“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন।

"उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत।"

১৭শ বর্ষ।

১৩২১ মাঘ হইতে ১৩২২ পৌষ পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

সূচী-পত্র।

১৭শ বর্ষ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২৭	২৪	তাঁহারা	তাঁহার
৭২৮	১৭	কিন্তু অভিভূত	কিন্তু এইরূপে অভিভূত
৭২৯	৯	কবিয়া	করিয়া.
৭৩১	৯	বলিত	বলিতে
,,	২৭	বলগে	বগলে
,,	২৮	কবধা	করিয়া
৭৩৪	২	উঠিয়ি	উঠিয়া
,,	৩	ভিতরটার	ভিতরটায়
,,	৪	যেন	যেন
৭৩৬	১	তাহার	তাঁহার
৭৩৭	১৫	দেখ্যাইবার	দেখাইবার
৭৩৮	১৬	ব্যার্দ্ধ	ব্যাসার্দ্ধ
,,	২৩	এইং	এবং
৭৩৯	৫	শ্রেয়ঃ	শ্রেয়ান্
,,	৬	শ্রেয়ান	শ্রেয়ঃ
,,	১৮	হৃদ্দেশেঽর্জ্জূন	হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন
৭৪০	২৭	মুক্ত	মুক্তা

পৌষ সংখ্যার শেষ ফর্ম্মার পত্রাঙ্কে ভুল আছে। ২৭৩ হইতে ২৮৮ পৃষ্ঠার স্থলে ৭৭৩ হইতে ৭৮৮ পৃষ্ঠা হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।
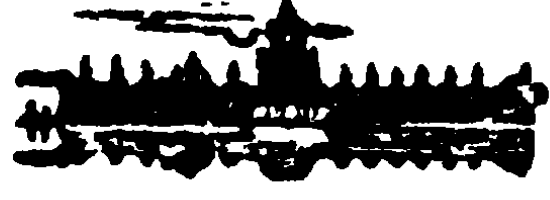
বাল্যকথা ও পিতৃবিয়োগ।

(স্বামী সারদানন্দ)

শাস্ত্রে আছে, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষসকলের জনক-জননী, তাঁহাদিগের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে নানারূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবরক্ষিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেও পরক্ষণেই অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং তাঁহাদিগের পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও তদীয় গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারা যায়। কারণ, তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মুখকমল দেখিয়া গয়াক্ষেত্রের দেবস্বপ্ন, শিব-মন্দিরের দিব্যদর্শন প্রভৃতি কথা এখন অনেকাংশে ভুলিয়া যাইলেন এবং তাহার যথাযথ পালন ও রক্ষণের জন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। উপার্জ্জনক্ষম ভাগিনেয় শ্রীযুত রামচাঁদের নিকটে, মেদিনীপুরে, পুত্রের জন্মসংবাদ প্রেরিত হইল। মাতুলের দরিদ্র সংসারে দুগ্ধের অভাব হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রেরণ করিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ঐ চিন্তা নিবারণ করিলেন। ঐরূপে নবজাত শিশুর জন্য যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে লাগিল, তখনই তাহা নানাদিক হইতে অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ হইলেও শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রা দেবীর চিন্তার বিরাম হইল না। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

এদিকে নবজাত বালকের চিত্তাকর্ষণশক্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া জনক-জননীর উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, কিন্তু পরিবারস্থ সকলের এবং পল্লীবাসিনী রমণীগণের উপরেও নিজ আধিপত্য ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া বসিল। পল্লীরমণীগণ অবসরকালে শ্রীমতী

চন্দ্রাকে এখন নিত্য দেখিতে আসিতেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'তোমার পুত্রটিকে নিত্য দেখিতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল, নিত্যই আসিতে হয়!' নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে আত্মীয়া রমণীগণও ঐ কারণে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দরিদ্র কুটীরে এখন হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলের আদরযত্নে সুখপালিত হইয়া নবাগত শিশু ক্রমে পঞ্চম মাস অতিক্রম করিল এবং তাহার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইল।

পুত্রের অন্নপ্রাশনকার্য্যে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম নিজ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাই প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ৺রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে প্রদান করিয়া ঐ কার্য্য শেষ করিবেন এবং তদুপলক্ষে দুই চারিজন নিকট আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ করিবেন—কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পরম বন্ধু গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহার গুপ্ত প্রেরণায় পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ আসিয়া তাঁহাকে সহসা ধরিয়া বসিলেন, পুত্রের অন্নপ্রাশন-দিবসে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুরোধে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কারণ, পল্লীর সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে আমন্ত্রণ করিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আবার তাঁহাদিগের সকলকে বলিতে তাঁহার সামর্থ্য কোথায়? সুতরাং 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' বলিয়া তিনি শ্রীযুত ধর্ম্মদাসের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ বিষয় স্থির করিতে আসিলেন এবং বন্ধুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই উপর উক্ত কার্য্যভার প্রদান-পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীযুত ধর্ম্মদাসও হৃষ্টচিত্তে অনেকাংশে আপন ব্যয়ে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপে গদাধরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পল্লীর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কুটীরে আসিয়া ৺রঘুবীরের প্রসাদ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে অনেক-গুলি দরিদ্র ভিক্ষুকও ঐরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার তনয়ের দীর্ঘজীবন এবং মঙ্গল কামনা করিয়া গিয়াছিল।

দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের বাল্যচেষ্টাসমূহ মধুরতর হইয়া উঠিয়া চন্দ্রা দেবীর হৃদয়কে আনন্দ ও ভয়ের পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিল। পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে যিনি দেবতাদিগের নিকটে কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না, সেই তিনিই এখন প্রতিদিন তনয়ের কল্যাণ-কামনায় শতবার, সহস্রবার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে, তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সকরুণ নিবেদন তাঁহাদিগের চরণে অর্পণ করিয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। ঐরূপে তনয়ের কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ শ্রীমতী চন্দ্রার ধ্যান জ্ঞান হইয়া তাঁহার ইতিপূর্ব্বের দিব্যদর্শনশক্তিকে যে এখন ঢাকিয়া ফেলিবে, একথা সহজে বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ঐ শক্তির সামান্য প্রকাশ তাঁহাতে এখনও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে কখন বিস্ময়ে এবং কখন বা পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পূর্ণ করিত। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনা যাহা আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এখানে বলিলে, পাঠক পূর্ব্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন সাত আট মাস হইবে। শ্রীমতী চন্দ্রা একদিন প্রাতে তাহাকে স্তন্যদানে নিযুক্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে নিদ্রিত দেখিয়া মশক-দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে মশারির মধ্যে শয়ন করাইলেন; অনন্তর ঘরের বাহিরে যাইয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল গত হইলে প্রয়োজনবশতঃ ঐ ঘরে সহসা প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, মশারির মধ্যে পুত্র নাই, তৎস্থলে এক দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ মশারি জুড়িয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে! বিষম আশঙ্কায় চন্দ্রা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে আসিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পুনরায় গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, বালক যেমন নিদ্রা যাইতেছিল, তেমনি নিদ্রা যাইতেছে! শ্রীমতী চন্দ্রার তাহাতেও ভয় দূর হইল না। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা হইতে ঐরূপ হইয়াছে; কারণ, আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি, পুত্রের স্থলে এক দীর্ঘাকার পুরুষ শয়ন করিয়া ছিল; আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই এবং সহসা ঐরূপ ভ্রম হইবার কোন কারণও নাই। অতএব শীঘ্র একজন

নিজ রোজা আনাইয়া সন্তানকে দেখাও, নতুবা কে জানে এই ঘটনায় পুত্রের কোন অনিষ্ট হইবে কি না?' শ্রীযুত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'যে পুত্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমরা নানা দিব্য দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে এখনও ঐরূপ কিছু দেখা বিচিত্র নহে; অতএব উহা উপদেবতাকৃত, একথা তুমি মনে কখনও স্থান দিও না; বিশেষতঃ বাটীতে ৺রঘুবীর স্বয়ং বিদ্যমান; উপদেবতাসকল এখানে কি কখন সন্তানের অনিষ্ট করিতে সক্ষম? অতএব নিশ্চিন্ত হও এবং একথা অন্য কাহাকেও আর বলিও না; জানিও, ৺রঘুবীর সন্তানকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন।' শ্রীমতী চন্দ্র স্বামীর ঐরূপ বাক্যে তখন আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কার ছায়া তাঁহার মন হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত হইল না। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রাণের বেদনা সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুলদেবতা ৺রঘুবীরকে নিবেদন করিলেন।

ঐরূপে আনন্দে, আবেগে, উৎসাহে, আশঙ্কায় শ্রীযুত গদাধরের জনক-জননীর দিন যাইতে লাগিল এবং বালক প্রথম দিন হইতে তাঁহাদিগের এবং অন্য সকলের মনে যে মধুর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দিন দিন দৃঢ় ও ঘনীভূত হইতে থাকিল। ক্রমে চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইল। ঘটনার ভিতর ঐ কালের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযুত ক্ষুদিরামের সর্ব্বমঙ্গলানাম্নী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ শ্রীযুত ক্ষুদিরাম এই কালে বিস্ময় ও আনন্দে অবলোকন করিয়াছিলেন। কারণ, চঞ্চল বালককে ক্রোড়ে করিয়া তিনি যখন নিজ পূর্ব্বপুরুষদিগের নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তোত্র ও প্রণামাদি, অথবা রামায়ণ মহাভারত হইতে কোন বিচিত্র উপাখ্যান তাহাকে শুনাইতে বসিতেন, তখন দেখিতেন, একবার মাত্র শুনিয়াই সে উহার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছে! আবার বহুদিন পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন, সে ঐ সকল সমভাবে আবৃত্তি করিতে সক্ষম! সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবিষয়েরও পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি বিষয়কে যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ ও ধারণা করে, অপর কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে আবার তেমনি উদাসীন থাকে—সহস্র

চেষ্টাতেও ঐ সকলে তাহার অনুরাগ অঙ্কুরিত হয় না। গণিতশাস্ত্রের নামতা প্রভৃতি শিখাইতে যাইয়া তিনি ঐ বিষয়ের আভাস পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, চপলমতি বালককে এত স্বল্প বয়সে ঐ সকল শিখাইবার জন্য পীড়ন করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু সে অত্যধিক চঞ্চল হইতেছে দেখিয়া, পঞ্চম বর্ষেই তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে পাঠশালে পাঠাইতে লাগিলেন। বালক তাহাতে সমবয়স্ক সঙ্গীদিগের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ সুখী হইল এবং সপ্রেম ব্যবহারে শীঘ্রই তাহাদিগের এবং শিক্ষকের প্রিয় হইয়া উঠিল।

গ্রামের জমীদার লাহা বাবুদের বাটীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত নাটমণ্ডপে পাঠশালার অধিবেশন হইত এবং প্রধানতঃ তাঁহাদিগের ব্যয়েই একজন সরকার বা গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের এবং নিকটস্থ গৃহস্থসকলের বালকগণকে অধ্যয়ন করাইতেন। ফলতঃ পাঠশালাটি লাহা বাবুরাই একরূপ পল্লীর বালকগণের কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং উহা শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কুটীরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। প্রাতে এবং অপরাহ্নে দুইবার করিয়া প্রতিদিন পাঠশালা খোলা হইত। ছাত্রগণ প্রাতে আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা পাঠ করিয়া স্নানাহার করিতে যে যাহার বাটীতে চলিয়া যাইত, এবং অপরাহ্ণ তিন চারি ঘটিকার সময় পুনরায় সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক ছাত্রগণকে অবশ্য অত অধিককাল পাঠাভ্যাস করিতে হইত না, কিন্তু তথায় হাজির থাকিতে হইত। সুতরাং পাঠের সময় পাঠাভ্যাস করিয়া তাহারা সেখানে বসিয়া থাকিত এবং কখন বা সঙ্গীদিগের সহিত ঐ স্থানের সন্নিকটে ক্রীড়ায় রত হইত। পাঠশালার পুরাতন ছাত্রেরা আবার নূতন ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিত এবং তাহারা পুরাতন পাঠ নিত্য অভ্যাস করে কি না, তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিত।

এইরূপে একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত থাকিলেও পাঠশালার কার্য্য সুচারুভাবে চলিয়া যাইত। গদাধর যখন পাঠশালে প্রথম প্রবেশ করে, তখন শ্রীযুত যদুনাথ সরকার তথায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। উহার কিছুকাল পরে তিনি নানা কারণে ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পাঠশালার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বালকের জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার মহৎ জীবনের পরিচায়কস্বরূপে শ্রীযুত ক্ষুদিরাম যে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দর্শনাদি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল তাঁহার মনে চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বালসুলভ চপলতায় সে কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করিতেছে দেখিলেও, তিনি তাহাকে মৃদুবাক্যে নিষেধ করা ভিন্ন কখনও কঠোরভাবে দমন করিতে সক্ষম হইতেন না। কারণ সকলের ভালবাসা পাইয়াই হউক, বা নিজ স্বভাবগুণেই হউক, তাহাতে তিনি এখন সময়ে সময়ে অনাশ্রবতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐজন্য অপর পিতামাতাসকলের ন্যায় তাহাকে কখনও তাড়না করা দূরে থাকুক, তিনি ভাবিতেন, উহাই বালককে ভবিষ্যতে বিশেষরূপে উন্নত করিবে। ঐরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি দেখিতেন, দুরন্ত বালক কখন কখন পাঠশালায় না যাইয়া সঙ্গিগণকে লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে ক্রীড়ায় রত থাকিলে অথবা কাহাকেও না বলিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে যাত্রাগান শুনিতে যাইলেও, যখন যাহা ধরিত, তাহা না সম্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হইত না, মিথ্যাসহায়ে নিজকৃত কোন কর্ম্ম কখনও ঢাকিতে প্রয়াস পাইত না এবং সর্ব্বোপরি তাহার প্রেমিক হৃদয় তাহাকে কখনও কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত করিত না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু এক বিষয়ের জন্য শ্রীযুত ক্ষুদিরাম কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, হৃদয় স্পর্শ করে এমন ভাবে কোন কথা না বলিতে পারিলে, উহা বিধি বা নিষেধ যাহাই হউক না কেন, বালক উহার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সর্ব্বথা বিপরীতাচরণ করিয়া বসে। উহা তাহার সকল বিষয়ের কারণ-জিজ্ঞাসার পরিচায়ক হইলেও, সংসারের সর্ব্বত্র বিপরীত রীতির অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, কেহই বালককে ঐরূপে সকল বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে না এবং তজ্জন্য অনেক সময়ে তাহার সদ্বিধিসকল মান্য না করিয়া চলিবার সম্ভাবনা। এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় শ্রীযুত ক্ষুদিরামের মনে বালকের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত চিন্তাসকল উদিত হইয়াছিল এবং এখন হইতে তিনি তাহার মনের ঐরূপ

প্রকৃতি বুঝিয়া তাহাকে সতর্কভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ইহাই—

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের বাটীর একরূপ পার্শ্বেই হালদারপুকুর নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান। পল্লীর সকলে উহার স্বচ্ছ সলিলে স্নান পান ও রন্ধনাদি কার্য্য করিত। অবগাহনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষদিগের নিমিত্ত দুইটি বিভিন্ন ঘাট নির্দ্দিষ্ট ছিল। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক বালকেরা স্নানার্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘাটে অনেক সময়ে গমন করিত। দুই চারি জন বয়স্যের সহিত গদাধর একদিন ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া জলে উল্লম্ফন-সন্তরণাদির দ্বারা বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। উহাতে স্নানের জন্য সমাগতা স্ত্রীলোকদিগের অসুবিধা হইতে লাগিল। সান্ধ্যাহ্নিক কর্ম্মে নিযুক্তা বর্ষীয়সী রমণীগণের অঙ্গে জলের ছিটা লাগায়, নিষেধ করিলেও তাহারা বালকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তোরা এ ঘাটে কি করিতে আসিস্? পুরুষদিগের ঘাটে যাইতে পারিস্ না? এ ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নানান্তে পরিধেয় বসনাদি ধৌত করে—জানিস্ না, স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গিনী দেখিতে নাই?' গদাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন দেখিতে নাই?' তিনি তাহাতে সে বুঝিতে পারে এমন কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া, তাহাকে অধিকতর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন এবং বাটীতে পিতামাতাকে বলিয়া দিবেন ভাবিয়া বালকগণ তখন অনেকটা নিরস্ত হইল। গদাধর কিন্তু উহাতে মনে মনে অন্যরূপ সঙ্কল্প করিল। সে দুই তিন দিন রমণীগণের স্নানের সময় পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বর্ষীয়সী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিল, 'পরশু চারি জন রমণীকে স্নানকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল ছয় জনকে এবং আজ আট জনকে ঐরূপ করিয়াছি— কিন্তু কৈ আমার কিছুই ত হইল না?' বর্ষীয়সী রমণী তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রা দেবীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ঐ কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রা তাহাতে গদাধরকে অবসরকালে নিকটে পাইয়া মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, 'ঐরূপ করিলে তোমার কিছু হয় না, কিন্তু রমণীগণ আপনাদিগকে

বিশেষ অপমানিতা জ্ঞান করেন; তাঁহারা আমার সদৃশা, তাঁহাদিগকে অপমান করিলে আমাকেই অপমান করা হয়। অতএব আর কখনও ঐরূপে তাঁহাদিগের সম্মানের হানি করিও না, তাঁহাদিগের ও আমার মনে পীড়া দেওয়া কি ভাল?' বালকও তাহাতে বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ আচরণ আর কখনও করিল না।

সে যাহা হউক, পাঠশালে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল না। সে অল্পকালের মধ্যেই সামান্য ভাবে পড়িতে এবং লিখিতে সমর্থ হইল। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাহার বিদ্বেষ চিরদিন প্রায় সমভাবেই রহিল। অন্যদিকে বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তি দিন দিন নানা নূতন দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। গ্রামের কুম্ভকারগণকে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদের নিকট যাতায়াত ও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং উহা তাহার ক্রীড়ার অন্যতম রূপে পরিগণিত হইল। পটব্যবসায়িগণের সহিত মিলিত হইয়া সে ঐরূপে চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের কোথাও পুরাণ-কথা অথবা যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই, সে তথায় গমন করিয়া শাস্ত্রোপাখ্যান সকল শিখিতে লাগিল এবং শ্রোতাদিগের নিকটে ঐ সকল কিরূপে প্রকাশ করিলে তাহাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হয়, তাহা তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বালকের অপূর্ব্ব স্মৃতি ও মেধা তাহাকে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল।

আবার, সদানন্দ বালকের রঙ্গরসপ্রিয়তা তাহার অদ্ভুত অনুকরণশক্তি-সহায়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া একদিকে যেমন তাহাকে নরনারীর বিশেষ বিশেষ হাব-ভাব অভিনয় করিতে এই বয়স হইতেই প্রবৃত্ত করিল, অন্যদিকে তেমনি তাহার মনের স্বাভাবিক সরলতা ও দেবভক্তি তাহার জনক-জননীর দৈনন্দিন অনুষ্ঠানসকলের দৃষ্টান্তে দ্রুতপদে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ঐকথা যে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ ও স্বীকার করিয়াছে, তাহা দক্ষিণেশ্বরে আমাদের নিকটে উক্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে পাঠক বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারিবেন—"আমার জননী মূর্ত্তিমতী সরলতাস্বরূপা ছিলেন। সংসারের কোন বিষয় বুঝিতেন না, টাকা

পয়সা গণনা করিতে জানিতেন না, কাহাকে কোন্ বিষয় বলিতে নাই তাহা না জানাতে আপনার পেটের কথা সকলের নিকটেই বলিয়া ফেলিতেন, সেজন্য লোকে তাঁহাকে 'হাউড়ো' বলিত—এবং সকলকে আহার করাইতে বড় ভালবাসিতেন। আমার জনক কখনই শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই, পূজা, জপ, ধ্যানে দিনের ভিতর অধিক কাল যাপন করিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবার কালে 'আয়াহি বরদে দেবি' ইত্যাদি গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার বক্ষ স্ফীত ও রক্তিম হইয়া উঠিত এবং নয়নের অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইত, আবার যখন পূজাদিতে নিযুক্ত না থাকিতেন তখনও তিনি ৺রঘুবীরকে সাজাইবার জন্য সূচ সূতা ও পুষ্প লইয়া মালা গাঁথিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন, গ্রামের লোকে তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মান্য ভক্তি করিত।"

বালকের অসীম সাহসের পরিচয়ও দিন দিন পাওয়া যাইতেছিল। বয়োবৃদ্ধেরাও যেখানে ভূত-প্রেতাদির ভয়ে জড়সড় হইত, বালক সেখানে অকুতোভয়ে গমনাগমন করিত। তাহার পিতৃষ্বসা শ্রীমতী রামশীলার উপর কখন কখন ৺শীতলাদেবীর ভাবাবেশ হইত। তখন তিনি যেন ভিন্ন এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। কামারপুকুরে ভ্রাতার নিকটে এই সময়ে অবস্থানকালে একদিন তাঁহার সহসা ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া পরিবারস্থ সকলের মনে ভয় ও ভক্তির উদয় করিয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ অবস্থা শঙ্কার সহিত সন্দর্শন করিলেও কিন্তু গদাধর উহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। সে তাঁহার সন্নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল এবং পরে বলিয়াছিল, "পিসিমার ঘাড়ে যে আছে, সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে ত বেশ হয়!"

কামারপুকুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভূরসুবো অথবা ভূরশোভা নামক গ্রামের বিশিষ্ট দাতা ও ভক্ত জমীদার মাণিকরাজার কথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ধর্ম্মপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ছয় বৎসরের বালক গদাধর পিতার সহিত একদিন মাণিকরাজার বাটীতে যাইয়া সকলের প্রতি এমন চিরপরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচ মধুর ব্যবহার করিয়াছিল

যে, সেইদিন হইতেই সে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মাণিকরাজার ভ্রাতা শ্রীযুত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বালককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিলেন, "সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নহে, ইহাতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞান হয়! তুমি যখন এদিকে আসিবে বালককে সঙ্গে লইয়া আসিও, উহাকে দেখিলে পরম আনন্দ হয়।" শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ইহার পরে নানাকারণে মাণিকরাজার বাটীতে কিছুদিন যাইতে পারেন নাই। মাণিকরাজা উহাতে নিজ পরিবারস্থ একজন রমণীকে সংবাদ লইতে এবং সুস্থ থাকিলে গদাধরকে কিছুক্ষণের জন্য ভুরসুবো গ্রামে আনয়ন করিতে পাঠান। বালক তাহাতে পিতার আদেশে সানন্দে উক্ত রমণীর সহিত আগমন করিয়াছিল এবং সমস্ত দিবস তথায় থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং কয়েকখানি অলঙ্কার উপহার লইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। গদাধর ক্রমে এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের এত প্রিয় হইয়া উঠে যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ভুরসুবো যাইতে কয়েকদিন বিলম্ব করিলেই তাঁহারা লোক পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেন।

ঐরূপে দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া বালক ক্রমে সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিল এবং শৈশবের মাধুর্য্য ঘনীভূত হইয়া তাহাকে এখন দিন দিন সকলের অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলিল! পল্লীবাসিনী রমণীগণ বাটীতে কোনরূপ সুখাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় তাহাকে উহার কিয়দংশ কেমন করিয়া ভোজন করাইবেন সেই কথাই অগ্রে চিন্তা করিতেন, সমবয়স্ক বালকবালিকা-গণ তাহাদিগের ভোজ্যাংশ তাহার সহিত ভাগ করিয়া খাইয়া আপনাদিগকে অধিকতর পরিতৃপ্ত বোধ করিত, এবং প্রতিবাসীসকলে তাহার মধুর কথা, সঙ্গীত ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার বালসুলভ দৌরাত্ম্যসকল হৃষ্টচিত্তে সহ্য করিত। এই কালের একটি ঘটনায় বালক তাহার জনকজননী এবং বন্ধুবর্গকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় গদাধর সুস্থ ও সবল শরীর লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কোনও ব্যাধি হয় নাই। বালক সেজন্য গগনচারী বিহঙ্গের ন্যায় অপূর্ব্ব স্বাধীনতা ও চিত্তপ্রসাদে দিন যাপন করিত। শরীরবোধরাহিত্যই পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ভিষকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বালক জন্মাবধি ঐরূপ স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিতেছিল। তদুপরি তাহার স্বাভাবিক একাগ্র চিত্ত বিষয়বিশেষে যখন নিবিষ্ট হইত তখন তাহার শরীরবুদ্ধির অধিকতর হ্রাস হইয়া তাহাকে যেন এককালে ভাবময় করিয়া তুলিত। বিশুদ্ধ-বায়ু-আন্দোলিত প্রান্তরের হরিৎ-সুন্দর ছবি, নদীর অবিরাম প্রবাহ, বিহঙ্গের কলগান এবং সর্ব্বোপরি সুনীল অম্বর ও তন্মধ্যগত প্রতিক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল অভ্রপুঞ্জের মায়ারাজ্য প্রভৃতি যখন যে পদার্থ আপন রহস্যময় প্রতিকৃতি তাহার মনের সম্মুখে আপন মহিমা প্রসারিত করিয়া উহাকে আকৃষ্ট করিত, বালক তখনই তাহাকে লইয়া আত্মহারা হইয়া ভাব-রাজ্যের কোন এক সুদূর নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইত। বর্ত্তমান ঘটনাটিও তাহার ভাবপ্রবণতা হইতে উপস্থিত হইয়াছিল।* প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালক নবজলধর-ক্রোড়ে বলাকাশ্রেণীর শ্বেতপক্ষবিস্তারপূর্ব্বক সুন্দর স্বাধীন পরিভ্রমণ দেখিয়া এতদূর তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহার নিজ শরীরের ও জাগতিক অন্য সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ হইয়াছিল এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে প্রান্তর-পথে পড়িয়া গিয়াছিল। বয়স্যগণ তাহার ঐরূপ অবস্থা দর্শনে ভীত ও বিপন্ন হইয়া তাহার জনক-জননীকে সংবাদ প্রদান করে এবং তাহাকে ধরাধরি করিয়া প্রান্তর হইতে বাটীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চেতনালাভের কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সে আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ বোধ করিয়াছিল। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী যে, এই ঘটনায় বিষম ভাবিত হইয়াছিলেন এবং আর যাহাতে তাহার ঐরূপ অবস্থা না হয় সেজন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। ফলতঃ তাঁহারা উহাতে বালকের মূর্চ্ছারোগ বিষম ব্যাধির সূচনা অবলোকন করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগে এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বালক গদাধর কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ ঘটনা-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল, তাহার মন এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবে লীন হইয়াছিল বলিয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং বাহিরে অন্যরূপ দেখাইলেও তাহার ভিতরে সংজ্ঞা এবং এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের বোধ

* ঠাকুর এই ঘটনাসম্বন্ধে নিজমুখে যেরূপ বলিয়াছিলেন তজ্জন্য "সাধকভাব"—২য় অধ্যায় - ৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ছিল। সে যাহা হউক, তাহার ঐরূপ অবস্থা তখন আর না হওয়াতে এবং তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম না দেখিয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ভাবিয়াছিলেন, উহা কোনরূপ বায়ুর প্রকোপে সাময়িক উপস্থিত হইয়াছিল; এবং শ্রীমতী চন্দ্রা স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, উপদেবতার নজর লাগিয়া তাহার ঐরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ঘটনার জন্য তাঁহারা বালককে পাঠশালায় কিছুকাল যাইতে দেন নাই। বালক তাহাতে প্রতিবেশিগণের গৃহে এবং গ্রামের সর্ব্বত্র যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐরূপে বালকের সপ্তম বর্ষের অর্দ্ধেক কাল অতীত হইয়া ক্রমে সন ১২৪৯ সালের শারদীয় মহাপূজার সময় উপস্থিত হইল। শ্রীযুত ক্ষুদিরামের কৃতী ভাগিনেয় রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। কর্ম্মস্থল বলিয়া মেদিনীপুরে বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত করিলেও সেলামপুর নামক গ্রামেই তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল; এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঐ স্থানেই বাস করিত। শ্রীযুত রামচাঁদ ঐ গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। হৃদয়রামের নিকট শুনিয়াছি, পূজার সময় রামচাঁদের সেলামপুরের ভবন অষ্টাহকাল গীতবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত এবং ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিতবিদায়, দরিদ্রভোজন ও তাহাদিগকে বস্ত্রদান প্রভৃতি কার্য্যে তথায় আনন্দের স্রোত ঐ কালে নিরন্তর প্রবাহিত হইত। শ্রীযুত রামচাঁদ এতদুপলক্ষে তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাতুলকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া এই সময়ে কিছুকাল তাঁহার সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। বর্ত্তমান বৎসরেও শ্রীযুত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ রামচাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ যথাসময়ে প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত ক্ষুদিরাম এখন অষ্টসপ্ততিতম বর্ষ প্রায় অতিক্রম করিতে বসিয়াছেন এবং কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে মধ্যে মধ্যে অজীর্ণ ও গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সুদৃঢ় শরীর এখন বলহীন হইয়াছিল। সেজন্য প্রিয় ভাগিনেয় রামচাঁদের সাদরাহ্বানে তাহার ভবনে যাইতে ইচ্ছা হইলেও তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; নিজ দরিদ্র কুটীর

এবং পরিবারবর্গকে, বিশেষতঃ গদাধরকে কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেও তিনি অন্তরে একটা কারণশূন্য অথচ প্রবল অনিচ্ছা অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, শরীর যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এ বৎসর না যাইলে আর কখনও যাইতে পারিবেন কি না তাহা কে বলিতে পারে? অতএব স্থির করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পরক্ষণে নিশ্চয় করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইলে শ্রীমতী চন্দ্রা বিশেষ উদ্বিগ্না থাকিবেন। অগত্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের সহিত যাইয়া পূজার কয়টা দিন রামচাঁদের নিকটে কাটাইয়া আসিবেন ইহাই স্থির করিলেন এবং ৺রঘুবীরকে প্রণামপূর্ব্বক সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ এবং গদাধরের মুখচুম্বন করিয়া তিনি পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে সলামপুর যাত্রা করিলেন। রামচাঁদও পূজার্হ মাতুল ও ভ্রাতা রামকুমারকে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন।

এখানে পৌঁছিবার পরেই কিন্তু শ্রীযুত ক্ষুদিরামের গ্রহণীরোগ পুনরায় দেখা দিল এবং তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন মহানন্দে কাটিয়া গেল। কিন্তু নবমীর দিনে আনন্দের হাটে নিরানন্দ উপস্থিত হইল, শ্রীযুত ক্ষুদিরামের ব্যাধি প্রবল ভাব ধারণ করিল। রামচাঁদ উপযুক্ত বৈদ্যগণ আনাইয়া এবং ভগ্নী হেমাঙ্গিনী ও রামকুমারের সাহায্যে সযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত রোগের উপশম হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নবমীর দিন ও রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া যাইয়া হিন্দুর বিশেষ পবিত্র সম্মিলনের দিন বিজয়া দশমী সমাগত হইল। শ্রীযুত ক্ষুদিরাম অদ্য এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

ক্রমে অপরাহ্ণ সমাগত হইলে রামচাঁদ প্রতিমা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সত্বর মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত-প্রায়। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শ্রীযুত ক্ষুদিরাম অনেকক্ষণ হইতে নির্ব্বাক্ হইয়া ঐরূপ জ্ঞানশূন্যের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন রামচাঁদ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"মামা, তুমি যে সর্ব্বদা 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া থাক, এখন বলিতেছ না কেন?" ঐ নাম শ্রবণ করিয়া সহসা শ্রীযুত ক্ষুদিরামের চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'কে? রামচাঁদ, প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে? তবে আমাকে একবার বসাইয়া দাও।' অনন্তর রামচাঁদ, হেমাঙ্গিনী ও রামকুমার তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অতি সন্তর্পণে শয্যায় উপবেশন করাইয়া দিবামাত্র তিনি গম্ভীর স্বরে তিনবার ৺রঘুবীরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিলিত হইল—৺রঘুবীর ভক্তের পৃথক জীবনবিন্দু নিজ অনন্ত জীবনে সম্মিলিত করিয়া তাহাকে অমর ও পূর্ণ শান্তির অধিকারী করিলেন! পরে গভীর নিশীথে উচ্চ সংকীর্ত্তনে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দেহ নদীকূলে আনীত হইলে উহাতে অগ্নিসংস্কার করা হইল। পরদিন ঐ সংবাদ অগ্রসর হইয়া কামারপুকুরের আনন্দধাম নিরানন্দে পূর্ণ করিল।

অনন্তর, অশৌচান্তে শ্রীযুত রামকুমার শাস্ত্রবিধানে বৃষোৎসর্গ এবং বহু ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ করিলেন। শুনা যায়, মাতুলের শ্রাদ্ধক্রিয়ায় শ্রীযুত রামচাঁদ পাঁচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীকদর্শন] [প্লেটো

(শ্রীকানাইলাল পাল এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

একত্ব ও বহুত্বের সামঞ্জস্যসাধনই প্লেটো-দর্শনের বিশেষত্ব একথা সুধী পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝিয়াছেন। কথাটা আমরা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক—"মনুষ্য" এই পদটী "জীব" শব্দ-বাচ্য পরজাতির অন্তর্গত, সেইটার তুলনায় ইহা একটী

বিশেষ পদার্থ মাত্র। পক্ষান্তরে রাম, শ্যাম, হরি প্রভৃতি বিশেষ পদার্থের তুলনায় ইহাকে পরজাতি-বাচক পদার্থ বলিতে হইবে। সুতরাং একই পদার্থ পরজাতি ও অপরজাতি বা বিশেষের অন্তর্গত হইতে পারে। মনুষ্য বলিতে যে জাতি-ভাব বুঝায় তাহা এক, কিন্তু সেই ভাব বহু বিশেষ পদার্থেরও অস্তিত্ব সূচনা করে, সুতরাং মনুষ্যত্ব এই পদটীতে একত্ব ও বহুত্বের অপূর্ব্ব সমাবেশ বর্ত্তমান। আমরা একটা ক্ষুদ্র উদাহরণ লইয়া বক্তব্য বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু বিষয়টা তত ক্ষুদ্র নয়-খুবই গুরুতর। মোট কথা সহজে ও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা উপস্থিত ক্ষান্ত রহিলাম, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

আমরা জানি মহাত্মা সক্রেটীসই প্রথমে প্রচার করেন, বস্তুর "সংজ্ঞা" নির্দ্ধারণ করিয়া দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল পরিবর্ত্তনশীল, অস্থায়ী, অনিত্য; সুতরাং যাহা কিছু প্রতীয়মান হইতেছে তাহাই সত্য নয়। বস্তুর "ভাবটা" অপরিবর্ত্তনীয়, সেই ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করিলেই বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয়। এ সকল কথাও সক্রেটীসই প্রথমে ঘোষণা করেন। দার্শনিকগুরু প্লেটো ঐ সকল উক্তির সারবত্তা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই সক্রেটীস্ কর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে তিনি দার্শনিক চিন্তায় অগ্রসর হয়েন। সাধারণ কথায় "ভাব" বলিতে "জাতি" বুঝায় (জাতি না বলিয়া জাতীয়তা বলিলেই ঠিক হয়); "মনুষ্যত্ব" এই ভাবটা মনুষ্যজাতিকেই লক্ষ্য করে, এবং সেই ভাবটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী, অস্থায়ী নয়। সুতরাং জ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত হইয়া প্লেটো ঐরূপ ভাবকে যে বাস্তবিক সৎ পদার্থরূপে গ্রহণ করিবেন সেটা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক।

প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান পদার্থগুলিকে উক্ত প্রণালী অবলম্বনে প্লেটো বহু জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া তাহাদের প্রত্যেকটাকেই ভাবপদার্থ আখ্যা প্রদান করেন। আপাতদৃষ্টিতে সেই ভাবপদার্থ পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও আপন সত্তায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহা নয়। বিশেষ পদার্থ যেমন জাতির অন্তর্ভুক্ত, জাতি আবার সেইরূপ পরজাতির অন্তর্ভুক্ত; এইরূপে ক্রমপরম্পরায় সকল জাতি পরমম জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রণালী

অবলম্বনেই প্লেটো বিশ্বজগৎকে একটী মূল ভাবপদার্থের অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রয়াসী হন। তাই বলিয়া ভাবপদার্থ বলিতে তিনি জাতিবাচক শব্দ বা যুক্তির মৌলিক নিয়ম মাত্র বুঝিতেন না; তাঁহার মতে এই ভাবপদার্থেরই বাস্তবিক সত্তা আছে—আর সমস্তই তাহার প্রতিকৃতি মাত্র।

যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে বুঝা যায়—বহু ভাবপদার্থ মূল ভাবপদার্থের অধীন হওয়ায় তাহারা সকল সম্পর্কশূন্য এক একটী পৃথক্ পদার্থ নয়। মনুষ্যত্ব বলিতে যেমন একাধারে বহুত্ব ও একত্বের সূচনা করে, বহুকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার যেমন একত্ব নিরর্থক, তেমনি মূল ভাবপদার্থ বহুত্বের নিরাস করে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম, একত্ব ও বহুত্বের সামঞ্জস্য সাধনই প্লেটো-দর্শনের বিশেষত্ব।

বহুকে নিরাস করিলে একত্ব শূন্যগর্ভ শব্দ মাত্রে পরিণত হয়। তাই প্লেটো ইলিয়াটিকগণের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 'বহু' বলিলেই ভেদবৈচিত্র্য বুঝায়. ভেদ আবার শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগত ভেদও বর্তমান। এই ভেদবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা প্রদানে পিথাগুরু সম্প্রদায়ের মত যে তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়, সেটী প্লেটো সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই সে মত অগ্রাহ্য না করিয়া "সংখ্যাকে" ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করিয়া তিনি সকল প্রকার ভেদবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আবার এই বহুত্বের মাঝে অপূর্ব্ব শিল্পচাতুরী! সুতরাং আনাকসাগোরাসের মতও যুক্তিযুক্ত বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এ সকল কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

একত্ব ও বহুত্বের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য থাকায় বহু ভাবপদার্থ স্বীকারে প্লেটো-দর্শনে কোনরূপ স্ববিরোধ দোষ ঘটে নাই। ভাবপদার্থ সত্য পদার্থ; মূল ভাবপদার্থের অন্তর্ভূত বলিয়াই সে সত্যপদার্থ; মূল ভাবপদার্থ বহু ভাবপদার্থের অস্তিত্ব লোপ করে না বলিয়াই তাহারা সৎ। এই প্রকার যুক্তিবলে বহু ভাবপদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে এই বিশ্বজগৎ ভাবজগতে পরিণত হয়। তাই তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জগৎ জ্ঞানময় ভাবজগতের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিশেষ পদার্থ হইতে পরতম জাতি মূল ভাবপদার্থে উপনীত হওয়া প্লেটোর লক্ষ্য ছিল এবং সে উদ্দেশ্যসাধনে

সক্রেটীস-উদ্ভাবিত প্রণালীই তাঁহার একমাত্র উপায় ছিল একথা আমরা জানি; কিন্তু সেই প্রণালী অবলম্বনে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না, তল্লিখিত পুস্তকসমূহে তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। ভাবপদার্থগুলি শ্রেণীপরম্পরায় সুসজ্জিত, ন্যায়শৃঙ্খলায় তাহারা এক একটী গ্রন্থিবিশেষ, একথা তিনিই প্রথমে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থসমূহে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অভাব। সে অভাব না থাকিলে সকল রহস্যের মীমাংসা প্লেটো-দর্শনে পাওয়া দুর্লভ হইত না।

আমরা ভাবজগতের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব—

ভাবপদার্থ এক হিসাবে এক একটী বিশেষ পদার্থ এবং অন্য হিসাবে ইহা জাতিবাচক। সাধারণ ভাব (uniform character) বর্ত্তমান থাকিলেই সেস্থলে জাতিবাচক শব্দের প্রয়োগ চলে। সুতরাং জাতি বহু, ভাবপদার্থও বহু—অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিশ্বজগৎ অনন্ত ভাবের সমষ্টি মাত্র। এই ভাবগুলিকে তিনি এইরূপে বিভাগ করিয়াছিলেন, যথা—সৎ (Being), অসৎ (Non-being), ভেদ (Difference), অভেদ (Identity), একত্ব (Unity) ও বহুত্ব (Multiplicity)। আবার সেইগুলির গুণ (Quality), পরিমাণ (Quantity) ও সম্বন্ধ (Relation) কতক কতক বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সমস্ত ভাবগুলিকে শ্রেণী-পরম্পরায় সুসজ্জিত করিয়া যান নাই। শ্রেণীবিভাগকার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিলেও তিনি মূলপদার্থের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "কল্যাণস্বরূপ" সেই মূলপদার্থ। এই কল্যাণস্বরূপই (the Good) সকল পদার্থের মূলপদার্থ—দর্শনবিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।

সকল পদার্থের মূলে প্লেটো কল্যাণস্বরূপ বা মঙ্গলস্বরূপকে স্থাপন করিলেন কেন একথা সহজেই মনে হইতে পারে। নৈতিক ধর্ম্মজীবন লাভই মানবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি পরস্পর পরস্পরাশ্রিত, সক্রেটীসের এই সকল উক্তির সার্থকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয় প্লেটো মঙ্গলস্বরূপকে বিশ্বের মূলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কল্যাণ বলিতে সাধারণতঃ কর্ম্মজীবনের লক্ষ্য বুঝায়, সেটীকে জগৎ-

কারণ বা চেতনশক্তিসমন্বিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। কিন্তু প্লেটো কল্যাণ বলিতে ঐ সঙ্কীর্ণ অর্থ বুঝিতেন না। তাঁহার মতে কল্যাণস্বরূপই এক হিসাবে জগৎস্রষ্টা, জগতের নিয়ামক, অপর হিসাবে আদর্শ সত্তা, আদর্শ লক্ষ্য। কল্যাণস্বরূপ ও জগৎস্রষ্টার পৃথক ভেদ স্বীকার করিলে নানা আপত্তি উঠিয়া থাকে। হয় একটী অপরের অধীন, অথবা পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভাবপদার্থ আপন সত্তায় পরিপূর্ণ—তাহার অস্তিত্ব অপরের উপর নির্ভর করে না—ভাবপদার্থের ইহাই বিশেষত্ব, সুতরাং সেই ভাবপদার্থকে ঈশ্বরের অধীন বলা অসঙ্গত। পক্ষান্তরে ঈশ্বর সেই ভাবপদার্থের অধীন একথা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই লোপ পায়। সুতরাং একটী অপরটীর অধীন হইতে পারে না। তারপর উভয়ের স্বাধীন অস্তিত্বও স্বীকার করা অযৌক্তিক—আমরা জানি ভাবপদার্থই একমাত্র সৎপদার্থ, আর যাহা কিছু তাহা সেই ভাবপদার্থেরই অনুকৃতি মাত্র। সেই ভাবপদার্থগুলি শ্রেণী-পরম্পরায় সুসজ্জিত। সেই ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে যদি সৎপদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব হয় তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? ঈশ্বর আদর্শ অনুসারে জগৎ রচনা করিয়াছেন, তৎগ্রন্থে এবংবিধ উক্তি সন্দর্শনে কোন কোন দার্শনিক বলেন প্লেটো উভয়ের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। কিন্তু সেরূপ উক্তি স্বীকারে তাঁহার দার্শনিক মতে স্ববিরোধ দোষ উপস্থিত হয়; অপরপক্ষে তিনি স্পষ্টভাবেই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন—"The Divine reason is none other than the Good." সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

(ক্রমশঃ)

দেববাণী।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

২৪শে জুলাই, বুধবার।

যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে যোগসিদ্ধিগুলি বিঘ্ন নয়, কিন্তু প্রবর্ত্তকের পক্ষে সেগুলি বিঘ্নস্বরূপ হতে পারে, কারণ, ঐগুলি প্রয়োগ করতে করতে তাঁর ঐসবে একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব আসতে

পারে। সিদ্ধি বা বিভূতিগুলি যোগসাধনার পথে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তার চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু সেগুলি মন্ত্রজপ, উপবাসাদি তপস্যা, যোগসাধন, এমন কি, ঔষধবিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আসতে পারে। যে যোগী যোগসিদ্ধিসমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদয় কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, তাঁর ধর্ম্মমেঘ নামে সমাধিলাভ হয়। যেমন মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি তিনি যে যোগাবস্থা লাভ করেন, তাতে চারিদিকে ধর্ম্ম বা পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

যখন একরূপ প্রত্যয়ের ক্রমাগত আবৃত্তি হতে থাকে, তখনই উহা ধ্যান-পদবাচ্য, কিন্তু সমাধি এক বস্তুতেই হয়ে থাকে।

মন আত্মার জ্ঞেয়, কিন্তু মন স্বপ্রকাশ নহে। আত্মা কোন বস্তুর কারণ হতে পারে না। কিরূপে হবে? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরূপে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কখন প্রকৃতিতে যুক্ত হন না—অবিবেকের দরুণ পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হয়েছেন বোধ হয়।

* * * *

লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা জগতে কোনরূপ দুঃখ আছে, এটী অনুভব না করে অপরকে সাহায্য করতে শিক্ষা কর। শত্রু মিত্র উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর; যখন তা হতে পারবে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে বুঝতে হবে।

বাসনারূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তাহলেই উহা একেবারে চলে যাবে—উহা ত কেবল ভ্রমমাত্র। "যাঁর মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনিই কেবল 'আজাদ' বা মুক্ত।"

কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমান ভাবে ভালবাস—তা হলে সব বাসনা চলে যাবে।

সর্ব্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে। অতএব পৃথিবীর উন্নতির জন্য, প্রজাপতিকে আবার রংচঙে করবার জন্য কেন চেষ্টা কর? সবই ত শেষে চলে যাবে। সাদা ইঁদুরের মত খাঁচায় বসে কেবল ডিগবাজি খেয়ো না, সদাই ব্যস্ত অথচ প্রকৃত কাজ কিছু হচ্ছে না। বাসনা ভালই হক

আর মন্দই হক, বাসনা জিনিসটাই খারাপ। এ যেন কুকুরের মত মাংসখণ্ড পাবার জন্য দিন রাত লাফান, অথচ মাংসের টুকরোটা ক্রমাগত সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষে কুকুরের মত মৃত্যু। ওরকম হয়ো না। সমস্ত বাসনা নষ্ট করে ফেল।

* * * *

পরমাত্মা যখন মায়াধীশ তখন তাঁকে বলে ঈশ্বর, আবার তিনিই যখন মায়ার অধীন, তখন তিনিই জীবাত্মাপদবাচ্য। সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের সমষ্টিই মায়া, একদিন উহা একেবারে উড়ে যাবে।

বৃক্ষের বৃক্ষত্বটা মায়া—গাছ দেখবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-স্বরূপকেই মায়াবৃতভাবে দেখ্‌ছি। কোন ঘটনার সম্বন্ধে 'কেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্তর্গত। সুতরাং মায়া কিরূপে এল, এ প্রশ্নটাই বৃথা প্রশ্ন, কারণ, মায়ার মধ্যে থেকে ওর উত্তর কখন দেওয়া যেতে পারে না, আর যখন মায়ার পারে চলে যাবে, তখন কে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা মায়া বা অসদ্দৃষ্টিই 'কেন' এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে, কিন্তু 'কেন' প্রশ্ন থেকে মায়া আসে না—মায়াই ঐ 'কেন' জিজ্ঞাসা করে। ভ্রম ভ্রমকে নষ্ট করে দেয়। যুক্তিবিচার নিজেই একটা বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং উহা একটা বৃত্তস্বরূপ, কাজেই উহাকে নিজেকে নিজে নষ্ট করতে হয়। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি একটা আনুমানিক জ্ঞান কিন্তু আবার সব আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অনুভূতি।

অজ্ঞানে যখন ব্রহ্মজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই তাকে দেখা যায়—উহাকে স্বতন্ত্রভাবে ধরলে উহা শূন্যস্বরূপ বৈ কিছুই নয়। সূর্য্যকিরণ মেঘে প্রতিফলিত না হলে মেঘকে দেখাই যায় না।

চার জন লোক দেশভ্রমণ করতে করতে একটা খুব উঁচু দেয়ালের কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রথম পথিকটা অতি কষ্টে দেয়াল বেয়ে উঠ্‌ল, আর পেছন দিকে চেয়ে না দেখেই দেয়ালের ওপারে লাফ দিয়ে পড়্‌ল। দ্বিতীয় পথিকটা দেয়ালে উঠ্‌ল, ভিতরের দিকে দেখ্‌লে, আর আনন্দধ্বনি করে ভিতরে পড়্‌ল। তারপর তৃতীয়টাও দেয়ালের মাথায় উঠ্‌ল, তার সঙ্গীরা কোথায় গিয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করে দেখ্‌লে, তার পর আনন্দে হাঃ হাঃ করে

হেসে তাদের অনুসরণ কর্‌লে। কিন্তু চতুর্থ পথিকটী দেয়ালে উঠে তার সঙ্গীদের কি হল লোককে জানাবার জন্য ফিরে এল। এই সংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে তার প্রমাণ হচ্ছে—যে সকল মহাপুরুষ মায়ার দেয়াল বেয়ে ভিতর দিকে পড়েছেন, তাঁদের পড়্‌বার আগে তাঁরা যে আনন্দে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠেন, সেই হাস্য।

*	*	*	*

আমরা যখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে আমাদিগকে পৃথক্ করে তাতে কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখনই আমরা তাকে ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর হচ্ছেন এই জগৎপ্রপঞ্চের মূল সত্য আমাদের মনের দ্বারা যেরূপভাবে দৃষ্ট হয়। আর শয়তান বল্‌তে জগতের সমুদয় মন্দ ও দুঃখরাশিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যে ভাবে দেখে তাই বুঝায়।

২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার। (পাতঞ্জল যোগসূত্র।)

কার্য্য তিন প্রকারের হতে পারে—কৃত (যা তুমি নিজে করছ), কারিত (যা অপরের দ্বারা করাচ্ছ), আর অনুমোদিত (অপরে কচ্ছে, তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি নেই)। আমাদের উপর এই তিন প্রকার কার্য্যের ফল প্রায় একরূপ।

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবর্জ্জিত হতে হবে। দেহটার যত্ন ভুলে যাও। যতটা পার দেহজ্ঞান ছেড়ে দাও।

যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও সুখে অনেকক্ষণ বসে থাকৃতে পারা যায়, তাকেই আসন বলে। সর্ব্বদা অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে অনন্তভাবে ভাবিত কর্‌তে পার্‌লে এটী হতে পারে।

একটা বিষয়ে সদা সর্ব্বদা চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান। স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ছুড়ে ফেলা যায়, তাহলে জলে অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়—বৃত্তগুলি সব পৃথক্ পৃথক্ অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য কর্‌ছে। আমাদের মনের ভিতরও এইরূপ বৃত্তিপ্রবাহ চলেছে; তবে আমাদের ভিতর সেটা অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভিতর ঐরূপ কার্য্য তাঁদের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। আমরা যেন মাকড়সার মত নিজের

জালের মধ্যে রয়েছি, যোগ-অভ্যাসের দ্বারা আমরা মাকড়সার মত জালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে পারি। অযোগীদিগকে তারা যেখানে রয়েছে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলবিশেষে আবদ্ধ থাক্‌তে হয়।

*　　　*　　　*　　　*

অপরকে হিংসা কর্‌লে তাতে বন্ধন আনে ও আমাদের সম্মুখ থেকে সত্যকে ঢেকে ফেলে। শুধু নিষেধাত্মক ধর্ম্মসাধনাই যথেষ্ট নয়। আমাদিগকে মায়াকে জয় কর্‌তে হবে, তাহলেই মায়া আমাদের পেছনে ছুটবে। যখন কোন বস্তু আমাদিগকে আর বাঁধ্‌তে না পারে, তখনই সেই বস্তু পাবার আমাদের যথার্থ অধিকার হয়। যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যায়, তখন সবই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়। যাদের কোন বস্তুর অভাব নেই, তারাই প্রকৃতিকে জয় করে থাকে।

এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যাঁর নিজের বন্ধন ছুটে গেছে, কালে তিনিই কৃপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের শরণাগতি ইহা অপেক্ষা উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন। প্রকৃতপক্ষে ইহা কার্য্যে পরিণত কর্‌তে পারে, এরূপ লোক এক শতাব্দীর ভিতর জোর একজন দেখা যায়। কিছু অনুভব করো না, কিছু জেনো না, কিছু করো না, কিছু নিজের বলে রেখো না—সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ কর, আর সর্ব্বান্তঃকরণে বল, প্রভো! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হক। আমরা বদ্ধ—এ ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র। জাগো—বন্ধনটা সব চলে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়ামরু অতিক্রম কর্‌বার এই একমাত্র উপায়।

"শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ ;
নিজ হস্তে রজ্জু যাহে আকর্ষণ।
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসী
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

আমরা যে অপরের উপর দয়া প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছি, এ আমাদের একটা বিশেষ সৌভাগ্য—কারণ, ঐরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমাদের আত্মোন্নতি হবে। লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তার কারণ, তার উপকার করে আমাদের কল্যাণ

হবে। অতএব দাতা দান কর্‌বার সময় গ্রহীতার সাম্‌নে হাঁটুগেড়ে বসুন এবং নিজেকে ধন্য জ্ঞান করুন, গ্রহীতা সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে দানে অনুমতি করুন। সব প্রাণীর পশ্চাতে সেই প্রভুকে দর্শন করে তাঁকেই দান করুন। যখন আমরা আর মন্দ কিছু দেখ্‌তে পাব না, তখন আমাদের পক্ষে জগৎ-প্রপঞ্চই আর থাক্‌বে না, কারণ, প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদিগকে এই ভ্রম হতে মুক্ত করা। অসম্পূর্ণতা বলে কিছু আছে এইটে ভাবাই উহাকে সৃষ্টি করা। আমরা পূর্ণস্বরূপ ও ওজঃস্বরূপ এই চিন্তাতেই কেবল উহা দূর হতে পারে। যতই ভাল কাজ কর না কেন, কিছু না কিছু মন্দ তাতে লেগে থাক্‌বেই থাক্‌বে। তবে সমুদয় কার্য্য নিজের ব্যক্তিগত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে করে যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তাহলে ভাল মন্দ কিছুই তোমায় অভিভূত কর্‌তে পার্‌বে না।

কাজ করাটা ধর্ম্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ কর্‌লে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে করুণার চক্ষে দেখা অজ্ঞানমাত্র, কারণ, আমরা দুঃখিত হব কার জন্য? তুমি ঈশ্বরকে করুণার চক্ষে দেখ্‌তে পার নাকি? আর, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু আছে নাকি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তোমার আত্মোন্নতির জন্য এই জগৎরূপ নৈতিক ব্যায়ামশালা প্রদান করেছেন, কিন্তু কখনও ভেবো না, তুমি এই জগৎকে সাহায্য কর্‌তে পার। তোমায় যদি কেউ গাল দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কারণ, গালাগাল বা অভিশাপ জিনিসটা কি তা দেখ্‌বার জন্য সে যেন তোমার সম্মুখে আরসি ধর্‌ছে, আর তোমাকে আত্মসংযম অভ্যাস কর্‌বার অবসর দিচ্ছে। সুতরাং তাকে আশীর্ব্বাদ কর ও সুখী হও। অভ্যাস কর্‌বার অবকাশ না হলে শক্তির বিকাশ হতে পারে না, আর আর্‌সি সাম্‌নে না ধর্‌লে আমরা নিজের মুখ নিজে দেখ্‌তে পাই না।

অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দোষাবহ। কামেচ্ছাকে দমন কর্‌লে তাথেকে উচ্চতম ফললাভ হয়। কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর, কিন্তু নিজেকে পুরুষত্বহীন করো না, কারণ, তাতে কেবল শক্তির অপচয় হবে মাত্র। এই শক্তিটা যত প্রবল থাক্‌বে, উহার দ্বারা তত অধিক কাজ হতে পারে। প্রবল জলের স্রোত পেলেই তার সহায়তায় খনির কাজ করা যেতে পারে।

আজকাল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের জানতে হবে একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমরা তাঁকে অনুভব করতে—দেখতে পারি। চিকাগোর একজন অধ্যাপক বলেন, "এই জগতের তত্ত্বাবধান কর, ঈশ্বর পরলোকের খবর নেবেন।" কি আহাম্মকি কথা! যদি আমরা এই জগতের সব বন্দোবস্ত করতে সমর্থ হই, তবে পরলোকের ভার নেবার জন্য আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি দরকার?

২৬শে জুলাই, শুক্রবার। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

সব বস্তুকে ভালবাস, কেবল আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার জন্য। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, "আত্মার দ্বারাই আমরা সব জিনিস জানতে পাচ্ছি।" আত্মা কখন জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না—যে নিজে জ্ঞাতা সে কি করে জ্ঞেয় হবে? যিনি আপনাকে আত্মা বলে জানতে পারেন, তাঁর পক্ষে আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জানতে পারেন, তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপ, আবার ইহার স্রষ্টাও বটে।

* * * * *

পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করলে এবং তাদের নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়, আর উহা বাস্তবিক দুর্ব্বলতা। সত্যের সঙ্গে যেন কখন কিছুর আপোষ না করা হয়। সত্যের উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের যুক্তি দিতে চেষ্টা করো না, অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তির উপযোগী করবার জন্য নাবিয়ে এনো না।

২৭শে জুলাই, শনিবার। (কঠোপনিষৎ)

অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে যেও না। অপরের কাছে উহা কেবল কথার কথা মাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতি হলে মানুষ ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভূতভবিষ্যৎ, সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের পারে চলে যায়। নিষ্কাম ব্যক্তি সেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তাঁর আত্মার শাশ্বতী শান্তি এসে থাকে। মুখে বলা, বিচার, শাস্ত্রপাঠ ও বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচালনা করা, এমন কি, বেদ পর্য্যন্ত—এ সকল কিছুই মানুষকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না।

আমাদের ভিতর জীবাত্মা পরমাত্মা দুই আছেন। জ্ঞানীরা জীবাত্মাকে ছায়াস্বরূপ, আর পরমাত্মাকে যথার্থ সূর্য্যস্বরূপ বলে জানেন।

আমরা যদি মনটাকে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তাহলে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারি না। মন এই বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরে যেতে দিও না—তাহলে দেহ এবং বহির্জ্জগৎ এই উভয়েরই হাত এড়াবে।

এই যে অজ্ঞাত বস্তুটাকে আমরা বহির্জ্জগৎ বলে দেখ্‌ছি, মৃত্যুর পর নিজ নিজ মনের অবস্থানুসারে ইহাকেই কেহ স্বর্গ, কেহ বা নরক বলে দেখে। ইহলোক পরলোক—এ দুটোই স্বপ্নমাত্র, শেষোক্তটা আবার প্রথমটার ছাঁচে গঠিত। ঐ দুই প্রকার স্বপ্ন থেকেই মুক্ত হও, জান—সবই সর্ব্বব্যাপী, সবই বর্ত্তমান। প্রকৃতি, দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না; আমরা যাইও না, আসিও না। এই যে স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা রয়েছে—এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর। সুতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে।' কিন্তু আত্মা—যাকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দরূপে দর্শন করছি—তার কখন জন্ম হয়নি; সে কখন মর্‌বেও না। উহা অনন্ত ও অপরিণামী সত্তা।

আমরা মনঃশক্তিকে পাঁচটা ইন্দ্রিয়শক্তিতেই ভাগ করি, অথবা একটা শক্তিরূপেই দেখি, মনঃশক্তি একরকমই থাকে। একজন অন্ধ বলে, 'প্রত্যেক জিনিসের এক এক বিভিন্ন প্রকার প্রতিধ্বনি আছে, সুতরাং আমি হাততালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের প্রতিধ্বনি দ্বারা আমার চতুর্দ্দিকে কোথায় কি আছে ঠিক ঠিক বল্‌তে পারি।' সুতরাং একজন অন্ধ একজন চক্ষুষ্মান্ লোককে ঘন কুয়াসার ভিতর দিয়ে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কারণ, তার কাছে কুয়াসা বা অন্ধকারে কিছু তফাৎ হয় না।

মনকে সংযম কর, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধ কর, তবেই তুমি যোগী; তার পর বাকি যা কিছু সবই হবে। শুনতে, দেখ্‌তে, ঘ্রাণ বা স্বাদ নিতে অস্বীকার কর; বহিরিন্দ্রিয়গুলি থেকে মনঃশক্তিকে সরিয়ে নাও। তুমি ত অজ্ঞাতসারে ইহা সদা সর্ব্বদাই কর্‌ছ—যেমন, যখন তোমার মন কোন বিষয়ে মগ্ন হয়ে থাকে; সুতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও ইহা কর্‌বার অভ্যাস কর্‌তে পার। মন যেখানে ইচ্ছা ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রয়োগ কর্‌তে পারে। আমাদিগকে দেহের দ্বারা দিয়েই

কাজ কর্‌তে হবে, এই মূল কুসংস্কারটী একেবারে ছেড়ে দাও। প্রকৃতপক্ষে ত তা নয়। নিজের ঘরে গিয়ে বস, আর নিজের অন্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্ত খনিস্বরূপ, ভূতভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না সেই ভিতরের অন্তর্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব বৃথা। বাহিরের শিক্ষা দ্বারা যদি হৃদয়রূপ গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই উহার কিছু মূল্য আছে বলা যেতে পারে।

আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই 'ক্ষুদ্র ধীর বাণী,' সেই যথার্থ নিয়ন্তা—যে আমাদিগকে সদা বিধিনিষেধ দিচ্ছে—বলুছে এই কাজ কর, এই কাজ করো না। ইহাই আমাদিগকে যত বন্ধনের মধ্যে এনেছে। অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর উহাই জ্ঞানপূর্ব্বক পরিচালিত হলে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। সহস্র সহস্র উপায়ে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা যেতে পারে, প্রত্যেক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ; তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের দ্বারা উহা খুব শীঘ্র সাধিত হতে পারে। ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। মুক্তিলাভ কর্‌বার জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি আছে, সব প্রয়োগ কর—কর্ম্ম, বিচার, উপাসনা, ধ্যান সমুদয় অবলম্বন কর, যত পাল একসঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পুরাদমে চালাও, আর গন্তব্যস্থানে উপনীত হও। যত শীঘ্র পার ততই ভাল।

* * * *

খ্রীষ্টিয়ানদের বাপ্‌তিজ্‌ম্ (Baptism) সংস্কার একটা বাহ্যশুদ্ধিস্বরূপ—উহা অন্তঃশুদ্ধির প্রতীক বা সূচকস্বরূপ। বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে উহার উৎপত্তি।

খ্রীষ্টিয়ানদের ইউক্যারিষ্ট * নামক অনুষ্ঠান অসভ্য জাতিসমূহের একটী অতি প্রাচীন প্রথার অবশেষ বা চিহ্নমাত্র। ঐ সব অসভ্য জাতি কখনও

* Eucharist or the Lord's Supper :—বাইবেলের নিউটেষ্টামেন্টে লিখিত আছে, যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া রুটি ও মদ্য ঈশ্বরোদ্দেশে নিবেদন করিয়া বলেন, এই রুটি আমার মাংস এবং এই মদ্য আমার রক্ত। তৎপরে শিষ্যগণকে উহা খাইতে বলেন। খ্রীষ্টানগণ এখনও ঐ দিনের সাম্বৎসরিক পালন করিয়া থাকেন ও উহাকে পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত করেন।

কখনও তাদের বড় বড় নেতাদের মহত্ত্ববিধায়ক গুণগুলি পাবার আশায় তাঁদের মেরে ফেল্‌ত এবং তাঁদের মাংস খেত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে সকল শক্তিতে তাদের নেতা বীর্য্যবান্‌, সাহসী ও জ্ঞানী হয়েছিলেন, এই উপায়ে সেই শক্তিগুলি তাদের ভিতর আস্‌বে, আর কেবল এক ব্যক্তি ঐরূপ বীর্য্যবান্‌ ও জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জাতিটাই তদ্রূপ হবে। নরবলি প্রথা য়াহুদীজাতির ভিতরও ছিল, আর তাঁদের ঈশ্বর জিহোবা ঐ প্রথার জন্য তাদের অনেক শাস্তি দিলেও উহা তাদের ভিতর থেকে একেবারে লোপ হয়নি। যীশু নিজে শান্তপ্রকৃতি ও প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকে য়াহুদীজাতির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রচার কর্‌বার চেষ্টার ফলে খ্রীষ্টয়ানদের মধ্যে এই মতবাদের উৎপত্তি হল যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি হয়ে নিজেকে বলি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট কর্‌লেন। য়াহুদীদের মধ্যে পূর্ব্বে এক প্রথা ছিল—তাঁদের পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ করে একটা ছাগলের উপর মানুষদের পাপ চাপিয়ে দিয়ে তাকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিতেন—এখানে ছাগলের বদলে মানুষ, এই তফাৎ। এই নিষ্ঠুর ভাব প্রবেশ করার দরুণ খ্রীষ্টধর্ম্ম খ্রীষ্টের যথার্থ শিক্ষা থেকে অনেক দূর তফাৎ হয়ে পড়্‌ল এবং উহার ভিতর পরের উপর অত্যাচার কর্‌বার ও অপরের রক্তপাত কর্‌বার ভাব এল।

* * * *

কোন কাজ কর্‌বার সময় বলো না যে, 'এটা আমার কর্ত্তব্য', বরং বল 'এটা আমার স্বভাব।'

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌।"—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয় না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তাহলেই তুমি ভগবান্‌কে লাভ করেছ।

* * * *

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণ জাতি আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা আপনাদিগকে ভূদেব বলে দাবি করেন। তাঁরা খুব দরিদ্রভাবে থাকেন, তবে তাঁদের দোষ এই যে, তাঁরা আধিপত্য বা প্রভুত্ব খোঁজেন। যাই হক, ভারতে প্রায় ৬ কোটি ব্রাহ্মণের বাস; তাদের কোন প্রকার বিষয় আশয় নেই, অথচ তারা বেশ

ভাল লোক, নীতিপরায়ণ। আর এইরূপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁরা শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছেন যে, তাঁরা বিধিনিষেধের অতীত, তাঁদের কোন প্রকার শাস্তির বিধান নাই। তাঁরা আপনাদিগকে দ্বিজ বা ঈশ্বরতনয় জ্ঞান করে থাকেন।

২৮শে জুলাই, রবিবার। (দত্তাত্রেয় কৃত অবধূত গীতা।)

"মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর কর্‌ছে।"

"যিনি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চে পূর্ণভাবে বিরাজ কর্‌ছেন, যিনি আত্মার মধ্যে আত্মস্বরূপ, তাঁকে আমি নমস্কার করি কিরূপে?"

আত্মাকে আমার নিজের স্বভাব, নিজের স্বরূপ বলে জানাই পূর্ণ জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভূতি। "আমিই তিনি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।"

"কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কার্য্যই আমার বন্ধন উৎপাদন কর্‌তে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়াতীত, আমি চিদানন্দস্বরূপ।"

অস্তি নাস্তি কিছুই নাই, সবই আত্মস্বরূপ। সমুদয় আপেক্ষিক ভাব, সমুদয় দ্বন্দ্ব দূর করে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল, জাতি, কুল, দেবতা, আর যা কিছু, সব চলে যাক্। থাকা, হওয়া—এ সবের কথা কেন কও? দ্বৈত অদ্বৈত এ সমুদয় কথা ছেড়ে দাও। তুমি দুই ছিলে কবে যে, দ্বৈত ও অদ্বৈতের কথা বল্‌ছ? এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ব্রহ্মমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। যোগের দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ হবে, এ কথা বলো না—তুমি স্বয়ংই যে শুদ্ধস্বভাব। তোমায় কেউ শিক্ষা দিতে পারে না।

যিনি এই গীতা লিখেছেন, তাঁর মত লোকই ধর্ম্মটাকে জীবন্ত রেখেছেন তাঁরা বাস্তবিকই সেই ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন। তাঁরা কোন কিছুর তোয়াক্কা রাখেন না, শরীরের সুখদুঃখ গ্রাহ্য করেন না, শীত উষ্ণ বা বিপদাপদ্ বা অন্য কিছু মোটেই গ্রাহ্য করেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার তাঁদের দেহকে দগ্ধ কর্‌তে থাকলেও তাঁরা স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, তাঁদের গা যে পুড়্‌ছে তা তাঁরা টেরই পান না।

"জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন দূর হয়ে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।"

"যখন বন্ধন ও মুক্তিরূপ ভ্রম চলে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।"

"মনঃসংযম করে থাক, তাতেই বা কি, না করে থাক, তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকে, তাতেই বা কি, না থাকে, তাতেই বা কি? তুমি নিত্যশুদ্ধ আত্মা। বল, আমি আত্মা, কোন বন্ধন কখনও আমার কাছে ঘেঁস্‌তে পারেনি। আমি অপরিণামী নির্ম্মল আকাশস্বরূপ, নানাবিধ বিশ্বাস বা ধারণারূপ মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাকে তারা স্পর্শই কর্‌তে পারে না।"

"ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ করে ফেল। মুক্তি ছেলেমানুষী কথামাত্র। আমিই সেই অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ, আমি সেই শুদ্ধিস্বরূপ।"

"কেউ কখন বদ্ধ হয়নি, কেউ কখন মুক্তও হয়নি। আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি অনন্তস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাব। আমাকে আর শেখাতে এসো না—আমি চিদ্‌ঘনস্বভাব, কিসে আমার এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধন কর্‌তে পারে? গুরুই বা কে? শিষ্যই বা কে?"

তর্কযুক্তি জ্ঞানবিচার ছুড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও।

"বদ্ধস্বভাব লোকই অপরকে বদ্ধ দেখে, ভ্রান্ত ব্যক্তিই অপরকে ভ্রান্ত দেখে, অশুদ্ধস্বভাব লোকেই অপরে অশুদ্ধভাব দেখে থাকে।"

দেশকালনিমিত্ত এ সবই ভ্রম। তুমি যে মনে কর্‌চ তুমি বদ্ধ আছ, মুক্ত হবে, এটা তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী। কথা বন্ধ কর, চুপ করে বসে থাক—সব জিনিস তোমার সাম্‌নে থেকে উড়ে যাক্—ওগুলি স্বপ্নমাত্র। পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন কিছু নেই, ওসব কুসংস্কার মাত্র। অতএব মৌনভাব অবলম্বন কর, আর নিজের স্বরূপ অবগত হও।"

"আমি আনন্দঘন স্বরূপ।" কোন আদর্শের অনুসরণ কর্‌বার দরকার নেই—তুমি ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেয়ো না। তুমি সার সত্তাস্বরূপ। শান্তিতে থাক—নিজেকে চঞ্চল করো না। তুমি কখনও বদ্ধ হওনি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে কখন স্পর্শ করেনি। এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাক। কাকে উপাসনা কর্‌বে? কেই বা উপাসনা করে? সবই ত আত্মা। কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার। পুনঃ পুনঃ বল 'আমি আত্মা', 'আমি আত্মা'। আর সব উড়ে যাক্।

স্ত্রীশিক্ষা ও নিবেদিতা।*

"প্রত্যেক মনুষ্যের মনে একটি আদর্শ থাকে, যাহা তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রকাশ পায়। এই আদর্শ কাহারও মনে স্পষ্টভাবে এবং কাহারও মনে অস্পষ্টভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। সেজন্য দেখা যায়, অনেকে নিজের আদর্শ ভালরূপে উপলব্ধি না করিয়াও কার্য্য করিয়া যায়। আবার ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টীভূত মানবমনের ন্যায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শক্তিসঙ্ঘের সমষ্টীভূত মানবমনের ভিতরেও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শসকল প্রতিষ্ঠিত থাকে। ঐজন্যই প্রত্যেক সমাজ, জাতি ও ব্যক্তিসঙ্ঘের ভিতর এক একটি আদর্শ বিদ্যমান থাকে এবং উহাই তাহাদিগের কার্য্যাবলীর নিয়ামক হয়। আদর্শ-সকলের স্থূলজগতে ঐরূপ প্রভাব বিস্তারই প্রাকৃতিক নিয়ম; কারণ, কার্য্যময় জগৎ ভাবময় জগতের প্রতিবিম্বস্বরূপ। ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কর্ম্মবীরগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবপ্রচারকগণেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপে কর্ম্ম ভাবের অধীন বলিয়াই জগতে লোকশিক্ষার এত প্রয়োজনীয়তা।"

স্বর্গীয়া নিবেদিতা ভারতবর্ষে ঐরূপ একটি আদর্শ ভাবতরঙ্গ লইয়া উপস্থিত হয়েন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বিনী বক্তৃতাই তাঁহার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। স্বামিজী পাশ্চাত্যে বক্তৃতাকালে কোন সময়ে বলিয়াছিলেন—

"What the world wants to-day, is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder, and say that they possess nothing but God Who will go? * * * Why should one fear? If this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter?"

অর্থাৎ—যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে পথে দাঁড়াইয়া সাহস করিয়া বলিতে পারিবে, ঈশ্বর ভিন্ন আর আমাদের কিছুই সম্বল নাই, এইরূপ

---

* ৮ই নভেম্বরের বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

রমণী ও পুরুষেরই পৃথিবীতে আজকাল প্রয়োজন হইয়াছে ; অধিক নহে, বিশ জনমাত্র হইলেই হইবে। তোমাদিগের মধ্যে কে কে ঐরূপ করিতে প্রস্তুত আছ ? * * * ঐরূপ করিতে ভয়ই বা কেন ? ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহাকে পাওয়া যায়—একথা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহাকে পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগে কি আসে যায় ? আর ঐকথা যদি সত্য না হয় (ঈশ্বর যদি না থাকেন), তবে আমাদিগের এইরূপে জীবন ধারণেই বা কি আসে যায় ?

উপসংহারে স্বামিজী ঐকালে বলিয়াছিলেন,—

"The world is in need of those whose life is one burning love—selfless. That love will make every word tell like a thunderbolt. Awake, awake, great souls! The world is burning in misery, can you sleep?"

অর্থাৎ—যাহাদিগের জীবন স্বার্থমাত্রশূন্য, জ্বলন্ত প্রেমস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হইবে, এইরূপ ব্যক্তিগণেরই জগতে প্রয়োজন। ঐরূপ ভালবাসা তোমাদের প্রত্যেক কথাটিকে বজ্রতুল্য অমোঘ করিবে। জাগো, জাগো মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, ইহা দেখিয়াও তোমরা কি নিদ্রিত থাকিবে ?

ঐরূপ বক্তৃতার ফলেই স্বর্গীয়া নিবেদিতা তাঁহার জাতি ধন মান প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। উহার প্রেরণাতেই তিনি ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরপূর্ব্বক পৃথিবীর দুঃখকষ্টের বোঝা বিন্দুমাত্রও লাঘব করিয়া নিজ জীবন স্বার্থক করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের দুরবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিদেশিনী রমণীর আমাদিগের অবস্থা বুঝা অসম্ভব ; কিন্তু আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা নিজের দোষ গুণ এবং প্রকৃত অবস্থা নিজে অনেক সময় অনুভব করিতে পারি না। ইংরাজিতে একটি চলিত কথা আছে যে, যে খেলায় মত্ত থাকে সে খেলার প্রকৃত চাল অনেক সময় বুঝিতে পারে না, কিন্তু খেলার পরিদর্শক অনেক সময়ে খেলার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে। সেইরূপ এক জন বিদেশী লোক যাঁহার আমাদের উপর আন্তরিক স্নেহ এবং সহানুভূতি আছে, তিনি আমাদিগের উন্নতির পথ যতটা দেখিতে ও বুঝিতে

পারেন আমরা নিজে ততটা দেখিতে ও বুঝিতে পারি না; এবং একথা ধ্রুব সত্য যে, যে জাতি কিম্বা ব্যক্তি ঐরূপ প্রকৃত বন্ধুর সাহায্যে নিজ অভাব ও ত্রুটি অনুভব করিতে পারে তাহার উন্নতির পথে বাধা থাকে না। শ্রদ্ধাস্পদা নিবেদিতা ভারতের ঐরূপ প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং আমাদিগের প্রতি তাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা তাঁহার ভারতের জাতীয় জীবন পর্য্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ শক্তিকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার Web of Indian Life নামক পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি কীদৃশ সূক্ষ্মভাবে এদেশের আচারব্যবহার ও সামাজিক নিয়মপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদিগকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠক শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত "নিবেদিতা" নামক পুস্তিকায় এতদ্বিষয়ক কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। এতৎসম্বন্ধে নিবেদিতার ধারণা এই:—

"ভারতবর্ষের দুঃখ কষ্টের কারণ তাহার দারিদ্র্যদোষ নহে। উহা কোনও রাজনৈতিক কারণ ঘটিত ব্যাপারও নহে। কিম্বা কোনও সামাজিক কুপ্রথা প্রচলন বা সমাজ সংস্কারের অভাব বশতঃও নহে। ইহার কারণ এই যে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, রাজনীতি, এবং সমাজের পশ্চাতে আর একটি বাস্তব পদার্থ বিদ্যমান আছে যাহাকে ভারতের জাতীয়ত্ব বলা যাইতে পারে।"

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে একটি ভাবময় আদর্শ প্রাণস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষকে পরিচালন করিতেছে। ভারতবর্ষের উন্নতি ও অবনতি এই জাতীয় প্রাণশক্তির উন্নতি ও অবনতির উপর নির্ভর করিতেছে। মনস্বিনী নিবেদিতা দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের এই প্রাণশক্তির উন্মেষণ করিবার জন্য দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমতঃ মাতৃভূমির উপর প্রগাঢ় প্রেম।

"But before such a result could come about, we must suppose the children of every province and every sect on fire with the love of the Motherland. Sikh, Mahratta and Mussulman, we must imagine each possessed by the thought of *India*, not of his own group, &c."

অর্থাৎ—জাতীয় জীবনের আদর্শ ভারতে পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিবার

জন্য চাই সকল প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের মাতৃভূমির প্রতি অনন্ত প্রেম। হিন্দু, শিখ, ক্রিশ্চিয়ান্ এবং মুসলমান প্রভৃতি সকলেরই এক অখণ্ড ভারতের ভাবনায় ভাবিত হওয়া চাই, তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র সমাজটীর কথা ভাবিলে চলিবে না। যিনি সর্ব্বকাল সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, সকল ধর্ম্মকেই নির্বিশেষে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই সর্ব্বধাত্রী মাতৃভূমিকে, আপন আপন সম্প্রদায়কে আমরা যেরূপ ভালবাসি, তাহা অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতে হইবে।"

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক্ষণে আর একটি জিনিসের অধিকতর প্রয়োজন। সেটি শিক্ষার বিস্তার। স্বর্গীয়া নিবেদিতা বলিয়াছেন,—

"And secondly we must have education. This education does not mean the knowledge gathered from outside but the unfoldment of the knowledge already within us."

অর্থাৎ,—দ্বিতীয়তঃ, চাই শিক্ষা। এই শিক্ষার অর্থ—বাহিরের জ্ঞান আহরণ করা নহে, আপনার ভিতরে পূর্ব্ব হইতেই যে জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে, তাহাকেই সম্যক্ বিকসিত করিয়া তুলা।

বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় ছাত্র এবং যুবকদিগের পক্ষে কিরূপ শিক্ষা উপযোগী, তাহা একটি জটিল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ,—যাঁহারা এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাও শিক্ষাপ্রণালী এবং তদন্তর্গত পাঠ্যপুস্তকাদির মধ্যে মধ্যে যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই বিষয় মীমাংসার জন্য এখনও অনেক পরীক্ষা ও বিবেচনা আবশ্যক। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার কতিপয় বাঙ্গালা প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, তাহার ফলে তাঁহার মেধাবী এবং প্রতিভাশালী ছাত্রদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রাণপাত করিতে হইয়াছে এবং অনেকেই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছেন। বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানাদি শিখিবার জন্য তাঁহাদের শক্তির এরূপ বৃথা অপব্যয় হয় যে, যথার্থ বিষয়টি শিখিবার

এবং জীবনে নিয়োগ করিবার সময় তাঁহাদিগের আর সামর্থ্য থাকে না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় লোক—যাঁহারা শিক্ষাদানকেই জীবনের ব্রত করিয়াছেন, তাঁহারাই যখন এরূপ কথা বলেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ হইতে আমরা এখনও অনেক দূরে রহিয়াছি।

ডাক্তার রায় মহাশয় যেমন বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে বুদ্ধিবিকাশের দিক্ হইতে দেখিয়া উহার দোষ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দও তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনবিকাশের দিক্ হইতে এই শিক্ষার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মান্দ্রাজে প্রদত্ত "ভারতের ভবিষ্যৎ" নামক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"আজকাল যে শিক্ষা আপনারা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার কতকগুলি সদ্‌গুণ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার একটা প্রচণ্ড দোষ আছে—সে দোষ এমনই বিষম যে, আর সমস্ত গুণ তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ পরাভূত। প্রথমেই দেখুন, আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতেই কেবল জানে। এইরূপ অনবস্থামূলক বা অস্থিরতা-বিধায়ক শিক্ষা,—কিম্বা যে শিক্ষা কেবল 'নেতি' ভাবই প্রবর্ত্তিত করায়, সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। * * * মস্তিষ্কের মধ্যে নানা বিষয়ের বহু বহু তথ্য বোঝাই করিয়া, সেগুলিকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারা জীবন হট্টগোল বাধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষালাভ করা বলে না। সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমনভাবে সুপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠিত করিতে পারে। পাঁচটী সদ্‌ভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে যিনি কেবল একটা পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী। * * * অতএব আমাদের লক্ষ্য এই যে, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে ও যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।"

আবার রামনদে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামিজী ঐ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"ভারতে আমাদের উন্নতিপথে দুইটী প্রবল বিঘ্ন বিদ্যমান, একটী জীর্ণ হিন্দুয়ানির গোঁড়ামী ও অপরটী আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা। * * যিনি সঙ্কীর্ণ, প্রাচীন হিন্দুয়ানির ভক্ত, তিনি কতকটা অজ্ঞানান্ধ হইতে পারেন, তাঁহার মতামত অপরিপক্ক হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার একটা মনুষ্যত্ব, একটা প্রতিষ্ঠাভূমি, একটা বলবত্তা আছে—তিনি আপন পায়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান। আর যিনি পাশ্চাত্য ছাঁচে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তিনি মেরুদণ্ডবিহীন, তিনি যখন যেমন সুযোগ পাইয়াছেন, নানা বিসদৃশ ভাব ও আদর্শ আহরণ করিয়া আপনার মধ্যে পুঞ্জীকৃত করিয়াছেন,—সেগুলি আপনার সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত বা পরিপাক করা, অথবা পরস্পর সমঞ্জসীভূত বা সমন্বিত করা হয় নাই। তিনি আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ান না এবং তাঁহার মস্তিষ্কও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া এক ভাবকক্ষ হইতে কক্ষান্তরে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইঁহার সৎসাধনার পশ্চাতে কোন্ প্রেরণাশক্তি বিদ্যমান? ইংরাজসমাজের প্রশংসাসূচক পৃষ্ঠপীড়ন। * * * এই সমগ্র প্রাচীন জাতির পরমার্থ-নিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধি প্রত্যেক হিন্দুর ভিতরে আশৈশব অন্তর্নিহিত হইয়াছে, ঐ মূলছন্দেই তাহার জীবনগাথা গ্রথিত করিতে হইবে,—উহারই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে নিজের ঐশ্বর্য্য মান যশকে, নিজের পাশ্চাত্য বিদ্যাবিজ্ঞানাদির শিক্ষাকে আনয়ন করিতে পারিলে, আদর্শ হিন্দুচরিত্রের মূল রহস্য সমাধান করা হইল।"

স্বামিজী শিক্ষাসম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় ছাত্রবর্গের শিক্ষার নিয়ামক করিবার পক্ষে অনেক বাধা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে উহার প্রযোজ্য হইবার পথে এখনও অনেক বিঘ্ন আছে। যদি Hindu Universityর মত কোন শিক্ষামহামণ্ডলী কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে উহার দ্বারা ঐরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমার যতদূর জানা আছে, বঙ্গদেশে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ই একমাত্র বিদ্যালয়, যেখানে ঐহিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মভাবও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহাদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধাস্পদা নিবেদিতা শিক্ষাসম্বন্ধে নিজের যে মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত উক্ত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।

শিক্ষাগুরুর চরিত্র শিক্ষার্থীদিগের উপর কিরূপভাবে কার্য্য করে, তদ্বিষয়ে নিবেদিতা এইরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—

"The Guru may have remained hidden and the disciple may stand in the blaze of the world. But every word, every gesture, will point the way to that secret sanctuary, whence comes his strength. * * * No disciple can win the same joy from spiritual vanity, as from the enthusiasm of *guru-bhakti.* * * * These are amongst the deepest secrets of the human heart and they form the area that India has chosen to explore. It is in this way that greatness is made. (Hints on Education.)

অর্থাৎ—গুরু হয়ত কোন নিভৃত স্থানে বাস করেন এবং শিষ্য হয়ত লোকলোচনের সম্মুখে বর্ত্তমান, কিন্তু শিষ্যের প্রতি কথা ও ভঙ্গী, যেখান হইতে তাঁহার শক্তি আসিতেছে, সেই নিভৃত স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। * * * কোন শিষ্যই, গুরুভক্তির আবেগে তিনি যেরূপ আনন্দ অনুভব করিবেন, সেরূপ আনন্দ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতি, স্মরণ করিয়া লাভ করিতে পারেন না। * * * এইগুলি মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত সত্য, আর ভারত ঐ বিষয়ক আলোচনা লইয়াই ব্যাপৃত আছে। লোকে এইরূপেই মহাপুরুষ-পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকে।

শিক্ষাগুরুর জীবনাদর্শ ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, বর্ত্তমানকালে ঋষিতুল্য ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্গদেশে যুবকদিগের মধ্যে আজকাল রসায়নশাস্ত্র-সম্বন্ধে যে বিশেষ চর্চ্চা দেখা যাইতেছে, তাহা ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা ও জীবনাদর্শসহায়েই যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, একথায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। শিক্ষাগুরুর জীবনাদর্শ যখন ছাত্রদের চরিত্রের উপর ঐরূপ বিশেষভাবে কার্য্য করে বুঝা যাইতেছে,

তখন পরমার্থবিভবান্বিতা, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতা শ্রীযুক্তা নিবেদিতা-প্রমুখ সিষ্টারদিগের জীবনাদর্শ এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার বস্থপাড়ার মহিলাবিদ্যালয় ছাত্রীদিগের জীবনে বিগত দশ বৎসরে কতদূর উচ্চ ভাবপরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দুর জাতীয়ত্ব বজায় রাখিয়া এবং ভারতের সনাতন ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ প্রেমাদর্শ ছাত্রীদিগের সম্মুখে নিরন্তর ধারণ করিয়া উহা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মতের শিক্ষাপ্রণালী ছাত্রীদিগকে প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা আমাদের কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। স্ত্রীশিক্ষাবিভাগে উহাতে এক নবীন যুগপরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদা নিবেদিতা বলিয়াছেন,—

"There is nothing so belittling to the human soul, as the acquisition of knowledge for the sake of worldly reward. There is nothing so degrading to a nation as coming to look upon the life of the mind as a means to bread-winning. Unless we strive for truth because we love it, and must at any cost attain, unless we live the life of thought out of our own rejoicing in it, the great things of heart and intellect will close their doors to us. There is a very definite limit to the distance a man can go, under the impulsion of a worldly motive."

অর্থাৎ—ঐহিক ভোগসুখকামনায় জ্ঞানলাভ চেষ্টা অপেক্ষা হীনতর কার্য্য আর কিছুই নাই। ভাবময় জীবনকে অন্নসংস্থানের উপায়মাত্র বলিয়া মনে করা অপেক্ষা জাতির পক্ষে অধিকতর অবনতির কারণ আর কিছুই নাই। সত্যানুরাগ, সর্ব্বস্ববিনিময়ে সত্যলাভেচ্ছা, এবং ভাবময় জীবন যাপন করিবার প্রবল আগ্রহ দ্বারাই যদি আমরা উক্ত জীবনের প্রতি আসক্ত না হই, তাহা হইলে হৃদয় ও মনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ঐহিক উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহার একটা অতি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে।

বলা বাহুল্য, সিষ্টার নিবেদিতা নিজ মহিলাবিদ্যালয়ে ছাত্রীগণের প্রাণে প্রাণে পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন।

"ভারতের সাধনা"র লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের সনাতন শিক্ষার গতি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গতি এক দিকে নহে। লেখক আরও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পরিণত নেশনের একটি সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বব্যাপক লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে বা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Immanent End. সেই নেশনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও রীতিনীতিতে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সাধনায় ঐ লক্ষ্যই আশু না হউক, চরমসাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। পাশ্চাত্য নেশনসমূহ একই লক্ষ্য অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। এক কথায়, তাহাদের সে লক্ষ্য—ঐহিক প্রতিপত্তি। কিন্তু ভারতের সনাতন আদর্শ—স্বধর্ম্মপালন। "স্বধর্ম্মপালনজনিত ত্যাগে চিত্তশুদ্ধিলাভ হইত, এবং লক্ষ্য-সিদ্ধির অধিকার বা সামর্থ্য জন্মিত। ত্যাগ অর্থে হেয়াংশের বর্জ্জন ও উত্তমাংশের গ্রহণ; স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা প্রতিপদে অধম আমিত্বের বর্জ্জন ও উত্তম আমিত্বের গ্রহণ নিষ্পন্ন হইত, এবং ক্রমশঃ মহৎ হইতে মহত্তর আমিত্বের আরোপ মানুষকে ব্রহ্মভাবে পৌঁছাইয়া দিত। পাশ্চাত্যের অধিকার-সামঞ্জস্যের মধ্যেও একভাবে আমিত্বের প্রচার হয় বটে, কিন্তু সে আমিত্বে ভোগবীজ বা বাসনা নিহিত থাকায় সোপান-পরম্পরায় আমিত্ব বৃহৎ বা মহাশক্তিসম্পন্ন হয় কিন্তু মহৎ বা মহাসত্ত্বসম্পন্ন হয় না। * * * উহা মায়াপ্রবাহে বৃহৎ বুদ্‌বুদের মত একদিন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া যায়।"

ছাত্রদিগের জীবনে ভারতের সনাতন আদর্শ অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অনেক বিঘ্ন বর্ত্তমান থাকিলেও, ছাত্রীমহিলাদিগকে ঐ আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন নাই এবং সিষ্টার নিবেদিতা প্রধানতঃ ঐরূপ-ভাবেই বসুপাড়াস্থ নিজ বিদ্যালয়ে ছাত্রীগণকে শিক্ষাপ্রদানের প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মৃতপ্রায় ভারতবর্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিবার উহাই একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষাপ্রণালী যদি মহিলামণ্ডলীমধ্যে যথার্থভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে

উহা পুনরায় সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়া আবার ভারতবর্ষের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ-সঞ্চার আনয়ন করিবে।

নিবেদিতা বলিয়াছেন,—

"Throughout the world women are the custodians of righteousness. * * * Besides this, the woman in every act of her life and in her life as a whole offers an illustration, as it were, of the high ideal she stands for."

অর্থাৎ—জগতের সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মের সংরক্ষক। এতদ্ভিন্ন, নারীর প্রতি কার্য্য এবং সমগ্র জীবন, তিনি যে উচ্চাদর্শ জগতে প্রচার করেন, তাহারই উদাহরণস্বরূপ।

জর্জ্জ হার্ব্বার্ট বলিয়াছেন,—"One good mother is worth a hundred schoolmasters." অর্থাৎ—একজন শিক্ষিতা জননী একশত স্কুলমাষ্টারের সমান।

পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য্য হইয়াছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের অধিকাংশই কোনও উন্নতমনা রমণীর স্বার্থশূন্য ভালবাসা ও শুভপ্রেরণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীতে যাঁহারা কোন মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, দেখা যায়, তাঁহাদিগের অধিকাংশই নিজ চরিত্রবল এবং উচ্চাদর্শে জীবন পরিচালনের সঙ্কল্প তাঁহাদিগের মাতৃদেবীর নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সহৃদয়তা এবং পরদুঃখকাতরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীর নিকটেই ঐসকল দিব্যগুণ লাভ করিয়াছিলেন। মহোচ্চ আদর্শে পুত্রের জীবনগঠন সম্বন্ধে ঐরূপ আরও কত দিব্যগুণসম্পন্না রমণীর কথা ইতিহাস ঘোষণা করিয়া থাকে। সেইজন্য বলি, যদি আমরা মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার সনাতন জাতীয়প্রণালী আমাদের দেশে পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা হইতে অনেক মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইবে। সেজন্যই আমার মনে হয়, সিষ্টার নিবেদিতার আদর্শপ্রণালী অবলম্বনে সুদীর্ঘকাল-পরিচালিত বসুপাড়ার মহিলাবিদ্যালয়কে সাহায্য করিলে, বন্দে মাতরং সম্প্রদায়ের সাহায্য অপাত্রে অর্পিত হইবে না।

শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশরূপিণী বঙ্গের মহিলাগণ যাহাতে তাঁহাদিগের যথার্থ মাতৃস্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের জাতি কুল ও দেশ পবিত্র করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা বর্ত্তমান কালে যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা আপনারা সকলেই বিদিত আছেন। বন্দে মাতরং সম্প্রদায়ের সভ্যগণ! আপনারা মাতৃরূপিণী স্বদেশভূমির উপাসনা ও বন্দনাগান দেশের মধ্যে প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছেন; এখন, শিক্ষাপ্রভাবে বঙ্গের মহিলাগণের ভিতর যাহাতে ঐ উপাসনা চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনাদিগের বংশধরগণকে ধন্য করিতে পারে, তদ্বিষয়ে অগ্রসর হউন। স্বদেশমাতার প্রধান উপাসিকা ভগিনী নিবেদিতা ঐ উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে যে মহিলাবিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রণালী স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার রক্ষাকল্পে সাহায্য করিয়া অসীম চিত্ত-প্রসাদ ও শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হউন। ভগিনী নিবেদিতা ঐ উপাসনা সম্বন্ধে এক স্থলে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, এখানে তাহাই নিবেদনপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রতি আমার এই সানুনয় অনুরোধের উপসংহার করি।—

It is essential, for the joyous revealing of that great Mother, that she be first surrounded by the mighty circle of these, her daughters, the Indian women of the days to come. It is they who must consecrate themselves before her, touching her feet with their proud heads, and vowing to her their own, their husbands' and their children's lives. Then and then only will she stand crowned before the world. Her sanctuary to-day is full of shadows. But when the womanhood of India can perform the great *arati* of nationality, that temple shall be all light, nay, the dawn verily shall be near at hand. From end to end of India, all who understand are agreed that the education of our women must needs, at this crisis, undergo some revision. Without their aid and co-

operation none of the tasks of the present can be finally accomplished.

অর্থাৎ—ভারতমাতা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশিত হইতে পারেন্, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার কন্যাস্বরূপিণী সুশিক্ষিতা, শক্তিসমৃদ্ধা নারীজাতির অবস্থান করা চাই। ভারতীয় নারীজাতিকে তাঁহার চরণে স্বীয় গর্ব্বিত মস্তক অবনত করিয়া আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিজের এবং স্বামী পুত্রের জীবন তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিতেই হইবে। শুধু এই উপায়েই ভারতজননী জগতের সমক্ষে বিজয়মুকুট ধারণ করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন। তাঁহার দেবমন্দিরে আজি অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। কিন্তু যখন ভারতীয় নারীকুল জাতীয়তারূপ মহারাত্রিক সম্পাদনে সমর্থ হইবে, তখন সেই মন্দির সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া উঠিবে, শুধু তাহাই নহে, ভারতের কালনিশার অচিরেই অবসান হইবে। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সকল বিশেষজ্ঞগণেরই অভিমত এই যে এই দুর্দ্দিনের সময় আমাদের নারীগণের শিক্ষাপ্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত আধুনিক বৃহৎ কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে কোনটিই সম্যিভাবে নিষ্পন্ন হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

[এই সংখ্যা হইতে আমরা সময়ের যথাসম্ভব পৌর্ব্বাপর্য্য রাখিয়া স্বামিজীর কয়েকখানি পত্র প্রকাশ করিব। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত দুই একখানি ব্যতীত সমস্তগুলিই কাশীর প্রসিদ্ধ জমিদার, ভক্ত ও সুপণ্ডিত ৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত। পত্রগুলিতে ঠাকুরের অদর্শনের পর, এবং আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে, স্বামিজীর ভারতের নানা স্থান ভ্রমণের কিছু কিছু মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যাইবে। তাঁহার জীবনের এক অল্প পরিজ্ঞাত অংশের সহিত জড়িত বলিয়া এই পত্রগুলির কিছু বিশেষ মূল্য আছে। দুই একখানি পত্র শুধু ঐ উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হইবে।]

বৃন্দাবন।
১২ই আগষ্ট, ১৮৮৮।

মান্যবরেষু,—

শ্রীঅযোধ্যা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে পৌঁছিয়াছি। কালাবাবুর কুঞ্জে

আছি—সহরে মন কুঞ্চিত হইয়া আছে। শুনিয়াছি রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম। তাহা সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। শীঘ্রই হরিদ্বার যাইব, বাসনা আছে। হরিদ্বারে আপনার আলাপী কেহ যদি থাকে, কৃপা করিয়া তাঁহার উপর এক পত্র দেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়। আপনার এস্থানে আসিবার কি হইল? শীঘ্র উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন। অলমধিকেনেতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

বৃন্দাবন।

২০শে আগষ্ট, ১৮৮৮।

মহাশয়েষু—

আমার এক বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা সম্প্রতি কেদার ও বদরিকাশ্রম দেখিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত গ—র সাক্ষাৎ হয়। গ—দুইবার তিব্বত ও ভুটান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অতি আনন্দে আছে। তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। শীতকালে কংখলে ছিল। আপনার প্রদত্ত করোয়া তাহার হস্তে অদ্যিও আছে। সে ফিরিয়া আসিতেছে—এই মাসেই বৃন্দাবনে আসিবে। আমি তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশায় হরিদ্বার গমন কিছুদিন স্থগিত রাখিলাম। আপনার সমীপচারী সেই শিবভক্ত ব্রাহ্মণটিকে আমার কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিবেন ও আপনি জানিবেন, অলমিতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

বরাহনগর মঠ।

১৯শে নভেম্বর, ১৮৮৮।

পূজ্যপাদ মহাশয়—

আপনার প্রেরিত পুস্তকদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনার অত্যুদার

হৃদয়ের পরিচায়ক অদ্ভুত স্নেহরসাপ্লুত লিপি পাঠ করিয়া আনন্দপূর্ণ হইয়াছি। মহাশয় আমার ন্যায় একজন ভিক্ষাজীবী উদাসীনের উপর এতাধিক স্নেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের সুকৃতিবশতঃ সন্দেহ নাই। বেদান্ত প্রেরণ দ্বারা মহাশয় কেবল আমাকে নয় পরন্তু ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমুদায় সন্ন্যাসিমণ্ডলীকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অবনতমস্তকে আপনাকে প্রণিপাত জানাইতেছেন পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদিগের মত, যাহা করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিব। অতএব, পাণিনিকৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিকভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক। লঘু অপেক্ষা আমাদের বাল্যাধীত মুগ্ধবোধ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। যাহা হউক, মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ঐ বিষয়ে আমাদের সদুপদেষ্টা, আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এবিষয়ে অষ্টাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহাই (যদি আপনার সুবিধা এবং ইচ্ছা হয়) দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন। এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি। মহাশয়কে আমার গুরুমহারাজের দুইখানি ফটোগ্রাফ্ এবং তাঁহার গ্রাম্য ভাষায় উপদেশের কিয়দংশ কোনও ব্যক্তি সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন—তাহা দুই খণ্ড প্রেরণ করিলাম। আশা করি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন। আমার শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে—ভরসা দুই তিন মাসের 'মধ্যে মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া সার্থক হইব। কিমধিকমিতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর,

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯।

নমস্ত মহাশয়,

কতকগুলি কারণবশতঃ অদ্য আমার মন অতি সঙ্কুচিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এমন সময়ে আপনার আমাকে অপার্থিব বারাণসীপুরীতে আবাহনপত্র আসিয়া উপস্থিত। ইহা আমি বিশ্বেশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সম্প্রতি আমার গুরুদেবের জন্মভূমি দর্শনার্থ গমন করিতেছি, তথায় কয়েক দিবসমাত্র অতিবাহিত করিয়া ভবৎসমীপে উপস্থিত হইব। কাশীপুরী ও কাশীনাথ দর্শনে যাহার মন বিগলিত না হয়, সে নিশ্চিত পাষাণে নির্ম্মিত। আমার শরীর এক্ষণে অনেক সুস্থ। জ্ঞানানন্দকে আমার প্রণাম। যত শীঘ্র পারি মহাশয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইব। পরে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। কিমধিকমিতি। সাক্ষাতে সমুদয় জানিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

বরাহনগর।

২৬শে জুন, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদ মহাশয়,

বহুদিন আপনাকে নানা কারণে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অধুনা গ—জীর সংবাদ পাইয়াছি। আমার কোন গুরু-ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উঁহারা দুইজনে উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন। আমাদের এখান হইতে চারিজন উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন,—গ—কে লইয়া পাঁচজন। শি— নামক আমার একজন গুরুভ্রাতার সহিত ৺কেদারনাথের পথে শ্রীনগর নামক স্থানে গ—র সাক্ষাৎ হয়। গ— এইস্থানে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি প্রথম বৎসর তিব্বত প্রদেশের অনুমতি পান নাই, পরের বৎসর পাইয়াছিলেন। লামারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তিনি

তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিব্বতে শতকরা ৯০ জন লামা কিন্তু তাহারা এক্ষণে তান্ত্রিক মতের উপাসনাই অধিক করে। অত্যন্ত শীতল দেশ—আহারীয় অন্য কিছুই নাই—কেবল শুষ্ক মাংস। গ— তাহাই খাইতে খাইতে গিয়াছিল। আমার শরীর মন্দ নাই, কিন্তু মনের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর।

দাস

বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরো জয়তি।

বাগবাজার, কলিকাতা।

৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদ মহাশয়,

কল্য আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনাকে পত্র লিখিতে গ—কে অনুরোধ করিতে যে আপনি লিখিয়াছেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কারণ, তাঁহারা আমাদের পত্র দিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ২।৩ দিবস কোথাও রহিতেছেন না, অতএব আমাদের কোনও পত্রাদি পাইতেছেন না। আমার পূর্ব্ব অবস্থার কোন আত্মীয় সিমুলতলায় (বৈদ্যনাথের নিকট) একটি বাংলা ক্রয় করিয়াছেন। ঐ স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বিধায় আমি সেস্থানে কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে অত্যন্ত উদরাময় হওয়ায় পলাইয়া আসিলাম।

৺কাশীধামে গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না, কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই কলিকাতার বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়—আর মহাশয়ের সহিত একদিবসের আলাপেই প্রাণ এবম্প্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্ম্মবন্ধু-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয়—

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি"।

(শকুন্তলা)

ভূয়োদর্শন এবং সাধনের ফলস্বরূপ মহাশয়ের যে উপদেশ তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। নানা প্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি।

কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৬।৭ বৎসরের আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামপরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।

বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতেছে, আর একটি ছোট।

ইহাদের অবস্থা পূর্ব্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্ব্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল— হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই বাটীর অংশ পাইয়াছেন—কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।

কখন কখন কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্য্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ &c.—গীতা।

আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান্ হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়—.

For "we have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us and grant us strength that we bear it into death. Amen." *

——Imitation of Christ.

আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি। আমার ঠিকানা—

বলরাম বসুর বাটী, ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ইতি দাস

বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর, কলিকাতা।

৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

প্রায় এক সপ্তাহের অধিক হইল আপনার পত্র পাইয়াছি, সেই সময় পুনরায় জ্বর হওয়ায় উত্তরদানে অসমর্থ ছিলাম, ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মাস দেড়েক ভাল ছিলাম, কিন্তু পুনরায় ১০।১২ দিন হইল জ্বর হইয়াছিল, এক্ষণে ভাল আছি। গুটি কতক প্রশ্ন আছে, মহাশয়ের বিস্তৃত সংস্কৃত জ্ঞান— উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। সত্যকাম জাবালি এবং জানশ্রুতির কোন উপাখ্যান ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সওয়ায় বেদের অন্য কোন অংশে আছে কি না ?

২। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত ভাষ্যের অধিকাংশ স্থানেই স্মৃতি উদ্ধৃত করিতে গেলেই মহাভারতের প্রমাণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু বনপর্ব্বে অজগরোপাখ্যান এবং উমা-মহেশ্বর সংবাদে, তথা ভীষ্মপর্ব্বে, যে গুণগত জাতিত্ব অতি স্পষ্টই প্রমাণিত তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন পুস্তকে কোন কথা বলিয়াছেন কি না ?

* কারণ আমরা ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি, হে পিতঃ তুমিই উহা আমাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি। ওঁ শান্তিঃ।—ঈশা অনুসরণ।

৩। পুরুষসূক্তের জাতি পুরুষানুগত নহে—বেদের কোন্ কোন্ অংশে ইহাকে ধারাবাহিক পুরুষানুগত করা হইয়াছে ?

৪। আচার্য্য শূদ্রে যে বেদ পড়িবে না এপ্রকার কোন প্রমাণ বেদ হইতে দিতে পারেন নাই। কেবল "যজ্ঞেঽনবকপ্তঃ" ইহাই উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, যখন যজ্ঞে অধিকার নাই তখন উপনিষদাদি পাঠেও অধিকার নাই। কিন্তু "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এস্থানে ঐ আচার্য্যই বলিতেছেন যে, অথ শব্দ "বেদাধ্যয়নাদনন্তরম্"—এ প্রকার অর্থ নহে, কারণ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ না পড়িলে উপনিষদ্ পড়া যায় না ইহা অপ্রামাণ্য এবং কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতি এবং জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতিতে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য ভাব নাই। অতএব যজ্ঞাত্মক বেদ না পড়িয়াই উপনিষদ্ পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে। যদি যজ্ঞে ও জ্ঞানে পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকিল, তবে শূদ্রের বেলা কেন "ন্যায়পূর্ব্বকম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আচার্য্য আপনার বাক্যকে ব্যাহত করিতেছেন। কেন শূদ্র উপনিষদ্ পড়িবে না ?

মহাশয়কে একখানি কোনও খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীর লিখিত Imitation of Christ (ঈশা অনুসরণ) নামক পুস্তক পাঠাইলাম। পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য্য। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ বৈরাগ্য ও দাস্য-ভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বোধ হয় আপনি এ পুস্তক পূর্ব্বে পড়িয়া থাকিবেন, না পড়িয়া থাকেন ত পড়িয়া আমাকে চিরকৃতার্থ করিবেন।

ইতি দাস

বিবেকানন্দ।

মল্লভূমি ও মল্লভূপগণ।*

(শ্রীঅভীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ)

মল্লভূমি বলিতে আমরা কোন্ স্থান বুঝি তাহা সর্ব্বাগ্রে বলা আবশ্যক। বাঁকুড়া গেজেটিয়ারে দেখি মল্লভূমি উত্তরদিকে সাঁওতাল পরগণান্তর্গত

* বাঁকুড়া সম্মিলনীর সাংবৎসরিক অধিবেশনে পঠিত

ডামিনিকো (Daminico) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে মেদিনীপুরের কতকাংশ, পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কতকাংশ এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অংশবিশেষ মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাকুড়া গেজেটিয়ার-সম্পাদক এই সীমানির্দ্দেশের প্রমাণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তবে এই সীমানির্দ্দেশ যে বিশেষ প্রমাণের উপরই নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। আমরা কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে মল্লরাজ্য যে চন্দ্রকোণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাইয়াছি। কবি গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে দিগ্বন্দনা স্থলে রাঢ়ের তৎকালপ্রসিদ্ধ দেবদেবীগণের উদ্দেশে প্রণাম করিতেছেন। সে স্থান হইতে একাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"কাইতির বাণেশ্বর বন্দি গাব আগে।
মৌলার রঙ্কিণী বন্দো মস্তকের পাগে॥
লাড়িয়া নগরে বন্দো সর্ব্বমঙ্গলা।
অসুর বধিয়া মায়ের গলে মুণ্ডমালা॥
তাটেশ্বর গোটেশ্বর বন্দিনু গোতানে।
অগ্নিমুখ হর বন্দো বাস পলাসনে॥
কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দো কোগ্রাঞ্চি নগরে।
চন্দ্রকোণার গড়পতি বন্দো মল্লেশ্বরে॥"

শেষোক্ত ছত্রটিতে আমরা চন্দ্রকোণার নাম পাইতেছি, তথায় যে একটি গড় ছিল এবং সেই গড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম "মল্লেশ্বর" ছিল, তাহাও জানিতে পারিতেছি। মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ নগর চন্দ্রকোণার নাম অনেকেই অবগত আছেন। এখনও তথায় মল্লেশ্বর নামে দেবতা আছেন এবং মল্লেশ্বরপুর বলিয়া একটি পল্লী আছে। এই মল্লেশ্বর দেবতাই কবিকঙ্কণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে মল্লরাজ বলিতে যে একমাত্র বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয়গণকে এবং মল্লরাজ্য বলিতে বিষ্ণুপুর রাজ্যকে বুঝায়, অন্য কোনও রাজবংশ বা রাজ্য বুঝায় না—তাহা হয়ত অনেকে অবগত নন। চন্দ্রকোণার গড় ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মল্লেশ্বর যে বিষ্ণুপুরের মল্লবংশনাথগণ কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরে মল্লেশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁহার মন্দিরের প্রস্তরলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে উহা ১৬২২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বেও যে মল্লভূপগণ স্বীয় রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে স্বীয় বংশগৌরবব্যঞ্জক মল্লেশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন তাহা অস্বাভাবিক নহে।

দুরতিক্রমনীয়, নিবিড় শালারণ্য-পরিব্যাপ্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ-শৈলসন্নিবিষ্ট, নয়নাভিরাম ক্ষুদ্র-সরিৎ-মেখলা, ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল, ততোধিক হিংস্র প্রকৃতি আদিম নিবাসিগণ অধ্যুষিত এই বিস্তৃত ভূভাগে সনাতন ধর্ম্মবৈজয়ন্তী অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিতে আর্য্য সভ্যতার যে কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভারতের অমূল্য ঐতিহাসিক ভাণ্ডার মহাভারতে দেখি—একদিকে ওড্র বা উৎকল এবং কলিঙ্গ, অপর দিকে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও মগধ অতি পুরাকাল হইতে আর্য্য-সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়া আর্য্যরাজ্য বলিয়া গণিত হইয়াছিল এবং আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্রভূমি উত্তরপথের পশ্চিম প্রান্তস্থিত কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি সরস্বতী-তীর-সন্নিকটস্থ আর্য্যগণের সহিত প্রাগুক্ত জনপদবাসিগণের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে যে অবাধ আদান প্রদান চলিত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যে অরণ্যরাজ্যকে মধ্যে রাখিয়া উক্ত জনপদসমূহ সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ মহাভারতে নাই। ইহার কারণ এই যে, যখন প্রাচীন আর্য্যগণ শনৈঃ শনৈঃ অপেক্ষাকৃত সহজগম্য মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও উৎকলে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, তখন ঐ সমস্ত প্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য অনার্য্যগণ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অধিকতর দুর্গম অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত আর্য্যগণ এই অরণ্যরাজ্যে প্রবেশ করা বিপজ্জনক মনে করিতেন। মল্লরাজ্যই যে ঐ দুর্গম সীমান্ত-প্রদেশের সমগ্রভাগ, তাহা নহে। তবে উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে ঐ সীমান্ত-প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরবর্ত্তী যুগে মল্লরাজ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কোন্ সময়ে আর্য্য-সভ্যতালোক সর্ব্বপ্রথম এই ভীষণ অন্ধকারময় অরণ্যমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। মল্লাব্দের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায়, আদিমল্ল ৬৯৫ খৃঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন। সে সময়

এই অরণ্যপ্রদেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত না হউক, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে যে আর্য্যসভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা মল্লরাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু পদ্মমপুরাধিপগণের অস্তিত্ব ও আদিমল্লের প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ-আশ্রয়ে বাস প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশিনের শিলালিপি প্রমাণে এবং ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দের মতে শকাব্দের ৩১৭৯ বর্ষ পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু রাঢ়ের উল্লেখ নাই। ক্রমশঃ যখন বঙ্গের পশ্চিমে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন সেই নবস্থাপিত আর্য্য-উপনিবেশের নাম রাঢ় হইয়াছিল। এখন সেকথা যাউক। আমরা মহাভারতের সময় অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে, রাঢ় বলিতে যে প্রদেশ বুঝি, তাহার কোনও সংবাদ পাই না। এক্ষণে মধ্যযুগে রাঢ়ের কোনও সন্ধান পাই কি না, দেখা যাউক। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাঢ়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক যে সমগ্র বাঙ্গলা জয় করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সুদীর্ঘবর্ষব্যাপী যুদ্ধ করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতযুদ্ধের সময় ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভের মধ্যকালবর্ত্তী কোন সময়ে আমরা যে জনপদকে রাঢ়নামে অভিহিত করি, তথায় আর্য্যসভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ণসুবর্ণের ন্যায় রাজধানী, শশাঙ্কের ন্যায় পৌণ্ড্র-বঙ্গ-মগধ-বিজয়ী রাজা ও তাঁহার সৈন্যগণের ন্যায় প্রজার সৃষ্টি করিয়াছিল।

বাঙ্গালার তমসাচ্ছন্ন যুগের ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত-পুত্র সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গ ও রাঢ় দেশ জয় করেন; এবং এই ৪র্থ শতাব্দীরই কোনও সময়ে উৎকীর্ণ বঙ্গভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপি বাঁকুড়ার সুসুনিয়া পাহাড়ের বক্ষে এতকাল লুক্কায়িত ছিল। সুতরাং ৪র্থ শতাব্দীতে পূর্ব্বরাঢ়ে এবং সম্ভবতঃ এই অরণ্যরাজ্যের মধ্যভাগেও আর্য্যসভ্যতা বিরাজিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এই সময়ের বহু পূর্ব্বে মহারাজ ধর্ম্মাশোকের সময়ে যে অন্ততঃ পূর্ব্বরাঢ় সুসভ্য আর্য্যগণের নিবাসভূমি ছিল ও রাঢ়রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বিশেষ সমৃদ্ধি-

শালী নগর ছিল, তাহা চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাংএর স্বর্ণসুবর্ণবর্ণনা হইতে প্রাপ্ত হই। তিনি তথায় মহারাজ অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম রাঢ় বা আধুনিক মল্লভূমির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে পদুমপুরের নিকটবর্ত্তী শলদাগ্রামে ভূগর্ভোত্থিত বুদ্ধমূর্ত্তির রচনাকৌশল পরীক্ষা করিলে কোন তথ্য পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া বোধ হয়। আমাদের অশিক্ষিত চক্ষুতে ঐ মূর্ত্তির রচনাকৌশল বঙ্গগৌরব ভাস্করশ্রেষ্ঠ ধীমান্ ও বীতপালের রচনাভঙ্গীর অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ঐ মূর্ত্তি খৃষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শতাব্দীর সৃষ্টি মাত্র। কিন্তু যদি ঐ মূর্ত্তির রচনাভঙ্গী অশোকযুগের মূর্ত্তিরচনাকৌশলের অনুরূপ হয়, তবে ঐ সীমান্তপ্রদেশে যে অশোকযুগে আর্য্যসভ্যতা বিরাজ করিত, তাহা প্রমাণিত হয়। শলদা গ্রামে অন্যান্য বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা পরীক্ষা করাইলে ঐ সমস্ত মূর্ত্তি হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

ভাবুক-কবি-কল্পনা-পরিপুষ্ট, তৎকালীন আড়ম্বরপ্রিয়তারঞ্জিত বহু-কিম্বদন্তী-সমাকীর্ণ ভারতের অতীত ইতিহাসে যখন সবে মাত্র বৈদেশিক দূতগণের বিবরণের ক্ষীণ আলোক পতিত হইতেছে, আলেক্জান্দারের ভারত বিজয়ের সেই নিষ্ফল প্রয়াসের সময়ও যে রাঢ়প্রদেশ বিশেষ পরাক্রমশালী আর্য্যগণ-নিসেবিত ছিল, তাহা গ্রীক দূতগণের বিবরণে দৃষ্ট হয়।

আলেক্জান্দার বিশপাতীরে অবস্থান কালে অবগত হইয়াছিলেন—প্রাচ্য ভারতে প্রাসাই ও গঙ্গারিডয় নামক দুইটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল।

মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্র নগরে অবস্থানকালে লিখিয়া গিয়াছেন পাটলিপুত্রই প্রাসাই রাজ্যের রাজধানী। উহার পূর্ব্বদিকে গঙ্গারিডি রাজ্য।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অবলম্বনে ডিয়োডোরস্ লিখিয়া গিয়াছেন, "গঙ্গানদী গঙ্গরিডিদেশের পূর্ব্বসীমা দিয়া গিয়া সাগরে মিশিয়াছে। অসংখ্য রণহস্তিগণের সাহায্যে এই রাজ্য অজেয় ছিল।"

টলেমি কি লিখিয়া গিয়াছেন, Mc. Crindle সাহেবের মন্তব্যসহ তাহা Ancient India as described by Ptlemy নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Gangaridai—This great people occupied all the country about the mouths of the Ganges. Their capital was Gange described in the Periplus as an important seat of commerce on the Ganges. They are mentioned by Virgil, by Valerius Flaccus and by Cartius who places them along with the Pharasii on the eastern bank of the Ganges. They were called by Pliny the Gangaridai Calingæ, and placed by him at the furthest extremity of the Ganges region. They must have been a powerful people. St. Martin says, "Bengal represents, at least in a general way, the country of the Gangaridai, and the city which Pliny speaks of as Parthalis can only be Vardhawan—a place which flourished in ancient times and is now known as Burdwan."

ভাবার্থ :—গঙ্গারিডয়—গঙ্গার মোহানার সমীপবর্ত্তী সমুদয় ভূভাগ এই পরাক্রান্ত জাতির অধিকৃত ছিল। গঙ্গ তাহাদের রাজধানী ছিল, এই গঙ্গই পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি প্রধান বাণিজ্যস্থল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভার্জিল, ভ্যালিরিয়াস ফ্ল্যাকাস এবং কার্টিয়াস এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। কার্টিয়াসের মতে এই জাতি গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ফারাসিয়াই নামক জাতির সহিত গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলে বাস করিত। প্লিনি ইহাদিগকে গঙ্গারিডয় কলিঙ্গী নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশের শেষসীমায় ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহারা নিঃসন্দেহ একটি পরাক্রান্ত জাতি ছিল। সেণ্ট মার্টিন বলেন, 'মোটামুটি বলিতে গেলে বাঙ্গালাই এই গঙ্গারিডয় প্রদেশ এবং প্লিনি যাহাকে পার্থ্যালিস নামে উল্লেখ করিতেছেন, তাহা আধুনিক বৰ্দ্ধমান ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এই নগর প্রাচীন কালেও বিদ্যমান ছিল।'

বিভিন্ন গ্রীক দূতগণের বর্ণনা পাঠে মনে হয় গঙ্গার উভয় কূলে রাঢ়ে ও বঙ্গে তৎকালে অতিপরাক্রান্ত এক আর্য্যজাতি বাস করিতেন এবং সেণ্ট

মার্টিনের অনুমান সত্য হইলে বর্দ্ধমান অঞ্চল বা পরবর্ত্তী যুগের মল্লরাজ্য পর্য্যন্ত আর্য্যনিবাস বিস্তৃত ছিল। একটি পরাক্রান্ত রাজ্য গঠিত হওয়া অল্পসময়-সাপেক্ষ নহে, সুতরাং গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বহু পূর্ব্বেই যে গঙ্গারিডয় রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

গ্রীক দূতগণ যে সময়ের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে সে এক অভিনব যুগ। অসাম্প্রদায়িকতা, সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিন্দুসভ্যতার বিশেষত্ব; উহাই জগতের সমস্ত সভ্য জাতি হইতে হিন্দুকে পৃথক্ করে। ধর্ম্মসম্বন্ধে এই উদারনীতি ভগবান্ শাক্যমুনির আবির্ভাবের পর কয়েক শতাব্দী যেরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল, জগতের চক্ষে সে দৃশ্য চমৎকার, অননুকরণীয়; বুঝি ভারতের ইতিহাসেও অন্যত্র ইহার তুলনা নাই। সনাতন ধর্ম্মের অস্থিমজ্জা হইতে জন্মলাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্রোহী শিশুর ন্যায় মাতার নিষেধবিধি মানিয়া চলিতেছে না; জৈন ধর্ম্ম স্বীয় ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়াছে। উভয়ে আচণ্ডালকে জ্ঞান বিতরণ করিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, সকলকে বৈরাগ্যের তেজোময় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, সমাজের মূলকাণ্ড ধরিয়া নাড়া দিতেছে। ওদিকে সর্ব্বংসহ মাতৃধর্ম্ম অতিদুরূহ জ্ঞান-বৈরাগ্য-মার্গাবলম্বী অথচ তৎসাধনে অকৃতকাম সাধারণ ব্যক্তিগণের মুক্তির জন্য দেশকালপাত্রোপযোগী বহুবিধ পৌরাণিক উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে—ধীরে ধীরে দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে—সে দৃশ্য জগৎ একবার মাত্র দেখিয়াছে এবং আজিও তাহা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতেছে। সেই মহাসমন্বয়ের যুগে রাঢ়েও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় নানাবিধ ধর্ম্মমত একত্র প্রচারিত হইত।

গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে রাঢ় সুসভ্য আর্য্যোপনিবেশ ছিল, তাহার প্রমাণ জৈনধর্ম্মগ্রন্থে প্রাপ্ত হই। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে মাগধী ভাষায় রচিত জৈন অঙ্গ মধ্যে রাঢ়ের উল্লেখ আছে। তাহারও বহুপূর্ব্বে যখন ভগবান্ তথাগত ধরিত্রীর ভার হরণ এবং সাধুদিগের পরিত্রাণ সাধন ও ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য প্রাপ্তপূর্ণকাল-অজ্ঞান-কুসংস্কারান্ধকার নিরাকরণার্থ হিমালয়ের পবিত্র ক্রোড়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ভারতের—ভারতের কেন, জগতের সেই চিরস্মরণীয় দিনের পূর্ব্বেও যে রাঢ়ে আর্য্যসভ্যতা বিরাজ

করিত, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন্ সাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে Kelonasufalana বা কর্ণসুবর্ণের বর্ণনাপাঠে জানিতে পারি, যখন ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ পতিতপাবন রূপে তাঁহার জ্ঞান বৈরাগ্য মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তৎকালে তিনি কর্ণসুবর্ণে আসেন। Samuel Beal সাহেবের Buddhist Records of the Western World নামক গ্রন্থ হইতে উক্ত ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদের একাংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।—

"It is thickly populated. The householders are very rich. The manners of the people are honest and amiable. There is a stupa built by Asoka. When Tathagata was alive in the world He preached here for seven days explaining the law and guiding men. By the side of it is a Vihar ; here there are traces where the past four Buddhas sat down and walked. There are several other stupas in places where Buddha explained the excellent law. They were built by Asoka-raja."

অর্থাৎ—এখানে বহুলোকের বাস। গৃহস্থগণ খুব সঙ্গতিপন্ন। লোকগুলি সৎস্বভাব এবং মধুর প্রকৃতি। এখানে অশোকনির্ম্মিত একটি স্তূপ আছে। ভগবান্ তথাগত জীবদ্দশায় এখানে সাতদিন ধর্ম্মব্যাখ্যা এবং লোকদিগকে সদুপদেশ দান করেন। ইহার সমীপে একটি বিহার আছে। যেখানে পূর্ব্বতন চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও বিচরণ করিতেন, সে সকল স্থলের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও এখানে বর্ত্তমান। বুদ্ধের ধর্ম্মব্যাখ্যার স্মারক রাজা অশোকনির্ম্মিত আরও কতিপয় স্তূপ বর্ত্তমান আছে।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারবৃত্তান্ত যত্নসহকারে পড়িলে বোধগম্য হয় যে, তিনি সুপ্রসিদ্ধ নগর, জনপদ ও লোকালয়ে, যে স্থলে কর্ম্মকাণ্ডবাদী বৈদিক হিন্দুগণের সহিত বিচার হওয়া সম্ভব, সেই সেই স্থলে ব্রাহ্মণদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে যাইতেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই যে মগধ-কোশলের ন্যায় রাঢ়ে, পৌণ্ড্রে ও বঙ্গে বৌদ্ধ মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা চীন-

পরিব্রাজক-কথিত তাঁহার ঐ সকল প্রদেশে আগমন ও মত প্রচারের বৃত্তান্ত হইতে জানা যাইতেছে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যোপনিবেশ ছিল। তাহাদেরই পার্শ্বে কর্ণসুবর্ণ নগর যখন বুদ্ধদেবের সময় একটি উপযুক্ত প্রচারক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তখন রাঢ়ে যে বুদ্ধদেবের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যসভ্যতা বিরাজ করিত ও তথায় বৈদিক যাগযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, তাহা অনুমান করা সহজ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—সে সময় আর্য্যনিষেবিত রাঢ় পশ্চিমে কতদূর বিস্তৃত ছিল? আর্য্যগণ তখন কেবল গঙ্গাতীরেই অবস্থান করিতেন, না সুদূর বীরভূম, মল্লভূম ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলমধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিলেন?

জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের সাহায্যে বোধ হয় এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যাইতে পারে। জৈন গ্রন্থে দেখি, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর নিবিড় অরণ্যসমাকীর্ণ রাঢ়ে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করিয়া বন্যজাতিগণের মধ্যেও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করেন। তৎকালে ঐ প্রদেশে আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যনিবাস না থাকিলে একজন আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারকের কেবল মাত্র অনার্য্যগণমধ্যে বাস করা অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ জৈনধর্ম্ম জাতিভেদ মানিত; যদি ঐ প্রদেশে কেবল অনার্য্যবাস থাকিত, তাহা হইলে মহাবীর কোনমতে এত দীর্ঘকাল তথায় বাস করিতে ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিতেন না। বৈদিক যুগের সময় হইতে দেখা যায়, আর্য্যধর্ম্ম যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য অগ্রে তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, বঙ্গ প্রভৃতি বাঙ্গালার অন্যান্য জনপদের ইতিহাসে দেখা যায়, অগ্রে ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া তথায় বাস করিয়াছেন, তাহার বহুপরে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞধূমে বাঙ্গালার আকাশ প্রথম পবিত্রীকৃত হয়। ক্ষত্রিয়গণ পুরাকালে ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া অনাদি পুরুষের বাহু নামে অভিহিত হইতেন। বস্তুতঃ মহাবীরের সময় যদি পশ্চিম রাঢ় কেবল অনার্য্যদের দেশ হইত, তবে তিনি কখনই সেস্থানে দীর্ঘকাল তিষ্টিতে পারিতেন না। অধিকন্তু মহাবীরের পূর্ব্বেও উক্ত অঞ্চলে আর্য্য-সভ্যতা ও আর্য্যবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবীরের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ধর্ম্ম প্রচারার্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে তাম্রলিপ্তে গমন করেন এবং পরে

তথা হইতে নাগপুরে গমন করেন। তিনি তথায় যে সমস্ত ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন, তাহাদের কাহারও কাহারও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়—সে সমস্ত আর্য্য-নাম। নাগপুরে অবস্থানকালে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার নির্ব্বাণকাল সমাগতপ্রায়। তখন তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত সমেতশিখরে গমন করিয়া তথায় ৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শতবর্ষ বয়ঃক্রমে মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন। উক্ত সমেতশিখরই জৈনদিগের প্রসিদ্ধ পরেশনাথ পাহাড়। প্রাগুক্ত দুইজন তীর্থঙ্করের পশ্চিম রাঢ়ের অরণ্য-পর্ব্বত-ময় প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস হইতে আমরা বুঝিতে পারি, ঐ সময় তথায় আর্য্যগণ বাস করিতেন। তাহা না হইলে, জাতিভেদমান্যকারী, ভিন্নভাষাবাদী, জৈনধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকগণের গুপ্তভাবে ঐ অনার্য্যদেশে ভ্রমণ আধুনিক কালে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর তিব্বত-ভ্রমণের ন্যায় সম্ভবপর হইলেও তথায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বরং ইহাই বোধ হয় যে, তৎকালে ঐ জঙ্গলময় প্রদেশে স্থানে স্থানে আর্য্যগ্রাম বা নগর ছিল,এবং তীর্থঙ্করগণ আর্য্যদিগের মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিবার সময় অনার্য্যদের মধ্যেও প্রচার করিতেন।

খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে আমরা বর্ত্তমান মল্লভূমে অনার্য্য ও আর্য্য-নিবাস দেখিতে পাইলাম। ইহার পূর্ব্বে আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। গ্রীকদূতগণের সময় হইতে পার্শ্বনাথের সময় পর্য্যন্ত কোনরূপে জৈনধর্ম্ম-গ্রন্থের ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম—কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে গভীর অন্ধকার রাঢ়ের ইতিহাস আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহা ভেদ করা দুঃসাধ্য। এমন কি, বাঙ্গালার অন্যান্য জনপদ পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতির কোনও বিবরণ খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুত্রাপি পাওয়া যায় না। এস্থলে বাঙ্গালায় প্রথম আর্য্যোপ-নিবেশ স্থাপনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য্যগণ বঙ্গদেশের বিষয় অবগত ছিলেন, এবং সাগরসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। কিন্তু তখন সমগ্র বাঙ্গালা অনার্য্যপূর্ণ ছিল—এখানে আর্য্যগণ বাস করিতেন না। বেদে অঙ্গদেশ বা বর্ত্তমান ভাগলপুরের উল্লেখ থাকিলেও তাহা অনার্য্য-বাসভূমি বলিয়াই কথিত হইয়াছে। সুতরাং তৎকালেও আর্য্যোপনিবেশ ভাগলপুর পর্য্যন্ত

বিস্তৃত হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও পৌণ্ড্রের নিন্দা করা হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ দেখি, কিন্তু এখানেও বঙ্গের নিন্দা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আর্য্যগণ যেস্থানে বাস করিতেন না এবং যেস্থানে যজ্ঞবিঘ্নকারী অসভ্য অনার্য্যগণ বাস করিত, সেস্থান আর্য্যগণ রাক্ষস-ভূমি, পিশাচভূমি, বা নাগভূমি বলিয়া ঘৃণা করিতেন। মনুসংহিতাতেও বাঙ্গালায় আর্য্যগণের বাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। এত নিষেধ সত্ত্বেও যে সমস্ত দুঃসাহসিক, আর্য্য ক্ষত্রিয় শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করিয়া এবং আপনারা মুষ্টিমেয় হইয়াও সর্ব্বদা দুর্দ্দান্ত অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা এবং ধর্ম্মানুশাসনের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি যথার্থভাবে প্রতিপালন করা অসম্ভব ছিল বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা নিন্দিত ও অন্যান্য প্রদেশের সদাচারী আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেন। কিন্তু কালে বংশবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিনব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিল। রামায়ণ-রচনাকালে বাঙ্গালানিবাসী আর্য্যগণ যে সমাজচ্যুত ছিলেন না, তাহার প্রমাণ রামায়ণে পাওয়া যায়। অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পিতা সূর্য্যবংশীয়-অযোধ্যাধিপ দশরথের পরম সখা ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ।*

(শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়)

আজি অনুপম তপোবনছায়ে জনকল্লোল মাঝে,
মরমগহনে তোমারি কাহিনী রণিয়া রণিয়া বাজে।
চিত্তকাননে পুলকপরশে স্মৃতির অশোকদল
চরণে তোমার মরণ লভিতে বিকশিছে অবিরল।
অযুতভক্তমুখরকণ্ঠে তোমারি আরতি আজ ;—
অন্তরে বসি চিরভাস্বর তুমি রাজ-অধিরাজ!

* স্বামিজীর ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মমহোৎসব দিনে বেলুড় মঠে লিখিত।

দধীচির মত আপনা অঁপিতে সাধিলে পুণ্যযাগ,
হোমশিখা তার অমর উজল, ঋত্বিক্ মহাভাগ!
নিখিল হিয়ার কালিমা-গরল বেদনাশোণিতক্ষত,
নীরবে হরিয়া প্রেম আঁখিপাতে চন্দ্রভালের মত,
ত্যাগেরে করিলে মাথার মাণিক, সেবারে চিত্তদান,
আপনি ভিখারী সাজিয়া, রাখিলে বিশ্বমানবমান।
ভাঙ্গা বুক বহি ঝরিল যাদের দুর্ব্বল আখিলোর,
আশার তরুণ অরুণে চাহিয়া যাপিল যামিনী ঘোর,
তাদের তাপিত মরু-অন্তরে শান্তি সলিল দানি
গভীর গরজে ঘোসিলে জ্ঞানের পাঞ্চজন্যখানি।
অনিমেস আঁখি ধেয়ানমগন • দেশের শিয়রে জাগি,
আকুলতাভরে পরাণ পাতিয়া দেবতার দয়া মাগি,
ভারতে পিয়ালে জীবন-অমিয়, দেখালে স্বরগছবি,—
সে কথা ত বাজে গগনে—ওগো নব যুগরবি!
কৌপীন আর পূত অধোবাসে পরমবিত্ত মানি,
কণ্ঠ ভরিয়া পুলকে গাহিলে উপনিসদের বাণী;
দেবতার লাগি ভ্রমিলে ভুবনে, ভ্রমিলে বৃন্দাবনে,—
দীনহীন মাঝে খুঁজিয়া পাইলে নিখিলের নারায়ণে!
সে সব কাহিনী স্মরিয়া ভক্ত ফেলিছে নয়ননীর,
চরণকমলে নমি মহা-ঋসি, শুচি, সন্ন্যাসী বীর!

স্বামী বিবেকানন্দের ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

বিগত ৮ই জানুয়ারি, শুক্রবার, বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-পূজা ও ১০ই জানুয়ারি, রবিবার, তদুপলক্ষে মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উভয় দিবসই স্বামিজীর কক্ষ, ও সমাধি-মন্দিরস্থিত শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত স্বামিজীর ধ্যানমূর্ত্তি বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া ভক্তমণ্ডলীর

প্রাণ ভক্তি ও আনন্দ-রসে পরিপ্লুত করিতেছিল। বিশেষতঃ, উৎসবদিবসে স্বামিজীর পরিব্রাজক-বেশের তৈলচিত্র, মঠাভ্যন্তরস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মনোহর পুষ্প-লতা-গুল্মাদির বেষ্টনে শোভিত হইয়া স্থানটীকে তৎকালে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রদান করিতেছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী নানা স্থান হইতে বহু সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদকগণ সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীত-নৈপুণ্যে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেছিলেন, এবং বালির কালী-কীর্ত্তন-সম্প্রদায় উচ্চভাবযুক্ত সুমধুর মাতৃ-নাম-কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বপ্রাণে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত করিতেছিলেন। স্বামিজীর জন্মতিথি কোনও ছুটির দিবসে না পড়ায়, জন-সাধারণের যোগদানের বহু বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তৎপূজা উপলক্ষে ঐ দিবসে সহস্রাধিক ভক্ত ঐ দিনের আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া এবং পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। মহোৎসবদিবসে, উহার প্রধান অঙ্গ "দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা" অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে বেলুড় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ঘোষণার দ্বারা প্রচার হওয়ায়, মহোৎসব দিবসে প্রায় দুই সহস্রেরও অধিক "দরিদ্র-নারায়ণ" সমবেত হইয়া তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলেন। ঐ দিবসে ন্যূনাধিক তিন সহস্র ভক্তও প্রসাদ পাইয়াছিলেন। মহোৎসব-দিবসে সর্ব্বসমেত প্রায় দশসহস্র নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন, এবং দুই দিবসের বিরাট্ ব্যাপারের সমস্ত কার্য্য, যাহাদিগকে স্বামিজী ভারতের ভবিষ্যৎ আশাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, সেই ভারতীয় যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে যে, এতাদৃশ বৃহৎ ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত স্থূল বিষয়কে অবলম্বন করিয়া এক মহৎ ভাব-স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমবেত ব্যক্তিবর্গের প্রাণে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনা আনয়ন করিয়াছিল—যেন মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তি ও পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে আপন আপন "আমিত্ব" ভুলাইয়া দিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেছিল :—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—জনৈক দর্শক।

১০ জানুয়ারি কাশী অদ্বৈত আশ্রমে উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামিজীর তৈলচিত্র অতি মনোহরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রায় ৮০০ দরিদ্র নারায়ণকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীযুত এফ্, জে, অ্যালেক্‌জাণ্ডার স্বামিজীর জীবনচরিত ও উপদেশ সম্বন্ধে এক অতীব হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। স্বামিজীর স্বদেশবাসিগণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, স্বদেশের কল্যাণ ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনকল্পে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বক্তা সকলের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ইংরাজীতে ও অপর কয়েকজন ভক্ত বাঙ্গালায় স্বামিজী-সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। বক্তৃতান্তে জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুত রাধিকানাথ রায় সারস্বতহংস কর্তৃক স্বামিজীর উদ্দেশে রচিত একটী গীত গান করেন। পরিশেষে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হইয়া উৎসবকার্য্যের "মধুরেণ" সমাপ্তি হয়। ভক্তসংখ্যা প্রায় এক সহস্র হইয়াছিল। সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমে স্বামিজীর জন্মোৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। আশ্রমটী পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যা, আচার্য্যকুলের বালব্রহ্মচারিগণ ও গোস্বামিগণ কর্তৃক হোম ও বেদপাঠ, দরিদ্র ও আতুর-নারায়ণগণকে পরম শ্রদ্ধাসহকারে বিবিধ ভোজ্য ও মাল্যাদিদানে সেবা, ভক্তগণের একত্র প্রসাদগ্রহণ, এবং নামসঙ্কীর্ত্তন এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ ছিল। বৃন্দাবনের সকল সম্প্রদায়ের লোকই উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ হোমে স্বামিজীর জন্মোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী ভজন ও প্রায় তিন সহস্র দরিদ্র নারায়ণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। অপরাহ্নে "হরিকথা-কালক্ষেপ" এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে "সূর্য্যনমস্কারের উপকারিতা" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রায় পাঁচটার সময় ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধান দেওয়ান পেস্কার ডাঃ এন, সুব্রহ্মণ্য আইয়ার মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুত কে, এস, রামস্বামী শাস্ত্রীয়ার

মহাশয় "আধুনিক জগতের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী" শীর্ষক একটী সারগর্ভ উপাদেয় বক্তৃতাদানে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে মোহিত করেন। মান্দ্রাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং কতিপয় ইউরোপীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় স্বামিজীর অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক উপদেশই নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছিল। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন :—

"অনেকে বলিয়া থাকেন যে, স্বামী বিবেকানন্দে হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত গুণগুলি একীভূত হইয়াছিল। ইহা অতি সত্য কথা। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার প্রশান্তগম্ভীর মুখমণ্ডল নয়নদ্বয়ের উজ্জ্বল প্রভায় সত্যসত্যই উদ্ভাসিত থাকিত। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা যত লোককে মুগ্ধ না করিয়াছে, তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর ও স্নিগ্ধ হাস্য তদপেক্ষা অধিক লোকের মন হরণ করিয়াছে। তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের তুলনা কেবল তাঁহার জগৎকে সেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অধিকারী করিবার প্রবল আগ্রহে, যে উপলব্ধি তিনি নিজে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পাদমূলে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কপটাচারকে ঘৃণা করিতেন, এবং প্রতি বস্তুকে, উহা ঠিক যেমনটী, তেমনই ভাবে দেখিবার প্রয়াস করিতেন। যাহা তিনি সত্য বলিয়া ধারণা করিতেন, তাহা অকুতোভয়ে জগতের সমক্ষে প্রচার করিতেন এবং নিজেও তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি যেন ঈশ্বরদত্ত ছিল; তিনি বহুভাষাবিৎ ছিলেন; তাঁহার শব্দ-বিন্যাস যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই ওজস্বী ছিল; তিনি একজন উচ্চদরের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার মাতৃভাষায়ও তিনি একজন সুলেখক ছিলেন; তাঁহার বিজ্ঞান ও দর্শনে প্রগাঢ় এবং বিপুল পাণ্ডিত্য ছিল; আর সর্ব্বোপরি তাঁহার কথার মধ্য দিয়া—শুধু কথার কেন, তাঁহার চাহনিরও মধ্য দিয়া—তিনি যে ধর্ম্মজগতের একজন মহাপুরুষ, লোকের মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়া যাইত। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপই এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনগৃহে স্বামিজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে সঙ্গীত, শ্রীযুত কামিনীকুমার বিদ্যারত্নের উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা

এবং দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা ; অপরাহ্নে শ্রীযুত জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের স্বামিজীকৃত "Inspired Talks" পাঠ ও ব্যাখ্যা ; এবং সায়াহ্নে সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ হইয়া উৎসব সম্পূর্ণ হয় । বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন ।

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালোর মঠ, কনখল, মেদিনীপুর ও কাশী সেবাশ্রম, মুর্শিদাবাদ আশ্রম, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম, ঢাকা প্রভৃতি ভারতের, ও সিংহল ও মালয় উপনিবেশ, আমেরিকা প্রভৃতি ভারতবহির্ভূত বহুস্থানে স্বামিজীর ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব ভক্তগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে । স্থানাভাবে তাহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল না ।

সংবাদ ও মন্তব্য ।

গত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হইতে সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত জেনিভায় একটী করিয়া সাপ্তাহিক ক্লাস হইতেছে । স্বামী পরমানন্দ যখন জেনিভা গমন করেন, তখন হইতেই ইহার সূত্রপাত হয় । বেদান্তসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা এই ক্লাসের উদ্দেশ্য ।

গত ১লা নবেম্বর অপরাহ্নে বোষ্টনের থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর ভবনে বহুলোকের সমক্ষে স্বামী পরমানন্দ "ভারতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন, এবং বক্তৃতান্তে কয়েকজনের প্রশ্নের সদুত্তর দানে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন ।

বোষ্টনের বেদান্তকেন্দ্রটীতে ক্লাস ও পূজাপাঠাদি পূর্ব্ববৎ চলিতেছে । সোমবার অপরাহ্নের ক্লাসটীতে লোকের বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে । নবেম্বর মাসে উক্ত ক্লাসে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল । ডিসেম্বর মাসে স্বামী পরমানন্দ "জগতের মহাপুরুষগণ" সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছেন ।

স্বামী বোধানন্দের তত্ত্বাবধানে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটীর কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে । প্রতি রবিবার দুইটী করিয়া এবং অন্যবারে

একটী করিয়া ক্লাস হইতেছে। উহাতে সময় বিভাগ করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা, গীতাব্যাখ্যা, কথোপকথন, এবং ধ্যান ভজনাদি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। একটী সংস্কৃত ক্লাস শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটীতে স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রতি রবিবার তিনটী করিয়া ধর্ম্ম ও দর্শন-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিতেছেন।

প্রায় বৎসরাবধি মেদিনীপুরের স্থানীয় ভদ্রলোকগণ কর্তৃক তথায় একটী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা মিশনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, প্রায় ৩ মাস হইল, বেলুড় মঠ হইতে স্বামী পূর্ণানন্দ তথায় গিয়া কার্য্য করিতেছেন। আশ্রমে ২টী রোগীর থাকিবার বন্দোবস্ত আছে, তদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক রোগী আশ্রম হইতে ঔষধসাহায্য প্রাপ্ত হয়। নাড়াজোলের বদান্য রাজা মহোদয় মিশনের অধ্যক্ষের নামে একখানি বাড়ী দান করিয়াছেন। উহারই কথঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া লইয়া বর্ত্তমানে উহাতে আশ্রমকার্য্য চলিতেছে। গত ২৭শে ডিসেম্বর বেলুড়মঠ হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দ উক্ত সেবাশ্রম পরিদর্শনে গমন করেন। সেবাশ্রমের বর্ত্তমান সেক্রেটারী ডাক্তার শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে গত ২৯শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে তত্রত্য হার্ডিঞ্জ স্কুলে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রকৃতভাবে অনুষ্ঠিত ভগবদুপাসনা ও নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা এতদুভয়েরই যে সমান মূল্য, তাহা আড়াই ঘণ্টাব্যাপী মনোহর বক্তৃতা দ্বারা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন। স্বামিদ্বয় ৩০শে ডিসেম্বর মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আগামী ৪ঠা ফাল্গুন, মঙ্গলবার, বেলুড়মঠে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অশীতিতম জন্মতিথি পূজা ও ৯ই ফাল্গুন, রবিবার, ইংরাজী ২১শে ফেব্রুয়ারি, তদুপলক্ষে মহোৎসব হইবে। ভক্তবৃন্দ যোগদান ও সহায়তা করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

গদাধরের কৈশোরকাল।

শ্রীযুত ক্ষুদিরামের দেহাবসানে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। বিধাতার বিধানে শ্রীমতী চন্দ্রা দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর, সুখে দুঃখে, তাঁহাকে জীবন-সহচর-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে হারাইয়া তিনি যে এখন জগৎ শূন্য দেখিবেন, এবং প্রাণে একটা চিরস্থায়ী অভাব প্রতিক্ষণ অনুভব করিবেন, ইহা বলিতে হইবে না। সুতরাং শ্রীশ্রীরঘুবীরের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণে চিরাভ্যস্ত তাঁহার মনের গতি এখন সংসার ছাড়িয়া সেই দিকেই নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল। কিন্তু মন ছাড়িতে চাহিলেও যতদিন না কাল পূর্ণ হয়, ততদিন সংসার তাহাকে ছাড়িবে কেন? সাত বৎসরের পুত্র গদাধর এবং চারি বৎসরের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার চিন্তার ভিতর দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়া আবার সংসার তাহাকে দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। সুতরাং ৺রঘুবীরের সেবায় এবং কনিষ্ঠ পুত্রকন্যার পালনে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দুঃখের দিন কোন রূপে কাটিতে লাগিল।

অন্যদিকে পিতৃবৎসল রামকুমারের স্কন্ধে এখন সংসারের সমস্ত ভার পতিত হওয়ায় তাঁহার বৃথা শোকে কালক্ষেপ করিবার অবসর রহিল না। শোকসন্তপ্তা জননী এবং তরুণবয়স্ক ভ্রাতা ও ভগিনী যাহাতে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট না পায়, অষ্টাদশবর্ষীয় মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যাহাতে স্মৃতি ও জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সংসারে সাহায্য করিতে পারে, স্বয়ং যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আয় বৃদ্ধি করিয়া পারিবারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারেন—ঐরূপ শত চিন্তা ও কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার এখন দিন যাইতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মকুশলা গৃহিণীও চন্দ্রা দেবীকে অসমর্থা দেখিয়া পরিবারবর্গের

আহারাদি এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্মের বন্দোবস্তের অধিকাংশ ভার গ্রহণ করিলেন।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ জীবনে যত অভাব আনয়ন করে, এত বোধ হয় অন্য কোন ঘটনা করে না। মাতার আদর-যত্নই শৈশবে প্রধান অবলম্বন থাকে, সেজন্য পিতার দেহান্ত হইলেও শিশু তাঁহার অভাব তখন উপলব্ধি করে না। কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষের সহিত কৈশোরে উপস্থিত হইয়া সেই শিশু যখন পিতার অমূল্য ভালবাসার দিন দিন পরিচয় লাভ করিতে থাকে, স্নেহময়ী জননী তাহার যে সকল অভাব পূর্ণ করিতে অসমর্থা, পিতার দ্বারা সেই সকল অভাব মোচিত হইয়া তাহার হৃদয় যখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, সে সময়ে পিতৃবিয়োগ উপস্থিত হইলে তাহার জীবনে অভাববোধের পরিসীমা থাকে না। পিতৃবিয়োগে গদাধরের ঐরূপ হইয়াছিল। প্রতিদিন নানা ক্ষুদ্র ঘটনা তাহাকে পিতার অভাব স্মরণ করাইয়া তাহার অন্তরের অন্তর বিষাদের গাঢ় কালিমায় সর্ব্বদা রঞ্জিত করিয়া রাখিত। কিন্তু তাহার হৃদয় ও বুদ্ধি এই বয়সেই অন্যাপেক্ষা অনেক অধিক পরিপক্ক হওয়ায়, মাতার দিকে চাহিয়া সে উহা বাহিরে কখনও প্রকাশ করিত না। সকলে দেখিত, বালক পূর্ব্বের ন্যায় সদানন্দে হাস্যকৌতুকাদিতে কাল যাপন করিতেছে। ভূতির খালের শ্মশান, মাণিক রাজার আম্রকানন প্রভৃতি গ্রামের জনশূন্য স্থানসকলে তাহাকে কখন কখন একাকী বিচরণ করিতে দেখিলেও বালসুলভ চপলতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে সে তথায় উপস্থিত হইয়াছে, একথা কাহারও মনে উদয় হইত না। বালক কিন্তু এখন হইতে চিন্তাশীল ও নির্জ্জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাহার চিন্তার বিষয় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সমসমান অভাববোধই মানবকে সংসারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সেই জন্যই বোধ হয়, বালক তাহার মাতার প্রতি এখন একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সময় এখন তাঁহার নিকটে থাকিতে এবং দেবসেবা ও গৃহকর্ম্মাদিতে তাঁহাকে

যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে নিকটে থাকিলে জননী নিজ জীবনের অভাববোধ যে অনেকটা ভুলিয়া থাকেন, একথা লক্ষ্য করিতে বালকের বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু মাতার প্রতি বালকের আচরণ এখন কিছু ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল। কারণ, পিতার মৃত্যুর পরে বালক কোন বিষয় লাভের জন্য চন্দ্রা দেবীকে পূর্ব্বের ন্যায় আবদার করিয়া কখনও ধরিত না। সে বুঝিত, জননী ঐ বিষয় দানে অসমর্থ হইলে তাঁহার শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করাইবে। ফলতঃ পিতৃবিয়োগে মাতাকে সর্ব্বথা রক্ষা করিবার ভাব তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল।

গদাধর পাঠশালে যাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকিল, কিন্তু পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান শ্রবণ করা এবং দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল গঠন করা তাহার নিকট এখন অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। পিতার অভাববোধ ঐসকল বিষয়ের আনুকূল্যে অনেকাংশে বিস্মৃত হইতে পারা যায় দেখিয়াই বোধ হয় সে উহাদিগকে এখন বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়াছিল। বালকের অসাধারণ স্বভাব তাহাকে এই কালে অন্য এক অভিনব বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। গ্রামের অগ্নিকোণে পুরী যাইবার পথের উপর জমীদার লাহা বাবুরা যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটি পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৺জগন্নাথ দর্শনে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার কালে সাধু বৈরাগীরা অনেক সময় উহাতে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। গদাধর সংসারের অনিত্যতার কথা ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুতে ঐ বিষয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়ও এখন লাভ করিয়াছিল। সাধু বৈরাগীরা অনিত্য সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কাল যাপন করে এবং সাধুসঙ্গ মানবকে চরমশান্তিদানে কৃতার্থ করে, পুরাণ-মুখে একথা জানিয়া বালক সাধুদিগের সহিত পরিচিত হইবার আশয়ে উক্ত পান্থনিবাসে এখন হইতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ধুনী-মধ্যগত পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া তাঁহারা যে ভাবে ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হন, ভিক্ষালব্ধ সামান্য আহার নিজ ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক যে ভাবে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে প্রসাদ

গ্রহণ করেন, ব্যাধির প্রবল প্রকোপে পড়িলে যে ভাবে তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষী থাকিয়া উহা অকাতরে সহ্য করিতে চেষ্টা করেন, আপনাদের বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যও তাঁহারা যে ভাবে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করিতে পরাঙ্মুখ হন, আবার তাঁহাদিগের ন্যায় বেশভূষাকারী ভণ্ড ব্যক্তিগণ যে ভাবে সর্ব্বপ্রকার সদাচারের বিপরীতাচরণ করিয়া স্বার্থসুখসাধনের নিমিত্ত জীবনধারণ করে—ঐ সমস্ত বিষয় বালকের এখন অবসরকালে লক্ষ্যের বিষয় হইল। ক্রমে সে যথার্থ সাধুগণকে দেখিলে রন্ধনাদির জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ, পানীয় জল আনয়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মধুর আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে ভগবদ্ভজন শিখাইতে, নানাভাবে সদুপদেশ প্রদান করিতে এবং প্রসাদী ভিক্ষান্নের কিয়দংশ তাহাকে দিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশ্য, যে সকল সাধু পান্থনিবাসে কোন কারণে অধিককাল বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সহিতই বালক ঐভাবে মিশিতে সমর্থ হইত।

গদাধরের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কয়েকজন সাধু অত্যধিক পথশ্রম নিবারণের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে ঐরূপে অধিককাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্তভাবে মিলিত হইয়া শীঘ্রই তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের সহিত তাহার ঐরূপে মিলিত হইবার কথা প্রথম প্রথম কেহই জানিতে পারিল না, কিন্তু বালক যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অধিককাল কাটাইতে লাগিল, তখন ঐকথা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। কারণ, কোন কোন দিন সে তাঁহাদিগের নিকটে প্রচুর আহার করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আর কিছুই খাইত না এবং চন্দ্রা দেবী কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে সমস্ত কথা নিবেদন করিত। শ্রীমতী চন্দ্রা প্রথম প্রথম উহাতে উদ্বিগ্ন হইতেন না; বালকের প্রতি সাধুগণের প্রসন্নতা আশীর্ব্বাদস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক যখন পরে

কোন দিন বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হইয়া, কোন দিন তিলকধারণ, আবার কোন দিন বা নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া সাধুদিগের ন্যায় কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিয়া গৃহে ফিরিয়া "মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন, দেখ" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন চন্দ্রা দেবীর মন বিষম উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ভাবিলেন, সাধুরা তাঁহার পুত্রকে কোনও দিন ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না ত? উক্ত আশঙ্কার কথা গদাধরকে বলিয়া তিনি একদিন নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বালক উহাতে তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়াও শান্ত করিতে পারিল না। তখন সাধুদিগের নিকটে আর কখনও যাইবে না বলিয়া সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল এবং জননীকে ঐকথা বলিয়া নিশ্চিন্ত করিল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে গদাধর শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাধুদিগের নিকটে উপস্থিত হইল এবং ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে জননীর আশঙ্কার কথা নিবেদন করিল। তাঁহারা তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে বালকের সহিত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলেন যে, গদাধরকে ঐরূপে সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প তাহাদিগের মনে কখনও উদিত হয় নাই এবং পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে ঐরূপ অল্পবয়স্ক বালককে সঙ্গে লওয়া তাঁহারা অপহরণরূপ সাধুবিগর্হিত বিষম অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। চন্দ্রা দেবীর মনে তাহাতে পূর্ব্বাশঙ্কার ছায়া মাত্র রহিল না এবং সাধুদিগের প্রার্থনায় বালককে তাঁহাদিগের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

এই কালের অন্য একটি ঘটনাতেও শ্রীমতী চন্দ্রা গদাধরের জন্য বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনা সহসা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলে ধারণা করিলেও বুঝা যায়, বালকের ভাব-প্রবণতা এবং চিন্তাশীলতা প্রবৃদ্ধ হইয়াই উহাকে আনয়ন করিয়াছিল। কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে অবস্থিত আনুর নামক গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা দেবী ৺বিশালাক্ষীকে একদিন দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যে সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মদাস লাহার পূতস্বভাবা কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী সেদিন বালকের ঐরূপ অবস্থা ভাবাবেশে

উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রা দেবী কিন্তু ঐ কথা বিশ্বাস না করিয়া উহা বায়ুরোগ হইতে বা অন্য কোন কারণে হইয়াছে বলিয়া চিন্তিতা হইয়াছিলেন।* বালক কিন্তু এবারও পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়াছিল যে, ৺দেবীর চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মন লয় হইয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থার উদয় হইয়াছিল।

ঐরূপে দুই বৎসরের অধিক কাল অপগত হইল এবং বালক ক্রমে পিতার অভাব ভুলিয়া নিজ দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখে ব্যাপৃত থাকিতে অভ্যস্ত হইল। গদাধরের পিতৃবন্ধু শ্রীযুত ধর্ম্মদাস লাহার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার পুত্র গয়াবিষ্ণুর সহিত বালকের এইকালে সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। একত্র পাঠ ও বিহারে বালকদ্বয় পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া ক্রমে পরস্পরকে 'স্যাঙাৎ' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিদিন অনেক সময় একত্র কাটাইতে লাগিল। পল্লীবাসিনী রমণীগণ গদাধরকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহে বাটীতে আহ্বান ও ভোজন করাইবার কালে সে এখন নিজ স্যাঙাৎকে সঙ্গে লইতে কখন ভুলিত না। বালকের ধাত্রী কামার-কন্যা ধনী মিষ্টান্ন মোদকাদি সযত্নে প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিলে, সে স্যাঙাৎকে উহার অংশ প্রদান না করিয়া কখনও ভোজন করিত না। বলা বাহুল্য, শ্রীযুত ধর্ম্মদাস এবং গদাধরের অভিভাবকেরা বালকদ্বয়ের মধ্যে ঐরূপ সখ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, গদাধর নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া শ্রীযুত রামকুমার এখন তাহার উপনয়নের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কামার-কন্যা ধনী ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে বালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন উপনয়নকালে তাহার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মাতৃ-সম্বোধনে কৃতার্থ করে। বালকও তাহাতে তাহার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। দরিদ্রা ধনী তাহাতে বালকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদবধি যথাসাধ্য অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া সাগ্রহে ঐ কালের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই কাল উপস্থিত দেখিয়া গদাধর এখন নিজ অগ্রজকে ঐ কথা নিবেদন করিল। কিন্তু

* এই ঘটনার সবিস্তার বৃত্তান্তের জন্য সাধকভাব, ২য় অধ্যায়, ৪৫—৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

বংশে কখনও ঐরূপ প্রথার অনুষ্ঠান না হওয়ায় শ্রীযুত রামকুমার উহাতে আপত্তি করিয়া বসিলেন। বালকও নিজ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐ বিষয়ে বিষম জেদ করিতে লাগিল। সে বলিল, ঐরূপ না করিলে তাহাকে সত্য-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণে কখন অধিকারী হইতে পারে না। উপনয়নের কাল সন্নিকট দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই সকল বিষয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল, বালকের পূর্ব্বোক্ত জেদে ঐ কর্ম্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে ঐ কথা শ্রীযুত ধর্ম্মদাস লাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিতে যত্নপর হইয়া তিনি শ্রীযুত রামকুমারকে বলিলেন, ঐরূপ অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের বংশে ইতিপূর্ব্বে না হইলেও, উহা অন্যত্র বহু সদ্ব্রাহ্মণ-পরিবারে দেখা গিয়া থাকে। অতএব উহাতে তাঁহাদিগের, যখন নিন্দাভাগী হইতে হইবে না, তখন বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য ঐরূপ করিতে দোষ নাই। প্রবীণ পিতৃ-সুহৃৎ ধর্ম্মদাসের কথায় তখন রামকুমার প্রভৃতি ঐ বিষয়ে আর আপত্তি করিলেন না এবং গদাধর হৃষ্টচিত্তে যথাবিধানে উপবীত ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-পূজাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কামার-কন্যা ধনীও তখন বালকের সহিত ঐ ভাবে সম্বন্ধ হইয়া আপনার জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। উহার স্বল্পকাল পরেই বালক দশম বর্ষে পদার্পণ করিল।

উপনয়ন হইবার কিছুকাল পরে একটি ঘটনায় গদাধরের অসাধারণ দিব্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পল্লীবাসী সকলে যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছিল।* গ্রামের জমীদার লাহা বাবুদের বাটীতে কোনও বিশেষ শ্রাদ্ধাবসরে এক মহতী পণ্ডিতসভা আহূত হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম-বিষয়ক কোন জটিল প্রশ্নের সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না। বালক গদাধর ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের এমন সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছিল যে, পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, উপনয়ন হইবার পরে গদাধরের ভাবপ্রবণ হৃদয়

* এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১২৬—১২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

নিজ প্রকৃতির অনুকূল অন্য এক বিষয় অবলম্বনের অবসর পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিল। পিতাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জীবন্ত বিগ্রহ ৺রঘুবীর কিরূপে কামারপুকুরের ভবনে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শুভাগমনের দিবস হইতে লক্ষ্মীজলার ক্ষুদ্র জমীখণ্ডে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সংসারের অভাব দূরীভূত হইয়াছিল এবং করুণাময়ী চন্দ্রা দেবী অতিথি অভ্যাগতদিগকেও নিত্য অন্ন দানে সমর্থা হইয়াছিলেন, ঐসকল কথা শুনিয়া বালক পূর্ব্ব হইতেই উক্ত গৃহ-দেবতাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। সেই দেবতাকে স্পর্শ ও পূজা করিবার অধিকার এখন হইতে প্রাপ্ত হইয়া বালকের হৃদয় নবানুরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া সে এখন নিত্য তাঁহার পূজা ও ধ্যানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিল এবং যাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া পিতার ন্যায় তাহাকেও সময়ে সময়ে দর্শন ও আদেশ দানে কৃতার্থ করেন, তজ্জন্য বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রামেশ্বর শিব এবং ৺শীতলামাতাও বালকের ঐ সেবার অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ঐরূপ সেবা ও পূজার ফলও উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। বালকের পূত হৃদয় উহাতে একাগ্র হইয়া স্বল্প কালেই তাহাকে ভাব-সমাধি বা সবিকল্প সমাধির অধিকারী করিল এবং ঐ সমাধিসহায়ে তাহার জীবনে নানা দিব্য-দর্শনও সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপ সমাধি ও দর্শনের প্রথম বিকাশ এই বৎসর শিবরাত্রিকালে তাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল।* বালক সেদিন যথারীতি উপবাসী থাকিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছিল। তাহার বন্ধু গয়াবিষ্ণু এবং অন্য কয়েকজন বয়স্যও সেদিন ঐ উপলক্ষে উপবাসী ছিল এবং প্রতিবেশী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিব-মহিমা-সূচক যাত্রার অভিনয় হইবে জানিয়া, উহা শুনিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। প্রথম প্রহরের পূজা সমাপ্ত করিয়া গদাধর যখন তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিল, তখন সহসা তাহার বয়স্যগণ আসিয়া

* সাধক-ভাব, ২য় অধ্যায়, ৫১-৫৫ পৃষ্ঠা দেখ। সাধক-ভাব পুস্তকের এই ঘটনার সবিস্তার বিবরণে 'গয়াবিষ্ণু'র স্থলে ভ্রমক্রমে 'গঙ্গাবিষ্ণু' নাম এবং পাইনদের বাটীর কর্ত্তার নাম 'রসিকলাল' লিখিত হইয়াছে। পাঠক, উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

তাহাকে সংবাদ দিল, পাইনদের বাটীতে যাত্রায় তাহাকে শিব সাজিয়া কয়েকটি কথা বলিতে হইবে! কারণ, যাত্রার দলে যে শিব সাজিত, সে পীড়িত হইয়া ঐ ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। বালক উহাতে পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেও তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিলে তাহাকে সর্ব্বক্ষণ শিব-চিন্তাই করিতে হইবে, উহা পূজা করা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; অধিকন্তু ঐরূপ না করিলে কত লোকের আনন্দের হানি হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত; তাহারা সকলেও উপবাসী রহিয়াছে এবং ঐরূপে রাত্রিজাগরণে ব্রত পূর্ণ করিবে, মনস্থ করিয়াছে। গদাধর অগত্যা সম্মত হইয়া শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসরে নামিয়াছিল। কিন্তু জটা, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি-ভূষিত হইয়া সে শিবের চিন্তায় এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার কিছুমাত্র বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না। পরে বহুক্ষণ অতীত হইলেও তাহার চেতন হইল না দেখিয়া, সে রাত্রির মত যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

এখন হইতে গদাধরের ঐরূপ সমাধি মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। ধ্যান করিবার কালে এবং দেব-দেবীর মহিমাসূচক সঙ্গীতাদি শুনিতে শুনিতে সে এখন হইতে তন্ময় হইয়া যাইত এবং তাহার চিত্ত স্বল্প বা অধিকক্ষণের জন্য নিজাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্বিষয়সকল গ্রহণে বিরত থাকিত। ঐ তন্ময়তা যে দিন প্রগাঢ় হইত, সেই দিনই তাহার বাহ্য সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইয়া সে জড়ের ন্যায় কিছুকাল অবস্থান করিত। ঐ অবস্থা-নিবৃত্তির পরে কিন্তু সে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিত, যে দেব অথবা দেবীর ধ্যান বা সঙ্গীতাদি সে শ্রবণ করিতেছিল, তাঁহার সম্বন্ধে অন্তরে কোনরূপ দিব্য-দর্শন লাভ করিয়া সে আনন্দিত হইয়াছে। চন্দ্রা দেবী প্রমুখ পরিবারস্থ সকলে উহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত সবিস্ময়ে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে বালকের স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র হানি হইতে না দেখিয়া এবং তাহাকে সর্ব্বকর্ম্ম-কুশল হইয়া সদানন্দে কাল কাটাইতে দেখিয়া, তাঁহাদিগের ঐ আশঙ্কা ক্রমে অপগত হইয়াছিল। বারংবার ঐরূপ অবস্থার উদয় হওয়ায় বালকেরও ক্রমে উহা অভ্যস্ত এবং প্রায় ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তাহার সূক্ষ্ম বিষয়সকলে দৃষ্টি প্রসারিত এবং দেব-দেবী-বিষয়ক নানা তত্ত্ব

উপলব্ধি হওয়ায় উহার আগমনে সে আনন্দিত ভিন্ন কখনও শঙ্কিত হইত না। সে যাহা হউক, বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এখন হইতে বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সে, হরিবাসর, শিবের ও মনসার গাজন, ধর্ম্ম-পূজা প্রভৃতি গ্রামের যেখানে যাহা ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে লাগিল, সেইখানেই উপস্থিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে লাগিল। বালকের মহদুদার ধর্ম্মপ্রকৃতি তাহাকে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষশূন্য করিয়া তাহাদিগকে এখন হইতে আপনার করিয়া লইল। গ্রামের প্রচলিত প্রথা তাহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কারণ, বিষ্ণূপাসক, শিবভক্ত, ধর্ম্মপূজক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অন্য গ্রামসকলের ন্যায় না হইয়া, এখানে পরস্পরের প্রতি দ্বেষশূন্য হইয়া বিশেষ সদ্ভাবে বসবাস করিত।

ঐরূপে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিণতি হইলেও কিন্তু গদাধরের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ এখন প্রবৃদ্ধ হয় নাই। পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্যাদি উপাধি-ভূষিত ব্যক্তি-সকলের ঐহিক ভোগসুখ ও ধন-লালসা দেখিয়া সে বরং তাঁহাদিগের ন্যায় বিদ্যার্জ্জনে দিন দিন উদাসীন হইয়াছিল। কারণ, বালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহাকে এখন সকল ব্যক্তির কার্য্যের উদ্দেশ্য নিরূপণে প্রথমেই অগ্রসর করিত এবং তাহার পিতার বৈরাগ্য, ঈশ্বর-ভক্তি এবং সত্য, সদাচার ও ধর্ম্ম-পরায়ণতাদি গুণসকলকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগের আচরণের মূল্য নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত করিত। ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বালক সংসারের প্রায় সকল ব্যক্তিরই অন্যরূপ উদ্দেশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আবার অনিত্য সংসারকে নিত্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা সর্ব্বদা দুঃখে মুহ্যমান হয় দেখিয়া সে ততোধিক বিমর্ষও হইয়াছিল। ঐরূপ দেখিয়া শুনিয়া ভিন্নভাবে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে যে তাহার মনে সঙ্কল্পের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। পাঠক হয়ত পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া বলিবেন, একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচারশক্তির অতদূর বিকাশ হওয়া কি সম্ভবপর? উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাধারণ বালক সকলের ঐরূপ হয় না সত্য; কিন্তু গদাধর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিল না। অসাধারণ প্রতিভা, মেধা ও মানসিক সংস্কারসমূহ লইয়া সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং অল্প বয়স্ক হইলেও তাহার পক্ষে ঐরূপ কার্য্য বিচিত্র নহে। সেজন্য ঐরূপ

হওয়া আমাদিগের নিকটে যেরূপই প্রতীয়মান হউক না কেন, আমরা অনুসন্ধানে ঘটনা যেরূপ জানিয়াছি, সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে উহা তদ্রূপই বলিয়া যাইতে হইবে।

সে যাহা হউক, প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসে ক্রমশঃ উদাসীন হইতে থাকিলেও গদাধর এখনও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে পাঠশালে যাইতেছিল এবং মাতৃ-ভাষায় লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থসকল পড়িতে এবং লিখিতে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থসকল সে এখন ভক্তির সহিত এমন সুন্দরভাবে পাঠ করিত যে, লোকে তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইত। গ্রামের সরলচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেজন্য তাহার মুখে ঐ সকল গ্রন্থ শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। বালকও তাহাদিগের তৃপ্তি সম্পাদনে কখনও পরাঙ্মুখ হইত না। ঐরূপে সীতানাথ পাইন, মধু যুগী প্রভৃতি অনেকে ঐজন্য তাহাকে নিজ নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া তাহার মুখে প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবোপাখ্যান অথবা রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে অন্য কোন উপাখ্যান ভক্তিভরে শ্রবণ করিত।

রামায়ণ-মহাভারতাদি ভিন্ন কামারপুকুরে, এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ দেবদেবী-দিগের প্রকট কাহিনীসমূহ গ্রাম্য কবিদিগের দ্বারা সরল পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত আছে। ঐরূপে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রকট হইবার কথা, যোগাদ্যার পালা, বন-বিষ্ণুপুরের ৺মদনমোহনজীর উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর অলৌকিক চরিত্র এবং সাধু ভক্তদিগের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিবার বৃত্তান্ত সময়ে সময়ে গদাধরের শ্রবণগোচর হইত। বালক নিজ শ্রুতিধরত্বগুণে ঐ সকল শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিত এবং ঐরূপ উপা-খ্যানের মুদ্রিত গ্রন্থ বা পুঁথি পাইলে, কখন কখন উহা স্বহস্তে লিখিয়াও লইত। গদাধরের স্বহস্তলিখিত রাম-কৃষ্ণায়ন পুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা প্রভৃতি আমরা কামারপুকুরের বাটীতে অনুসন্ধানে দেখিতে পাইয়া ঐ বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। ঐ সকল উপাখ্যানও যে, বালক অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রামের সরলচিত্ত নরনারীর নিকটে এইকালে বহুবার অধ্যয়ন ও আবৃত্তি করিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গণিতশাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা, আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ

দেববাণী।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

২৯শে জুলাই, সোমবার, প্রাতঃকাল।

আমরা কখন কখন কোন জিনিসের লক্ষণ করতে হলে তার আশপাশের কতকগুলি ব্যাপার বর্ণনা করে থাকি। একে তটস্থ লক্ষণ বলে। আমরা যখন ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন সেই অনির্ব্বাচ্য সর্ব্বাতীত সত্তারূপ সমুদ্রের কিনারার কিছু কিছু বর্ণনা কর্‌ছি মাত্র। আমরা উহাকে 'অস্তি'স্বরূপও বল্‌তে পারি না, কারণ, অস্তি বল্‌তে গেলেই তার বিপরীত 'নাস্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, সুতরাং উহাও আপেক্ষিক। তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা ঠিক ঠিক হতে পারে না। কেবল 'নেতি' 'নেতি'—ইহা নহে, ইহা নহে, এই বলেই তাঁকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ, তাঁকে চিন্তা করতে গেলেও সীমাবদ্ধ কর্‌তে হয়—সুতরাং সেটা আর ব্রহ্মের যথার্থ ভাব হল না।

ইন্দ্রিয়গুলো দিবারাত্র তোমায় ভুলজ্ঞান এনে দিয়ে প্রতারিত কর্‌ছে। বেদান্ত অনেককাল পূর্ব্বেই এই বিষয় আবিষ্কার করেন। আধুনিক বিজ্ঞান এই সবে ঐ তত্ত্বটী বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছে। একটা ছবির প্রকৃতপক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিটাতে কৃত্রিমভাবে গভীরতার ভাব ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণার অনুকরণ করে থাকেন। দুজন লোক কখনও এক জগৎ দেখে না। চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ হলে তুমি দেখ্‌তে পাবে,—কোন বস্তুতে কোন প্রকার গতি,—কোন প্রকার পরিণাম নাই। কোন প্রকার গতি বা পরিণাম আছে, আমাদের এই ধারণাই মায়া। সমুদয় প্রকৃতিটা অর্থাৎ সমুদয় গতির তত্ত্বটাকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর। দেহ ও মন কেহই আমাদের যথার্থ আত্মা নহে—উভয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত; কিন্তু কালে আমরা উহাদের ভিতরের সার সত্য—যথার্থ তত্ত্বকে জানতে পারি। তখন আমরা দেহমনের পারে চলে যাই, সুতরাং দেহমনের দ্বারা যা কিছু অনুভব হয়, তাও চলে

যায়। যখন তুমি এই জগৎপ্রপঞ্চকে দেখ্‌তে পাবে না, বা জান্‌তে পার্‌বে না, তখনই তোমার আত্মোপলব্ধি হবে। আমাদের বাস্তবিক প্রয়োজন এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। অনন্ত মন বা অনন্ত জ্ঞান বলে কিছু নেই, কারণ, মন ও জ্ঞান উভয়ই সসীম। আমরা এক্ষণে আবরণের মধ্য দিয়ে দেখ্‌ছি—তার পর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে আমরা আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সার সত্যস্বরূপ সেই অজ্ঞাত বস্তুর কাছে পৌঁছুব।

যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একখানা ছবি দেখি, তা হলে আমরা ঐ ছবির সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লাভ করি, কিন্তু তথাপি আমরা যা দেখি, তা বাস্তবিক ছবিটাই বটে। ছিদ্রটা আমরা যত বাড়াতে থাকি, ততই আমরা ছবিটার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ কর্‌তে থাকি। আমাদের নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করে থাকি। আবার যখন আমরা কার্ডবোর্ডখানা ফেলে দিই, আমরা সেই একই ছবি দেখে থাকি, কিন্তু ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখ্‌তে পাই। আমরা ঐ ছবিটাতে যত বিভিন্নপ্রকার গুণ বা ভ্রমাত্মক ধারণা আরোপ করি না কেন, ছবিটার তার দ্বারা কিছু অদলবদল হয় না। এইরূপ আত্মাই সকল বস্তুর মূল সত্যস্বরূপ—আমরা যা কিছু দেখ্‌ছি, সবই আত্মা; কিন্তু আমরা যে ভাবে উহাদের নামরূপাকারে দেখ্‌ছি, সে ভাবে নয়। ঐ নামরূপ আবরণের অন্তর্গত, উহা মায়ার অন্তর্গত।

ঐগুলি যেন দূরবীণের কাচের উপরের দাগ—আবার যেমন সূর্য্যের আলোকের দ্বারাই আমরা ঐ দাগগুলি দেখ্‌তে পাই, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্য বস্তু পশ্চাতে না থাক্‌লে আমরা মায়াটাকেও দেখ্‌তে পেতাম না। স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা ঐ দূরবীণের কাচের উপরকার দাগ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমি সত্যস্বরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সত্য-বস্তুটাই আমাকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখ্‌তে সমর্থ কর্‌ছে। সকল ভ্রমের মূলীভূত সার সত্তা আত্মা—আর যেমন সূর্য্য কখন ঐ কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে মিশিয়ে যায় না, উহা আমাদিগকে দাগগুলিকে

দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাও কখন নামরূপের সঙ্গে মিশিয়ে যান না। আমাদের শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমূহ ঐ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু উহারা আমাদের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মনের দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেল। তা হলেই আমরা দেখ্‌ব—'আমি ও আমার পিতা এক।'

প্রত্যক্ষানুভূতি আমরা আগে করি, যুক্তিবিচার পরে এসে থাকে। এই প্রত্যক্ষানুভূতি আমাদিগকে লাভ করতে হবে, আর উহাই বাস্তবিক ধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্ম্মমত বা অবতারের কথা না শুনে থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি প্রত্যক্ষানুভূতি করে থাকে, তার আর কিছুর দরকার নেই। চিত্ত শুদ্ধ কর—ধর্ম্মের এই হচ্ছে সার কথা, আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ না মনের ঐ দাগগুলো দূর করছি, ততক্ষণ আমরা সেই সত্যস্বরূপকে ঠিক ঠিক দর্শন করতে পারি না। শিশু জগতের ভিতর কোন পাপ দেখতে পায় না, কারণ, বাইরের পাপটার পরিমাণ নির্ণয় করবার কোন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর নেই। তোমার ভিতর যে দোষগুলি আছে, সব দূর করে ফেল—তা হলেই তুমি আর বাইরে কোন দোষ দেখতে পাবে না। ছোট ছেলের সাম্‌নে ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, সে তাতে খেয়ালই করে না—উহা তার কাছে কিছু একটা অন্যায় বলে বোধ হয় না। ধাঁধার ছবির ভিতর লুকোনো জিনিসটা একবার যদি দেখতে পাও, তুমি পরে সর্ব্বদাই উহা দেখতে পাবে। এইরূপ যখন তুমি একবার মুক্ত ও নির্দ্দোষ হয়ে গেলে, তখন জগৎ-প্রপঞ্চের ভিতর তুমি মুক্তি ও শুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই মুহূর্ত্তেই হৃদয়ের গ্রন্থি সব ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাঁকা-চোরা জায়গা সিধা হয়ে যায়, আর এই জগৎপ্রপঞ্চও স্বপ্নের ন্যায় উড়ে যায়। আর ঘুম ভাঙ্গলেই, আমরা যে এই সব বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম, এই ভেবেই আমরা আশ্চর্য্য হই।

"যাঁকে লাভ করে পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখও হৃদয়কে বিচলিত করতে পারে না," তাঁকে লাভ করতে হবে।

জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্রদ্বয়কে পৃথক্ করে ফেল—তা হলেই আত্মা মুক্তস্বরূপ হয়ে পৃথগ্‌ভাবে দাঁড়াতে পার্‌বে, যদিও পুরাতন বেগে দেহমনরূপ চক্র খানিক ক্ষণের জন্য চল্‌বে। তবে এখন চাকাটী সোজাই চল্‌বে অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা শুভকার্য্যই হবে। যদি সেই শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ কার্য্য হয়, তা হলে জেনো, সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নয়—যদি সে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলে দাবি করে, তবে সে মিথ্যা কথা বলছে। এটাও বুঝ্‌তে হবে যে, যখন চিত্তশুদ্ধির দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই সময়ই তার উপর কুড়ুল চালান সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কর্ম্মই অজ্ঞানের উপর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঘা মার্‌ছে। অপরকে পাপী বলার চেয়ে আর মন্দ কার্য্য কিছু নাই। ভাল কাজ না জেনে কর্‌লেও তার ফল একই প্রকার হয়—উহা বন্ধন-মোচনে সহায়তা করে।

দূরবীণের কাচের দাগগুলি দেখে সূর্য্যকেও দাগযুক্ত মনে করাই আমাদের মুখ্য ভ্রম। সেই 'আমি'রূপ সূর্য্য কোন প্রকার বাহ্যদোষে লিপ্ত নন—এইটী জেনে রাখ, আর নিজেকে ঐ দাগগুলি তুল্‌তে নিযুক্ত কর। মানুষের চেয়ে বড় প্রাণী আর কেউ নেই। কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মনুষ্যের উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। তোমার যা কিছুর অভাব বোধ হয়, তাই তুমি সৃষ্টি করে থাক—বাসনামুক্ত হও। "বাসনায় জগৎ সৃজন, কর জীব বাসনা বর্জ্জন।"

দেবতারা ও পরলোকগত ব্যক্তিরা সকলেই এখানে রয়েছেন—এই জগৎকেই তাঁরা স্বর্গ বলে দেখ্‌ছেন। একই অজ্ঞাতবস্তুকে সকলে নিজ নিজ মনের ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখ্‌ছে। এই পৃথিবীতেই কিন্তু ঐ অজ্ঞাত বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দর্শন লাভ হতে পারে। কখন স্বর্গে যাবার ইচ্ছা করো না—উহাই সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও খুব বেশী পয়সা থাকা ও ঘোর দারিদ্র্য—উভয়ই বন্ধন—উভয়ই আমাদিগকে ধর্ম্মপথ থেকে—মুক্তিপথ থেকে দূরে রাখে। তিনটী জিনিস এ পৃথিবীতে বড় দুর্লভ—প্রথম, মনুষ্যদেহ। মনুষ্যমনেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রতিবিম্ব বিদ্যমান—বাইবেলে আছে, "মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ"।) দ্বিতীয়, মুক্ত

হবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয়, মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ—যিনি স্বয়ং মায়া-মোহ-সমুদ্র পার হয়ে গেছেন, এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে লাভ।* এই তিনটী যদি পেয়ে থাক, তবে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও, তুমি মুক্ত হবেই হবে।

কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা তোমার যে সত্যের জ্ঞান লাভ হয়, তা একটা নূতন যুক্তিতর্কের দ্বারা উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব কর, তা তোমার কোনকালে যাবার নয়। ধর্ম্মসম্বন্ধে কেবল বচন-বাগীশ হলে কিছু ফল হয় না। যে কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসবে—যেমন মানুষ, জানোয়ার, আহার, কাজকর্ম্ম—সকলের পশ্চাতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর—আর এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি করাকে একটা অভ্যাসে পরিণত কর।

(আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী) ইঙ্গারকোল আমায় একবার বলেন,—"এই জগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে, তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলা লেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বার করে নিতে হবে—যেন এক ফোঁটা রসও বাদ না যায়—কারণ, আমরা এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্বসম্বন্ধে সুনিশ্চিত নই।" আমি তাঁকে উত্তর দিছলাম—"আমি আপনার চেয়ে এই জগৎরূপ কমলা লেবুটাকে নিংড়াবার উৎকৃষ্টতর প্রণালী জানি—আর আমি এ থেকে বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নাই, সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নাই—আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নাই—সুতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে আনন্দ করে নেংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্ত্তব্য নাই, আমার স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষয়সম্পত্তির কোন বন্ধন নাই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাস্‌তে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান্ বলে ভালবাস্‌লে কি আনন্দ—একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলা লেবুটাকে এইভাবে নেংড়ান্ দেখি—অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার গুণ রস পাবেন—এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।"

* দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥
—বিবেকচূড়ামণি

যাকে আমাদের 'ইচ্ছা' বলে মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তরালস্থ আত্মা—উহা প্রকৃতপক্ষে মুক্তস্বভাব।

সোমবার, অপরাহ্ন।

যীশুখ্রীষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ, তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তদনুসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেন নাই, আর সর্বোপরি, তিনি নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নাই। স্ত্রীলোকেরাই তাঁর জন্য সব কর্‌লে, কিন্তু তিনি য়াহুদীদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি 'প্রেরিত শিষ্য' (Apostle) পদে উন্নীত করেন নাই। তথাপি উচ্চতম চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই তাঁর স্থান—আবার বুদ্ধও যে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিলেন, তাও নয়। যাই হক্, বুদ্ধ ধর্মে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমাধিকার স্বীকার করেছিলেন, আর তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর প্রথম ও একজন প্রধান শিষ্য। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনায়িকা হয়েছিলেন। আমাদের কিন্তু এই সকল মহাপুরুষদের দোষানুসন্ধান করা উচিত নয়, আমাদের শুধু তাঁহাদিগকে আমাদের চেয়ে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করা উচিত। তা হলেও কিন্তু, যত বড়ই হন না কেন, কোন মানুষের উপরই, আমাদের বিশ্বাস মাত্র রেখে পড়ে থাকলেই চল্‌বে না, আমাদেরও বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হতে হবে।

কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার করা উচিত নয়। মানুষের যে মহা মহা সদ্‌গুণ দেখা যায়, তা তার নিজের, কিন্তু তার দোষগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণ দুর্ব্বলতামাত্র ; সুতরাং তার চরিত্র বিচার করতে গেলে সেগুলি কখন গণনা কর্‌তে নেই।

* * * *

ইংরাজী ভার্চু (ধর্ম্ম) শব্দটী সংস্কৃত 'বীর' শব্দ থেকে এসেছে ; কারণ, প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকেই লোকে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক লোক বলে বিবেচনা করত।

৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার।

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ প্রভৃতি—এঁরা কেবল বহিরবলম্বনস্বরূপ। আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহকে ঐ সকল অবলম্বনে আমরা আরোপ করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রার্থনার আমরাই উত্তর দিয়ে থাকি।

যীশু যদি না জন্মাতেন, তবে মনুষ্যজাতির কখন উদ্ধার হত না, এরূপ ভাবা ঘোর নাস্তিকতা। মনুষ্যস্বভাবের ভিতর যে ঐশ্বরিক ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে, উহাকে ঐরূপে ভুলে যাওয়া বড় ভয়ানক—ঐ ঐশ্বরিক ভাব কোন না কোন সময়ে প্রকাশ হবেই হবে। মনুষ্যস্বভাবের মহত্ত্ব কখনও ভুলো না। ভূত বা ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ঈশ্বর আর কেউ হন নি, হবেনও না। আমিই সেই 'অনন্ত মহাসমুদ্র—খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তারই তরঙ্গ মাত্র। তোমার নিজের পরমাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নুইও না। যতক্ষণ না তুমি আপনাকে সেই দেবদেব বলে জান্‌তে পারছ, ততক্ষণ তোমার কখন মুক্তি হতে পারে না।

আমাদের সকল অতীত কর্ম্মই বাস্তবিকই ভাল, কারণ, আমাদের যা চরমাবস্থা হবে, ঐ কর্ম্মগুলিই আমাদের সেইখানে নিয়ে যায়। কার কাছে আমি ভিক্ষা করব?—আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমিই সমগ্র সমুদ্র—তুমি নিজে ঐ সমুদ্রে যে একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, তাকে 'আমি' বলো না। উহা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জেনো। সত্যকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য যাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছে) শুন্‌তে পেলেন—তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরীণ বাণী তাঁকে বল্‌ছে, "তুমি অনন্তস্বরূপ, সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে। নিজেকে সংযত কর, করে তোমার যথার্থ আত্মার বাণী শোন।"

যে সকল মহাপুরুষ প্রচারকার্য্যের জন্য প্রাণপাত করে যান—তাঁরা, যে সকল মহাপুরুষ নির্জ্জনে নীরবে মহাপবিত্র জীবন যাপন করে এবং বড় বড় ভাব চিন্তা করে যান ও ঐরূপে জগতের সাহায্য করেন, তাঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ। ঐ সকল শান্তিপ্রিয় নির্জ্জনবাসী মহাপুরুষের একের পর অপরের আবির্ভাব হয়—শেষে তাঁদের শক্তিরই চরমফলস্বরূপ এমন এক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি সেই তত্ত্বগুলি চারিদিকে প্রচার করে বেড়ান।

* * * * *

জ্ঞান স্বতঃই বর্ত্তমান র'য়েছে, মানুষ কেবল উহা আবিষ্কার করে

মাত্র। বেদসমূহই এই চিরন্তন জ্ঞান—যার সহায়তায় ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্ব কয়ে থাকেন আর এই ভয়ানক দাবিও করে থাকেন।

*   *   *   *

সত্য যা, তা সাহসপূর্ব্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে বল—ঐ সত্য-প্রকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হল বা না হল, সে দিকে খেয়াল করো না। সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান্ লোকদের পক্ষেও যদি অতি-মাত্রায় প্রখর বোধ হয়, তাঁরা যদি উহা সহ্য কর্‌তে না পারেন, সত্যের বন্যায় যদি তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় ত যাক্—যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল। ছেলেমানুষী ভাব সব শিশুদের ও বুনো অসভ্যদেরই শোভা পায়; কিন্তু দেখা যায়, ঐ সব ভাব কেবল শিশুমহলে বা জঙ্গলেই আবদ্ধ নয়, ঐ সকল ভাবের অনেকগুলি ধর্ম্মপ্রচারকের আসনেও উঠেছে।

বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হলে আর সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা অন্যায়। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর।

উন্নতি যা কিছু, তা এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই হয়ে থাকে। মানবদেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্ব্বোচ্চ প্রাণী, কারণ, এই মানবদেহে এই জন্মেই আমরা এই আপেক্ষিক জগৎ হতে সম্পূর্ণরূপে বাহিরে যেতে পারি, সত্য সত্যই মুক্তির অবস্থা লাভ কর্‌তে পারি, আর ঐ মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। শুধু যে আমরা পারি তা নয়, অনেকে সত্য সত্যই ইহ জীবনে মুক্তাবস্থা লাভ করেছেন, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং কেহ এ দেহ ত্যাগ করে যতই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করুক, সে তখনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরই রয়েছে, সে আর আমাদের অপেক্ষা বেশী কিছু কর্‌তে পারে না, কারণ, মুক্তিলাভ করা ছাড়া আর উচ্চাবস্থা কি লাভ করা যেতে পারে?

দেবতারা (angels) কখনও কোন অন্যায় কাজ করে না, তারা কাজেই শাস্তিও পায় না; সুতরাং তারা মুক্ত হতেও পারে না। সংসারের ধাক্কাতেই

আমাদিগকে জাগিয়ে দেয়, তাইতেই এই জগৎস্বপ্ন ভাঙ্গ্‌বার সাহায্য করে। ঐরূপ ক্রমাগত আঘাতই এই জগতের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়ে দেয়, তাইতে আমাদের এ সংসার থেকে পালাবার, মুক্তিলাভ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়।

* * * *

কোন বস্তু যখন আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তখন আমরা তার এক নাম দিই, আবার সেই জিনিসকেই যখন আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তার অন্য নাম দিই। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলব্ধিও তত উৎকৃষ্টতর হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়।

মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ।

আমরা যে জড় ও চিন্তারাশির ভিতর সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাই, তার কারণ, উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর দুটী দিক্‌মাত্র, সেই জিনিসটাই দুভাগ হয়ে বাহ্য ও আন্তর হয়েছে।

ইংরাজী প্যারাডাইস্‌ শব্দটী সংস্কৃত 'পরদেশ' শব্দ থেকে এসেছে, ঐ শব্দটা পারস্য ভাষায় চলে গিছ্‌ল—উহার শব্দার্থ হচ্ছে দেশের পারে, অথবা অন্য দেশ, বা অন্য লোক। প্রাচীন আর্য্যেরা বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস কর্‌তেন, তাঁরা মানুষ কেবল দেহমাত্র বলে কখন ভাব্‌তেন না। তাঁদের মতে স্বর্গ নরক উভয়ই সান্ত, কারণ, কোন কার্য্যই কখন তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হতে পারে না, আর কোন কারণই কখন চিরস্থায়ী নয়; সুতরাং কার্য্য বা ফল মাত্রেরই নাশ হবেই। নিম্নকথিত উপাখ্যানটীতে সমগ্র বেদান্তদর্শনের সার রয়েছে—

সোনার পাখাওয়ালা দুটী পাখী একটা গাছে বসে আছে। উপরে যে পাখীটা বসে আছে, সে স্থির শান্তভাবে নিজ মহিমায় নিজে বিভোর হয়ে রয়েছে; আর যে পাখীটা নীচের ডালে রয়েছে, সে সদাই চঞ্চল—ঐ গাছের ফল খাচ্ছে—কখনও মিষ্ট ফল, কখনও বা কটু ফল খাচ্ছে। একবার সে একটা অতিরিক্ত কটু ফল খেলে, তখন সে একটু স্থির হয়ে উপরের সেই মহিমময় পাখীটার দিকে চাইলে। কিন্তু আবার সে

শীঘ্রই তাকে ভুলে গিয়ে পূর্ব্বের মত সেই গাছের ফল খেতে লাগ্‌ল। আবার সে একটা কটু ফল খেলে—এইবার সে টুপ্‌ টুপ্‌ করে লাফিয়ে উপরের পাখীটার দু এক ডাল কাছে গেল। এইরূপ অনেকবার হল, অবশেষে নীচের পাখীটা একেবারে উপরের পাখীটার জায়গায় গিয়ে বস্‌ল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ল। সে অমনি বুঝ্‌লে যে, দুটো পাখী কোন কালেই ছিল না, সে নিজেই বরাবর সেই শান্ত, স্থিরভাবে নিজ মহিমায় নিজে মগ্ন উপরের পাখীই ছিল

৩১শে জুলাই, বুধবার।

প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্মসংস্থাপক লুথার ধর্ম্মসাধনের ভিতর থেকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার করে ধর্ম্ম জিনিসটার সর্ব্বনাশ করে গেলেন। নাস্তিক ও জড়বাদীরাও নীতিপরায়ণ হতে পারে, কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসীরাই ধর্ম্মলাভ করতে পারে।

মহাপুরুষদের পবিত্রতার মূল্য, সমাজ যাদের অসৎ বলে থাকে তারাই দিয়ে থাকে—সুতরাং তাদের দেখ্‌লে তাদের ঘৃণা না করে ঐ কথা ভাবা উচিত। যেমন গরিব লোকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে বড় লোকের বিলাসিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও তদ্রূপ। ভারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, সেটা মীরাবাই, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের উৎপাদনের জন্য, যেন প্রকৃতিকে তার মূল্য ধরে দিতে হয়েছে।

* * * *

"আমিই পবিত্রাত্মা বা ধার্ম্মিকদের পবিত্রতা বা ধর্ম্মস্বরূপ।" "আমিই সকলের মূল বা বীজস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিই উহার বিভিন্নপ্রকার ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু সবই আমি।" "আমিই সব কর্‌ছি, তুমি নিমিত্তমাত্র।" গীতা।

বেশী বকো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্মা রয়েছেন, তাঁকে অনুভব কর, তবেই তুমি জ্ঞানী। ইহাই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। জানবার বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, উহাই সব।

*   *   *   *

সত্ত্ব মানুষকে সুখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বদ্ধ করে, রজঃ বাসনা দ্বারা বদ্ধ করে, তমঃ ভ্রমজ্ঞান, আলস্য প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ করে। রজঃ তমঃ এই দুটী নিকৃষ্টগুণকে সত্ত্বের দ্বারা জয় কর, তার পর সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ করে মুক্ত হও।

ভক্তিযোগী অতি শীঘ্র ব্রহ্মোপলব্ধি করেন ও তিন গুণের পারে চলে যান।

ইচ্ছা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়, বাসনা, রিপু—এইগুলি মিলে, আমরা যাকে জীবাত্মা বলে থাকি, তাই হয়েছে।

প্রথম, প্রাতিভাসিক আত্মা (দেহ); দ্বিতীয়, মানসাত্মা—যে দেহটাকে আমি বলে মনে করে; তৃতীয়, যথার্থ আত্মা, যিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তাঁকে আংশিকভাবে দেখ্‌লে প্রকৃতি বলে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাবে দেখ্‌লে সমস্ত প্রকৃতিই উড়ে যায়; এমন কি, উহার স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ হয়ে যায়। প্রথম—পরিণামী ও অনিত্য, দ্বিতীয়—প্রবাহরূপে নিত্য (প্রকৃতি), তৃতীয়—কূটস্থ নিত্য (আত্মা)।

*   *   *   *

আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, ইহাই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। আশা কর্‌বার কি আছে? আশার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল, নিজের আত্মার উপর দাঁড়াও, স্থির হও; যাই কর, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্তু তার ভিতর কোন কপটতা রেখো না।

ভারতে কারও কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌তে 'স্বস্থ' (যা থেকে 'স্বাস্থ্য' কথাটা এসেছে) এই সংস্কৃত শব্দটার ব্যবহার হয়ে থাকে—স্বস্থ শব্দের অর্থ স্ব অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। হিন্দুরা কোন জিনিস দেখেছে, এই ভাব প্রকাশ কর্‌তে গেলে বলে থাকে, 'আমি একটা পদার্থ দেখেছি।' 'পদার্থ' কি না পদ বা শব্দের অর্থ অর্থাৎ শব্দপ্রতিপাদ্য ভাববিশেষ। এমন কি এই জগৎপ্রপঞ্চটা তাদের কাছে একটা 'পদার্থ' (অর্থাৎ পদের অর্থ)।

জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ আপনা আপনি শুভ কার্য্যই করে থাকে। উহা কেবল শুভ কার্য্যই কর্‌তে পারে, কারণ, উহা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। যে অতীত সংস্কাররূপ বেগের দ্বারা দেহচক্র পরিচালিত হয়, তা সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংস্কার সব দগ্ধ হয়ে গেছে।

* * * *

"যদচ্যুতকথালাপরসপীযূষবর্জ্জিতম্।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্॥"

সেই দিনকেই যথার্থ দুর্দ্দিন বলা যায়, যে দিন আমরা ভগবৎপ্রসঙ্গ না করি; কিন্তু যে দিন মেঘ ঝড় বৃষ্টি হয়, সে দিনকে প্রকৃত পক্ষে দুর্দ্দিন বলা যায় না।

সেই পরম প্রভুর প্রতি ভালবাসাকেই যথার্থ ভক্তি বলা যায়। অন্য কোন পুরুষের প্রতি, তিনি যত বড়ই হন না কেন, ভালবাসাকে ভক্তি বলা যায় না। এখানে পরম প্রভু বলতে পরমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে। তোমরা পাশ্চাত্য দেশে Personal God বা ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বর বলতে যা বোঝ, ভারতে পরমেশ্বরের ধারণা তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। "যাঁ থেকে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হচ্ছে, যাঁতে ইহা স্থিত রয়েছে, আবার প্রলয়কালে যাঁতে লয় হয়, তিনিই ঈশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বশক্তিমান্‌, সদামুক্তস্বভাব, দয়াঘন, সর্ব্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।"

মানুষ নিজের মস্তিষ্ক থেকে ভগবান্‌কে সৃষ্টি করে না; তবে তার যতদূর শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখ্‌তে পারে, আর তার যত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধারণা, তাঁতে আরোপ করে। এই এক একটী গুণই ঈশ্বরের সবটাই, আর এই এক একটী গুণের দ্বারা সবটাকে বোঝানই বাস্তবিক ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরের দার্শনিক ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তাঁর সব আকার রয়েছে; তিনি নির্গুণ, আবার তাঁতে সব গুণ রয়েছে। আমরা যতক্ষণ মানবভাবাপন্ন রয়েছি, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীব—এই তিনটী সত্তা আমাদের দেখ্‌তে হয়। তা না দেখে থাক্‌তেই পারি না।

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই সকল দার্শনিক পার্থক্য কেবল বাজে কথা মাত্র। সে যুক্তি বিচার মোটে গ্রাহ্যই করে না, সে বিচার করে না—

সে দেখে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেমে আত্মহারা হয়ে যেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে গেছেন, যাঁরা বলেন, মুক্তির চেয়ে ঐ অবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যাঁরা বলেন, "চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি"—আমি সেই প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে চাই, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাই।

ভক্তিযোগে প্রথম বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপটভাবে ও প্রবলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই, কারণ বহির্জ্জগৎ থেকেই আমাদের সব বাসনা পূরণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন আমরা ঈশ্বরের জন্য কোন অভাববোধ করি না; কিন্তু যখন আমরা এ জীবনে চারিদিক থেকে প্রবল ঘা খেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বস্তুতেই নিরাশ হই, তখনই উচ্চতর কোন বস্তুর জন্য আমাদের প্রয়োজন বোধ হয়ে থাকে, তখনই আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে থাকি।

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙ্গে চুরে দেয় না, বরং ভক্তিযোগের শিক্ষা এই যে, আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মুক্তিলাভ করবার উপায়স্বরূপ হতে পারে। ঐ সব বৃত্তিগুলিকেই ঈশ্বরাভিমুখী করতে হবে—সাধারণতঃ যে ভালবাসা অনিত্য ইন্দ্রিয়বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে হবে।

তোমাদের পাশ্চাত্যধর্ম্মের ধারণা হতে ভক্তির এইটুকু তফাৎ যে, ভক্তিতে ভয়ের স্থান নাই—ভক্তিদ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ শান্ত বা কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না। এমন কি, এমন ভক্তও সব আছেন, যাঁরা ঈশ্বরকে তাঁদের নিজের ছেলে বলে উপাসনা করে থাকেন—এরূপ উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ উপাসনায় ভয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোন ভাব না থাকে। প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকতে পারে না, আর যতদিন পর্য্যন্ত এতটুকু ভয় থাকবে, ততদিন ভক্তির আরম্ভ পর্য্যন্ত হতে পারে না। আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়া অথবা তাঁর সঙ্গে কেনাবেচার ভাব কিছু নাই। ভগবানের কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ।

ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা ঐশ্বর্য্য, এমন কি, স্বর্গ পর্য্যন্ত কামনা করেন না।

যিনি ভগবান্‌কে ভালবাস্‌তে চান, ভক্ত হতে চান, তাঁকে ঐ সব বাসনাগুলি একটা পুঁটুলি করে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ঢুক্‌তে হবে। যিনি সেই জ্যোতির্‌ রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁকে উহার দরজায় ঢুক্‌তে গেলে আগে দোকানদারী-ধর্ম্মের পুঁটুলি করে তাকে বাইরে ফেলে আস্‌তে হবে। একথা বল্‌ছি না যে, ভগবানের কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না—সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐরূপ প্রার্থনা করা অতি নীচু দরের ধর্ম্ম, ভিখারীর ধর্ম্ম।

'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।'

সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস করে জলের জন্য কুয়া খোঁড়ে।

সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ, যে হীরার খনির কাছে এসে কাচের মালা খুঁজ্‌তে লেগে যায়।

এই সব আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ঐহিক অভ্যুদয়ের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না—এগুলি অতি নীচু দরের কর্ম্ম। ভক্তি এর চেয়ে উচু জিনিস। আমরা রাজার রাজার সাম্‌নে আস্‌বার চেষ্টা করছি। আমরা সেখানে ভিখারীর বেশে যেতে পারি না। যদি আমরা কোন মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হতে ইচ্ছা করি, ভিখারীর মত ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে সেথায় কি ঢুক্‌তে দেবে? কখনই নয়। দরওয়ান আমাদিগকে ফটক থেকে বার করে দেবে। ভগবান্‌ রাজার রাজা—আমরা তাঁর সাম্‌নে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। দোকানদারদের তথায় প্রবেশ নাই—সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চল্‌বে না। তোমরা বাইবেলেও পড়েছ, যীশু ক্রেতাবিক্রেতাদিগকে মন্দির থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হবার জন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, স্বর্গাদির কামনা একেবারে দূর করে দেওয়া। এরূপ স্বর্গ এই জায়গারই, এই পৃথিবীরই মত—না হয় এর চেয়ে একটু ভাল। খ্রীষ্টিয়ান্‌দের স্বর্গের ধারণা এই যে, 'উহা একটা খুব বেশী ভোগের স্থানমাত্র—উহা

কিরূপে ভগবান্ হতে পারে? এই যে সব স্বর্গে যাবার বাসনা ভোগসুখেরই কামনা। এ বাসনা ত্যাগ কর্‌তে হবে। ভক্তের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—নিজের জন্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা হবে না।

সুখদুঃখ, লাভক্ষতি—এসকলের গণনা ত্যাগ করে দিবারাত্রি ঈশ্বরোপাসনা কর—এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা নষ্ট না হয়।

আর সব চিন্তা ত্যাগ করে দিবারাত্রি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপাসনা কর।

এইরূপে দিবারাত্রি উপাসিত হলে, তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাঁর উপাসকদিগকে তাঁর অনুভবে সমর্থ করেন। (ক্রমশঃ)

ভারতের সাধনা।

শেষকথা।

পুরাকালে ভগীরথ যেমন গঙ্গা আনিয়াছিলেন, সেইরূপ ইতিহাস মানুষের দ্বারা নানা দেশে নানা রকমের সাধনার ধারা বহাইয়া আনিয়াছেন। কিন্তু ভারতের যে সাধনার ধারা আদিযুগ হইতে বহিয়া আসিয়াছে, তাহার উপমা নাই, তুলনা নাই। এ ধারা যেমন বিপুল, যেমন গভীর, যেমন অবিচ্ছিন্নগতি, যেমন বিশ্ববিস্তৃত-প্রভাব, আর কোনও দেশের সাধনা-ধারা সেরূপ নহে। যাঁহারা বলেন—ভারতের ইতিহাস নাই, তাঁহারা অন্ধ ; যাঁহারা পাশ্চাত্যেতিহাস-লব্ধ দৃষ্টিতে ভারতেতিহাস আবিষ্কার করিতে যান, তাঁহারা শুধু অন্ধ নহেন, আরও কিছু। ভারতে ইতিহাস গড়িবার মালমশলা আলাদা, প্রণালী আলাদা, আদর্শ আলাদা, কারিগর আলাদা। আমরা চতুর্দ্দশটী প্রবন্ধে এ সব কথার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। ভারতের ইতিহাস আজ আমাদের কোন্ স্থানে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, এখন তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিচার করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধপর্য্যায়ের চরম উপসংহার করিব।

ভারতের সাধনাস্রোত বন্ধুর অতীতকালহিমাদ্রি অতিক্রম করিয়া আজ

বর্ত্তমান যুগভূমির উপর নিপতিত হইতেছে। শিবের মত এই বিপুল ধারা শিরে ধারণ করিয়াছেন সমাধিবিধৃতাসন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, আর সেই ধারাকে যুগোচিত বিচিত্র কর্ম্মখাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন শ্রীমদাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ। আধুনিক যুগভূমির উপর ভারতের সাধনা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতের যাহা কিছু সনাতন, যাহা কিছু এককালে ছিল কিন্তু বীজ রাখিয়া নষ্ট হইয়াছে, সবই আজ ঐ প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের দখলে আসিয়াছে। এখন বাকি কেবল সে সমস্তকে আয়ত্ত করা। কালতরঙ্গাঘাতে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত হইলেও আজ ভারতবাসীর আর ভয় নাই; কেন না, দাঁড়াইবার জমি, বাস করিবার ঘর তাহার জন্য প্রস্তুত। আজ তাহাকে কেবল জাগিতে হইবে, জানিতে হইবে, আপনার বুঝিয়া লইতে হইবে। আবার বলি—ভারতে যুগে যুগে, নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া, বারংবার নানা দিক্ হইতে শাখাস্রোতসকল আত্মসাৎ করিয়া, যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সাধনাস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার কিছুই নষ্ট হয় নাই। সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ভাবে সেই স্রোত আজ আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত। অতএব অতীতের দিকে চাহিয়া হা হুতাশ করিবার আর প্রয়োজন নাই, পশ্চাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সম্মুখের কর্ত্তব্য আর অবহেলা করিতে হইবে না, উদ্দীপনা ও প্রেরণার উৎস খুঁজিবার জন্য আর অতীতারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। বুঝিবার ও কাজে লাগাইবার নিতান্ত উপযোগী হইয়া অতীত আজ আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে। সংযোগের এই যে মহাকেন্দ্র, ইহাতে শক্তি ও সাধনার সমস্ত প্রাচীন উৎস একযোগে আপনাদিগকে সংযোজিত করিয়া দিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণতা লাভ করিয়া ভারতের সাধনা এই মহাকেন্দ্র হইতে অভূতপূর্ব্ব গৌরবে আত্মপ্রকাশ করিবে, সন্দেহ নাই।

ভারতের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের আদর্শগুলিকে নানা পথ দিয়া ইতিহাস পরিচালিত ও সংগঠিত করিয়া আনিয়াছে। তাহারা যখন ভিন্ন ভিন্ন পথের যাত্রী ছিল, তখন পরস্পর হয়ত বিরোধ ঘটিয়াছে। যখন ভক্তি আপনার বিবিধ অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, তখন আপনার চারিপাশে বেড়া দিয়া জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য আদর্শগুলির

সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে; আবার জ্ঞানও আপনার তত্ত্বদৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য বিচারের প্রাচীর তুলিয়া ভক্তিমার্গের সাধন ও বিশ্বাসগুলিকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। এইভাবে এক সম্প্রদায় হইতে আর এক সম্প্রদায়,—গৃহী হইতে সন্ন্যাসী,—বৈষ্ণব হইতে শাক্ত,—কর্ম্মপন্থী হইতে জ্ঞানী—পরস্পর-বিশ্লিষ্ট, এমন কি প্রয়োজনমত পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়া পরমার্থ-সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে দৃঢ়িষ্ঠ ও পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ সঙ্কীর্ণতার ভিতর দিয়া ভারতের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে ইতিহাস এক মহাসঙ্গমের দিকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু পরমহংসদেবের আবির্ভাবে আজ যে মহাসমন্বয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া পরমার্থ-সাধনার আদর্শগুলি পূর্ণাঙ্গ হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছে। এতদিনে ভারতেতি-হাসের সুচিরপোষিত নিগূঢ় অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে। এখন প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক আদর্শ, আপনার বিশেষত্ব সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াও, অপর সম্প্রদায়, অপর আদর্শের সহিত অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সুসমন্বিত। সে গভীর সমন্বয়ের কৌশল ও সত্যতা যদি তোমার আমার বুদ্ধিতে উপলব্ধ না হয়, তথাপি পরমহংসদেবের অলৌকিক জীবনকে উহার স্থূল নিদর্শন-রূপে (symbol রূপে) অবলম্বন করিয়া তুমি আমিও উচ্চ সমন্বয়-ভূমিতে প্রবেশাধিকার পাইব। তিনি আপনার জীবন, আপনার সাধন-সম্পদ্, আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া দেশের আপামর সাধারণকে প্রকৃতভাবে ধর্ম্মসমন্বয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তুমি জ্ঞানমার্গী, ভক্তিমার্গী বা কর্ম্মমার্গী হও, তুমি অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও,—তুমি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীশ্চান হও, তুমি বৈষ্ণব হও বা শাক্ত হও, তুমি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হও না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহার মধ্য দিয়া তুমি অপর সমস্ত সম্প্রদায়ের সহিত অবিচ্ছেদ্য মিলন-সূত্রে আবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি এখন ঘরে ঘরে দেখা যাইতেছে, কিন্তু হে দেশবাসী, যদি ঐ ছবির দিকে চাহিয়া তুমি এই মহাসম্মিলন, এই যুগ-সমন্বয় প্রাণের মধ্যে অনুভব না কর, যদি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি

দর্শনে আপনাকে সকল সম্প্রদায়ের সহিত, সকল ভারতবাসীর সহিত এক বলিয়া অনুভব না কর, তবে সে ছবি রক্ষা করা তোমার বৃথা হইয়াছে। ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন ও দুঃখমোচনের মূল উপায় একতা। সেই রাষ্ট্রীয় একতার নিদর্শনরূপে পরমহংসদেবের জীবন ও সাধনা আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। এই অতিদুর্লভ নিদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া আজ যদি আমরা সম্মিলিত না হই, তবে মিলনের—একতার আর আশা নাই।

সর্ব্বধর্ম্মমার্গের সমন্বয় একটা সামান্য কথা নহে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি বিশাল সহানুভূতি ও উদারতার দ্বারা, অতিতুঙ্গতত্ত্বশিখরস্পর্শী পাণ্ডিত্যের দ্বারা এ সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সর্ব্বসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের সাধনসম্পদ্ এই মহাসমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাতাকে আপনার মধ্যে একাধারে বিকশিত করিতে হয়—খ্রীষ্ট বুদ্ধ মহম্মদ শঙ্কর চৈতন্যাদির সাধনসম্পদ্ একটী জীবনে আয়ত্ত ও প্রতিফলিত করিতে হয়। একের মধ্যে এই সকলকে যদি আমরা খুঁজিয়া পাই, যদি খ্রীষ্টের জীবাত্মিকসর্ব্ব-সহিষ্ণু প্রেম, বুদ্ধের জীবকল্যাণমাত্রেকপ্রতিষ্ঠিত নির্ব্বাণানন্দ, মহম্মদের মরুকে কাননে পরিণত করিবার কর্ম্মাভিজ্ঞতা, শঙ্করের সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্মগ্রাহী মেধাবিত্ব, চৈতন্যের ভবদ্রবকারী মহাভাব আমরা একাধারে অভিব্যক্ত দেখিতে পাই, তবেই বুঝিব, মহাসমন্বয়ের যুগ যুগাবতারকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইয়াছে। হে মানব, অকপটচিত্তে আজ পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে যুগ ও যুগাবতার আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত কি না। এ প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া তোমার জীবন ও দেশের জীবন তুমি কোন্ পথে চালিত করিবে?

এই সমন্বয়কেন্দ্রে অবস্থিত হইয়া ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার প্রাচীন সমস্ত বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে এবং ভারতের ভাবী ইতিহাস গড়িবার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ও ব্যক্ত হইয়া প্রকৃত কর্ম্মি-বৃন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে। আধুনিক জগতে যে কোনও দেশের ইতিহাস গড়িবার জন্য একটী অভিনব কৌশল কালের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে দেশ সে কৌশল অবলম্বন না করিবে উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য বা উপায় সে খুঁজিয়া পাইবে না। এ কৌশলের নাম nationalism; একটী

চরম লক্ষ্যকে কেন্দ্ররূপে অবলম্বন করিয়া ও জীবনের কর্ম্মপ্রপঞ্চকে তাহার সাধনরূপে পরিণমিত করিয়া যখন সমস্ত দেশবাসী দেশের কল্যাণ ও উন্নতি-সাধনে সমবেতভাবে অগ্রসর হয়, তখন সেই সমষ্টিবদ্ধতাকে nationalism বলা যায়। পাশ্চাত্যে এইভাবে একটী চরমলক্ষ্য লইয়া দেশে দেশে এক একটী সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সমষ্টিগঠনের ফলে অদ্ভুত অপরিমেয় শক্তি ও কর্ম্মতৎপরতার বিকাশ হইয়াছে এবং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, ভারতবর্ষকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে ঐ সমষ্টি গঠনের কৌশল আমাদিগকেও অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এযাবৎ আমাদের দেশহিতৈষিগণ সমষ্টিগঠনের পাশ্চাত্য কৌশলটী অনুকরণ করিতে যাইয়া, সমষ্টিগঠনের পাশ্চাত্য লক্ষ্যটী পর্য্যন্ত আমাদের দেশে আমদানি করিবার চেষ্টা করিয়া আপনাদিগকে ও দেশকে বিষম ভ্রান্তির কবলে কবলিত করিতেছেন। সেই জন্য আমরা "ভারতের সাধনা"য় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতীয় সমষ্টিজীবনের লক্ষ্য বহু পুরাকাল হইতেই নিরূপিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভারতের ইতিহাস কখনও সেই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই বলিয়াই, ভারত আজও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু আজ যদি পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচাররূপ সেই সনাতন লক্ষ্যকে নববলে উদীয়মান দেশের সমষ্টিজীবনে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাজনৈতিক লক্ষ্য ও একতাকে অবলম্বন করিয়া রাজনৈতিক সমষ্টিজীবন গড়িবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোক আপনারা ক্ষেপিয়া উঠেন ও দেশকে ক্ষেপাইতে চান, তবে দেশের মৃত্যু অনিবার্য্য। সেই ভীষণ আসন্ন বিপদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন— "* * The result will be that in three generations you will be an extinct race; because the backbone of the nation will be broken, the foundation upon which the national edifice has been built will be undermined, and the result will be annihilation all round." * * ফল এই হইবে যে, তিন পুরুষে তোমরা মৃত জাতিতে পরিণত হইবে; কারণ, জাতির (নেশনের) মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে,

যে ভিত্তির উপর দেশের সমষ্টিজীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহার মূলচ্ছেদ হইবে এবং ফলে সকল দিকেই ধ্বংস দেখা দিবে।”

এ সমস্ত কেবল আবেগের কথা নহে। বাস্তবিকই মরণ-বাঁচনের সন্ধিস্থলে আমরা আজ দাঁড়াইয়া আছি। কালের আহ্বান—অগ্রসর হও; যুগধর্ম্মের আদেশ—নেশন গঠন কর। এখন দেখিতে হইবে, আমরা কোন্ পথে পদক্ষেপ করি, মরণের পথে—না বাঁচনের পথে? আমরা কোন্ রকমের nationalism (জাতীয়তা বা স্বদেশ-পরায়ণতা) গ্রহণ করিব? ইহা জীবনমৃত্যুর সমস্যা। একটী পথ রহিয়াছে—রাজনৈতিক ভাবের উপর নেশন ও সমষ্টিজীবন গঠন করা। দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এই পথে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ডাকিলেও সাড়া দেয় না। আর একটী পথ—ভারতীয় সমষ্টিজীবনের ও ব্যষ্টিজীবনের চিরন্তন লক্ষ্যকে লইয়া নেশন গঠন করা। কালে এ পথ জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও সাধন আবার উহাকে সুসংস্কৃত করিয়া আমাদের দখলে আনিয়া দিয়াছে। আচার্য্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া এই পথের পরিচয় আমরা “ভারতের সাধনা”র দিয়াছি; বহু প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে এই পথ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, কিরূপে এই পথ ধরিয়া উহাকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী বাঁচিবার পথ এবং কোন্‌টী মৃত্যুর, সে বিষয়ে কি এখনও সন্দেহ আছে?

অনেকে বলেন যে, আমরা আর এক দিক্ দিয়া মরিতে বসিয়াছি। তাঁহারা বলেন যে, একে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি, তাহার উপর অন্নাভাব, এই দুই কারণে হিন্দুরা মরিতে বসিয়াছে, তাহারা dying race; উপায়—সমাজের প্রবেশদ্বার যথাসম্ভব উন্মুক্ত কর, সমাজের ভিতরে বিধবাবিবাহাদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রীতিনীতির প্রচলন কর, ইত্যাদি। সব সমাজেই ত অন্নকষ্ট আছে, কিন্তু হিন্দুসমাজেই যখন লোকক্ষয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তখন যুক্তি এই যে ব্যাধিও সামাজিক এবং প্রতীকারও সামাজিক হওয়া চাই।

বিড়াল, কুকুর, বা আর কোনও জানোয়ারদের যদি সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে দেখা যায়, তবে বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, ঐ জন্তুদের জাতটা লোপ পাইতেছে। কিন্তু একটা দেশের সমষ্টিমানব, যাহারা শুধু খাওয়া পরা লইয়াই বাঁচে না, যাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা, আদর্শ প্রভৃতি লইয়াই পরিচয়,—তাহাদের যদি কোনও সময় বা অবস্থায় লোকসংখ্যা কমিতে থাকে, তবে ফস্ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় কি যে, ইহারা মরিতে বসিয়াছে, ইহারা dying race? যে হিন্দুরা এতকাল বাঁচিয়া আছে, তাহাদের নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমের একটা সমষ্টিজীবন আছে। যাহারা একবার একটা সমষ্টি হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সেই সমষ্টিদেহের প্রাণবস্তু কি? কি অবলম্বনে সমষ্টি বাঁধে এবং কি আকর্ষণে ও ক্রিয়ায় সেই জোট-বাঁধা বজায় থাকে? উত্তর,—সমষ্টিলক্ষ্য ও তাহার সাধন। যে লক্ষ্য ব্যষ্টির জীবন ও সাধনাগুলিকে সংহত করিয়া সমষ্টি গড়িয়া তুলে, সেই লক্ষ্যই সমষ্টিদেহের প্রাণ। এই লক্ষ্য যতদিন অক্ষুণ্ণ আছে, ততদিন সমষ্টি বাঁচিয়া থাকিবে, যদি না আকস্মিক অপমৃত্যু ঘটে। যতদিন সমষ্টির প্রাণ বাঁচিয়া আছে, ততদিন সমষ্টির মৃত্যু নাই। হিন্দুরা যে লক্ষ্য লইয়া সমষ্টি হইয়াছিল, যতদিন সেই লক্ষ্য কার্য্যকারী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন সেই লক্ষ্য সহস্র অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারিবে, ততদিন লোকসংখ্যা কিছুকাল কমিতে থাকিলেই বলা ঠিক নয় যে, হিন্দুরা মরিতে বসিয়াছে। শতকরা বিশজন লোকও যখন প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, তখনও বলা যায় না যে, একটা দেশের সমষ্টিমানব মরিতে বসিয়াছে। এরূপ লোকক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিলক্ষ্যের খবরও রাখিতে হইবে; দেখিতে হইবে যে, দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে সমষ্টির লক্ষ্য উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া, দেশের লোককে আরও দৃঢ়ভাবে সমষ্টিবদ্ধ করিয়াই দুঃখদারিদ্র্যের যে একমাত্র চরম প্রতীকার পাওয়া যাইবে, তাহারই পথ খুঁজিতেছে কি না। রোগী সাগু খাইয়া বাঁচিতেছে বলিয়াই যেমন বলা যায় না যে, সে খাইতে না পাইয়া মরিতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হয় যে, এক দিকে সাগু খাইতে হইলেও অপর দিকে তাহার প্রাণপোষণের ব্যবস্থা

হইতেছে, একটা সমষ্টির অন্নকষ্টসম্বন্ধেও অনেকটা সেইরূপ। শুধু অন্নকষ্ট দেখিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে, ঐ অন্নকষ্টকে একটা ক্ষণিক বা অস্থায়ী ব্যাপারে পরিণত করিয়া ফেলিবার জন্য সমষ্টির লক্ষ্য মহা উদ্যোগে আর এক দিক্ দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে কি না, আপনার প্রতিষ্ঠা খুঁজিতেছে কি না। কেবল সংখ্যার হিসাব করিয়া হিন্দুদের dying race বলা অল্পদর্শিতা ও ভাবপ্রবণতার ফল।

রোগের প্রাদুর্ভাব ও অন্নের অভাব যে দেশে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহার একটা মূল কারণ এই যে, আধুনিক যুগে একটা দেশের লোক যতদূর সমষ্টিবদ্ধ হইলে আধুনিক দারিদ্র্যসমস্যা ও রোগসমস্যা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, আমরা এখনও ততদূর সমষ্টিবদ্ধ হই নাই। যতদিন এই disorganisation বা সমষ্টিবদ্ধতার অভাব থাকিবে, ততদিন আমাদের দেশের অস্বাস্থ্য ও অন্নকষ্ট কিছুতেই ঘুচিবে না এবং লোকক্ষয়ও হইতে থাকিবে। সেইজন্য আমাদের দেশে সমস্ত সমস্যার মূল সমস্যা হইতেছে—নেশন গঠনের সমস্যা। সেই সমস্যার উপরই আমাদের জীবনমৃত্যু নির্ভর করিতেছে। আর যাঁহারা রাজনীতির সাহায্যে ঐ সমস্যার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা দেশকে মৃত্যুর পথ অবলম্বন করাইতেছেন। এই একমাত্র হিসাবে বলা যায় যে, আমরা মৃত্যুর পথে চলিতে যাইতেছি,—কেবল এই হিসাবে বলা যায়, "We are seeking to be a dying race," আমরা মরিবার পথ খুঁজিতেছি।

ভারত যে সাধনার পথে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে,—কখনও বীর-পদবিক্ষেপে, কখনও বা জড়িতপদক্ষেপে,—সেই পথই ভারতের বাঁচিবার পথ। সে পথ আমরা দেখিতে পাইয়াছি এবং আরও দেখিতে পাইয়াছি যে, অলৌকিক ও দুরধিগম্য প্রেম ও বীর্য্যের সহায়ে সমগ্র ভারতকে ভারতের যুগাবতার সেই বাঁচিবার পথে আজ দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। কারণ, ভারতকে যে বাঁচিতে হইবে, সে বাঁচা শুধু ভারতবাসীর জন্য নহে, সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য। যদি জগতে পরমার্থের প্রকৃত মহিমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি মনুষ্যজীবনে পারমার্থিক উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা ও রক্ষা করা সমগ্র জগতের পক্ষে একটা চিরন্তন প্রয়োজন হয়, যদি পৃথিবীতে মোক্ষমার্গকে বাঁচিয়া

থাকিতে হয়, তবে ভারতকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ভারতের এই বাঁচায় বিশ্বমানবের স্বার্থ রহিয়াছে; আর সমস্ত জগতের মানুষও যদি সে স্বার্থ না বুঝে, তবে জগতের বিধাতা সে স্বার্থ রক্ষা করিবেন। তিনি রক্ষা করেন বলিয়াই, ভারত এতকাল বাঁচিয়াছে এবং বাঁচিবে। "শেষকথা"র অবতারণা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, ভারতের ইতিহাস গড়ে ভারতের আদর্শ। আর এক ধাপ উঠিয়া বলি, সব দেশের ইতিহাস গড়েন ও ভাঙ্গেন শ্রীভগবান্, মানুষ কেবল নিমিত্ত। "ভারতের সাধনা"য় ভারতে তাঁরই লীলা বুঝিবার আমরা চেষ্টা করিয়াছি এবং সর্ব্বশেষেও বলিতেছি—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

সেইজন্য যদিও নেশন গড়িয়া তুলিবার সবই প্রস্তুত, যদিও উপায় জানা আছে, কৌশল ও প্রণালী জানা আছে, পথ জানা আছে, তথাপি কর্ম্মীর অভাব ও অর্থের অভাব দেখিয়া হৃদয় দমিয়া যায় না, মন ভাঙ্গিয়া যায় না। যিনি চোখ খুলিয়া দিয়া পথ দেখাইয়াছেন, যিনি আদর্শের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, যিনি নেশন গঠনের জন্য নিজের লীলাজীবনকে কেন্দ্ররূপে দান করিয়াছেন, তিনিই সাধক ও কর্ম্মীর অভাব ঘুচাইবেন, অর্থের অভাব ঘুচাইবেন, এ বিশ্বাস পোষণ না করিয়া থাকিতে পারি না।

(সমাপ্ত)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর,
৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়ের শেষ পত্রে আপনাকে উক্ত অভিধান দেওয়ায় কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা আমার দোষ নহে, মহাশয়ের গুণের। পূর্ব্বে এক পত্রে মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম যে, মহাশয়ের গুণে আমি এত আকৃষ্ট যে, বোধ হয়, আপনার সহিত জন্মান্তরীণ কোন সম্বন্ধ ছিল। আমি গৃহস্থও

বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং উদারতা এবং মহত্ত্ব যেথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। প্রার্থনা করি, আজিকালিকার মানভিখারী পেটবৈরাগী এবং উভয়ভ্রষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমীদের মধ্যে লক্ষের মধ্যেও যেন আপনার ন্যায় মহাত্মা একজন হউন। আপনার গুণের কথা শুনিয়া আমার সকল ব্রাহ্মণ-জাতীয় গুরু-ভ্রাতাও আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইতেছেন।

মহাশয় আমার প্রশ্ন কয়েকটির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি সম্বন্ধে আমার ভ্রম সংশোধিত হইল। মহাশয়ের নিকট তজ্জন্য আমি চির-ঋণবদ্ধ রহিলাম। আর একটি প্রশ্ন ছিল যে, ভারতাদি পুরাণোক্ত গুণগত জাতি সম্বন্ধে আচার্য্য কোন মীমাংসাদি করিয়াছেন কি না? যদি করিয়া থাকেন, কোন্ পুস্তকে? এতদ্দেশীয় প্রাচীন মত যে বংশগত, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই, এবং স্পার্টানদের দ্বারা যে প্রকার হেলটদের উপর, অথবা মার্কিন দেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর জাত্যাদি সম্বন্ধে আমার কোনও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই। কারণ, আমি জানি, উহা সামাজিক নিয়ম, গুণ এবং কর্ম্ম-প্রসূত। যিনি নৈষ্কর্ম্য ও নির্গুণত্বকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জাত্যাদি ভাব মনে আসিলেও সমূহ ক্ষতি। এই সকল বিষয়ে গুরুকৃপায় আমার এক প্রকার বুদ্ধি আছে, কিন্তু মহাশয়ের মতামত জানিলে কোন স্থানে সেই সকলকে দৃঢ় এবং কোন স্থানে সংশোধিত করিয়া লইব। চাকে খোঁচা না মারিলে মধু পড়ে না—অতএব আপনাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব. আমাকে বালক এবং অজ্ঞ জানিয়া যথাযথ উত্তর দিবেন, রুষ্ট হইবেন না।

১। বেদান্ত-সূত্রে যে মুক্তির কথা কহে, তাহা এবং অবধূতগীতাদিতে যে নির্ব্বাণ আছে, তাহা এক কি না?

২। "সৃষ্টিবর্জ্জং" ইত্যাদি সূত্রে পুরো ভগবান্ কেহই হয় না, তবে নির্ব্বাণ কি?

৩। চৈতন্যদেব পুরীতে সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন ব্যাসসূত্র আমি বুঝি, তাহা দ্বৈতবাদ, কিন্তু ভাষ্যকার অদ্বৈত করিতেছেন, তাহা বুঝি

না—ইহা সত্য নাকি? প্রবাদ আছে যে, চৈতন্যদেবের সহিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এ বিষয়ে অনেক বিচার হয়, তাহাতে চৈতন্যদেব জয়ী হন। চৈতন্যদেব-কৃত এক ভাষ্য নাকি উক্ত প্রকাশানন্দের মঠে ছিল।

৪। আচার্য্যকে তন্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছে; প্রজ্ঞাপারমিতা নামক বৌদ্ধদের মহাযান গ্রন্থের মতের সহিত আচার্য্য-প্রচারিত বেদান্তমতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। পঞ্চদশীকারও বলিতেছেন যে, বৌদ্ধ শূন্য ও আমাদিগের ব্রহ্ম একই ব্যাপার—ইহার অর্থ কি?

৫। বেদান্তসূত্রে বেদের কোনও প্রমাণ কেন দেওয়া হয় নাই? প্রথমেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদ প্রামাণ্য "পুরুষ-নিঃশ্বসিতম্" বলিয়া; ইহা কি পাশ্চাত্য ন্যায়ে যাহাকে Argument in a circle ('চক্রক'—যাহার বলে সিদ্ধান্ত করা হইবে, তাহাকেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থন করা) বলে, সেই দোষদুষ্ট নহে?

৬। বেদান্ত বলেন,—বিশ্বাস করিতে হইবে, তর্কে নিষ্পত্তি হয় না। তবে যেখানে ন্যায় এবং সাংখ্যাদির অণুমাত্র ছিদ্র পাইয়াছেন, তখনই তর্ক-জালে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করা হইয়াছে কেন? আর বিশ্বাসই বা করি কাকে? যে যার আপনার মত স্থাপনেই পাগল; এত বড় "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" তিনিই যদি ব্যাসের মতে অতি ভ্রান্ত, তখন ব্যাস যে আরও ভ্রান্ত নহেন, কে বলিল? কপিল কি বেদাদি বুঝিতেন না?

৭। ন্যায়-মতে "আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ"; ঋষিরা আপ্ত ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহারা তবে সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বারা সামান্য সামান্য জ্যোতিষিক-তত্ত্বে অজ্ঞ বলিয়া আক্ষিপ্ত হইতেছেন কেন? যাহারা বলেন,—পৃথিবী ত্রিকোণ, বাসুকি পৃথিবীর ধারয়িতা ইত্যাদি, তাঁহাদের বুদ্ধিকে ভবসাগরপারের একমাত্র আশ্রয় কি প্রকারে বলি?

৮। ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে যদি শুভাশুভ কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় আমার লাভ কি? নরেশচন্দ্রের একটি সুন্দর গীত আছে—

"কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে (মা)
জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা ব'লে কেন ডাকা তবে॥"

৯। সত্য বটে, বহু বাক্য এক আপটির দ্বারা নিহত হওয়া অন্যায্য। তাহা হইলে চিরপ্রচলিত মধুপর্কাদি প্রথা "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্" ইত্যাদি দুই একটি বাক্যের দ্বারা কেন নিহত হইল? বেদ যদি নিত্য হয়, তবে ইহা দ্বাপরের, ইহা কলির ধর্ম্ম ইত্যাদি বচনের অর্থ এবং সাফল্য কি?

১০। যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শুনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না আগের বিধি প্রবল?

১১। তন্ত্র বলেন,—কলিতে বেদমন্ত্র নিষ্ফল; মহেশ্বরেরই বা কোন্ কথা মানিব?

১২। বেদান্তসূত্রে ব্যাস বলেন যে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ উপাসনা ঠিক নহে—আবার সেই ব্যাসই ভাগবতাদিতে উক্ত উপাসনার মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন; ব্যাস কি পাগল?

আরও এই প্রকার অনেক সন্দেহ আছে, মহাশয়ের প্রসাদে ছিন্নদ্বৈধ হইব আশা করিয়া পরে সেগুলি লিখিব। এ সকল কথা সাক্ষাৎ না হইলে সমস্ত বলা যায় না এবং আশানুরূপ তৃপ্তিও হয় না। গুরুর কৃপায় শীঘ্রই ভবৎ-চরণসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিবার বাসনা রহিল। ইতি—

শুনিয়াছি, বিনা সাধনায় শুষ্ক যুক্ত্যাদি-বলে এ সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কিন্তু কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হওয়া প্রথমেই বোধ হয় আবশ্যক। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

বাগবাজার, কলিকাতা,

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়ের দুইখানি পত্র কয়েক দিবস হইল পাইয়াছি। মহাশয়ের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যে তর্ক যুক্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাহা অতি যথার্থ

বটে এবং প্রত্যেক জীবনের উদ্দেশ্যই তাহাই—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি। তবে কি না আমার গুরু মহারাজ যে প্রকার বলিতেন যে, কলসী পুরিবার সময় ভক্ ভক্ ধ্বনি করে, পূর্ণ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া যায়, আমার পক্ষে সেইরূপ জানিবেন। বোধ হয়, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব—ঈশ্বর মনস্কামনা পূর্ণ করুন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরো জয়তি।

বাগবাজার,

৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

অনেকদিন আপনার কোনও পত্রাদি পাই নাই; ভরসা করি, শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছেন। সম্প্রতি আমার দুইটি গুরুভ্রাতা ৺কাশীধামে যাইতেছেন। একটির নাম রা—ও অপরটির নাম সু—। প্রথমোক্ত মহাশয় আমার গুরুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। যদি সুবিধা হয়, ইঁহারা যে কয়দিন উক্তধামে অবস্থান করেন, কোনও সত্রে বলিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমার সকল সংবাদ ইঁহাদের নিকট পাইবেন। আমার অসংখ্য প্রণামের সহিত—

দাস

বিবেকানন্দ।

গ—এক্ষণে কৈলাসাভিমুখে যাইতেছেন। পথে তিব্বতীরা তাঁহাকে ফিরিঙ্গির চর মনে করিয়া কাটিতে আসে—পরে কোন কোন লামা অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দেয়—এসংবাদ তিব্বতযাত্রী কোন ব্যবসায়ী হইতে পাইয়াছি। লাসা না দেখিলে আমাদের গ—র রক্ত শীতল হইবে না। লাভের মধ্যে শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে—একরাত্রি তিনি অনাচ্ছাদনে বরফের উপর শয়ন করিয়া ছিলেন, তাহাতেও বিশেষ কষ্ট হয় নাই। ইতি—

বিবেকানন্দ

ঈশ্বরো জয়তি ।

বরাহনগর, কলিকাতা,

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯ ।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম—পরে রা—র পত্রে তাঁহার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাও জানিলাম। আপনার রচিত pamphlet (পুস্তিকা) পাইয়াছি। Theory of conservation of energy (জগতে শক্তির অপক্ষয় নাই—এই মতবাদ) আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপে একপ্রকার scientific (বৈজ্ঞানিক) অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু তাহা পরিণামবাদ। আপনি ইহার সহিত শঙ্করের বিবর্ত্তবাদের যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতি উত্তম। জর্ম্মাণ transcendentalistদের (যাঁহারা বলেন,—ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞান-নিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ আরও একরূপ জ্ঞান আছে, তাঁহাদের) উপর স্পেন্সারের যে বিদ্রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম না; তিনি স্বয়ং উঁহাদের প্রসাদভোজী। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী গাফ্ (Gough) সম্যক্‌রূপে হেগেল বুঝেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আপনার উত্তর অতি pointed (চোকাল) এবং thrashing (অকাট্য)।

দাস

বিবেকানন্দ

ঈশ্বরো জয়তি ।

বৈদ্যনাথ ।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯ ।

পূজ্যপাদেষু—

বহুদিবস চেষ্টার পর বোধ হয় এতদিনে ভবৎসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম। দুই এক দিনেই ৺কাশীধামে ভবৎচরণসমীপে উপস্থিত হইব।

এস্থানে কলিকাতার একজন বাবুর বাসায় কয়েক দিবস আছি—কিন্তু কাশীর জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল।

ইচ্ছা আছে, তথায় কিছুদিন থাকিব এবং আমার মন্দ ভাগ্যে বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা কি করেন, দেখিব। এবং "শরীরং বা পাতয়ামি মন্ত্রং বা সাধয়ামি" প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—কাশীনাথ সহায় হউন।

দাস

বিবেকানন্দ।

আচার্য্য বিবেকানন্দ।

(যুক্তরাজ্যের ডিট্রয়েট নগরস্থ জনৈক ভদ্রমহিলা-লিখিত; "Inspired Talks" গ্রন্থের ভূমিকা হইতে অনূদিত।)

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্মৃতিপথে একটী পৃথক্, পবিত্র দিবস হইয়া রহিয়াছে; কারণ, ঐ দিনেই আমি সর্ব্বপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্ম্মজগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি, যিনি দুই বৎসর পরে আমার শিষ্যপদে বরণ করিয়া লইয়া আমাকে অপার আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন।

তিনি এই দেশের (আমেরিকার) বড় বড় নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন, এবং ডিটয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে তিনি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, তাহার প্রথমটা উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, সুবৃহৎ প্রাসাদটাতে সত্য সত্যই তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না, এবং স্বামিজী তথায় রাজসম্মানে সম্মানিত হন। যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে প্রথম পদার্পণ করিলেন, তাঁহার তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় মূর্ত্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হইতেছে। উহা যেন অসীম শক্তির আধার এবং মুহূর্ত্তেই সকলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইতেছে! আর তাঁহার সেই অপূর্ব্বকণ্ঠনিঃসৃত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র—শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত—এই বীণার ন্যায় করুণ রাগিণীতে বাজিতেছে,—এই আবার গম্ভীর, শব্দময়, আবেগময় হইয়া ঝঙ্কার দিতেছে—সমস্ত সভা নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল—সে নিস্তব্ধতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল—এবং সেই বিপুল জনসঙ্ঘ শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় শ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তথায় সর্ব্বসমক্ষে পাঁচটী বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ, তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপর অসাধারণ অধিকার ছিল, এবং তিনি এমনভাবে কথা কহিতেন, যেন তিনি "চাপরাস" পাইয়াছেন। তাঁহার তর্কগুলি যুক্তিপূর্ণ থাকিত এবং লোকের সংশয় অপনোদন করিয়া দিত, আর বক্তৃতার অতি উৎকৃষ্ট অংশেও তিনি কদাপি ভাববশে চালিত হইয়া, যে সত্যটী তিনি লোকের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই মূল বক্তব্য বিষয়টী হারাইয়া ফেলিতেন না।

তিনি নির্ভীকভাবে ধর্ম্ম বা দর্শনের তত্ত্বগুলির প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে লোকে স্বতঃই বুঝিতে পারিত যে, এ ব্যক্তির হৃদয় এত মহৎ যে, উহা লোকের দোষ ও দুর্ব্বলতার দিকে না দেখিয়া সমদায় বিশ্বকে আপনার বুকে টানিয়া লইতে পারে; ইনি লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইবেন না। বাস্তবিকই, পরে আমার তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ ঘটিলে, আমি দেখিয়াছি, তিনি সত্য সত্যই মানুষের যতদূর সাধ্য ততদূর ক্ষমা করেন। আহা, কি অপরিসীম ভালবাসা ও ধৈর্য্যের সহিত তিনি তাঁহার সমীপাগত লোকদিগকে তাহাদের নিজ নিজ দুর্ব্বলতার গোলকধাঁধা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে 'কাঁচা আমি'র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরলাভের মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন! তিনি ঈর্ষা বলিয়া কিছু জানিতেন না। যদি কেহ তাঁহাকে গালি দিত, তিনি গম্ভীর হইয়া যাইতেন এবং 'শিব' 'শিব' বলিতে বলিতে তাঁহার বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, আর তিনি বলিতেন, "ইহাও শুধু প্রিয়তম প্রভুরই বাণী!" অথবা আমাদের মধ্যে যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, তাহারা যদি এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইত, তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "যে নিন্দাস্তুতির কর্ত্তা ও পাত্র উভয়কেই এক বলিয়া জানে, তাহার নিকট ইহাতে কি আসিয়া যায়?" আবার, ঐ সকল স্থলে তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহাকে কেহ গালি দিলে বা কটু কথা বলিলে তাহা গ্রাহের মধ্যেই আনিতেন না, তৎসম্বন্ধে কোন এক গল্প বলিতেন। ভাল মন্দ সকল বস্তুই, সকল 'দ্বন্দ্ব'ই "আদরিণী শ্যামা মায়ের" নিকট হইতে আসিয়া থাকে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, এবং একটী দিনের জন্যও আমি তাঁহার চরিত্রে এতটুকু দাগ দেখিতে পাই নাই। মানবের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতাগুলি তাঁহাতে স্থান পাইত না; আর যদি বিবেকানন্দের কোন দোষ থাকিত, তবে উহা নিশ্চয়ই উদার ভাবের দোষ হইত। এত বড় হইয়াও তিনি বালকের মত সরল ছিলেন; ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত যেমন, দরিদ্র ও পতিত লোকদিগের সহিতও তিনি ঠিক তেমনই ভাবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন।

ডিট্রয়েটে অবস্থানকালে তিনি মিশিগ্যানের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার বিধবা পত্নী মিসেস্ জন্, জে, ব্যাগ্‌লির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা রমণী অতি বিরল, ইঁহার ধর্ম্মভাবও অসাধারণ ছিল। ইনি আমাকে বলিয়াছেন যে, স্বামিজী যতদিন (প্রায় একমাস কাল) তাঁহার গৃহে অতিথি ছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার কথায় ও কার্য্যে এক ক্ষণের জন্যও অতি উচ্চদরের ভাব ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ পাইত না, এবং তাঁহার অবস্থানে গৃহ যেন "অবিরত মঙ্গলপ্রবাহে পূর্ণ" থাকিত। মিসেস্ ব্যাগ্‌লির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দ অনারেব্‌ল্ টমাস, ডব্‌লিউ, পামারের অতিথিরূপে একপক্ষকাল বাস করেন। মিঃ পামার World's Fair Commissionএর অধ্যক্ষ ছিলেন; ইনি পূর্ব্বে স্পেনদেশে যুক্তরাজ্যের রাজদূতস্বরূপে ছিলেন এবং যুক্তরাজ্যের মহাসভার একজন সভ্যও ছিলেন। এই ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন এবং ইঁহার বয়স অশীতি বর্ষেরও অধিক হইয়াছে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই বলিতে পারি যে, আমি যে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত ছিলাম, তন্মধ্যে আমি তাঁহাকে কদাপি আদর্শে ও কার্য্যে উচ্চতম ভাব ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

ধন্য স্বামিজী! তুমি কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ষণ করিয়াছ! মানুষ যে তাঁহার মত এত অমলধবল, এত নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে, তাহা আমি ধারণায়ও আনিতে পারিতাম না! উহাই তাঁহাকে অন্য সকল মানব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ রূপলাবণ্যসম্পন্না

রমণীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শুধু সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিত না। তবে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমি তোমাদের তীক্ষ্ণধী বিদুষীগণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে চাই; আমার পক্ষে উহা একটী অভিনব ব্যাপার; কারণ, আমার দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অন্তঃপুরচারিণী।"

তাঁহার চালচলন বালকসুলভ সরলতাময় ছিল এবং লোককে সাতিশয় মুগ্ধ করিত। আমার মনে আছে, একদিন তিনি অদ্বৈতানুভূতির পরাকাষ্ঠা বর্ণন করিয়া একটী অতি চিত্তগ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছেন, পরক্ষণেই দেখিলাম, তিনি সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি একটা কিছু ভাবিয়া কিনারা করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। লোকে উপর নীচে করিতেছে—কেহ গাত্রবস্ত্র আনিবার জন্য, কেহ অন্য কিছুর জন্য। সহসা তাঁহার আনন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিয়াছি! উপরে উঠিবার সময় পুরুষেরা স্ত্রীলোকের আগে যায়; আর নীচে নামিবার সময় স্ত্রীলোক পুরুষের আগে আসে। নয় কি?" তাঁহার প্রাচ্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলস্বরূপ তিনি আচারমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকে আতিথ্যেরই নিয়মভঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

যাঁহারা তাঁহার জীবনের সঙ্কল্পিত কার্য্যগুলিতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্ব হওয়া একান্ত আবশ্যক। একজন শিষ্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক আশা পোষণ করিতেন। তাঁহার মধ্যে ভাবী ত্যাগবৈরাগ্যের বিশিষ্ট পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন। একদিন তিনি আমাকে একাকী পাইয়া, তিনি কিরূপ জীবন যাপন করেন ও কিরূপ লোকের সঙ্গে মিশেন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন, এবং আমি সে সকলগুলিই উত্তর দিবার পর তিনি আমার দিকে অতি আগ্রহান্বিতভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তিনি খুব শুদ্ধসত্ত্ব, না?" আমি শুধু বলিলাম; "হাঁ, স্বামিজী, খুব শুদ্ধসত্ত্ব।" তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল, তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "আমি ইহা জানিতাম, আমি ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার কলিকাতার কার্য্যের জন্য আমি তাঁহাকে চাই।"

তৎপরে তিনি ভারতীয় নারীকুলের উন্নতিকল্পে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্য-প্রণালীর কথা এবং ঐ বিষয়ে তিনি যে সকল আশা পোষণ করেন, তাহার কথা কহিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, "তাহাদের চাই শিক্ষা; আমাদিগকে কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।" তথায় পরে একটী বালিকাবিদ্যালয় সিষ্টার নিবেদিতা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, আর উক্ত শিষ্যাটীও তাঁহার সহিত উক্ত কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় একটী গলিতে বাস করেন, সাড়ী পরেন, এবং যথাসাধ্য বালিকাগণকে মাতার ন্যায় সেবাযত্ন করেন। স্বামিজীর সহিত আমার পরিচয়ে তিনি আমার সঙ্গিনী ছিলেন, কারণ, আমরা উভয়ে একত্রে আচার্য্যদেবকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি। সেই শীতকালটীতে তিনিই ডিট্রয়েটের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত মহলে তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং লোকে তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্য সুযোগ খুঁজিত। দৈনিক সংবাদপত্রগুলি তাঁহার গতিবিধির সংবাদ রাখিতে লাগিল। একখানি কাগজে গম্ভীরভাবে উল্লিখিত হইল যে, খুব মরিচের গুঁড়া দেওয়া রুটী মাখনই তাঁহার প্রাতরাশ! রাশি রাশি চিঠি ও নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল এবং ডিট্রয়েট বিবেকানন্দের পদানত হইল।

ডিট্রয়েট তাঁহার বরাবর প্রিয় ছিল, এবং তাঁহার প্রতি এই সমস্ত সদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সদাই কৃতজ্ঞ ছিলেন। আমাদের সে সময়ে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার কোন সুযোগ ছিল না, কিন্তু আমরা তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতে এবং যাহা শুনিতাম, মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলাম। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবই করিব, যদি আমাদিগকে তজ্জন্য সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। প্রায় দুই বৎসর আমরা তাঁহার কোনও খোঁজ পাইলাম না, এবং মনে করিলাম, হয়ত তিনি ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একদিন অপরাহ্নে একজন বন্ধু আমাদিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীষ্মকালটা Thousand Island Park এ যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার

নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব, এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া আমরা পরদিন প্রাতে যাত্রা করিলাম।

অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাস করিতেছেন, এমত অবস্থায় তাঁহার শান্তিভঙ্গ করিবার দুঃসাহস করিয়াছি, এই ভাবিয়া আমরা যার পর নাই ভীত হইলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন জ্বালিয়াছেন, যাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই অদ্ভুত ব্যক্তি ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও জানিতে হইবেই হইবে। সেদিন অন্ধকারময়ী রজনী, ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার আমরাও দীর্ঘ পথভ্রমণে শ্রান্ত, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের মনে শান্তি নাই। তিনি কি আমাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন? আর যদি না করেন, তবে আমাদের উপায়? আমাদের হঠাৎ মনে হইল যে, এক ব্যক্তি, যিনি আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুশত ক্রোশ চলিয়া আসা হয়ত বা মূর্খতার কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু সেই অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা কষ্টে সৃষ্টে পাহাড়টী চড়াই করিতে লাগিলাম; সঙ্গে একজন লণ্ঠনধারী লোক, তাহাকে আমরা পথ দেখাইয়া দিবার জন্য ভাড়া করিয়াছিলাম। পরে এই ঘটনার প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব আমাদিগকে এইরূপে অভিহিত করিতেন—"আমার শিষ্যদ্বয় যাঁহারা শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া আসিয়াছিলেন।" তাঁহাকে কি বলিব, পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু যেমন আমরা বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, অমনি আমরা সেই সব ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা ভুলিয়া গেলাম, আর আমাদের মধ্যে একজন কোন মতে অস্ফুটস্বরে বলিতে পারিল, "আমরা ডিটয়েট হইতে আসিতেছি এবং মিসেস্ প — আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" আর একজন বলিলেন, "ভগবান্ ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিলে যেরূপে আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করিতাম, আমরা আপনার নিকট সেইরূপই আসিয়াছি।" তিনি আমাদের দিকে অতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত

করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "শুধু যদি আমার ভগবান্ খ্রীষ্টের ন্যায় তোমাদিগকে এই মুহূর্ত্তে মুক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিত!" ক্ষণেকের জন্য তিনি চিন্তামগ্নভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং পরে গৃহস্বামিনীকে (তিনি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন) বলিলেন, "এই মহিলাদ্বয় ডিট্রয়েট হইতে আসিতেছেন, ইঁহাদিগকে উপরে লইয়া যান, ইঁহারা এই সন্ধ্যাটী আমাদের সহিত অতিবাহিত করিবেন।" আমরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি আমাদের প্রতি আর কোন মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু আমরা সকলের নিকট বিদায় লইবার সময় তিনি আমাদিগকে পরদিন প্রাতে নয়টার সময় আসিতে বলিলেন। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং আচার্য্যদেবও আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে?

আমাদের তথায় অবস্থানসম্বন্ধে আর একজন শিষ্যা বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিব যে, সে গ্রীষ্ম ঋতুটী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই কাটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি যেমন ছিলেন, এমনটী আমি তাঁহাকে আর কখনও দেখি নাই। এখানে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত বলিয়া তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যও অতি সুন্দরভাবেই বিকাশ পাইয়াছিল।

আমরা তথায় বার জন ছিলাম, এবং বোধ হইতেছিল, যেন জ্বালাময়ী ঐশী শক্তি (Pentecostal fire) অবতরণ করিয়া পুরাকালে খ্রীষ্টশিষ্যগণের ন্যায় আচার্য্যদেবকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে ত্যাগমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে গৈরিকবসনধারী যতিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা করিতে করিতে সহসা তিনি উঠিয়া গেলেন, এবং অল্পক্ষণেই ত্যাগবৈরাগ্যের চরমসীমাস্বরূপ "Song of the Sannyasin" (সন্ন্যাসীর গীতি)-শীর্ষক কবিতাটী লিখিয়া ফেলিলেন। আমার মনে হয়, তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য ও কোমলতাই আমাকে ঐকালে সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছিল। পিতা তাঁহার সন্তানদের যে চক্ষে দেখেন, তিনিও আমাদের সেই চক্ষে দেখিতেন—যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। প্রাতঃকালের ক্লাসের কথোপকথনগুলি শুনিয়া সময়ে সময়ে আমাদের মনে হইত, যেন

তিনি ব্রহ্মকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন সময়ে হয়ত তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, "এখন আমি তোমাদের জন্য রন্ধন করিতে যাইতেছি।" আর, কত ধৈর্য্যের সহিত তিনি উনানের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য কোন কিছু ভারতীয় আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন! ডিট্রয়েটে আমাদের সহিত শেষবার অবস্থানকালে তিনি একদিন আমাদিগের জন্য অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য জগদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবগুলি নিজ হস্তে পূরণ করিয়া দিতেছেন—শিষ্যগণের পক্ষে কি অপূর্ব্ব উদাহরণ! তিনি ঐসকল সময়ে কত কোমল, কত করুণস্বভাব হইতেন! কত কোমলতাময় পুণ্যস্মৃতিই না তিনি আমাদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন!

(আগামী বারে সমাপ্য

স্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতি

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে ৪।৫ দিন হইল বাড়ী ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নির্ম্মলানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামিজী দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামিজীর মান্দ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা, পেরুমল, কিডি, জি-জি প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হইল স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি স্বামিজীকে বলিলেন, এক্ষণে অনেক নূতন নূতন যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া মঠবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে বড় ভাল হয়। স্বামিজী তাঁহার

অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ—একটা নিয়ম করা ভাল বৈ কি। ডাক্ সকলকে।" সকলে আসিল ও বড় ঘরটীতে জমা হইল। তখন স্বামিজী বলিলেন, "একজন কেউ লিখ্তে থাক্, আমি বলি।" তখন এ উহাকে সাম্নে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেহ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তখন মঠে লেখাপড়াটার উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল! সাধনভজন করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটীই সার—আর লেখাপড়াটা—উহাতে মানযশের ইচ্ছা আসিবে—যাহারা ভগবানের আদিষ্ট হইয়া প্রচারকার্য্যাদি করিবে, তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন ত নাইই, বরং উহা হানিকর—এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কতকটা forward ও বেপরওয়া—আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। স্বামিজী একবার শূন্যের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি থাক্বে? (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে তথায় থাকিব, অথবা ২।১ দিনের জন্য মঠে বেড়াইতে আসিয়াছি, আবার চলিয়া যাইব!) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, "হাঁ।" তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্ব্বে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, এই সব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝ্তে হবে, এগুলি কর্বার মূল লক্ষ্য কি? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতঃই কতকগুলি কুনিয়ম রয়েছে—সুনিয়মের দ্বারা সেই কুনিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা কর্তে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে, শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

তার পর নিয়মগুলি লেখান হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান স্নান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট

হইল। মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না এই ভাবের একটী নিয়ম লেখা হইল। শেষে সমুদয় লেখান শেষ করিয়া স্বামীজি বলিলেন, "দেখ্, একটু দেখিয়া শুনিয়া নিয়মগুলি ভাল করিয়া কপি করিয়া রাখ্—দেখিস্, যদি কোন নিয়মট negative ভাবে লেখা হইয়া থাকে, সেটাকে positive করিয়া দিবি।"

এই শেষোক্ত আদেশ প্রতিপালনে আমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বামিজীর উপদেশ ছিল, লোককে খারাপ বলা বা তার বিরুদ্ধে কুসমালোচনা করা, তার দোষ দেখান, তাকে তুমি অমুক করো না, তমুক করো না,—এইরূপ negative (নেতিবাচক) উপদেশ দিলে তার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না, কিন্তু তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দোষগুলি আপনা আপনি চলিয়া যায়। ইহাই স্বামিজীর মূল কথা। স্বামিজীর সব নিয়মগুলিকে positive করিয়া দিবার উপদেশে আমাদের মনে বারবার ঐ কথাই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আদেশ মত যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য হইতে 'না' কথাটার সম্পর্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তখন দেখিলাম, আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্তু মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটী প্রথম এইভাবে লেখা হইয়াছিল যে, 'মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না।' যখন আমরা উহার মধ্যগত 'না'টীকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলাম, তখন প্রথম দাঁড়াইল—'সকলে তামাক খাইবেন।' কিন্তু ঐরূপ বাক্যের দ্বারা সকলের উপর (যে না খায়, তাহারও উপর) তামাক খাইবার বিধি আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটী এইরূপ দাঁড়াইল—'মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করিতে পারিবেন' —যাহা হউক এখন মনে হইতেছে, আমরা একটা বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। Detailএর ভিতর আসিলে, বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, তবে ইহাও সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই

উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামিজীরও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ছিল।

*   *   *   *

একদিন অপরাহ্নে বড়ঘরে একঘর লোক—স্বামিজী তন্মধ্যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন—নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে। তন্মধ্যে আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু (বর্ত্তমানে আলিপুর আদালতের স্বনামখ্যাত উকিল) মহাশয়ও আছেন। তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায় —এমন কি, কখন কখন কংগ্রেসে দাঁড়াইয়াও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এই বক্তৃতাশক্তির কথা কেহ স্বামিজীর নিকট উল্লেখ করিলে স্বামিজী বলিলেন, "তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন—এইখানে দাঁড়াইয়া একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা—soul (আত্মা) সম্বন্ধে তোমার যা idea (ধারণা), তাই খানিকটা বল।" বিজয় বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন—স্বামিজী এবং আর আর অনেকেও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অনুরোধ উপরোধের পরও যখন কেহ তাঁহার সঙ্কোচ ভাঙ্গিতে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন অগত্যা হার মানিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি বিজয়বাবু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্ব্বে কখন কখন ধর্ম্মসম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা করিতাম—আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব্ ছিল—তাহাতে ইংরাজী বলিবার অভ্যাস করিতাম। আমার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়িল—আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি অনেকটা বেপরোয়া, অথবা অন্য ভাষায় বলিতে গেলে দু-কান-কাটা! Fools rush in where angels fear to tread.—আমাকে আর বেশী বলিতে হইল না—আমি একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী-সংবাদান্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া যা মুখে আসিল, বলিয়া গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হইতেছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হইতেছে, এ সকল খেয়ালই করিলাম না। দয়ার সাগর স্বামিজী আমার এই হঠকারিতায়

কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে স্বামিজীর নিকট নূতন সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী (ইনি এক্ষণে আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায় ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।) প্রায় ১০ মিনিটকাল ধরিয়া আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে বলিলেন। তিনি স্বামিজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করিয়া বেশ গম্ভীরস্বরে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। তাঁহারও বক্তৃতার স্বামিজী খুব প্রশংসা করিলেন।

আহা! স্বামিজী বাস্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। যাহার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়া যাহাতে তাহার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পাঠকবর্গ, আপনারা একথা হইতে যেন ইহা ভাবিয়া বসিবেন না যে, তিনি সকলকে সকল কার্য্যেই প্রশ্রয় দিতেন। কারণ, বহুবার দেখিয়াছি, লোকেরা, বিশেষতঃ অনুগত গুরুভ্রাতা বা শিষ্যগণের দোষপ্রদর্শনে তিনি সময়ে সময়ে মহা কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। কিন্তু সেটা আমাদের দোষ সংশোধনের জন্য—আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য—আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিবার বা আমাদের মত কেবল পরদোষানুসন্ধান-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। আর এরূপ উৎসাহদাতা, ভরসাদাতা কোথায় পাইব? কোথায় পাইবে এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন,—"I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—*must*, that is my word." অর্থাৎ আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা হইতে পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হইতে হইবে—হইতেই হইবে—নহিলে চলিবে না।

*　　*　　*　　*

সেই সময়ে স্বামিজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগসম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই, টি, ষ্টার্ডি সাহেব কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার ২।১ কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামিজী দার্জ্জিলিং হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহসহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ

অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরাজী জানেন না—কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ, 'নরেন' বেদান্তসম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন,—"তোমরা স্বামিজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ কর না।" তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত pamphletগুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম; ইতিমধ্যে স্বামিজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন প্রেমানন্দ স্বামী স্বামিজীকে বলিলেন, এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছে। পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে কি অনুবাদ করিয়াছ, স্বামিজীকে শুনাও দেখি।" তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামিজীকে শুনাইল। স্বামিজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু একটা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই একটা কথাও বলিলেন একদিন স্বামিজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি—তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, "রাজযোগটা তর্জ্জমা কর্ না।" আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামিজী কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম, ঐ যোগের উপর কিছুদিন এত অনুরাগ হইয়াছিল যে, ভক্তি, জ্ঞান বা কর্ম্মযোগকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষেই, দেখিতাম। মনে ভাবিতাম মঠের সাধুরা যোগযাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁহারা যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামিজীর রাজযোগ গ্রন্থ পড়িয়া ধারণা হয় যে, স্বামিজী শুধু যে রাজযোগে বিশেষ পটু, তাহা নহে, উক্ত যোগ সম্বন্ধে আমার যে সকল ধারণা ছিল, সে সকল ত তিনি উত্তমরূপেই বুঝাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সহিত রাজযোগের সম্বন্ধও তিনি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। স্বামিজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার ইহা অন্যতম কারণ হইয়াছিল। রাজযোগের অনুবাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের উত্তম চর্চ্চা হইবে এবং তাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির

সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চ্চার অভাব দেখিয়া, সর্ব্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? তিনি ৺প্রমদা দাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা দেশে রাজযোগের চর্চ্চার একান্ত অভাব—যাহা আছে, তাহা দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়।"

যাহা হউক, স্বামিজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

মল্লভূমি ও মল্লভূপগণ।

(শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দাস বি-এল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৎপরে মহাভারতের সময় বাঙ্গালাতে যে আর্য্যসভ্যতা ও বৈদিক ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বাঙ্গালার নৃপতিগণ যে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের সহিত সন্ধি-বিগ্রহ-বিবাহাদি ব্যাপারে যোগদান করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা মহাভারতে প্রাপ্ত হই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে মহাবলশালী দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন পূর্ব্বদিক জয় করিবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালায় আগমনপূর্ব্বক পৌণ্ড্রে বাসুদেব, কৌশিক কচ্ছে প্রবল পরাক্রান্ত মহৌজা ও বঙ্গে সমুদ্রসেনকে পরাজিত করেন। তৎপরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শকুনির দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া যখন যুধিষ্ঠির দেবোপম চারি ভ্রাতা ও শক্তিস্বরূপিণী কৃষ্ণার সহিত বনবাসী হইলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। সাগরাভিমুখে আসিবার সময় তাঁহারা বঙ্গ গৌড়মণ্ডল অতিক্রম করেন ও পরে তাম্রলিপ্তে আগমন করেন, তাহার উল্লেখ আছে। তৎপরে তাঁহারা কলিঙ্গে গমন করিয়া বৈতরণীতীরে "যজ্ঞীয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত পুণ্য আর্য্যক্ষেত্র দর্শন করেন।"

যখন বিষয়-মদ-মত্ত ধর্ম্মদ্রোহী পাপিগণের পাপের বোঝা পূর্ণ হইলে পতিতপাবন নরনারায়ণ পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভীষণ মঙ্গলময় নরমেধ যজ্ঞের সূচনা করিয়া মন্ত্রাহুতি দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ক্ষত্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, তখন আমাদের এই অধুনা ম্যালেরিয়া-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতা বঙ্গ-ভূমি হইতেও ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাজ দুর্য্যোধনকর্তৃক সসম্মানে বৃত হইয়া কিরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা মহাভারতে আছে।

মহাভারতের সময় বাঙ্গালার অঙ্গ, পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের ন্যায় রাঢ়, বিশেষতঃ পশ্চিম রাঢ়, সুসভ্য আর্য্যনিবাস ছিল কি না, ইহাই আমাদের জানিবার বিষয়। মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী কর্ণসুবর্ণ ও রাঙ্গামাটি প্রসঙ্গে মহারাজ দাতাকর্ণসম্বন্ধীয় যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা বিশ্বাস করিলে, রাঢ়, বিশেষতঃ পূর্ব্বরাঢ়, যে তৎকালে আর্য্যনিবাস ছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে হয়; অধিকন্তু তখন অঙ্গাধিপ কর্ণের বীর্য্য, প্রতাপ ও আধিপত্যের কথা স্মরণ করিলে অঙ্গের সংলগ্ন এই প্রদেশ যে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাই বোধ হয়। কিন্তু উপরোক্ত প্রবাদবাক্য ভিন্ন অন্য এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্থির করা যায় যে, রাঢ়ে তৎকালে আর্য্যনিবাস ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, পার্শ্বনাথের সময় বা খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে ছোটনাগপুরের জঙ্গল হইতে কর্ণসুবর্ণ পর্য্যন্ত আর্য্যনিবাস সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতসমর খৃষ্টের ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব্ব রাঢ়ে যাহাই হউক, পশ্চিম রাঢ়ে খৃঃ পূঃ একত্রিংশৎ শতাব্দী ও খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময় আর্য্যনিবাস ও আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পশ্চিম রাঢ়ের আর্য্যোপনিবেশ যে মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী সময়ের, সে সন্দেহের আর একটি কারণ এই যে, পশ্চিম রাঢ়ের নদীগুলির নাম অধিকাংশই পৌরাণিক যুগের। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মগধবীর জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ত্যাগ করিয়া রৈবতক শৈলের ও দ্বারকার দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণের পূর্ব্বে, ও ভারতে শ্রীকৃষ্ণপূজা সম্যগ্রূপে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কোনও নদীর নাম "দ্বারকেশ্বর" হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, শতদ্রু, গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় ঐ নদীর

কোনও বৈদিক নাম ছিল, কিন্তু পৌরাণিক দেবপূজা বিশেষভাবে স্থানীয় জনগণ-মধ্যে প্রচলিত হওয়ায় উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া দ্বারকেশ্বর নাম হইয়াছে—তাহার উত্তর এই যে, এরূপ ঘটনা ভারতের ইতিহাসে কখনও হয় নাই; সুতরাং কেবল পশ্চিম রাঢ় সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত কিরূপে করা যাইতে পারে? কেবল যে পশ্চিম রাঢ়েই শ্রীকৃষ্ণপূজা প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। যদি দেবভক্তির আতিশয্যে নদীর নাম পরিবর্ত্তন সম্ভব হইত, তবে এতদিন সরযূর নাম সীতা ও যমুনার নাম রাধা হইয়া পড়িত।

দামোদর সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা ঐরূপ। খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর ক্ষেত্র-সংহিতাতে কিন্তু লিখিত আছে যে, দামোদরই পুরাণের বেদস্মৃতি বা বেদবতী। কিন্তু নদীর বৈদিক নাম পরিবর্ত্তনের কোনও দৃষ্টান্ত না থাকায় এবং বেদবতী বা বেদস্মৃতি হইতে অপভ্রংশ শব্দ "দামোদর" গঠিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া, আমরা আধুনিক যুগের ক্ষেত্রসংহিতার কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আর বাস্তবিকই যদি দামোদর বৈদিকযুগে বেদস্মৃতি বা বেদবতী নামেই পরিচিত ছিল, তবে ইহাই মনে হয় যে, দামোদরতীরে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপনের বহুপূর্ব্বে দুই চারিজন তীর্থপর্য্যটনকারী ব্রাহ্মণ বা ঋষি ঐ নদীকে বেদস্মৃতি বা বেদবতী নামে অভিহিত করিতেন—কিন্তু যখন তথায় আর্য্যোপ-নিবেশ স্থাপিত হইল, তখন আর্য্যগণমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবদেবী পূজার অত্যন্ত প্রচলন ছিল, তজ্জন্য ঔপনিবেশিকগণ ঐ নদীর নাম দামোদর রাখিয়াছিলেন।

পণ্ডিতবর Mc. Crindle, Lassen সাহেবের মতানুসারে বলেন দামো-দরের নাম ধম্মোদয় ছিল। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে অপৌরাণিক ধম্মোদয় শব্দ হইতে দেশ্য শব্দ দামোদা বা দামোদর উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু Lassen সাহেবের প্রমাণপ্রয়োগবিশিষ্ট সম্পূর্ণ মন্তব্য এখনও সংগ্রহ করিতে না পারায়, তাহার সিদ্ধান্ত সমীচীন কি না, বলিতে অক্ষম হইলাম।

ভারতসমর হইতে খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীর মধ্যে কখন পশ্চিম রাঢ়ে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয়, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কেবল সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে লিখিত আছে যে, বুদ্ধজন্মের বহু পূর্ব্বে রাঢ়ে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন; তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল সিংহপুর।

ইহারই দুর্দান্ত পুত্র বঙ্গগৌরব বিজয়সিংহ অল্পসংখ্যক অনুচরের সহিত নৌবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কায় আসিয়া লঙ্কাজয় করেন ও তথায় বঙ্গীয় উপনিবেশ ও বঙ্গীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন.

আমরা গৌরচন্দ্রিকায় বোধ হয় কিছু অধিক সময় লইলাম। এখন মল্লরাজগণের বিষয় অবতারণা করা যাক।

আপনারা বোধ হয় সকলে অবগত আছেন যে, বিষ্ণুপুরের স্বাধীন মল্লভূপগণের একটি অব্দ ছিল এবং বর্ত্তমানে সেই অব্দের ১২২০ বৎসর যাইতেছে।

মল্লরাজগণের রাজ্যস্থাপনসম্বন্ধে দুইটি গল্প প্রচলিত আছে। হাণ্টার সাহেব তাঁহার পণ্ডিতের নিকট হইতে শ্রুত একটি গল্প অল্প বিস্তর মন্তব্য-সহ স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। আর একটি মহারাজ গোপালসিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বাঁকুড়া কলেক্টরিতে রক্ষিত বিষ্ণুপুরের রাজবংশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বাঁকুড়া গেজেটে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম প্রবাদটি এই—একদা শ্রীবৃন্দাবনের সন্নিকটস্থ জয়নগরের রাজা সস্ত্রীক পুরুষোত্তম দর্শনে বহির্গত হন। তখন বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ পশ্চিম রাঢ়ের, অধিকাংশ স্থানই অরণ্যসমাকীর্ণ ছিল। পরবর্ত্তী কালের বিষ্ণুপুরের জঙ্গল দিয়া যাইবার সময় তাঁহার রাণী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতি শিশু ও তাঁহার মাতাকে সঙ্গে লওয়া অসম্ভব দেখিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই শ্রীকুম্ভমেটে বাগদি নামক এক ব্যক্তি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মাতার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। হাণ্টার সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—মাতা হিংস্র জন্তুদিগের উদরে অথবা নিকটবর্ত্তী কোনও অনার্য্যগৃহে স্থান লাভ করিলেন কি না, তাহা আজ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। প্রাগুক্ত বাগ্দি পুরুষ শিশুটিকে গৃহে আনিয়া সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত লালন পালন করিল, এবং তাহার 'রঘু' এই নাম রাখিল। অতঃপর এক ব্রাহ্মণ বালকটির অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও তাহার শরীরে রাজকীয় চিহ্নসমূহ সন্দর্শনে তাহাকে গৃহে আনিলেন। অল্পদিনমধ্যেই ঐ দেশের রাজার (হাণ্টার সাহেবের মতে ইনি অনার্য্য ছিলেন) শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতে চলিল।

নানা দিগ্দেশ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ রাজধানীতে উপনীত হইলেন। উক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণও বালক রঘুর সহিত তথায় গমন করিলেন। যখন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেছিলেন (অনার্য্য রাজার গৃহে ও তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের অন্নগ্রহণ সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে হাণ্টার সাহেব কোনও আলোচনা করেন নাই), সেই ব্রাহ্মণভোজনের সময় রাজার পাট-হস্তী সহসা রঘুকে গ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসনে স্থাপন করিল। মন্ত্রিগণও রঘুনাথকে অভিষিক্ত করিলেন—এইরূপে রঘুনাথ বিষ্ণুপুরের মল্লবংশের প্রথম রাজা হইলেন।

রাজা গোপালসিংহের প্রদত্ত বিবরণে যে গল্পটি আছে এবং যে গল্পটি বিষ্ণুপুর পরগণার জনসাধারণে বেশী প্রচলিত, সেটি এই—

সন ১০২ সালে আর্য্যাবর্ত্তের কোনও রাজা সস্ত্রীক জগন্নাথ তীর্থ সন্দর্শনে বহির্গত হন। পথিমধ্যে ভীষণ জঙ্গল অতিক্রম করিবার সময় তিনি কোতুলপুরের নিকটবর্ত্তী লাউগ্রামে বিশ্রামার্থ অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় স্বীয় মহিষীকে আসন্নপ্রসবা দেখিয়া, তাঁহাকে পঞ্চানন নামক ব্রাহ্মণগৃহে, ভগীরথ গুহ নামক জনৈক কায়স্থের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। অল্পদিন পরেই রাণী একটি পুত্র প্রসব করিলেন এবং মাতাপুত্রে ঐ ব্রাহ্মণাশ্রয়ে ভগীরথের তত্ত্বাবধানে বাস করিতে লাগিলেন। সাত বৎসর বয়সে বালক ব্রাহ্মণের গোচারণের ভার লইয়া জঙ্গলে যাইত। একদিন প্রখর রৌদ্রপীড়িত ও শ্রমক্লিষ্ট হইয়া বালক অবসন্নদেহে ভূমিতে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে গৃহে ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। গ্রামের অন্যান্য বালকগণ গৃহে গমন করিল, কিন্তু রঘু ফিরিল না দেখিয়া, রঘুর মাতা ও পালক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ বালকটিকে বড় স্নেহ করিতেন। চিন্তাকুলমনে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ, যেস্থানে রঘু ঘুমাইতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল। রঘু প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, তাহার সুন্দর বদনের উপর প্রখর সূর্য্যরশ্মি পড়িতেছে এবং সেই তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি ভীষণ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া

তাহার শিয়রে দণ্ডায়মান। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সর্প ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল, ব্রাহ্মণও রঘুকে লইয়া চমৎকৃতচিত্তে গৃহে ফিরিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের ধারণা হইল, এই বালক কালে রাজা হইবে।

আর এক দিন, বর্ষাকাল, ভূরি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—গ্রামের জল শ্রুতিসুখকর কলকল, ছলছল শব্দ করিয়া নাচিতে নাচিতে গড়াইয়া গ্রাম-বহিঃস্থ মাঠে পড়িতেছে। ১২০০ বৎসর পরে আজও যেমন বাদলের দিনে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে হইয়া থাকে—সেদিনও লাউগ্রামের মৎস্য-শিকারামোদী বালক, যুবক, বৃদ্ধগণ—বোধ হয় আজিও পল্লীগ্রামে যে সমস্ত সহজ যন্ত্রাদির সাহায্যে মৎস্য-শিকার হইয়া থাকে—সেই সমস্ত যন্ত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কৌতূহলী বালক রঘুও পুলকচঞ্চলহৃদয়ে "বাড়" ও "জিভে" লইয়া একটি "আড়াগাড়ি"র নিকট গিয়া যন্ত্রগুলি যথানিয়মে স্থাপিত করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বালকের "আড়াগাড়ি"তে যাহা পড়িতে লাগিল, তাহা মাছ ত নয়ই, এমন কি, কোনরূপ প্রাণীই নয়—সেগুলি জড় পদার্থ—কতকগুলি স্বর্ণ-ইষ্টক। বালকের নির্ম্মলহৃদয়ে তখনও সাংসারিক লাভালাভ জ্ঞান বা অজ্ঞান, যাহাই বলুন, উদিত হয় নাই—সে মৎস্য সংগ্রহের আমোদে বঞ্চিত হইয়া যেন কতকটা বিরক্তির সহিতই স্বর্ণ-ইষ্টকগুলি ব্রাহ্মণের 'গোয়ালবাড়ী'তে ফেলিয়া রাখিল। ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণ তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যখন উপরোক্ত অতি অস্বাভাবিক গল্পটি শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল যে, এই বালক ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রাজা হইবে, এবং তিনি বালকের মাতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তিনিও ব্রাহ্মণবাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রঘু রাজা হইলে তিনিই রাজগুরু হইবেন। এদিকে বালক রঘু মল্লক্রীড়াদি তৎকালীন পুরুষোচিত ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ঐ অঞ্চলে একজন প্রধান কুস্তিগির হইয়া উঠিল। শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী পঞ্চম গড়ের রাজা—যিনি বাকুড়া গেজেটিয়ারে অনার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন—সেই রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল ও আদিমল্ল নামে বিখ্যাত হইল।

ক্রীড়ানিপুণ বলশালী বালক যৌবনের প্রারম্ভেই একজন যোদ্ধা হইয়া

উঠিল এবং পদুমপুরের রাজার অনুগ্রহে সর্দ্দার পদ লাভ করিল। একদিন পদুমপুরে কোনও উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনাদি হয়। নবীন যোদ্ধা রঘু এক অনাবৃত স্থানে আহারে বসিয়াছে, এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাজা ছত্র দ্বারা স্বীয় শরীর রক্ষা করিয়া সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করিতেছিলেন। যুবকের আহার হয় না দেখিয়া, মহৎ-হৃদয় রাজা স্বীয় ছত্র দ্বারা তাহাকে ও তাহার খাদ্যদ্রব্যসকল বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিলেন। এতদ্দর্শনে সকলে (রহস্যচ্ছলে ?) রাজাকে বলিলেন, তিনি যখন রঘুর মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াছেন, তখন তাহারও রাজপদ লাভ করা সঙ্গত। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজাও আহ্লাদ-পরিহাস-রসিত-হৃদয়ে রঘুকে লাউগ্রাম প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের অধিপতি করিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

সারগাছি আশ্রম।

মুর্শিদাবাদান্তর্গত সারগাছি রামকৃষ্ণমিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাপূর্ব প্রথম ষোল বর্ষের (১৮৯৮—১৯১৩ খৃঃ) সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখণ্ডানন্দজী এতাবৎকাল পরিচিত বন্ধুবর্গের সাহায্যেই উক্ত আশ্রমটীকে চালাইয়া আসিতেছিলেন বলিয়া কার্য্যবিবরণী প্রকাশের কোন প্রয়োজনই হয় নাই। এক্ষণে উক্ত আশ্রমটীকে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার কিছু পর হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ যাবৎ আশ্রমটী জনৈক সহৃদয়া মহিলা কর্ত্তৃক অস্থায়ী বাসের জন্য প্রদত্ত বাটীতেই অবস্থিত ছিল। আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ বহুদিন হইতে আশ্রমের নিজস্ব বাটী নির্ম্মাণোপযোগী স্থানের চেষ্টা করিতেছিলেন, ফলে সম্প্রতি বার্ষিক ২০৬/০ টাকা খাজনায় সারগাছি গ্রামে ৫০ বিঘা জমি মৌরসি স্বত্বে পাওয়া গিয়াছে। এবং তথায় কয়েকখানি চালা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটী উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আশ্রম অনাথবালকগণের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতি-কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এবং এপর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ জন অনাথ আশ্রমে স্থান পাইয়াছে। (ইহাদের মধ্যে ৪ জন মুসলমান ও ২টী বালিকাও ছিল।) তন্মধ্যে ৩৩ জন আশ্রমে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অন্যত্র সাধুভাবে এবং কোন কোন স্থলে সচ্ছল ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আশ্রমের বর্ত্তমান অনাথসংখ্যা ১০ জন। শিক্ষাদানকল্পে আশ্রমে একটী সাধারণ বিদ্যালয় ও চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমূহের সুবিধার জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয় বরাবর চলিয়া আসিতেছে। তদুদ্দেশ্যে একাধিক শিক্ষকও নিযুক্ত আছেন। আশ্রমের উন্নতাবস্থায় সাধারণ বিদ্যালয়টী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল এবং নিয়মিত সরকারী সাহায্যও প্রাপ্ত হইত। কিন্তু আশ্রমটীকে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহাভাবে উহার কার্য্যক্ষেত্রের বিলক্ষণ সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য তৎসংশ্লিষ্ট কৃষি-শিল্প-বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছে। কাশিমবাজারের বদান্য মহারাজ আশ্রমকে অন্য নানা প্রকারে সাহায্য করা ব্যতীত এই কৃষিশিল্প বিভাগের সমুদয় ব্যয়ভার একা বহন করিয়া আসিয়াছেন। এবং উহার জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়া উহার কার্য্য চলিতে থাকিলে, পুনরায় উহার ব্যয় তিনিই দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আশ্রমে একটী ছোট দাতব্য ঔষধালয়ও আছে, এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সকলে কলেরা প্রভৃতির প্রকোপকালে আশ্রম হইতে যথাসাধ্য সাহায্য করা হইয়া থাকে। স্থানাভাবে আমরা এখানে আশ্রমের বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যগুলির সবিস্তার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসু পাঠক আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট পত্র লিখিয়া রিপোর্ট আনাইয়া সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

আশ্রমটী যে দেশের একটী মহান্ অভাব পূরণ করিতেছে, তাহা হৃদয়বান পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে ইহার স্থায়িত্ব ও সম্যক্ উন্নতিকল্পে অর্থের প্রয়োজন। তজ্জন্য আশ্রম সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আনন্দের বিষয়, অনাথবালকগণের থাকিবার গৃহটী নির্ম্মাণ করিবার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং অন্য একজন সহৃদয় ব্যক্তি আর একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত

আছেন। তথাপি আশ্রমের শিল্পশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আশ্রমটীকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্মপ্রাণ, পরদুঃখকাতর জনসাধারণ এই মহদনুষ্ঠানে স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন। অনাথবালকগণের সাহায্যকল্পে যিনি যাহা দান করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে :—স্বামী অখণ্ডানন্দ, অধ্যক্ষ, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মহুলা পোঃ, (মুর্শিদাবাদ)।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১০ই জানুয়ারী রবিবার, বাঙ্গালোর মঠে স্বামিজীর ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভজনান্তে আঞ্জনেয়-মন্দিরে দুই সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। মঠ-ভবনে তিনঘণ্টাব্যাপী হরিকথার পর দুই সহস্র ভদ্রলোকের সমক্ষে ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত কে, চণ্ডী মহাশয়ের সভাপতিত্বে "কর্ণাটক"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডি, ভি, গুণ্ডাপা মহাশয় কর্ণাটী ভাষায় স্বামিজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তৎপরে সভাপতি মহাশয় একটী মনোহর, বহুজ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ইংরাজী বক্তৃতা এবং মিঃ এস, ডব্লিউ, কুইণ্টন এণ্ডারসন "স্বামী বিবেকানন্দ ও সার্থক ধর্ম্মজীবন" সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিশেষে মঙ্গলারতি ও প্রসাদবিতরণান্তে সভাভঙ্গ হয়।

দেরাদুনের সন্নিকটস্থ রায়পুরে স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, হোম, দরিদ্রনারায়ণ-সেবাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঢাকার অন্তঃপাতী সোণারগাঁ জি, আর, ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক স্বামিজীর জন্মোৎসব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে এবার গঙ্গাসাগর-মেলায় সেবাকার্য্যের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৮৬ জন সেবক ও চিকিৎসক পাঠান হইয়াছিল। কাঁথি হইতে একদল সেবক মিশনের অধীনে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। মিশন হইতে নিম্নলিখিতভাবে কার্য্য করা হইয়াছিল। (১) বাড়ী বাড়ী খুঁজিয়া রোগীর সন্ধান করা ও সরকারী ডাক্তারের সহযোগিতায় তাহাদিগকে ঔষধ পথ্যাদি প্রদান করা, (২) যাত্রিগণ বাড়ী হারাইয়া ফেলিলে তাহাদিগকে বাড়ী খুঁজিয়া দেওয়া, (৩) পুলিশের সহযোগিতায় যাত্রিগণকে ষ্টীমার হইতে নামান, (৪) সমুদ্র স্নানের এবং কপিলমুনি দর্শনের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য পাহারা দেওয়া, এবং (৫) কলেরা ওয়ার্ডটীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করা। এবার কলেরারোগীর সংখ্যা ছয় জন মাত্র ছিল এবং তথায় কোন লোকের মৃত্যু হয় নাই; কেবল একজন কলেরা রোগীকে ষ্টীমারে কলিকাতা পাঠান হয়, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটে আসিয়া তাহার মৃত্যু হয়। ওভারসিয়ার শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পুলিশ ইন্সপেক্টার শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দত্ত সর্ব্বদা মিশনের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন; শ্রীযুত মহেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, কণ্ট্রাক্টর, মিশনের কার্য্যের জন্য নিজব্যয়ে প্রধান কেন্দ্রের জন্য ৩ খানি ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য আমরা ইঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রধান কেন্দ্রটী ব্যতীত আরও চারিটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রে ডাক্তার ও সেবকগণ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। মেসার্স হোরমিলার কোম্পানি রেলার এবং ষ্টীমারে চিকিৎসার জন্য ঔষধ এবং সেবকগণের জন্য ৩০ খানি পাস দিয়াছিলেন, এবং মেসার্স কিলবর্ণ কোম্পানীও ২৫ খানি পাস দিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সেবক ও চিকিৎসকগণের খোরাকী, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং রোগীর ঔষধ পথ্যাদিতে মোট ৩২১৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শ্রীযুত কলেক্টর বাহাদুরস্বয়ং, এবং পুলিসের ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ম্মচারিগণ সকলেই অতি সহৃদয়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার যাত্রীর সংখ্যা অনেক কম হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

যৌবনের প্রারম্ভে।

(স্বামী সারদানন্দ)

পত্নী পরলোকে গমন করিলেন, কিন্তু রামকুমারের দুঃখদুর্দ্দিনের অবসান হইল না। বিদায় আদায় কমিয়া যাওয়ায় অর্থের অভাবে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। লক্ষ্মীজলার জমীখণ্ডে পর্য্যাপ্ত ধান্য এখনও উৎপন্ন হইলেও বস্ত্রাদি অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় পদার্থসকলের অভাব সংসারে প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তদুপরি তাঁহার বৃদ্ধা মাতার ও মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের জন্য এখন নিত্য দুগ্ধের প্রয়োজন। সুতরাং ঋণ করিয়া ঐ সকল প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল, এবং ঋণজালের প্রতিদিন বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। অশেষ চিন্তা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও রামকুমার উহা প্রতিরোধে অসমর্থ হইলেন। তখন বন্ধুবর্গের পরামর্শে অন্যত্র গমন করিলে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত মনও উহাতে সাহ্লাদে সম্মতি দান করিল। কারণ, প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া সংসার পাতিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি যে গৃহের সর্ব্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গৃহ হইতে দূরে থাকিলেই এখন শান্তিলাভের সম্ভাবনা। সুতরাং কলিকাতা বা বর্দ্ধমান কোথায় যাইলে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা এই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল প্রথমোক্ত স্থানে যাওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, শিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেশড়ার রামধন ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার পরিচিত অনেক ব্যক্তি কলিকাতা যাইয়া উপার্জ্জনের সুবিধা লাভ করিয়া নিজ নিজ সংসারের বেশ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে—একথা তাঁহার বন্ধুগণ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যক্তিরা যে তাঁহা

অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলে অনেকাংশে হীন, একথাও তাঁহারা তাঁহাকে বলিতে ভুলিলেন না। সুতরাং পত্নীবিয়োগের স্বল্পকাল পরেই শ্রীযুত রামকুমার রামেশ্বরের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং ঝামাপুকুর নামক পল্লীর ভিতর টোল খুলিয়া ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে নিযুক্ত হইলেন।

রামকুমারের পত্নীর মৃত্যুতে কামারপুকুরের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। শ্রীমতী চন্দ্রা ঐ ঘটনায় গৃহকর্ম্মের সমস্ত ভার পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের লালনপালনের ভারও ঐ দিন হইতে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। তাঁহার মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের পত্নী তাঁহাকে ঐ সকল কর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল; কিন্তু সে তখনও নিতান্ত বালিকা, তাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ৺রঘুবীরের সেবা, অক্ষয়ের লালনপালন এবং রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম, সকলই তাঁহাকে এখন করিতে হইত। ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, বিশ্রামের জন্য তিলার্দ্ধ অবসর থাকিত না। আটান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে * সংসারের সমস্ত ভার ঐরূপে স্কন্ধে লওয়া সুখসাধ্য না হইলেও শ্রীশ্রীরঘুবীরের ঐরূপ ইচ্ছা বুঝিয়া চন্দ্রা দেবী উহা বিনা অভিযোগে বহন করিতে লাগিলেন।

অন্য দিকে সংসারের আয়ব্যয়ের ভার শ্রীযুত রামেশ্বরের উপর এখন হইতে নিপতিত হওয়ায় তিনি কিরূপে উপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। কিন্তু কৃতবিদ্য হইলেও তিনি কোনকালে বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা শ্রবণ করি নাই। তদুপরি পরিব্রাজক সাধু ও সাধকগণকে দেখিতে পাইলে

* শ্রীমতী চন্দ্রা সন ১১৯৭ সালে জন্মগ্রহণ এবং সন ১২৮২ সালে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। "সাধকভাবে"র পরিশিষ্টের ৮ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে—তিনি সন ১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন, ৯০।৯৫ বৎসরে দেহত্যাগ করেন। পাঠক উহা এই ভাবে সংশোধন করিয়া লইবেন—সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চন্দ্রা দেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিদিবসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেককাল অতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অভাব দেখিলে উহা মোচন করিতে অনেক সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং আয় বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার দ্বারা সংসারের ঋণ পরিশোধ অথবা বিশেষ সচ্ছলতা সম্পাদিত হইল না। কারণ, সংসারী হইলেও তিনি সঞ্চয়ী হইতে পারিলেন না এবং সময়ে সময়ে আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া "৺রঘুবীর কোনরূপে চালাইয়া দিবেন" ভাবিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলেও শ্রীযুত রামেশ্বর তাহার শিক্ষাদি অগ্রসর হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে কোনকালে লক্ষ্য করিতেন না। কারণ, একে ঐরূপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, তদুপরি অর্থচিন্তায় তাঁহাকে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। সুতরাং ঐ বিষয় লক্ষ্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা এবং সময় উভয় বস্তুরই এখন অভাব হইয়াছিল। আবার এই অল্প বয়সেই বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি তাহাকে সুপথে ভিন্ন কখনও কুপথে পরিচালিত করিবে না। পল্লীর নরনারীসকলকে তাহার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং তাহাকে পরমাত্মীয় বোধে ভালবাসিতে দেখিয়া তাঁহার ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তিনি বুঝিতেন, বিশেষ সৎ এবং উদারচরিত্র না হইলে কেহ কখন সংসারে সকল ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। সেজন্য বালকের সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিত এবং তিনি সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সুতরাং রামকুমারের কলিকাতা গমনকালে গদাধর ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া এক প্রকার অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়িল এবং তাহার উন্নত প্রকৃতি তাহাকে যেদিকে ফিরাইতে লাগিল, সে এখন অবাধে সেই পথেই চলিতে লাগিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি গদাধরের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এই অল্প বয়সেই প্রত্যেক ব্যক্তির ও কার্য্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে শিখাইয়াছিল। সুতরাং অর্থলাভে সহায়তা হইবে বলিয়াই যে, পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসে এবং টোলে উপাধিভূষিত হইতে লোকে সচেষ্ট হয় ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই।

আবার, অশেষ আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক সেই অর্থ উপার্জ্জন এবং উহা দ্বারা সাংসারিক ভোগসুখ লাভ করিয়া লোকে তাহার পিতার ন্যায় সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবল এবং ধর্ম্মলাভে সক্ষম হয় না, ইহাও সে দিন দিন দেখিতে পাইতেছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ স্বার্থসুখে অন্ধ হইয়া বিষয়সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা উত্থাপনপূর্ব্বক গৃহ ও ক্ষেত্রাদিতে দড়ি ফেলিয়া "এই দিকটা আমার, ঐ দিকটা উহার" ইত্যাদি অংশ নিরূপণ করিয়া লইয়া কয়েক দিন ঐ বিষয় ভোগ করিতে না করিতেই শমনসদনে চলিয়া যাইল—ঐরূপ দৃষ্টান্তসকল কখনও কখনও অবলোকন করিয়া বালক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, অর্থ ও ভোগ-লালসা মানবজীবনে অনেক অনর্থ উপস্থিত করে। সুতরাং অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে সে যে এখন দিন দিন উদাসীন হইবে এবং পিতার ন্যায় 'মোটা ভাত কাপড়ে' সন্তুষ্ট থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতিলাভকে মনুষ্য-জীবনের সারোদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিবে ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্য বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমে গদাধর পাঠশালায় প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে যাইলেও ৺রঘুবীরের সেবা-পূজায় এবং গৃহকর্ম্মে সাহায্যদানপূর্ব্বক মাতার পরিশ্রমের লাঘব করিয়া এখন হইতে তাহার অধিককাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাহাকে এখন প্রায়ই বাটীতে থাকিতে হইত।

গদাধর ঐরূপে বাটীতে অধিক কাল অতিবাহিত করায় পল্লীরমণীগণের তাহার সহিত মিলিত হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া তাঁহাদিগের অনেকে অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং বালককে তথায় দেখিতে পাইয়া কখনও গান করিতে এবং কখন ধর্ম্মোপাখ্যানসকল পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ সকল অনুরোধ যথাসাধ্য পালন করিতে যত্নপর হইত। চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য তাহার অবসরের অভাব দেখিলে তাঁহারা আবার সকলে মিলিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার কর্ম্মসকল করিয়া দিয়া তাহার মুখে পুরাণকথা ও সঙ্গীতাদি শুনিবার অবসর করিয়া লইতেন। ঐরূপে তাঁহাদিগের নিকটে কিছুক্ষণ পাঠ ও সঙ্গীত করা

গদাধরের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীগণও উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, উহা অধিকক্ষণ শুনিবার আশয়ে তাঁহারা এখন হইতে নিজ নিজ গৃহকর্ম্মসকল শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিয়া চন্দ্রা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

গদাধর ইঁহাদের নিকটে শুদ্ধ পুরাণপাঠ মাত্রই করিত না। কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ইঁহাদিগের আনন্দ সম্পাদন করিত। গ্রামে ঐ সময়ে তিন দল যাত্রা, একদল বাউল এবং দুই এক দল কবি ছিল, তদ্ভিন্ন বহু বৈষ্ণব এখানে বসতি করায় অনেক গৃহেই প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগবতপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইত। বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করায় এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় ঐ সকল দলের পালা, গান ও সঙ্কীর্ত্তনসকল গদাধরের আয়ত্ত ছিল। সেজন্য রমণীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সে কোন দিন যাত্রার পালা, কোন দিন বাউলের গীতাবলী, কোন দিন কবি এবং কোন দিন বা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিত। যাত্রার পালা বলিবার কালে সে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভূমিকার কথাসকল উচ্চারণপূর্ব্বক একাকীই সকল চরিত্রের অভিনয় করিত। আবার নিজ জননী বা রমণীদিগের মধ্যে কাহাকেও কোন দিন বিমর্ষ দেখিলে সে ঐ সকল যাত্রার সঙের পালা অথবা সকলের পরিচিত গ্রামের কোন ব্যক্তির বিচিত্র আচরণ ও হাবভাবের এমন স্বাভাবিক অনুকরণ করিত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্য ও কৌতুকের তরঙ্গ ছুটিত।

সে যাহা হউক, গদাধর ঐরূপে ইঁহাদিগের হৃদয়ে ক্রমে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বালকের জন্মগ্রহণকালে তাহার জনকজননী যে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সে সকলের কথা ইঁহারা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার দেবদেবীর ভাবাবেশে সময়ে সময়ে তাহার যেরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অবস্থান্তর উপস্থিত হয় তাহাও তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার জ্বলন্ত দেবভক্তি, তন্ময় হইয়া পুরাণ-পাঠ, মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত এবং তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় সরল উদার আচরণ যে, তাঁহাদিগের কোমল হৃদয়ে এখন অপূর্ব্ব ভক্তি ও ভালবাসার উদয় করিবে ইহা বিচিত্র নহে। আমরা শুনিয়াছি, ধর্ম্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ীপ্রমুখ বর্ষীয়সী রমণীগণ বালকের ভিতরে বালগোপালের দিব্য

প্রকাশ অনুভব করিয়া তাহাকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন; এবং তদপেক্ষা স্বল্পবয়স্কা রমণীগণ তাহাকে ঐরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত সখ্যভাবে সম্বদ্ধা হইয়াছিলেন। রমণীগণের অনেকেই বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সরল কবিতাময় বিশ্বাসই তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল, সুতরাং অশেষ গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালককে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। সে যাহা হউক, ঐরূপ বিশ্বাসে তাঁহারা এখন গদাধরের সহিত মিলিতা হইয়া তাহাকে নিঃসঙ্কোচে আপনাপন মনের কথা খুলিয়া বলিতেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। গদাধরও তাঁহাদিগের সহিত এমন ভাবে মিলিত হইত যে, অনেক সময়ে তাহাকে তাঁহাদিগের রমণী বলিয়া মনে হইত। *

গদাধর কখন কখন রমণীর বেশভূষা ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিশেষ বিশেষ নারীচরিত্রের অভিনয় করিত। ঐরূপে শ্রীমতী রাধারাণীর অথবা তাঁহার প্রধানা সখী বৃন্দার ভূমিকা গ্রহণ করিবার কালে তাঁহারা তাহাকে অনেক সময় রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হইতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ অনুরোধ রক্ষা করিত। ঐ সময়ে তাহার হাব ভাব, কথাবার্ত্তা, চাল চলন প্রভৃতি অবিকল নারীর ন্যায় হইত। রমণীগণ উহা দেখিয়া বলিতেন, নারী সাজিলে গদাধরকে পুরুষ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না। উহাতে বুঝিতে পারা যায় বালক নারীগণের প্রত্যেক কার্য্য কত তন্ন তন্ন করিয়া ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিল। রঙ্গপ্রিয় বালক এই সময়ে কোন কোন দিন রমণীর ন্যায় বেশভূষা করিয়া কক্ষে কলসী ধারণপূর্ব্বক পুরুষদিগের সম্মুখ দিয়া হালদারপুকুরে জল আনয়নে গমন করিয়াছিল এবং কেহই তাহাকে ঐবেশে চিনিতে পারে নাই।

গ্রামের ধনী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সীতানাথের সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল; এবং কন্যাগণ

* সম্পূর্ণরূপে রমণীগণের ন্যায় হইবার বাসনা শ্রীযুত গদাধরের প্রাণে এই কালে কত প্রবল হইয়াছিল তাহা "সাধকভাবে"র চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২৮৯ ও ২৯০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ কথা হইতে পাঠক সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বিবাহের পরেও সীতানাথের ভবনে একান্নে অবস্থান করিতেছিল।* শুনা যায়, সীতানাথের বহু গোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন দশখানি শিলে বাটনা বাটা হইত, রন্ধনকার্য্যে এত মসলার প্রয়োজন হইত! তদ্ভিন্ন সীতানাথের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের অনেকে আবার তাঁহার বাটীর পার্শ্বে বাটী করিয়া বাস করিয়াছিল। সেজন্য কামারপুকুরের এই অংশ বণিকপল্লী নামে প্রসিদ্ধ ছিল; এবং উহা ক্ষুদিরামের বাটীর সন্নিকটে থাকায় বণিক-রমণীগণের অনেকে চন্দ্রা দেবীর নিকটে অবসরকালে উপস্থিত হইতেন; বিশেষতঃ আবার, সীতানাথের স্ত্রী ও কন্যাগণ। সুতরাং গদাধরের সহিত ইঁহাদিগের এখন বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ইঁহারা বালককে অনেক সময়ে নিজ ভবনে লইয়া যাইতেন, এবং রমণী সাজিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে অভিনয়াদি করিতে অনুরোধ করিতেন। অভিভাবকগণের নিষেধে তাঁহাদিগের আত্মীয়া রমণীগণের অনেকে তাঁহাদিগের বাটী ভিন্ন অন্যত্র যাইতে পারিতেন না এবং সেজন্য গদাধরের পাঠ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বালককে ঐরূপে নিজ ভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেন। ঐরূপে যাঁহারা চন্দ্রা দেবীর নিকটে যাইতেন না, বণিক-পল্লীর ভিতরে এমন অনেকগুলি রমণী ও গদাধরের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সে সীতানাথের ভবনে উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকমুখে সংবাদ পাইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাহার পাঠশ্রবণে ও অভিনয়াদি দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিতেন। বাটীর কর্ত্তা সীতানাথ গদাধরকে বিশেষরূপে ভালবাসিতেন, এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য পুরুষেরাও তাহার সদ্গুণসকলের সহিত পরিচিত ছিলেন। সেজন্য তাঁহাদিগের রমণীগণ তাহার নিকটে ঐরূপে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করে জানিয়াও তাঁহারা উহাতে আপত্তি করিতেন না।

* বণিকপল্লীর দুর্গাদাস পাইন নামক এক ব্যক্তি কেবল ঐ বিষয়ে আপত্তি করিতেন এবং গদাধরকে স্বয়ং শ্রদ্ধা ভক্তি করিলেও অন্দরের কঠোর অবরোধ-প্রথা কাহারও জন্য কোন কালে শিথিল হইতে দিতেন না। তাঁহার অন্তঃপুরের কথা কেহ জানিতে সক্ষম নহে এবং তাঁহার বাটীর রমণীগণকে কেহ কখনও অবলোকন করে নাই—বলিয়া তিনি সীতানাথ-প্রমুখ তাঁহার

আত্মীয়বর্গের নিকট সময়ে সময়ে অহঙ্কারও করিতেন। ফলতঃ সীতানাথ-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার ন্যায় কঠোর অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হীন জ্ঞান করিতেন।

দুর্গাদাস একদিন তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকটে ঐরূপে অহঙ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে গদাধর তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় শ্রবণ-পূর্ব্বক বলিলেন, "অবরোধপ্রথার দ্বারা রমণীগণকে কখন কি রক্ষা করা যায়, সৎশিক্ষা ও দেবভক্তি প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন; ইচ্ছা করিলে আমি তোমার অন্দরের সকলকে দেখিতে ও সমস্ত কথা জানিতে পারি।" দুর্গাদাস তাহাতে অধিকতর অহঙ্কৃত হইয়া বলিলেন, "কেমন জানিতে পার, জান দেখি?" গদাধরও তাহাতে 'আচ্ছা দেখা যাইবে' বলিয়া সেদিন চলিয়া আসিল। পরে একদিন অপরাহ্নে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বালক মোটা মলিন একখানি সাড়ী ও রূপার পৈঁছা প্রভৃতি পরিয়া দরিদ্রা তন্তুবায়-রমণীর ন্যায় বেশ ধারণপূর্ব্বক একটি চুবড়ি কক্ষে লইয়া ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাটের দিক হইতে দুর্গাদাসের ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস বন্ধুবর্গের সহিত তখন বহির্ব্বাটিতেই বসিয়াছিলেন। রমণী-বেশধারী গদাধর তাঁহাকে তন্তুবায়রমণী গ্রামান্তর হইতে হাটে সূতা বেচিতে আসিয়া সঙ্গিনীগণ ফেলিয়া যাওয়ায়, বিপন্না বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিল। দুর্গাদাস তাহাতে তাহার কোন্ গ্রামে বাস ইত্যাদি দুই একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তর শ্রবণান্তর বলিলেন, "আচ্ছা, অন্দরে স্ত্রীলোকদিগের নিকটে যাইয়া আশ্রয় লও।" গদাধর তাহাতে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল এবং রমণীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মপরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক নানাবিধ বাক্যালাপে পরিতুষ্টা করিল। তাহার স্বল্প বয়স দেখিয়া এবং মধুর বাক্যে প্রসন্না হইয়া দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরা তাহাকে থাকিতে দিলেন এবং তাহার বিশ্রামের স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া জলযোগ করিবার জন্য মুড়ি মুড়কি প্রভৃতি প্রদান করিলেন। গদাধর তখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে করিতে অন্দরের সকল ঘর ও প্রত্যেক রমণীকে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ

করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের বাক্যালাপে মধ্যে মধ্যে যোগদান এবং প্রশ্নাদি করিতেও সে ভুলিল না। ঐরূপে প্রায় এক প্রহর রাত্রি অতীত হইল। এদিকে এত রাত্রি হইলেও সে গৃহে ফিরিল না দেখিয়া চন্দ্রা দেবী রামেশ্বরকে তাহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং বণিকপল্লীতে সে প্রায় যাইয়া থাকে জানিয়া তাহাকে তথায় অন্বেষণ করিতে বলিয়া দিলেন। রামেশ্বর সেজন্য প্রথমে সীতানাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, বালক তথায় আসে নাই। অনন্তর দুর্গাদাসের ভবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর শুনিতে পাইয়া গদাধর অধিক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া দুর্গাদাসের অন্দর হইতে "দাদা, যাচ্চি গো" বলিয়া উত্তর দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তখন সকল কথা বুঝিলেন এবং বালক তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে অপ্রতিভ ও কিছু রুষ্ট হইলেও পরক্ষণেই তাহার দরিদ্র তন্তুবায়রমণীর বেশ ও চাল-চলনের অনুকরণ কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। সীতানাথপ্রমুখ দুর্গাদাসের আত্মীয়েরা পরদিন ঐ কথা জানিতে পারিয়া গদাধরের নিকটে তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এখন হইতে সীতানাথের ভবনে বালক উপস্থিত হইলে দুর্গা-দাসের অন্তঃপুরচারিণীরাও তাহার নিকটে আসিতে লাগিলেন।

সীতানাথের পরিবারবর্গ এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য রমণীগণ ক্রমে গদাধরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের নিকটে কিছু দিন না আসিলেই তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। সীতানাথের ভবনে পাঠ ও সঙ্গীতাদি করিবার কালে গদাধরের কখন কখন ভাবাবেশ উপস্থিত হইত। তদ্দর্শনে রমণীগণের তাহার প্রতি ভক্তি বিশেষ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি ঐরূপ ভাবসমাধিকালে তাঁহাদিগের অনেকে বালককে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন এবং অভিনয়কালে তাহার সহায়তা হইবে বলিয়া তাঁহারা একটি সুবর্ণনির্ম্মিত মুরলী এবং স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের অভিনয়োপযোগী বিবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রবণ পূতস্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং সপ্রেম সরল ও অমায়িক ব্যবহারে গদাধর পল্লীরমণীগণের উপরে এইকালে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিবরণ আমরা তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মুখে সময়ে সময়ে শুনিবার অবসর লাভ করিয়াছিলাম। সন ১২৯৯ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীপ্রমুখ আমরা কয়েক জন কামারপুকুর দর্শনে গমন করিয়া সীতানাথ পাইনের কন্যা শ্রীমতী রুক্মিণীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স তখন আন্দাজ ষাট বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুত গদাধরের পূর্ব্বোক্ত প্রভাব সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার এখানে উল্লেখ করিলে পাঠকের ঐ বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। শ্রীমতী রুক্মিণী বলিয়াছিলেন—

"আমাদের বাড়ী এখান হইতে একটু উত্তরে—ঐ দেখা যাইতেছে। আজ কাল আমাদের বাড়ীর ভগ্নাবস্থা, পরিবারবর্গ একরূপ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমার বয়স যখন সতর আঠার বৎসর ছিল, তখন বাড়ীটি দেখিলে লক্ষ্মীমন্তের বাড়ী বলিয়া বোধ হইত। আমার পিতার নাম ৺সীতানাথ পাইন। খুড়তুতো জাটতুতো সকলকে ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ আমরা সতর আঠারটি ভগ্নী ছিলাম এবং বয়সে পরস্পরে দুই পাঁচ বৎসরের ছোট-বড় হইলেও ঐকালে সকলেই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। গদাধর বাল্যকাল হইতে আমাদিগের সহিত একত্রে খেলা-ধূলা করিতেন। সেজন্য আমাদিগের সহিত তাঁহার খুব ভাব ছিল। আমরা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি আমাদের বাড়ীতে যাইতেন এবং ঐরূপে তিনি বড় হইবার পরেও আমাদিগের বাড়ীর অন্দরে যাতায়াত করিতেন। বাবা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন—আপনার ইষ্টের মত দেখিতেন ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। পাড়ায় কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, 'তোমার বাড়ীতে অতগুলি যুবতী কন্যা রহিয়াছে, গদাধরও এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে এখনও অত বাড়ীর ভিতরে যাইতে দাও কেন?' বাবা তাহাতে বলিতেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি গদাধরকে খুব চিনি।' তাহারা সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিত না। গদাধর বাড়ীর অন্দরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণকথা বলিতেন, কত রঙ্গ-পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় প্রতিদিন ঐ সকল শুনিতে শুনিতে

আনন্দে গৃহকর্ম্মসকল করিতাম। তিনি যখন আমাদিগের নিকটে থাকিতেন তখন কত আনন্দে যে সময় কাটিয়া যাইত তাহা একমুখে আর কি বলিব। যেদিন তিনি না আসিতেন সেদিন তাঁহার অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া আমাদিগের মন ছট্ ফট্ করিত। সেদিন যতক্ষণ না আমাদিগের কেহ জল আনিবার বা অন্য কোন কর্ম্মের দোহাই দিয়া বামুন মার (চন্দ্রা দেবীর) সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিত ততক্ষণ, আমাদিগের কাহারও প্রাণে শান্তি থাকিত না। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি আমাদের অমৃতের ন্যায় বোধ হইত। সে জন্য তিনি যেদিন আমাদিগের বাড়ীতে না আসিতেন, সেদিন তাঁহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাটাইতাম।"

কেবলমাত্র রমণীগণের সহিত ঐরূপে মিলিত হইয়াই গদাধর ক্ষান্ত ছিল না। কিন্তু তাহার সর্ব্বতোমুখী উদ্ভাবনী শক্তি এবং সকলের সহিত প্রেমপূর্ণ আচরণ তাহাকে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সহিত মিলিত করিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের বৃদ্ধ ও যুবকেরা যে সকল স্থলে মিলিত হইয়া ভাগবতাদি পুরাণপাঠ বা সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনাদিতে আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার সকল স্থলেই তাহার যাতায়াত ছিল। বালক ঐ সকল স্থলের যেখানে যেদিন উপস্থিত থাকিত সেখানে সেদিন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইত। কারণ, তাহার ন্যায় পাঠ ও ধর্ম্মতত্ত্বকালে ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে সক্ষম ছিল না। সঙ্কীর্ত্তনকালে তাহার ন্যায় ভাবোন্মত্ততা, তাহার ন্যায় নূতন নূতন ভাবপূর্ণ আখর দিবার শক্তি এবং তাহার ন্যায় মধুর কণ্ঠ ও রমণীয় নৃত্য আর কাহারও ছিল না। আবার, রঙ্গপরিহাসস্থলে তাহার ন্যায় সঙ্ দিতে, তাহার ন্যায় নরনারীর সকল প্রকার আচরণ অনুকরণ করিতে এবং তাহার ন্যায় নূতন নূতন গল্প ও গান যথাস্থলে অপূর্ব্বভাবে লাগাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে অন্য কেহ সমর্থ হইত না। সুতরাং যুবক ও বৃদ্ধেরা সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। বালকও সেজন্য কোন দিন এক স্থলে, কোন দিন অন্য স্থলে তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধিত করিত।

আবার এই বয়সেই বালক পরিণতবয়স্কের ন্যায় বুদ্ধি ধারণ করায়

তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ সাংসারিক সমস্যাসকলের সমাধানের জন্য তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ঐরূপে তাহার পূত-স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া এবং ভগবৎ-নাম ও কীর্ত্তনে তাহার ভাবসমাধি হইতে দেখিয়া, তাহার পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন।* কেবল ভণ্ড ও ধূর্ত্তেরা তাহাকে দেখিতে পারিত না। কারণ গদাধরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহাদিগের উপরের মোহনীয় আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদিগের গোপনীয় উদ্দেশ্যসকল ধরিয়া ফেলিত এবং সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী বালক অনেক সময়ে উহা সকলের নিকটে কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিত। শুদ্ধ তাহাই নহে, রঙ্গপ্রিয় গদাধর অনেক সময়ে অপরের নিকটে তাহাদিগের কপটাচরণের অনুকরণ করিয়াও বেড়াইত। উহার জন্য মনে মনে কুপিত হইলেও সকলের প্রিয়, নির্ভীক বালকের তাহারা কিছুই করিতে পারিত না। সেজন্য অনেক সময়ে শরণাগত হইয়া তাহাদিগকে গদাধরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইত। কারণ, শরণাগতের উপর বালকের অশেষ করুণা সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, গদাধর এখনও প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে পাঠশালায় উপস্থিত হইত এবং বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমই তাহার ঐরূপ করিবার কারণ ছিল। বাস্তবিক চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিকটে উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন এখন হইতেই অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবন অন্য কার্য্যের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং ধর্ম্মসাক্ষাৎকার করিতে তাহাকে তাহার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ের অস্পষ্ট ছায়া তাহার মনে অনেক সময়ে উদিত হইত, কিন্তু উহা এখনও পূর্ণাবয়ব না হওয়ায় সে উহাকে সকল সময়ে ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু নিজ জীবন ভবিষ্যতে কি ভাবে পরিচালিত করিবে একথা তাহার মনে যখনই

---

* শুনা যায় শ্রীনিবাস শাঁখারিপ্রমুখ কয়েক জন যুবক শ্রীযুত গদাধরকে এখন হইতে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিত।

উদিত হইত তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে তখনই ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহার কল্পনাপটে গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালব্ধ ভোজন এবং নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিত। তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় কিন্তু তাহাকে পরক্ষণেই মাতা ও ভ্রাতাদিগের সাংসারিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে ঐ পথে গমনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে এবং নিজ পিতার ন্যায় নির্ভরশীল হইয়া সংসারে থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উত্তেজিত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয় তাহাকে ভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করায় সে 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' ভাবিয়া ঈশ্বরের আদেশ-লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। কারণ বালকের প্রেমপূর্ণ হৃদয় একান্ত আপনার বলিয়া তাঁহাকেই ইতিপূর্ব্বে অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং যথাকালে তিনি ঐ প্রশ্ন সমাধান করিয়া দিবেন ভাবিয়া সে যেন অনেক সময়ে আপনাকে শান্ত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বস্থলে তাহার বিশুদ্ধ হৃদয়ই পরিশেষে জয়লাভ করিত এবং উহার প্রেরণাতেই সে এখন সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিল।

অসাধারণ সহানুভূতিসম্পন্ন গদাধরের বিশুদ্ধ হৃদয় তাহাকে এখন হইতে অন্য এক বিষয়ও সময়ে সময়ে উপলব্ধি করাইতেছিল। পুরাণপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি সহায়ে উহা তাহাকে গ্রামের নরনারীসকলের সহিত ইতিপূর্ব্বে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে এত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছিল যে, তাহাদিগের জীবনের সুখদুঃখাদি সে এখন হইতে সর্ব্বতো-ভাবে আপনার বলিয়া অনুভব করিতেছিল। সুতরাং তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে এইকালে যখনই সংসার পরিত্যাগে ইঙ্গিত করিত, তাহার হৃদয় তাহাকে তখনই ঐ সকল নরনারীর সরল প্রেমপূর্ণ আচরণ এবং তাহার প্রতি অসীম বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে এমন ভাবে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে বলিত, যদ্দর্শনে তাহারা সকলে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিবার উচ্চাদর্শ লাভে কৃতার্থ হইতে পারে এবং তাহার সহিত তাহাদিগের বর্ত্তমান সম্বন্ধ যাহাতে সুগভীর পারমার্থিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত অবিনশ্বর হইতে পারে। বালকের স্বার্থগন্ধশূন্য হৃদয় তাহাকে ঐ বিষয়ের স্পষ্ট আভাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে ঐ জন্য

বলিতেছিল, 'আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা—সে ত স্বার্থপরতা; যাহাতে ইহারা সকলে উপকৃত হয় এমন কিছু কর।'

পাঠশালায়, এবং পরে, টোলে বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে কিন্তু গদাধরের হৃদয় ও বুদ্ধি এখন মুক্তকণ্ঠে এক কথাই বলিতেছিল; কিন্তু সহসা পাঠশালা পরিত্যাগ করিলে বয়স্যগণ তাহার সঙ্গলাভে অনেকাংশে বঞ্চিত হইবে বলিয়াই সে ঐ কার্য্য এখনও করিতে পারিতেছিল না। কারণ, গয়াবিষ্ণুপ্রমুখ বালকের সমবয়স্ক সকলে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, এবং তাহার অসাধারণ বুদ্ধি ও অসীম সাহস তাহাকে এখানেও দলপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময়ের একটি ঘটনায় বালক অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। গদাধরের অভিনয় করিবার শক্তি দেখিয়া তাহার কয়েক জন বয়স্য এখন একটি যাত্রার দল খুলিবার প্রস্তাব একদিন উত্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানের ভার গদাধরকে লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাধরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইল। কিন্তু অভিভাবকগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন্ স্থানে তাহারা ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবে তদ্বিষয়ে বালকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িল। গদাধরের উদ্ভাবনী শক্তি তখন তাহাদিগকে মাণিক রাজার আম্রকানন দেখাইয়া দিল এবং স্থির হইল পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইবে।

সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল এবং গদাধরের শিক্ষায় বালকগণ স্বল্প সময়ের ভিতরেই আপন আপন ভূমিকা ও গানসকল কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয়ে আম্রকানন মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশ্য, ঐ সকল যাত্রাভিনয়ের সকল অঙ্গই গদাধরকে নিজ উদ্ভাবনী শক্তিবলে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইত এবং উহাদিগের প্রধান চরিত্রের ভূমিকা-সকল তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইত। যাহাই হউক, যাত্রার দল এক-প্রকারে মন্দ গঠিত হইল না দেখিয়া বালকেরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিল এবং শুনা যায়, আম্রকাননে অভিনয়কালেও গদাধরের সময়ে সময়ে ভাবসমাধি উপস্থিত হইয়াছিল।

সঙ্কীর্ত্তন ও যাত্রাভিনয়ে গদাধরের অনেককাল অতিবাহিত হওয়ায় তাহার চিত্রবিদ্যা এখন আর অধিক অগ্রসর হইতে পায় নাই। তবে শুনা যায়, গৌরহাটিগ্রামে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলাকে বালক এই সময়ে একদিন দেখিতে গিয়াছিল এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল তাহার ভগিনী প্রসন্নমুখে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে। উহা দেখিয়া সে অল্পদিন পরে তাহার ভগিনীর ও তৎস্বামীর ঐভাবের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, পরিবারস্থ সকলে উহাতে চিত্রগত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের সহিত শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলার ও তৎস্বামীর নিকটসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল সংগঠনে কিন্তু গদাধর বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, তাহার ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতি তাহাকে ঐসকল মূর্ত্তি-গঠনপূর্ব্বক বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে যথাবিধি পূজা করিতে অনেক সময়ে প্রযুক্ত করিত। সে যাহা হউক, পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া গদাধর নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকলে নিযুক্ত থাকিয়া এবং চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ও তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে অনেক সময় নিযুক্ত রাখিত। কারণ, চন্দ্রা দেবীকে গৃহকর্ম্মের অবসর দিবার জন্য ঐ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করা এবং নানাভাবে খেলা দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা এখন তাহার নিত্য কর্ম্মসকলের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। ঐরূপে তিনবৎসরের অধিক-কাল অতীত হইয়া গদাধর ক্রমে সপ্তদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। ঐ তিন বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীযুত রামকুমারের কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারও উপার্জ্জনের পূর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছিল।

কলিকাতায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও শ্রীযুত রামকুমার বৎসরান্তে একবার কয়েক পক্ষের জন্য কামারপুকুরে আগমনপূর্ব্বক জননী ও ভ্রাতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধান করিতেন। গদাধরের বিদ্যার্জ্জনে উদাসীনতা ঐ অবসরে লক্ষ্য করিয়া তিনি এখন চিন্তিত হইয়াছিলেন। সে যেভাবে বর্ত্তমানে কাল কাটাইয়া থাকে তিনি তদ্বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান লইলেন এবং মাতা ও মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে

কলিকাতায় নিজসমীপে রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া নিরূপণ করিলেন। ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত টোলের গৃহকর্ম্মও অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; সেজন্য ঐ সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে একজন লোকের অভাবও তিনি ঐ সময়ে বোধ করিতেছিলেন। অতএব স্থির হইল যে, গদাধর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য দান করিবে এবং অন্যান্য ছাত্র-গণের ন্যায় তাঁহারই নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিবে। গদাধরের নিকটে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পিতৃতুল্য অগ্রজকে সাহায্য করিতে হইবে জানিতে পারিয়া সে কলিকাতা গমনে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীযুত রামকুমার ও গদাধর ৺রঘুবীরকে প্রণামপূর্ব্বক চন্দ্রা দেবীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। কামারপুকুরের আনন্দের হাট কিছুকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যাইল এবং শ্রীমতী চন্দ্রা ও গদাধরের প্রতি অনুরক্ত নরনারী সকলে তাহার মধুময় স্মৃতি ও ভাবী উন্নতির চিন্তা করিয়া কোনরূপে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কলিকাতায় আগমন করিবার পরে শ্রীযুত গদাধর যে সকল অলৌকিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, পাঠক সে সকল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের 'সাধকভাব' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন।

স্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতি।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

একদিন অপরাহ্ণে এক ঘর লোক বসিয়া আছে, স্বামিজীর খেয়াল হইল, গীতাপাঠ করিতে হইবে। অমনি গীতা আনা হইল। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামিজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে সে দিন তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ২।৪ দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহা গীতাতত্ত্ব নামে প্রথমে উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় ও পরে "ভারতে বিবেকানন্দে"র অঙ্গীভূত করা হয়। সুতরাং সেই কথাগুলি পুনরায় লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ইচ্ছা করি না; কিন্তু এখানে ঐ গীতা-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে

স্বামিজীকে যে বিভিন্নভাবে ভাবিত দেখিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা মহাপুরুষের বাক্যাবলী অনেক সময় যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করি বটে, কিন্তু যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই সব বাক্য তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা প্রায় লিপিবদ্ধ থাকে না ; আবার মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ না হইলে হাজার বর্ণনা করিলেও লোকে তাঁহাদের ভিতরের জিনিষ লইতে পারে না। তথাপি তাঁহাদের সম্বন্ধে যতটা যথাযথ লিপিবদ্ধ থাকে, ততটাই—যাঁহাদের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ হয় নাই, তাঁহাদের বড়ই আদরের বস্তু হয়, এবং তাহার আলোচনায় ও ধ্যানে তাঁহাদের কল্যাণ হয়। হে পাঠকবর্গ, সেই মহাপুরুষের যে ছবি এখনও যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাহা তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হউক—তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সেই মহাপণ্ডিত, মহাতেজস্বী, মহাপ্রেমিকের ছবি জাগিতেছে। তোমরাও একবার আমার সহিত দেশকালের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের স্বামিজীকে দেখিবার চেষ্টা কর।

যখন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি একজন কঠোর সমালোচক—কৃষ্ণার্জ্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ-পরম্পরা যখন তন্নতন্নরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সময়ে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্তির নিকট অতি কঠোর সমালোচকও হার মানিয়া যায়। ঐতিহাসিকত্বের এইরূপ তীব্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামিজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ না করিয়াই পরে বুঝাইলেন, ধর্ম্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক গবেষণায় শাস্ত্রবিবৃত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হইলেও সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক না রহিল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নাই ?—এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামিজী বুঝাইলেন, নির্ভীক-ভাবে এই সকল ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্য মহান্ হইলেও তজ্জন্য মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং যদি লোকে সর্ব্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে

আশ্রয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। তার পর গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্ব্বমত-সমন্বয় ও নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করিয়া শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনাবাক্য পড়িয়া তিনি স্বয়ং সর্ব্বসাধারণকে যে ভাবে উপদেশ দেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল—"নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে" এ ত তোমার সাজে না—তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে যে নানারূপ ভাববিকৃতি দেখিতেছি—তাহা ত তোমার সাজে না। প্রফেটের মত ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর হইতে যেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করিলে চলিবে না।" "মহাপাপীকে ঘৃণা করো না" এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ হইয়াছে—তাহাতে কঠোরতার যেন লেশমাত্র নাই।

এই এক শ্লোকের মধ্যেই স্বামিজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখিয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, "এই একটীমাত্র শ্লোক পড়্লেই সমগ্র গীতা পাঠের ফল হয়।"

* * * *

একদিন ব্রহ্মসূত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, "ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না পড়িয়া এখন স্বাধীনভাবে সকলে সূত্রগুলির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা কর্।" প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পড়া হইতে লাগিল। স্বামিজী যথাযথভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, "সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ উহার উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করিলে সকলেই উহার যথাযথ উচ্চারণ করিতে পারে। কেবল আমরা বাল্যকাল হইতে অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হইয়াছি—তাই উহা এখন আমাদের এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা' শব্দকে 'আত্‌মা' এইরূপ উচ্চারণ না করিয়া 'আত্তাঁ' এই ভাবে উচ্চারণ

করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলিয়াছেন, অপশব্দ উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ—আমরা সকলেই ত পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হইয়াছি।" তখন নূতন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসিগণ এক এক করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি পড়িতে লাগিলেন। পরে স্বামিজী যাহাতে সূত্রের প্রত্যেক শব্দটী ধরিয়া উহার অক্ষরার্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন, সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, একথা কে বলিল? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন—তিনি সকল সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বি—ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌বি। উদাহরণস্বরূপ দেখ্—'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'—এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, ইহাতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হইয়াছে।

স্বামিজী একদিকে যেমন গম্ভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও ছিলেন। পড়িতে পড়িতে 'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা' সূত্রটী আসিল। স্বামিজী এই সূত্রটী পাইয়াই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সূত্রটীর প্রকৃত অর্থ এই—যখন উপনিষদে জগৎকারণের প্রসঙ্গ উঠাইয়া 'সোঽকাময়ত'—তিনি (অর্থাৎ সেই জগৎকারণ) কামনা করিলেন, এইরূপ কথা আছে, তখন অনুমানগম্য (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। স্বামিজী কি যাহারা শাস্ত্রগ্রন্থের নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুসারী কদর্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্ম্মকে ঘোর বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, গ্রন্থকারের যাহা কোনকালে অভিপ্রেত ছিল না, তিনি যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এমন সকল বিষয় গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুরূপে প্রতিপন্ন করিয়া ধর্ম্ম জিনিষটাকে শিষ্টজনের দূরাৎ পরিহর্ত্তব্য পদার্থ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন, অথবা যেমন তিনি অন্যান্য অনেক সময় বলিয়াছেন যে, কঠিন শুষ্ক গ্রন্থ আয়ত্ত করাইবার জন্য তিনি তন্মধ্যে সাধারণ মনের উপযোগী রসিকতা প্রবেশ করাইয়া অপরকে সহজেই তাহা আয়ত্ত করাইয়া দিতেন, সেই চেষ্টা করিতেছিলেন?

যাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ' সূত্র আসিল। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বামিজী প্রেমানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান্ বল্‌তেন, সে ঐ ভাবে বল্‌তেন।" এই কথা বলিয়াই কিন্তু স্বামিজী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেন, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।" এই বলিয়া আবার অন্য সূত্র পড়িতে বলিলেন।

এখানে ঐ সূত্রটী সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনসংবাদ নামক একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, প্রতর্দ্দন নামক জনৈক রাজা দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করাতে ইন্দ্র তাঁহাকে বর দিতে চান। প্রতর্দ্দন তাহাতে এই বর প্রার্থনা করেন যে, আপনি যাহা মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করেন, তাহাই বর দিন্। তাহাতে ইন্দ্র তাঁহাকে এই উপদেশ দেন, 'মাং বিজানীহি'—আমায় জান। এক্ষণে সূত্রকার ঐ 'আমাকে' অর্থে ইন্দ্র কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এই প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। সমুদয় আখ্যায়িকাটী অধ্যয়ন করিলে প্রথমেই কতকগুলি সন্দেহ হয়—'আমাকে' বলিতে স্থানে স্থানে বোধ হয় যেন ইন্দ্র দেবতাকে বুঝাইতেছে, স্থানে স্থানে আবার প্রাণকে বুঝাইতেছে, কোথাও বা জীবকে বুঝাইতেছে, কোথাও বা আবার ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে—এইরূপ বোধ হয়। এক্ষণে নানাপ্রকার বিচারের দ্বারা সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ঐ স্থলে 'আমাকে' অর্থ ব্রহ্মকে। 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সূত্রকার এমন একটী উদাহরণ দেখাইতেছেন, যাহার সঙ্গে ইন্দ্রের এইরূপ ভাবে উপদেশ সঙ্গত হয়। উপনিষদের স্থলবিশেষে আছে, বামদেব ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি মনু, আমি সূর্য্য হইয়াছি। ইন্দ্রও এইরূপে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাকে জান' এখানে আমি ও ব্রহ্ম এক কথা।

স্বামিজীও স্বামী প্রেমানন্দকে বলিতেছিলেন, পরমহংসদেব যে কখন কখন নিজেকে ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা হইতেই করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সিদ্ধপুরুষমাত্র, অবতার নহেন। এই কথা

বলিয়াই কিন্তু জনান্তিকে বলিলেন, রামকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, আমি শুধু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নহি, আমি অবতার। সুতরাং আমাদের একটী বন্ধু যেমন বলিতেন, রামকৃষ্ণকে শুধু একজন সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ বলিতে পারা যায় না, যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়, নতুবা প্রতারক বলিতে হয়।

যাহা হউক, স্বামিজীর কথায় আমার একটা বিশেষ উপকার হইল। সামান্য ইংরাজী পড়িয়া আর কিছু হউক না হউক, সন্দেহ করিতে বিশেষ শিখিয়াছিলাম। মহাপুরুষগণের শিষ্যগণ তাঁহাদের গুরুকে বাড়াইতে যাইয়া নানারূপ কল্পনা ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় করে, ইহাই অন্তরে অন্তরে সংস্কার ছিল। অদ্ভুত sincerity, সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া, তিনি যে কোনরূপ অতিরঞ্জন করিতে পারেন, এধারণা একেবারে দূর হইয়াছিল, স্বামিজীর বাক্য ধ্রুব সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বাক্যে পরমহংসদেব সম্বন্ধে এক নূতন আলোক পাইলাম। যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ—এই কথা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, এখন এই কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। স্বামিজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই, ফস্ করিয়া কাহারও কথা বিশ্বাস করিতে বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-চরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি ত তাঁহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও বুঝিতে পারি নাই—উহা যত বুঝিবার চেষ্টা করিবে, ততই সুখ পাইবে, ততই মজিবে।

* * * *

একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজন শিখাইতে লাগিলেন। প্রথম সকলে আসন করিয়া বস্; ভাব্,—আমার আসন দৃঢ় হউক, এই আসন অচল অটল হউক, ইহার সহায়তাতেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব। সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তার পর বলিলেন, ভাব্,—আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ—ইহা বজ্রের মত দৃঢ়—এই দেহসহায়ে আমি সংসারের পারে যাইব। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন—এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হইতে

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চতুর্দ্দিকে প্রেমের প্রবাহ যাইতেছে—হৃদয়ের ভিতর হইতে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হইতেছে—সকলের কল্যাণ হউক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হউক। এইরূপ ভাবনার পর কিয়ৎক্ষণ প্রাণায়াম করিবে, অধিক নয়, তিনটী প্রাণায়াম করিলেই হইবে। তার পর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটী আধ ঘণ্টা আন্দাজ করবি। সকলেই স্বামিজীর উপদেশমত চিন্তাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামিজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া বহুকাল যাবৎ, এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তার পর এইরূপ কর, বলিয়া বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া স্বামিজীপ্রোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাস করাইয়াছিলেন।

* * * * *

একদিন সকালবেলা ৯টা ১০টার সময় আমি একটা ঘরে বসিয়া কি করিতেছি—হঠাৎ তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্ম্মলানন্দ) আসিয়া বলিলেন, স্বামিজীর নিকট দীক্ষা লইবে? আমিও বলিলাম, আজ্ঞা হাঁ। ইতিপূর্ব্বে আমি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্র গ্রহণ করি নাই। জনৈক যোগীর নিকট প্রাণায়ামাদি কয়েকটী যোগের ক্রিয়া লইয়া প্রায় ৩ বৎসর সাধন এবং তাহাতে কতকটা শারীরিক উন্নতি ও মনের স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের অত্যাবশ্যকতা, এবং প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি অন্যান্য পথগুলি একেবারে বৃথা—এইরূপ গোঁড়ামি আমার আদৌ ভাল লাগিত না। অপরদিকে মঠের অন্য কোন কোন সন্ন্যাসী বা তাঁহাদের অনুগত ভক্তগণ যোগের নাম শুনিলেই উড়াইয়া দিতেন ও উহাতে বিশেষ কিছু হয় না, পরমহংসদেব উহার তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না, ইত্যাদি কথা তাঁহাদের নিকট শুনিতে পাইতাম। স্বামিজীর রাজযোগ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই গ্রন্থের প্রণেতা যেমন যোগমার্গের সমর্থক, তদ্রূপ অন্যান্য মার্গের প্রতিও শ্রদ্ধাসম্পন্ন, গোঁড়া ত নহেনই, বরং এরূপ উদারভাবের

আচার্য্য আমার নয়নপথে কখন পতিত হন নাই—তাহাতে আবার সন্ন্যাসী—সুতরাং তাঁহার প্রতি যে আমার হৃদয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরে বিশেষরূপে জানিয়াছি যে, পরমহংসদেব সাধারণতঃ প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার উপদেশ করিতেন না, তিনি জপ ও ধ্যানেরই বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, বলিতেন, ধ্যানাবস্থা প্রগাঢ় হইলে বা ভক্তির প্রাবল্যে প্রাণায়াম আপনা আপনি হইয়া যায়, এই সকল দৈহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অনেক সময় দেহের দিকে মন আসিয়া পড়ে; কিন্তু অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে যোগের উচ্চাঙ্গের সাধনা করাইতেন, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহাদিগের কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া দিতেন এবং ষট্‌চক্রের বিভিন্ন চক্রে মনঃস্থৈর্য্যের সুবিধার জন্য সময়ে সময়ে দেহের স্থানবিশেষে আল্‌পিন ফুটাইয়া তথায় মনঃস্থির করিতে বলিতেন। স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণের অনেককে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধ হয়, স্বামিজীর স্বকপোলকল্পিত নহে, উহা তাঁহার গুরূপদিষ্ট মার্গ। আর একটী কথা স্বামিজী বলিতেন যে, কাহাকেও যথার্থ সৎমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, তাহারই ভাষায় তাহাকে উপদেশ করিতে হইবে। এই ভাব অনুসরণ করিয়াই তিনি ব্যক্তিবিশেষকে বা অধিকারিবিশেষকে বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতেন এবং সর্ব্ববিধ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই অল্প বিস্তর আধ্যাত্মিক সাহায্য করিতে কৃতকার্য্য হইতেন।

যাহা হউক, আমি এতদিন তাঁহার উপদেশ শুনিতেছি, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক সাহায্য কিছু পাই নাই, পাইবার চেষ্টাও করি নাই। চেষ্টা করি নাই, তাহার কারণ—বলিতে ভরসা হয় নাই—আরও মনে মনে একটা ভাব ছিল বোধ হয় যে, যখন ইঁহার আশ্রিত হইলাম, তখন যাহা প্রয়োজন, সবই পাইব। কি ভাবে আধ্যাত্মিক সাহায্য করিবেন, তাহাও জানা ছিল না। এক্ষণে নির্ম্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধা রহিল না। 'লইব' বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জানিতাম না যে, সেদিন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দীক্ষা লইতেছেন—তখনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয়, ঠাকুরঘরের বাহিরে একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়াছিল। তার পর

শরৎবাবু বাহির হইয়া আসিবামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া স্বামিজীকে বলিলেন, এ দীক্ষা লইবে। স্বামিজী আমাকে বসিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর সাকার ভাল লাগে, না, নিরাকার ভাল লাগে?' আমি বলিলাম, 'কখন সাকার ভাল লাগে, কখন বা নিরাকার ভাল লাগে।' তিনি এই উত্তরে বলিলেন, 'তা নয়; গুরু বুঝ্‌তে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।' এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্পক্ষণ যেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। তার পর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তুই কখন ঘটস্থাপনা করে পূজো করেছিস্?' আমি বাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে ঘটস্থাপনা করিয়া কোন পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলাম—তাহা বলিলাম। তিনি তখন একটী দেবতার মন্ত্র বলিয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "এই মন্ত্রে তোর সুবিধা হবে। আর ঘটস্থাপনা করে পূজো করে তোর সুবিধে হবে।" তৎপরে আমার সম্বন্ধে একটী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া পরে সম্মুখে কয়েকটী লিচু পড়িয়াছিল—সেইগুলি লইয়া আমায় গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিতে বলিলেন।

আমি দেখিলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তবে স্বামিজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দিলেন, তাহাই আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসঙ্গত। শুনিয়াছিলাম যে, যথার্থ গুরুরা শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া মন্ত্র দেন—স্বামিজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামিজীর আহার হইল—স্বামিজীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমি ও শরৎবাবু উভয়েই ধারণ করিলাম। (ক্রমশঃ)

দেববাণী।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

১লা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার।

প্রকৃত গুরু তিনি, যিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্ব্বপুরুষ—আমরা যাঁর ভিতরের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী। তিনিই সেই প্রণালী, যার মধ্য

দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তিনিই সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ-সূত্রস্বরূপ। ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে দুর্ব্বলতা ও অন্তঃসারশূন্য বহিঃপূজা আস্‌তে পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগে খুব দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে আমাদের সংযোগবিধান করেন। যদি তোমার গুরুর ভিতর যথার্থ সত্য থাকে, তবে তাঁর আরাধনা কর, ঐ গুরুভক্তিই তোমাকে অতি সত্বর চরম অবস্থায় নিয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুর ন্যায় পবিত্রস্বভাব ছিলেন। তিনি জীবনে কখন টাকা ছোঁন নাই, আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে গিছ্‌ল। বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিখ্‌তে যেও না, তাঁদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভিতর মানুষভাবটা মরে গিছ্‌ল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। তিনি বাস্তবিকই পাপ দেখ্‌তে পেতেন না—তিনি সত্য সত্যই যে চক্ষে বহির্জ্জগতে পাপ দর্শন হয়, তদপেক্ষা পবিত্রতর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। এইরূপ অল্পসংখ্যক কয়েকজন পরমহংসের পবিত্রতাই সমগ্র জগৎটাকে ধারণ করে রেখেছে। যদি এঁরা সকলেই মারা যান, সকলেই যদি জগৎকে ত্যাগ করে যান, তবে জগৎ খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল নিজে মহোচ্চ পবিত্র জীবনযাপন করে লোকের কল্যাণ বিধান করেন, কিন্তু তাঁরা যে অপরের কল্যাণ কচ্ছেন, তা তাঁরা টেরও পান না; তাঁরা নিজেরা আদর্শ জীবন যাপন করেই সন্তুষ্ট।

* * * *

আমাদের ভিতরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্ত্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার আভাস দিয়ে থাকে, আর উহাকে অভিব্যক্ত কর্‌বার উপায় বলে দেয়, কিন্তু যখন আমরা নিজেরা সেই জ্ঞান লাভ করি, তখনই আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝ্‌তে পারি। যখন তোমার ভিতর সেই অন্তর্জ্যোতির প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন?—তখন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমুদয় শাস্ত্রে যা আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজারগুণ বেশী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কখন হারিও না, এ জগতে তুমি সব কর্‌তে পার। কখনও নিজেকে দুর্ব্বল ভেবো না, সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে।

বাস্তব ধর্ম্ম যদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে চুলোয় যাক্ সব ধর্ম্ম, চুলোয় যাক্ সব শাস্ত্র। ধর্ম্ম আমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে। কোন শাস্ত্র বা কোন গুরু আমাদের উহাকে লাভ কর্‌বার সাহায্য ভিন্ন আর কিছু কর্‌তে পারেন না; এমন কি, উঁহাদের সহায়তা ব্যতীতও আমাদের নিজেদের ভিতরেই সব সত্য লাভ কর্‌তে পারি। তথাপি শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন হও, কিন্তু উঁহারা যেন তোমায় বদ্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈশ্বর বলে উপাসনা কর, কিন্তু অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করো না। তাঁকে যতদূর সম্ভব ভালবাস, কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধ বিশ্বাস তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই নিজের মুক্তিসাধন কর। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই একমাত্র ধারণা রাখ যে, তিনি আমাদের নিত্য সাহায্যদাতা।

স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম—দুই একসঙ্গে থাকা চাই, তা হলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে না। আমরা ভগবান্‌কে কিছু দিতে পারি না, তিনিই আমাদের সব দিয়ে থাকেন। তিনি সকল গুরুর গুরুস্বরূপ। তিনি আমাদের আত্মার আত্মাস্বরূপ, আমাদের যা যথার্থস্বরূপ, তাই তিনি। যখন তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ, তখন আমরা যে তাঁকে ভালবাস্‌ব, এ আর আশ্চর্য্য কি? আর কাকে বা কোন্ বস্তুকে আমরা ভাল বাস্‌তে পারি? আমাদের 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্' হওয়া চাই। যখন তোমরা কেবল ব্রহ্মকেই দেখ্‌বে, তখন আর কার উপকার করতে পার্‌বে? ভগবানের ত আর উপকার কর্‌তে পার না? তখন সব সংশয় চলে যায়, সর্ব্বত্র সমত্বভাব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর ত নিজেরই কল্যাণ কর্‌বে। এইটী অনুভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি যে তার সেবা কর্‌ছ, তার কারণ, তুমি তার চেয়ে ছোট; এ নয় যে, তুমি বড় আর সে ছোট। যেমন গোলাপ নিজের স্বভাববশতঃই সুগন্ধ বিতরণ করে, আর, সুগন্ধ দিচ্ছি বলে মোটেই টের পায় না, তুমিও সেই ভাবে দান কর।

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দুসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটা ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ

করেছিলেন। তিনিই সতীদাহপ্রথা বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কারকার্য্য সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের দ্বারা সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং উহা রহিত কর্‌বার জন্য গবর্ণমেণ্টের সহায়তালাভে কৃতকার্য্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরাজেরা কিছুই করেন নি। তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে বিখ্যাত ধর্ম্মসমাজও স্থাপন করেন, আর একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি তারপর সরে এলেন এবং তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাদের নিজেদের এগিয়ে যেতে বল্‌লেন। তিনি নামযশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা কর্‌তেন না।

বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ।

জগৎপ্রপঞ্চ অনন্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ক্রমাগত চলেছে — যেন নাগরদোলা—আত্মা যেন ঐ নাগরদোলার চড়ে ঘুরছে। এক একজন ব্যক্তি ঐ নাগরদোলা থেকে নেমে পড়্‌ছে বটে, কিন্তু নাগরদোলার ঘোরবার বিরাম নাই, সেই একরকম ঘটনাই পুনঃ পুনঃ হচ্ছে, আর এই কারণেই লোকের ভূতভবিষ্যৎ সব বলে দেওয়া যেতে পারে, কারণ, প্রকৃতপক্ষে সবই বর্ত্তমান। যখন আত্মা একটা শৃঙ্খলের ভিতর এসে পড়ে, তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের যা কিছু অনুভব বা ভোগ—সবই গ্রহণ কর্‌তে হয়। ঐরূপ একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণী থেকে আত্মা আর একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে এলে তারা আপনাদের ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করে একেবারে তা থেকে বেরিয়ে যায়। ঐরূপ শ্রেণী বা শৃঙ্খলবিশেষের একটী প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন করে সমুদয় শৃঙ্খলটাকেই টেনে আনা যেতে পারে, আর তার ভিতরের সমুদয় ঘটনাই যথাযথ পাঠ করা যেতে পারে। এই শক্তি সহজেই লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু এতে বাস্তবিক কোন লাভ নাই, আর যে পরিমাণে ঐ শক্তি লাভের চেষ্টা করা যায়, ততটা আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার হানি হয়। সুতরাং ও সব বিষয়ের চেষ্টা করো না, ভগবানের উপাসনা কর।

২রা আগষ্ট, শুক্রবার।

ভগবৎসাক্ষাৎকার কর্‌তে গেলে প্রথমে নিষ্ঠার দরকার।

সব্‌সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে সব্‌কা লীজিয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥

সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বস, সকলের নাম নাও, অপরের কথায় হাঁ হাঁ কর্‌তে থাক, কিন্তু আপন ভাব কোন মতে ছেড়ো না। এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থা—অপরের ভাবে নিজেকে যথার্থ ভাবিত করা। যদি আমিই সব হই, তবে আমার ভ্রাতার সঙ্গে যথার্থভাবে এবং কার্য্যতঃ সহানুভূতি কর্‌তে পার্‌ব না কেন? যতক্ষণ আমি দুর্ব্বল, ততক্ষণ আমাকে নিষ্ঠা করে একটা রাস্তা ধরে থাক্‌তে হবে; কিন্তু যখন আমি সবল হব, তখন আমি অপর সকলের মত অনুভব কর্‌তে পার্‌ব, তাদের সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি কর্‌তে পার্‌ব।

প্রাচীন কালের লোকের ভাব ছিল—'অপর সকল ভাব নষ্ট করে একটা ভাবকে প্রবল কর'। আধুনিক ভাব হচ্ছে—'সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি করা'। একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে—'মনের বিকাশ কর ও উহাকে সংযম কর,' তার পর যেখানে ইচ্ছা উহাকে প্রযোগ কর—তাতে ফল খুব শীঘ্র হবে। ইহাই যথার্থভাবে আত্মোন্নতি কর্‌বার উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর যেদিকে ইচ্ছা উহার প্রয়োগ কর। এরূপ কর্‌লে তোমায় কিছুই খোয়াতে হবে না। যে সমস্তটাকে পায়, সে অংশটাকেও পায়। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

"আমি প্রথম তাকে দেখ্‌লাম, সেও আমায় দেখ্‌লে,
আমিও তার প্রতি কটাক্ষ কর্‌লাম, সেও আমার প্রতি কটাক্ষ কর্‌লে।"

এইরূপ চল্‌তে লাগ্‌ল—শেষে দুটা আত্মা এত সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে গেল যে, উহারা প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে গেল।

দুই প্রকার সমাধি আছে—এক রকম হচ্ছে সবিকল্প—এতে একটু দ্বৈতের আভাস থাকে। আর এক রকম হচ্ছে নির্ব্বিকল্প—ধ্যানের দ্বারা জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের অভেদ হয়ে যায়।

প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহানুভূতিসম্পন্ন হতে

শিক্ষা করতে হবে, তার পর একেবারে উচ্চতম অদ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে। নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা লাভ করে তুমি ইচ্ছা করে আপনাকে আবার সীমাবদ্ধ করতে পার। প্রত্যেক কাযে নিজের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর। খানিকক্ষণের জন্য অদ্বৈতভাব ভুলে দ্বৈতবাদী হবার শক্তিলাভ করতে হবে, আবার যখন খুসি যেন ঐ অদ্বৈতভাব আশ্রয় করতে পারা যায়।

* * * *

কার্য্যকারণ সব মায়া, আর আমরা যত বড় হব, ততই বুঝ্‌বে যে, ছোট ছেলেদের পরীর গল্প যেমন আমাদের কাছে বোধ হয়, তেমনি যা কিছু আমরা দেখ্‌ছি, সবই ঐরূপ অসম্বদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকারণ বলে কিছু নেই, আর আমরা কালে উহা জান্‌তে পার্‌ব। সুতরাং যদি পার ত, যখন কোন রূপক গল্প শুন্‌বে, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু নামিয়ে এনো, মনে মনে ঐ গল্পের পূর্ব্বাপর সঙ্গতির বিষয় প্রশ্ন তুলো না। হৃদয়ে রূপক বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বের উপর অনুরাগের বিকাশ কর, করে সমুদয় পৌরাণিক গল্পগুলিকে কবিত্ব হিসাবে উপভোগ কর। পুরাণচর্চ্চার সময় ইতিহাস ও বিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। ঐ সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহাকারে চলে যাক্, তোমার চোখের সাম্‌নে উহাকে মশালের মত ঘোরাও দেখি—কে মশালটা ধরে রয়েছে—এ প্রশ্ন করো না, ত হলেই উহা চক্রাকার ধারণ কর্‌বে, উহাতে যে সত্যের কণা অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা তোমার মনে থেকে যাবে।

সকল পুরাণের লেখকেরাই—তাঁরা যা যা দেখেছিলেন যা শুনেছিলেন, সেইগুলিই রূপকভাবে লিখে গেছেন—তাঁরা কতকগুলি প্রবাহাকার চিত্র এঁকে গেছেন। উহার ভিতর থেকে কেবল উহার মূল কথাটা বার কর্‌বার চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে ফেলো না। সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কার্য্য করুক। উহাদের ফলাফল দেখে বিচার করো—তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল আছে, সেইটুকুই নাও।

* * * *

তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তিই তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে—তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণা অনুসারে উহা বিভিন্ন

আকারে প্রকাশ পায়। আমরা উহাকে বুদ্ধ, যীশু, কৃষ্ণ, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি যে কোন নাম ইচ্ছা দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের আত্মা।

* * * *

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু ঐ ধারণা যে সকল রূপকাকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। আমাদের অলৌকিক দর্শনসমূহ অপেক্ষা মুশার অলৌকিক দর্শনে ভুলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ, আমরা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং আমাদের মিথ্যা ভ্রম দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা অনেক কম।

যতদিন না আমাদের হৃদয়রূপ শাস্ত্র খুলছে, ততদিন শাস্ত্রপাঠ বৃথা। তখন ঐ শাস্ত্রগুলি আমাদের হৃদয়শাস্ত্রের সঙ্গে যতটা মেলে, ততটাই তাদের সার্থকতা। বলবান্ ব্যক্তিই বল কি তা বুঝ্‌তে পারে, হাতীই সিংহকে বুঝ্‌তে পারে, ইঁদুর কখন সিংহকে বুঝ্‌তে পারে না। আমরা যতদিন না যীশুর সমান হচ্ছি, ততদিন আমরা যীশুকে কেমন করে বুঝ্‌ব? দুখানা পাঁউরুটিতে ৫০০০ লোক খাওয়ান, অথবা ৫ খানা পাঁউরুটিতে দু'জন লোক খাওয়ান, এ দুইই মায়ার রাজ্যে! এদের মধ্যে কোনটাই সত্য নয়, সুতরাং এ দুটোর কোনটাই অপরটার দ্বারা বাধিত হয় না। মহত্বই কেবল মহত্বের আদর করিতে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরের উপলব্ধি করিতে পারেন। একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, উহার অন্য কোন ভিত্তি নেই। ঐ স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টা পৃথক্ বস্তু নয়। সমগ্র সঙ্গীতটার ভিতর 'সোঽহং' 'সোঽহং' এই এক সুর বাজ্‌ছে, অন্যান্য সুরগুলি তারই ওলট-পালট মাত্র, সুতরাং তাতে মূল সুরের—মূল তত্ত্বের কিছু এসে যায় না। জীবন্ত শাস্ত্র আমরাই, আমরা যে সব কথা বলেছি, সেইগুলিই শাস্ত্র বলে পরিচিত। সবই জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত খ্রীষ্ট—ঐ ভাবে সব দর্শন কর। মানুষকে অধ্যয়ন কর, মানুষই জীবন্ত কাব্য। জগতে এ পর্য্যন্ত যত বাইবেল, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ হয়েছেন, সবই আমাদের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্। ঐ জ্যোতিকে ছেড়ে দিলে ঐগুলি আমাদের পক্ষে আর জীবন্ত থাক্‌বে না, মৃত হয়ে যাবে। তোমার নিজ আত্মার উপর দাঁড়াও।

মৃত দেহের উপর যেরূপ ব্যবহারই কর না, সে তাতে কোন বাধা দেয় না। আমাদের দেহকে ঐরূপ মৃতবৎ করে ফেল্‌তে হবে, আর উহার সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেটাকে দূর করে ফেল্‌তে হবে।

৩রা আগষ্ট, শনিবার।

যে সকল ব্যক্তি এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চায়, তাদের এক জন্মেই হাজার বছরের কায করে নিতে হয়। তারা যে যুগে জন্মেছে, তাদের সেই যুগের ভাবের অনেক এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সাধারণ লোকে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। খৃষ্ট ও বুদ্ধগণের এইরূপেই উৎপত্তি।

* * * *

একজন হিন্দুরাণী ছিলেন—তাঁর ছেলেরা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করবে, এই বিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন। তিনি অতি শৈশবাবস্থা থেকে তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াবার সময় সর্ব্বদা তাদের কাছে একটী গান গাইতেন—তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি। তাদের তিন জন সন্ন্যাসী হয়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজা করবার জন্য অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মানুষ করা হতে লাগ্‌ল। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর মা তাঁকে এক টুক্‌রা কাগজ দিয়ে বল্লেন, বড় হলে এতে কি লেখা আছে পড়ো। সেই কাগজখানাতে লেখা ছিল,—"ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা। আত্মা কখনও মরেনও না, মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা সৎসঙ্গে বাস কর।" যখন রাজপুত্র বড় হয়ে এটে পড়্‌লেন, তিনিও তখনই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

সংসার ত্যাগ কর। আমরা এখন যেন এক পাল কুকুর—রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুক্‌রা মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে এদিক্ ওদিক চেয়ে দেখ্‌ছি—পাছে কেউ এসে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। তা না হয়ে রাজার মত হও—জেনে রাখ,—সমুদয় জগৎ তোমার। যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ করছ, যতক্ষণ সংসার তোমাকে বাধ্‌তে থাক্‌বে, ততক্ষণ এ ভাবটা তোমার কখনই আস্‌তে পারে না। যদি বাইরে ত্যাগ করতে না পার, মনে মনে সব ত্যাগ কর। প্রাণের ভেতর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন হও। ইহাই যথার্থ আত্মত্যাগ—ইহা ব্যতীত ধর্ম্মলাভ অসম্ভব। কোন প্রকার

বাসনা করো না ; কারণ, যা বাসনা কর্‌বে, তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে। যেমন সেই গল্পে আছে, এক ব্যক্তি তিনটী বরলাভ করেছিল, এবং তার ফলে তার সর্ব্বাঙ্গে নাক * হয়েছিল, বাসনা কর্‌লে ঠিক সেইরূপ হয়। যতক্ষণ না আমরা আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ মুক্তিলাভ করতে পার্‌ছি না। আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্য কেহ নয়।

এইটী অনুভব কর্‌তে শিক্ষা কর যে, তুমি অন্য সকলের দেহেও বর্ত্তমান —এইটী জান্‌বার চেষ্টা কর যে, আমরা সকলেই এক। আর সব বাজে বিষয় ছেড়ে দাও। তুমি ভালমন্দ যা কিছু কায করেছ, তাদের সম্বন্ধে একদম ভেবো না—সেগুলি থু থু করে উড়িয়ে দাও। যা করেছ, করেছ। কুসংস্কার দূর করে দাও। মৃত্যু সম্মুখে এলেও দুর্ব্বলতা আশ্রয় করো না। অনুতাপ করো না—পূর্ব্বে যে সব কায করেছ, সে সব নিয়ে মাথা ঘামিও না, এমন কি,

* গল্পটী এই :—জনৈক গরীব লোক এক দেবতার কাছে বর পেয়েছিল। দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বল্‌লেন, তুমি এই পাশা নাও। এই পাশা নিয়ে যে কোন কামনা করে তিনবার ফেলবে, সেই তিন কামনাই তোমার তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হবে। সে অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল—কি বর চাওয়া যায়? স্ত্রী বল্লে, ধনদৌলত চাও। কিন্তু স্বামী বল্লে, দেখ, আমাদের দুজনেরই নাক খাঁদা, তাই দেখে লোকে আমাদের বড় ঠাট্টা করে, অতএব প্রথম বার পাশা ফেলে সুন্দর নাক প্রার্থনা করা যাক। স্ত্রীর মত কিন্তু তা নয়। শেষে দুজনে ঘোর তর্ক বাধ্‌ল। শেষে স্বামী রেগে গিয়ে এই বলে পাশা ফেল্লে—'আমাদের কেবল সুন্দর নাক হক—আর কিছু চাই না।' আশ্চর্য্য, পাশা ফেলা, আর তাদের সর্ব্বাঙ্গে রাশি রাশি নাক হল। তখন সে দেখ্‌লে, এ কি বিপদ্ হল, তখন দ্বিতীয়বার পাশা ফেলে বল্লে—নাক চলে যাক্। অমনি সব নাক চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজের নাকও চলে গেল। এখন বাকি আছে তৃতীয় বর। তখন তারা ভাব্‌লে—যদি এইবার পাশা ফেলে ভাল নাক পাই, লোকে অবশ্য আমাদের খাঁদা নাকের বদলে ভাল নাক হবার কারণ জিজ্ঞাসা করবে—তখন তাদের অবশ্য সব কথা বল্‌তে হবে। তখন তারা আমাদের আহাম্মক বলে এখনকার চেয়ে বেশী ঠাট্টা করবে যে, এরা এমন তিনটী বর পেয়েও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পার্‌লে না। কাযে কাযেই তৃতীয়বার পাশা ফেলে তাদের পুরাতন খাঁদা নাকই ফিরিয়ে নিলে।

যে সব ভাল কায করেছ, তাও স্মৃতিপথ থেকে দূর করে দাও। আজাদ্ (মুক্ত) হও। দুর্ব্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাভ কর্‌তে পারে না। তুমি কোন কর্ম্মের ফলকে নষ্ট কর্‌তে পার না—ফল আস্‌বেই আস্‌বে; সুতরাং সাহসী হয়ে তার সম্মুখীন হও, কিন্তু সাবধান, যেন পুনর্ব্বার সেই কায করো না। সকল কর্ম্মের ভার সেই ভগবানের ঘাড়ে ফেলে দাও, ভাল, মন্দ—সব দাও; নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাপিও না। যে নিজেকে নিজে সাহায্য না করে, ভগবান্ তাকেই সাহায্য করেন।

* * * *

"বাসনা-মদিরা পান করে সমস্ত জগৎ মত্ত হয়েছে।" "যেমন দিবা-রাত্রি কখন একসঙ্গে থাক্‌তে পারে না, সেইরূপ বাসনা ও ভগবান্ দুই কখন একসঙ্গে থাক্‌তে পারে না।" সুতরাং বাসনা ত্যাগ কর।

জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহীঁ জহাঁ কাম তহাঁ নহীঁ রাম।
দুহুঁ একসাথ মিলত নহীঁ রব্ রজনী এক ঠাম॥

* * *

"খাবার খাবার" বলে চেঁচান ও খাওয়া, "জল জল" বলে চেঁচান ও জল পান করা—এই দুটোর ভিতর আকাশ পাতাল তফাৎ। সুতরাং কেবল "ঈশ্বর ঈশ্বর" বলে চেঁচালে কখনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা করতে পারা যায় না। আমাদের ঈশ্বর লাভ কর্‌বার চেষ্টা ও সাধন কর্‌তে হবে।

তরঙ্গটা সমুদ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই অসীমত্ব লাভ কর্‌তে পারে, কিন্তু তরঙ্গ-অবস্থায় থেকে কখন পারে না। তার পর সমুদ্রস্বরূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ কর্‌তে পারে ও যত বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হতে পারে। নিজেকে তরঙ্গ বলে মনে করো না; জান যে, তুমি মুক্ত।

প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ করা। যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইখানেই ধর্ম্মের আরম্ভ। সমাধি বা ঈশ্বর-ভাবাবেশ যুক্তিবিচারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু ঐ অবস্থায় উপলব্ধ সত্যগুলি কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না। যুক্তিবিচার মোটা হাতিয়ারের মত—উহা দ্বারা শ্রমসাধ্য কাযগুলো কর্‌তে পারা যায়, আর সমাধি বা ঈশ্বর-ভাবাবেশ (Inspiration) উজ্জ্বল আলোকের মত সব সত্য দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু আমাদের ভিতর একটা কিছু কর্‌বার ইচ্ছা বা প্রেরণা আসাকেই Inspiration বল্‌তে পারা যায় না।

* * * *

মায়ার ভিতর উন্নতি করা বা অগ্রসর হওয়াকে একটী বৃত্তের মত বর্ণনা করা যেতে পারে—উহাতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি যাত্রা করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌঁছুবে। তবে প্রভেদ এই যে, যাত্রা কর্‌বার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর সেখানে যখন ফিরে আস্‌বে, তখন তুমি পূর্ণ জ্ঞান-লাভ করেছ। ঈশ্বরোপাসনা, সাধু মহাপুরুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম্ম—মায়ার জাল কেটে বেরিয়ে আস্‌বার এই সব উপায়, তবে প্রথমেই আমাদের তীব্র মুমুক্ষুত্ব থাকা চাই। যে জ্যোতিঃ দপ্‌ করে প্রকাশ হয়ে আমাদের হৃদয়ান্ধকারকে আলোকিত করে দেবে, তা আমাদের ভিতরেই রয়েছে—উহা সেই জ্ঞান, যাহা আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ। (ঐ জ্ঞানকে আমাদের 'জন্মগত স্বত্ব' বলা যেতে পারে না, কারণ, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্মই নেই।) কেবল যে মেঘগুলো ঐ জ্ঞানসূর্য্যকে ঢেকে রয়েছে, আমাদের সেইগুলোকে দূর করে দিতে হবে।

ইহলোকে বা স্বর্গে সর্ব্বপ্রকার ভোগ কর্‌বার বাসনা ত্যাগ কর। (ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ); ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযম কর (দম ও শম); সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ্য কর, মন যেন জান্‌তেই না পারে যে, তোমার কোনরূপ দুঃখ এসেছে (তিতিক্ষা); মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবনা দূর করে দাও, গুরু ও তাঁর উপদেশে বিশ্বাস রাখ এবং তুমি যে নিশ্চিত মুক্ত হতে পার্‌বেই, ইহাও বিশ্বাস কর (শ্রদ্ধা); যাই হক না কেন, সদাই বল সোঽহং সোঽহং; খেতে, বেড়াতে, কষ্টে পড়ে, সর্ব্বদাই সোঽহং সোঽহং বল, সর্ব্বদাই মনকে বল যে, এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখ্‌ছি, কোন কালে এর অস্তিত্ব নাই, কেবল আমি মাত্র আছি (সমাধান); দেখ্‌বে—একদিন দপ্‌ করে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে জগৎস্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে। দিবারাত্র চিন্তা কর, এই জগৎ শূন্যমাত্র, কেবল ব্রহ্মই আছেন। মুক্ত হবার জন্য প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন হও (মুমুক্ষুত্ব)।

(ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ।

(পাহাড়ীয়া পাখী)

(১)

কে তুমি হে অভিরাম,
পূত-তোয়া জাহ্নবীর কূলে,
ধ্যানমগ্ন অবিরাম
পুণ্যক্ষেত্র পঞ্চবটী-মূলে ?

(২)

চিদাকাশে দিব্যজ্ঞানে
প্রকাশিত অরূপ অনামা,
ভক্তিযোগে শক্তিধ্যানে
অন্তরে আনন্দময়ী শ্যামা।

(৩)

কামিনী-কাঞ্চন-স্পর্শে
হয় যাঁর বিকল শরীর,
নামানন্দ-পানে হর্ষে
নৃত্যপর মত্ত মহাবীর।

(৪)

কলির কলুষ-ভার
দূর কেলে উপদেশ দানে।
জগৎ জুড়ায় যাঁর
উপাদেয় "কথামৃত"-পানে।

(৫)

বেদের বিহিত উক্তি
ব্রহ্মবিদ্ হয় ব্রহ্ম-সম।
একাধারে ভক্তি মুক্তি
জয় জয় রামকৃষ্ণ নম।

আচার্য্য বিবেকানন্দ।

(জনৈক আমেরিকান শিষ্যা-লিখিত।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন বিবেকানন্দ আমাদিগকে একটী গল্প বলিলেন—এই গল্পটীই তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শৈশবে ধাত্রী-মুখ হইতে তিনি উহা বার বার শুনিয়াছিলেন, এবং উহা বার বার শুনিয়াও তাঁহার কখনও বিরক্তি বোধ হইত না। যতদূর সম্ভব, তাঁহার নিজের ভাষায়ই উহা আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একটী সন্তান ছিল। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, আর পুত্রটীও অতি অল্পবয়স্ক ছিল—শিশু বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণের সন্তান, সুতরাং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেই হইবে। কিন্তু কিরূপে উহা সম্ভব হয়? দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর যে গ্রামে বাস, তথায় কোন শিক্ষক ছিল না, সুতরাং বালককে শিক্ষালাভ করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইতে হইত, এবং তাহার জননী অত্যন্ত দরিদ্র থাকায় তাহাকে তথায় হাঁটিয়া যাইতে হইত। গ্রামদ্বয়ের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল এবং বালককে উহা অতিক্রম করিতে হইত। সকল উষ্ণপ্রধান দেশের ন্যায় ভারতেও খুব প্রাতে এবং পুনরায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, দিবসের গ্রীষ্মাধিক্যে কোন কাজ হয় না। সুতরাং বালকের পাঠশালা যাইবার সময় এবং পুনরায় বাড়ী ফিরিবার সময় রোজই অল্প অন্ধকার থাকিত। আমাদের দেশে যাহাদের সঙ্গতি নাই, তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, সুতরাং বালক বিনা ব্যয়ে এই গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে পাইল, কিন্তু তাহাকে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হইত, এবং সঙ্গে কেহ না থাকায় সে মহা ভয় পাইত। একদিন বালক তাহার মাতার নিকট বলিল, "আমাকে প্রত্যহ ঐ ভয়ঙ্কর বনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, আমার ভয় পায়। অন্য ছেলেদের সঙ্গে চাকর যায়, তাহারা তাহাদের তত্ত্বাবধান করে, আমার সঙ্গে যাইবার জন্য কেন একটী চাকর থাকিবে না?" উত্তরে মাতা বলিলেন, "বাবা, দুঃখের কথা

কি বলিব, আমি যে বড় গরীব, আমার যে তোমার সঙ্গে চাকর দিবার সঙ্গতি নাই।" ছেলেটী জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি?" মাতা বলিলেন, "বলিতেছি। এক কাজ কর—ঐ বনে তোমার রাখাল-দাদা কৃষ্ণ আছেন (ভারতে শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম "রাখাল-রাজ", তাঁহাকে ডাকিও, তাহা হইলেই তিনি আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধান করিবেন, এবং তুমিও আর একা থাকিবে না।" বালক পরদিনও সেই বনে প্রবেশ করিল এবং ডাকিতে লাগিল, "রাখাল দাদা, রাখাল দাদা, তুমি এখানে আছ কি?" এবং শুনিতে পাইল কে যেন বলিতেছে, "হাঁ, আছি।" বালক সান্ত্বনা পাইল এবং আর কখনও ভয় করিত না। ক্রমে সে দেখিতে লাগিল, তাহারই বয়সী এক বালক বন হইতে বাহির হইয়া তাহার সহিত খেলা করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। ছেলেটীর মনে আর দুঃখ রহিল না। কিছু দিন পরে গুরুমহাশয়ের পিতৃ-বিয়োগ হইল, এবং ভারতের প্রথা-মত, তদুপলক্ষে একটী বৃহৎ অনুষ্ঠান হইল। সেই সময়ে সকল ছাত্রকেই গুরুমহাশয়কে কিছু কিছু উপহার দিতে হইবে, সুতরাং দরিদ্র বালক তাহার মাতার নিকট গিয়া বলিল, "মা, অন্য ছেলেদের মত আমিও গুরুমহাশয়কে কিছু উপহার দিব, আমাকে কিছু কিনিয়া দাও।" কিন্তু জননী বলিলেন যে, তিনি নিতান্ত দরিদ্র। তাহাতে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার উপায়?" শেষে মাতা বলিলেন, "রাখাল-দাদার কাছে গিয়া তাঁহার নিকট চাও।" ইহা শুনিয়া বালক বনের মধ্যে গিয়া ডাকিল, "রাখাল দাদা, গুরু মহাশয়কে উপহার দিবার জন্য তুমি আমাকে কিছু দিবে কি?" অমনি তাহার সম্মুখে একটী দুগ্ধভাণ্ড উপস্থিত হইল। বালক কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভাণ্ডটী গ্রহণ করিল এবং গুরুমহাশয়ের গৃহে গিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া, ভৃত্যগণ তাহার উপহারটী গুরুমহাশয়ের নিকট লইয়া যাইবে এইজন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অন্য উপঢৌকনগুলি এত জাঁকজমকপূর্ণ ও চমৎকার ছিল যে, চাকরেরা তাহার দিকে খেয়ালই দিল না। তাহাতে সে মুখ ফুটিয়া কহিল, "গুরু-মহাশয়, এই আমি আপনার জন্য উপহার আনিয়াছি।" গুরুমহাশয় মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, উপহার অতি সামান্য, নগণ্য সামগ্রী, এবং অবজ্ঞাভরে ভৃত্যকে বলিলেন, "এ যখন ইহা লইয়া এত চেঁচামিচি করিতেছে, তখন

দুধটা একটা পাত্রে ঢালিয়া লইয়া উহাকে বিদায় কর।" ভৃত্য ভাণ্ডটী লইয়া দুধটুকু একটী বাটীতে ঢালিল, কিন্তু সে ভাণ্ডটী নিঃশেষ করিতে না করিতে উহা আবার পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে উহাকে শূন্য করিতে পারিল না! তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ব্যাপার? এ ভাণ্ড তুমি কোথায় পাইলে?" ছেলেটী উত্তর দিল, "রাখাল দাদা আমাকে বনে উহা দিয়াছেন।" তাহারা সকলে বলিয়া উঠিল, "বল কি! তুমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছ, আর তিনি উহা তোমাকে দিয়াছেন?" বালক বলিল, "হাঁ, এবং তিনি আমার সহিত প্রত্যহ খেলা করেন, এবং আমি পাঠশালায় আসিবার সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসেন।" সকলে বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল কি! তুমি কৃষ্ণের সঙ্গে বেড়াও, কৃষ্ণের সঙ্গে খেল?" আর, গুরুমহাশয়ও বলিলেন, "তুমি আমাদিগকে লইয়া গিয়া ইহা দেখাইতে পার?" ছেলেটী বলিল, "হাঁ, পারি। আমার সঙ্গে আসুন।" তখন ছেলেটী এবং গুরুমহাশয় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বালক নিত্যকার অভ্যাসমত ডাকিতে লাগিল, "রাখাল দাদা, রাখাল দাদা, এই আমার গুরুমহাশয় আসিয়াছেন, কোথায় তুমি?"—কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বালক বারংবার ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "রাখাল দাদা, একবার এস, নতুবা সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।" তখন শুনা গেল, বহু দূর হইতে কে যেন বলিতেছে, "আমি তোমার নিকট আসি, কারণ, তুমি শুদ্ধসত্ত্ব, এবং তোমার সময় হইয়াছে, কিন্তু তোমার গুরুমহাশয়কে এখনও আমার দর্শন লাভের জন্য বহু জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে।"

Thousand Island Park এ গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া বিবেকানন্দ ইংলণ্ড যাত্রা করেন, এবং পরবর্ত্তী বসন্তকালের (১৮৯৬ খৃঃ) পূর্ব্বে আমি আর তাঁহাকে দেখি নাই। উক্ত সময়ে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য ডিট্রয়েটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাঙ্কেতিক লেখক (Stenographer) বিশ্বস্ত গুড্‌উইন্। তাঁহারা রিশিলুতে (The Richelieu) কয়েকখানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। রিশিলু একটী ক্ষুদ্র 'ফ্যামিলি হোটেল'—তথায় একাধিক লোক সপরিবারে বাস করিত। তত্রত্য বৃহৎ বৈঠকখানাটীকে তিনি ক্লাসের অধিবেশন ও বক্তৃতার জন্য

ব্যবহার করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে, উহাতে সেই বিপুল জনসঙ্ঘের সকলের স্থান সঙ্কুলান হয়, এবং দুঃখের বিষয়, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। বৈঠকখানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং পুস্তকাগারে সত্য সত্যই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তিনি একেবারে ভক্তিমাখা ছিলেন—ভগবৎপ্রেমই তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা-স্বরূপ ছিল। তিনি যেন একপ্রকার ঐশ্বরিক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, প্রেমময়ী জগজ্জননার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল।

ডিট্রয়েটে সাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষ উপস্থিতি বেথেল মন্দিরে—স্বামিজীর জনৈক অনুরাগী ভক্ত, রাবি লুই গ্রোস্‌ম্যান্, তথায় যাজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেদিন রবিবার, সন্ধ্যাকাল, এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইয়াছিল, বুঝি লোকে বিহ্বল হইয়া একটা কি করিয়া বসে। রাস্তার উপরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত ঠাসা লোক, এবং শত শত ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়াছিল। বিবেকানন্দ সেই বৃহৎ শ্রোতৃসঙ্ঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—"পাশ্চাত্য জগতের প্রতি ভারতের বাণী" ও "সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ"। তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। সে রজনীতে আচার্য্যদেবকে যেমনটী দেখিয়াছি, তেমনটী আর কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। মনে হইতেছিল, যেন আত্মাপক্ষী দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে, এবং সেই সময়েই আমি প্রথম তাঁহার অচির দেহাবসানের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু বর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি যে অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তাহা তখনই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। আমি "না, না, এ কিছু নহে" বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণে প্রাণে উহার সত্যতা অনুভব করিলাম। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভিতর হইতে বুঝিতেছিলেন, তাঁহাকে কার্য্য করিয়াই যাইতে হইবে।

ইহার পর আমি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার দর্শন পাই।

তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে—এই বিবেচনায় তিনি গোলকণ্ডা জাহাজে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তিনি দেখিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন যে, জাহাজখানি টিলবেরি ডকে পৌঁছিবার সময় তাঁহার দুইজন আমেরিকাবাসী শিষ্য তথায় উপস্থিত আছেন। তিনি অমুকদিনে যাত্রা করিবেন, একখানি ভারতীয় মাসিক পত্রে এই সংবাদটী পাইবামাত্র আমরা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলাম, কারণ, তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা যে সকল বিবরণ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমরা সাতিশয় ভীত হইয়াছিলাম।

তিনি অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে দেখিতে যেমন বালকের ন্যায় হইয়াছিল, তাঁহার ক্রিয়াকলাপও তদ্রূপ হইয়াছিল। এই সমুদ্রযাত্রার ফলে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব বল ও শক্তি কথঞ্চিৎ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবার স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন এবং লণ্ডনের অনতিদূরে উইম্‌বল্‌ডেন্ নামক স্থানের একটী প্রশস্ত পুরাতন ধরণের বাটীতে স্বামিদ্বয়ের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্থানটী বেশ কোলাহলশূন্য এবং শান্তিপ্রদ ছিল এবং আমরা তথায় একমাসকাল সুখে অতিবাহন করিয়াছিলাম।

স্বামিজী সেবার সাধারণের সমক্ষে কোন বক্তৃতাদি করেন নাই এবং শীঘ্রই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও তাঁহার আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে আমেরিকা যাত্রা করেন। সমুদ্রবক্ষে দশটী চিরস্মরণীয় দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত কবিতা ও গল্পের আবৃত্তি ও অনুবাদ, এবং সুর করিয়া প্রাচীন বৈদিক স্তোত্রপাঠ হইত। সমুদ্রে বীচিবিক্ষোভ ছিল না, এবং রজনীতে চন্দ্রালোক অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিত। ঐ কয় দিনের সন্ধ্যাগুলি অতি চমৎকার ছিল; আচার্য্যদেব ডেকের উপর পায়চারী করিতেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার বপুঃ অতি মহদ্ভাবব্যঞ্জক দেখাইত; মধ্যে মধ্যে পাদচারণা হইতে বিরত হইয়া তিনি আমাদিগের নিকট স্বভাবের শোভা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতেন এবং বলিয়া উঠিতেন, "দেখ, এই সব মায়ারাজ্যের

বস্তুই যদি এত সুন্দর হয়, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের পশ্চাতে যে নিত্যবস্তু রহিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য কত অপরূপ!”

এক বিশেষ রমণীয় রজনীতে যখন পূর্ণচন্দ্রের কনককিরণধারায় জগৎ হাসিতেছিল, সেই অপরূপ মোহকরী রজনীতে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাক্-ভাবে দৃশ্যমাধুরী পান করিতেছিলেন। সহসা আমাদিগের দিকে চাহিয়া সমুদ্র ও আকাশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, যখন কবিত্বের চরমসীমা ঐ সম্মুখে রহিয়াছে, তখন আবার কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি?

আমরা যথাসময়ে নিউইয়র্ক পৌঁছিলাম—গুরুদেবের সহিত এই দশ দিবস এমন পরমানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলাম যে, মনে হইতেছিল, আমরা আরও বিলম্বে পৌঁছিলাম না কেন। ইহার পর তাঁহার সাক্ষাৎ পাই ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে,—এই সময় তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত কিছুদিন যাপন করিবার জন্য ডিট্রয়েটে আগমন করিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন—যেন ভাবময় তনু যেন সেই মহান্ আত্মা আর হাড়মাসের খাঁচায় আবদ্ধ থাকিবে না! আর একবার আমরা সত্যকে দেখিয়াও দেখিলাম না—কোন আশা নাই জানিয়াও তাঁহার আরোগ্যের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।

আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু “সেই অপর শিষ্যাটি” তিনি আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, কয়েক সপ্তাহ ভারতে তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কথা মনে করিলেই যার-পর-নাই কষ্ট বোধ হয়। সে হৃদয়ভেদী দুঃখ এখনও আমার সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু এই সকল দুঃখকষ্টের অন্তরালে অতি গভীরপ্রদেশে এক মহতী শান্তি বিরাজমান,—তথায় এই মধুর দিব্য অনুভূতি বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, মহাপুরুষগণ স্বীয় জীবনদ্বারা লোককে সত্যের পন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আর এইরূপ একজন মহাপুরুষের সঙ্গ ও কৃপালাভ যে আমাদের জীবনে সম্ভবপর হইয়াছিল—যখন আমি এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করি, এবং দিনের পর দিন তাঁহার উক্তি-গুলির মধ্যে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য এবং গভীরতর অর্থ দেখিতে পাই, এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকি, তখন আমার সত্য সত্যই ধারণা হয়—কে যেন

বলিতেছে "জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ, যেস্থানে তুমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, উহা পবিত্রভূমি।"

ডিট্রয়েট, মিশিগ্যান, ১৯০৮।

(সমাপ্ত)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ঈশ্বরো জয়তি।

৺প্রয়াগধাম,
৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

দুই এক দিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বলিয়া আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? যো— নামক আমার একটী গুরুভ্রাতা চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করিয়া এস্থানে আসিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন সংবাদ পাই, তাহাতে তাঁহার সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। এখানের কয়েকটী বাঙ্গালীবাবু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অনুরাগী, তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিশেষ আগ্রহ যে, আমি এইস্থানে মাঘ মাসে কল্পবাস করি। আমার মন কিন্তু কাশী কাশী করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আপনাকে দেখিবার জন্য মন অতি চঞ্চল। দুই চারি দিবসের মধ্যে ইঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইয়া যাহাতে বারাণসীপুর-পতির পবিত্র রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। অ— সরস্বতী নামক আমার কোন গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসী যদি আপনার নিকট আমার তত্ত্ব লইতে যান, বলিবেন যে, শীঘ্রই আমি কাশী যাইতেছি। তিনি অতি সজ্জন এবং পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বাঁকীপুরে ফেলিয়া আসিয়াছি। রা— ও সু— কি এখনও কাশীতে আছেন? এ বৎসর কুম্ভের মেলা হরিদ্বারে হইবে কি না, ইহার তথ্য লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। কিমধিকমিতি।

অনেক স্থানে অনেক জ্ঞানী ভক্ত সাধু ও পণ্ডিত দেখিলাম, অনেকেই

অত্যন্ত যত্ন করেন, কিন্তু ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, আপনার সঙ্গে কেমন প্রাণের টান আছে—অত ভাল আর কোথাও লাগে না। দেখি কাশীনাথ কি করেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

ঠিকানা—

ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাটী,

চক, এলাহাবাদ।

ঈশ্বরো জয়তি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী,

গোরাবাজার, গাজীপুর।

শুক্রবার, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

অদ্য তিন দিন যাবৎ গাজীপুরে পৌঁছিয়াছি। এস্থানে আমার বাল্যসখা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছি; স্থানটি অতি মনোরম। অদূরে গঙ্গা আছেন, কিন্তু স্নানের বড় কষ্ট—পথ নাই, এবং বালির চড়া ভাঙ্গিতে বড় কষ্ট হয়। আমার বন্ধুর পিতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যে মহানুভাবের কথা আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম—এস্থানে আছেন। অদ্য ইনি ৺কাশীধামে যাইতেছেন, কাশী হইতে কলিকাতা যাইবেন। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, পুনর্ব্বার কাশী যাই, কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি—অর্থাৎ বাবাজীকে দেখা—তাহা এখনও হয় নাই। অতএব দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে। এস্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র কিন্তু বড় Westernized (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন); আর দুঃখের বিষয় যে, আমি Western idea (পাশ্চাত্য ভাব) মাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত। কেবল আমার বন্ধুর ওসকল idea (ভাব) বড়ই কম। কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে! কি materialistic (জড়ভাবের) ধাঁধাই লাগাইয়াছে। বিশ্বনাথ এইসকল দুর্ব্বলহৃদয়কে রক্ষা করুন। পরে বাবাজীকে দেখিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিব। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ভগবান্ শুকের জন্মভূমিতে আজি বৈরাগ্যকে লোকে পাগলামী ও পাপ মনে করে; অহো ভাগ্য!

শ্রীঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর,

৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

বাবাজীর সহিত দেখা হওয়া বড় মুস্কিল, তিনি বাড়ীর বাহিরে আসেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানসমন্বিত এবং চিম্‌নিদ্বয়-শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই। লোকে বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন; কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা দেখিব। রবিবার ৺কাশীধামে যাত্রা করিব—এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজী দেখিবার সখ আমার গুটাইয়াছে। অদ্যই চলিয়া যাইতাম; যাহা হউক, রবিবার যাইতেছি। আপনার হৃষীকেশ যাইবার কি হইল?

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—গুণের মধ্যে স্থানটি বড় স্বাস্থ্যকর।'

ওঁ বিশ্বনাথো জয়তি।

গাজীপুর,

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি এবং বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি,

আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাবাজীর ইচ্ছা— কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এস্থানে থাকিব। ইহাতে আপনিও আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পত্রে লিখিব না, কথা অতি বিচিত্র, সাক্ষাতে জানিবেন। ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা পুরা হয় না।

দাস

বিবেকানন্দ।

বিশ্বেশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর,

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

এইমাত্র আপনার পত্র পাইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। বাবাজী আকারে বৈষ্ণব, যোগ, ভক্তি এবং বিনয়ের মূর্ত্তি বলিলেই হয়। তাঁহার কুটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন; যখন উপরে আসেন, তখনই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহেন। কি খান, কেহই জানে না, এইজন্যই পওহারী বাবা বলে। মধ্যে একবার ৫বৎসর একবারও গর্ত্ত হইতে উঠেন নাই, লোকে জানিয়াছিল যে, শরীর ছাড়িয়াছেন; কিন্তু আঁবার উঠিয়াছেন। এবার কিন্তু দেখা দেন না, দ্বারের আড়াল হইতে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা আমি কখন শুনি নাই। কোন Direct (মুখামুখি) প্রশ্নের উত্তর দেন না, বলেন—দাস ক্যা জানে? তবে কথা কহিতে কহিতে আগুন বাহির হয়। আমি খুব জেদাজিদি করাতে বলিলেন যে, "আপনি কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া কৃতার্থ করুন।" এপ্রকার কখন কহেন না; ইহাতেই বুঝিলাম, আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং যখনই পেড়াপীড়ি করি, তখনই বলেন, কিছুদিন থাকুন। এই আশায় আছি। ইনি অতি পণ্ডিত, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবার কর্ম্মকাণ্ড করেন—পূর্ণিমা হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত হোম হয়। অতএব ইহার মধ্যে

গর্ত্তে যাইবেন না নিশ্চিত। অনুমতি কি লইব, Direct উত্তর দিবেন না। "দাসকে ভাগ্য" ইত্যাদি ঢের বলিবেন। আপনার ইচ্ছা থাকে, পত্রপাঠ চলিয়া আইসুন। ইঁহার শরীর যাইলে বড় আপশোষ থাকিবে—দুই দিনে দেখা করিয়া (অর্থাৎ আড়াল হইতে কথা কহিয়া) যাইতে পারিবেন। আমার বন্ধু সতীশবাবু অতি সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করিবেন। আপনি পত্রপাঠ চলিয়া আইসুন, ইতিমধ্যে আমি বাবাজীকে বলিব।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ইঁহার সঙ্গ না হইলেও, এপ্রকার মহাপুরুষের জন্য কোনও কষ্টই বৃথা হইবে না নিশ্চিত। অলমতিবিস্তারেণ।

দাস

বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর,

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পুজ্যপাদেষু—

আপনার শারীরিক অসুস্থতা শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। আমারও কোমরে একপ্রকার বেদনা হইয়া রহিয়াছে, সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং যাতনা দিতেছে। বাবাজীকে দুইদিন দেখিতে যাইতে পারি নাই, তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতে আমার খবর লইতে একব্যক্তি আসিয়াছিল—অতএব আজি যাইব। আপনার অসংখ্য প্রণাম দিব। আগুন বাহির হয়, অর্থাৎ অদ্ভুত গুরুভক্তির কথা এবং নির্ভরের কথা বাহির হয়—এমন অদ্ভুত তিতিক্ষা এবং বিনয় কখনও দেখি নাই। কোনও মাল যদি পাই, আপনার তাহাতে ভাগ আছে নিশ্চিত জানিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর,

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

গত কল্য আপনাকে যে পত্র দিয়াছি, তাহাতে শ— ভায়ার পত্রখানি পাঠাইতে বলিতে ভুলিয়াছি বোধ হয়; অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। গ— ভায়ার একখানি পত্র পাইয়াছি। তিনি এক্ষণে কাশ্মীর, রামবাগ সমাধি, শ্রীনগরে আছেন। আমি Lumbagoতে (কোমরের বাতে) বড় ভুগিতেছি ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—রা— ও সু— ওঁকার, গির্ণার, আবু, বম্বে, দ্বারকা দেখিয়া এক্ষণে বৃন্দাবনে আছে।

অবতার-চিত্র।

(শ্রীনীরদচন্দ্র দত্ত।)

(১)

ছায়া-চিত্র, বিলম্বিত কক্ষ-ভিত্তি গায়;
নহে মানবের উহা, ছায়া অন্য কার,—
তাঁর! যিনি নররূপে যুগ-অবতার!
শুভ্র স্ফটিকের স্বচ্ছ আচ্ছাদন তায়,
আচ্ছাদিয়া অবিরত, বক্ষা-কবচের মত,
পাপ-ধরা-ধূলি হ'তে করিছে রক্ষণ
ওই দেবমূর্ত্তিখানি, সদ্য পাপ-নাশা,
না করিয়া দর্শকের বিঘ্ন উৎপাদন,
দেব-দরশন-সুখে, মিটাতে পিপাসা।

(২)

চিত্রে সমাসীন হের দেব রামকৃষ্ণ,
দিব্য যোগাসনোপরি, যোগিবরবেশে,
আত্মা মন সমর্পিয়া ঈশ্বর-উদ্দেশে,
উপবিষ্ট স্থির যোগ-সমাধি-আবিষ্ট ;
নাহি বাহ্যজ্ঞানলেশ, সংসারের তাপ ক্লেশ,
ত্রিবিধ দুঃখের সিন্ধুসীমা অতিক্রমি,
লভিয়াছে চিত্ত-সহ ইন্দ্রিয়-নিচয়
অবিচ্ছিন্ন সুখময় উপকূলভূমি ;
সৎ-চিদানন্দ-পদ চরম আশ্রয়।

(৩)

ইন্দ্রিয়সকলে যেন পরামর্শ করি,
ত্যজি নিজ নিজ কর্ম্ম একযোগে মিলি,
বাহ্য ভোগতৃষ্ণা আশা দুই পদে ঠেলি,
কোন গূঢ় মন্ত্রবলে ভৃঙ্গরূপ ধরি,
অন্তরের অন্তস্তলে, স্ফুট চিত্ত-শতদলে,
পশিয়া নীরবে রত স্নিগ্ধ মধুপানে,
পরম নিশ্চিন্তমনে, নিমজ্জিয়া কায়—
পরিণত একাকারে ! রস-অবসানে—
উপনীত গুণাতীত সূক্ষ্ম অবস্থায়।

(৪)

মহাযোগী, কিন্তু নাই বাহ্য আড়ম্বর,
কটিতে বল্কল-বাস, শিরে জটাভার,
নহেক আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রুর প্রসার,
নহে ভস্ম-আচ্ছাদিত দীর্ঘ কলেবর !
তবুও অপূর্ব্ব রূপে, প্রতি অঙ্গে লোমকূপে,
কি যেন বিজলী-ছটা খেলিছে সতত,
তরল-কাঞ্চন-স্রোত শিরায় শিরায়,

কায়া করি অপার্থিব প্রভায় মণ্ডিত,
ব্রহ্মণ্যের বহ্নিশিখা ছুটিয়া বেড়ায়।

(৫)

করে কর শৃঙ্খলিত শিথিল বন্ধনে,
স্থাপিত সম্মুখে হের অলস অবশে।
(চিরালস যাহা বিষ-বিষয়-পরশে ;)
বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, পরশরতনে
গঠিত, পরশ মাত্র,　　　কঠিন লোহের পাত্র,
খাঁটি হেম-সুধাপাত্রে করে পরিণত।
দুটি সম্মিলিত প্রান্ত শাখাগ্রসীমায়,
ধরেছে একটি গুচ্ছ অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত,
সুবর্ণ-চম্পক যেন পূর্ণ মহিমায়।

(৬)

বাহিরে গৃহীর বেশ ধুতী উত্তরীয়,
কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী চির-বিরাগীর ;
নির্লিপ্ত নিষ্কাম কর্ম্মী, নিষ্পাপ-শরীর ;
চিন্ময়ী-চরণ যাঁর গৃহ রমণীয়।
নিত্য সেই গৃহে বাস,　　　বদনেতে সেই ভাষ,
অন্য অভিলাষ-শূন্য পুণ্য চিত্তধামে ;
নারীমাত্রে মাতৃভাব, বিষয়ে গরল,
পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত এক প্রাণারামে ;
জীবনের এক কার্য্য জীবের মঙ্গল।

(৭)

অনাবৃত বক্ষ পার্শ্ব—দৃশ্য মনোরম,
সমুন্নত গ্রীবা'পরে সৌন্দর্য্য-আকর,
সুধাসিক্ত নিষ্কলঙ্ক সুপ্ত শশধর,
চারু বরাননখানি শোভার চরম।
ঈষদুন্মীলিত নেত্র,　　　অদৃশ্য দর্শনক্ষেত্র,

ললাট-ফলকে আঁটা, যাহাতে পতিত
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব, মানচিত্রবৎ
ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সুদূর অতীত,
ত্রিকাল-ঘটনাবলী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ।

(৮)

হে দেব! রয়েছ সদা চক্ষের উপর
অধ্যাত্মগগনে যেন মধ্যাহ্নভাস্কর;
সংসার-কালিমা-অন্ধ নয়ন আমার,
চাহিতে তোমার পানে নাহি অবসর।
অসার তৃণের মত, প্রবৃত্তি-আবর্ত্তে কত,
ফিরিতেছি অবিশ্রান্ত ঘূর্ণিপাক খেয়ে;
অনিত্য বিষয় লাগি সংগ্রাম ভীষণ
করিতেছি পরস্পর মদমত্ত হয়ে।
মোর ভাগ্যে অসম্ভব ও পদদর্শন।

(৯)

বারে বারে কতবার ওহে বিশ্বরূপ,
দেখালে প্রেমের খেলা শিখাতে মানবে,
হয়ে আবির্ভূত প্রতি ধর্ম্মের বিপ্লবে,
এই ধরাধামে, ধরি কত নব রূপ।
যে বংশী বাজিল বনে, শুনিল তা বিশ্বজনে,
শুনিল, সঁপিল পদে কায়-মন-প্রাণ।
শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর,
উড়ায়ে নিষ্কাম কর্ম্ম ধর্ম্মের নিশান,
পিল প্রেমামৃত সর্ব্ব ধর্ম্ম করি দূর।

(১০)

আবার যখন জন্মি রাজপুত্র হয়ে,
বিপুল বিভব ত্যজি বোধি-বৃক্ষতল
করিলে আশ্রয়, চেয়ে জীবের মঙ্গল,

অনাহারে অনিদ্রায় ঝঞ্ঝাবাত সয়ে ;
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, উদ্‌ঘাটিয়া সার মর্ম্ম,
লিখিলে কর্ম্মের গ্রন্থে প্রথম পৃষ্ঠায়,
পূর্ণভাবে পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ,
সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তির অমোঘ উপায়।
ছুটিল নির্ব্বাণ-মুক্তি-সুধা-প্রস্রবণ।

(১১)

তার পর লয়ে রূপ ভুবনমোহন,
উদিলে নদীয়াচাঁদ ভারতগগনে,
পূর্ণিমার দিন দেখি, পূর্ণ আকর্ষণে
উথলিল প্রেমসিন্ধু, বিশুষ্ক যখন।
আচণ্ডালে দিয়া কোল, বলাইলে হরিবোল,
ভাসাইয়া জাতি-কুল-বিদ্যা-অভিমান ;
নাচিল আবাল-বৃদ্ধ ভক্তির হিল্লোলে,
প্রেমানন্দে মাতি, পেয়ে সুধার সন্ধান,
সুধার ভাণ্ডার নাম হরিবোল ব'লে।

(১২)

এবারে আসিয়াছিলে সে দিনের কথা—
সাজি এক নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ ;
নবীন বয়সে ত্যজি গৃহ পরিজন,
পূজিতে ভবতারিণী কালী জগন্মাতা।
রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত, ভাগীরথীতীরস্থিত,
দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে, উপবন-ঘেরা
সুরম্য মন্দির মাঝে, বুঝিয়া অন্তরে
উপযুক্ত স্থান মর্ত্ত্যে সকলের সেরা
সাধনার, তারিবারে ধর্ম্মহীন নরে।

(১৩)

যে পাঠ পড়ালে তুমি গুরুমহাশয়,

পেয়ে তব রশ্মিকণা, সর্ব্বজ্ঞানাধিপ,
প্রজ্বলিল জগতের নির্ব্বাপিত দীপ ;
ফুটিল তাহাতে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।
জীবমাত্রে একজাতি, একচিদ্রূপভাতি,
ভেদাভেদে অন্ধ হয়, দেখে অন্ধকার।
অন্ধই বিপথে পড়ে করে আমি আমি.
ভক্তিতৈলহীন দীপ অহং-আকার,—
না পারে চিনিতে তুমি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী।

(১৪)

সংসার-অরণ্যে আমি পড়িয়াছি একা,
কামিনীকাঞ্চন-মোহে বিকল অন্তর,
চেষ্টাহীন, লক্ষ্যহীন, অদৃষ্ট-নির্ভর,
যাতায়াতকালে মাত্র ছবিখানি দেখা ;
হে দয়াল দীনত্রাতা, গুরু দীক্ষা-শিক্ষা-দাতা,
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু একাধারে সব,
যা দিয়েছ কেড়ে লও ওহে প্রাণবধু,
দৃষ্টি ছাড়া ; দেহ হ'ক্ অবশ নারব,
চিত্রপানে চিরদিন চেয়ে থাকি শুধু।

মল্লভূমি ও মল্লভূপগণ।

(শ্রীঅহীন্দ্রনাথ ঘোষ বি. এল্.,)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই দুইটি কিংবদন্তীই বিষ্ণুপুরের মল্লভূপ-বংশোৎপত্তির ইতিহাসের অবলম্বন। কোনটিরই কোনরূপ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দুইটিই মূলতঃ এক হইলেও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। ইহাদের কোন্‌টি সত্য, অথবা একটিও সত্য কি না, তাহা নির্ণয় করা

বোধ হয় মানবের সাধ্যাতীত। তবে আমাদের মনে হয়, প্রথম গল্পটি অস্বাভাবিকত্বে দ্বিতীয়টিকে অতিক্রম করিয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হাণ্টারের গ্রন্থে দৃষ্ট গল্পটির সম্বন্ধে কয়েকটি বেশ কূট প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহা এই—

প্রথম।—শ্রীকুশমেটে বাগ্দী যদি কেবল বালকটিকেই অরণ্যমধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিল, তবে তাহার জন্ম সম্বন্ধে এরূপ চমৎকার ইতিহাস ও সে যে রাজার সন্তান, তাহা কিরূপে জানিতে পারিল?

দ্বিতীয়।—যদিচ জয়নগরের রাজা মহিষীকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্বীয় অনুচরবর্গের কতকগুলিকে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত মাতাপুত্রের পরিচর্য্যার নিমিত্ত লাউগ্রামে রাখিয়া যাইতেন না কি? হাণ্টার সাহেব ইহাতে কোনরূপ অস্বাভাবিকত্ব দেখেন না; তিনি বলেন, হিন্দুদিগের তীর্থযাত্রার হুজুগে এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। কিন্তু হাণ্টার সাহেব যদি জানিতেন যে, হিন্দুগণ—বিশেষতঃ পুরাকালের হিন্দুগণ—পুত্র-সন্তানকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ও কথা বলিতে পারিতেন না। আর যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে নানাবিধ বিপৎ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যমধ্য দিয়া বৃন্দাবন হইতে লাউগ্রাম পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া সঙ্গে আনিলেন, তিনি কি এতই অমানুষ ও ক্রূরচেতা হইবেন যে, তাঁহাকে ঐরূপ অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন?

রমেশবাবুর তৃতীয় প্রশ্ন।—বালক যে প্রকৃত ক্ষত্রিয়-সন্তান, বাগ্দী-পুত্র ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? ইহা কি সম্ভব নয় যে, বিষ্ণুপুরের আদি নৃপতিগণ বাগ্দীই ছিলেন এবং কালে হিন্দু-সভ্যতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় বংশের ইতিহাস গৌরবান্বিত করিবার জন্য ঐরূপ গল্প রচনা করিয়াছিলেন?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও রমেশবাবু প্রভৃতি মনীষিগণ দুইটি কারণে বিষ্ণুপুরের রাজবংশকে বাগ্দীবংশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রথম, তাঁহাদের বাগ্দী রাজা বলিয়া খ্যাতি; দ্বিতীয়, তাঁহাদের মল্ল উপাধি—যাহা পণ্ডিতগণের মতে অনার্য্য-উপাধি।

কিন্তু আমাদের মনে হয়—যদিও এ কথা আমরা খুব ভয়ের সহিতই

বলিতেছি—যে, পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু রমেশবাবুর ন্যায় সংস্কৃত-ভাষাবিৎ ও পুরাতন হিন্দু-সভ্যতার আলোচনা-রত বিদ্বান্ ব্যক্তিও কিরূপে মল্ল শব্দকে অনার্য্যজাতিবাচক বলিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণে কোথাও মল্ল নামক অনার্য্যজাতির উল্লেখ নাই. বরং উক্ত উপাধিধারী মহাপরাক্রান্ত আর্য্যজাতির উল্লেখ বিশেষভাবে আছে। মহাভারতে মল্লদেশের উল্লেখ আছে, তথাকার অধিবাসী মল্লগণ প্রবল যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহারা কুরুক্ষেত্র-সমরে স্বীয় রণ-কৌশল ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া উভয় পক্ষকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন. মহাভারতের অনেক স্থানে মল্লগণের উল্লেখ আছে।

তাহার পর বৌদ্ধযুগে ভগবান্ শাক্যমুনির তিরোধানের সময় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া মল্লগণ জগতে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থে মল্লগণের দুইটি শাখার উল্লেখ আছে—পাভার মল্লগণ ও কুশীনারার মল্লগণ। বুদ্ধদেব স্বীয় মহানির্ব্বাণের সময় আগত দেখিয়া, কুশীনারা নগরীকেই তিরোধানের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করিলেন। তাঁহার তিরোধানের ইতিহাসের কতকাংশ Kern সাহেবের Manual of Buddhism নামক গ্রন্থ হইতে এখানে অনূদিত হইতেছে:—

"ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ-দান শেষ হইলে, আনন্দ এই মত প্রকাশ করিলেন যে, দেশের এক শ্রীহীন অংশে অবস্থিত এরূপ এক ক্ষুদ্র স্থানে দেহত্যাগ করা তথাগতের পক্ষে শোভা পায় না, এবং চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী অথবা কাশী এই ছয়টী মহানগরীর মধ্যে কোন একটীই উহার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু প্রভু বুদ্ধ তাঁহাকে দেখাইলেন যে,কুশীনারা পূর্ব্বতন কালে কুশবতীর রাজধানী ছিল বলিয়া উহাই দেহত্যাগের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। তৎপরে তিনি কুশীনারার মল্লগণকে এই সংবাদ দিবার জন্য আনন্দকে প্রেরণ করিলেন, 'রাত্রির শেষ যামে ভগবান্ তথাগত মহানির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তাঁহার জীবনের শেষ কয় মুহূর্ত্ত দেখিবার সুযোগ তোমরা ছাড়িয়া দিও না।' মল্লগণ এই সংবাদ পাইয়া যেখানে ভগবান্ বুদ্ধ শয়ান ছিলেন, তথায় দ্রুতপদে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সমীপে নীত হইলেন।

তৎপরে তিরোধানের বর্ণনান্তে লিখিত হইয়াছে, "রজনীশেষে অনুরাধা মল্লগণকে প্রভুর দেহত্যাগ-সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য আনন্দকে প্রেরণ করিলেন। মল্লগণ সভাগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহারা স্ত্রীপুত্রগণ সমভিব্যাহারে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং গন্ধমাল্য ও সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র কুশীনারায় সংগ্রহ করিবার জন্য ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন। তৎপরে বুদ্ধদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত সপ্তদিবসব্যাপী নৃত্যগীত চলিল। সপ্তম দিবসে আটজন মল্লভূপ কর্ত্তৃক মৃতদেহ চিতাশায়ী করান হইল।

"ভগবান্ বুদ্ধদেবের পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হইলে পর, মল্লগণ নৃত্যগীত এবং গন্ধমাল্যাদি দ্বারা দেহাবশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে বুদ্ধদেবের দেহভস্ম লইয়া বিষম গণ্ডগোল বাধিয়াছিল। মহাপরাক্রমশালী মহারাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, আল্লাকাপ্পার বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়াগণ, পাভার মল্লগণ এবং বেত দ্বীপের এক ব্রাহ্মণ দেহভস্মের অংশ দাবি করিলেন। প্রথমে কুশীনারার মল্লগণ দেহভস্মের অংশ দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; অবশেষে দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণের যুক্তিপূর্ণ উপদেশে দেহভস্মগুলি আটটী ভাগে বিভক্ত হইল এবং সকল পক্ষই ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন।"

হিউয়েন্থ্সাংও মল্লগণের উল্লেখসময়ে তাহাদিগকে রত্নখচিত দণ্ডধারী বলিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বুদ্ধদেবের সময়ে লিচ্ছবি ও শাক্যগণের ন্যায় মল্লনামেও একটী সুসভ্য পরাক্রান্ত আর্য্যজাতি ছিল, যাহাদের নগরী কুশীনারা পুরাকালে কুশবতী নামে সমৃদ্ধি-শালী রাজধানী ছিল। এই সমস্ত ইতিহাসবিখ্যাত মল্ল-আখ্যাধারী পরাক্রান্ত আর্য্যজাতির অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ থাকা সত্বেও, কেবলমাত্র নীচ উপাধি মাল শব্দের সহিত উচ্চারণ-সাদৃশ্যের জন্য মল্লশব্দকে অনার্য্য উপাধি-ব্যঞ্জক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে।

আমাদের মনে হয়, বিষ্ণুপুরের মল্লবংশ উপরোক্ত পাভা বা কুশীনারার মল্লবংশের ন্যায় মহাভারতীয় যুগের আর্য্য মল্লজাতিরই শাখান্তর। আদি-মল্ল রাজা হইবার বহুপূর্ব্বে পশ্চিম রাঢ়ে মল্লগণ বাস করিতেন বলিয়া বোধ

হয়; ইহাও অসম্ভব নহে যে, মল্লগণই পশ্চিম রাঢ়ে প্রথম আর্য্যোপনিবেশ স্থাপন করেন।

গ্রীক দূত টলেমি মণ্ডেলৈ নামক একটী জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—তাহারা গঙ্গারিডয় জাতির পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। তাহাদের প্রসিদ্ধ নগরগুলির নাম ছিল কেলিড্না (Kelydna), অগনগর (Aga-nagor) ও তলর্গ (Talarga)। পণ্ডিতবর ম্যাক্ ক্রিণ্ডল্ সাহেব স্থির করিয়াছেন, কেলিড্না কালিন্দী-তীরস্থ কোনও নগর ছিল; তলর্গ হুগলির নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল; এবং অগনগর কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী অগ্রদ্বীপ।

ম্যাক ক্রিণ্ডল্, ল্যাসেন, কানিংহাম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিবর্গ মণ্ডলৈ (Mandalai) জাতিকে অসভ্য মুণ্ডাজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ বলিয়া মনে করেন। আমাদের মনে হয়, এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—কলিঙ্গ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অর্থাৎ বর্ত্তমান মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, ও হুগলি মণ্ডী (Mandie) ও মল্লি (Malli) গণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। মল্লিদের দেশে মল্লস্ নামে এক পর্ব্বত ছিল। আমাদের বিশ্বাস, প্লিনি-বর্ণিত মল্লিগণ ও টলেমি-বর্ণিত মণ্ডলৈ-গণ একই জাতি ছিল, যাহাদের আর্য্য-নাম ছিল মল্ল এবং যাহারা প্লিনি-বর্ণিত ভূভাগের পূর্ব্বাংশে অর্থাৎ বর্ত্তমান পশ্চিম রাঢ়ে বাস করিত। প্লিনির মণ্ডলৈগণই হয়ত বর্ত্তমান মুণ্ডাগণের পূর্ব্বপুরুষ; তাহারা ছোটনাগপুরের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আরণ্য প্রদেশে বাস করিত। পণ্ডিত উইলফোর্ড সাহেবও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দেশ-বর্ণনা-স্থলে তাম্রলিপ্তের পার্শ্বে মালদেশ বলিয়া যে ভূভাগের উল্লেখ আছে, উইল-ফোর্ড সাহেব বলেন, উহাই প্লিনির মল্লি দেশ এবং বর্ত্তমান মল্লভূম।

আমাদের মনে হয়, মল্লগণ অতি পুরাকাল হইতেই মল্লভূমে বাস করিতেন; পরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও পূর্ব্ব-রাঢ়ের গুপ্ত ও শূরবংশীয় বীর রাজন্যবর্গের পরাক্রমে তাঁহারা হতপ্রভাব হইয়া যান এবং মল্লজাতির প্রধান বা সর্দ্দারগণ দুর্ব্বল সামন্তরূপে গণ্য হইয়া পড়েন। পরে আদিমল্ল স্বীয় শৌর্য্য, বীর্য্য ও রণনৈপুণ্যে মল্লজাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার বংশ মহাসামন্ত-

বংশরূপে গণ্য হইল; তজ্জন্যই বোধ হয়, তিনি আদিমল্ল আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন—মল্লনাম আবার গৌরবমণ্ডিত ও বিখ্যাত হইয়া উঠিল।

আদিমল্লের রাজ্যলাভের গল্প দুইটির মধ্যে শেষোক্তটিই অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য এবং তাহার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়। তবে বিশেষ প্রমাণ না পাইলে আদিমল্লের জন্মবৃত্তান্ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা ঐ প্রদেশেরই পূর্ব্বতন মল্লবংশীয় কোনও ক্ষুদ্র সামন্ত ছিলেন। তিনি তীর্থে গমন করিয়া প্রত্যাগমন না করায়, ও অন্য কোনও কারণে, তাঁহার শিশু-পুত্র রঘুনাথ ও তাঁহার মাতা নিতান্ত দরিদ্র ও অসহায় অবস্থায় নিপতিত হন এবং ভগীরথ গুহ * ও এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে অতি কষ্টে লাউগ্রামে জীবন যাপন করিতেন। বালক রঘু পুরাকালের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এবং আধুনিক যুগের ছত্রপতি শিবাজীর ন্যায় নীচ শূদ্র ও অনার্য্য কিশোর ও যুবকগণের সহিত নানারূপ ক্রীড়ায় বাল্যকাল অতিবাহিত করেন ও কৈশোর অবস্থায়ই স্বীয় বীর্য্য ও বুদ্ধিমত্তায় শৈশবের সাথী বাগ্দী প্রভৃতি নীচবংশীয় যুবকগণের নেতৃত্ব-পদ লাভ করিয়া অনেক অসমসাহসিক কার্য্য করেন। তাঁহার সাহস ও রণপাণ্ডিত্য এবং তাঁহার বন্ধু বাগ্দী সৈন্যগণের অকুতোভয়তা দর্শনে নিকটবর্ত্তী কোন কোন ক্ষুদ্র রাজা বিপদ আপদে তাঁহার সহায়তা লাভ করিবার জন্য তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। এইরূপে তিনি পঞ্চমগড় ও পদুমপুর বা প্রদ্যুম্নপুরের রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং ক্রমে বিহারের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার ও লাউগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন

আদিমল্ল প্রথম-জীবনে বাগ্দী সৈন্যগণের নেতা ছিলেন এবং তাহারাই সেই সময় তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার বাগ্দী রাজা নাম হয়। ভারতের এক সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশের সন্তান হইয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ পর্য্যন্ত যশোদানন্দন, গোপাল, ননীচোরা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। আধুনিক যুগেও পাঠান-শাসনসময়ে দাক্ষিণাত্যে হোসেন গাঙ্গ বাহ্মনি কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজ্য Bahmani Kingdom বা ব্রাহ্মণ রাজ্য বলিয়া

* যদি আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়নের গল্প সত্য হয়, তবে ইনি সম্ভবতঃ কান্যকুব্জ হইতে অল্প দিন পূর্ব্বে আগত বিরাট গুহের বংশধর ছিলেন।

ইতিহাসে পরিচিত। তাহার কারণ হোসেন প্রথম-জীবনে ব্রাহ্মণগৃহে প্রতিপালিত হন এবং ব্রাহ্মণসাহায্যেই তাঁহার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়।

আদিমল্ল লাউগ্রামে ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে জয়মল্ল রাজা হইয়াছিলেন। তিনি প্রভূত বলশালী ছিলেন এবং পদুমপুরের রাজাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য ও রাজধানী অধিকার করিয়া লয়েন। পদুমপুরের রাজবংশ অন্তঃপুরিকাগণ সহ কানাইসায়রের জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

বাঙ্গালা দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উপরোক্ত প্রবাদ সত্য এবং ঐ ঘটনা স্বাভাবিক ও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। সে সময় বাঙ্গালা দেশে ঘোর বিপ্লবের যুগ। রাজা শশাঙ্কের দুর্ব্বল পুত্র পিতৃবৈরী মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে পর, রাঢ় সহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ৬৪৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ঘোর অরাজকতা বিরাজিত ছিল। কোন পুরাক্রান্ত রাজার সুশাসন বাঙ্গালায় তৎকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সেই সকল ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসনকর্ত্তাগণ প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া চক্রবর্ত্তিত্ব লাভের চেষ্টা করিতেন। দেশে এইরূপ বিশৃঙ্খলা ও সুশাসনাভাব হইলে উচ্চাভিলাষী সাহসী বীরগণের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ সুযোগেই শিবাজী মহারাষ্ট্ররাজ্য স্থাপন করেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রাক্কালে দেশব্যাপী অরাজকতার সুযোগে আদিমল্ল ও তাঁহার বীর পুত্র জয় মল্ল বর্ত্তমান কোতুলপুর ও জয়পুর থানায় মল্লরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

জয় মল্ল পদুমপুরের চতুষ্পার্শ্বে স্বীয় অসি-রেখা অঙ্কিত করিয়া রাজ্যসীমা প্রসারিত করিতে লাগিলেন ও বিষ্ণুপুর নগর স্থাপিত করিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৩০ বৎসর। তৃতীয় রাজা বেণু মল্ল শতচক্র বেহারীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্থ কিনু মল্ল ইন্দাস বা ইন্দ্রহাস নামক রাজ্য জয় করেন। পঞ্চম ইন্দ্র মল্ল। ষষ্ঠ রাজা কাউ মল্ল কাকটিয়া রাজ্য জয় করেন। ইহা অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগের ঘটনা—তখনও বাঙ্গালায় অরাজকতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। সপ্তম রাজা ঝাউ মল্ল এক বৎসর মাত্র

রাজত্ব করেন, কিন্তু এই অল্পকালমধ্যে তিনিও রাজ্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। পরবর্ত্তী রাজা শূর মল্ল বগড়ী জয় করেন। তৎপরে কনক মল্ল রাজা হন।

ইত্যবসরে দেশের অরাজকতা প্রজাগণের চেষ্টায় নিরাকৃত হইয়াছে, এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া গোপাল দেব বঙ্গের সর্ব্বত্র স্বীয় শাসন-প্রভাব বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সে সময়ে বা তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল দেবের শাসনসময়ে তাঁহাদের সহিত মল্লনৃপতিগণের সংঘর্ষ হওয়া সম্ভব এবং সম্ভবতঃ মল্লনৃপতিগণ পাল-নরপতিগণের চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মল্লভূপগণ যে পরাক্রান্ত স্বাধীন আরণ্য সামন্তরূপে পরিগণিত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই।

কনক মল্লের পর যথাক্রমে কন্দর্প মল্ল, সনাতন মল্ল, [illegible] মল্ল, দুর্জ্জয় মল্ল, যাদব মল্ল, জগন্নাথ মল্ল, বিরাট্ মল্ল, মাধো মল্ল ও দুর্গাদাস মল্ল রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকাল সম্ভবতঃ তিন শত বৎসর। এই তিন শতাব্দীর মধ্যে মল্লরাজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং মল্লরাজবংশের প্রতাপ ও সমৃদ্ধি বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজ্যের স্থানে স্থানে সুরক্ষিত নগরসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক দেবমন্দির, তড়াগ প্রভৃতি বিষ্ণুপুর ও অন্যান্য নগরের শোভা সম্পাদন করিত। বঙ্গীয় স্থাপত্যশিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ধীমান্ ও বীতপাল এই সময়মধ্যে আবির্ভূত হন। বঙ্গ, উড়িষ্যা ও যবদ্বীপে প্রাপ্ত অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্যবিশিষ্ট দেবমূর্ত্তিসকল তাঁহাদেরই সুকুমার রচনাকৌশলের অনুকরণে গঠিত। আমাদের মনে হয়, পদ্মপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাপ্ত দেবমূর্ত্তিগুলিও ঐ শ্রেণীর। মল্লভূপগণের রাজধানী ঐ সময় বিষ্ণুপুর বা পদ্মপুর ছিল তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, তবে দুইটি নগরই যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এই সময় বাঙ্গালার ধর্ম্মজগতেও নানা পরিবর্ত্তন হইতেছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেই বাঙ্গালায় শিব, কুমার প্রভৃতি পৌরাণিক দেবপূজা ও জৈন-মত প্রচলিত ছিল; তৎপরে বৌদ্ধপ্রভাব বাঙ্গালায় বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নানাবিধ দেবদেবী-পূজাপদ্ধতিও প্রচলিত হইতে লাগিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক দেবদেবীপূজা উভয়ে মিলিত হইয়া বাঙ্গালার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে অভিনব তান্ত্রিক মতের সৃষ্টি করিল। যে সময় আদিমল্ল জয় মল্ল প্রভৃতি

মল্লবংশের আদিরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বাঙ্গালায় তান্ত্রিক মতের বিশেষ প্রভাব। লাউগ্রামে আদিমল্ল দণ্ডেশ্বরী নামে দেবী প্রতিষ্ঠিত করেন; জয় মল্লও শঙ্খচক্র বেহারী নামক দেব প্রতিষ্ঠিত করেন—উভয়ই তান্ত্রিক দেব দেবী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তখন দেশ তান্ত্রিক প্রভাবে এত পূর্ণ ছিল যে, অষ্টম শতাব্দীতে আদিশূর যখন বঙ্গে বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা করেন, তখন বাঙ্গালায় বৈদিক-ক্রিয়াকলাপ-পারদর্শী তেজস্বী ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হয় এবং তজ্জন্য আদিশূরকে কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞরক্ষাকারী পঞ্চ ক্ষত্রিয় আনয়ন করিতে হইয়াছিল। যদিই আদিশূরের গল্প মিথ্যা হয়, তাহা হইলেও ইহার মূলে যে কিছু সত্য আছে এবং সে সত্য যে তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের হীনতাসম্বন্ধীয়, তাহাই মনে হয়। এই সময়ের মধ্যেই বঙ্গে অভিনব ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রচলিত হয়। মহাজ্ঞানী ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ এই সময় হিন্দু শূদ্রগণের ধর্ম্মদেবতায় পরিণত হইলেন। (বাইতি ?) জাতীয় রামাই পণ্ডিত নবম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। প্রথমে ডোম, পোদ, হাড়ী প্রভৃতি নীচ মিশ্র জাতির মধ্যেই ধর্ম্মপূজা প্রচারিত হইয়াছিল। পরে হিন্দু শূদ্রগণের মধ্যেও উহা প্রচলিত হয় এবং কালে ডোম পুরোহিতের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণও ধর্ম্মপূজায় পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন। মল্লভূমে এই নবধর্ম্ম বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়; বিষ্ণুপুর নগর স্থাপনের পূর্ব্বেই তথায় বুদ্ধাক্ষ নামক ধর্ম্মদেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—পরে মল্লভূপগণ তাঁহার পূজার জন্য কিছু জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মল্লভূমির নানা স্থানে ধর্ম্মমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হাকন্দ, গাজন, চড়ক প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহে ঐ সমস্ত দেবতার পূজা সম্পন্ন হইত। এখনও মল্লভূমের বহু গ্রামে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধপূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কয়েকটি ধর্ম্মদেবতার নাম এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে—ইন্দাসের বাঁকুড়া রায়, ইন্দাস থানার অন্তর্গত মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণ, গাবপুরের স্বরূপনারায়ণ, বালসীর নবজীবন, পানথাউয়ের বঙ্করায়, দিহামের কালাচাঁদ, জোৎবিহারের কালুরায়, পড়াশের পঞ্চানন। এমন কি, যদি বলা যায় যে,—মল্লভূমের এমন কোনও পুরাতন গ্রাম নাই, যেখানে কোনরূপ ধর্ম্মদেবতা নাই, তাহা হইলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

এই তিন শতাব্দীর মধ্যে মল্লভূমে যে সমস্ত প্রধান গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টির উল্লেখ প্রাপ্ত হই। ইন্দাসের নিকটবর্ত্তী খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত কুলে, বড়া বা বৈকুণ্ঠপুর, কেশরকোনা, অম্বিকানগরের নিকট মুখটী; ছাতনার নিকটবর্ত্তী কাঞ্জিয়া কুড়া। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণপঞ্চকম্।

(শ্রীহরিচরণ কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ)

ধর্ম্মেণ ধর্ম্মস্য বিবাদকালে
যো ভারতে ধর্ম্মসমন্বয়ায়।
আবির্ব্বভূব স্থিতধীর্মহাত্মা
তং রামকৃষ্ণং সততং স্মরামি ॥১॥

পরোপকারায় সতাং বিভূতি-
র্বিধানমেতৎ পরিপালনীয়ম্।
সুযোগমাসাদ্য মতং হি যস্য
তং রামকৃষ্ণং সততং স্মরামি ॥২॥

জ্ঞানার্থিশিষ্যো ললনাবিলাসং
ত্যজেত্তথা রত্নহিরণ্যলোভম্
যস্যৈতদাসীদুপদেশবাক্যং
তং রামকৃষ্ণং সততং স্মরামি ॥৩॥

আকারযুক্তো জগতামধীশ
আকারহীনঃ কিমু বেতি তর্কে।
তুষারখণ্ডঃ তুলিতং হি যেন
তং রামকৃষ্ণং সততং স্মরামি ॥৪॥

যো মুক্তিপূর্ণাবয়বস্বকীয়-
মতপ্রকাশাদ্ ভুবনে বরেণ্যঃ।
নিরক্ষরোঽপাক্ষরসংবিধানা
তং রামকৃষ্ণং সততং স্মরামি ॥৫॥

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ৯ই ফাল্গুন, রবিবার, ইংরাজী ২১ ফেব্রুয়ারী, বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অশীতিতম জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জন্মতিথি তৎপূর্ব্ব মঙ্গলবারে পড়িয়াছিল এবং তদুপলক্ষে বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তন ও প্রসাদবিতরণও ঐ দিনের উৎসবের অঙ্গস্বরূপ ছিল। রবিবারের দিন মঠবাটী অতি মনোহরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। মঠের দক্ষিণস্থ ভূমিতে বিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি বৃহৎ আলেখ্য লতাকুসুমাদি-পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছিল। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শুভ পদার্পণে এবং মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর উপস্থিতি হেতু এবারকার উৎসব বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় ৬০০০০ নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারের সুবন্দোবস্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন রেল, গাড়ী ও নৌকাযোগে এবং পদব্রজে বহুসংখ্যক লোক আগমন করিয়াছিলেন। আন্দুলের বিখ্যাত কালীকীর্ত্তন-সম্প্রদায়, শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জনবাবুর কনসার্ট-পার্টি এবং বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ সঙ্কীর্ত্তন-দল ভগবন্নামগানে মঠটীকে ধর্ম্মভাবে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সমস্ত দিবস পংক্তিভোজন ও প্রসাদবিতরণ চলিয়াছিল। যাঁহার অলোকসামান্য সাধনা জগতের সর্ব্ববিধ ভেদজ্ঞানের বিলোপ সাধন করিয়া মানবকে এক ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধানে তৎপর করিয়াছিল, ভারতবাসী যে আজি তাঁহার উপদেশমালা সাদরে মস্তকে ধারণ করিতেছে, এই বিপুল জনসঙ্ঘের ভ্রাতৃভাবে এই দিনের মহোৎসবে যোগদানই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

রবিবারের দিন মান্দ্রাজ মঠে উক্ত মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৮॥টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ভজন, ৯॥টা হইতে অপরাহ্ণ ২টা পর্য্যন্ত, দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা, আড়াইটা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত "বুদ্ধচরিত্র" সম্বন্ধে হরিকথা, এবং তৎপরে "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কি শিখাইতে আসিয়াছিলেন" এতৎসম্বন্ধে শ্রীযুত বেঙ্কটরাম রাও আভর্গল এম, এ কর্তৃক বক্তৃতা—এই উৎসবের অঙ্গস্বরূপ ছিল।

এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জস্থ মঠভবনে উক্ত দিবস উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকাল ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত পূজা, ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত ভজন, ১টা হইতে অপরাহ্ণ ২টা পর্য্যন্ত দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা এবং ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত প্রসাদ-বিতরণ হইয়া উৎসবের অবসান হয়।

বারাণসীস্থ রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে মহোৎসব ভক্তিভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বেলা ১১টার সময় শতাধিক সাধু ও শতাধিক দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পাঁচশত শ্রোতার সম্মুখে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন, ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সুললিত হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও জগদ্বাসীকে স্বীয় সাধন-ফল বিতরণে আগ্রহ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, এবং ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত—উক্ত উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল।

বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন গৃহে উক্ত দিবস প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন, ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পাঠ, সঙ্গীত ও স্থানীয় হাঁসপাতালের রোগী-দিগের সেবা, অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫।৷ টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহে এবং পরে ৬৷৷টা হইতে ৮৷৷টা পর্য্যন্ত মিশন ভবনে প্রবন্ধপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন, এবং সর্ব্বশেষে মিষ্টমুখ করিয়া উৎসব সমাপ্ত হয়।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের আয়োজনে উক্ত দিবস ৺মোহিনীবাবুর বাটীতে সকাল ৭টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত নানাবিধ সঙ্গীত, পাঠ, কীর্ত্তন ও গোষ্ঠ-লীলা গান, ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতানুশীলন এবং ৪টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মুন্সীগঞ্জ রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক জয়দেব গীতাভিনয় হইয়াছিল।

রেঙ্গুন "রামকৃষ্ণ সোসাইটী" ও "রামকৃষ্ণ সেবক-সমিতি"র সম্মিলিত উদ্যোগে উক্ত দিবস স্থানীয় বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে সম্প্রতি অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজ্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করা হয়। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর্ জেনারেল্ মিঃ পি, সি, সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উক্ত দিবস প্রাতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন, দ্বিপ্রহর হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় চারি শত দরিদ্রনারায়ণকে সেবা, সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯॥টা পর্য্যন্ত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল এম, এ এবং শ্রীযুত স্ুন্দররাম আয়ার কর্ত্তৃক বক্তৃতা হয়। পরে হরি-সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তনান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাঁচির ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মঠ হইতে উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকাল হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শিলংএর প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীযুত কেদারনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক গোষ্ঠ-লীলা গান, ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পূজা ও প্রসাদ বিতরণ, ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আরতি ও কালী-কীর্ত্তন হয়।

উক্ত ২৮শে তারিখে মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ, ঐ উপলক্ষে মঠ হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে পূজা ও অপরাহ্নে প্রায় ১৫০০ দরিদ্রনারায়ণকে ভোজন দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। সহরের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবন-চরিত্র সম্বন্ধে মনোহর বক্তৃতা করেন।

এতদ্ভিন্ন ব্যাঙ্গালোর মঠ, কনখল ও বৃন্দাবন সেবাশ্রম, সারগাছি আশ্রম, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম, এবং নরোত্তমপুর, বিষ্ণুপুর, বামরাইল প্রভৃতি বহু স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানাভাবে আমরা তাহাদের সবিস্তার উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যভাব। পূর্ব্বকথা।

(স্বামী সারদানন্দ)

৺ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠান করিয়া ঠাকুর নিজ সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উহা সন ১২৮০ সালে, ইংরাজী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তিনি দিব্যভাবের প্রেরণায় জীবনের সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। ঠাকুরের বয়স তখন আটত্রিশ বৎসর ছিল। সুতরাং উনচল্লিশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ বর্ষ কাল তাঁহার জীবনে ঐ ভাব নিরন্তর প্রবাহিত ছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার চেষ্টাসমূহ এইকালে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্যশিক্ষা-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপনে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্যার পরে ঠাকুর নিজ শক্তির এবং দেশের জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে একাদিক্রমে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে পাশ্চাত্যভাবে দীক্ষিত ব্যক্তিসকলের মধ্যে ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়া দ্বাদশ বৎসরান্তে উক্ত ব্রতের উদ্‌যাপনপূর্ব্বক সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্য তিনি যেরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

পাঠক হয়ত আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথায় স্থির করিবেন যে, উনচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ঠাকুর সাধকের ভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহা নহে। 'গুরুভাব'শীর্ষক গ্রন্থে আমরা ইতিপূর্ব্বে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে,

গুরু, নেতা বা ধর্ম্মসংস্থাপকের পদবী স্বভাবতঃ গ্রহণপূর্ব্বক যাঁহারা মানবের হিতসাধন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত জগতে পূজ্য হইয়াছেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদিগের জীবনে ঐ সকল গুণের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ঠাকুরের জীবনে আমরা বাল্যকাল হইতে গুরু ও ধর্ম্মসংস্থাপকের ভাব সময়ে সময়ে লক্ষ্য করিয়া থাকি। যৌবনে, সাধনকালে উহাদের প্রেরণায় তিনি অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন—একথা বুঝিতে পারি এবং সাধনাবস্থার অবসানে, তাঁহার বত্রিশ বৎসর বয়সকালে শ্রীযুত মথুরের সহিত তীর্থপর্য্যটনকালে এবং পরে, উহাদিগের সহায়ে প্রায় সকল কার্য্য করিতেছেন —এ বিষয়ের পরিচয় পাই। অতএব সন ১২৮১ সাল হইতে তাঁহাতে দিব্য-ভাবের প্রকাশ এবং তাঁহার ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে মনোনিবেশ বলিয়া যে এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার কারণ, এখন হইতে তিনি দিব্যভাবের নিরন্তর প্রেরণায়, পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞানমূলক যে শিক্ষা ও সভ্যতা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত-ভারতীকে প্রতিদিন বিপরীতভাবাপন্ন করিয়া সনাতন ধর্ম্মমার্গ হইতে সুদূরে লইয়া যাইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া জনসাধারণের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন।

ঐরূপ করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরকৃপায় ঠাকুরের অলৌকিক আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন দিব্য-ভাবময় জীবন উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলে ভারতের নিজ জাতীয়ত্বের এবং সনাতন ধর্ম্মের এককালে লোপসাধন হইত বলিয়া স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, ঠাকুর নিজ জীবনে পৃথিবীস্থ যাবতীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সাধনপূর্ব্বক 'যত মত তত পথ'-রূপ সত্যের আবিষ্কার করিয়া যেমন পৃথিবীস্থ সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির কল্যাণ-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ পাশ্চাত্যশিক্ষাসম্পন্ন ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের সম্মুখে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর নিজ আদর্শ-জীবন অতিবাহিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই কালে ধর্ম্মসংস্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাশ্চাত্য-ভাবরূপ বন্যা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় বিষম সঙ্কটে ভারত উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছে। অতএব সনাতন ধর্ম্মের সহিত পূর্ব্ব-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার

ধর্ম্মমতকে সংযুক্ত করিয়া অধিকারি-ভেদে তাহাদিগের সমসমান প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করা যেমন তাঁহার জীবনের বিশেষ কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রবল স্রোতে নিমজ্জনোন্মুখ ভারতের উদ্ধারসাধন তাঁহার জীবনের ঐরূপ দ্বিতীয় কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সন ১২৪২ সাল বা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ বৎসরেই ঠাকুর জন্মপরিগ্রহ করেন। অতএব পাশ্চাত্যশিক্ষার দোষভাগ যে শক্তির দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং যাহার সহায়ে ভারত নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্যশিক্ষার গুণভাগকে মাত্র নিজস্ব করিয়া লইবে, বিধাতার বিধানে তদুভয় শক্তির ভারতে যুগপৎ উদয় ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

আধ্যাত্মিক-রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ মানব-জীবনে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব ঈশ্বরকৃপায় মুক্ত হইয়া পরিণামে উক্ত ভাবের সামান্য মাত্র আস্বাদনেই সমর্থ হইয়া থাকে। কারণ, মানব যখন শমদমাদি গুণসমূহ শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, পরমাত্মার প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাহার ক্ষুদ্র আমিত্ববোধ যখন চিরকালের নিমিত্ত অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-সাগরে বিলীন হইয়া থাকে, নির্বিকল্প সমাধিতে ভস্মীভূত হইয়া তাহার মন-বুদ্ধি যখন সর্ব্বপ্রকার মলিনতা পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিগ্রহে পরিণত হয় এবং তাহার অন্তরের অনাদি বাসনা-প্রবাহ জ্ঞানসূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে এককালে বিশুষ্ক হইয়া যখন নবীন সংস্কার ও কর্ম্মপুঞ্জের উৎপাদনে আর সমর্থ হয় না—তখনই তাহাতে দিব্যভাবের উদয় হইয়া তাহার জীবন কৃতার্থ হইয়া থাকে। অতএব দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশে চিরপরিতৃপ্ত ব্যক্তির দর্শনলাভ যেমন অতীব বিরল, তেমনি আবার, ঐরূপ ব্যক্তির কার্য্যকলাপ কোনও প্রকার অভাববোধ হইতে প্রসূত না হওয়ায় উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া প্রতীত হইয়া সাধারণ মন-বুদ্ধির নিকটে চিরকাল দুর্বোধ্য থাকে। সুতরাং দিব্যভাবের স্বরূপ যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে কেবলমাত্র দিব্যভাবারূঢ় ব্যক্তিই সমর্থ হয় এবং উক্ত ভাবের প্রেরণায় যে সকল অলৌকিক কার্য্যাবলী সম্পাদিত হয়, সে সকলের আলোচনা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত না করিলে তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র মর্ম্মগ্রহণও আমাদের ন্যায় মন-বুদ্ধির কখন সম্ভবপর হয় না।

স্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতি।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মঠে তখন ইণ্ডিয়ান মিরর নামক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরূপ সংস্থান ছিল না যে, উহার ডাকখরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বারা বরাহনগর পর্য্যন্ত বিলি হইত। বরাহনগরে 'দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা' সেবাব্রত শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়প্রতিষ্ঠিত একটী বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একখানি করিয়া ঐ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আসিত। ইণ্ডিয়ান মিররের পিয়নের ঐ পর্য্যন্ত বিট বলিয়া মঠের কাগজখানিও ঐখানে আসিত এবং তথা হইতে উহা প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হইত। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামিজীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থানকালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামিজী একটী benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই প্রদত্ত হয়। যাহা হউক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুরসেবার আয়োজন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজ আনার ভারও তাঁহার উপরেই ছিল। তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটিয়াছি, কিন্তু তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্ম্মের একটা প্রণালীপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া সকলের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কাযের ভার দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কার্য্য করিতে হইতেছে। তাঁহারও তাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নূতন সাধুদের উপর দিতে পারেন, তবে তাঁহার কতকটা অবকাশ হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, "যেখানে ইণ্ডিয়ান মিরর আসে, তোমাকে সেই স্থান দেখাইয়া আনিব—তুমি রোজ গিয়া কাগজখানি আনিও।" আমিও ইহা অতি সহজ কাজ জানিয়া এবং উহাতে একজনের কার্য্যভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে

ভাবিয়া, সহজেই স্বীকৃত হইলাম। এক দিন দ্বিপ্রহরের প্রসাদ ধারণান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, "চল, সেই বিধবাশ্রম-স্থানটী তোমায় দেখাইয়া দিই।" আমিও তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়াছি, ইতিমধ্যে স্বামিজী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "বেদান্তপাঠ করা যাক্—আয়।" আমি "অমুক কার্য্যে যাইতেছি" বলায় আর কিছু বলিলেন না। আমি কানাই মহারাজের সহিত বাহির হইয়া সেই স্থান চিনিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট শুনিলাম—স্বামিজী আমি চলিয়া যাইবার কিছু পরে অপরের নিকট বলিতেছিলেন—"ছোঁড়াটা গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখিতে গেল নাকি?" এই কথা শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, "ভাই, চিনিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু তথায় কাগজ আনিতে আমার আর যাওয়া হইবে না।"

শিষ্যগণের, বিশেষতঃ, নূতন নূতন ব্রহ্মচারিগণের যাহাতে চরিত্র রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে স্বামিজী এত সাবধান ছিলেন। কলিকাতায়, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু ব্রহ্মচারী বাস করে বা রাত কাটায়—ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না; বিশেষ, যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি।

যে দিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে যেন এখনও বাজিতেছে :—

"দেখ্ বাবা, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্ম্মজীবন লাভ কর্‌তে হলে ব্রহ্মচর্য্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের একদম সংস্পর্শে আস্‌বি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না কর্ত্তে বল্‌ছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচ্‌বার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাৎ থাক্‌তে বল্‌ছি। তোরা যে আমার লেক্‌চারে পড়েছিস্—আমি সংসারে থেকেও ধর্ম্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিস্‌নি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস ধর্ম্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করব, সে সব লেক্‌চারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে

যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পর দিন থেকে আর কেউ আমার লেক্‌চারে আস্‌ত না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐ ভাবে লেক্‌চার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের কথা তোদের বল্‌ছি—ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া এতটুকু ধর্ম্মলাভও হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন কর্‌বি।”

* * * * *

একদিন বিলাত হইতে কি একখানা চিঠি আসিয়াছে— সেই চিঠিখানি পড়িয়া তৎপ্রসঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন- ধর্ম্মপ্রচারকের এই এই গুলি খোলা থাকা আবশুক, ও এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ তাহার মাথা, হৃদয় ও মুখ খোলা থাকা আবশুক—তাহার প্রবল মেধাবী, হৃদয়বান্ ও বাগ্মী হওয়া উচিত—আর তাহার অধোদেশের কার্য্য যেন বন্ধ থাকে—যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যবান্ হয়। জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্য সমুদয় গুণ আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব—যাহা হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে।

সেই পত্রে সিষ্টার নিবেদিতা (তখন মিস্ নোব্‌ল্) বিলাত হইতে শীঘ্র ভারতে রওনা হইবেন, এই সংবাদ ছিল। মিস নোব্‌লের প্রশংসায় স্বামিজী শতমুখ হইলেন, বলিলেন, বিলাতের ভিতর এমন পূতচরিতা, মহানুভাবা রমণী অতি দুর্ল্ভ। আমি যদি কাল মরিয়া যাই, তথাপি এ আমার কার্য্য বজায় রাখিবে। স্বামিজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

* * * * *

বেদান্তের শ্রীভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদক, স্বামিজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মবাদিন্ পত্রের প্রধান লেখক, মান্দ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুত রঙ্গাচার্য্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, স্বামিজীর নিকট পত্র আসিয়াছে। মধ্যাহ্ন। স্বামিজী আমাকে বলিলেন, “চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ্ দিকি; একটু আর খাবার জল নিয়ে আয়।”

আমি এক গ্লাস জল স্বামিজীকে দিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিলাম, "আমার হাতের লেখা তত ভাল নয়।" আমি মনে করিয়াছিলাম, বিলাত আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামিজী অভয় দিয়া বলিলেন, "লেখ—foreign letter (বিলাতী চিঠি) নয়।" তখন আমি কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম—স্বামিজী ইংরাজীতে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। একখানি উক্ত অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্যকে লেখাইলেন; আর একখানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন, কাহাকে, ঠিক মনে নাই। রঙ্গাচার্য্যকে অন্যান্য কথার ভিতর এই কথা লেখাইয়াছিলেন মনে আছে যে, বাঙ্গালা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চ্চা নাই, অতএব আপনি যখন কলিকাতায় আসিতেছেন, তখন give a rub to the people of Calcutta—কলিকাতাবাসীকে একটু উস্কাইয়া দিয়া যান। কলিকাতায় যাহাতে বেদান্তের চর্চ্চা বাড়ে, কলিকাতাবাসী যাহাতে একটু সচেতন হয়, তজ্জন্য স্বামিজীর কি দৃষ্টি ছিল! নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বামিজী কলিকাতায় দুইটী মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি যখনই সুবিধা পাইতেছেন, তখনই কলিকাতাবাসীর ধর্ম্মভাব জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বামিজীর এই পত্রের ফলেই, ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতাবাসিগণ ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত পণ্ডিতবরের The Priest and the Prophet (পুরোহিত ও ঋষি) নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

* * * * *

একটী বয়স্ক বাঙ্গালী যুবক এই সময় মঠে আসিয়া তথায় সাধুরূপে বাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। স্বামিজী ও মঠের অন্যান্য সাধুগণ তাহার চরিত্র পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রমভুক্ত হইবার অনুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বামিজী তাহাকে বলিলেন, "মঠে যে সকল সাধু আছেন, তাঁহাদের যদি সকলের মত হয়, তবে তোমায় রাখিতে পারি।" এই কথা বলিয়া পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে মঠে রাখিতে তোমাদের কাহার কিরূপ মত?" তখন সকলেই একবাক্যে

তাহাকে রাখিতে অমত প্রকাশ করিলে, উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না। ইহার কিছুকাল পরে শুনিয়াছিলাম, এ ব্যক্তি কোনরূপে বিলাত গিয়াছিল এবং সঙ্গে পয়সা কড়ি না থাকাতে তাহাকে work-houseএ থাকিতে হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*　　*

একদিন অপরাহ্নে মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়া বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছেন—সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে স্বামিজী কর্তৃক প্রচার-কার্য্যের জন্য মান্দ্রাজে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার অপর একজন গুরুভ্রাতা তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্য্যভার লইয়াছেন। আরাত্রিকাদি কার্য্যে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তাঁহাদিগকেও লইয়া স্বামিজী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত গুরুভ্রাতা আসিয়া নূতন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, "চল হে চল, আরতি কর্‌তে হবে, চল।" তখন একদিকে স্বামিজীর আদেশে সকলে বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইঁহার আদেশে ঠাকুরের আরাত্রিকে যোগদান করিতে হইবে, নূতন সাধুরা একটু গোলে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন স্বামিজী তাঁহার ঐ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নহে? কেবল একখানা ছবির সাম্‌নে সল্‌তে-পোড়া নাড়্‌লে ও ঝাঁজ পিট্‌লেই মনে কর্‌ছিস্ বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?—তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি," এইরূপ বলিতে বলিতে আরও উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে বেদান্তপাঠ ভঙ্গ হইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে আরতিও হইয়া গেল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্রাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, তখন স্বামিজীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া 'সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খাইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল'—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকেই চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে, তাঁহাকে মঠের উপরের ছাদে চিন্তান্বিতভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়া স্বামিজীর নিকট লইয়া আসা হইল। তখন স্বামিজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি

তাঁহাকে কত আদর, কত যত্ন করিলেন, তাঁহাকে কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা স্বামিজীর গুরুভাইএর প্রতি অপূর্ব্ব ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামিজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামিজীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, যাঁহাকে স্বামিজী বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

* * * * *

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে আমাকে বলিলেন, "দেখ্, মঠের একটা ডায়েরি রাখ্‌বি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা করে রিপোর্ট পাঠাবি।" স্বামিজীর এই আদেশ আমি ও পরে মধ্যে মধ্যে অপর অনেকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখনও মঠের সেই আংশিক ডায়েরি মঠে পরিরক্ষিত আছে। তাহা হইতে এখনও মঠের ক্রমবিকাশের অনেকটা ধারাবাহিক ইতিহাস ও স্বামিজী-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

দেববাণী।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরাতন অন্ধকূপসদৃশ; আমরা ঐ অন্ধকূপে পড়ে কর্ত্তব্য, বন্ধন প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি—ঐ স্বপ্নের আর শেষ নেই। কাকেও সাহায্য করতে গিয়ে আর ভ্রমের সৃষ্টি করো না। এ যেন বটগাছের মত, ক্রমাগত ঝুরি নামিয়ে বাড়্‌তেই থাকে। যদি তুমি দ্বৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে সাহায্য কর্‌তে যাওয়াই তোমার আহাম্মকি। আর যদি অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি ত স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ—তোমার আবার কর্ত্তব্য কি? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ধুবান্ধব—কারও প্রতি কিছু কর্ত্তব্য নেই। যা হচ্ছে হয়ে যাক্, চুপ্ চাপ্ করে পড়ে থাক।

"রামপ্রসাদ বলে ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আস্‌বে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা॥"

শরীর মরে মরুক্—আমার একটা দেহ আছে, এটা ত একটা পুরাতন উপকথা বই আর কিছু নয়। চুপ্ চাপ্ করে থাক, আর আমি ব্রহ্ম বলে জান।

কেবল বর্ত্তমান কালই বিদ্যমান—আমরা চিন্তায় পর্য্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারি না; কারণ, চিন্তা করতে গেলেই উহাকে বর্ত্তমান করে ফেল্‌তে হয়। সব ছেড়ে দাও, উহা যেখানে যাবার, ভেসে যাক্। এই সমগ্র জগৎটাই একটা ভ্রমমাত্র; উহা যেন তোমায় আর প্রতারিত করতে না পারে। জগৎটাকে তুমি উহা যা নয় তাই বলে জেনেছ, অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান করেছ, এখন উহা বাস্তবিক যা, উহাকে তাই বলে জান। যদি দেহটা কোথাও ভেসে যায়, যেতে দাও; দেহ যেখানেই যাক না কেন, কিছু গ্রাহ্য করো না। কর্ত্তব্য বলে একটা কিছু আছে এবং তাকে পালন কর্ত্তেই হবে—এইরূপ ধারণা ভীষণ কালকূটস্বরূপ—উহা জগৎকে নষ্ট করে ফেল্‌ছে।

স্বর্গে গেলে বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবে—এর জন্য অপেক্ষা করো না। এইখানেই একটা বীণা নিয়ে আরম্ভ করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্য অপেক্ষা করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে ফেল। তোমাদের বইয়ে আছে, স্বর্গে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া নাই—তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না কেন? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও না কেন? সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন মুক্ত পুরুষের চিহ্ন। সংসাররূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও। মুক্তির পতাকা—গৈরিক ধারণ কর।

৪ঠা আগষ্ট, রবিবার।

'অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁকে না জেনে উপাসনা করছে, আমি তোমার নিকট তাঁর কথা প্রচার করছি।'

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সকল জ্ঞাত বস্তুর মধ্যে আমাদের অধিক জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্তু, যাঁকে আমরা সর্ব্বত্র দেখ্‌ছি। সকলেই তাদের নিজ আত্মাকে জানে; সকলেই, এমন কি, পশু পর্য্যন্ত জানে যে, আমি আছি। আমরা যা কিছু জানি, সব আত্মারই বহিঃপ্রসারণ, বিস্তারস্বরূপ। ছোট ছোট ছেলেদের এ তত্ত্ব শিখাও, তারাও এ তত্ত্ব ধারণা করতে পারে।

প্রত্যেক ধর্ম্ম (কোন কোন স্থলে অজ্ঞাতসারে হলেও) এই আত্মাকেই উপাসনা করে এসেছে, কারণ, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার প্রতি এরূপ ঘৃণিত ভাবে আসক্ত হয়ে থাকাই সমুদয় অনিষ্টের মূল। তাই থেকে এই সব প্রতারণা চুরি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এরই জন্যে লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি হয়। কোন জড় বস্তুকে মূল্যবান্ বলে মনে করো না, আর উহাতে আসক্ত হয়ো না। তুমি যদি কিছুতে, এমন কি, জীবনে পর্য্যন্ত আসক্ত না হও, তা হলে আর কোন ভয় থাক্‌বে না। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' যিনি এই জগতে নানা দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। আমরা যখন সবই এক দেখি, তখন আমাদের শরীরের মৃত্যু থাকে না, মনের মৃত্যুও থাকে না। জগতের সকল দেহই আমার, সুতরাং আমার দেহও নিত্য; কারণ, গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্রসূর্য্য, এমন কি, সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডই আমার দেহ—তবে ঐ দেহের নাশ হবে কিরূপে? প্রত্যেক মন, প্রত্যেক চিন্তাই আমার—তবে মৃত্যু আস্‌বে কি করে? আত্মা কখন জন্মেনও না, মরেনও না—যখন আমরা এইটে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, তখন সকল সন্দেহ উড়ে যায়। 'আমি আছি', 'আমি অনুভব কর্‌ছি' 'আমি সুখী হচ্ছি'—'অস্তি, ভাতি, প্রিয়'—এগুলির উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পারে না। ক্ষুধা বলে কিছু থাক্‌তে পারে না, কারণ, জগতে যে কেউ যা কিছু খাচ্ছে, তা আমিই খাচ্ছি। আমাদের যদি এক গাছা চুল উঠে যায়, আমরা মনে করি না যে, আমরা মলাম। সেইরূপ যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, সে ত ঐ এক-গাছা চুল উঠে যাওয়ারই মত।

* * * *

সেই জ্ঞানাতীত বস্তুই ঈশ্বর—তিনি বাক্যের অতীত, চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত।.........তিনটে অবস্থা আছে,—পশুত্ব (তমঃ), মনুষ্যত্ব (রজঃ) ও দেবত্ব (সত্ত্ব)। যাঁরা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন, তাঁরা অস্তিমাত্র বা সৎস্বরূপমাত্র হয়ে থাকেন। তাঁদের পক্ষে কর্ত্তব্যের একেবারে নাশ হয়ে যায়, তাঁরা কেবল লোককে ভালবাসেন, আর

চুম্বকের মত অপরকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মুক্তি। তখন আর চেষ্টা করে কোন সৎকার্য্য কর্‌তে হয় না, তখন তুমি যে কাজ কর্‌বে, তাই সৎকার্য্য হয়ে যাবে। ব্রহ্মবিৎ যিনি, তিনি সকল দেবতার চেয়েও বড়। যীশুখ্রীষ্ট যখন মোহকে জয় করে 'শয়তান, আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ' বলেছিলেন, তখনই দেবতারা তাঁকে পূজা কর্‌তে এসেছিলেন। ব্রহ্মবিৎকে কেউ কিছু সাহায্য কর্‌তে পারে না, 'সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ তাঁর সাম্‌নে প্রণত হয়ে থাকে। তাঁর সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, তাঁর আত্মা অপরকে পবিত্র করে থাকে। অতএব যদি ঈশ্বর লাভের কামনা কর, তবে ব্রহ্মবিদের পূজা কর। যখন আমরা দেবানুগ্রহস্বরূপ মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয়, লাভ করি, তখনই বুঝ্‌তে হবে, মুক্তি আমাদের করতলগত।

* * * *

চিরকালের জন্য দেহের মৃত্যুর নামই নির্ব্বাণ। ইহা নির্ব্বাণতত্ত্বের 'না'-এর দিক্। এতে কেবল বলে আমি এটা নই, ওটা নই। বেদান্ত আর একটু অগ্রসর হয়ে 'হাঁ'এর দিক্‌টা বলেন—ওরই নাম মুক্তি। 'আমি অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ, আমিই সেই'—এই হল বেদান্ত—সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন খিলানের শীর্ষপ্রস্তর-স্বরূপ।

বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তরাম্নায়ভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই মুক্তিতে বিশ্বাসী—তারা যথার্থই বৈদান্তিক। কেবল সিংহলবাসিগণই নির্ব্বাণকে বিনাশের সহিত সমানার্থক ভাবে গ্রহণ করে।

কোনরূপ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস 'আমি'কে নাশ কর্‌তে পারে না। যেটার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ও অবিশ্বাসে যা উড়ে যায়, তা ভ্রমমাত্র। আত্মাকে কিছুই স্পর্শ কর্‌তে পারে না। আমি আমার আত্মাকে নমস্কার করি। 'স্বয়ংজ্যোতিঃ আমি নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ব্রহ্ম।' এই দেহটা যেন একটা অন্ধকার ঘর; আমরা যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই উহা আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই উহা জীবন্ত হয়। আত্মার এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিকে কিছুই স্পর্শ কর্‌তে পারে না, একে কোন মতেই নষ্ট করা যায় না। একে আবৃত করা যেতে পারে, কিন্তু কখন নষ্ট করা যায় না।

*　　　*　　　*　　　*

বর্ত্তমান যুগে ভগবান্‌কে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননীরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপূজায় আমেরিকায় মহাশক্তির বিকাশ হবে। এখানে কোন মন্দির (পৌরোহিত্যশক্তি) আমাদের গলা টিপে ধরে নাই, আর অপেক্ষাকৃত গরীব দেশের মত এখানে কেউ কষ্ট ভোগ করে না। স্ত্রীলোকেরা শত শত যুগ ধরে দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে, তাইতে তাদের ভিতর অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা কোন ভাব সহজে ছাড়্‌তে চায় না। এই হেতুই তারা কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মসমূহের এবং সকল দেশের পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটেই পরে তাদের স্বাধীনতার কারণ হবে। আমাদিগকে বৈদান্তিক হয়ে বেদান্তের এই মহান্ ভাবকে জীবনে পরিণত করতে হবে। নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও ঐ ভাব দিতেই হবে—এটা কেবল স্বাধীন আমেরিকায়ই কার্য্যে পরিণত করা যেতে পারে। ভারতে বুদ্ধ, শঙ্কর ও অন্যান্য মহামনীষী ব্যক্তি এই সকল ভাব লোকসমক্ষে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকে সেগুলি ধরে রাখ্‌তে পারে নি। এই নূতন যুগে নিম্নজাতিরা বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করবে, আর স্ত্রীলোকদের দ্বারাই এটা কার্য্যে পরিণত হবে।

"আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে। (মাঝে মাঝে)
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিয়ো না'ক,
জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে।"

"যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ করছে, তুমি সেই সকলের পারে। তুমি আমার জীবনের সুধাকরস্বরূপ, আমার আত্মারও আত্মা।"

রবিবার, অপরাহ্ণ।

দেহ যেমন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার হাতে একটা যন্ত্রস্বরূপ। জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে ভিতরের গতি। সমুদয় পরিণামের আরম্ভ ও সমাপ্তি কালে। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তিনি

নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ; আর যদি পূর্ণস্বরূপ হন, তবে তিনি অনন্তস্বরূপ; আর অনন্তস্বরূপ হলে অবশ্যই তিনি দ্বিতীয়রহিত;—কারণ, দুটো অনন্ত ত আর থাক্‌তে পারে না? সুতরাং আত্মা একমাত্রই হতে পারেন। যদিও আত্মাকে বহু বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক। যদি কোন ব্যক্তি সূর্য্যের অভিমুখে চল্‌তে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে সে এক একটা বিভিন্ন সূর্য্য দেখ্‌বে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবগুলি ত সেই একই সূর্য্য।

'আস্তি'ই হচ্ছে সর্ব্বপ্রকার একত্বের ভিত্তিস্বরূপ, আর ঐ ভিত্তিতে যেতে পার্‌লেই পূর্ণতা লাভ হয়। যদি সব রংকে এক রঙে পরিণত করা সম্ভব হত, তবে চিত্রবিদ্যাই লোপ পেয়ে যেত। সম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রাম বা লয়-স্বরূপ; আমরা সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর হতে প্রসূত বলে থাকি। 'টাও'-বাদী*, কংফুছমতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু, য়াহুদী, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও জরতুষ্ট্র-শিষ্যগণ সকলেই প্রায় এক প্রকার ভাষায়, "তুমি অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর"—এই অপূর্ব্ব নীতি প্রচার করেছেন। কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এই বিধির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কারণ, তাঁরা এর কারণ দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। মানুষকে অপর সকলকে ভালবাস্‌তেই হবে; কারণ, সেই অপর সকলে যে, সে ছাড়া কিছু নয়। এক অনন্ত বস্তুই রয়েছে কি না?

জগতে যত বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্য হয়েছেন, তন্মধ্যে কেবল লাওট্জে, বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, 'তোমার শত্রুদিগকে পর্য্যন্ত ভালবাস', 'যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদেরও ভালবাস।'

তত্ত্বসমূহ পূর্ব্ব থেকেই রয়েছে; আমরা তাদের সৃষ্টি করি না, আবিষ্কার করি মাত্র। ধর্ম্ম কেবল প্রত্যক্ষানুভূতিমাত্র। বিভিন্ন মতামত পথস্বরূপ—প্রণালীস্বরূপ মাত্র, ওরা ধর্ম্ম নয়। জগতের যত বিভিন্ন ধর্ম্ম সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী এক ধর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। শুধু মতে কেবল বিরোধ বাধিয়ে দেয়; দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শান্তি

* খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লাওট্জে-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়। ইঁহাদের মত প্রায় বেদান্তসদৃশ। 'টাও' এর ধারণা অনেকটা বেদান্তের নিগুর্ণ ব্রহ্মসদৃশ।

হবে—তা না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্দ্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে। একেবারে মূলে যাও। স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা কর—তিনি কিংস্বরূপ? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, বুঝ্‌তে হবে, তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্ম্মই বলে, তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন।

তোমার নিজের যেন কিছু বল্‌বার থাকে, তা না হলে অপরে কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা কর্‌তে পার্‌বে কেন? পুরাতন কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকো না, সর্ব্বদাই নূতন সত্যসমূহের জন্য প্রস্তুত হও। "মূর্খ তারা, যারা তাদের পূর্ব্বপুরুষদের খোঁড়া কুয়ার নোন্‌তা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া কুয়ার বিশুদ্ধ জল খাবে না।" আমরা যতক্ষণ না নিজেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর্‌ছি, ততক্ষণ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জান্‌তে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বভাবতঃ পূর্ণস্বরূপ, অবতারেরা তাঁদের এই পূর্ণস্বরূপকে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে রয়েছে। আমরা কি করে বুঝ্‌ব—মুশা ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন, যদি আমরাও তাঁকে দেখ্‌তে না পাই? যদি ঈশ্বর কখনও কারও কাছে এসে থাকেন ত আমারও কাছে আস্‌বেন। আমি একেবারে সোজাসুজি তাঁর কাছে যাব, তিনি আমার সঙ্গে কথা কন্‌। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ কর্‌তে পারি না—সেটা নাস্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দামাত্র। যদি ঈশ্বর দু হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা করে থাকেন, তিনি আজ আমার সঙ্গেও কথা কইতে পারেন! তা না হলে কি করে জান্‌ব, তিনি মরে যান নি? যে কোন রকমে হক্‌, ঈশ্বরের কাছে এস—কিন্তু আসা চাই। তবে আস্‌বার সময় যেন কাউকে ঠেলে ফেলে দিও না।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা রাখ্‌বেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি একটা পিঁপ্‌ড়ের জন্য পর্য্যন্ত নিজের দেহত্যাগ কর্‌তে রাজী থাকেন, কারণ, তিনি জানেন, দেহটা কিছুই নয়।

৫ই আগষ্ট, সোমবার।

প্রশ্ন এই,—সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভ কর্‌তে গেলে কি সমুদয় নিম্নতর সোপান দিয়ে যেতে হবে, কিংবা একেবারে লাফিয়ে সেই অবস্থায় যাওয়া যেতে পারে? আধুনিক মার্কিণ বালক আজ যে বিষয়টা পচিশ বছরে শিখে ফেল্‌তে পারে,

তার পূর্ব্বপুরুষদের সেই বিষয় শিখ্‌তে একশ বছর লাগ্‌ত। আধুনিক হিন্দু এখন বিশ বছরে সেই অবস্থায় আরোহণ করে, তার পূর্ব্বপুরুষদের যে অবস্থা পেতে আট হাজার বছর লেগেছিল। জড়ের দৃষ্টি থেকে দেখ্‌লে দেখা যায়, গর্ভে ভ্রূণ সেই প্রাথমিক জীবাণুর (amœba) অবস্থা থেকে আরম্ভ করে নানা অবস্থা অতিক্রম করে শেষে মানুষরূপ ধারণ করে। এই হল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা। বেদান্ত আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু অতীত সমগ্র মানবজাতির জীবন যাপন কর্‌তে হবে তা নয়, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন করতে হবে। যিনি প্রথমটী করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি ; যিনি দ্বিতীয়টী কর্‌তে পারেন, তিনি জীবন্মুক্ত।

কাল কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপকমাত্র, আর চিন্তার গতি অভাবনীয়রূপ দ্রুত বলে, আমরা কত দ্রুতগতিতে ভাবী জীবনটা যাপন কর্‌তে পারি, তার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যেতে পারে না। সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন নিজ জীবনে অনুভব কর্‌তে কতদিন লাগ্‌বে, তা নির্দ্দিষ্ট করে বল্‌তে পারা যায় না। কারও কারও এক মুহূর্ত্তে সেই অবস্থা লাভ হতে পারে, কারও বা পঞ্চাশ জন্ম লাগ্‌তে পারে। এটা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করছে। সুতরাং শিষ্যের প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশও বিভিন্নরূপ হওয়া দরকার। জ্বলন্ত আগুন সকলের জন্যই রয়েছে—তাতে জল, এমন কি, বরফের চাঙ্গড় পর্য্যন্ত নিঃশেষ করে দেয়। এক রাশ ছট্‌রা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও লাগ্‌বে। লোককে এক এক বারে এক এক রাশ সত্য দিয়ে দাও, তারা অমনি তার মধ্যে যেটুকু নিজের উপযোগী, তা নিয়ে নেবে। অতীত বহু বহু জন্মের ফলে যার যেমন সংস্কার গঠিত হয়েছে, তাকে তদনুযায়ী উপদেশ দাও। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্ম—এর মধ্যে যে কোন ভাবকে মূল ভিত্তি কর, কিন্তু অন্যান্য ভাবগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি দিয়ে সামঞ্জস্য কর্‌তে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের দ্বারা সামঞ্জস্য কর্‌তে হবে, আর কর্ম্ম যেন সকল পথেরই অঙ্গস্বরূপ হয়। যে যেখানে আছে, তাকে সেইখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও। ধর্ম্মশিক্ষা যেন ভাঙ্গার কাযে না থেকে গড়ার কায নিয়েই রাতদিন থাকে।

মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তার অতীতের কর্ম্মসমষ্টির পরিচায়ক, ওটা যেন

সেই রেখা বা ব্যাসার্দ্ধ, যাকে অনুসরণ করে তাকে চল্‌তেই হবে। আবার সকল ব্যাসার্দ্ধ অবলম্বন করেই কেন্দ্রে যাওয়া যায়। অপরের প্রবৃত্তি কখনও উল্টে দেবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করো না, তাতে গুরু কিংবা শিষ্য উভয়েরই ক্ষতি, হয়ে থাকে। যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছ, তখন তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে, আর শিষ্য যে অবস্থায় অবস্থিত, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই অবস্থায় অবস্থিত হতে হবে। অন্যান্য যোগেও এইরূপ। প্রত্যেক বৃত্তির এমন ভাবে বিকাশ সাধন কর্‌তে হবে যে, যেন সেটা ছাড়া আমাদের অন্য কোন বৃত্তিই নেই—এই হচ্ছে তথাকথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্য—অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে উদারতা অর্জ্জন কর, কিন্তু সেটাকে হারিয়ে নয়। আমরা অনন্তস্বরূপ—আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি করা যেতে পারে না। সুতরাং আমরা সব চেয়ে নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের মত গভীর অথচ সবচেয়ে ঘোর নাস্তিকের মত উদারভাবাপন্ন হতে পারি। এটা কার্য্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে—মনকে কোন বিষয়বিশেষে প্রয়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংযম করা। তা হলেই তুমি তাকে যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। এইরূপে তোমার গভীরতা ও উদারতা দুইই লাভ হবে। জ্ঞানের উপলব্ধি এমন ভাবে কর যে, জ্ঞান ছাড়া যেন আর কিছু নাই, তার পর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ নিয়েও ঐ ভাবে সাধন কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাও, তবেই তোমার ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ উৎপাদন কর্‌তে পার্‌বে। তোমার নিজের মনরূপ হ্রদকে সংযম কর, তা না হলে তুমি অপরের মনরূপ হ্রদের তত্ত্ব কখনও জান্‌তে পার্‌বে না।

তিনিই প্রকৃত আচার্য্য, যিনি তাঁর শিষ্যের প্রবৃত্তি বা রুচি অনুযায়ী নিজের সমস্ত শক্তিটা প্রয়োগ কর্‌তে পারেন। প্রকৃত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। মানুষ যে একজন দায়িত্বপূর্ণ প্রাণী—এ ধারণা ছেড়ে দাও; কেবল পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই দায়িত্বজ্ঞান আছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা মোহমদিরা পান করে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ—তোমাদের তাদের প্রতি অনন্ত ধৈর্য্যসম্পন্ন হতে হবে। তাদের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভাব রেখো না; তারা যে রোগে আক্রান্ত হয়ে জগৎটাকে ভ্রান্তদৃষ্টিতে দেখ্‌ছে, আগে

সেই রোগ নির্ণয় কর ; তার পর তাদের যাতে সেই রোগ আরাম হয়, আর তারা ঠিক ঠিক দেখতে পায়, তদ্বিষয়ে সাহায্য কর। সর্ব্বদা স্মরণ রেখো যে, মুক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে—বাকি সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে—সুতরাং তারা যা কর্‌ছে, তার জন্য তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা যখন ইচ্ছারূপেই থাকে, তখন তা বদ্ধ। জল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গল্‌তে থাকে, তখন স্বাধীন বা উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু নদীরূপ ধারণ কর্‌লেই তীরভূমি দ্বারা বদ্ধ হয় ; তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, তথায় ঐ জল আবার সেই পূর্ব্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমটা অর্থাৎ নদীরূপে আবদ্ধ হওয়াকেই বাইবেল 'মানবের পতন' (Fall of man) ও দ্বিতীয়টীকে পুনরুত্থান (Resurrection) বলে লক্ষ্য করে গেছেন। একটা পরমাণু পর্য্যন্ত, যতক্ষণ না সে মুক্তাবস্থা লাভ কর্‌ছে, স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে না।

কতকগুলি কল্পনা অন্য কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙ্গবার সাহায্য করে থাকে। সমগ্র জগৎটাই কল্পনা, কিন্তু এক প্রকারের কল্পনাসমষ্টি অপর কল্পনাসমষ্টিকে নষ্ট করে দেয়। যে সব কল্পনা বলে, জগতে পাপ, দুঃখ, মৃত্যু রয়েছে, সে সব কল্পনা বড় ভয়ানক ; কিন্তু অপরবিধ কল্পনা, যাতে বলে— 'আমি পবিত্রস্বরূপ, ঈশ্বর আছেন, জগতে দুঃখ কিছু নাই'—সেগুলিই শুভ কল্পনা, আর তাতেই অন্যান্য কল্পনার বন্ধন কাটিয়ে দেয়। সগুণ ঈশ্বরই মানবের সেই সর্ব্বোচ্চ কল্পনা, যাতে আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের পাবগুলি ভেঙ্গে দিতে পারে।

ওঁ তৎ সৎ অর্থাৎ একমাত্র সেই নির্গুণ ব্রহ্মই মায়ার অতীত, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরও নিত্য। যতদিন নায়াগারা প্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধনুও রয়েছে। কিন্তু এদিকে প্রপাতের জলরাশি ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ঐ জলপ্রপাত জগৎপ্রপঞ্চস্বরূপ, রামধনু সগুণ ঈশ্বরস্বরূপ আর এই দুইটীই নিত্য। যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, ততক্ষণ জগদীশ্বর অবশ্যই আছেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি কর্‌ছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি কর্‌ছে—দুইই নিত্য। মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে। নায়াগারা প্রপাত ও রামধনু উভয়ই অনন্ত কালের জন্য পরিণামশীল—এরা মায়ার

মধ্য দিয়ে দৃষ্ট ব্রহ্ম। পারসিক ও খ্রীষ্টিয়ানেরা মায়াকে দুই ভাগে ভাগ করে ভাল অর্দ্ধেকটাকে ঈশ্বর ও মন্দ অর্দ্ধেকটাকে শয়তান নাম দিয়েছেন। বেদান্ত মায়াকে সমষ্টি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং উহার পশ্চাতে ব্রহ্মরূপ এক অখণ্ড বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন।

* * * *

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

প্লেটো।

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম্-এ, বি-এল্)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন—ভাবপদার্থই একমাত্র সৎ পদার্থ; প্রতীয়মান জগৎ আপেক্ষিক সত্য, ইহা সৎ ও অসতের মধ্যস্থানীয়—এই সিদ্ধান্তই প্লেটো দর্শনের বিশেষত্ব। সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি অসম্ভব—একথা প্রচার করিয়া ইলিয়াটিকগণ পরিবর্ত্তনব্যাপারকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। অপর পক্ষে পরিবর্ত্তন-ব্যাপারই সর্ব্বস্ব, হেরাক্লাইটাসের এ সিদ্ধান্তও একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট ছিল। পরিবর্ত্তনের রহস্য উভয় সম্প্রদায়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই; ইহা যে সদসতের অপূর্ব্ব সমাবেশ, সে কথা সম্যক্ অবধারণ করিলে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধের উদয় হইতে পারিত না। আমাদের মনে হয়, প্লেটো এই বিরোধের সামঞ্জস্যসাধনে সফল হইয়াছিলেন।

প্লেটোর মতে প্রত্যক্ষজগৎ ভাবজগতের ছায়ামাত্র; সুতরাং এই প্রত্যক্ষ-জগতে ভাবপদার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। পরন্তু ইহা বিপরীত ধর্ম্মসংযুক্ত, বহুধা বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ হইয়া 'প্রকৃতি'র আবরণে প্রকাশ পায়। ভাবপদার্থ আপন সত্তায় আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পারে, প্রত্যক্ষ পদার্থসমূহ এক মুহূর্ত্তও ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে তিষ্ঠিতে পারে না; একের সত্তা স্বাধীন, অপরের সত্তা সম্পূর্ণই পরাধীন। শুধু তাহাই নয়, ভাবপদার্থ অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয়; প্রত্যক্ষ পদার্থমাত্রই পরিবর্ত্তনশীল; একটী সৎ পদার্থ, অপরটী পরিবর্ত্তন-

পরম্পরামাত্র; একটী আপন সত্তা অক্ষুণ্নভাবে বজায় রাখিতে সক্ষম; সৎ হইতে অসতে, অসৎ হইতে সতে পরিবর্তন ব্যতিরেকে অপরের অস্তিত্বই অসম্ভব।

ভাবপদার্থের সহিত প্রত্যক্ষজগতের যদি এইরূপ বিপরীত সম্বন্ধ হয়, তবে প্রত্যক্ষজগৎকে কিরূপে ভাবপদার্থের বিকাশ বলা যায়? সৎ হইতে অসতের উৎপত্তিরূপ অঘটন-ঘটন কিরূপে সম্ভব হয়? বৈদান্তিক বলিতে পারেন, ইহাই মায়া—"অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া"। দেখা যাউক, এবিষয়ে প্লেটো কি বলিয়া গিয়াছেন:—এই যে অঘটন-ঘটন কার্য্য, ইহার কারণ ভাবপদার্থে বর্ত্তমান,—এ কথা বলিলে ভাবপদার্থকে পরিবর্ত্তনব্যাপারের কারণ বলিতে হয়; কিন্তু ভাবপদার্থ অপরিবর্ত্তনীয়, ইহা হইতে তদ্বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপে উৎপন্ন হইবে? ভাবপদার্থ মূলতঃ এক হইলেও বহু ভাবপদার্থ স্বীকার করা প্লেটোর পক্ষে অনিবার্য্য হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তবে কি বহু ভাবপদার্থের সমাবেশে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে? এ কথাও বলা যায় না; কারণ, তাহাদের সমাবেশ স্বীকার করিলেও তাহাদের স্বরূপহানি অস্বীকার্য্য। ভাবপদার্থকে এখন একরূপ, তখন অন্যরূপ মনে করিতে পার না; পরন্তু প্রত্যক্ষ পদার্থ এই মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র, পর মুহূর্ত্তে বৃহৎ, এখন কঠিন, কিছুক্ষণ পরে তরলরূপে প্রতিভাত হয়। ভাবপদার্থকে এই অঘটন-ঘটন-কার্য্যের কারণ বলিয়া যখন নির্দ্দেশ করা চলিল না, তখন এমন একটা কিছু (something) স্বীকার করিতে হইবে, যেটাকে পরিবর্ত্তনব্যাপারের হেতু বলা যাইতে পারে। তাই এই 'একটা কিছু' স্বীকার করা প্লেটোর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই 'কিছু' বলিতে কি বুঝায়, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; তবে এটা সুনিশ্চিত যে, ইহা ভাবপদার্থের বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত। কারণ, প্রত্যক্ষজগৎ সদসৎ, ভাবপদার্থ সৎ; সুতরাং এই 'একটা কিছু' তাহার বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত না হইলে, যেজন্য সেই 'কিছু'র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহাকে কি আখ্যা দিব, খুঁজিয়া পাই না; 'জড়' বলিলে প্লেটো-দর্শনের মর্য্যাদা-হানি করা হয়; 'প্রকৃতি' বলিলে সাংখ্য-দর্শনোক্ত প্রকৃতির ধারণা অগোচরে মনের মধ্যে উদয় হয়। তথাপি আমরা ইহাকে 'প্রকৃতি' আখ্যা দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না।

প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের কারণ, সকল বিচ্ছেদের মূল। ইহা অনাদি, সীমাহীন (unlimited)। মূলতঃ ইহা অব্যক্ত, ইহার রূপ নাই, ইহা অদৃশ্য। ইহাকে বিশেষ কোন কিছুর অন্তর্গত করা অযৌক্তিক; কারণ, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকারের ভেদ প্রকৃতির অন্তর্গত। ইহাকে আশ্রয় করিয়া শুধু পরিবর্ত্তনপরম্পরা অনন্তকাল ধরিয়া প্রকাশ পাইতেছে, পরন্তু কোন দিন স্থায়ী ভাব লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ফিলেবাস (Philebus) পুস্তকে প্রকৃতি সম্বন্ধে এবংবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। টিমীয়াস (Timæus) পুস্তকেও উক্ত প্রকারের উক্তি দেখা যায়। এই গ্রন্থে প্লেটো বিশ্বজগৎকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, প্রথম শ্রেণীতে ভাবপদার্থের, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাবপদার্থের প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষগোচর পদার্থের, ও তৃতীয় শ্রেণীতে প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থের আধার 'প্রকৃতি'র স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তিনি এই পুস্তকে 'প্রকৃতি'কেও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'প্রকৃতি' পরিবর্ত্তনপরম্পরার একটী অবস্থাবিশেষ হইলে, পরিবর্ত্তনব্যাপারের কারণ হইতে পারিত না। পরন্তু পরিবর্ত্তনপরম্পরা ইহাতেই উদয় হইতেছে এবং ইহাতেই লয় পাইতেছে; সুতরাং এই 'প্রকৃতি' প্রত্যক্ষগোচর পদার্থের মত পরিবর্ত্তনশীল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—যদি প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল না হইয়াও সকল পরিবর্ত্তনের কারণ হইতে পারে, তবে ভাবপদার্থ ছাড়া এই 'প্রকৃতি' স্বীকার করার প্রয়োজন কি? প্লেটো এ প্রশ্নের কি উত্তর দিতেন, বলা সুকঠিন; কারণ, যে সকল দার্শনিক বা দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহাসিক তাঁহার (প্লেটোর) মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না, এবং প্লেটোর মূল গ্রন্থে এ ক্ষুদ্র লেখকের অধিকার নাই। তবে প্লেটো যে 'প্রকৃতি'কে পরিবর্ত্তন-ব্যাপারের কারণস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। এখন 'কারণ' বলিতে নিমিত্তকারণ বুঝিব, না উপাদানকারণ বুঝিব?

প্রত্যক্ষজগৎ লইয়াই পরিবর্ত্তন। প্রত্যক্ষজগৎ সদসৎ, তাই প্লেটোর পক্ষে ভাবপদার্থ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়াছিল,—এই দুটী কথা মনে রাখিয়া বিচারে অগ্রসর হওয়া যাউক। প্রথমতঃ যাঁহারা

প্রকৃতিকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি মতামত দেখা যাউক :—এই সম্প্রদায় বলেন, "প্লেটো প্রকৃতি বলিতে প্রত্যক্ষজগতের বীজস্বরূপ অসংখ্য জড় পদার্থকেই বুঝিয়াছিলেন! প্রত্যক্ষ-জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে অনিয়মের রাজত্বে অসংখ্যরূপগুণসম্পন্ন অসংখ্য পদার্থ নিয়তগতিশীল অবস্থায় বীজাকারে বর্ত্তমান ছিল"—এবংবিধ উক্তি প্লেটোর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই সম্প্রদায় বলিতে চান, এই বীজাকারে বর্ত্তমান অসংখ্য পদার্থের সমষ্টিকেই প্লেটো 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অযৌক্তিক। কেন না, প্লেটোর দর্শনে তাহা হইলে স্ববিরোধ-দোষের উদয় হয়। কারণ, প্লেটো বারবার প্রকৃতিকে অরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেবলমাত্র ভাবপদার্থেই শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যথন প্লেটোর গ্রন্থমধ্যে বিপরীত মতবাদ দেখা যায়, তখন একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটী গ্রহণ করায় গোড়ায় গলদ রহিয়া যায়। (It is begging the question.) কিন্তু প্লেটোর গ্রন্থ কূটতর্কবাদে যেমন পরিপূর্ণ, রূপক ভাষারও তেমনি উহাতে অভাব নাই; সুতরাং কোন্‌টী রূপক, কোন্‌টী খাঁটি কথা, নির্দ্দেশ করা দুরূহ হইলেও, সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে ও সেই কারণেই কোন কোন উক্তিকে রূপক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই নিয়মানুসারে আমরা পূর্ব্বোক্ত মতবাদ অযৌক্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতিকে জগতের উপাদানকারণরূপে নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক; তবে কি ইহাকে নিমিত্তকারণ বলিব? এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। প্লেটো টিমিয়াস গ্রন্থে ইহাকে দেশ (space) বলিয়া উল্লেখ করিয়া আমাদের সমস্যা অনেকটা পূরণ করিয়াছেন। সীমাবদ্ধ দেশই "রূপে" প্রতিভাত হয়। প্রত্যক্ষ পদার্থের রূপই প্রথমে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। বিশেষ বিশেষ পদার্থের পার্থক্য প্রধানতঃ রূপেরই পার্থক্য। আর পরিবর্ত্তনব্যাপারের মধ্যে রূপেরই পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং পদার্থের 'রূপ'ই যে তাহার অপর বিশেষ গুণের মধ্যে সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, তাহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই বুঝি, সেই রূপের কারণস্বরূপ 'দেশ' শব্দের দ্বারা সকল পরিবর্ত্তনের মূলকেই প্লেটো লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু দেশের অস্তিত্ব ও ভাবপদার্থের অস্তিত্ব একরূপ নয়। দেশ সীমাহীন (unlimited), দেশ অরূপ (formless), দেশ পরিবর্ত্তনব্যাপারের কারণ বা আধার হইয়াও স্বয়ং অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া ভাবপদার্থের সহিত সত্তা হিসাবে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। সাদৃশ্য ত নাইই, পক্ষান্তরে ইহা সম্পূর্ণ বিসদৃশ। ভাবপদার্থই একমাত্র সৎ পদার্থ, ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে সৎপদার্থ নাই; সুতরাং দেশকে সৎ পদার্থ বলিতে পার না। ইহাকে অসৎ পদার্থ, অর্থাৎ নাস্তি বলিতেও পার না, কারণ, ইহাকে ছাড়িয়া দিলে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব লোপ করিতে হয়। ইহাকে সদসৎ ভিন্ন অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যায় কি না, জানি না। প্লেটোর গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ বলেন,—প্লেটো ইহাকে 'অসৎ' পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, এরিষ্টট্‌ল্‌ও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্লেটোর মূল সিদ্ধান্তের ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। প্লেটো বলেন,—যাহা সৎ তাহাই জ্ঞানগম্য, যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহা ইন্দ্রিয়গম্য। প্রত্যক্ষ পদার্থ সদসৎ; ইহার সত্তা একেবারেই নাই—এ কথা বলা যায় না, ইহার সত্তা আপেক্ষিকমাত্র। ইন্দ্রিয়জ্ঞানও একেবারে মিথ্যা নয়; প্রতিকৃতির সহিত আদর্শের যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের সহিত ভাব-পদার্থের, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত সত্যজ্ঞানের সেই সম্বন্ধ। যাহা সৎ নহে, যাহার কোন অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার জ্ঞানোদয় (সে আপেক্ষিক জ্ঞানই হউক, বা আর কিছু হউক) হইবে কিরূপে? প্রকৃতি যদি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎই হইবে, তবে সেবিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান হয় কিরূপে?

এই স্থলে প্লেটো-দর্শনের সহিত সাংখ্য ও বেদান্তের তুলনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাংখ্যের পুরুষ জ্ঞ-মাত্র, প্রকৃতি না হইলে জগৎ রচনা হয় না। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পন্থী বৈদান্তিককেও জগদ্‌ব্যাখ্যায় মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি মূলতঃ অব্যক্ত হইয়া সকল ব্যক্তাবস্থার অর্থাৎ জগতের কারণ। মায়ার দুই মূর্ত্তি;—দেশ ও কাল। দেশ কাল লইয়া জাগতিক ব্যাপার। 'ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে সৎ নাই' প্রচার করিয়াও জগদ্‌ব্যাখ্যায় প্লেটোর পক্ষে ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে অন্য 'কিছু'র আশ্রয় লইতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য না হওয়াই উচিত।

এই 'কিছু'কে সাংখ্যের প্রকৃতি বলিব, না বেদান্তের মায়া বলিব, জানি না। 'জড়' আখ্যা দিলে প্লেটো-দর্শনের মর্য্যাদাহানি হয়, তাই আমরা ইহাকে 'প্রকৃতি' আখ্যা দিয়াছি। পারিভাষিক শব্দের অভাবে 'প্রকৃতি' আখ্যা দিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু সাংখ্যের 'প্রকৃতি' বলিতে যাহা বুঝায়, প্লেটোও তাহাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বলা অযৌক্তিক। সাংখ্যমতে প্রকৃতি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যভাবই ইহার অব্যক্তাবস্থা; স্থতরাং সাংখ্যবাদী প্রকৃতির অনাদি সত্তা স্বীকার করিয়া ইহাকে শক্তিত্রয়ের আধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু প্লেটো 'প্রকৃতি'র সত্তা সম্পূর্ণই অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে অনাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্য অর্থ আছে। প্রকৃতির পূর্ব্বে কালের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা যায় না, তাই ইহাকে অনাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। অপর পক্ষে, প্লেটো একমাত্র ভাবপদার্থে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে প্রকৃতিকে চেতন বা শক্তিশালিনী বলা অসঙ্গত। উপনিষদে উক্ত আছে "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"। প্রকৃতিতত্ত্বের দ্বারা জগদ্ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না। প্রকৃতি-তত্ত্বের মূলে মায়াতত্ত্ব রহিয়াছে। সেই মায়াতত্ত্ব দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ঐন্দ্রজালিকের সহিত ইন্দ্রজালের যে সম্বন্ধ, মায়ার সহিত মায়াবী পরমেশ্বরেরও সেই সম্বন্ধ। তাহা হইলে মায়াকে মায়াবী হইতে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করা চলে না। ইহাকে মায়াবীর শক্তি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় কি না, জানি না। আমাদের মনে হয়, প্লেটো 'প্রকৃতি' বলিতে সাংখ্যবাদীর মত ঈশ্বরনিরপেক্ষ কোন স্বাধীন সত্তা বুঝিতেন না; কারণ, তাঁহার মতে ঈশ্বর বা মূল ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে সৎ পদার্থ নাই। কিন্তু তিনি ইহাকে ঐশী শক্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি ইহাকে 'দেশ' আখ্যা দিয়া মায়ার রূপের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সে 'দেশ' বলিতে কি বুঝায়, বিচার করিয়া দেখিলে, শেষে 'মায়া' হইতে ইহাকে অভিন্নরূপে মনে করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। মায়ারহস্য প্লেটো বুঝিয়াছিলেন কি না, জানি না।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকায় স্বামিজী।

(Inspired Talks গ্রন্থের ভূমিকা হইতে অনূদিত।)

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এক তরুণবয়স্ক হিন্দু সন্ন্যাসী ভ্যাঙ্কুভারে পদার্পণ করিলেন। তিনি চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সর্ব্বজনপরিচিত ধর্ম্মসঙ্ঘের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে নহে। কেহ তাঁহাকে চিনিত না, এবং তাঁহার নিজের সাংসারিক জ্ঞানও অল্প ছিল; তথাপি মান্দ্রাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাঁহাকেই এই মহৎ কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়াছিল; কারণ, তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা, তিনিই ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের যোগ্যতর প্রতিনিধি হইতে পারিবেন, এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল। এই অর্থ এবং দুই এক জন দেশীয় নরপতি যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহাই সম্বল করিয়া তরুণ সন্ন্যাসী—তদানীন্তন অপরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ—এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এরূপ একটী মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করিতে তাঁহাকে বিপুল সাহস অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ভারতের পুণ্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রা করা হিন্দুর নিকট কত গুরুতর ব্যাপার, তাহা পাশ্চাত্যবাসী আমাদের ধারণাতীত। সন্ন্যাসীর পক্ষে একথা বিশেষ করিয়া খাটে, কারণ, জীবনের ব্যবহারিক জড়প্রধান অংশের সহিত তাঁহার সমগ্র শিক্ষাদীক্ষার কোনই সম্পর্ক নাই। টাকা কড়ি লইয়া নাড়াচাড়া করার, অথবা নিজের পায়ে ভিন্ন অপর কোন উপায়ে ভ্রমণ করার অভ্যাস না থাকায়, স্বামিজী এই সুদীর্ঘ পথের প্রত্যেক অংশে প্রতারিত হন এবং লোকে তাঁহার অর্থ অপহরণ করে। অবশেষে যখন তিনি চিকাগো পৌঁছিলেন, তখন প্রায় কপর্দ্দক-শূন্য। তিনি সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র আনেন নাই, এবং এই বিরাট্ নগরীতে কাহাকেও চিনিতেন না।* এইরূপে স্বদেশ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ

* পরে জনৈক মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ চিকাগো-নিবাসী এক ভদ্রলোককে স্বামিজীর সম্বন্ধে লিখেন, এবং ইনি এই হিন্দু যুবককে নিজ পরিবারে স্থান দান করেন। এইরূপে যে

ব্যবধানে অপরিচিতগণের মধ্যে একাকী বাস করা একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিরও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে; কিন্তু স্বামিজী এ সমস্ত ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভগবানের কৃপা তাঁহাকে সতত রক্ষা করিবেই করিবে।

প্রায় এক পক্ষকাল তিনি তাঁহার হোটেলের কর্ত্তা ও অন্যান্য লোকের অত্যধিক দাবি পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে সামান্য অর্থ ছিল, তাহা এখন এত স্বল্পায়তন হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি বেশ বুঝিলেন যে, যদি তিনি রাস্তায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ এমন একটী স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে, যেখানে থাকিবার খরচ অপেক্ষাকৃত কম হইবে। যে মহৎ কার্য্যভার তিনি এরূপ সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইল। মুহূর্ত্তের জন্য নৈরাশ্য ও সন্দেহের একটা ঢেউ তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এবং তিনি এই ভাবিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে লাগিলেন, কেন তিনি নির্ব্বোধের মত সেই সকল মাথা-গরম মান্দ্রাজী ইস্কুলের ছোঁড়াদের কথা শুনিয়াছিলেন। তথাপি উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে টাকার জন্য তার করিতে এবং প্রয়োজন হইলে, ভারতে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বোষ্টন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু যাঁহার উপর তিনি এত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। রেলগাড়ীতে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, এবং তিনি তাঁহার আগ্রহ উদ্বোধিত করিতে এতদূর সক্ষম হইলেন যে, মহিলা তাঁহাকে নিজ আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এইখানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। ইনি একদিন স্বামিজীর সহিত নির্জ্জনে চারি ঘণ্টা কাল একত্র

বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, তাহা স্বামিজী যতদিন বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। পরিবারভুক্ত সকলেই স্বামিজীকে অতিশয় ভালবাসিতে, তাঁহার অপূর্ব্ব সদ্‌গুণরাজির গুণগ্রাহী হইতে এবং তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও সরলতার সমাদর করিতে শিখিয়াছিলেন। এই সকল সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায়ই প্রীতি ও আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন।

থাকিবার পর তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন চিকাগো-ধর্ম্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গমন করিতেছেন না ?"

স্বামিজী তাঁহার অসুবিধাগুলি বুঝাইয়া দিলেন ; বলিলেন যে,—তাঁহার অর্থও নাই এবং উক্ত মহাসভাসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নামে পরিচয়পত্রও নাই। অধ্যাপক অমনি উত্তর দিলেন, "শ্রীযুত বনি আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাঁহার নামে এক পত্র দিব।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উহা লিখিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্যে এই কয়েকটী কথাও লিখিয়া দিলেন, "দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু—আমাদের সকল পণ্ডিতগুলিকে একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও বেশী পণ্ডিত।" এই পত্রখানি এবং অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি টিকিট লইয়া স্বামিজী চিকাগো প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নির্ব্বিবাদে প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

অবশেষে মহাসভা খুলিবার দিন সমাগত হইল, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের শ্রেণীমধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভামঞ্চে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, কিন্তু সেই বিরাট্ শ্রোতৃসঙ্ঘের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র এক আকস্মিক উদ্বেগ তাঁহাকে অভিভূত করিল। অপর সকলে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন ; তাঁহার কিছুই ছিল না। সেই ছয় সাত সহস্র নরনারীর বিপুল সঙ্ঘকে তিনি বলিবেন কি ? সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া তিনি তাঁহার পরিচয়ের পালা আসিলেই ক্রমাগত উহা পিছাইয়া দিতে লাগিলেন, প্রতিবারই সভাপতি মহাশয়ের কাণে কাণে বলিতে লাগিলেন, "আর কাহাকেও অগ্রে বলিতে দিন্।" অপরাহ্ণেও এইরূপ হইল। অবশেষে প্রায় পাঁচটার সময় ডাক্তার ব্যারোজ মহোদয় উঠিয়া তাঁহাকেই পরবর্ত্তী বক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এই ঘোষণা বিবেকানন্দের স্নায়ুমণ্ডলীর স্থিরতা সম্পাদন করিয়া তাঁহার সাহস উদ্বোধিত করিয়া দিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্রোপযোগী কার্য্য করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বক্তৃতা দিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, বিশেষ বহু শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়া, তাঁহার জীবনে এই প্রথম, কিন্তু ফল হইল তাড়িত শক্তির ন্যায়। সেই সাগরোপম সহস্র সহস্র উৎসুক নরনারীর

মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার শক্তি ও বাগ্মিতা পূর্ণভাবে জাগরিত হইয়া উঠিল, এবং তিনি তাঁহার মধুনিঃস্যন্দী কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গকে "আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সিদ্ধি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার করতলগত হইল, এবং যতদিন যাবৎ মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার আদর একদিনের জন্যও কমে নাই। সকলেই বরাবর তাঁহার কথা অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহারই বক্তৃতা শুনিবার জন্য গরমের দিনেও দীর্ঘ অধিবেশনের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন।

ইহাই তাঁহার যুক্তরাজ্যে কার্য্যের প্রারম্ভ। মহাসভার কার্য্য শেষ হইলে স্বামিজী নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য একটী বক্তৃতা-কোম্পানীর (Lecture Bureau) অনুরোধে তাহাদের পক্ষ হইতে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম অংশে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে স্বীকৃত হন। বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও তিনি শীঘ্রই এই অপ্রীতিকর কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তিনি এখানে ধর্ম্মাচার্য্যরূপে আসিয়াছেন, ঐহিক বিষয়ে সুবক্তা হিসাবে নহে। সুতরাং এটী অতি লাভজনক পন্থা হইলেও তিনি শীঘ্রই উহা পরিত্যাগ করিলেন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য নিউইয়র্কে আগমন করিলেন। চিকাগোয় অবস্থানকালে যাঁহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, প্রথমে তাঁহাদেরই সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা প্রধানতঃ ধনাঢ্য শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদেরই বৈঠকখানায় বক্তৃতা করিতেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি লোকের মনে যে অনুরাগ উৎপাদন করিয়াছেন, উহা তিনি যাহা চাহেন, তাহা নহে; উহা অত্যন্ত ভাসা ভাসা জিনিস, অতিমাত্রায় আমোদপ্রিয়তা মাত্র। এইজন্য তিনি নিজের একটী স্থান নির্দ্ধারিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, যেখানে ধনী নির্ধন— সকল অনুরাগী সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে আসিতে পারিবেন।

ব্রুকলীন নীতিসভার সমক্ষে একটী বক্তৃতায় তাঁহার এইরূপে নিজের ভাবে শিক্ষা দিবার পথ সুগম করিয়া দিল। এই সভার অধ্যক্ষ ডাক্তার লিউইস্ জি, জেন্স্ এই হিন্দু যুবা সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার ক্ষমতায় ও পশ্চিম-গোলার্দ্ধবাসী আমাদের নিকট তাঁহার উপদেশবাণী দ্বারা

এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে উক্ত সভার সমক্ষে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষদিন। নীতিসভার অধিবেশন-গৃহ "পাউচ্ প্রাসাদ" লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"হিন্দুধর্ম্ম"। স্বামিজী যখন লম্বা আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিহিত হইয়া তাঁহার মাতৃভূমির প্রাচীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন লোকের আগ্রহ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, বক্তৃতান্তে ব্রুকলীনে যাহাতে নিয়মিত ক্লাস হয়, তজ্জন্য লোকে বিশেষ জেদ করিতে লাগিল। স্বামিজী অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে সম্মতি দিলেন, এবং পাউচ্ প্রাসাদে ও অন্যত্র কতকগুলি নিয়মিত ক্লাসের অধিবেশন ও সর্ব্বসাধারণসমক্ষে কতিপয় বক্তৃতা হইল।

ব্রুকলীনে যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক-জন, তিনি নিউইয়র্কের যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় এই সময়ে যাইতে আরম্ভ করিলেন। একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীর তেতালার সামান্য একটা ঘরে তিনি থাকিতেন, এবং ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া যখন তত্রত্য চৌকীখানি ও চেয়ারগুলিতে আর স্থান-সঙ্কুলান হইল না, তখন ছাত্রগণ কতক দেরাজের উপর, কতক কোণের মার্ব্বেল পাথরের হাত মুখ ধুইবার উঁচু জায়গায়, আর কতক বা মেজেতেই বসিতে লাগিলেন। স্বামিজী নিজেও তাঁহার স্বদেশের প্রথামত মেজেতেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আগ্রহবান্ শিষ্যগণকে বেদান্তের মহাসত্যগুলি শিক্ষা দিতেন।

এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, স্বীয় আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ধর্ম্মের সত্যতা ও মৌলিক একত্ব-প্রতিপাদক উপদেশবাণী পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করা রূপ নিজ অভীপ্সিত মহাকার্য্যে তিনি কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ক্লাসটী এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল যে, আর উপরের ছোট ঘরটীতে স্থান হয় না, সুতরাং নীচেকার বড় বৈঠকখানাদ্বয় ভাড়া লওয়া হইল। এইখানেই স্বামিজী সেই ঋতুটীর শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিনা বেতনে প্রদত্ত হইত, প্রয়োজনীয় ব্যয়, স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিতেন, তাহাতেই চালাইবার চেষ্টা করা হইত। কিন্তু সংগৃহীত অর্থ ঘরভাড়া ও স্বামিজীর আহারাদির ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় অর্থাভাবে ক্লাসটী উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল; অমনি স্বামিজী ঘোষণা করিলেন যে, ঐহিক বিষয়ে

তিনি সর্ব্বসাধারণসমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন। ইহাদের জন্য পারিশ্রমিক লইতে তাঁহার বাধা ছিল না; সেই অর্থে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্লাসটী চালাইতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুদের চক্ষে শুধু বিনামূল্যে শিক্ষা দিলেই ধর্ম্মব্যাখ্যাতার কর্ত্তব্য শেষ হইল না, সম্ভবপর হইলে, তাঁহাকে এই কার্য্যের ব্যয়ভারও বহন করিতে হইবে। পূর্ব্বকালে ভারতে এমনও নিয়ম ছিল যে, উপদেষ্টা, শিষ্যগণের আহার ও বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করিবেন।

ইতিমধ্যে কতিপয় ছাত্র স্বামিজীর উপদেশে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যাহাতে তাঁহারা পরবর্ত্তী গ্রীষ্ম ঋতুতেও ঐ শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু তিনি একটী ঋতুর কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পুনরায় গ্রীষ্মের সময় ঐরূপ পরিশ্রম করা সম্বন্ধে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। তার পর অনেক ছাত্র বৎসরের ঐ সময়ে সহরে থাকিবেন না। কিন্তু প্রশ্নটীর আপনা আপনিই মীমাংসা হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেণ্টলরেন্স্ নদীবক্ষস্থ বৃহত্তম দ্বীপ থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে (Thousand Island Park) একখানি ছোট বাড়ী ছিল; তিনি উহা স্বামিজীর এবং আমাদের মধ্যে যতজনের উহাতে স্থান হয়, ততজনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যবস্থা স্বামিজীর ভাল লাগিল; তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর মেইন ক্যাম্প (Maine Camp) নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাদের নিকট তথায় আসিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

যে ছাত্রীটী বাড়ীখানির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মিস্ ডি—। তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষে একটী পৃথক্ কক্ষ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, যেখানে কেবল পবিত্রভাবই বিরাজ করিবে, এবং তাঁহার গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি-অর্ঘ্য হিসাবে আসল বাড়ীখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটী নূতন পার্শ্ব নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বাড়ীটী এক উচ্চ ভূমির উপর অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য নদীটীর অনেকখানি এবং উহার বহুদূরবিস্তৃত সহস্র দ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্লেটন অল্প অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত ক্যানাডা উপকূল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়ীখানি একটী পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টীর উত্তর ও

পশ্চিম দিক্ হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর ও উহারই যে ক্ষুদ্র অংশটী ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে ; শেষোক্ত জলভাগটী একটী ক্ষুদ্র হ্রদের ন্যায় বাড়ীখানির পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়ীখানি সত্য সত্যই (বাইবেলের ভাষায়) "একটী পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত", আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়া ছিল। নবনির্ম্মিত পার্শ্বটী পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন একটী বিরাট্ বাতিঘরের মত দেখাইত। বাড়ীটীর তিন দিকে জানালা ছিল এবং উহা পিছনের দিকে ত্রিতল ও সাম্‌নের দিকে দ্বিতল ছিল। নীচের ঘরটীতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন ; তাহার উপরকার ঘরটীতে বাড়ীখানির যেটী প্রধান অংশ, তাহা হইতে অনেকগুলি দ্বার দিয়া যাওয়া যাইত, এবং প্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, এবং তথায় স্বামিজী অনেকঘণ্টা ধরিয়া আমাদিগকে সুপরিচিত বন্ধুর মত উপদেশ দিতেন। এই ঘরটীর উপরের ঘরটী শুধু স্বামিজীরই ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে তজ্জন্য মিস ডি— উহার বাহিরের দিকে একটী পৃথক্ সিঁড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে দোতলার বারান্দায় আসিবার একটী দরজাও ছিল।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

সফল মাতৃস্নেহ।

(গল্প)

(১)

বৃদ্ধ দাশু বাবু তরুণী ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগো, তেলী কি এখনও ঘরে আসে নি ?" বলিতে বলিতে দাশু বাবু বাড়ীর উঠানের দিকে আসিতেছেন। রান্নাঘর হইতে উত্তর হইল, "দাঁড়াও, এই ত একঘণ্টা হ'ল স্যিয্যি ডুবেছেন ; তোমার উপযুক্ত সন্তান এর মধ্যেই কি ঘরে ফির্‌বেন ? তুমি ত চল্লে বামুনদের বৈঠকখানায় দাবা টিপ্‌তে, যত জ্বালা যেন আমারই ; মরণ নেই ত ! তাও যদি নিজের একটা পেটে ধর্‌তুম !—ঝি, বাবুর ঘরে শেকলটা তুলে দে ত।"

মাতৃহীন বালক ত্রিলোক সেদিন সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরিল না। বিমাতা গালি দিয়া গাত্রজ্বালা মিটাইতে লাগিল,—সে কেবলই কটূক্তি, তাহাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া, দাসী দাবাখেলার বৈঠকে খবর দিল, ছেলে ঘরে আসে নাই। কুসংবাদে বৈঠকে নানা রকম অনুমান ও বাদানুবাদ চলিল; কেহ কেহ অনুসন্ধানে বাহির হইল; ক্রমশঃ খবর গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ দাশরথি অসমর্থ; তিনি দু একজন মুঁরুব্বির আশ্বাসবাক্যে বাড়ী ফিরিলেন। তিনি যে এই শেষ বয়সে স্ত্রীরত্নকেই সম্বল করিয়াছিলেন,—ত্রিলোককে ত সম্বল করেন নাই!

সংসারে ত্রিলোকের আর কেহ ছিল না। দুইটী বিবাহিতা সহোদরার মধ্যে একটী শ্বশুরালয়ে দুই বৎসর হইল গতাসু, আর একটী বিমাতার লাঞ্ছনায় দুঃখে ও অভিমানে জন্মের মত পিতৃগৃহ হইতে বিদায় লইয়াছে। ত্রিলোকের গৃহত্যাগে অনেকেই তেমন বিস্মিত হন নাই, কিন্তু মর্ম্মাহত হইয়াছেন প্রায় সকলেই! হায় জীবন্মৃত সমাজ!

প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল, দশবর্ষবয়স্ক পুত্র লইয়া দাশরথি পশ্চিম হইতে ফিরিয়াছেন। অস্তমিতপ্রায় যৌবনে তিনি একটী কন্যা ও প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া ষ্টেসন মাষ্টারি চাকরির অনুরোধে পশ্চিমে গিয়াছিলেন। ত্রিলোকনাথের জন্ম সেই চাকরিস্থানে, সেইখানেই জননীর স্নেহনীড়ে তাহার শৈশব কাটিয়াছে। হঠাৎ মাতৃবিয়োগে তাহার মধুর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল; সে স্বপ্নাবেশ কাটিতে না কাটিতে, নিষ্ঠুর সংসারচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে মার অঞ্চলনিধি মা-হারা ত্রিলোকনাথ বাঙ্গালার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে সহসা নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার হৃদয়ের শোক-শেল হৃদয়েই লুকাইয়া রহিল, কেবল একটা অগাধ অপরিমেয় স্নেহাভাস জীবনের সকল অন্তরালকে পূর্ণ করিয়া যেন তাহার দিকেই চাহিয়া রহিল। গ্রামে স্কুল ছিল, ত্রিলোককে সেখানে ভর্ত্তি করা হইল।

উদাসভাবাপন্ন জনমাত্রে উপলক্ষিত একটা অস্পষ্ট জীবনপটের উপর বিদ্যাশিক্ষার কৌতূহল ও সঙ্গীদের সহিত ক্রীড়াকৌতুকের নানা চিত্রাঙ্কন পড়িতে পড়িতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এমন সময় অকস্মাৎ বিমাতার উদয় হইল; একটা অপ্রত্যাশিত প্রবল সংঘর্ষে, লেখাপড়া খেলা সমস্তই ত্রিলোকের মনের সঙ্গে সংযোগ হারাইল, তাহার আর কোন অবলম্বনই রহিল

না; বাহিরের অনবচ্ছিন্ন তাড়নায় তাহার চিত্ত নিভৃতের অস্ফুট ছায়াময় স্নেহাশ্রয়ের দিকে বারংবার ধাবিত হইল; কিন্তু হায়, সে দিকে যে কোন প্রবেশপথ নাই!

ত্রিলোক নিভৃতে বসিয়া চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িত; ভাবিত,—"কোথায় যাই, কোথায় জুড়াই? কেন পশ্চিম থেকে আমাকে এখানে আস্‌তে হ'ল?" সে যখন বিদ্যালয়ে ভূগোল পড়িত, নানা দেশের কথায় তাঁহার প্রাণটা যেন চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইত। সে আকর্ষণ, সে অনুরাগ ক্রমশঃ তাহার মনকে বিরাট্‌ বিশ্বসত্তায় বাঁধিয়া ফেলিতে লাগিল। সে প্রতিদিন বারবার গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, মাঠে দাঁড়াইয়া, কল্পনাকে বিশ্বের চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিত। আর কারাসদৃশ পিতৃগৃহ ও গ্রামটীর আবেষ্টনকে বারংবার পরাজিত করিয়া, আপনাকে মুক্ত পাখীর মত বিশ্ববিহারী মনে করিয়া হৃদয়ে কত সুখ পাইত! ভূগোল-সহায়ে তাহার কল্পনা কি প্রিয় রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে! অল্পে অল্পে এই রহস্য তাহার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল, সে সমস্ত লাঞ্ছনা ও উপেক্ষার মধ্যে বিরাট্‌ বিশ্বের স্মরণ এক মুহূর্ত্তও ত্যাগ করিত না। এই স্মরণ-মননের ফলে একদিন সন্ধ্যার সময় সে অনুভব করিল যে, তাহার বুকটা যেন কি এক অজ্ঞাত কৌশলে জগতের অনন্ত প্রসারের সঙ্গে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে; দেহ ছাড়া একটা বিশ্বব্যাপী বুকের সন্ধান সেইদিন সে পাইল, আর হারাইল না; ভাবিল,—"ছোট বুকে এত দুঃখ কুলাইল না বলিয়াই বুঝি উহা অদৃশ্য হইয়া জগতে ছড়াইয়া পড়িল!"

কি আশ্চর্য্য! বালকের মনের কোনখানে যেন সমগ্র বিশ্বটা সব সময়ই লাগিয়া রহিয়াছে। যেন প্রাণটা এই বিরাট্‌কে রাতদিনই ছুঁইয়া রহিয়াছে! দুঃখ-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে, কি একটা অদৃশ্য আশ্রয় যেন ত্রিলোকের পাদস্পর্শ করিয়াছে। এখন দুঃখে ভাসিলেও আর সে অধীর হইয়া পড়িতেছে না,—চিত্ত আর তেমন চঞ্চল হয় না; দুঃখ যেন তাহার কতকটা গা-সহা হইয়া গেল। এইরূপে কিছুদিন চলিল।

কিন্তু পিতার ঔদাসীন্যে ও বিমাতার নির্য্যাতনে একদিন তাহাকে বাড়ী ছাড়িতে হইল। শুধুই কি তাই? দিবারাত্র তাহার কল্পনা যে একটা বৃহৎ

জগৎ রচনা করিতেছে, আর সেখান হইতে যে একটা অব্যক্ত আহ্বান সে শুনিতেছে, ইহাতে কি কোনও প্রেরণা নাই! তাহাকে ত নিশ্চিত হইতে অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিতেও হয় নাই? সে যেমন করিয়াই হউক, সর্ব্বদাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে যে একটা ভাষাহীন আত্মীয়তার আশ্বাস পাইয়াছে!

(২)

বেলা দুইটার পর মুর্গীহাটার এক খাবারের দোকানে একটী ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন,—কোনও আফসের কেরাণীই হইবেন সন্দেহ নাই। মোদকপ্রবর তাঁহাকে এমন সময় জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুগো, একটা লোক দিতে পারি, লেবেন কি? ঝাঁটপাট, তামুকসাজা, ছেলে নেওয়ায় মজবুত হবে।" কলিকাতাবাসী বাবুটীর চাকর রাখিবার সংস্থান নাই, ঠিকে ঝিয়ে কাজ সারেন; বলিলেন, "না বাবু, আমার সংসারে ওরকম কাজই নেই; আচ্ছা দেখি, যদি আমাদের পাড়ার বিনয় বাবু একটা চাকর রাখেন; সে দিন বল্‌ছিলেন বটে। কি জান, পাড়ার মজলিস্ হ'ল ঐ বাবুর বাড়ীতে, কিন্তু আজকাল এক ছিলিম তামাক পেতে যে বেগ পেতে হয়, বাবা!"

তার পর দিন ঐ কেরাণীবাবু অফিস হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় বিনয় বাবুর জন্য একটী ছোকরা চাকর সঙ্গে লইয়া মাণিকতলার দিকে চলিয়াছেন। পথে উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে;—

"খাবারওয়ালা তোমার কে হয়, বাপু?"

"আমার কেউ হয় না।"

"তবে তোমাকে সে পেলে কোথা?"

"আমি আপনি এসেছি। কল্‌কাতায় আমার থাক্‌বার খাবার জায়গা ছিল না; দোকানদার দয়া করে আমাকে রেখেছিল, আমি দোকানেই কাজ কর্‌তুম।"

"তুমি কি ক'রে সহরে এলে? তোমার আপনার লোক কেউ নেই? তুমি কোথায় কাজ ক'রেছ বল দেখি?"

"আমি বাড়ী থেকে হেঁটে সহরে এসেছি; বাড়ীতে আমার বাপ আর সৎমা আছেন। আমি আর কোথাও কাজ করিনি।"

ত্রিলোক বিনয় বাবুর বাড়ী আর দুইটী চাকরের দলভুক্ত হইল। বিনয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কি রে? কত নিবি তুই?" ত্রিলোক বলিল, "আমায় সবাই তের্লা ব'লে ডাকৃত।"

বিনয় বাবু। তুই কত মাহিনা নিবি বল্?

ত্রিলোক। তা ত জানি না মশাই; আমি কখনও এ কাজ করিনি; সহরে এসে পড়েছি, দেখ্‌লুম, পেট চল্‌বার উপায় নাই। খাওয়া পরা হ'লেই হ'ল।

বিনয় বাবু দেখিলেন, ছেলেটা একেবারে পাড়াগেঁয়ে, কিন্তু সহরের বালাম চাল পেটে পড়িলেই চালাক হইবে, পাঁচজন "কাণ-ভাঙ্গানিও" দিবে। তাই ত্রিলোককে আবার ডাকিয়া বলিলেন, "শুন্‌ছিস্, খাওয়া পরা ছাড়া মাসে মাসে কিছু খরচা পাবি, ভাল ক'রে কাজ কর্।"

অল্পদিনের মধ্যে ত্রিলোকের কাজে সকলেই সন্তুষ্ট। সে সকালে বিকালে তামাক সাজে, বাবুদের ফরমাস খাটে ও আপন মনে থাকে। তাহাকে সকলেই ভালবাসে;—অবশ্য, সহরের লোক চাকরকে যেমন ভালবাসে। আর ত্রিলোক?

চাকর সাজিতে হইয়াছে বলিয়া ত্রিলোকের দুঃখ নাই। সে সহরে আসিয়া একদিনেই বুঝিয়াছিল যে, পেট না চলিলে সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়। যখন খাবারওয়ালা তাহাকে খাটাইয়া লইয়া দুবেলা খাইতে দিত, তখন সে বেশ বুঝিয়াছে যে, যে রকম কাজই তাহার ভাগ্যে জুটুক না কেন, তাহার পৃথিবী-জোড়া অদৃশ্য বুকটার কিছুতেই অশান্তি হয় না। কেবল একটা কথা মনে প্রায়ই উঠিত এই যে, সে কোন্ পথে যাইবে,—কোন্ পথে গেলে তাহার ভাল হইবে; কেহই কি এ কথা তাহাকে বলিয়া দিবে না? কই, কেহই ত তাহাকে বুঝিতে পারিল না, বা চেষ্টাও করিল না; তাহাতেই বা দুঃখ কি? একদিন নিশ্চয়ই সে গন্তব্য পথের সন্ধান পাইবে।

যতই দিন যায়, ত্রিলোক বিনয় বাবুর সংসারটী ততই ঘনিষ্ঠভাবে চিনিতে লাগিল। ছেলেগুলির উপর মা-বাপের কি যত্ন, কি আদর! ভাই ভাইকে কেমন রক্ষা করে! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি অদ্ভুত সেবা! সংসারে ভালবাসার যে লীলারস সংসারমগ্নের দৃষ্টির কাছে প্রকাশ পায় না, সেই লীলারস

ত্রিলোকের অজ্ঞাতসারে তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। সে সর্ব্বদা অনুভব করিত, যত্ন সেবা আদরের পশ্চাতে কি যেন একটা লুকান মধুরতা রহিয়াছে; তার প্রাণে ঐ মাধুরী জাগিয়া থাকিত, তার বিশ্বজোড়া হৃদয়টা যেন সরস হইয়া উঠিত, কিন্তু বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

এক একবার ত্রিলোক ভাবিত,—"ঐ রকম যত্ন, ঐ রকম সেবা কি আমিও কর্‌তে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। সেই ইস্কুলের সঙ্গীদের ত আমিও কত যত্ন কর্‌তুম, তারাও আমার কাছে আস্‌তে কত ভালবাস্‌ত! কিন্তু এদের বাড়ীর মত বোধ হয় নয়। এখানে দেখ্‌ছি, এরা সেই সেবা, সেই যত্ন নিয়ে যেন ডুবে আছে। আচ্ছা, ডুবে যাওয়াটা কি রকম? আমি ত দেখেছি, সমস্ত প্রকাণ্ড জগৎটা ভাব্‌তে ভাব্‌তে কতবার আমার যেন হুঁস্‌ থাক্‌ত না; এদের ত কাজকর্ম্মের মধ্যে বেশ হুঁস্‌ থাকে!"

(৩)

প্রসিদ্ধ পাটের দালাল বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জ্বরাক্রান্তা জননীকে লইয়া কলিকাতা হইতে ৺কাশীতে আসিয়াছেন, সঙ্গে বাড়ীর প্রায় সকলকেই আনিতে হইয়াছে,—বায়ু-পরিবর্ত্তনের সুযোগ কলিকাতার ক'জন সহজে ছাড়ে? বিনয় বাবুর দিদি-মা অনেক কাল কাশীবাস করিতেছিলেন; তিনি কন্যার রুগ্নাবস্থা দেখিয়া দুঃখ করিলেন, কিন্তু নিজে এখনও বেশ শক্ত আছেন।

ত্রিলোক কাশীতে যাইয়া বাড়ীর বাহির বেশী হয় নাই; আর একটী চাকর বাজার করিত, সে কেবল বাড়ীর ফাই-ফরমাসই খাটিত, কখনও কখনও বাড়ীর কাছেই দোকানে যাতায়াত করিতে হইত। মণিকর্ণিকার ঘাটে সে তিন চারবার স্নান করিতে গিয়াছিল; কয়েকটী ঠাকুরবাড়ীতেও তাহাকে গাড়ীর ছাদে বসিয়া যাইতে হইয়াছে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া ত্রিলোক দেখিল, তাহার প্রাণ কি একটা অস্ফুট আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গেল। সেই অবধি সে দেখিত, তাহার অদৃশ্য জগৎ-জোড়া হৃদয়ে যেন সেই আনন্দ-তরঙ্গ সর্ব্বদাই বহিয়া যাইতেছে,—সে আনন্দের যদি কণামাত্র ক্ষুদ্র হৃদয়ের দ্বারা ধারণ করা যায়,

তবে সে হৃদয় নিশ্চয়ই উথলিয়া উঠে, বোধ হয় ধারণ করা যায় না। এ আনন্দ কোথা হইতে আসিল? কলিকাতায় যখন সাংসারিক সেবা-যত্ন তাহার দৃষ্টিতে পড়িত,—আর সে ত প্রায় সর্ব্বদাই পড়িত,—তখন প্রাণটা যে মধুর ভাবে ভরিয়া যাইত, সে ত আবার তখনই বিলীন হইত। কিন্তু প্রথম দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া অবধি যে আনন্দ সে অনুভব করিতেছে, সে আনন্দের যে ক্ষণমাত্রও অভাব হয় না,—রাস্তার গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, দোকান বাড়ী, গাছ, গাছের পাতা, আকাশ, জল, মাটী—সবই যেন সেই এক আনন্দকে তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে ধারণ করিয়া রহিয়াছে! এই আনন্দ-প্লাবন আপনি আপনি হঠাৎ কখন আসিয়া পড়িয়াছে, আর আপনি আপনি রহিয়া গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য!

ত্রিলোকের ভাবিবার অনেক কথা ছিল; কিন্তু ভাবনা আর তাহাকে বাধা দেয় না। সে নিজ বাড়ীতে যে পিতা বা বিমাতাকে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার যে খেলার বা পড়ার সঙ্গীদের ফেলিয়া আসিয়াছে, আজকাল তাহাদের কথা মনে পড়িয়াও বুঝি মনে পড়ে না। সে কলিকাতায় প্রথম প্রথম তাহার গন্তব্য পথের সন্ধান না পাইয়া যে ভাবিয়া আকুল হইত, সে ভাবনাও কখন বিদায় লইয়াছে। তবে কি সেই পথ সে পাইয়াছে? কই, এ কথাটাও ত তাহাকে চিন্তান্বিত করে না? সে কেবল দেখিতেছে, তাহার বিশ্ব-ভরা বুকটা একটা স্থির আনন্দে যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতে চাহিতেছে, আর তাহার দেহটা ও সমস্ত পৃথিবীই যেন সেই আনন্দেরই আবেগে সেই আনন্দেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

একথা সহজে বুঝা যায় যে, কাশীধাম ত্রিলোকের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। বিনয় বাবুর সংসারে এদিকে কত কি ঘটনা ঘটিল। তাঁহার সেই ভাগ্যবতী জননী সকল শুশ্রূষা-চিকিৎসা এড়াইয়া, পুত্রদের সাজান সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, মণিকর্ণিকার চিতাশয্যা পাতিয়াছেন। অশৌচের মধ্যেই কলিকাতা হইতে বিনয় বাবু পাটের কণ্ট্র্যাক্টে গুরুতর লোকসানের সংবাদ পাইয়াছেন। মাতৃশ্রাদ্ধ কলিকাতাতেই সম্পন্ন করা হইবে, স্থির হইয়াছে; সেইজন্য তিনি শীঘ্রই সপরিবারে কলিকাতা ফিরিতেছেন। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ত্রিলোক কলিকাতায় ফিরিল না। অগত্যা কাশীতেই একটী পরিচিত

ভদ্রলোকের জিম্মায় বিনয় বাবু তাহাকে রাখিয়া গেলেন। কিন্তু নূতন সংসারে আর ত্রিলোকের মন টিকিল না।

(৪)

আজ প্রায় ৬ বৎসর হইল একমাত্র পুত্র ত্রিলোকনাথ নিরুদ্দেশ; বৃদ্ধ দাশরথির সংসারে আরও অঘটন ঘটিয়াছে; তাঁহার সাধের দ্বিতীয়া পত্নী ইহ-লোকে নাই! পুত্র-কামনায় অধীরা প্রসবগৃহে নিমেষে "পুত্রমুখ দেখিয়া লইয়াছিল,—হায়, সেও স্পন্দনহীন পুত্রমুখ, কি দুর্দ্দৈব! আর বৃদ্ধ দাশরথি? তাঁহার ভাঙ্গা মন আর জোড়া লাগে নাই; মরণ-প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব দেখিয়া, সঞ্চিত অর্থে তীর্থ-পরিভ্রমণে বৃদ্ধ বাহির হইলেন। তাঁহার হৃদয়-আধারে ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখ, দেখিবে—একটা ক্ষীণ উৎকণ্ঠাও যে সেখানে প্রায়ই উঁকি মারে না, তাহা নহে; সে উৎকণ্ঠা আর কিছু নহে,—উহা নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের দর্শনেচ্ছাজনিত!

ত্রিলোক যে কেন পলাইল, দাশরথি তাহা বুঝিতেন। তিনি যে তাহার জননীর স্নেহোন্মাদ দেখিয়াছেন—তিনি যে দেখিয়াছেন, ভালবাসার কি গভীর তন্ময়তা ত্রিলোকের জ্ঞানোন্মেষ ঘটাইয়াছিল, তিনি যে একদিন অনুভব করিয়াছেন —ত্রিলোক তাহার জননীর নয়নতারা, তাঁহার সর্ব্বস্বধন! দাশরথি জানিতেন যে, নিজ সংসার হইতে তিনি নিজ হাতে ত্রিলোকের স্থান ঘুচাইয়া দিয়াছেন,—পুত্রের উপর তাঁহার কোনও অধিকার নাই; আর ইহাও জানিতেন যে, নিরীহ বালক নিজে পলায় নাই, যে জননীর অলক্ষিত স্নেহদৃষ্টি পিতৃসংস্রব হইতে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে, জগতে ত্রিলোকের উপর একমাত্র তাহারই পূর্ণ অধিকার। পাঠক, এ কথাও জানিয়া রাখ, দাশরথি তাঁহার যৌবন-সঙ্গিনীর উদ্দেশে কাঁদিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে, তাঁহারই নিজের অসংযমে ক্ষমা চাহিবার মুখ তাঁহার নাই, কিন্তু ত্রিলোককে কি একটা বার দেখিতে পাইবেন না?

অনেকগুলি তীর্থস্থানে মাসাবধিকাল কাটাইতে কাটাইতে দাশরথির জীবনে আরও দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। কই, বৃদ্ধ পিতাকে ত্রিলোক ত দেখা দিল না! বৃদ্ধ আর কতদিন বাঁচিবে; এখনও কি মাতাপুত্র তাহাকে ক্ষমা করিল না? ত্রিজগতে দয়া লাভ করা কি এতই কঠিন? সে

অনুসন্ধানের অবসর ত ফুরাইয়া আসিতেছে; মরণের আর বেশী দিন নাই। তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া দাশরথি নিয়মিত সাধনভজন করিতেন, কিন্তু বারো আনা মন ছিল পুত্রের সন্ধানে। এবার তিনি অনেক কষ্টে মন ফিরাইতে লাগিলেন,—করুণাময়ও কি তাঁহাকে পায়ে ঠেলিবেন?

কাশীতে দাশরথির একটা আড্‌ডা স্থির করা ছিল। সেইখানে আসিয়া তিনি ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু কাশীর বর্ত্তমান আশ্রয়ে সুদীর্ঘকাল বাস করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না। এদিকে আবার বর্ত্তমান দেহাশ্রয়ও আর বেশীদিন টিকিবে না। অতএব কোন্ আশ্রয়টী আগে ভাঙ্গিয়া যায়, সেই প্রতীক্ষায় দাশরথিকে বসিয়া থাকিতে হইল।

কয়েকমাস পরে যৌবনবন্ধু একটী রেল-কর্ম্মচারী এলাহাবাদ হইতে দাশরথিকে একখানি নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন। বন্ধু সম্প্রতি প্রয়াগে বদলি হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার অভিপ্রায়—দাশুবাবু সেইখানেই তাঁহার কাছে যতদিন সম্ভব থাকিয়া যান। দাশরথি দেখিলেন, দেহের মেয়াদ ফুরাইবার আগেই কাশীবাসের মেয়াদ ফুরাইল—আর বুঝিলেন যে, প্রয়াগ-মৃত্যুই তাঁহার ভাগ্যলিখন।

পাঠক, ভগবৎসাধনায় নিবিষ্টচিত্ত, আসন্ন-মৃত্যু দাশরথির নিকট সংসারের কেন, আমাদেরও বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। কেবল তাঁহার জীবনের দুই দিনের দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া গল্প শেষ করিব।

(৫)

প্রয়াগের সীমান্তে দারাগঞ্জে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন দাশরথি দেখিলেন, একটী সন্ন্যাসী বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাসীন। একাওয়ালাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, যষ্টির উপর ভর দিয়া দাশরথি সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হইলেন, অভিপ্রায় এই যে, সাধন-বিষয়ক দু' একটা জ্ঞাতব্য কথা তাঁহার কাছে যদি জানা যায়। সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া যেন চিনিলেন এবং বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বৃদ্ধ লাঠি রাখিয়া বসিলেন ও হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাবাজী! আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

উত্তর। পারেন বই কি।

প্র। ইষ্টের স্বরূপ কি ?

উ। প্রেম।

প্র। উপাসকের স্বরূপ কি ?

উ। প্রেম।

প্র। প্রেম কাহাকে বলে ?

উ। উপাস্য ও উপাসকের পূর্ণ-মিলনাত্মক অভেদের নাম প্রেম।

প্র। শাস্ত্রে কি বলে ?

উ। শাস্ত্রে ঐ প্রেম বা অভেদকে বলে 'ব্রহ্ম'।

প্রষ্টাকে এখানে একটু ভাবিতে হইল। ভাবিয়া তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন,—

"উপাস্য-উপাসক আগে, না তাঁদের পূর্ণ মিলন আগে ?"

উ। পূর্ণ মিলন ; অখণ্ড অভেদৈকরসই সত্য ও সর্ব্বকারণাণাং কারণম্। প্রিয়-প্রেমিক বা উপাস্য-উপাসক-ভেদ ঐ অভেদরূপ সত্যের প্রতিবিম্বসদৃশ ; উহার কোনরূপই স্বাতন্ত্র্য নাই।

প্র। কিন্তু ঐ ভেদই যে কেবল আমাদের কাছে এখন সত্য ?

উ। এখন ঐ ভেদের সাহায্যে অভেদাভাসকে ধরাই আপনার প্রয়োজন ও সামর্থ্য, তাই ভেদই সত্য বলিয়া প্রতীত। যেদিন ভেদের পারে যাইবেন, সেদিন উহার প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিতে পারিবেন।

প্র। আচ্ছা, স্বামিজী, আজ তবে আসি ; আমাকে অনেক দূর যাইতে হইবে।

বৃদ্ধ ও সন্ন্যাসী একসঙ্গেই উভয়ে উভয়কে প্রণাম করিলেন। এক্কাওয়ালা বৃদ্ধকে এক্কায় তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, গাড়ী "টেশানবাবুকো" বাড়ী ফির্ত্তি যাবে কি না। উত্তর পাইল, "হাঁ"।

(৬)

আর একদিন বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। প্রায় দশ দিন হইল, তিনি চলৎশক্তিরহিত ; রেল-কর্ম্মচারী বন্ধু তাঁহার শেষ-সেবা করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ বন্ধুর বাহিরে ডাক পড়িল, তিনি উঠিয়া গেলেন এবং কিছু পরেই

এক সন্ন্যাসীকে লইয়া দাশরথির ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দাশরথি ক্ষীণ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন, ভাল চিনিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী বাঙ্গালাভাষায় বলিলেন, "দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে আপনার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল; আমি প্রয়াগ হইতে আজই চলিয়া যাইব, তাই এখানে দেখা করিতে আসিয়া শুনিলাম, আপনার কঠিন উদরাময় হইয়াছে।" গলাভাঙ্গা স্বরে রোগী উত্তর করিলেন, "আপনার উপদেশে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছে; আজ দর্শনলাভ করিয়া মরিতে পারিব, ইহাও সৌভাগ্য।" একটু নীরব হইয়া আবার বৃদ্ধ বলিলেন, "কিন্তু এই পরলোকের দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা প্রশ্ন আপন মনে কবাটফলকে লিখিতে হইতেছে, আপনাকেও সেটা জিজ্ঞাসা করিব।" রোগী আবার থামিলেন। সেবক বন্ধু দেখিলেন, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে। "প্রশ্ন এই যে, আমার পুত্র ত্রিলোকনাথ এখন ইহলোকে না পরলোকে?"

সন্ন্যাসী রোগীর পদতলে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "পুত্র পিতার শেষ কাজে সাহায্য করিতে আপনার চরণে আগত।" বৃদ্ধ "তবে দাঁড়াও, দেখি" বলিয়া ক্রমে উঠিয়া বসিলেন ও পুত্রের মুণ্ডিত মস্তকে হাত বুলাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শেষ মুহূর্ত্তের আসিতে দেরী হয় নাই। বৃদ্ধ সজ্ঞানে সানন্দে পুত্রমুখে ভগবন্নাম শুনিতে শুনিতে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; কেবল শেষে আর একটী কথা ত্রিলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বাবা, তোমাকে গৈরিক কে পরাইল?" ত্রিলোক বলিয়াছিল—"একদিন কাশীধামে, গুরুসন্নিধানে, হৃদয়ের প্রেমসম্ভোগে সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছিল। তার পরদিন গুরু গেরুয়া পরাইয়া দিয়াছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর,

ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

প্রাণাধিকেষু—

তোমার পত্র পাইয়া অতি প্রীত হইলাম। তিব্বৎ সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছ, তাহা অতি আশাজনক, আমি সে স্থানে যাইবার একবার চেষ্টা করিব—সংস্কৃততে তিব্বৎকে উত্তরকুরুবর্ষ কহে—উহা ম্লেচ্ছভূমি নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমি, এজন্য শীত অত্যন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহিয়া যাইতে পারে। তিব্বতী লোকদিগের আচার ব্যবহার তুমি ত কিছুই লিখ নাই—যদি এত আতিথেয়, তবে কেন তোমাকে যাইতে দিল না? সবিশেষ লিখিবে—সকল কথা খুলিয়া একখানি বৃহৎ পত্রে। তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।

তিব্বতীদের যে তন্ত্রাচারের কথা কহিয়াছ, তাহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, আমাদের যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা। ঐ সকল তন্ত্র আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরও ভয়ঙ্কর; উহাতে ব্যভিচার অতি মাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল, এবং ঐ প্রকার immorality (চরিত্রহীনতা) দ্বারা যখন বৌদ্ধগণ নির্ব্বীর্য্য হইল, তখনই কুমারিল্ল ভট্ট দ্বারা দুরীকৃত হইয়াছিল। যে প্রকার সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে ও বাউলরা মহাপ্রভুকে secret (গোপনে) ভোগী, সুরাপায়ী ও নানাপ্রকার জঘন্য আচরণকারী বলে, সেই প্রকার modern (আধুনিক) তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে এবং প্রজ্ঞাপারমিতোক্ত তত্ত্বগাথা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাক্যকে কুৎসিত

ব্যাখ্যা করে। ফল এই হইয়াছে যে, এক্ষণে বৌদ্ধদের দুই সম্প্রদায় বর্ম্মা ও সিংহলের লোক—প্রায় তন্ত্র মানে না ও সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীও দূর করিয়াছে ও উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধেরা যে "অমিতাভ বুদ্ধম্" মানে, তাহাকেও ঢাকী-শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়াছে। ফল কথা এই, উত্তরের লোকেরা যে আমিতাভ বুদ্ধম্ ইত্যাদি মানে, তাহা প্রজ্ঞাপারমিতাদিতে নাই, কিন্তু দেবদেবী অনেক মানা আছে। আর দক্ষিণীরা জোর করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া দেবদেবী বিসর্জ্জন করিয়াছে। যে Everything for others ("যাহা কিছু সব পরের জন্য") তিব্বতে বিস্তৃত দেখিতেছ, ঐ Phase of Buddhism (বৌদ্ধধর্ম্মের ঐ ভাব) আজকাল ইউরোপকে বড় strike করিয়াছে (ইউরোপের বড় মনে লাগিয়াছে)। যাহা হউক, ঐ phase (ভাব) সম্বন্ধে আমার বলিবার অনেক আছে—এ পত্রে তাহা হইবার নহে। যে ধর্ম্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্ব্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্ম্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect (বুদ্ধি) এবং heart (হৃদয়), যাহা জগতে আর হইল না।

বেদের যে কর্ম্মবাদ, তাহা Jew (য়াহুদী) প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের কর্ম্মবাদ, অর্থাৎ যজ্ঞ ইত্যাদি বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তরশুদ্ধি করা—এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেব the first man (প্রথম ব্যক্তি), যিনি ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু ভাব ঢং সব পুরাতনের মত রহিল, সেই তাঁহার অন্তঃকর্ম্মবাদ—সেই তাঁহার বেদের পরিবর্ত্তে সূত্রে **বিশ্বাস** করিতে হুকুম। সেই জাতিও ছিল, তবে গুণগত হইল (বুদ্ধের সময় জাতিভেদ যায় নাই), সেই যাহারা তাঁহার ধর্ম্ম মানে না, তাহাদিগকে পাষণ্ড বলা। (পাষণ্ডটা বৌদ্ধদের বড় পুরাণ বোল, তবে কখনও বেচারীরা তলোয়ার চালায় নাই, এবং বড় toleration (উদারভাব) ছিল। তর্কের দ্বারা বেদ উড়িল, কিন্তু তোমার ধর্ম্মের প্রমাণ?—বিশ্বাস কর!!!—যেমন সকল ধর্ম্মের আছে, তাহাই। তবে সেই কালের জন্য বড় আবশ্যক ছিল এবং সেই জন্যই তিনি অবতার হন।

তাঁহার মায়াবাদ কপিলের মত। কিন্তু শঙ্করের how far more grand and rational (কত মহত্তর এবং অধিকতর যুক্তিপূর্ণ)! বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন,—জগতে দুঃখ দুঃখ—পালাও পালাও। সুখ কি একেবারে নাই? যেমন ব্রাহ্মরা বলেন,—সব সুখ—এও সেই প্রকার কথা। দুঃখ, তা কি করিব?—কেহ যদি বলে যে, সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে? শঙ্কর এ দিক্ দিয়ে যান না—তিনি বলেন সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি—আছে অথচ নেই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব,—দুঃখ আছে, কি, কি আছে; জুজুর ভয়ে আমি পলাই না। আমি জানিব—জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ, তা ত প্রাণ ভরে গ্রহণ করিতেছি—আমি কি পশু যে, ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ-জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব—জানিবার জন্য জান দিব—এ জগতে জানিবার কিছুই নাই—অতএব যদি এই relativeএর (মায়িক জগতের) পার কিছু থাকে—যাকে শ্রীবুদ্ধ প্রজ্ঞাপারম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যদি থাকে, তাহাই চাই। তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে I do not care (আমি গ্রাহ্য করি না)। কি উচ্চ ভাব! কি মহান্ ভাব! উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য্য heart (হৃদয়) অণুমাত্র পান নাই, কেবল dry intellect (শুষ্ক জ্ঞান-বিচার)—তন্ত্রের ভয়ে, mobএর (ইতর লোকের) ভয়ে ফোড়া সারাতে গিয়ে হাত শুদ্ধ কেটে ফেল্‌লেন। এ সকল সম্বন্ধে লিখ্‌তে গেলে পুঁথি লিখ্‌তে হয়—আমার তত বিদ্যা ও অবকাশ দুইয়েরই অভাব।

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর—তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরেরও আপনাকে limited (সীমাবদ্ধ) করিবার শক্তি নাই। তুমি যে "সুত্তনিপাত" হইতে গণ্ডার সুত্ত তর্জ্জমা লিখিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। ঐ গ্রন্থে ঐ প্রকার আর একটী ধনীর সুত্ত আছে, তাহারও প্রায় ঐ ভাব। ধর্ম্মপদমতেও ঐ প্রকার অনেক কথা আছে। কিন্তু সেও শেষে যখন "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ"—যাঁহার শরীরের উপর অণুমাত্র শরীর-বোধ নাই, তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ

করিবেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী এক জায়গায় বসিয়া সাধন করিয়া সিদ্ধ হইলে তখন ঐ প্রকার আচরণ করিবে—সে দূর—বড় দূর।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথীষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥
বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুসক্তবাহ্যঃ॥
দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥

—শঙ্করাচার্য্য।

—ব্রহ্মজ্ঞের ভোজন চেষ্টা বিনা উপস্থিত হয়—যেথায় জল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় ইতস্ততঃ তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখন বনে কখন শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন এবং যে পথে যাইতে বেদ শেষ হইয়াছে, তথায় সঞ্চরণ করিতেছেন। আকাশের ন্যায় তাঁহার শরীর, বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত; তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তম বস্ত্রধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উন্মত্ত, কখন পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

গুরুচরণে প্রার্থনা করি, তোমার তাহাই হউক এবং তুমি শার্দ্দুলবৎ ভ্রমণ কর।

ইতি
বিবেকানন্দ।

(৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত।)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর.

ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

গ— ভায়াকে আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়া ও কোন স্থানে বসিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া এবং তিব্বতে কি কি সাধু দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহার কি প্রকার, সবিশেষ লিখিতে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অত্র পত্রের সহিত আপনার নিকট পাঠাইতেছি। কা— ভায়ার (অভেদানন্দের) হৃষীকেশে পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতেছে—তাঁহাকে এ স্থান হইতে এক telegram (তার) পাঠাইয়াছি—উত্তরে যদি আমার যাওয়া আবশ্যক তিনি বিবেচনা করেন, এস্থান হইতে একেবারেই হৃষীকেশে যাইতে বাধ্য হইব, নতুবা দুই এক দিনের মধ্যেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। মহাশয় হয় ত এই মায়ার প্রপঞ্চ দেখিয়া হাসিবেন—কথাও তাই বটে—তবে কি না লোহার শিকল ও সোনার শিকল—সোনার শিকলের অনেক উপকার আছে—তাহা হইয়া গেলে আপনা আপনি খসিয়া যাইবে—আমার গুরুদেবের পুত্রগণ আমার অতি সেবার পাত্র—এই স্থানেই একটুকু duty (কর্ত্তব্য) বোধ আছে। সম্ভবতঃ কা— ভায়াকে এলাহাবাদে অথবা যে স্থানে সুবিধা হয়, পাঠাইয়া দিব। আপনার চরণে আমার শত শত অপরাধ রহিল, "পুত্রস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

দাস

বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর,

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

Lumbago (কোমরের বাতে) বড় ভোগাইতেছে, নহিলে ইতিপূর্ব্বেই যাইবার চেষ্টা দেখিতাম। এস্থানে আর মন তিষ্ঠিতেছে না। তিন দিন

বাবাজীর স্থান হইতে আসিয়াছি, কিন্তু তিনি দয়া করিয়া প্রায় প্রত্যহই আমার খবর লয়েন। কোমর একটু সারিলেই বাবাজীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতেছি। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর,

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনি জানেন না—কঠোর বেদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। একটুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি। এবার বড় কঠোর হইয়া নিজের চেষ্টার জন্য বাহির হইয়াছিলাম—এলাহাবাদে এক ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অমনি ছুটিতে হইল—আবার এই হৃষীকেশের খবর—মন ছুটিয়াছে—শ—কে এক telegram (তার) পাঠাইয়াছি—আজিও উত্তর আইসে নাই—এমন স্থান, telegram আসিতেও এত দেরী! কোমরের বেদনা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, বড় যন্ত্রণা হইতেছে। পওহারী জীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি "উল্টা সমঝ্‌লি রাম"!—কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন। বোধ হয়, ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইঁহাকে উদ্বেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি এবং বিদায় লইয়া শীঘ্রই প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল করিয়াছেন! বাবাজী ছাড়েন না, আবার গগন বাবু (ইঁহাকে আপনি বোধ হয় জানেন, অতি ধাম্মিক, সাধু এবং সহৃদয় ব্যক্তি) ছাড়েন না। Telegramএ যদ্যপি আমার যাইবার

আবশ্যক হয়, যাইব ; যত্যপি না হয়, তুই চারি দিনে কাশীধামে ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। আপনাকে ছাড়িতেছি না—হৃষীকেশে লইয়া যাইবই, কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। শৌচের কথা কি বলিতেছেন? পাহাড়ে জলের অভাব—স্থানের অভাব!! তীর্থ এবং সন্ন্যাসী কলিকালের!! টাকা খরচ করিলে, সত্রওয়ালারা ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া দেয়, স্থানের কা কথা!! কোনও গোল নাই, এত দিনে গরম আরম্ভ হইয়াছে, তবে কাশীর গরম হইবে না—সে ত ভালই। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা চিরকাল, তাহাতে নিদ্রা উত্তমরূপ হইবারই কথা।

আপনি অত ভয় পান কেন? আমি guarantee (দায়ী), আপনি নিরাপদে ঘরে ফিরিবেন এবং কোথাও কষ্ট হইবে না। ব্রিটিশ রাজ্যে ফকিরের গৃহস্থের কোনও কষ্ট নাই—ইহা আমার experience (অনুভূত সত্য)।

সাধ করে বলি—আপনার সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ? এক চিঠিতে আমার সকল resolution (সঙ্কল্প) ভেসে গেল, আবার সব ফেলে গুটি গুটি কাশী চলিলাম। ইতি—

গ—ভায়াকে ফের এক চিঠি লিখিয়াছি, এবার তাঁহাকে মঠে যাইতে বলিয়াছি। যদি যান, অবশ্যই কাশী হইয়া যাইবেন ও আপনার সহিত দেখা হইবে। আজ কাল কাশীর স্বাস্থ্য কেমন? এস্থানে থাকিয়া আমার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সকল সারিয়াছে, কেবল কোমরের বেদনায় অস্থির, দিন রাত কন্ কন্ করে এবং জ্বালাতন করিতেছে—কেমন করিয়া বা পাহাড়ে উঠিব, ভাবিতেছি। বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড় হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ! অতএব আমিও প্রস্থান।

দাস
বিবেকানন্দ।

পুঃ—আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—

"আপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
ও মন, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।”

ইতি শ্রীরামপ্রসাদ।

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধজীবের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন; অথবা বেদান্তদর্শনে যাহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা।

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই, ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্য মাত্রেই জানে। বিপদে প্রলোভনে ভগবান্ রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ অন্তর্য্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি,—হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন্, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুক-দয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুঃ—পত্রপাঠ উত্তর দিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

সহজ কাজ।

স্বামী বিবেকানন্দের ও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব ভারতের নানা স্থানে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। বঙ্গ-নরনারী এখন এই দুই মহাপুরুষের অলোকসামান্য চরিত্রের আলোচনা করিতেছে। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণকারী ভারতের ও বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্থল ছাত্রগণের পরীক্ষাও শেষ হইয়াছে বা শীঘ্রই হইবে। বঙ্গের বহু সহস্র বালক ও যুবকের স্কন্ধ হইতে অনেক দিনের বোঝা কিছু দিনের জন্য নামিয়া যাইবে। ছাত্রগণের প্রকৃত অবকাশের সময় আসিতেছে। এরূপ সু-অবসর সকল সময় মিলে না। এরূপ নানা অনুকূল অবস্থার যোগাযোগ অনেক সাধ্য-সাধনার ফল। তাই আমরা এই শুভ-মুহূর্ত্তে ছাত্রমণ্ডলীকে দু' একটী কথা বলিতে চাই।

কঠোর শ্রমের পর এই অবকাশ-লাভের প্রথম সুফল—শান্তি। মাথা হইতে বোঝা নামিয়া যাইলে যে স্বচ্ছন্দতা বোধ হয়, তাহা তোমাদেরও হইবে। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিবে। ইহাই ত চাই। কোন জিনিসকেই অত্যধিক খাটাইতে নাই। কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম চাই। তাহাতে কাজ করিবার সুবিধাই হয়, ক্ষয়িত শক্তি পুনঃসঞ্চিত হয়। সুতরাং আমরা চাই,—তোমরা এই বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ অবকাশের ষোল আনা সুখ ভোগ কর।

কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহ মাত্র নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে, শুধু আমোদ-প্রমোদে কাটিবে। তার পর উহারও আবার প্রতিক্রিয়া আসিবে। প্রত্যহ ১২।১৪ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিবার অভ্যাস আবার ফিরিয়া আসিতে চাহিবে, আবার তোমাদিগকে কোন না কোন কাজের জন্য লালায়িত করিবে। আমরা চাই,—এই সময়ের জন্য তোমরা নিজ নিজ রুচি ও সাধ্যানুযায়ী কোন না কোন কাজ ঠিক করিয়া লইবে।

দেশ-ভ্রমণ একটী অতি উপাদেয় আমোদ। ইহাতে যেমন নূতন নূতন স্থান দেখিয়া নূতন নূতন আচার-ব্যবহারের সংস্পর্শে আসিয়া আনন্দ পাইবে, তেমনিই আবার শিক্ষালাভ হইবে। এই শিক্ষাই ঠিক ঠিক শিক্ষা; ইহাতে

জোর জবরদস্তি নাই, এক্‌জামিনের তাড়া নাই। স্বেচ্ছায় উৎসুক মন যতটুকু চায়, যতটুকু পারে, ততটুকুই আপনি বাছিয়া লয়, ততটুকুই আয়ত্ত করে। উহা জীবনের সহিত গাঁথিয়া যায়। পুঁথিগত বিদ্যা ইহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে না।

ভ্রমণের অশেষ গুণ। কিন্তু সকলের পক্ষে ত ভ্রমণের ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। আবার অনেকের পিতা মাতা ও অভিভাবকেরা তাঁহাদের যাইতে দিবেন না,—বিদেশে, অজানা স্থানে, ছেলেরা কোথায় থাকিবে কি খাইবে? বাপ-মায়ের কাছে ছেলে চিরকালই ছেলে। একটু ছাড়িয়া না দিলে যে ছেলেদের শিক্ষা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে, অপরে হাতে তুলিয়া ক্রমাগত খাওয়াইয়া দিতে থাকিলে ক্রমে যে নিজের হাত অকেজো হইয়া যাইবে, স্নেহে তাঁহারা সে কথা ভুলিয়া যান। বংশানুক্রমিক সংস্কারই তজ্জন্য দায়ী।

এখন অন্য কোন কার্য্য আছে কি না, দেখা যাউক। অনেকে আরাম করিয়া ভবিষ্যতের পড়া পড়িতে থাকেন। কিন্তু ইহা ত সেই পুরান ঠুলিই চোকে বাঁধিয়া সেই পুরান ঘানিতেই ঘোরা। ইহাতে এরূপ অবকাশের অপ-ব্যবহার করা হয়। অনেকে নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা খুব ভাল; তবে ইস্কুল-কলেজের দৈনিক কার্য্যের মধ্যে যে যে বই আমরা পড়ি, তাহাদের অপেক্ষা যেগুলি ঠিক ঠিক বাহিরের বই, যাহারা আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দেয়, সেই সবই গ্রহণীয়। কিন্তু মনে রাখিও, ইহাতে বেশীর ভাগ মানসিক ব্যায়ামই হইয়া থাকে। হৃদয়ের উন্নতির আশা ইহাতে অল্প।

আমরা চাই,—তোমরা হাতে কলমে এমন কিছু এই অবসরে করিবে, যাহাতে হৃদয়ের পুষ্টি হয়। ইস্কুল-কলেজে তোমরা সে শিক্ষা পাও নাই, এবং পাইবেও না। এ শিক্ষা তোমাদিগকে নিজে নিজে লাভ করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতেছ—কিরূপে ইহা সম্পন্ন হইবে? উপায় চক্ষের সাম্‌নেই রহিয়াছে, অভাব শুধু লোকের। তোমাদের মধ্যে এমন অতি অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা বুভুক্ষুর কাঙ্ক্ষিত ভোজন-লাভান্তে তৃপ্তিসূচক ধ্বনি লক্ষ্য না করিয়াছেন। আর যদি তুমি নিজে রাস্তা হইতে এইরূপ

একজনকেও বাটীতে আনিয়া তাহাকে 'নারায়ণ'-জ্ঞানে একবেলা ভোজন দিতে পার, তবে দেখিও, তাহার এই তৃপ্তি দেখিয়া তোমার হৃদয় মন কি অপূর্ব্ব আনন্দে নাচিয়া উঠে। তোমার সব প্রাণটা ভরিয়া উঠিবে। ইহাতে গৃহস্থের খরচ কিছুই নাই, অধিকন্তু পরম কল্যাণ। তোমার এতটুকু পরিশ্রমের ফলে একটী বুভুক্ষু-নারায়ণের সেবা হইল।

ইহা অতি সহজসাধ্য, তোমরা সকলেই ইহা করিতে পার শুধু ইচ্ছা করিলেই হইল। বাঙ্গালার রাস্তায় রাস্তায় বুভুক্ষুর অভাব নাই, অতিথিবৎসল গৃহস্থেরও অভাব নাই। তবে তোমরা সানন্দে ঘরে ঘরে যথার্থ ভাবের সহিত এই নীরব দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর না কেন? যদি প্রত্যেকে প্রত্যহ একটী করিয়া বুভুক্ষু-নারায়ণকে অন্ন দানে সেবা কর, উহার ফল আর পরলোকে দেখিব বলিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। হাতে হাতেই দেখিতে পাইবে। আর তোমার কি সৌভাগ্য বল দেখি! তুমি যদি কিছু না করিতে, মা অন্নপূর্ণার রাজ্যে সে ব্যক্তি অভুক্ত থাকিত না, মাঝে হইতে তুমি ভগবানের অভীপ্সিত কর্ম্ম-সম্পাদন-জনিত প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইতে।

এই এক রকমের কার্য্য—ইহাতে বেশী সময় লাগিবে না, উপরন্তু সমস্ত দিনটী অতি আনন্দে কাটিবে। এ আনন্দ সাত্ত্বিক আনন্দ; সাত্ত্বিক আনন্দের কাছে কি অন্য আনন্দ লাগে?

আরও একরূপ কার্য্য আছে। তোমরা ভগবানের ইচ্ছায় বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছ। বিদ্যার অভাবে মানুষের কি দুর্গতি হয়, তাহা তোমাদের কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তোমার আশে পাশে এইরূপ সহস্র সহস্র লোক রহিয়াছে, যাহারা বিদ্যার আলোক-স্পর্শে একেবারে বঞ্চিত। তাহারা ক খ পর্য্যন্ত জানে না। এই তোমাদের পঠদ্দশা; তাহাদের কি কষ্ট, কি ইঁট কাঠ পাথরের মত তাহারা জীবন যাপন করিতেছে, তাহা তোমরা যেমন বুঝিবে, অপরে তেমন বুঝিতে পারিবে না। আবার বুঝিতে পারিলেও ত সকলে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না! তোমরা তাহাদের দুঃখ বুঝিতেছ, তোমাদের অবসর মিলিয়াছে, তোমাদের কার্য্যপদ্ধতি জানা আছে। একটু চেষ্টা কর না কেন? ইতর সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার স্বামিজীর অতি অভিলষিত বস্তু ছিল। যদি তুমি একজন

চাষার ছেলেকেও কিঞ্চিৎ বিদ্যা দান করিতে পার, সে ত সুখী হইবেই, তুমিও ধন্য হইবে।

সমষ্টি হইতে ব্যষ্টি ভিন্ন নহে, সমষ্টির সুখ ছাড়িয়া ব্যষ্টির সুখ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা মাত্র। যদি তুমি নিজের বিদ্যাশিক্ষার এত আদর কর, তবে অপর একজনকেও বিদ্যাশিক্ষা দিবার এতটুকু চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি। দেখিবে, তোমার বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হইবে। প্রভু তোমায় যে অধিকার দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার হইবে। আর তাঁহার একটী মূর্খ ছেলের বিদ্যাশিক্ষার সহায়তা করিলে তিনি খুসীই হইবেন। আর 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'। কি করিয়া আরম্ভ করিবে ভাবিয়া অনর্থক কালক্ষেপ করিও না। আরম্ভ কর, যে কোন রকমে হউক আরম্ভ কর, সদুপায় আপনা আপনিই জানিতে পারিবে। 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে'।

দুটী একটী ছেলেকে লইয়া, যখন তাহাদের অবসর থাকে, সেই সন্ধ্যার সময় একটু পড়াইতে আরম্ভ কর দেখি। , ক খই না হয় শিখাও না, এটা ত সকলেই পারিবে। দীন হীন ভাবকে দূর করিয়া দাও। ইচ্ছা, আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেই প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পাকা কাজ করিয়া যাইতে পারে। তুমি যদি ঐরূপে গরীব চাষাভূষার ছেলেদের পড়াইতে আরম্ভ কর, দেখিবে, তোমার দেখাদেখি অন্য গ্রামেও ঐরূপ নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছে। এটা অত্যন্ত সহজ কাজ; শুধু আরম্ভ করিয়া দিবার, কাজটাকে প্রথমে একটু বেগ দিয়া চালাইয়া দিবার একজন লোক দরকার; তার পর গাঁয়ে গাঁয়ে এইরূপ পাঠশালা খুলিয়া যাইবে। ইতিমধ্যেই ভারতের নানা স্থানে এরূপ পাঠশালা খুলিয়াছে। হৈ-চৈএর দরকার নাই, নিঃশব্দে প্রাণের ভালবাসা ঢালিয়া কাজ করিয়া যাও, সিদ্ধি তোমার করায়ত্ত হইবে।

যেখানে যেমন ছেলে পাইবে, সেই অনুসারে উচ্চ উচ্চ মানের—Standard এর—বই পড়াইতে থাকিবে। তবে আমাদের উদ্দেশ্য—প্রাথমিক শিক্ষা। শিশুকে পা পা করিয়া একটু চলিতে শিখাও, একটু সাহায্য দাও, তারপর তাহারা আপনিই চলিবে ও দৌড়িতে শিখিবে। বই না থাকিলেও শুধু মুখে মুখেই শিক্ষা দিতে থাক। তাহাতে আরও ভাল কাজ হইবে। তোমাদের ভাবিবার—বুঝিবার শক্তি আছে, তোমাদিগকে সবিস্তার বুঝাইতে হইবে না।

দুই তিন মাস এইরূপে কাজটাকে চালাও দেখি। তার পর গ্রামেরই কোন বালক, যুবক বা অপর কাহাকেও তোমার অনুপস্থিতিতে এই কার্য্য চালাইবার ভার দিয়া দাও। ছুটীর সময় যখনই তুমি বাড়ী যাইবে, তখনই কাজ কিরূপ চলিতেছে তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতে পারিবে ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাও করিতে পারিবে। আমরা চাই,—অন্ততঃ দুই শত বীরহৃদয় বালক ও যুবক এইরূপ নিজ নিজ গ্রামে চাষাভূষার ছেলেদের জন্য পাঠশাল খুলিবেন। ছাত্র খুঁজিতে হইবে না, আপনিই আসিবে। তার পর নিঃস্বার্থ কার্য্যে যেরূপ হইয়া থাকে, দেখিবে, এই সামান্য অঙ্কুর হইতে কি বিশাল মহীরুহের উৎপত্তি হয়। শুধু সাহস করিয়া লাগিয়া যাও। ভবিষ্যতের ভাবনা করিও না।

ভারতবাসী আমরা সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া কাজকর্ম্ম ফাঁসাইতে বড়ই পটু। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার কাজ নয়। যদি আমরা কিছু শিখিয়া থাকি, তবে তাহা কাজে দেখাইতে হইবে—ইহাই পরীক্ষা। যদি আমাদের ইস্কুল-কলেজের শিক্ষায় আমাদিগকে অপরের জন্য—অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ আমাদেরই আর কয়েকটী ভাইএর জন্য একটু পরিশ্রম করিতে না শিখায়, তবে আমাদের সে শিক্ষাকে ধিক্। একটু ত্যাগ চাই, যৎসামান্য ত্যাগ—তাহা হইলেই হইল। বিভিন্ন গ্রামে এইরূপ নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। তার পর সঙ্ঘবদ্ধভাবে উহাদের পরিচালনা আপনা হইতেই হইবে। সংবাদপত্রের সাহায্যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের পাঠশালার খবরাখবর সাধারণের নিকট পৌঁছিবে এবং এতৎসম্বন্ধে আলোচনাও চলিবে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা চলিলেই ত সুফল, নচেৎ শুধু বকাবকিতে বৃথা আয়ুঃক্ষয়।

গাঁয়ে গাঁয়ে সেবাশ্রম ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ইহার কমে কিছুতেই হইবে না। তবে প্রথম হইতেই ঢাক বাজান বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। 'শনৈঃ পন্থাঃ'। ধীরভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। রাই কুড়াইয়া বেল হয়। ঐ দু-দশটী দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হইতে কালে গ্রামে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ দু-দশটী গরীবের ছেলেকে লইয়া নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইতেই সমস্ত বঙ্গদেশ প্রাথমিক শিক্ষার একটী বিরাট্ ক্ষেত্র-স্বরূপ হইয়া উঠিবে। টাকার দরকার নাই, দরকার লোকের। দৃঢ়চিত্ত

ভগবদ্বিশ্বাসী লোকেরই প্রয়োজন। বেদান্ত বা ধর্ম্ম শুধু মুখে আওড়াইলেই চলিবে না। কাজে দেখাইতে হইবে। সদিচ্ছা চাই, তার পর বুদ্ধি তিনিই দিবেন। আরম্ভ সামান্য হউক, কিন্তু আরম্ভ করা চাই। পিছাইলে চলিবে না।

আমরা উপর উপর কতকগুলি ইঙ্গিত করিয়া গেলাম। বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণ উহা হইতেই কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন। মনে রাখিও,—আগে কাজ, তার পর কথা। তবেই উহা সফল হইবে। অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার প্রয়োজন নাই, শুধু আরম্ভ কর। লাগিয়া যাও, লাগিয়া যাও—স্বামিজীর আদেশ। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

মল্লভূমি ও মল্লভূপগণ।

(শ্রীঅহীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দুর্গাদাস মল্লের পর জগৎ মল্ল আনুমানিক ১০০৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সমধিক বলশালী ও সমৃদ্ধিশালী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিষ্ণুপুর সুরপুরী অপেক্ষাও সম্পৎশালিনী ছিল। প্রাসাদ-প্রাকারের মধ্যে নাট্যশালা, শোভাগৃহ, রাজপ্রাসাদ এবং পরিচ্ছদাগার ছিল। শুভ্র শ্বেত মর্ম্মর-প্রাসাদমালা নগরীর শোভা বৃদ্ধি করিত। প্রাসাদ-প্রাচারের মধ্যেই সৈন্যাবাস, হস্তিশালা, অশ্বশালা, ভাণ্ডারগৃহ, অস্ত্রাগার, কোষগৃহ ও একটী সুন্দর মন্দির ছিল। রাজপুরীর বাহিরে অতি সুন্দর মনোরম মন্দিরাদি দ্বারা নগরী সুশোভিত থাকিত। জগৎ মল্ল রাধাবিনোদ বিগ্রহের জন্য একটী মন্দির ও একটী রাসমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিশেষ প্রচলিত ছিল। জগৎ মল্লের রাজধানীর ঐশ্বর্য্য-গৌরব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, নানা স্থান হইতে বণিকগণ আকৃষ্ট হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।

জগৎ মল্ল রাজা হইবার কিছু পূর্ব্বে, দশম শতাব্দীতে রাঢ় বন্দেলরাজ

ধঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মল্লরাজ্যের কোনও ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, মল্লরাজ্য বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইলে, আমরা উহার অল্পকাল পরেই জগৎ মল্লের সময়ে বিষ্ণুপুর রাজধানীকে এরূপ সম্পদ্‌শোভাশালিনী দেখিতে পাইতাম না। বিষ্ণুপুরের সে 'অমরা জিনি' ঐশ্বর্য্যের কোনও চিহ্ন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। সে সমস্ত মর্ম্মর-প্রাসাদ, সেই মন্দিররাজি কোথায় গেল? কে তাহার উত্তর দিবে? হয় ত বিষ্ণুপুর নগরের কোনও নিভৃত, লোক-সমাগমশূন্য স্থানে, ভূগর্ভে তাহাদের ধ্বংসাবশেষ নিহিত থাকিয়া, আমাদের তৎসন্ধানের নিষ্ফল চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিতেছে। এই সময়ে মহীপাল বাঙ্গালার একচ্ছত্র রাজা ছিলেন, এবং মনে হয়, স্বাধীন আরণ্য সামন্ত জগৎ মল্ল তাঁহার চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিয়া মিত্ররাজগণমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। জগৎ মল্লের রাজত্বকালে পশ্চিম ভারতের তীর্থস্থানসকল মামুদ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছিল।

জগৎ মল্ল বা জগন্নাথ মল্লের পর যথাক্রমে অনন্ত মল্ল, রূপ মল্ল, সুন্দর মল্ল, কুমুদ মল্ল, কৃষ্ণ মল্ল, ঝাপ মল্ল, প্রকাশ মল্ল, প্রতাপ মল্ল, সিন্দূর মল্ল, শুক মল্ল, বনমালী মল্ল, যাদু মল্ল, জীবন মল্ল এবং রাম মল্ল বা রায় মল্ল রাজা হন। রায় মল্লের রাজত্বকালে দুর্গের উৎকর্ষ সাধন করিয়া অধিকতর দুর্ভেদ্য করা হইয়াছিল। নানাবিধ আগ্নেয় অস্ত্র বা কামান দ্বারা দুর্গপ্রাকার সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের সৈন্য তখন অমিতবলশালী ছিল। সৈন্যগণের মধ্যে উর্দ্দীর ব্যবহার ও প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার একটি কারণও আমরা দেখিতে পাই। রাজা রায় মল্ল ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইতে চলিয়াছে। সেনবংশীয় বৃদ্ধ, তেজস্বী নৃপতি সৈন্যসহায়পরিত্যক্ত অবস্থায় এক বৎসর নদীয়ায় অবস্থান করিয়া হীনতেজা, ভয়-চকিত প্রজাগণ দ্বারা নদীয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া, পূর্ব্ববঙ্গে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যখন বাঙ্গালার একচ্ছত্র নৃপতি লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়েই দেখিতে পাই, তাঁহার আরণ্য-সামন্ত-নৃপতি রাম মল্ল বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্বীয় দুর্গ ও সৈন্যদলের উন্নতি বিধান করিতেছেন। এই সমস্ত প্রয়াস যে মুসলমান আক্রমণ হইতে মল্লরাজ্য ও

রাজধানী রক্ষা করিবার জন্যই হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যখন আমরা দেখি যে, মুসলমানগণের নদীয়া-বিজয়ের পর হইতে ধাড়ি হাম্বীরের সময় পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসর মল্লনৃপতিগণ অপ্রতিহত স্বাধীনতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ধাড়ি হাম্বীরের সময়ও নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া বিষ্ণুপুর করদরাজ্যরূপে গণ্য হইয়াছিল, তখন রাম মল্লের এই রণ-কৌশল ও দূরদর্শিতার সুফল বুঝিতে পারি। আমাদের মনে হয়, রাম মল্লের সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রকোনা হইতে মানভূমের কিয়দংশ পর্য্যন্ত সমস্ত আরণ্যপ্রদেশ মল্লরাজ্যভুক্ত ছিল।

রাম মল্ল কেবল যে সমরনীতিজ্ঞ পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণতারও পরিচয় পাপ্ত হওয়া যায়। তিনি রাধাকান্ত জিউএর জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই দেবতা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেব একটি হাস্যোদ্দীপক ভ্রম করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পক্ষে আমাদের ভাষা আয়ত্ত করা ও তদবলম্বনে ঐতিহাসিক আলোচনা করা কত দুরূহ তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বোধ হয় কোন ইংরাজী পাঠে *u* স্থলে *n* পাঠ করিয়া জিউ স্থলে "জিন" পড়িয়াছেন এবং তজ্জন্য রাধাকান্ত জিউকে "apparently ghost of some hero" (অর্থাৎ সম্ভবতঃ কোন বীরের প্রেতাত্মা) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অনার্য্যজাতির ন্যায় বিষ্ণুপুররাজবংশ কর্ত্তৃক এই ভূতোপাসনা যে, হাণ্টার সাহেব প্রভৃতি সুধি-গণের মনে উক্ত বংশের অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে ধারণা দৃঢ়মূল করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? পক্ষান্তরে আমরা এই রাধাকান্ত জিউএর মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইতে প্রমাণ পাইতেছি যে তান্ত্রিক যুগের পর যখন সুবিমল প্রেম ভক্তিমূল বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গে প্রচারিত হইতেছিল তখন, মল্লরাজ্যেও উহা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

রাম মল্লের পর যথাক্রমে গোবিন্দ মল্ল, ভীম মল্ল, কটার মল্ল, পৃথ্বী মল্ল, তপ মল্ল, দীনবন্ধু মল্ল, কানু মল্ল, শূর মল্ল, শিবসিং মল্ল, মদন মল্ল, দুর্জ্জন মল্ল, উদয় মল্ল, চন্দ্র মল্ল ও বীর মল্ল অমিতপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন এই সার্দ্ধ তিন শতাব্দীর কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য এপর্য্যন্ত পাই নাই। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই সার্দ্ধ

তিন শতাব্দীকাল বিষ্ণুপুর-রাজবংশের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতে ঘোর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে; হিন্দু-স্বাধীনতা-হরণকারী পাঠানগণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে প্রায় তিন শত বৎসর ভারত শাসন করিয়া উদীয়মান মোগল-প্রতাপের পদানত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত ভূভাগে পাঠানগণ হতশ্রী হইয়া প্রাচী-সীমান্তে উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালার সিংহাসন ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় পাঠানহস্ত হইতে মোগলহস্তে গিয়াছে।

বাঙ্গালীজাতি তখন নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে এই দুইটি প্রবল জাতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিতেছিল। যাহাদের নির্ব্বাচিত রাজা গোপালের বংশসমুদ্ভূত পাল-নরপতিগণ এক সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহাদের অসিচিহ্ন এক দিন সুদূর কাশ্মীরের দেবমন্দিরে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণ মোগল-পাঠানের মধ্যে কাহার দাস হইবে তাহা মীমাংসার জন্য যখন বাঙ্গালায় বিগ্রহ চলিতেছিল, তখন কেবল মাত্র বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তে মল্লভূমে হিন্দুস্বাধীনতা-সূর্য্যের শেষ রশ্মিমালা অম্লান প্রভা বিকিরণ করিতেছিল। কিন্তু সে রশ্মিচ্ছটা বিগতযাম ঊষার রক্তিমাভা নহে, সন্নিহিত শর্ব্বরীর আগমনপরিচায়ক। বস্তুতঃ মল্লভূপগণ তখনও অপ্রতিহত-প্রভাবে দুর্গম অরণ্যরাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন, মুসলমান-আক্রমণ-ভীতি তাঁহাদিগকে দুর্গসংস্কারে ও রণবলসংগ্রহে মনোযোগী করিয়া অধিকতর বলশালী করিতেছিল।

মহারাজ বীর মল্লের পর তৎপুত্র ধাড়ি মল্ল বা কাউ মল্ল রাজ্য প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র সুপ্রসিদ্ধ বীর হাম্বীর দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহারাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় যুগ। মল্লভূমের পক্ষে এই যুগ যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের কাল। এই সময়ে দুইটি বিশেষ পরিবর্ত্তন মল্লভূমের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠন করিয়া দিয়াছিল। এই যুগে মল্লভূমে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বীর্য্য ও ভক্তির বিনিময়ে স্বাধীনতা বিক্রীত হইয়াছিল। বীর হাম্বীর ও তৎপরবর্ত্তী নৃপতিগণের শাসনবিবরণ শ্রবণ করিলেই উহা বোধগম্য হইবে।

বীর হাম্বীর অতি তেজস্বী যুদ্ধকুশল নৃপতি ছিলেন। হিন্দু সেনাপতি

মানসিংহ যখন পাঠান দমনমানসে বাঙ্গালায় আগমন করেন, তখন বিষ্ণুপুর-অধিপতি বীর হাম্বীরের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। এমন কি, মল্ল-নৃপতি বীর হাম্বীর রক্ষা না করিলে, যুবরাজ জগৎ সিংহ রাইপুরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর নিশ্চয়ই পাঠানহস্তে বন্দী হইতেন। কিন্তু এই মোগল-প্রীতি শীঘ্রই তাঁহাকে বিপদাপন্ন করিয়াছিল। দুই বৎসর পরে যখন পাঠান-গণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল, তখন বীর হাম্বীর তাহাদিগকে সাহায্য না করায়, তাহারা তাঁহার রাজ্যের কতকাংশ ছারখার করিয়াছিল। অবশ্য সুদৃঢ় দুর্গরক্ষিত বিষ্ণুপুর নগর কিংবা অরণ্যান্তর্গত প্রদেশ বিধ্বস্ত হয় নাই, কিন্তু বোধ হয়, কোতুলপুর ও গড়বেতার নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত অরণ্যহীন প্রদেশ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। পদ্মপুর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণরূপে লোক-চক্ষুর অন্তরালে যাইবার ইহাই বোধ হয় অন্যতম কারণ। বীর হাম্বীরের কিছুদিন পূর্ব্বে বা পরে নামমাত্র এক লক্ষ টাকা কর ধার্য্য হইয়া বিষ্ণুপুরে মুসলমান-প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল—কিন্তু বীর হাম্বীরের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাহার পরেই এই সন্ধি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যদিই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতির শাসনসময়ে এই সন্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা যে নামমাত্র অধীনতা এবং বীর হাম্বীর যে বস্তুতঃ স্বাধীন নৃপতির ন্যায় রাজত্ব করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের সত্ত্বগুণাবলম্বী সভ্যতার সহিত অবশিষ্ট জগতের রজোগুণাপেক্ষী সভ্যতার অপূর্ব্ব সম্মিলনের দিন নিকট হইয়া আসিতেছিল। এই অপূর্ব্ব সম্মিলন সংঘটন করাইবার জন্যই বুঝি বিধাতা ভারতের সমস্ত প্রদেশের স্বাধীনতা-দীপ নির্ব্বাপিত করিতেছিলেন—সেইজন্যই বুঝি বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা অধিকদিন রক্ষিত হইল না। বীর হাম্বীরের শাসনকালেই বিষ্ণুপুর-রাজবংশের শৌর্য্যবীর্য্য হীন হইবার সূত্রপাত হয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—যখনই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের পরাভব ঘটে, তখনই তিনি অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ঐ অভয়বাণীর মর্ম্মবোধ করিতে পারি। খৃঃ ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় একবার ঐরূপ শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। ভিন্নজাতি, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অধিকৃত হইলে, তথায় হিন্দুধর্ম্মের অবনতি ঘটিবার বিশেষ

আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক বিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লবের সূচনা করিতেছিল। হিন্দুগণ স্বীয় বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে এবং রাজপুরুষগণের প্ররোচনায় ও অত্যাচারে, রাজপুরুষগণের আচার-ব্যবহারের অনুকরণে প্রণোদিত হইয়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। দলে দলে হিন্দুগণ ঐহিকসুখলাভেচ্ছায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। এই ঘোর দুর্দ্দিন হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ প্রেমাবতাররূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া যে ভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা ঐহিক-সুখসর্ব্বস্ব সভ্যতা হইতে বাঙ্গালাকে রক্ষা করিয়াছিল। প্রেমমাতোয়ারা গোরার প্রেমপ্রবাহে শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়াছিল, নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল, সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে নাচিয়াছিল। সে প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা বিষ্ণুপুরের জঙ্গল রাজ্যে বীর হাম্বীরের পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছিল কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না—তবে বোধ হয় তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্যকে গৌরাঙ্গমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার ভার বিধাতা বীর হাম্বীরের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কোন্ সূত্রে বিষ্ণুপুরে এই পতিতোদ্ধারী মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লিখিত আছে। ভক্তবীর কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন ধামে বসিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখা সমাপ্ত করিলে, তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হইল। নবদ্বীপচন্দ্রের পুণ্যচরিত বঙ্গে প্রকাশিত হইলে, সমগ্র বঙ্গ কিরূপ উল্লাসে মাতিয়া উঠিবে, ভগবদ্ভক্তিপ্রচারে সমগ্র বঙ্গ ধন্য হইবে এই সাত্ত্বিক আশায় কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বৃন্দাবনপ্রবাসী গৌর-সাঙ্গোপাঙ্গগণ কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময় ঘোর দুঃসংবাদ আসিল—বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ পথিমধ্যে পুস্তকলুণ্ঠন করিয়াছে। এ সংবাদে ভক্তের প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, শ্রবণ করুন ;—

"রঘুনাথ, কবিরাজ শুনিলা দুজনে।
আছাড় খাইয়া কান্দে লোটাইয়া ভূমে॥
বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥" (প্রেমবিলাস)

কিন্তু মঙ্গলময় এই অমঙ্গলের মধ্য হইতে বিষ্ণুপুর রাজ্যের কি সুমহৎ মঙ্গল সম্পাদিত করিলেন, তাহা তখন কে বুঝিবে? ধর্ম্মের জন্য চৌর্য্য বীর হাম্বীর

কর্ত্তৃক এই একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয় নাই—বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত মদনমোহন দরিদ্র তেজস্বী ব্রাহ্মণ ধরণীর গৃহ হইতে বীর হাম্বীর কর্ত্তৃকই অপহৃত হইয়া বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আর্ষ রামায়ণে বাল্মীকি—শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, হেড্‌মাষ্টার, রাথুরা বান্ধব হাইস্কুল, বানিরাজুরী পোঃ, ঢাকা, কর্ত্তৃক প্রণীত এবং প্রকাশিত। ৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০ আনা।

রামায়ণ মহাকাব্যে মহাকবি বাল্মীকির কবিত্বশক্তি কিরূপ অসাধারণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, গ্রন্থকার বর্ত্তমান পুস্তকে তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উক্ত মহাকাব্যের সম্পৎসমূহের অন্তরে অন্তরে যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কিরূপে তাহার অনুপ্রেরণা এমন এক মহান্ সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াছে, গ্রন্থকার অতি ওজস্বী ভাষায় এবং বিশদ ভঙ্গীতে তাহাই দেখাইয়াছেন। ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে এই প্রকারের রচনা যথেষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ রচনা অতি বিরল। সুতরাং কবি এবং মহাকবিদের সম্বন্ধে এরূপ নিবন্ধ রচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে কথা এই—প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক দেশের সমাজের যে এক একটি বিশেষত্ব আছে, সেই দেশের এবং সেই সমাজের কবিকে তত্তৎ বিশেষত্বকে কষ্টিপাথর করিয়াই বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত। বর্ত্তমান গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব পরিদৃষ্ট হয়। আলোচনা একটু অতিমাত্রায় বিলাতী-ঘেঁসা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, আমরা পুস্তকখানি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকারের গবেষণা প্রশংসনীয়।
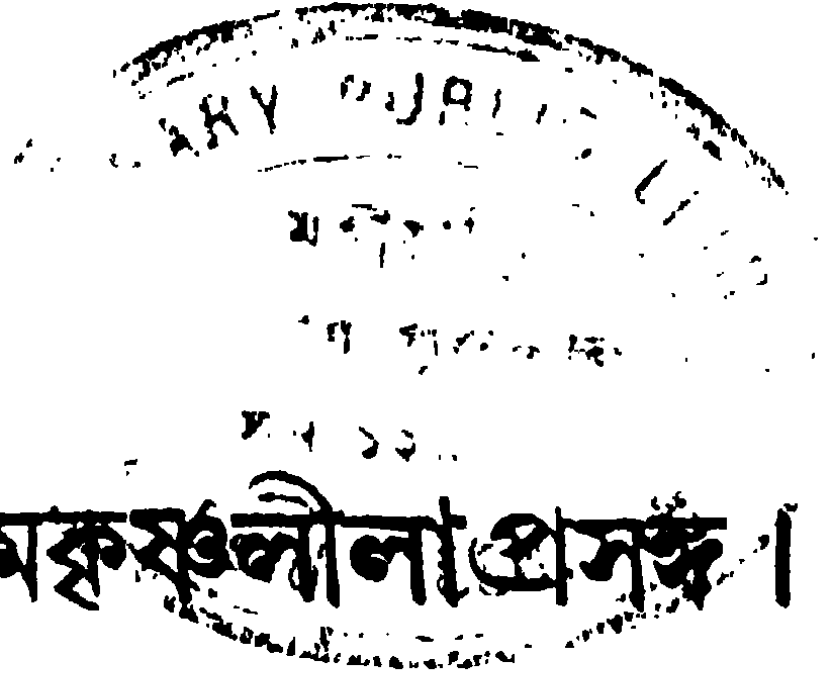
ভারতবাসী—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আট আনা, ডবল ক্রাউন, ৭২ পৃষ্ঠা।

'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে', 'আর্য্য-দর্শন ও সমাজ', 'রামায়ণের শিক্ষা', 'আর্য্যদিগের আদর্শ', 'গীতা', 'ভক্তি', 'প্রেম', 'কয়েকটি অপবাদ খণ্ডন' এবং 'ভারতের আলোক', এই নয়টি সন্দর্ভ উচ্ছ্বাসের বাস্পে ল হইয়া

৭২ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লেখক মহাশয় বিনাইয় বিনাইয়া কখন রোষে, কখন ক্ষোভে, কখন চোখের জলে লুটোপুটি খাইয়া, ভারত-বর্ষকে তাঁহার দেশের লোকের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এ চেষ্টা না করিলেই ভাল হইত।

শোক-সংবাদ।

আমরা অতীব শোক-সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত প্রবীণ সন্ন্যাসিগণের অন্যতম, উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠাতা, কালিফোর্ণিয়ার বেদান্ত-প্রচারক বহুগুণাধার শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীত গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। শরীরত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কোর হিন্দু-টেম্পলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি একদিন সমবেত ভক্তবৃন্দ-সমক্ষে বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাবরা নামক এক ব্যক্তি আসিয়া সহসা তথায় এক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটা ফাটিয় অনেককে আহত করে। ভাবরা নিজে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ভাবরা কেন এই ঘোর দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনও মূল্যস্বরূপে প্রদান করিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই ব্যক্তি বড় অস্থিরচিত্ত ছিল এবং কয়েক বৎসর যাবৎ একটীর পর একটী করিয়া নানা ধর্ম্মমত ও সমিতিতে যোগদান করিয়া আসিতেছিল এবং বৎসরাধিক পূর্ব্বে কিছুদিন হিন্দু-টেম্পলেও ছিল। অনুমান হয়, ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়াই সে ঐরূপ করিয়াছে। বিশেষ যত্নে স্বামী ত্রিগুণাতীতের চিকিৎসা হইতে থাকিলেও, বিষাক্ত বিস্ফোরক দ্রব্যের সংস্পর্শে রক্ত দূষিত হইয়া সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্কানুসারী কর্ম্মবীর কর্ম্মক্ষেত্রেই বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায় জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে মিশনের যে ক্ষতি হইল, তাহা বর্ণনাতীত। বারান্তরে আমরা ইঁহার অপূর্ব্ব জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব।

(স্বামী সারদানন্দ)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুত কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরে কলিকাতার জনসাধারণ ঠাকুরের কথা জানিতে পারিয়াছিল। গুণগ্রাহী কেশব প্রথম দর্শনের দিন হইতেই যে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্য-ভাবে ভাবিত হইলেও তাঁহার হৃদয় যথার্থ ঈশ্বরভক্তিতে পূর্ণ ছিল এবং অমৃতময় ভক্তিরসের একাকী সম্ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং ঠাকুরের পুণ্য দর্শন ও অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাণীতে তিনি জীবনপথে যতই নূতন আলোক দেখিতে লাগিলেন, ততই ঐকথা মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে জানাইয়া, তাহারা সকলেও যাহাতে তাঁহার ন্যায় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সোৎসাহে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেজন্য দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত সমাজের ইংরাজী ও বাঙ্গালা যাবতীয় পত্রিকা, যথা,—সুলভ সমাচার, সানডে মিরর্, থীষ্টিক্ কোয়ার্টার্লি রিভিউ প্রভৃতি—এখন হইতে ঠাকুরের পূত চরিত, সারগর্ভ বাণী ও ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের আলোচনায় পূর্ণ। বক্তৃতা এবং একত্র উপাসনার পরে বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে সম্বোধনপূর্ব্বক উপদেশ-প্রদানকালেও কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম-নেতাগণ অনেক সময়ে ঠাকুরের বাণীসকল আবৃত্তি করিতেছেন। আবার অবসর পাইলেই তাঁহারা কখন দুই চারি জন অন্তরঙ্গের সহিত এবং কখন বা সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত সদালাপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন।

ব্রাহ্ম-নেতাগণের ধর্ম্মপিপাসা ও ঈশ্বরানুরাগ দর্শনে আনন্দিত হইয়া, যাহাতে তাঁহারা সাধনসমুদ্রে এক কালে ডুবিয়া যাইয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষদর্শনরূপ

রত্নলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে পথ দেখাইতে ঠাকুর এখন বিশেষভাবে যত্নপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত হরি-কথা ও কীর্ত্তনে তিনি এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত কেশবের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। ঐরূপে উক্ত সমাজস্থ বহু পিপাসু ব্যক্তির সহিত তিনি ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত কেশব ভিন্ন কোন কোন ব্রাহ্মগণের বাটীতেও কখন কখন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। সিঁদুরিয়া পটির মণিমোহন মল্লিক, মাথাঘসা গলির জয়গোপাল সেন, বরানগরস্থ সিঁতি নামক পল্লীর বেণীমাধব পাল, নন্দনবাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্যক্তি-গণের বাটীতে উৎসবকালে এবং অন্য সময়ে তাঁহার গমনাগমনের কথা এ বিষয়ে উল্লিখিত হইতে পারে। কখন কখন এমনও হইয়াছে যে, বেদী হইতে উপদেশপ্রদানকালে তাঁহাকে সহসা মন্দিরমধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীযুত কেশব উহা সম্পূর্ণ না করিয়াই বেদী হইতে নামিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাণী শ্রবণে ও তাঁহার সহিত কীর্ত্তনানন্দে সেই দিনের উপাসনার উপসংহার করিয়াছেন।

স্ব স্ব সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের সহিতই মানব অকপটে মিলিত হইতে এবং নিঃসঙ্কোচ আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের সহিত তাঁহাকে ঐরূপভাবে মিলিত হইতে এবং আনন্দ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্ম-নেতাগণ যে ঠাকুরকে এখন তাঁহাদিগের ভাবের ও মতের লোক বলিয়া স্থির করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। হিন্দুদিগের শাক্তবৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁহাকে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত ঐরূপে নিঃসঙ্কোচ-ভাবে আনন্দ করিতে দেখিয়া অনেক সময়ে ঐরূপ করিয়াছেন। কারণ, সর্ব্বভাবের উৎপত্তি এবং সমন্বয়ভূমি 'ভাবমুখে' অবস্থিত হইতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর ঐরূপ করিতে পারিতেন, একথা তখন কে বুঝিবে? কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগের সহিত নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান ও কীর্ত্তনাদিতে তন্ময় হইয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহারা যেখানে অন্ধকার দেখিতেছেন সেস্থানে অপূর্ব্ব আলোক সত্য সত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিগণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ

ছিল না। তাঁহারা এ কথাও বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার ন্যায় তন্ময় হইতে না পারিলে, ঐরূপ দর্শন ও আনন্দানুভব কখন সম্ভবপর নহে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থ অনেকগুলি ব্যক্তির সত্যানুরাগ, ত্যাগশীলতা এবং ধর্ম্মপিপাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে নিজ জীবনাদর্শে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণ যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, তিনি তাঁহাদিগকে চিরকাল পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে অকাতরে সাহায্য প্রদান করিতেন। আবার যথার্থ ঈশ্বরভক্তসকলকে ঠাকুর এক পৃথক্ জাতি বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্রে পান-ভোজন করিতে তিনি কখন দ্বিধা করিতেন না। অতএব শ্রীযুত কেশব এবং তাঁহার পার্ষদগণ, যথা,— শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চিরঞ্জীব শর্ম্মা, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণকে তিনি যে এখন পরম স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আধ্যাত্মিক সহায়তা করিতে উদ্যত হইবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্র পান-ভোজনে সঙ্কুচিত হইবেন না, একথা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাব-সহায়ে ইঁহারা যে জাতীয় ধর্ম্মাদর্শ হইতে বহুদূরবিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিলেন এবং অনেক সময়ে সমাজসংস্কারকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের চূড়ান্ত জ্ঞান করিয়া বসিতেছেন, একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি সেজন্য তাঁহাদিগের ভিতর সাধনানুরাগ প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সমাজ তাঁহাদিগের সহিত ঐ পথে অগ্রসর হউক বা নাই হউক, একমাত্র ঈশ্বরলাভকেই তাঁহাদিগকে জীবনোদ্দেশ্য-রূপে অবলম্বন করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে শ্রীযুত কেশব সদলবলে তৎপ্রদর্শিত মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। মধুর মাতৃনামে ঈশ্বরকে সম্বোধন ও তাঁহার মাতৃত্বের উপাসনা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল এবং উক্ত সমাজের সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়ে ঠাকুরের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব সরস করিয়া তুলিয়াছিল। শুদ্ধ তাহা নহে; কিন্তু ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া হিন্দুদিগের যে আদর্শ ও অনুষ্ঠান সকল হইতে ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ করিয়াছিল, সে সকলের মধ্যে

অনেক বিষয় ভাবিবার এবং শিখিবার আছে—উক্ত সমাজের নেতাগণ একথা ঠাকুরের জীবনালোকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত কেশব ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার সকল প্রকার ভাব ও উপদেশ যে যথাযথ বুঝিতে পারিবেন না এবং যাহা বুঝিতে পারিবেন, তাহাও সম্যক্ গ্রহণ করা তাঁহাদিগের রুচিকর হইবে না—এ বিষয় ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপদেশপ্রদানকালে কোন কথা বলিবার পরে ঐ বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি সেজন্য প্রায়ই বলিতেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার 'ল্যাজা মুড়ো' বাদ দিয়া গ্রহণ করিও।" আবার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক ব্যক্তির ঈশ্বরলাভ জীবনোদ্দেশ্য না হইয়া সমাজসংস্কার এবং ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনই ঐ স্থল অধিকার করিয়াছিল—একথাও তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। ঐ বিষয় তিনি অনেক সময়ে রহস্যচ্ছলে প্রকাশও করিতেন। বলিতেন—

"কেশবের ওখানে গিছ্‌লাম। তাদের উপাসনা দেখ্‌লাম। অনেকক্ষণ ভগবদৈশ্বর্য্যের কথাবার্ত্তার পরে বল্লে—'এইবার আমরা তাঁহার (ঈশ্বরের) ধ্যান করি।' ভাব্‌লাম কতক্ষণ না জানি ধ্যান কর্‌বে। ওমা!—দু মিনিট না চোক্ বুজ্‌তে বুজ্‌তেই হয়ে গেল!—এই রকম ধ্যান করে কি তাঁকে পাওয়া যায়? যখন তারা সব ধ্যান কর্‌ছিল, তখন সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম। পরে কেশবকে বল্‌লাম, 'তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখে কি মনে হ'ল জান?—দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখন কখন হনুমানের পাল চুপ করে বসে থাকে, যেন কত ভাল, কিছু জানে না!—কিন্তু তা নয়, তারা তখন বসে বসে ভাব্‌ছে—কোন্ গৃহস্থের চালে লাউ বা কুমড়োটা আছে, কার বাগানে কলা বা বেগুন হয়েছে! কিছুক্ষণ পরেই উ-প্ করে সেখানে গিয়ে পড়ে সেইগুলো ছিঁড়ে নিয়ে উদরপূর্ত্তি করে। অনেকের ধ্যান দেখ্‌লাম ঠিক সেই রকম!'—সকলে শুনে হাস্‌তে লাগ্‌ল।"

ঐরূপে রহস্যচ্ছলে শিক্ষাপ্রদান তিনি আমাদিগকেও করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ আছে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার সম্মুখে ভজন গাহিতেছিলেন। স্বামিজী তখন ব্রাহ্মসমাজে অনেক সময়ে যাতায়াত

করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসনা ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। "সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে" ইত্যাদি ব্রাহ্মসঙ্গীতটী তিনি অনুরাগের সহিত তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে—"ভজন সাধন তাঁর, কর রে নিরন্তর"; ঠাকুর ঐ কথাগুলি স্বামিজীর মনে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য সহসা বলিয়া উঠিলেন—"না, না। বল্—'ভজন সাধন তাঁর, কর রে দিনে দুবার'—কাজে যা কর্‌বিনি, মিছামিছি তা কেন বল্‌বি?" সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, স্বামিজীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।

আর এক সময়ে ঠাকুর উপাসনা-সম্বন্ধে কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা তাঁর (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্য্যের কথা অত ক'রে বল কেন? সন্তান কি তার বাপের সম্মুখে ব'সে 'বাবার আমার কত বাড়ী, কত ঘোড়া, কত গরু, কত বাগ-বাগিচা আছে' এই সব ভাবে? অথবা, বাপ তার কত আপনার, তাকে কত ভালবাসে, এই ভেবে মুগ্ধ হয়? ছেলেকে বাপ খেতে পর্‌তে দেয়, সুখে রাখে, তাতে আর কি হয়েচে? ঈশ্বর ত ঐরূপ নিশ্চয় কর্‌বেন, নইলে সৃষ্টি করেছেন কেন? যথার্থ ভক্ত, সেজন্য তাঁকে আপনার ক'রে নিয়ে, তাঁর উপর আব্‌দার করে, অভিমান করে, জোর ক'রে তাঁকে বলে, 'তোমাকে আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তেই হবে, আমাকে দেখা দিতেই হবে'। অত ক'রে ঐশ্বর্য্য ভাব্‌লে, তাঁকে খুব নিকটে, খুব আপনার ব'লে ভাবা যায় না, তাঁর উপর জোর করা আসে না। তিনি যেন কত মহান্, আমাদের নিকট হ'তে কত দূরে, এইরূপ ভাব আসে। তাঁকে খুব আপনার ব'লে ভাব, তবে ত হবে, তাঁকে পাওয়া যাবে।"

ঈশ্বরলাভের জন্য সাধন-ভজন ও বিষয়বাসনা ত্যাগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা করা ভিন্ন ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ অন্য একটি বিষয়ও জানিতে পারিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের ধর্ম্মপ্রচারকগণের মুখে এবং ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর কখন সাকার হইতে পারেন না। অতএব কোন সাকার মূর্ত্তিতে তাঁহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া পূজোপাসনাদি করায় মহাপাপ হয়। "নিরাকার জল জমিয়া সাকার বরফের ন্যায় নিরাকার সচ্চিদানন্দের ভক্তিহিমে জমিয়া সাকার হওয়া"—

"শোলার আতা দেখিয়া যথার্থ আতা মনে পড়ার ন্যায় সাকার মূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞানে পৌঁছান"—ইত্যাদি প্রতীকোপাসনার কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, 'পৌত্তলিকতা' নামে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা যে কার্য্যটাকে এতদিন নিতান্ত যুক্তিহীন ও হেয় ভাবিয়া আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বলিবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে! তদুপরি যেদিন ঠাকুর অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ বিরাট্ জগতের অভেদ কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের নিকটে প্রতিপাদন করিলেন, সেদিন যে তাঁহারা সাকারোপাসনাকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ-ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিলে, ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের একাংশমাত্রই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ঈশ্বর-স্বরূপকে কেবলমাত্র সাকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করায় যে দোষ হয়, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণময় বলিয়া উঁহাকে নির্দ্দেশ করিলে তদ্রূপ দোষ হয়। কারণ, ঈশ্বর সাকার জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিরাকার সগুণ-ব্রহ্মস্বরূপে জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন, আবার সর্ব্বগুণের অতীত থাকিয়া তুরীয়াবস্থায় সতত অবস্থান করিতেছেন। "ঈশ্বর-স্বরূপের ইতি করিতে নাই—তিনি সাকার, তিনি নিরাকার (সগুণ) এবং তাহা ছাড়া তিনি আরও যে কি—তাহা কে জানিতে—বলিতে পারে?"—ঠাকুরের এই সামান্য উক্তির ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে পাইয়া কেশব-প্রমুখ সকলে সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, একথা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি।

ঐরূপে সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ঠাকুরের পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিবার পর হইতে তিন বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পর্য্যন্ত কেশব-পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পাশ্চাত্য-ভাবের মোহ হইতে দিন দিন বিমুক্ত হইয়া নবীনাকার ধারণ করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকের সাধনানুরাগ সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিল। পরে সন ১২৮৪ সালে, ইংরাজী ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুত কেশব তাঁহার কন্যাকে শ্রীযুক্ত কুচবিহার প্রদেশের মহারাজের সহিত পরিণয়-

সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। বিবাহকালে কন্যার বয়সের যে সীমা ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, কেশব-দুহিতার বয়স তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন থাকায় উক্ত বিবাহ লইয়া সমাজে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং পাশ্চাত্যানুকরণে সমাজসংস্কারপ্রিয়তারূপ শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া এখন হইতে উহা 'ভারতবর্ষীয়' ও 'সাধারণ' নামক দুই ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকিল। ব্রাহ্মসমাজের উপর ঠাকুরের প্রভাব কিন্তু ঐ ঘটনায় নিরস্ত হইল না। তিনি উভয় পক্ষকে সমান আদর করিতে লাগিলেন এবং উভয় পক্ষের পিপাসু ব্যক্তিগণই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক পথে সহায়তা লাভ করিতে লাগিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদলের নেতা শ্রীযুত কেশব এখন হইতে দ্রুতপদে সাধন-মার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন এখন হইতে সুগভীর হইয়া উঠিয়াছিল। হোম, অভিষেক, মুণ্ডন, কাষায়-ধারণাদি স্থূল ক্রিয়াসকলের সহায়ে মানবমন আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম ও উচ্চ স্তরসমূহে আরোহণে সমর্থ হয়, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি ঐ সকলের সময়ে সময়ে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জীবন্ত ভাবময় তনুতে নিত্য বিদ্যমান এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক এক বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রস্রবণ-স্বরূপে নিত্য অবস্থিত—বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগের ভাব যথাযথ উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি কখন একের, কখন অন্যের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার ভেখ ধারণপূর্ব্বক সকল মতের সাধনা করিয়াছিলেন শুনিয়াই যে শ্রীযুত কেশবের পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। ঐরূপে সাধনসমূহের স্বল্পবিস্তর অনুষ্ঠানপূর্ব্বক 'যত মত, তত পথ'রূপ ঠাকুরের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের বিষয় শ্রীযুত কেশব যতদূর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই কুচবিহার-বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে 'নববিধান' আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি উক্ত বিধানের ঘনীভূত মূর্ত্তি জানিয়া কতদূর শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ। আমাদিগের মধ্যে অনেকে দেখিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি 'জয় বিধানের জয়', 'জয় বিধানের

জয়' এই কথা বারংবার উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন। 'নববিধান' প্রচারের প্রায় চারি বৎসর পরে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান না করিলে, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন আরও কত সুগভীর ভাব প্রাপ্ত হইত, তাহা কে বলিতে পারে ?

ঠাকুর শ্রীযুত কেশবকে এতদূর পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন যে, এক সময়ে তাঁহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া, তাঁহার আরোগ্যের নিমিত্ত শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে ডাব, চিনি মানত করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া অতিশয় কৃশ দেখিয়া নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই; পরে বলিয়াছিলেন, "বসরাই গোলাপের গাছে বড় ফুল হইবে বলিয়া মালী কখন কখন উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া উহার শিকড় পর্য্যন্ত মাটি হইতে বাহির করিয়া রোদ ও হিম খাওয়ায়। তোমার শরীরের এই অবস্থা মালী (ঈশ্বর) সেইজন্যই করিয়াছেন।" আবার তাঁহার শেষ পীড়ার অন্তে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার শরীররক্ষার কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া ঠাকুর তিন দিন কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন, "কেশবের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে!" শ্রীযুত কেশবের পরিবারবর্গের স্ত্রীপুরুষ সকলে ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং কখন কখন তাঁহাকে 'কমল-কুটীরে' লইয়া যাইয়া এবং কখন বা দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন। উৎসবকালে তাঁহার সহিত ভগবদালাপ ও কীর্ত্তনাদিতে একদিন আনন্দ করা, কেশব থাকিতে নববিধান-সমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে শ্রীযুত কেশব কখন কখন জাহাজে করিয়া সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেন, এবং ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথীবক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কীর্ত্তনাদি আনন্দে মগ্ন হইতেন।

কুচবিহার-বিবাহ লইয়া বিচ্ছিন্ন হইবার পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী 'সাধারণ' সমাজের আচার্য্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিজয় ইতিপূর্ব্বে সত্যপরায়ণতা এবং সাধনানুরাগের জন্য শ্রীযুত কেশবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। আচার্য্য কেশবের ন্যায় ঠাকুরের পুণ্যদর্শন

লাভের পরে বিজয়কৃষ্ণেরও সাধনানুরাগ বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। ঐ পথে অগ্রসর হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার নানা নূতন আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি ঈশ্বরের সাকার প্রকাশে বিশ্বাসবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্ব্বে শ্রীযুত বিজয় যখন সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন দীর্ঘ-শিখা, সূত্র এবং নানা কবচাদিতে তাঁহার অঙ্গ ভূষিত ছিল; সত্যের অনুরোধে বিজয় সেই সকল একদিনে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদলে যোগদান করিয়াছিলেন। কুচবিহার-বিবাহের পরে সত্যের অনুরোধে তিনি নিজ গুরুতুল্য কেশবকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আবার সেই সত্যের অনুরোধে তিনি এখন তাঁহার সাকার-বিশ্বাস লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মসমাজ হইতে আপনাকে পৃথক্ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার বৃত্তিলোপ হইয়া কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষরূপে কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহাতে কিছুমাত্র অবসন্ন হয়েন নাই। শ্রীযুত বিজয় ঠাকুরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভের কথা এবং কখন কখন অদ্ভুতভাবে তাঁহার দর্শন পাইবার বিষয় * অনেক সময় আমাদিগের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে উপগুরু অথবা অন্য কোন-ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, গয়াধামে আকাশগঙ্গার পাহাড়ে কোন সাধু কৃপা করিয়া নিজ যোগশক্তি-সহায়ে তাঁহাকে সহসা সমাধিস্থ করিয়া দেন ও তাঁহার গুরুপদবী গ্রহণ করেন, একথাও আমরা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঠাকুরের সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার যে অতি উচ্চ ধারণা ছিল, তাহাতে সংশয় নাই এবং ঐবিষয়ে তাঁহার স্বমুখ হইতে আমরা যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা গ্রন্থের অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি। †

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্ হইবার পরে শ্রীযুত বিজয়ের আধ্যাত্মিক গভীরতা দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। কীর্ত্তনকালে ভাবাবিষ্ট

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৫ম অধ্যায়, ২০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৫ম অধ্যায়, ২০৮ পৃষ্ঠা।

হইয়া তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা তাঁহার উচ্চাবস্থার কথা এইরূপ শুনিয়াছি—"যে ঘরে প্রবেশ করিলে লোকের সিদ্ধি ও পূর্ণত্ব লাভ হয়, তাহার পার্শ্বের ঘরে পৌঁছিয়া বিজয় দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত করাঘাত করিতেছে!"—আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভের পরে শ্রীযুত বিজয় অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্র-শিষ্য করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের শরীররক্ষার প্রায় চৌদ্দবৎসর পরে পুরীধামে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

কুচবিহার-বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিশেষ মনান্তর লক্ষিত হইত। এক দলের সহিত অন্য দলের কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উভয় দলের সাধনানুরাগী ব্যক্তিগণ কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, একথার আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুত কেশব ও বিজয় উভয়েই একদিন এই সময়ে নিজ নিজ অন্তরঙ্গগণের সহিত সহসা ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একদল অন্যদলের আসিবার কথা না জানাতেই অবশ্য ঐরূপ হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব-বিরোধ স্মরণ করিয়া উভয় দলের মধ্যে একটা সঙ্কোচের ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। কেশব এবং বিজয়ের মধ্যেও ঐ সঙ্কোচ বিদ্যমান দেখিয়া ঠাকুর সেদিন তাঁহাদিগের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—

"দেখ, ভগবান্ শিব এবং রামচন্দ্রের মধ্যে একসময়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। এখন, শিবের গুরু রাম এবং রামের গুরু শিব—একথা জগতে প্রসিদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধান্তে তাঁহাদিগের পরস্পরে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেতাদির সঙ্গে রামের চেলা বাঁদরগণের আর কখন মিলন হইল না। ভূতে বাঁদরে লড়াই সর্ব্বক্ষণ চলিতে লাগিল। (কেশব ও বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তোমাদিগের পরস্পরে এখন আর মনোমালিন্য রাখা উচিত নহে, উহা ভূত ও বাঁদরগণের মধ্যেই থাকুক্।"

তদবধি শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের পরস্পরের মধ্যে পুনরায় কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল।

শ্রীযুত বিজয় নিজ অভিনব আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলের অনুরোধে সাধারণ সমাজ পরিত্যাগ করিলে, উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার উপর একান্ত বিশ্বাসবান্ ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার সহিত চলিয়া আসিলেন। সাধারণ সমাজ ঐকারণে এই কালে বিশেষ ক্ষীণ হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রীই এখন ঐ দলের নেতা হইয়া সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত শিবনাথ ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ঠাকুরের নিকটে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু বিজয় সমাজ ছাড়িবার পরে শ্রীযুত শিবনাথ বিষম সমস্যায় নিপতিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের উপদেশপ্রভাবেই বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মভাব-পরিবর্ত্তন এবং পরিণামে সমাজ-পরিত্যাগ—একথা অনুধাবন করিয়া তিনি এক্ষণে ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় যাওয়া আসা রহিত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে সাধারণ সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত শিবনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধারণ সমাজে যোগদান করিলেও কিন্তু স্বামিজী মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত কেশবের এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিতেন। স্বামিজী বলিতেন, আচার্য্য শিবনাথকে তিনি এই সময়ে ঠাকুরের নিকটে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘন ঘন গমন করিলে, তাঁহার দেখাদেখি ব্রাহ্মসঙ্ঘের অন্য সকলেও ঐরূপ করিবে এবং পরিণামে উক্ত দল ভাঙ্গিয়া যাইবে। স্বামিজী বলিতেন, ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীযুত শিবনাথ সময়ে সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতে বিরত করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভাবসমাধি প্রভৃতি স্নায়ুদৌর্ব্বল্য হইতে উপস্থিত হইয়াছে!—অত্যধিক শারীরিক কঠোরতার অভ্যাস করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে!

সে যাহা হউক, ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মসঙ্ঘে যে সাধনানুরাগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে নববিধান এবং সাধারণ উভয় সমাজের পিপাসু ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে যাহাতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এরূপভাবে জীবনগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গলাভের পর, সমাজের আধ্যাত্মিক ভাব-পরিণতি

কিরূপ ও কতদূর হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইঁহাকে দেখিবার আগে আমরা ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা কি বুঝিতাম?—কেবল গুণ্ডামি করিয়া বেড়াইতাম। ইঁহার দর্শন লাভের পরে বুঝিয়াছি, যথার্থ ধর্ম্মজীবন কাহাকে বলে।" শ্রীযুত প্রতাপের সঙ্গে সেদিন আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্ম্মা ওরফে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালও উপস্থিত ছিলেন।

নববিধান-সমাজে ঠাকুরের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হইলেও সাধারণ সমাজে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যতদিন বিদ্যমান ছিলেন, ততদিন উহা স্বল্প দেখা যাইত না। শ্রীযুত বিজয়ের সহিত অনেকগুলি ধর্ম্মপিপাসুর পরিত্যাগের পর হইতেই উক্ত সমাজে ঐ প্রভাব হ্রাস হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া সমাজসংস্কার, দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতির অনুষ্ঠানেই আপনাকে প্রধানতঃ নিযুক্ত রাখিয়াছে। হ্রাস হইলেও উক্ত প্রভাব যে একেবারে লুপ্ত হয় নাই, তাহার নিদর্শন সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসে, বেদান্ত-চর্চ্চায় এবং প্রেততত্ত্বাদির (Spiritualism) অনুশীলনে দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাঙ্গের কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের বৈদিক মতের অনুশীলনও যে সাধারণ সমাজস্থ কোন কোন ব্যক্তি করিয়া থাকেন এবং ধ্যানাদিসহায়ে শারীরিক ব্যাধি নিবারণের চেষ্টা করেন, এবিষয়ও আমরা জ্ঞাত হইয়াছি।

নববিধান-সমাজের আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্ম্মা ব্রাহ্মসঙ্গীতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায়, ঠাকুরের নানাপ্রকার দর্শন, ভাব ও সমাধি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠভাবোদ্দীপক পদগুলি রচনায় সক্ষম হইয়াছেন। ঐরূপ কয়েকটি পদের প্রথম লাইনের আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

(১) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
(২) গভীর সমাধি-সিন্ধু অনন্ত অপার।
(৩) চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে।
(৪) চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
(৫) আমায় দে মা পাগল ক'রে।

সুকবি আচার্য্য চিরঞ্জীব ঐরূপ পদসকল রচনার দ্বারা সমগ্র বঙ্গবাসীর এবং দেশের সাধককুলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখিয়াই যে তিনি ঐ সকল পদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতেও সংশয় নাই। আচার্য্য চিরঞ্জীব সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে আমরা ঠাকুরকে অনেক সময় সমাধিস্থ হইতে দেখিয়াছি।

ঐরূপে ব্রাহ্মসমাজ এইকালে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপের উপাসনা উক্ত সমাজে যে ভাবে প্রচারিত হয়, তাহাকে ঠাকুর কখন কখন 'কাঁচা নিরাকার ভাব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও * যথার্থ বিশ্বাসের সহিত ঐভাবে উপাসনা করিলে সাধক ঈশ্বরলাভে সমর্থ হয়েন—একথা তাঁহার মুখে আমরা বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। কীর্ত্তনান্তে ঈশ্বর ও তাঁহার সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণকে প্রণাম করিবার কালে তিনি 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম' বলিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীকে প্রণাম করিতে কখন ভুলিতেন না। উহাতেই বুঝা যায়, ভগবদিচ্ছায় ঈশ্বরলাভের জন্য জগতে প্রচারিত অন্য সকল মত বা পথের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকেও তিনি এক পথ বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিতেন। তবে পাশ্চাত্য ভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলী যাহাতে যথার্থ আধ্যাত্মিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল; এবং সমাজসংস্কারাদি কার্য্যসকল প্রশংসনীয় এবং অবশ্যকর্ত্তব্য হইলেও, ঐ সকল কার্য্য যাহাতে তাঁহাদিগের সমাজে মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনভজনাদি হেয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিতেন। ব্রাহ্মসমাজই ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অনুশীলন করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের চিত্ত দক্ষিণেশ্বরে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তিলাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকে ঐ বিষয়ের জন্য নববিধান ও সাধারণ উভয় ব্রাহ্মসমাজের নিকটেই চিরঋণে আবদ্ধ। বর্ত্তমান লেখক আবার তদুভয় সমাজের নিকটে শতগুণে সহস্রগুণে অধিকতর ঋণী। কারণ, উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে আধ্যাত্মিকভাবে চরিত্রগঠনে তাহাকে ঐ সমাজদ্বয়ই সাহায্য করিয়াছিল।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

অতএব, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মমণ্ডলী বা সমাজরূপী ত্রিরত্নকে স্বরূপতঃ এক জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি এবং অধ্যায়ের উপসংহারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের আনন্দ করা সম্বন্ধে যে দুইটি বিশেষ চিত্র স্বচক্ষে দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই পাঠককে উপহার দিতেছি।

(ক্রমশঃ)

দেববাণী।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহম্মদ দেখ্‌লেন, খৃষ্টধর্ম্ম সেমিটিক ভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আর ঐ সেমিটিক ভাবের মধ্যে থেকেই খৃষ্টধর্ম্মের কিরূপ হওয়া উচিত, উহার যে এক ঈশ্বরে মাত্র বিশ্বাস করা উচিত—এইটীই তাঁর উপদেশের বিষয়। 'আমি ও আমার পিতা এক'—এই আর্য্যোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, ঐ উপদেশে তিনি ভয় খেতেন। প্রকৃতপক্ষে মানব হতে নিত্য পৃথক্ জিহোবা-সম্বন্ধীয় দ্বৈত ধারণা হতে ত্রিত্ববাদের মত অনেক উন্নত। যে সকল ভাবশৃঙ্খলার পারম্পর্য্যে ক্রমশঃ ঈশ্বর ও মানবের একত্ব-জ্ঞান এনে দেয়, অবতারবাদ তাদের গোড়ার পাবস্বরূপ। লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজন মানবের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারপর দেখে, বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, অবশেষে দেখ্‌তে পায়, তিনি সব মানুষের ভিতর রয়েছেন। অদ্বৈতবাদ সর্ব্বোচ্চ সোপান—একেশ্বরবাদ তদপেক্ষা নিম্নতর সোপান। বিচারযুক্তির চেয়েও কল্পনা তোমায় শীঘ্র ও সহজে সেই সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে।

অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা করুক, আর সমগ্র জগতের জন্য ধর্ম্ম জিনিসটাকে রক্ষা করুক। 'আমি জনকরাজার মত নির্লিপ্ত' বলে ভাণ করো না। তুমি জনক বটে, কিন্তু মোহের বা অজ্ঞানের জনকমাত্র। অকপট হয়ে বল, 'আমি আদর্শ কি বুঝ্‌তে পারছি

বটে, কিন্তু এখনও আমি তার কাছে এগুতে পার্‌ছি না।' কিন্তু বাস্তবিক ত্যাগ না করে ত্যাগ কর্‌বার ভাণ করো না। যদি বাস্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে ঐ ত্যাগকে ধরে থাক। লড়াইয়ে এক শ' লোকেরও পতন হ'ক না, তবু তুমি ধ্বজা উঠিয়ে নাও ও এগিয়ে যাও। যেই পড়ুক না কেন, তা সত্বেও ঈশ্বর সত্য। যাঁর যুদ্ধে পতন হবে, তিনি ধ্বজা অপরের হস্তে সমর্পণ করে যান—সে সেই ধ্বজা বহন করুক। ধ্বজা কখন পড়্‌তে পারে না।

*　　*　　*　　*

বাইবেলে আছে, প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর যা কিছু তা তোমাতে জুড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, আমি যখন ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার হলাম, তখন আবার অপবিত্রতা, অশুচিতা আমাতে জুড়ে দেবার কি দরকার? বরং আমি বলি, প্রথমেই স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর বাকি যা কিছু সব চলে যাক্। তোমাতে কিছু বাড়ার ভাগ আসুক, এ অন্বেষণ করো না, বরং ঐগুলোকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেই খুসী হও। ত্যাগ কর, আর জেনো যে, তুমি নিজে দেখ্‌তে না পেলেও তার ফল এক সময়ে না না এক সময়ে ফল্‌বেই। যীশু বারটী জেলে শিষ্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ অল্প ক'টী লোকেই প্রবল রোমক সাম্রাজ্য ওলট পালট করে দিয়েছিল।

ঈশ্বরের বেদীতে, পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, তাই বলিস্বরূপে অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন করেন না, তাঁর চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি ঢের ভাল। একজন ত্যাগীকে দেখ্‌লেও তার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে লাভ কর্‌ব—কেবল তাঁকেই চাই—এই বলে দৃঢ়পদে দাঁড়াও, দুনিয়া উড়ে যাক্; ঈশ্বর ও সংসার—এই দুইএর মধ্যে কোন আপোষ কর্‌তে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, তা হলেই কেবল তুমি দেহবন্ধন হতে মুক্ত হতে পার্‌বে। আর ঐরূপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি আজাদ্ বা মুক্ত হলে। মুক্ত হও। শুধু দেহের মৃত্যুতে আমাদিগকে কখনও মুক্ত কর্‌তে পারে না। বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ কর্‌তে হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের পক্ষে আর পুনর্জ্জন্ম হবে না।

সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার করতে হবে, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। সূর্য্যকে দেখবার জন্য আর মশালের দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও উহা সত্য—ঐ সত্য ধরে থাক।

ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি করা সহজ—তাইতেই সাধারণ লোককে আকর্ষণ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু নেই।

"যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন।"

* * * *

৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার।

'আমি' না থাকলে বাইরে 'তুমি' থাকতে পারে না। এই থেকে কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমাতেই বাহ্য জগৎ রয়েছে—আমা ছাড়া উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। 'তুমি' কেবল 'আমাতেই' রয়েছ। অপরে আবার ঠিক উহার বিপরীত তর্ক করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, 'তুমি' না থাকলে 'আমার' অস্তিত্ব প্রমাণই হতে পারে না। তাঁদের পক্ষে যুক্তির বলও সমান। এই উভয় মতই আংশিক সত্য—খানিকটা সত্য, খানিকটা মিথ্যা। দেহ যেমন জড় ও প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত, চিন্তাও তদ্রূপ। জড় ও মন উভয়ই একটা তৃতীয় পদার্থে অবস্থিত—এক অখণ্ড বস্তু আপনাকে দুভাগ করে ফেলেছে। এই এক অখণ্ড বস্তুর নাম আত্মা।

সেই মূল সত্তা যেন 'ক', সেইটেই মন ও জড় উভয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। দৃষ্ট জগতে এর গতি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে হয়ে থাকে, তাদেরই আমরা নিয়ম বলি। অখণ্ড এক সত্তা হিসাবে উহা মুক্ত-স্বভাব, বহু হিসাবে উহা নিয়মের অধীন। তথাপি এই বন্ধন সত্ত্বেও আমাদের ভিতর একটা মুক্তির ধারণা সদা বর্ত্তমান রয়েছে, আর এরই নাম নিবৃত্তি, অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করা। আর বাসনাবশে যে সব জড়ত্ববিধায়িনী শক্তি আমাদিগকে সাংসারিক কার্য্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে, তাদেরই নাম প্রবৃত্তি।

সেই কাযটাকেই নীতিসঙ্গত বা সৎকর্ম্ম বলা যায়, যা আমাদিগকে জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। তার বিপরীত যা, তা অসৎকর্ম্ম। এই জগৎ-প্রপঞ্চকে অনন্ত বোধ হচ্চে, কারণ, এর মধ্যে সব জিনিষই চক্রগতিতে চলেছে; যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই ফিরে যাচ্ছে। বৃত্তের রেখাটা চল্‌তে চল্‌তে আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, সুতরাং এখানে—এই সংসারে—কোনখানে বিশ্রাম বা শান্তি নেই। এই সংসাররূপ বৃত্তের ভিতর থেকে আমাদিগকে বেরুতেই হবে। মুক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র গতি।

*　　　*　　　*　　　*

মন্দের কেবল আকার বদ্‌লায়, কিন্তু তার গুণগত কোন পরিবর্ত্তন হয় না। প্রাচীনকালে 'জোর যার মুল্লুক তার' ছিল, এখন চালাকি সেই স্থান অধিকার করেছে। দুঃখকষ্ট আমেরিকায় যত তীব্র, ভারতে তত নয়; কারণ, এখানে গরিব লোকে নিজেদের দুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেশী প্রভেদ দেখ্‌তে পায়।

ভাল মন্দ এই দুটো অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—একটাকে নিতে গেলে আর একটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিসমষ্টি যেন একটা হ্রদের মত—ওতে যেমন তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক তদনুযায়ী একটা পতনও আছে। সমষ্টিটা সম্পূর্ণ এক—সুতরাং এক জনকে সুখী করা মানেই আর এক জনকে অসুখী করা। বাইরের সুখ জড় সুখমাত্র, আর উহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং এক কণা সুখও পেতে গেলে, তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না নিয়ে পাওয়া যায় না। কেবল যা জড়জগতের অতীত সুখ, তা কারও কিছু হানি না করে পাওয়া যেতে পারে। জড় সুখ কেবল জড় দুঃখের রূপান্তরমাত্র।

যারা ঐ তরঙ্গের উত্থানাংশে জন্মেছে ও সেইখানে রয়েছে, তারা—তার পতনাংশটা, আর তাতে কি আছে, তা দেখ্‌তে পায় না। কখনও মনে করো না, তুমি জগৎকে ভাল ও সুখী কর্‌তে পার। ঘানির বলদ তার সাম্‌নে বাঁধা গাছকতক খড় পাবার জন্য চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতে কোন কালে পৌঁছুতে পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে

মাত্র। আমরাও এইরূপে সদাই সুখরূপ আলেয়ার অনুসরণ কর্‌ছি—সেটা সর্ব্বদাই আমাদের সাম্‌নে থেকে সরে যাচ্ছে—আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ঘোরাচ্ছি। এইরূপ ঘানি টান্‌তে টান্‌তে আমাদের মৃত্যু হল, তার পরে আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে। যদি আমরা অশুভকে দূর কর্‌তে পার্‌তুম, তা হলে আমরা কখনই কোন উচ্চতর বস্তুর আভাস পর্য্যন্ত পেতুম না; আমরা তা হলে সন্তুষ্ট হয়ে থাক্‌তুম, কখনও মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা কর্‌তুম না। যখন মানুষ দেখ্‌তে পায়, জড়জগতে সুখের অন্বেষণ একেবারে বৃথা, তখনই ধর্ম্মের আরম্ভ। মানুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্ম্মের অঙ্গমাত্র।

মানবদেহে ভালমন্দ এমন সামঞ্জস্য করে রয়েছে যে, মানুষের এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ কর্‌বার ইচ্ছার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুক্ত যে, সে কোন কালেই বদ্ধ হয় নি। মুক্ত কি করে বদ্ধ হল, এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যেখানে কোন বন্ধন নাই, সেখানে কার্য্য-কারণভাবও নাই। "আমি স্বপ্নেতে একটা শেয়াল হয়েছিলাম, আর একটা কুকুর আমায় তাড়া করেছিল।" এখন আমি কি করে প্রশ্ন কর্‌তে পারি যে, কেন কুকুর আমায় তাড়া করেছিল? শেয়ালটা স্বপ্নেরই একটা অংশ, আর কুকুরটাও ঐ সঙ্গে আপনা হতেই এসে জুটল; কিন্তু দুইই স্বপ্ন, এদের বাহিরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ই আমাদের এই বন্ধন অতিক্রম কর্‌বার সহায়স্বরূপ। তবে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে যে, ওটা বিজ্ঞানের চেয়ে পবিত্র। এক হিসাবে পবিত্রও বটে, কারণ, ধর্ম্ম নীতি বা চারিত্র্যকে তার একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না।

"পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ, তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন কর্‌বেন।" জগতে যদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লোপ হয়ে যায়, তথাপি এই একমাত্র বাক্যই সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচিয়ে দেবে। অন্তরের এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। বিশ্বরূপ সমগ্র সঙ্গীতে এই পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিত্রতায় কোন বন্ধন নাই। পবিত্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে

দাও, তা হলেই আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা জান্তে পার্‌ব, আমরা কোন কালে বদ্ধ হই নি। নানাত্বদর্শনই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ—সমুদয়কেই আত্মারূপে দর্শন কর ও সকলকেই ভালবাস। ভেদভাব সব একেবারে দূর করে দাও।

* * * *

পশুপ্রকৃতি লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘার মত আমার দেহেরই একটা অংশ। তাকে ওষুধ যত্ন করে ভাল করে তুল্‌তে হবে। দুষ্টলোককেও সেইরূপ ক্রমাগত সাহায্য কর্‌তে থাক, যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ ও সুখী হচ্ছে।

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততক্ষণ আমাদের বিশ্বাস কর্‌বার অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক জগতের বস্তু দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক সেই রকমে সাহায্যও হতে পারে। এই সাহায্যের ভাবটাকেই বিচার করে পৃথক করে নিলে যে জিনিষ দাঁড়ায়, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর বল্‌তে আমাদের এই ধারণা আসে যে, আমরা যত প্রকার সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপ।

যা কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সারসমষ্টিস্বরূপ। ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত। আমরা যখন নিজেদের আত্মারূপে ভাবি, তখন আমাদের কোন দেহ নাই, সুতরাং 'আমি ব্রহ্ম, বিষেও আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে না,' এই কথাটাই একটা স্ববিরোধী বাক্য। যতক্ষণ আমাদের দেহ রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমরা দেখ্‌ছি, ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি হয় নি। নদীটারই যখন লোপ হল, তখন তার ভিতরের ছোট আবর্ত্তটা কি আর থাক্‌তে পারে? সাহায্যের জন্য কাঁদ দেখি, তা হলেই সাহায্য পাবে—আর অবশেষে দেখ্‌বে, সাহায্যের জন্য কান্নাও চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যদাতাও চলে গেছেন—খেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকি রয়েছেন কেবল আত্মা।

একবার এইটী হয়ে গেলে ফিরে এসে, যেমন খুসী, খেলা কর। তখন আর এই দেহের দ্বারা কোন অন্যায় কায হতে পারে না;

কারণ, যতদিন না আমাদের ভিতরের কুপ্রবৃত্তিগুলা সব পুড়ে যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাভ হবে না। যখন ঐ অবস্থা লাভ হয়, তখন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে—"জ্যোতিরিব অধূমকম্" ও "দগ্ধেন্ধনমিবানলম্"।

তখন প্রারব্ধ আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তার দ্বারা তখন কেবল ভাল কাযই হতে পারে, কারণ, মুক্তিলাভ হবার পূর্ব্বে সব মন্দ চলে গেছে। চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরবার সময় তার প্রাক্তন কর্ম্মের ফললাভ কর্‌লে। * সে নিশ্চিত পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিল, তার পর সে যোগভ্রষ্ট হওয়াতে তাকে জন্মাতে হয়; তার আবার পতন হওয়াতে তাকে পরজন্মে চোর হতে হয়েছিল। কিন্তু ভূতকালে সে যে শুভকর্ম্ম করেছিল, তার ফল ফল্‌ল। তার মুক্তিলাভ হবার যখন সময় হল, তখনই তার যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা হল আর তাঁর এক কথায় সে মুক্ত হয়ে গেল।

বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ, সে ব্যক্তি তাঁকে এত দ্বেষ কর্‌ত যে, ঐ দ্বেষবশে সে সর্ব্বদা তাঁর চিন্তা কর্‌ত। ক্রমাগত বুদ্ধের চিন্তায় তার চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাভ কর্‌বার উপযুক্ত হয়েছিল। অতএব সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তা দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

* * *

[ইহার পরদিন স্বামিজী সহস্রদ্বীপোদ্যান (Thousand Island Park) ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্কে চলিয়া যান; সুতরাং এই উপদেশাবলি এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল।]

* যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ কর্‌বার সময় সেই সঙ্গে আর একজন চোরকেও ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল—সে যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করে তাঁর কৃপায় মুক্ত হয়ে গেল—বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত আছে। ঐ ব্যক্তি তার পূর্ব্ব কর্ম্মফলেই যীশুখ্রীষ্টের কৃপা লাভ করেছিল।

শ্রেয় ও প্রেয়।

আমাদের মধ্যে এমন কম লোকই আছেন, যাঁহারা জীবনে একাধিকবার প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন যে, জগতে শ্রেয় ও প্রেয় এ দুইটী একমার্গগামী, নহে। শ্রেয় বলিতে যাহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে, তাহাই বুঝায়; এবং প্রেয় শব্দের অর্থ যাহা আমাদের ভাল লাগে। এখন, যাহা আমার ভাল লাগিবে, তাহাই যে আমার কল্যাণপ্রদ হইবে, এমন ত কোন কথা নাই। হয়ত কোন কোন স্থলে এরূপ হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এরূপ হইবার আশা কম। বালক জ্বরে ভুগিতেছে, কিন্তু লুকাইয়া মুখরোচক কুপথ্যগুলি একে একে আত্মসাৎ করিতেছে—অথচ সে জানে, উহাতে তাহার জ্বর বাড়িবে বই কমিবে না। যুবক ও বৃদ্ধের সম্বন্ধেও ঐরূপ উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। সুতরাং শ্রেয় ও প্রেয় এই দুইটী শব্দের অর্থ বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না—এইরূপ আশা করা যায়।

মানবেতর প্রাণিজগতে কিন্তু শ্রেয় ও প্রেয় এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান বা দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয় না। তাহারা একমাত্র প্রেরণায়ই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে—উহাকে শ্রেয় বলিতে হয় বল, প্রেয় বলিতে হয় বল। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মানবের মত উন্নত নহে। মানব নিজ প্রাধান্যের ষোল আনা সদ্ব্যবহার করিয়া ইতর প্রাণীর চেষ্টাদিকে সহজাত সংস্কার (instinct)-প্রসূত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। এই সহজাত-সংস্কার বা instinct তাহাকে যে দিকে লইয়া যায়, যন্ত্রচালিতবৎ সে সেই দিকেই গিয়া থাকে। তাহার উহাকে রোধ করিবার সামর্থ্য নাই—সে সম্পূর্ণ স্বভাবের বশ। প্রকৃতিদেবী তাহাকে যেরূপে ইচ্ছা চালাইতেছেন, গড়িয়া পিটিয়া তুলিতেছেন, বা অযোগ্য বিবেচনা করিলে সমগ্র জাতিটীকেই জগৎ হইতে অপসারিত করিতেছেন। এইরূপে কতকগুলি প্রাণী ধীরে ধীরে অপর সকলের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, এবং যাহার মধ্যে যে পরিমাণে এই instinct বিকাশ পাইতেছে, সে সেই পরিমাণে "যোগ্য" বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাণিগণ যে এইরূপে প্রকৃতিদেবীর ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মরিতেছে, উহাতে তাহাদের একটী বিশেষ সুবিধা হইতেছে। প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক জড়ই বলুন আর যাহাই বলুন,

প্রকৃতি কিন্তু কখনও ভুল করেন না, ধীর স্থির গতিতে সন্তানতুল্য জীবনিচয়কে তাহাদের প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যান। ইতর প্রাণীর মধ্যে ইন্দ্রিয়শক্তি এত প্রবল ও এত সূক্ষ্ম যে, উহাদের আর মানুষের মত হিসাব করিয়া কাজ করিতে হয় না। কোথায় মধু-ভরা ফুল আছে, তাহা মধুমক্ষিকা আপনা হইতেই অভ্রান্তভাবে জানিতে পারিবে, এবং দক্ষিণে বামে না বাঁকিয়া সোজা তাহারই দিকে চলিয়া যাইবে। আবার বহু দূরে গিয়া পড়িলেও নিজ চক্রে ফিরিয়া আসিবে। ইহাকে বুদ্ধি না বল, হানি নাই। কিন্তু মানুষ ঐরূপ অবস্থায় কিরূপ করিত, তাহা প্রণিধানযোগ্য। শতকরা ৯৯ জন লোক যে ঐরূপ অবস্থায় বিফলমনোরথ হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হয়ত সহজাত সংস্কার বা instinct বুদ্ধির নিম্নতর অবস্থা, হয়ত বা উচ্চতর অবস্থা—কিন্তু ইহা সত্য যে, কার্য্যফল তুলনা করিলে বুদ্ধি সহজাত সংস্কারের কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। মোটের উপর প্রকৃতির হস্তে নিজ নিজ জীবনভার সমর্পণ করিয়া দিয়া ইতর প্রাণিগণের লাভ বই লোকসান নাই। এও এক রকম "বকলমা দেওয়া"; এবং শিশু যেমন মাকে পাইয়া মায়ের ক্রোড়ে থাকিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে, ইহারাও সেইরূপ। মানুষ নিজের হাতে নিজ পরিচালন-ভার লইয়া অনেক বিষয়ে সুবিধা পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার যে অংশে সে ইতর প্রাণিগণের সমধর্ম্মী, সে অংশে তাহার এই স্বায়ত্ত শাসনে কিছুই লাভ ঘটে নাই, একথা নিশ্চিত।

এখন দেখা যাউক, মানবের এই শ্রেয় ও প্রেয়-রূপ দ্বন্দ্বের মূল কোথায়। আমরা দেখিতে পাই, চিন্তাশীল মানব স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রশ্নের আলোচনা ও ইহার সমাধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মৃত্যুর পরপারে কি আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, যমরাজ বালক নচিকেতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে নির্ভীক বালকের বীরোচিত প্রত্যাখ্যানে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উত্তর দিবার প্রারম্ভেই নচিকেতার ত্যাগের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

অর্থাৎ—শ্রেয় এক জিনিস, প্রেয় আর এক জিনিস। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন, মানুষকে এই দুয়ের মধ্য হইতে কর্ত্তব্য বাছিয়া লইতে হয়। তন্মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়; আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন। যমরাজের এই উক্তিই শ্রেয় ও প্রেয়ের ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তুমি ইন্দ্রিয়সুখ চাও, না শাশ্বত শান্তি চাও? আপাত-মনোরম বর্ত্তমান চাও, না অপেক্ষাকৃত কষ্টসঙ্কুল কিন্তু নিশ্চিত-কল্যাণপ্রদ ভবিষ্যৎ চাও? যেরূপ কামনা কর, তাহাই পাইবে। অনিত্য সুখ চাও, অনিত্য সুখই পাইবে; নিত্যানন্দ চাও, তাহাও পাইবে। এখন নির্ব্বাচনের ভার তোমার উপর।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা হইতেই এই নির্ব্বাচন কত কঠিন ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রেয় ইন্দ্রিয়জ সুখ বলিয়া অতি নিকটে, হাতের কাছে রহিয়াছে; কিন্তু শ্রেয় অত শীঘ্র ফলদান করে না। আবার প্রেয়োজনিত সুখ ক্ষণপ্রভার ন্যায়, অতি উজ্জ্বল, কিন্তু নিমিষমাত্রস্থায়ী; শ্রেয়ের ফল অত তীব্র নয়, উহা দেবমন্দিরের ঘৃতপ্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতির ন্যায়। উহাতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিয়া দেয়। একটী, বিষয়-মদিরোন্মত্ত মানবমনকে আরও উন্মাদগ্রস্ত করিয়া তুলে; অপরটী, শান্তির অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে। সুতরাং যে যেরূপ প্রকৃতির লোক, সে সেইরূপ পথই বাছিয়া লইবে। সুতরাং যাহার মধ্যে পশুভাব প্রবল, সে পশুর ন্যায় instinctএর—সহজাত সংস্কারের—বশে চালিত হইবে। পশুর ধর্ম্মই ত ঐ—সে বর্ত্তমানের প্রেরণার বাহিরে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। পূর্ব্বাপর চিন্তা করা তাহার প্রকৃতিতে নাই, যেমন বাসনার উদয় হওয়া, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত করা—ইহাই পশুধর্ম্ম। কিন্তু মানব বিচারপরায়ণ জীব, চিন্তাপূর্ব্বক কার্য্য করাই তাহার স্বভাব। কি সামান্য কার্য্যে, কি কঠিন ব্যাপারে, সে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। যদি কোন কার্য্য তাহার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহার জন্য দায়ী নহে—উহা non-moral, আমরা মোটামুটি এরূপ বলিতে পারি যে, সুস্থাবস্থায় এবং নিদ্রিত না হইলে মানুষের প্রতিকার্য্য তাহার বিচারশক্তির সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহার মধ্যে এই মানবত্ব বা বিচারবুদ্ধির

প্রাধান্য যত অধিক, সে ততই ঐ instinctকে বিচারের সাহায্যে ওজন করিয়া, উহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া তবে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইবে। যদি উহা ভাল হয়, যদি উহাতে তাহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, তবেই সে উহাকে প্রশ্রয় দিবে, উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবে। আর, যদি উহা তাহার অযোগ্য হয়, যদি উহা তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে চাহে, তাহা হইলে সে উহাকে দমন করিয়া স্থিরভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করে।

সুস্থ-মানব-মনে সাধারণতঃ এইরূপই ঘটিয়া থাকে। যদি কোথাও ইহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কোথাও কোন অন্যায্য বাসনা প্রশ্রয় পায়, যদি দেখিতে পাও—কেহ উক্ত বাসনাকে অসৎ জানিয়াও তাহার রোধকল্পে কোন চেষ্টা করিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে—উক্ত ব্যক্তি তাহার বহুমানাস্পদ মানবত্বরূপ সিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিতেছে। আবার, এমন অনেক সময় আসে, যখন এই বাসনা প্রকৃত-পক্ষে অসৎ হইলেও আপনাকে সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে, অসত্য সত্যের মুখোস পরিয়া উপস্থিত হয়; তখনই বিপদ্ গুরুতর। যখন ভোগ ত্যাগের বেশে উপস্থিত হয়, যখন স্বার্থপরতা আত্মত্যাগের ভাণ করে, তখনই প্রকৃত বীরের পরীক্ষাস্থল উপস্থিত হয়। ফরাসীভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ভিক্টর হিউগোর অমর লেখনীমুখে এই দ্বন্দ্ব অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার লে মিজেরাব্‌ল্ (Les Miserables) নামক গ্রন্থের "মাথার মধ্যে ঝড়" ("Tempest in a Brain")-শীর্ষক পরিচ্ছেদটী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাইয়াছেন। মানবের বিশ্লেষণশক্তি বুঝি বা ঐ অধ্যায়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অপর এক ব্যক্তি আমার জন্য প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে—সম্ভবতঃ সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ—অন্ততঃ যে প্রাণদণ্ডে আমার দণ্ডিত হওয়া উচিত ছিল, বিধির বিড়ম্বনায় অপর একজন সেই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে চলিয়াছে—এরূপ অবস্থায় মানবের সমগ্র মনুষ্যত্ব উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকে—যাও, এখনি গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া উহাকে বাচাও—নির্দ্দোষের জীবন-বিনিময়ে নিজ পাপজীবন ক্রয় করিও না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার

জিজীবিষা বলবতী হইয়া কত প্রলোভন দেখাইতে থাকে—কানে কানে আসিয়া বলে,—কি করিতেছ? তোমার এরূপ নাম, তুমি এতগুলি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তোমাকে লোকে ঘৃণাক্ষরেও প্রাণদণ্ডার্হ বলিয়া সন্দেহ করিবে না—কেন আগ বাড়াইয়া নিজ মরণ ডাকিয়া আনিতেছ? শত যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া দুষ্টবুদ্ধি তোমায় বুঝাইয়া দিবে—তুমি ত এখন আর পাপী নহ, তোমার দ্বারা কত উপকার হইতেছে—কেন অকারণ প্রাণ দিতে যাইতেছ? সে ব্যক্তিকে তুমি ত ধরাইয়া দাও নাই? যখন সে ঘটনাচক্রে তোমার জীবনপথের একমাত্র কণ্টকটা উঠাইয়া ফেলিতেছে, তখন তাহাতে বাধা দাও কেন? তুমি বাতুল নাকি? আর "বাধা-বিপত্তি" (Difficulties)-শীর্ষক অধ্যায়ে যখন আমরা দেখিতে পাই—সে ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াও কিরূপে গ্রন্থের নায়ক মাদিলীন প্রত্যেক নূতন নূতন বিঘ্নকে যেন নিজ জীবনরক্ষারই ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতেছেন—কিন্তু প্রত্যেক বারেই শেষে দেবভাবই জয়ী হইতেছে, এবং যখন দেখি—পরিশেষে সমস্ত বাধা দূরে ঠেলিয়া বীরহৃদয় মাদিলীন ধর্ম্মাধিকরণে আপনাকেই দোষী ব্যক্তি বলিয়া অকাট্য প্রমাণ দিলেন—তখন আনন্দে, বিস্ময়ে অধীর হইয়া আমরা বলিতে বাধ্য হই—ধন্য কবি—ধন্য তোমার প্রতিভা! শ্রেয় ও প্রেয়ের সংগ্রাম সাহিত্যক্ষেত্রে অমন দক্ষতার সহিত আর কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি?

আপাত-মধুরের এই আকর্ষণ কেন? কেন মানুষ জানিয়া শুনিয়া ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়সুখের জন্য 'লালায়িত হয়? যাহা লাভ করিলে মানুষ আর অন্য কিছু চাহে না, তাহার জন্য এতটুকু অপেক্ষা করিতে কেন সে অপারক হয়? তাহার উত্তর—মানবের জন্মজন্মান্তরাগত সংস্কাররাশি। বহুদিন ধরিয়া কোন কিছু অভ্যাস করিলে, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা সেই অভ্যাসানুবর্ত্তী কাজ করিতে বাধ্য হই। শুধু কয়েক দিনের অভ্যাসেরই যদি এই বল, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, বহু জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মজনিত সংস্কাররাশির কি ভীষণ প্রতাপ! পুনঃ পুনঃ এবং দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যবিষয়ের প্রতীতিমাত্রই প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য সদা উন্মুখ হইয়া আছে। বুদ্ধি উহার মধ্যে ক্রিয়া করিবার অবসর পায় না।

মানুষ হইলে কি হয়, ওরূপ স্থলে আমরা সহজাত সংস্কারেরই—instinct-এরই দাস হইয়া থাকি, এবং মনে করি—পরমপুরুষার্থ লাভ করিলাম! স্থিরভাবে এই বদ্ধমূল সংস্কারপুঞ্জের প্রভাব চিন্তা করিলে হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয়; মনে হয়, তাইত, আমি ভাল হইতে চাহিলেও ইহারা আমায় সবলে অন্যদিকে—ভোগের দিকেই লইয়া যাইবে! মানুষ যে অসদ্বস্তুকে অসৎ বলিয়া জানিয়াও ছাড়িতে চাহে না, তাহাতেই নিশ্চেষ্টভাবে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহার এই জড়তা দর্শন করিলে মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—তবে কি কখনও আমাদের মনে প্রেয়কে ছাড়িয়া শুধু শ্রেয়কেই কামনা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে না? আমাদের প্রেয় কি কখনও শ্রেয়ে পর্য্যবসিত হইবে না? কখনও কি আমাদের ইচ্ছা ভুলিয়াও শ্রীভগবানের বিরাট্ ইচ্ছার সহিত এক হইয়া যাইবে না?

শ্রুতি এবং আপ্তবাক্য ইহার উত্তরে বলেন, অবশ্যই হইবে। প্রত্যেকের জীবনে এমন একদিন আসিবেই আসিবে, যেদিন তাহার অন্তরাত্মার বাণীই তাহার নিকট প্রবলতম হইবে। একদিন না একদিন মানব শুধু শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া নয়, আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই তুচ্ছ বিষয়ের আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইবে, আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া শ্রীভগবানের ক্রীড়াপুত্তলিমাত্র হইয়া থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। তখন তাহার আর কোন তুচ্ছ বস্তুতে লোভ থাকিবে না। "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।"—ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহার বাসনাসমূহ এককালে ক্ষয় পাইবে এবং সে নিত্যানন্দপদবীতে আরোহণ করিবে। ইহাই শাস্ত্রোক্ত পরমহংস অবস্থা—যে অবস্থায় মানবীয় দেহে স্বয়ং ঈশ্বরই বিরাজ করিতে থাকেন, যে অবস্থায় আরূঢ় হইয়া মানব বলিতে পারে,—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

—'আমি তমসের পরপারে অবস্থিত এই মহান্ আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। যাইবার অন্য পথ নাই।" ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমেরিকায় স্বামিজী।

(Inspired Talks গ্রন্থের মিস্ ওয়াল্ডো-লিখিত ভূমিকার অনুবাদ।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই উপরতলার বারান্দাটী আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; কারণ, স্বামিজীর সকল সান্ধ্য কথোপকথন এই স্থানেই অনুষ্ঠিত হইত। বারান্দাটী প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকটা স্থান ছিল। উহার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল, এবং উহা বাড়ীখানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস্ ডি—উহার পশ্চিমাংশটী একটী পর্দ্দা দিয়া সযত্নে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে সকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারান্দা হইতে তত্রত্য অপূর্ব্ব দৃশ্যটী দেখিবার জন্য তথায় প্রায়ই আগমন করিতেন, তাঁহারা আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। এইখানেই আমাদের অবস্থানকালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্য্যদেব তাঁহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটী যেন সত্যসত্যই একটী পুণ্যনিকেতন ছিল। পাদনিম্নে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি হরিৎসমুদ্রের মত আন্দোলিত হইত; কারণ, সমগ্রস্থানটী ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। সুবৃহৎ গ্রামটীর একখানি বাড়ীও তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন অন্তরে কোন নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষশ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেণ্টলরেন্স নদী; তদ্বক্ষে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এই সকল এত দূরে বিদ্যমান ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। আমাদের এই নির্জ্জন স্থানে জনকোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীটসমূহের অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর

কাকলি, অথবা পত্রাভ্যন্তরচারী পবনের মৃদু মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্যটীর কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত, এবং নিম্নের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত। এই গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে আমরা আচার্য্যদেবের সহিত সাতটী সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয়রাজ্যের বার্ত্তাসমন্বিত অপূর্ব্ব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম—তখন আমরাও জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জগৎও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন সান্ধ্য-ভোজন-সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দাটীতে গমন করিয়া আচার্য্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না; কারণ, আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভ্যস্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। এক অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী রজনীতে (সেদিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রাস্ত হইয়া গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামিজীও যেন ঠিক তদ্রূপই জানিতে পারেন নাই।

এই সকল কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই। তাহারা শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে। এই সকল দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্ম্মানুভূতিসকল লাভ করিতাম, তাহা আমাদিগের কেহই ভুলিতে পারিবেন না। স্বামিজী ঐ সকল সময়ে তাঁহার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দিতেন; ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের নেত্রগোচর হইত; তাঁহার গুরুদেবই যেন সূক্ষ্মশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদের নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন, এবং সমুদায় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময়ে স্বামিজী যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন;—তখন আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি—এই ভয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দাটীর

সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেন। এই সকল সময়ে তিনি যেরূপ কোমলপ্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কখনও নহে; তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়ত অনেকটা তদনুরূপই ব্যাপার—তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাব-মুখে কথা কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ শুধু শুনিয়া যাইতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্ম্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম। স্বামিজী মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও, এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কখনও মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিসটী হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন, এবং এক মুহূর্ত্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামিজী পৌরাণিক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আর্য্যগণ অপেক্ষা কোন জাতির মধ্যেই এত অধিকপরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি আমাদিগকে ঐ সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অনুভব করিতেন এবং আমরাও শুনিতে ভালবাসিতাম; কারণ, তিনি কখনও, এই সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান্ ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ আবিষ্কার করিয়া দিতে বিস্মৃত হইতেন না। কোন ভাগ্যবান্ ছাত্রমণ্ডলী এরূপ প্রতিভাবান্ আচার্য্যলাভে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না, সন্দেহ।

আশ্চর্য্য কাকতালীয় ন্যায়ে ঠিক দ্বাদশজন ছাত্রী ও ছাত্র 'থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে' স্বামিজীর অনুগমন করিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেইজন্যই তিনি আমাদিগকে এরূপ দিবারাত্র প্রাণ

খুলিয়া, তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল, তাহাই শিক্ষা দিতেন। এই বারজনের সকলেই এক সময়ে একত্র হন নাই, ঊর্দ্ধসংখ্যায় দশজনের অধিক কোন এক সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের মধ্যে দুইজন পরে 'থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে'ই সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ন্যাসের সময় স্বামিজী আমাদিগের পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং অবশিষ্ট কয়জন পরে নিউইয়র্ক নগরে স্বামিজীর তত্রত্য অপর কয়েকজন শিষ্যের সহিত একসঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে' গমনকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একযোগে বাস করিব; প্রত্যেকেই গৃহকর্ম্মের নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শান্তিভঙ্গ হইতে পারিবে না। স্বামিজী স্বয়ং একজন পাকা রাঁধুনি ছিলেন, এবং আমাদের জন্য প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার গুরুদেবের দেহান্তের পরে যখন তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সেবা করিতেন, সেই সময়েই তিনি রন্ধনকার্য্য শিখিয়াছিলেন। এই যুবকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া, যাহাতে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারিত সত্যসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া দিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার গুরুদেব কর্তৃক আরব্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্য্যগুলি শেষ হইবামাত্র (অনেক সময়ে তাহার পূর্ব্বেই) স্বামিজী আমাদিগকে, যে বৃহৎ বৈঠকখানাটীতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, তথায় সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রতিদিন তিনি কোন একটী বিশেষ বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষৎ বা ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র প্রভৃতি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। বেদান্তসূত্রে বেদান্তর্গত মহাসত্যগুলি যতদূর সম্ভব স্বল্পাক্ষরে নিবদ্ধ আছে। তাহাদের কর্ত্তা ক্রিয়া কিছুই নাই, এবং সূত্রকারগণ প্রত্যেক অনাবশ্যক পদ পরিহার করিতে এত আগ্রহান্বিত থাকিতেন যে, হিন্দুগণের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, সূত্রকার বরং তাঁহার একটী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার সূত্রে একটী অতিরিক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তুত নহেন।

অত্যন্ত স্বল্পাক্ষর—প্রায় হেঁয়ালির মত—বলিয়া বেদান্তসূত্রগুলিতে ভাষ্যকারগণের মাথা খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব এই তিন জন হিন্দু মহাদার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন। প্রাতঃকালের কথোপকথনগুলিতে স্বামিজী প্রথমে এই ভাষ্য-গুলির কোন একটী লইয়া, তৎপরে আর একটী, এইরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, এবং দেখাইতেন, কিরূপে প্রত্যেক ভাষ্যকার তাঁহার নিজ মতানুযায়ী সূত্রগুলির কদর্থ করার অপরাধে অপরাধী, এবং যাহা তাঁহার নিজ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করিবে, নিঃসঙ্কোচে সেইরূপ অর্থই সেই সূত্রের মধ্যে ঢকাইয়া দিয়াছেন! জোর করিয়া মূলের কদর্থ করা রূপ কদভ্যাস কত পুরাতন, তাহা স্বামিজী আমাদিগকে প্রায়ই দেখাইয়া দিতেন।

কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোন দিন বা মধ্ববর্ণিত শুদ্ধ দ্বৈতবাদ আবার কোন দিন বা রামানুজ-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইত। কিন্তু শঙ্করের অদ্বৈতমূলক ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাখ্যাত হইত। তবে শঙ্করের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চুল-চেরা বিচার আছে বলিয়া উহা সহজবোধ্য ছিল না, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত রামানুজই ছাত্রগণের মনের মত ব্যাখ্যাকার রহিয়া যাইতেন।

কখনও কখনও স্বামিজী নারদীয় ভক্তিসূত্র লইয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এই সূত্রগুলিতে ঈশ্বরভক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে, এবং উহা পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ ধারণা হয়—হিন্দুদের প্রকৃত, সর্ব্বগ্রাসী, আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিরূপ—সে প্রেম সত্য সত্যই সাধকের মন হইতে অপর সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া, তাহাকে ভূতে পাওয়ার মত পাইয়া বসে! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যভাব লাভ করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়; এ উপায় ভক্তগণের স্বভাবতঃই ভাল লাগে। ঈশ্বরকে—কেবল তাঁহাকেই—ভালবাসার নামই ভক্তি

এই কথোপকথনগুলিতেই স্বামিজী সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের নিকট তাঁহাকে মহান্ আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন,—কিরূপে স্বামিজী দিনের পর দিন তাঁহার সহিত কাল কাটাইতেন, এবং কিরূপে তাঁহাকে নিজ নাস্তিক মতের দিকে ঝোঁক দমন করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হইত, এবং উহা যে সময়ে সময়ে তাঁহার গুরুদেবকে সন্তাপিত করিয়া তাঁহাকে কাঁদাইয়াও ফেলিত—এই সকল কথা বলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, স্বামিজী একজন মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহার কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন, এবং তিনি কে, তাহা জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিতেন যে, উক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে স্বামিজীকে শুধু ভারতেরই কল্যাণের জন্য নহে, কিন্তু অপর দেশসমূহের জন্যও কোন একটী বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "বহু দূরে আমার আরও সব শিষ্য আছে; তাহারা এমন সব ভাষায় কথা কহে, যাহা আমি জানি না।"

'থাওজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে' সাত সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিয়া স্বামিজী নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পরে অন্যত্র ভ্রমণে বাহির হইলেন। নভেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিতে এবং ছাত্রগণকে লইয়া ক্লাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় পুনরায় ক্লাস আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত সাঙ্কেতিকলিখনবিৎকে (stenographer) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে স্বামিজীর উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাইয়াছিলেন। এই ক্লাসের বক্তৃতাগুলি কিছুদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে নিবদ্ধ তাঁহার সাধারণসমক্ষে বক্তৃতাগুলিই আজি স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রচারকার্য্যের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট, মুদ্রিত পৃষ্ঠা-গুলিতে স্বামিজীকে যেন আবার সজীব বলিয়া বোধ হয় এবং তিনি যেন তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, এইরূপ মনে হয়। তাঁহার বক্তৃতা-গুলি যে এরূপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্য কৃতিত্ব একজনের —যিনি পরে স্বামিজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই কার্য্য নিষ্কামপ্রেমপ্রসূত ছিল, সুতরাং ঐ কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল।

নিউইয়র্ক, ১৯০৮।

(সমাপ্ত

মল্লভূমি ও মল্লভূপগণ।

(শ্রীঅহীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল্)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কবিরাজ কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে নিদারুণ শোকবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অন্যান্য ভক্তবীরগণ, শোকের প্রথম বেগ অপগত হইলে, পুস্তক উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে রাজসভায় আগমন-বিবরণ আমরা দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"গোস্বামিগণকৃত গ্রন্থগুলি হারাইয়া শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় বীর হাম্বীরের সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, শোকবিহ্বল শ্রীনিবাসের অন্য জ্ঞান নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তিনি নিস্পন্দ ; সভায় ব্যাসাচার্য্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। দেবরূপী দর্শকের অপূর্ব্ব অবয়ব দর্শনে ভক্তিভরে বীর হাম্বীর প্রণত হইলেন ; সভাস্থলীতে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তৃত হইল ; তাঁহার আগমনের কারণ কি—প্রশ্ন হইল, কিন্তু অসহ্য দুঃখে কাতর শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন, "ভাগবতপাঠ সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।" সেই দুঃখের সময়েও ভক্তিপূরিত চিত্তে দাঁড়াইয়া তিনি ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন। যেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নিস্রোত বহিতেছিল, কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ঋজু হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গ অন্তর্দাহের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করিল না। কি সুন্দর ভাগবতে ভক্তি! কি সুন্দর সভাসৌষ্ঠবকারী উজ্জ্বল বিনয়! শ্রীনিবাস আচার্য্য অনুরুদ্ধ হইয়া ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। শোকাকুলস্বরে, ভক্তিমাখা কণ্ঠের আবেগে, অসাধারণ পাণ্ডিত্যসহকারে শ্রীনিবাস যখন ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীর হাম্বীর, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলে তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে সভামণ্ডপ প্লাবিত হইল, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে বনবিষ্ণুপুর স্বর্গপুর হইয়া উঠিল।"

বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে জীবন নিয়োজিত করিলেন। এই ঘটনার পর বীর হাম্বীরের আর কোনও বীর্য্যগৌরব শ্রবণ করা যায় না।

তিনি অসি পরিত্যাগ করিয়া খোল করতাল ধরিলেন,—আবার সময়ে সময়ে অসিও ধারণ করিতেন। তাঁহার রচিত পদাবলীও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে শ্রীনিবাস-নিয়োজিত হইয়া রাজা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইলেন—শ্রীনিবাসও বীর হাম্বীর-প্রদত্ত ধনসম্পৎ গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপুররাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই খেতুড়ির সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম মল্লভূমে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। 'স্বনামধন্য বৈষ্ণব ভক্তগণের মধ্যে করুণাময় দাস, প্রসাদ দাস, মনোহর দাস প্রভৃতি অনেকের মাতৃভূমি মল্লভূমি ছিল। এই সময় হইতে বিষ্ণুপুর রাজ্যে মহা উৎসাহে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। বিষ্ণুপুর নগরে বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল; অভিনব মন্দিরসকল নির্ম্মিত হইয়া দিন দিন উহার শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র দেব, দ্বিজ ও অতিথিসেবার নিমিত্ত বিস্তর ভূসম্পত্তি মল্লনৃপতিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় এতদিন রাজ্যরক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল, এখন হইতে তাহা দেবসেবায় ও ধর্ম্মোৎসবে নিয়োজিত হইল। বস্তুতঃ বীর হাম্বীরের সময়কে মল্লনৃপতিগণের অবনতির আরম্ভের ও মল্লভূমবাসিগণের ধর্ম্মোন্নতির যুগ বলা যাইতে পারে।'

"বীর হাম্বীরের পর তৎপুত্র ধাড়ী হাম্বীর ৬ বৎসর রাজত্ব করেন—বোধ হয়, তিনিই প্রথম মুসলমান-প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

তৎপরে বীর হাম্বীরের অন্যতম পুত্র স্বনামখ্যাত রঘুনাথ সিংহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন—বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ "জোড় বাঙ্গলা" তাঁহারই আদেশে নির্ম্মিত হয়। শ্যামরায় ও কালাচাঁদের মন্দিরদ্বয়ও তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৎপরে তৎপুত্র বীর সিংহ রাজা হন। তিনি লালজির মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন ও তদীয় মহিষী মদনগোপাল ও মুরলীমোহনের মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

মদনমোহনের বর্ত্তমান মন্দির বীর সিংহের পুত্র রাজা দুর্জ্জন সিংহের রাজত্বকালে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

তৎপুত্র রঘুনাথ সিংহ সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি শোনা যায়। এখানে সে সমস্ত উল্লেখ করিবার স্থানাভাব। তিনি অতি তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় মল্লনৃপতিবংশের শৌর্য্যগৌরব তাঁহার দ্বারা ক্ষণিকের জন্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গ-বিখ্যাত শোভা সিংহ যখন স্বাধীনতা-কামী হইয়া সমগ্র রাঢ় জয় করিয়াছিলেন, তখন জঙ্গল রাজ্যের অধিপতি রঘুনাথ সিংহ অতি দক্ষতার সহিত বিষ্ণুপুর নগর রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং লোকললামভূতা সতীশিরোমণি বর্দ্ধমানাধিপ-দুহিতার ছুরিকাঘাতে কামবিমূঢ়-চিত্ত শোভা সিংহ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পর, রঘুনাথ সিংহ শোভা সিংহের রাজ্য চেতুয়া ও বরদা পরগণাদ্বয় অধিকার করিয়া লয়েন।

ইহাই মল্লনৃপতিগণের শেষ বিজয়গৌরব। যদিও বীর হাম্বীরের পর হইতে মল্লনৃপতিগণ মুসলমান-প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তথাপি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অধীনতাপাশে বদ্ধ হন নাই—অর্দ্ধস্বাধীন করদ রাজা বলিয়াই তাঁহারা নবাব-দরবারে পরিচিত ছিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যাপারে মুসলমানগণ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এমন কি, রঘুনাথ সিংহের শাসনকালে যখন মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সমগ্র বাঙ্গালাকে চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, তখন বিষ্ণুপুরের জঙ্গল-রাজ্য উক্ত বন্দোবস্তের মধ্যে পড়ে নাই। অবশ্য মল্লরাজ্যের পূর্ব্বাংশ বা খণ্ডঘোষ, ইন্দাস ও কোতুলপুর থানা ইতিপূর্ব্বেই সম্যগ্রূপে মুসলমানা-ধিকৃত হইয়াছিল।

রঘুনাথ সিংহের পর মহারাজ গোপাল সিংহ রাজা হইলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। প্রবাদ যে, তাঁহার রাজ্যের সমস্ত প্রজাকেই দিনান্তে হরিনাম করিতে হইত—না করিলে, তিনি দণ্ডবিধান করিতেন। "গোপাল সিংহের বেগার" নামক কথাটি আজিও মল্লভূমের সকলের নিকট সুপরিচিত। বোধ হয়, গোপাল সিংহ সিংহাসন গ্রহণ না করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেই, তাঁহার, বিষ্ণুপুর-রাজবংশের ও মল্লভূপবাসিগণের সমূহ মঙ্গল হইত। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। রঘুনাথ সিংহের সময় পর্য্যন্ত মল্লনৃপতিগণ কোনও প্রকারে স্বীয় বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তেজস্বী অর্দ্ধস্বাধীন জমিদাররূপে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বল গোপাল

সিংহের সময় হইতে চূড়ান্ত অধঃপতন আরম্ভ হইল। বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ফতেপুর মহল অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে বর্গীরা রাজ্য ছারখার করিবার চেষ্টা করিতেছে, ওদিকে মহারাজ গোপাল সিংহ সঙ্কীর্ত্তন লইয়া মাতিয়া আছেন। ভাস্কর পণ্ডিত কাটোয়ার নবাবসৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পঞ্চকোট রাজ্য দিয়া পলায়ন করিবার সময় বিষ্ণুপুরের নিকট ছাউনি ফেলিয়া নগর অবরোধ করিলেন। সকলে নগর রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় সৈন্য, সচিব ও নগরবাসিগণের প্রতি এক অদ্ভুত রাজ-আদেশ হইল—যেন কেহ বর্গীদের বাধা দিবার চেষ্টা না করে। যাহা হউক, সে যাত্রা রাজমন্ত্রীর বুদ্ধিকৌশলে ও বঙ্গবিখ্যাত কামান "দলমর্দ্দনে"র সাহায্যে বিষ্ণুপুরনগরবাসিগণের ধনপ্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত চন্দ্রকোণাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বিষ্ণুপুর নগর দুর্ভেদ্য গড় ও ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা রক্ষিত থাকিয়া পরিত্রাণ পাইলেও, সমগ্র মল্লরাজ্য বর্গীদের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। তাহারা লুণ্ঠন ও অত্যাচারে মল্লভূমির গ্রাম ও নগরসমূহ ছারখার করিয়াছিল।

গোপাল সিংহের পর কৃষ্ণ সিংহ কয়েকমাস রাজত্ব করেন। তৎপরে চৈতন্য সিংহ রাজা হন। এদিকে মারাঠাগণ পুনঃ পুনঃ রাঢ়ভূমি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মল্লভূমিকে বর্গী-বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার সাহস ও উদ্যম চৈতন্যসিংহের ছিল না—তিনিও গোপাল সিংহের ন্যায় ভীরু, দুর্ব্বল ও তথাকথিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। কামানের সাহায্যে কোনও প্রকারে রাজধানী রক্ষা হইত—কিন্তু রাজধানী রক্ষা হইলেই রাজ্য রক্ষা হয় না। মল্লভূমির গ্রাম ও নগরসমূহ ধ্বংস হইতে লাগিল। অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয়ে দলে দলে প্রজাগণ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ বর্দ্ধমান, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল। যখন রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হন, তখন সর্ব্বপ্রকারে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। প্রজাদিগের এই অবস্থা—ওদিকে ধার্ম্মিক রাজা গৃহবিবাদে মাতিয়া উঠিলেন। জ্ঞাতিভ্রাতা দামোদর সিংহ সিরাজুদ্দৌল্লার সাহায্যে সৈন্যবল লাভ করিয়া বিষ্ণুপুর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। সে যাত্রা বিষ্ণুপুরের সর্ব্বেসর্ব্বা ছত্রপতি কমল বিশ্বাস দামোদরকে পরাস্ত করিয়া চৈতন্য সিংহকে রক্ষা

করিলেন। কিন্তু এ বালুকার বাঁধে অধঃপতনের প্রবল বেগ রুদ্ধ হইল না। শীঘ্রই দামোদর নবীন নবাব মীরজাফরের সৈন্যসাহায্যে পুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলেন। চৈতন্য সিংহ বড় নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন, যুদ্ধ হাঙ্গামা ভালবাসিতেন না—তিনি বুদ্ধিমানের মত মদনমোহন বিগ্রহটিকে সঙ্গের সাথী করিয়া কলিকাতা আসিয়া ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তখন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বড় প্রতাপ। জমিদারগণ সকলে তাঁহার নিকট সন্ত্রস্ত। চৈতন্য সিংহ তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন—কিন্তু রাজসচিবের সাহায্য বিনামূল্যে লাভ হয় না। এদিকে চৈতন্য সিংহের অর্থ নাই—কি করেন, তখন ধার্ম্মিক চৈতন্য সিংহ প্রভূত অর্থের বিনিময়ে সেই বিষ্ণুপুর-গৌরব, বিষ্ণুপুরবাসিগণের হৃদয়ের ধন, বিষ্ণুপুর-দুলাল মদনমোহনকে গোকুল মিত্রের নিকট বন্ধক রাখিলেন। চৈতন্য সিংহ পুনরায় রাজা হইলেন।

বিপদের উপর বিপদ্। বর্গীর আক্রমণে রাঢ়ের প্রজাগণ নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার উপর অনাবৃষ্টিতে ও অজন্মায় দেশে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস করালবদন বিস্তার করিয়া রাঢ়বাসিগণকে গ্রাস করিতে লাগিল। অসংখ্য প্রজা কালকবলে পতিত হইল। দেশে হাহাকার উঠিল। এদিকে চৈতন্য সিংহ তখনও গৃহবিবাদে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন—দামোদর সিংহের সহিত মোকদ্দমায় জড়িত। প্রজারক্ষার অবকাশ ও সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। প্রজাসংখ্যা নিতান্ত কমিয়া যাওয়ায়, দুর্ভিক্ষের পরও দেশে কৃষকের অভাবে সুচারুরূপে ফসল উৎপন্ন হইতে পারিল না। পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থান শস্যশ্যামল ছিল, ক্রমে তাহা ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইল। সুতরাং রাজস্ব একেবারে কমিয়া গেল। গ্রাম আছে, প্রজা নাই—আবাদী জমি আছে, ফসল উৎপন্ন করিবার লোক নাই—কে রাজস্ব দেয়? এদিকে কোম্পানী বাহাদুর দিন দিন করবৃদ্ধি করিতেছেন। সে ভীষণ করভার বিষ্ণুপুরের দরিদ্র রাজবংশ সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৮০৬ খৃঃ বাকি খাজনার দায়ে রাজ্য নিলামে বিক্রীত হইল। একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে আদিমল্ল যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, চৈতন্য সিংহের সময় তাহার জমিদারি স্বত্বটুকুও লোপ পাইল। এখন হইতে বিষ্ণুপুরের নৃপতিগণ ভূমিশূন্য রাজা হইলেন।

চৈতন্য সিংহের পর মদনমোহন সিংহ, মাধব সিংহ গোপাল সিংহ, রামকৃষ্ণ সিংহ ও তাঁহার পোষ্যপুত্র নীলমণি সিংহ ক্রমান্বয়ে রাজা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পেন্সনজীবী হইয়াও মল্লভূমবাসিগণের নিকট যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন।

(সমাপ্ত)

আয়ুষ্মান্ নন্দের উপাখ্যান।

(পালি গল্প)

(শ্রীগোকুলদাস দে)

ভগবান্ বুদ্ধদেব গয়াধামে নির্ব্বাণলাভের পর বারাণসীতে আসিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। তথায় কিছুদিন বাস করিবার পর তিনি রাজগৃহে আগমন করিয়া তত্রস্থ বেলুবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদন এই সংবাদ পাইয়া, পুত্রকে লইয়া আসিবার জন্য সানুচর দশটী দূত ভগবানের নিকট প্রেরণ করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের অগ্রে যাইতে আদেশ করিয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্ব্বাণমার্গের ব্যাখ্যা করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন এবং ত্রিকালজ্ঞ অর্হৎ কালুদায়ী থের কর্ত্তৃক কপিলপুরে নীত হইলেন।

তিনি রাজপুরে আসিবামাত্রই জ্ঞাতি পুরবাসীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল। তিনি তথায় 'পুষ্কর জাতক' ও 'বেশ্মান্তর জাতক' বিবৃত করিলেন। পরদিবস যখন তিনি ভিক্ষার জন্য বহির্গত হন, তখন "উত্তিট্‌ঠে ন পমজ্জেয়্য" ("উঠ, অলস হইও না" ইত্যাদি) এই গাথা দ্বারা উপদেশ দান করিয়া পিতাকে স্রোতাপত্তি-ফলে অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রথম সোপানে অধিষ্ঠিত করিলেন। পুনরায় "ধম্মং চরে" ("সদ্ধর্ম্ম আচরণ করিবে" ইত্যাদি) এই গাথা বলিয়া তাঁহার মাতৃষ্বসা এবং বিমাতা মহাপ্রজাপতি গোতমীকে স্রোতাপত্তি-ফলে ও পিতাকে সকদাগমী ফলে অর্থাৎ ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে আহারাদি সমাপন করিয়া স্বীয় পত্নী রাহুল-মাতা যশোধরার প্রশংসাচ্ছলে 'চন্দ্রকিন্নর জাতক' বর্ণন করিলেন।

পরদিন ভগবান্ বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকুমারের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ, বিবাহমঙ্গলাদি কার্য্য উপস্থিত হইল। ভগবান্ বুদ্ধ পিণ্ড অর্থাৎ ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্য বাহির হইবার সময় কুমারের হস্তে ভিক্ষার পাত্র অর্পণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কুমার তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত 'পাত্র ফিরাইয়া লউন' একথা বলিতে পারিলেন না এবং 'এই স্থলে লইবেন,' 'এই স্থলে লইবেন' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে এক ঘটনা উপস্থিত হইল। জনপদকল্যাণী নামে এক শাক্য-কুল-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, এইরূপ পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। তাহাকে সকলে বলিল, "ভগবান্ বুদ্ধ নন্দকুমারকে তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঠে লইয়া যাইতেছেন।" সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বিকীর্ণকেশে অশ্রু-সিক্তনয়নে তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি শীঘ্র ফিরিয়া আসুন।" এই বাক্য নন্দের হৃদয়ে শেলের মত আঘাত করিল। কিন্তু হইলে কি হইবে, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না পুত্তলিকার ন্যায় ভগবানের সহিত বিহার বা মঠে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রব্রজ্যা লইবে ?" তিনি, ইচ্ছা না থাকিলেও, ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি সম্মান হেতু 'না' বলিতে পারিলেন না ; পরন্তু বলিলেন, "হাঁ, প্রব্রজ্যা লইব।" শাস্তা (শাস্তা ভগবান্ বুদ্ধের একটী নাম) বলিলেন, "উত্তম, নন্দকে প্রব্রজ্যা দেওয়া হউক," এবং এক বয়োজ্যেষ্ঠ বহুদর্শী ভিক্ষু দ্বারা তাঁহার প্রব্রজ্যা-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। কপিলপুরে আগমনের তৃতীয় দিবসে শাস্তা নন্দকুমারকে এই প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

* * * *

সপ্তম দিবসে মাতা যশোধরা কুমার রাহুলকে অলঙ্কৃত করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বিদায়কালে বলিয়া দিলেন, "বৎস, এই বিংশতি-সহস্র-ভিক্ষু-পরিবৃত কষিত-কাঞ্চন-কান্তি সন্ন্যাসী তোমার পিতা। ইঁহার অনেকগুলি সুমহান্ নিধি ছিল ; ইঁহার গৃহত্যাগের পর হইতে সেগুলি দেখিতে পাইতেছি না। তুমি যাও ; গিয়া তোমার প্রাপ্যবস্তু চাহিয়া লও। বলিবে, আমি রাজকুমার ; অভিষিক্ত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইব ; আমার ধনের প্রয়োজন, আমাকে ধন দিন্ ; যেহেতু পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী।"

কুমার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আসিবা-মাত্রেই পিতার প্রতি স্নেহবশতঃ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, "হে সন্ন্যাসি-প্রবর! আপনার ছায়া সুখকর" এই বলিয়া আরও অনেক আপনার অনুরূপ বাক্য বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান্ আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বুদ্ধদিগের রীতি অনুযায়ী শুদ্ধোদনাদি সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া রাজ-প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কুমারও মাতার আদেশমত "হে সন্ন্যাসি-প্রবর! আমার প্রাপ্য দিউন, আমার প্রাপ্য দিউন" বলিতে বলিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না এবং পরিজনবর্গও তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিতে পারিল না। এইরূপে তাঁহারা বিহারে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ ভাবিলেন, "এ যে পিতৃসম্পত্তি চাহিতেছে, তাহা ক্ষয়শীল এবং অনিষ্টকর। ভাল, আমি ইহাকে বোধি-তলে প্রাপ্ত স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি বা শান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সপ্তবিধ আর্য্যধন প্রদান করিয়া, ইহাকে লোকোত্তর সম্পদের অধিকারী করিব।" অতঃপর আয়ুষ্মান্ সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে সারিপুত্র, তুমি কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দাও।" এইরূপে রাজকুমার সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লাভ করিলেন।

কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দেওয়া হইলে, মহারাজ শুদ্ধোদনের অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, "মাতাপিতার আদেশ না পাইলে সন্ন্যাসিগণ কোন পুত্রকে প্রব্রজ্যা দিতে পারিবেন না"—এই নিবেদন করিয়া ভগবানের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

* * * *

অন্য একদিবস বুদ্ধদেব রাজভবনে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আপনি যখন তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময় এক দেবতা আসিয়া আমায় বলেন, 'তোমার পুত্র মারা গিয়াছে'। আমি সে কথা বিশ্বাস না করিয়া, 'আমার পুত্র বোধিপ্রাপ্ত না হইয়া দেহত্যাগ করিবেন না' এই বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম।" ভগবান্ বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মে

আপনার বিশ্বাস ইহা অপেক্ষাও দৃঢ়তর ছিল; কেননা, তখন পুত্র মরিয়াছে বলিয়া অস্থিসকল দেখাইলেও আপনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই।” এই বলিয়া সেই পূর্ব্বজন্মবিষয়ক ‘ধর্ম্মপাল জাতক’ বর্ণন করিলেন; এবং তৎপরে রাজা শুদ্ধোদনকে অনাগমি ফলে অর্থাৎ ধর্ম্মের তৃতীয় সোপানে আরূঢ় করাইলেন।

ভগবান্ এইরূপে স্বীয় পিতাকে তিন প্রকার ফলে স্থাপিত করিয়া পর-দিবস রাজগৃহে আগমন করিলেন। অনাথপিণ্ডিক নামে এক ধনবান্ শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তীতে বাস করিতেন। এই সময় তিনি তথায় জেতবন নামে এক পরমরমণীয় বিহার প্রস্তুত করিয়া উহা ভগবান্‌কে উৎসর্গ করেন। ভগবান্‌ও তথায় যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেইজন্য তিনি রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভিক্ষু নন্দও তাঁহার সহিত আসিলেন।

কিছুকাল জেতবনে অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান্ নন্দ অপর ভিক্ষুগণকে বলিলেন, “হে ভ্রাতৃবর্গ, আমি নিরানন্দে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ইহাতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না; এই শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীন গৃহি-ভাব অবলম্বন করিব।” ভগবান্ এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া নন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, “তুমি কি সত্য সত্যই ভিক্ষুদের বলিয়াছ, ‘আমি নিরানন্দে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি; ইহাতে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিব না; এই শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীন গৃহি-ভাব অবলম্বন করিব?’ ”

“হাঁ, ভগবন্, বলিয়াছি।”

“কেন তুমি এইরূপ বলিয়াছ?”

“ভগবন্, শাক্যানী জনপদকল্যাণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে বিকীর্ণকেশে আসিয়া আমায় বলিল, ‘আর্য্যপুত্র, আপনি শীঘ্র চলিয়া আসুন।’ আমি সেই বাক্য স্মরণ করিয়া এইরূপ বলিতেছি।”

অনন্তর লোক-কল্যাণ-রত ভগবান্ আয়ুষ্মান্ নন্দকে হস্তের দ্বারা ধারণ-করতঃ অসামান্য শক্তিপ্রভাবে ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাধিষ্ঠিত এক লোকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে অঙ্গুলি-কর্ণ-নাসিকা-বিহীন এক জরাগ্রস্ত মর্কটী একটী দগ্ধ ক্ষেত্রে এক দগ্ধ স্থাণুর উপর উপবিষ্ট ছিল। ভগবান্ নন্দকে তাহা দেখাইলেন। পরে দেবলোকে আসিয়া দেবরাজ শাক্যের (ইন্দ্রের)

পরিচারিকা অসামান্যসৌন্দর্য্যশালিনী কপোতসদৃশ-লোহিতবর্ণ-পদবিশিষ্টা পঞ্চ-শত অপ্সরাকে দেখাইয়া বলিলেন, "নন্দ, তুমি জনপদকল্যাণীকে অধিক সুন্দরী বিবেচনা কর, না এই পঞ্চশত অপ্সরাকে?" নন্দ উত্তর করিলেন, "ভগবন্, অঙ্গুলি-কর্ণ-নাসিকা-বিহীন জরাযুক্ত মর্কটী যেরূপ কুৎসিত, ইঁহাদের তুলনায় শাক্যানী জনপদকল্যাণীও তদ্রূপ ; ইঁহারাই অধিক সুন্দরী।"

ভগবান্ বলিলেন, "নন্দ, আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, তাহা হইলে এইরূপ পঞ্চশত অপ্সরা লাভ করিবে। তাহার জন্য আমি দায়ী।" নন্দ বলিলেন, "বেশ, তাহা হইলে আমি আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।"

ইহার পর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ নন্দকে লইয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া জেতবনে আবির্ভূত হইলেন। ক্রমে ভিক্ষুগণ শুনিলেন, ভগবানের মাতৃষ্বসা-পুত্র ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ কেবল অপ্সরাদের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন। ভগবান্ আবার তাঁহার পাঁচ শত রূপবতী অপ্সরা লাভের জন্য দায়ী। অতঃপর তাঁহারা নন্দকে 'দাস' ও 'ভৃত্য' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, যেহেতু তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যপালনের উদ্দেশ্য—অপ্সরারূপ বেতন লাভ। এইরূপে আয়ুষ্মান্ নন্দ ভিক্ষু ভ্রাতৃগণের 'দাস' ও 'ভৃত্য' সম্বোধনে লজ্জা, ঘৃণা এবং অপমান বোধ করিলেন, এবং নিঃসঙ্গ, অপ্রমত্ত, যত্নবান্ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিচরণ করিতে করিতে অচিরে, যে ব্রহ্মচর্য্য লাভের জন্য আর্য্যসন্তানেরা পূর্ণ-বৈরাগ্যবান্ হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন, সেই ব্রহ্মচর্য্যের পরাকাষ্ঠা ইহ জীবনেই লাভ করিলেন, এবং সাক্ষাৎকার করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার সংসারনিবৃত্ত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার করণীয় আর কিছুই নাই, এবং তাঁহাকে আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি এক জন অর্হৎ হইলেন।

অনন্তর এক দেবতা রাত্রিকালে সমস্ত জেতবন আলোকিত করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, "ভগবন্, আপনার মাতৃষ্বসা-পুত্র আয়ুষ্মান্ নন্দ বাসনাসমূহের ক্ষয় হেতু চিত্তের বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-জনিত বিমুক্তি ইহ জীবনেই সাক্ষাৎকার ও উপলব্ধি করিয়া পরম শান্তিতে অবস্থান করিতেছেন।" ভগবান্ ইতিপূর্ব্বেই সে কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।

সে রাত্রি গত হইলে আয়ুষ্মান্ নন্দ ভগবানের নিকট আসিয়া বন্দনা-পূর্ব্বক বলিলেন, "ভগবান্ যে আমায় রূপবতী অপ্সরা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা হইতে আমি আপনাকে মুক্ত করিতেছি।"

ভগবান্ কহিলেন, "হে নন্দ, আমি তোমার চিত্তের সহিত আমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছি যে, তুমি বাসনাসমূহ ক্ষয় করিয়া বাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া ইহ জীবনেই চিত্তের বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-জনিত বিমুক্তি সাক্ষাৎকার ও উপলব্ধি করিয়া পরম শান্তিতে অবস্থান করিতেছ। দেবতা আসিয়াও আমায় এই ঘটনা বলিয়াছেন। হে নন্দ, যেহেতু তুমি আসক্তি-রহিত হইয়া বাসনা হইতে মুক্ত হইয়াছ, সে কারণ আমিও এই প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইয়াছি।"

তদনন্তর ভগবান্ এই সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া, এই সময় এই উদান গান করিলেন (অর্থাৎ গাথায় প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন) ;—

"যস্স নিত্তিণ্ণো পঙ্কো চ মদ্দিতো কাম কণ্টকো।
মোহক্খয়ং অনুপ্পত্তো সুখদুক্খেন বেধতীতি॥"

অর্থাৎ, যিনি সংসাররূপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, যাঁহার দ্বারা কাম-কণ্টক বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহার মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি সুখ দুঃখ আর বোধ করেন না।

ইহার পর এক দিবস ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান্ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভাই নন্দ, তুমি বলিয়াছিলে, 'আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি' ; এখন তোমার কিরূপ বোধ হয় ?"

"বন্ধুগণ ! আমার আর গৃহি-ভাবে অনুরক্তি নাই।"

ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভাবিলেন, "আয়ুষ্মান্ নন্দ অদ্ভুত কথা বলিতেছেন, অন্যরূপ কথা কহিতেছেন। যেহেতু পূর্ব্বে 'আমি উৎকণ্ঠিত' বলিয়া, এখন বলিতেছেন, 'আমার আর গৃহি-ভাবে অনুরক্তি নাই' ! তাঁহারা তথা হইতে গমন করিয়া এই বিষয় ভগবানের গোচর করিলেন। ভগবান্ কহিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, অতীত দিবসে নন্দের অবস্থা অসম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত গৃহসদৃশ ছিল, এক্ষণে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত গৃহের মত হইয়াছে। তিনি স্বর্গের অপ্সরাদের দর্শনাবধি প্রব্রজ্যা-ক্রিয়ার চরম সীমা লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট

হইয়া এক্ষণে তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।” এই বলিয়া ভগবান্ বক্ষ্যমাণ গাথা-দ্বয় কহিলেন—

“যথা অগারং দুচ্ছন্নং বুট্‌ঠি সমতিবিজ্ঝতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্ঝতি॥
“যথা অগারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠি ন সমতিবিজ্ঝতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্ঝতি।”

—“যেরূপ বিরলাচ্ছন্ন আগারমধ্যে বৃষ্টি সহজে প্রবেশ লাভ করে, সেইরূপ ধ্যান-সমাধি দ্বারা অমার্জ্জিত চিত্তকে রাগাদি বশীভূত করিয়া থাকে।

“যেরূপ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত গৃহমধ্যে বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ সম্যগনুষ্ঠিত চিত্তকে রাগাদি বশ করিতে পারে না।”

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত।)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর,
৮ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইলাম, অতএব আমিও প্রয়াগ যাইতেছি। আপনি প্রয়াগে কোথায় থাকিবেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। ইতি

দাস
বিবেকানন্দ

পুঃ—

দুই এক দিনের মধ্যে অভেদানন্দ যদ্যপি আসেন, তাঁহাকে কলিকাতায় রওনা করিয়া দিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

বিবেকানন্দ।

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর।

(আনুমানিক তারিখ—মার্চ্চের তৃতীয় সপ্তাহ)

প্রাণাধিকেষু—

কল্য তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখানে পওহারীজী নামক যে অদ্ভুত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইনি ঘরের বাহির হন না—দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্ত্তা কহেন। ঘরের মধ্যে এক গর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে বাস করেন। শুনিতে পাই, ইনি মাস মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ইঁহার তিতিক্ষা বড়ই অদ্ভুত। আমাদের বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্ত্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল বদ্‌খত্‌ দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা ত Gymnastics (কুস্তি)। এইজন্য এই অদ্ভুত রাজযোগীর নিকট রহিয়াছি—ইনি কতক আশাও দিয়াছেন। এখানে একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে একটি সুন্দর বাঙ্গলা ঘর আছে; ঐ ঘরে থাকিব এবং উক্ত বাগান বাবাজীর কুটীরের অতি নিকটে। বাবাজীর একজন দাদা ঐখানে সাধুদের সৎকারের জন্য থাকেন, সেই স্থানেই ভিক্ষা করিব। অতএব এ রঙ্গ কতদূর গড়ায়, দেখিবার জন্য এক্ষণে পর্ব্বতারোহণ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম; এবং কোমরে দুমাস ধরিয়া একটা বেদনা (Lumbago) হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ে উঠা এক্ষণে অসম্ভব। অতএব বাবাজী কি দেন, পড়িয়া পড়িয়া দেখা যাউক।

আমার motto (মূলমন্ত্র) এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরাহনগরের অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ ও আভাস্বরূপ।

তুমি যদি গাজীপুরে আইস, গোরাবাজারের সতীশ বাবু অথবা গগন বাবুর নিকট আসিলেই আমার সন্ধান পাইবে। অথবা পওহারী বাবা এত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যে, ইঁহার নাম মাত্রেই সকলেই বলিবে এবং তাঁহার আশ্রমে যাইয়া পরমহংসজীর খোঁজ করিলেই সকলে বলিয়া দিবে। মোগলসরাই ছাড়াইয়া "দিলদার নগর" ষ্টেশনে নামিয়া Branch Railway (শাখা

রেল) একটু আছে ; তাহাতে "তারিঘাট"—গাজীপুরের আড়পারে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসিতে হয়।

এক্ষণে আমি গাজীপুরে কিছুদিন রহিলাম ; দেখি, বাবাজী কি করেন। তুমি যদি আইস, দুই জনে উক্ত কুটীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে পাহাড়ে বা যথায় হয়, যাওয়া যাইবে। আমি গাজীপুরে আছি, একথা বরাহনগরে কাহাকেও লিখিও না। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ।

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

(আনুমানিক তারিখ—মার্চ্চের শেষভাগ।)

প্রাণাধিকেষু—

এইমাত্র তোমার আর একখানি পত্র পাইলাম—হিজিবিজি বহু কষ্টে বুঝিলাম। পূর্ব্বের পত্রে সমস্ত লিখিয়াছি। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তুমি যে নেপাল হইয়া তিব্বতের পথ বলিয়াছ, তাহা আমি জানি। যে প্রকার তিব্বতে সহজে কাহাকেও যাইতে দেয় না, ঐ প্রকার নেপালেও কাটামুণ্ড রাজধানী ও দুই এক তীর্থ ছাড়া কাহাকেও কোথাও যাইতে দেয় না। কিন্তু আমার একজন বন্ধু এক্ষণে নেপালের রাজার ও রাজার স্কুলের শিক্ষক—তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, বৎসর বৎসর যখন নেপাল হইতে চীন দেশে রাজকর যায়, সে সময় লাসা হইয়া যায়। একজন সাধু যোগাড় করিয়া ঐ রকমে লাসা, চীন এবং মাঞ্চুরিয়া, North China (উত্তর চীন)—তারাদেবীর পীঠ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। উক্ত বন্ধু চেষ্টা করিলে আমরাও মান্য ও খাতিরের সহিত তিব্বত চীন লাসা—সব দেখিতে পারিব ;—অতএব তুমি অবিলম্বে গাজীপুরে চলিয়া আইস। এখানে আমি বাবাজীর কাছে কিছুদিন থাকিয়া, উক্ত বন্ধুকে চিঠি পত্র লিখিয়া নেপাল হইয়া নিশ্চিত তিব্বত যাইব। কিমধিকমিতি। দিলদার নগর ষ্টেশনে নামিয়া গাজীপুরে আসিতে হয়। দিলদার নগর মোগলসরাই ষ্টেশনের তিন চার ষ্টেশনের পরে। এখানে ভাড়া যোগাড় করিতে পারিলে, পাঠাইতাম ; অতএব তুমি যোগাড় করিয়া আইস।

গগন বাবু—যাঁহার আশ্রয়ে আমি আছি—এত ভদ্র, উদার এবং হৃদয়বান্ ব্যক্তি যে, কি লিখিব। তিনি কা—র জ্বর শুনিয়া হৃষীকেশে তৎক্ষণাৎ ভাড়া পাঠাইলেন এবং আমার জন্য আরও অনেক ব্যয় করিয়াছেন। এ অবস্থায় আবার তাঁহাকে কাশ্মীরের ভাড়ার জন্য ভারগ্রস্ত করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে জানিয়া নিরস্ত হইলাম। তুমি যোগাড় করিয়া পত্রপাঠ চলিয়া আইস। অমরনাথ দেখিবার বাতিক এখন থাক্। ইতি

বিবেকানন্দ।

(৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত।)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর,

৩১শে মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আমি কয়েক দিবস এস্থানে ছিলাম না এবং অদ্যই পুনর্ব্বার চলিয়া যাইব। গ— ভায়াকে এস্থানে আসিতে লিখিয়াছি। যদি আইসেন, তাহা হইলে তৎসহ আপনার সন্নিধানে যাইতেছি। কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ এস্থানের কিয়দ্দূরে এক গ্রামে গুপ্তভাবে কিছুদিন থাকিব, সে স্থান হইতে পত্র লিখিবার কোনও সুবিধা নাই। এইজন্যই আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। গ— ভায়া বোধ করি আসিতেছেন, না হইলে আমার পত্রের উত্তর আসিত। অভেদানন্দ ভায়া কাশীতে প্রিয় ডাক্তারের নিকট আছেন। আর একটি গুরুভাই আমার নিকটে ছিলেন, তিনি অভেদানন্দের নিকট গিয়াছেন। তাঁহার পৌঁছ সংবাদ পাই নাই। তাঁহারও শরীর ভাল নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি। তাঁহার সহিত আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি—অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি। কি করি, আমি বড়ই দুর্ব্বল, বড়ই মায়া-সমাচ্ছন্ন—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কঠিন হইতে পারি। আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না—এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল—কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বাবাজী মিষ্ট মিষ্ট বুলি বলেন, আর আটকাইয়া রাখেন। আপনাকে কি

বলিব, আমি আপনার চরণে শত শত অপরাধ করিতেছি—অন্তর্যাতনায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তির কৃত বলিয়া সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। অভেদানন্দের রক্তামাশয় হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি তাঁহার তত্ত্ব লন এবং যিনি এস্থান হইতে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যদি মঠে যাইতে চান, পাঠাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দ্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে?—আমি দিবারাত্র কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আমার হয়। আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—প্রিয় ডাক্তারের বাটী সোণার পুরাতে অভেদানন্দ আছেন। আমার কোমরের বেদনা সেই প্রকারই আছে।

দাস

বিবেকানন্দ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর,

২রা এপ্রেল, ১৮৯০।

ভাই কা—

তোমার, প্রমদা বাবুর ও বা—র হস্তাক্ষর পাইয়াছি। আমি এ স্থানে এক রকম মন্দ নাই। তোমার আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে—আমারও বড় ঐরূপ হয়, সেই ভয়েই যাইতে পারিতেছি না—তার উপর বাবাজী বারণ করেন—দুই চারি দিনের বিদায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভয় এই—তাহা হইলে একবারে হৃষীকেশী টানে পাহাড়ে টানিয়া তুলিবে—আবার ছাড়ান বড় কঠিন হইবে, বিশেষ আমার মত দুর্ব্বলের পক্ষে। কোমরের বেদনাটাও কিছুতেই সারে না—বালাই। তবে অভ্যাস পড়ে আস্‌ছে। প্রমদা বাবুকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবে, তিনি আমার শরীর ও মনের বড় উপকারী বন্ধু ও তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। যাহা হয়, হইবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন।

(শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় হাওলাদার)

তীর্থদর্শনে পুণ্য হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই গৃহস্থ আমরা তীর্থযাত্রা করিয়া থাকি।

গত ২৬শে চৈত্র শুক্রবার রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় বোম্বাই মেলে হরিদ্বার যাত্রা করিলাম। অনেক লোক গাড়ীতে স্থান না পাওয়াতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে গয়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। গয়াধাম হিন্দুর একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এই স্থানে পিতৃপুরুষের উদ্ধারকল্পে বিষ্ণুপাদপদ্মে লোকে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। এই স্থানেই ভগবান্ বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিকটস্থ গোড়ধোওয়া অথবা পাদোদক তীর্থ। দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহাতে পদ ধৌত করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই এই তীর্থের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই স্থানেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রথম ভাবাবেশ হয় এবং এই স্থানেই তিনি পরমভক্ত ঈশ্বরপুরীর দর্শন লাভ করেন, ও তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। যে মুহূর্ত্তে দীক্ষিত হন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার 'মহাভাবের উদয় হয়। গয়াধামে ও তাহার সন্নিকটস্থ পাহাড়ে অনেক যোগী তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই মহাপুরুষদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস এই স্থানের বায়ুর সহিত মিশিয়া ইহাকে পবিত্র সিদ্ধস্থানে পরিণত করিয়াছে। এই সকল ভাবিয়া আমি গয়াধামকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলাম।

গয়া ষ্টেসনে একজন পণ্ডিত তাঁহার সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে লইয়া আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। পণ্ডিতজীর সহিত আলাপ করিয়া অবগত হইলাম যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে লইয়া যাইবেন, পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য ৺কাশীধামে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবেন।

শনিবার বেলা সাড়ে বারটার সময় আমরা কাশী ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। গাড়ী কাশী ষ্টেসন হইতে ছাড়িল; দুইদিকে বিশাল প্রান্তর, মাঝে মাঝে মহুয়া ও আম্রকানন দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই প্রান্তরে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া

কৃষকরমণীগণ মহুয়া পুষ্প আহরণ করিতেছে এবং তাহা রৌদ্রে শুকাইতেছে। এই প্রদেশবাসীরা বর্ষাকালে আটার সহিত মহুয়া পুষ্পের গুঁড়া মিশাইয়া রুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কৃষক ও কৃষকরমণীগণ একত্র হইয়া ঘটীযন্ত্র দ্বারা কূপ হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক ইক্ষুক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছে; কেহ বা যব, অড়হর উঠাইয়া মড়াই বোঝাই করিতেছে। শস্যের অবস্থা অধিকাংশ স্থানেই সন্তোষজনক নহে এবং আম্রের অবস্থা সর্ব্বত্রই শোচনীয়। গাড়ী যখন অযোধ্যা প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল, তখন রৌদ্রতাপে আরোহীদিগের সকলেরই প্রাণ পিপাসায় ওষ্ঠাগত হইল এবং গাড়ী ষ্টেসনে থামিলেই শত শত লোক "পানি পাঁড়ে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কলিকাতা "মারবারী সহায়ক সমিতি"র নিযুক্ত লোকেরা আসিয়া তৃষ্ণাতুরদিগকে যথাসাধ্য জলদান করিতেছিলেন। প্রত্যেক ষ্টেসনে জলসত্র স্থাপন করিয়া এই সমিতি মহাপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অমৃতসরের "সেবা সোসাইটী"ও লক্সর জংসন হইতে পঞ্জাব প্রদেশের প্রত্যেক ষ্টেসনে যাত্রী-দিগের তৃষ্ণানিবারণহেতু জলসত্র খুলিয়াছিলেন। নাগিনা ষ্টেসনে এক ভদ্রলোক একটি জলসত্র খুলিয়াছিলেন; উহার বিশেষত্ব এই যে, উহাতে তৃষ্ণাতুর যাত্রীদিগকে সুশীতল জল ব্যতীত একখানি করিয়া খর্জ্জুরপত্রনির্ম্মিত পাখাও প্রদান করা হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণাতুরকে জলদান করা আর্য্য-জাতির একটি চিরন্তন প্রথা। সেইজন্যই এই সময়ে রাস্তার পার্শ্বে লোকে জলসত্র স্থাপন করে। আর্য্যগৃহলক্ষ্মীগণও এই সময়ে জলনারায়ণের ব্রত করিয়া, শীতলজলপূর্ণ কুম্ভ ও তালবৃন্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন। এই প্রকারে পুণ্যবান্ লোকদিগের সাধুসঙ্কল্প দেখিতে দেখিতে আমরা ভোগ ও বিলাসের নগরী কলিকাতাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া, দুই রাত্রি ও এক দিন পরে ত্যাগীদিগের মিলনভূমি হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে পুনঃ পুনঃ "গঙ্গা মায়ীকী জয়" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আমরা জনকোলাহলের মধ্য দিয়া গঙ্গাতীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কতকদূর গিয়া আমি ও আমার সঙ্গী ত্রিপুরা-জেলা-নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়—এই দুইজনে এক মহাপুরুষের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আশ্রমে প্রায় পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন; স্বামিজী

স্বয়ং এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আসনোপরি বসিয়া আছেন। তাঁহার দিব্য কান্তি, সুগঠিত নাসা, দীর্ঘ বাহু, শুভ্র কেশ ও আবক্ষবিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু দেখিবামাত্র হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। আমরা মহাপুরুষকে প্রণাম করিলে, তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং আমরা কয়জন তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "আমরা দুই জন।" অতঃপর তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে অনুমতি করিলেন, "ইহাদের জিনিষ পত্র ঐ বাড়ীতে ব্রহ্মচারীর নিকট রাখ; রাত্রিতে এই দুই জন এইখানে শুইবে।" জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইনিই মহাত্মা গম্ভীরনাথ। ইঁহার আশ্রয়েই আমরা পরমানন্দে কয় দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলাম। অল্প বিশ্রামের পর আমরা দুইজন গঙ্গাস্নান করিয়া হরিদ্বার প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হইলাম এবং গঙ্গাতীর দিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলাম।

হরিদ্বারে আসিয়া যাত্রিগণ প্রধানতঃ দুইটি কার্য্য করিয়া থাকেন;—প্রথমতঃ গঙ্গাস্নান, দ্বিতীয়তঃ সাধুদর্শন। এখানে গঙ্গা প্রস্থে বেশী নহে, কিন্তু খরস্রোতা; উহার জলও অতিশয় নির্ম্মল। এই স্থানের সুশীতল জলে স্নান করিলে দেহ ও মন পবিত্র হইয়া যায়। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর কল কল ধ্বনিতে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। আমরা পুনরায় গঙ্গাস্নান করিয়া সাধুদর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। গঙ্গাতীরে যাঁহাদের চটি পড়িয়াছিল, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে করিতে শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরির আশ্রমে পৌঁছিলাম। তাঁহার দর্শন মিলিল না; একটি লোককে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইলাম, "তিনি একটি নিভৃতস্থানে ধ্যানে নিমগ্ন।" সেই আশ্রমের আঙ্গিনায় সাধুসেবা দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। মধ্যাহ্নে প্রসাদগ্রহণানন্তর কনখল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গঙ্গার সেতু পার হইয়া কনখলের দিকে কতকদূর অগ্রসর হইলে পর আমরা "অখিল ভারতবর্ষীয় সনাতন মহাসম্মিলনী"র এক অধিবেশন হইতেছে দেখিয়া, উহাতে যোগদান করিলাম। একটি ব্রহ্মচারী দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন আর সহস্র সহস্র শ্রোতা নিবিষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছে।

আমরা সভায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কতকদূর গিয়া একটি প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা আখড়া দেখিতে পাইলাম। ভিতরে

প্রবেশ করিয়া দেখি; প্রকাণ্ড মাঠের মত একটি আঙ্গিনা; উহার মধ্যস্থলে একটি উচ্চ স্তম্ভের উপর নিশান উড়িতেছে; পশ্চিম পার্শ্বে একটি বৃহৎ খড়ের বাঙ্গলা ঘর। এই বাঙ্গলাটির সম্মুখে একটি বাঁধান স্থান, তাহার উপর কয়েকজন শিখ ভজন করিতেছেন; এবং ঘরের ভিতর কিছু জন লোক "গ্রন্থ সাহেব" বা গুরু নানকের উপদেশবাণী পাঠ করিতেছেন এই স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। ইহার পর "কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম" দেখিবার মানসে তথায় প্রবেশ করিলাম। প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে খড়ের একটি ক্ষুদ্র চালা ঘর। কতিপয় ত্যাগী যুবক তথা হইতে বাহিরের রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। ভিতরে একটি দালানে কতিপয় রোগীকে শয্যার উপর উপবিষ্ট দেখিলাম। অপর একটি দালানে রোগীদিগের শয্যা রচনা করা হইতেছে এবং তৃতীয় একটি দালানে কতিপয় ব্রহ্মচারী বসিয়া আছেন, দেখিতে পাইলাম। আমরা আশ্রমস্থ ইন্দারা হইতে জলপান করিয়া, বাহির হইয়া সতীকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলাম। রাস্তার জনস্রোত অতিক্রম করিয়া অপরাহ্নে আমরা সতীকুণ্ডে উপস্থিত হইলাম। সতী যে স্থানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থানকে সতীকুণ্ড বলে। যে স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই স্থানে 'দক্ষেশ্বর' নামে একটি লিঙ্গ বিরাজিত। দক্ষেশ্বরের মন্দিরপার্শ্বেই সতীকুণ্ড বর্ত্তমান। এই স্থানেই প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সকল দেবতাদিগের নিমন্ত্রণ হইল, শুধু দেবাদিদেব মহাদেবের হইল না। পতির অপমান ও নিন্দা দক্ষনন্দিনী সতীর অসহ্য হইল। তিনি সর্ব্বজনসমক্ষে দেহত্যাগ করিলেন। এই পতিভক্তিই ভারতীয় আর্য্যনারী-দিগের আদর্শ। কত যুগ হইল সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই পতিভক্তি ভারতীয় নারী-হৃদয় হইতে তিরোহিত হয় নাই। রাজপ্রাসাদ হইতে ক্ষুদ্র কুটীর পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র আর্য্যরমণীগণের হৃদয়মন্দিরে এই দেবভাব প্রদীপ্ত দীপশিখার ন্যায় আজ পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। 'এই সকল চিন্তা করিয়া আমি সেই স্থানের ধূলিতে ভক্তিভরে অবলুণ্ঠিত হইলাম।

সতীকুণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিপার্শ্বে কতিপয় আম্রকাননে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী দর্শন করিলাম এবং "পণ্ডিতজীর চতুষ্পাঠী"তে সাধুদের 'ভাণ্ডারা' বা পংক্তিভোজন দেখিতে গেলাম। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, তথায়

বহুসংখ্যক সাধুর সেবা হইতেছে। সাধুসেবা দেখিয়া হৃদয় প্রফুল্ল হইল। সঙ্গী বর্ম্মণ মহাশয় ও আমি সাধুদিগকে প্রণাম করিলাম। সেখানে যে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ আমরা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলাম। তৎপরে কনখলের নানকপন্থী সন্ন্যাসীদিগকে দর্শন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আজ ২৯শে চৈত্র, সোমবার। প্রাতঃকালে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া "লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব" স্মরণ করিয়া, পাহাড়ের উপর যাইবার জন্য বাহির হইলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিহিত পাহাড়টির উপর উঠিতে লাগিলাম। এই পাহাড়টির উচ্চতা অধিক না হইলেও আমরা অনভ্যাসপ্রযুক্ত তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া উহার উপরে উঠিলাম। পর্ব্বতোপরি ক্ষুদ্র মন্দিরাভ্যন্তরে সিংহবাহিনী দশভুজার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির দর্শন করিয়া "সূর্য্যকুণ্ড" দর্শন করিবার জন্য নিম্নে একটি গুহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই পথে একটি স্তম্ভে ইংরাজীতে লেখা আছে 'সূর্য্যকুণ্ডের রাস্তা'। আমরা সেই পথ ধরিয়া দুই তিনটি পাহাড় বেষ্টন করিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। বোধ হইল, যতদূর উচ্চে উঠিয়াছিলাম, ততোধিক নিম্নে নামিলাম। যাইতে যাইতে এক গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখি—চতুর্দ্দিকে প্রস্তরবেষ্টিত একটি কুণ্ড, তন্মধ্যে কোমর পর্য্যন্ত জল। উহাই সূর্য্যকুণ্ড। বহুলোক উহাতে স্নান করাতে জল অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। সূর্য্যকুণ্ড দর্শন করিয়া অপেক্ষাকৃত সুগম অন্য একটি রাস্তা দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। পাহাড়ের গাত্র প্রস্তরময় হইলেও, উহাতে অসংখ্য শেফালিকা ও বিল্ববৃক্ষ দেখিয়া অতীব আনন্দ অনুভব করিলাম। এই প্রকার নানারূপ দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে বাসস্থানে পৌঁছিলাম। গঙ্গাস্নানানন্তর প্রসাদ পাইয়া সঙ্গী বর্ম্মণ মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তাঁবুতে গেলাম। কনখলে গঙ্গাতীরে যে স্থানে সতীকুণ্ড অবস্থিত, তাহারই সম্মুখে গঙ্গার বৃহৎ চড়ার উপর বৈষ্ণবদিগের তাঁবু পড়িয়াছিল। দেখিলাম, রামাইতগণ নিজ নিজ তাঁবুতে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। কেহ বা পরদিনের ভাণ্ডারার আয়োজন করিতেছেন। দুই একটি প্রবীণ রামাইত সাধুও দেখিলাম; কিন্তু আমরা, সাধুদিগের সহিত কি প্রকারে

আলাপ করিতে হয়, জানিনা বলিয়াই কোন প্রকার প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। কেবল প্রণাম করিয়াই চলিয়া আসিলাম।

আমাদের বঙ্গদেশে বৈষ্ণব বলিতে শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায় ও বাউল সম্প্রদায়কে বুঝায়। এবার কুম্ভমেলায় কোন বাঙ্গালী বৈরাগী বা বাউলকে বৈষ্ণবদিগের চটিতে আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম না। একবার মাত্র প্রয়াগ কুম্ভমেলায় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বা জটিয়া বাবা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে স্থান পাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে নিজের লোক বলিয়া অতি সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার মত মহাপুরুষ কয়জন জন্মিয়া থাকেন ?

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের চটি দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে গঙ্গাবক্ষস্থিত বালুকা ও অসংখ্য-শিলা-সমন্বিত বিশাল চড়ার উপর দণ্ডায়মান হইয়া, গঙ্গার উভয় তীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, হিমাদ্রির অযুত শৃঙ্গরাজি দিগন্তপ্রসারী নীল আকাশকে চুম্বন করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য ভগবানের অনন্ত মহিমার কথা মনে পড়িল ; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তার পর আবার পথ চলিতে চলিতে সেই লোকারণ্য ভেদ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

এই হাজার হাজার সন্ন্যাসীর মধ্যে চারিজন প্রখ্যাতনামা মহাপুরুষ দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরনাথ ও শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি বঙ্গদেশের অনেকেরই নিকট পরিচিত। অপর দুইজন নাথসম্প্রদায়ভুক্ত ; পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কখনও দর্শন করি নাই। এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে একজন অতি প্রাচীন। তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অতি স্নেহের সহিত আলাপ করিলেন। অপর মহাপুরুষের পদস্পর্শ করিতে গেলে, তিনি নিষেধ করিলেন। আমি শুধু প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। এই সহস্র সহস্র সাধুর মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক ত্যাগী মহাপুরুষ আছেন ; সংসারী লোকেরা তাঁহাদিগের খবর রাখে না, কারণ, প্রকৃত সাধুগণ লোক-দেখান ভাব হইতে বহুদূরে থাকেন ; তদ্ভিন্ন শুধু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষেরাই, কে প্রকৃত সাধু, কে বেশমাত্রোপজীবী, তাহা ধরিতে পারেন। অপরের এ বিষয়ে চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

আজ ৩০শে চৈত্র, মঙ্গলবার, মহাবিষুব সংক্রান্তি। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শুনিতে পাইলাম, বহুলোক চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া কিছুদূর বাহির হইয়া দেখি, বাস্তবিকই পুলিস কতকগুলি সবলকায় নরনারীর মৃতদেহ পাহারা দিতেছে; এবং মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়স্বজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশবাসী। এই যে লোকগুলি চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল, ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের বা পুলিসের কিছুই দোষ নাই। কর্ত্তৃপক্ষ লোকের যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত গঙ্গার উপর প্রায় ত্রিশটী পুল করিয়া দিয়াছিলেন, এবং মেলার সর্ব্বত্র রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিয়াছিলেন। পুলিসও পূর্ব্ব হইতেই, স্নানের সময় কোন্ রাস্তা দিয়া সাধুদিগের যাতায়াত হইবে ইত্যাদি বিষয় বিশদ-রূপে মুদ্রিত করিয়া, প্রকাণ্ড রাস্তার অনেক স্থানে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। যথা-সময়ে সকলে স্নান করিবে, ইহাই সকলের ধারণা ছিল; কিন্তু সোমবার রাত্রি দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে যে এত লোকের ভিড় হইবে, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এই ভিড়ের মধ্যেই এই লোকগুলি চাপা পড়িয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার পর পুলিস এতদূর সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, স্নানের সময় একটি লোকেরও কোনরূপ অসুবিধা বা ক্লেশ হয় নাই। হরিদ্বারে পুলিসের ব্যবহার বড়ই সন্তোষজনক হইয়াছিল। প্রায় সাড়ে তিন কি চারি লক্ষ লোকের সম্মিলনক্ষেত্রে পুলিসের যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রয়াগের স্বেচ্ছাসেবকদিগের সেবাকার্য্যও অতিশয় প্রশংসার্হ। তাঁহারা অক্লান্তশ্রমে যাত্রীদিগের সেবা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে কোন কোন পর্ব্ব উপলক্ষে শুধু যুবকদিগকেই স্বেচ্ছাসেবক হইতে দেখি, কিন্তু প্রয়াগ-স্বেচ্ছাসেবকদলের মধ্যে দৃঢ়কায় প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের উৎসাহ ও কার্য্যপটুতা দেখিয়া পুলকিত হইলাম।

বেলা বারটায় স্নান আরম্ভ হইবে। যে স্থান হইতে সন্ন্যাসীদের শোভা-যাত্রা আরম্ভ হয়, আমি ও আমার একটি যুবকবন্ধু সেই স্থানে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে শোভাযাত্রা আরম্ভ হইল। প্রথমে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে মোহান্ত মহারাজজী, তৎপরে নাগা সন্ন্যাসী সকল, তাহার পর নিরঞ্জনী সন্ন্যাসিগণ, তৎপরে সন্ন্যাসিনীগণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান

হইলেন। ঘণ্টাধ্বনি হইলে পর "গঙ্গে হর হর হর", "নর্ম্মদে হর হর হর" বলিতে বলিতে শোভাযাত্রা ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নাগা সন্ন্যাসীরা অগ্রে স্নান করিলেন; তৎপরে অপর তীর দিয়া বৈরাগি-সম্প্রদায় একইভাবে শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিলেন। আমরা অন্য দিক্ দিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া স্নানাদি কৃত্য সমাপন করিলাম। স্নানের সময় লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে পঞ্জাবপ্রদেশবাসিনী শত শত রমণীকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত মুখশ্রী দেখিয়া হৃদয়ে এক দিব্য ভাবের উদয় হইল; মনে মনে বলিলাম, 'মা, যে তুমি বহুকাল পূর্ব্বে পতিনিন্দা অসহ্য-জ্ঞানে এই পূতসলিলা গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিয়াছিলে, আজ সেই তুমিই কি আবার বহুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এই মহাকুম্ভে গঙ্গাস্নান করিতেছ? লোকচক্ষুর অগোচর তোমাকে প্রণাম।"

গঙ্গাস্নান করিয়া আশ্রমে আসিলাম এবং ত্রিতল গৃহের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া উভয় তীরের লক্ষ লক্ষ নরনারীর গঙ্গাস্নান দর্শন করিয়া প্রসাদ পাইলাম। তৎপরে ভীমগড়ে নানকপন্থীদের আখড়াগুলিতে ভাণ্ডারা দেখিতে বাহির হইলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে দেশীয় রাজন্যবর্গের বাসা-বাড়ী, দ্বারে প্রহরী সকল দণ্ডায়মান। সাধুদর্শন করিতে করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটি ক্ষুদ্র স্থানে দেখিলাম, অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত দেবসমাজের একটি লোক কতিপয় পুস্তিকা সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আর এক স্থানে গো-রক্ষিণী সভার সভ্যদিগকে সম্মিলিত দেখিলাম। একটি সভ্য কি একখানা কাগজ আমার হাতে দিলেন, কিন্তু উহা পড়িয়া দেখিবার সময় হইয়া উঠে নাই। প্রথম আখড়াটিতে গিয়া দেখিলাম যে, উহা এক বিরাট্ ব্যাপার। এক একটি আখড়াতে হাজার হাজার লোক ডাল, ভাত, লুচি, মিষ্টান্ন, দধি প্রভৃতি প্রচুরপরিমাণে আহার করিতেছে, যেন আনন্দের বাজার বসিয়াছে। এই আনন্দের বাজার দেখিতে দেখিতে আবার আশ্রমে ফিরিলাম এবং তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে গঙ্গার মধ্যাস্থিত আর একটি চড়ায় গিয়া দেখি, তথায় কতকগুলি মৃতদেহ। কোনটিকে দাহ করিতেছে, কোনটিকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতেছে। চণ্ডীর পাহাড়ের পাদমূল ধৌত করিয়া গঙ্গার যে স্রোতটি প্রবাহিত হইয়াছে,

উহাতেই একটি লোক তাহার মৃত পত্নীকে ভাসাইয়া দিয়া দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ত্রিতাপহারিণী গঙ্গা সেই লোহিতবস্ত্রপরিহিতা সতীর মৃতদেহকে নাচাইতে নাচাইতে দক্ষিণ দিকে বহিয়া লইয়া চলিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। পরিশেষে যথাসময়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরনাথের ভজন শুনিয়া প্রাণ-মন বিমোহিত হইল। শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কতিপয় শিষ্য ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। একটি লোক ছোট একটি সারঙ্গ বাজাইল, আর একজন বাঁশী বাজাইল। স্বামিজী ধ্যানস্থ হইয়া ভজন করিলেন। সেখানে সে সময় যে ভাবের প্রস্রবণ বহিয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। এরূপ ভজন আমার জীবনে কখনও শ্রবণ করি নাই।

সংক্রান্তির মধ্যাহ্ন হইতে পরদিবস মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাত্রিগণ ১লা বৈশাখ অপরাহ্ণ হইতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। তবে বিরাট্ জনতা হইলে যেমন হইয়া থাকে, অনেকেরই সেদিন ষ্টেসনে প্রবেশ করিয়া গাড়ীতে উঠিবার সামর্থ্য হয় নাই। ২রা তারিখের অপরাহ্ণে জনতা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, তবে আমরা গাড়ীতে উঠিতে পারিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য কিছুই চক্ষে পড়ে নাই। শুধু শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরির আশ্রমের উত্তর দিকে উৎকলদেশীয় কতিপয় ব্রহ্মচারী একটি যজ্ঞে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, দেখিতে পাইয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছিলাম, "এটি রুদ্রযজ্ঞ, ছয় দিন যাবৎ হইতেছে।" এইরূপে কুম্ভমেলা-দর্শন শেষ করিলাম। মেলা দর্শন করিয়া বেশ বুঝিলাম যে, ভারতে বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়-সমূহের একটি সাধারণ লক্ষ্য আছে; সেটি—ত্যাগ। এই ত্যাগবলেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব বিদূরিত হয়। এই ত্যাগকে অবলম্বন করিয়াই ভারতের ধর্ম্মার্থিগণ বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও একই সত্যে উপনীত হন। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তপোভূমি হরিদ্বারকে প্রণাম করিয়া পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।*

(সমালোচনা)

গ্রন্থকার মুখবন্ধের একস্থলে এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অদ্বৈতবাদ প্রধানতঃ দুই আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার অদ্বৈতবাদ মৌলিক অভেদের ভিতরে একটী অবান্তর অথচ চিরন্তন ভেদ দেখিতে পায় এবং সেই ভেদের উপর ভক্তি ও সেবার ধর্ম্ম এবং ভেদমূলক মুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত করে। এই জাতীয় অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নামে পরিচিত। দ্বিতীয় আকারের অদ্বৈতবাদ অভেদকে একান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করে, সর্ব্বপ্রকার ভেদকে মায়িক, কাল্পনিক, অবিদ্যাজাত বলিয়া বর্ণনা করে এবং ভক্তি, সেবা ও ভেদমূলক মুক্তিকে সাময়িক অবস্থা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এই সমুদয়ের উপরে নির্বিকল্প সমাধি ও অভেদমূলক নির্ব্বাণ অন্বেষণ করে। এই শ্রেণীর অদ্বৈতবাদ বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি নামে পরিচিত। অন্য যত প্রকার অদ্বৈতবাদ আছে, সে সমুদয় এই দুই মতের কোন একটীর সহিত অল্পাধিক পরিমাণে সম্পর্কিত। কোন্ প্রকার অদ্বৈতবাদ সত্য, তাহার নির্দ্ধারণে সাহায্য করাই এই পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য।"

মুখবন্ধের এই উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া সহজেই মনে হয়, লেখক পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের একতরটীকে সত্য বলিয়া স্থাপনের চেষ্টা করিবেন এবং তদনুরূপ যুক্তি ও প্রমাণপরম্পরা বিবৃত করিবেন। কিন্তু আমরা গ্রন্থের আদ্যন্ত মনোযোগসহকারে আলোচনা করিয়াও লেখকের সিদ্ধান্ত যে কি, তাহা কোথাও পরিষ্কারভাবে বিবৃত দেখিতে পাইলাম না। যেখানে যেখানে তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে উভয় মত তুলনায় নিযুক্ত দেখি, তথায়ই দেখি, তিনি উভয় মতেরই পোষক কতকগুলি প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোন মতটীকেই সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করেন নাই। তিনি কি উভয় মতের কোন প্রকার সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন? তাহাও ত পরিষ্কার বোধ হয় না। বরং ঐ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থলে উল্লিখিত তাঁহার উক্তিগুলি মধ্যে মধ্যে

* শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরি, উয়ারি, ঢাকা। ক্রাউন ২০৬ পৃঃ। মূল্য ১৲ টাকা।

স্ববিরোধিতা-দোষদুষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রকাশে জটিলতা দার্শনিক গ্রন্থের এক মহাদোষ। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুলার তাঁহার 'ষড়্‌দর্শন' গ্রন্থের স্থলবিশেষে বলিয়াছেন, "ভারতীয় দর্শনসমূহ কোথাও এরূপ জটিলতা-দোষদুষ্ট নহে; তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই, তাঁহারা যে কি মতাবলম্বী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না; কিন্তু পাশ্চাত্যদর্শনকারগণ অনেকেই ঐ দোষে দোষী।" গ্রন্থকারের মত অনেকাংশে পাশ্চাত্যদর্শন-প্রভাবিত বলিয়া তাঁহার লেখাতেও কি এই পাশ্চাত্যদর্শনসুলভ দোষ আসিয়া পড়িয়াছে? যাহা হউক, তাঁহার গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলে আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

'মায়াবাদ ও পরিণামবাদ' নামক অধ্যায়ে লেখক বলিতেছেন,—

"অদ্বৈতবাদমাত্রকেই কোন না কোন আকারে মায়াবাদ মানিতে হইবে। যিনি স্বীকার করিবেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য বস্তু, তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, জীব ও জড়ের অস্তিত্ব আপেক্ষিক—ব্রহ্ম যে অর্থে ও যে পরিমাণে সত্য, জড় ও জীব সেই অর্থে ও সেই পরিমাণে সত্য নহে।"

ইহার কিছু পরেই রামানুজের মতপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"সেই একতার গভীরতা রামানুজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন কি না, বিশেষ সন্দেহ। * * * রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যুক্তি ও শ্রুতি উভয়-বিরুদ্ধ। তিনি ভেদের উপরই অধিক ঝোঁক দিয়াছেন। ভেদ যে একান্ত মিথ্যা, তাহা নহে; কিন্তু ভেদের প্রকৃত ভাব এবং ভেদের ভিতরে অভেদ রামানুজ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।"

পরে উভয়বাদীর স্ব স্ব পক্ষে বক্তব্য বিষয়গুলি বলিয়া এই বলিয়া উপসংহার করিতেছেন :—

"আমাদের ধারণা এই যে, মায়াবাদ ও পরিণামবাদ যতক্ষণ স্থূলাকারে থাকে, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে স্পষ্ট ভেদ থাকে, কিন্তু যখন উভয়ই সূক্ষ্মাকার ধারণ করে, তখন তাহাদের মধ্যে যে ভেদ থাকে, তাহা প্রকৃত ভেদ নহে, সে ভেদ কেবল শব্দগত। রামানুজ বলেন, * * * তাঁহাতে স্বগত ভেদ আছে * *। শঙ্কর ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মশক্তিতে একটী অনির্ব্বচনীয় ভেদ স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মের অখণ্ড একতার দিকে চাহিয়া এই কথা স্বীকার করেন না

যে, ব্রহ্মে স্বগত ভেদ আছে। ভেদ বলিতেই তিনি স্থূল দ্বৈতভাব বুঝেন * *। আমরা পরিণামবাদের পক্ষ হইয়া যে সূক্ষ্ম ভেদের কথা বলিলাম, সে ভেদ যে প্রকৃতপক্ষে শঙ্কর অস্বীকার করেন না * * তাহাতেই আমরা বলিতেছি যে, সূক্ষ্মাবস্থায় মায়াবাদ ও পরিণামবাদের ভেদ কেবল শব্দগত। ফলতঃ মূল রহস্য যাহা, তাহা মায়াবাদ কি পরিণামবাদ—কোন মতদ্বারাই পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হয় না।”

প্রথমোক্ত উদ্ধৃতাংশদ্বয় দেখিয়া গ্রন্থকারকে যেন শঙ্করমতাবলম্বী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শেষ উদ্ধৃতাংশটী আমাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রহেলিকাপূর্ণ। মায়াবাদ ও পরিণামবাদের সূক্ষ্মাকারপ্রাপ্তিটা কিরূপ? শঙ্কর ভেদ বলিতেই যে স্থূল দ্বৈতভাবমাত্র বুঝেন, এ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত তিনি শঙ্করের কোন্ গ্রন্থ হইতে পাইলেন? শঙ্কর সূক্ষ্ম ভেদ অস্বীকার করেন না, এ কথারই বা প্রমাণ কোথায়?

আমরাও শঙ্করের গ্রন্থগুলি যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহার এই মতই বুঝিয়াছি যে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি কোন প্রকার (স্থূল বা সূক্ষ্ম) ভেদ স্বীকার করেন না আর ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রকার ভেদই স্বীকার করেন এবং উক্ত ভেদের অন্তর্গত কর্ম্মকাণ্ড, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি কিছুমাত্র অস্বীকার করেন না। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে শঙ্কর তথাকথিত ভক্তিবাদী অপেক্ষা ভক্তিমাহাত্ম্যস্বীকারে যে কিছুমাত্র নিরুৎসাহী নহেন, তাহার শত শত প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

অবশ্য আমরা গ্রন্থকারের সহিত একথা স্বীকার করি যে, “অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে কোন কোন বৈদান্তিক ঈশ্বরকে মায়াধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে অতি নিম্ন স্থান দিয়াছেন, এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।” কিন্তু উক্ত আধুনিক বৈদান্তিক-গণের এরূপ ঈশ্বরাশ্রদ্ধা অবশ্য শঙ্করে আরোপিত করিতে কেহই সাহসী হন নাই; সুতরাং উহা কখনই তৎপ্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হইবার যোগ্য নহে।

গ্রন্থকার দ্বিতীয়াধ্যায়ে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতার জন্য যে সকল সাধনসম্পত্তি অত্যাবশ্যক, সেইগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনিও ঐরূপ

সাধনসম্পত্তিসম্পন্ন; কিন্তু নিম্নোদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনিও যেন প্রাচীন সংস্কারান্ধতার দৃঢ় শাসন অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যে প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসার সহায়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সত্য বলিয়া জানিলে আপাত-অপ্রিয় সত্যের দৃঢ় অবলম্বনেও ইতস্ততঃ করে না, সেই অদম্য সত্যানুরাগ যেন এখানে চিরপোষিত বিশ্বাসের নিকট কুণ্ঠিত!

"মুক্তিলাভ করিলেই, চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্রহ্মের সহিত নিত্যযোগলাভ হইলেই, জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, মানবের আর ব্যক্তিত্ব থাকে না, প্রকৃত পক্ষে মানব আর থাকেই না—এই যে একটা বৈদান্তিক মত, ইহা আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। * * মুক্তাত্মা যদি ব্রহ্মে লয়-প্রাপ্তই হইল অর্থাৎ নিত্য চিরন্তন পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণই রহিলেন, সসীম জীবভাব যদি বিনষ্টই হইল, তবে ব্রহ্মের জীব-লীলা, জীবের জীবনে তাঁহার অনুপ্রকাশ ও জীবের উন্নতিকল্পে অশেষ আয়োজন—সমস্তই ব্যর্থ হইল, বলিতে হইবে। * * অতি ক্ষুদ্রতম মানবকেও যখন ঈশ্বর বিনাশ করেন না, তখন যাঁহারা তাঁহার সারূপ্য ও সাযুজ্য লাভ করিয়া তাঁহার মহদুদ্দেশ্যসাধনের, তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের সহায় হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিনাশ করিবেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। * * * গীতাকার উৎকট সন্ন্যাসবাদের প্রতিবাদ করিতেছেন—'যাঁহার সমস্ত পাওয়া হইয়াছে, তাঁহার আর সংসারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবার প্রয়োজন নাই', এই স্বার্থপরতাপ্রসূত সঙ্কীর্ণ মতের প্রতিবাদ করিতেছেন। তাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও বোধ হয় যে, বিদেহ অবস্থায়ই হউক, অথবা শরীরান্তর গ্রহণ করিয়াই হউক, ব্রহ্মভূত মুক্তাত্মারা সর্ব্বদাই জীবজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন।"

মন্তব্য অনাবশ্যক। তথাপি গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, জীবভাববিনাশে ও অখণ্ডব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিতে এই বিদ্বেষ বা ভীতি, ইহা কি সাংসারাসক্তিরই অন্যতম অভিব্যক্তি নহে? 'যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না,' 'বিশ্বাস করা যাইতে পারে না'—এই সকল কথায় কি ইহাই মনে হয় না যে, প্রকৃতপক্ষে যুক্তি অখণ্ড অদ্বৈতবাদেরই পক্ষে সায় দিতেছে অথচ প্রাণ সংসারাসক্তি একেবারে অতিক্রম করিতে না পারিয়া তথাকথিত 'বিনাশ'-ভয়ে ভীত হইয়া একটু ভেদ, একটু দ্বৈত রাখিতে আগ্রহ করিতেছে? সেইজন্যই কি বলা

হইয়াছে—সম্পূর্ণ সন্ন্যাস ব্যতীত সেই অদ্বৈতজ্ঞানলাভের অধিকার কাহারই নাই? উদ্ধৃতাংশে পাঠক কি কোন যুক্তির সম্পর্ক দেখিলেন, না, কেবল সেই বিশ্বাস—বিশ্বাস!

গ্রন্থকার আপনাকে স্পষ্টতঃ রামানুজমতাবলম্বী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিয়া স্বীকার করিলে, আমরা তাঁহার ভাব তবু একরূপ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচিন্তাপরায়ণের পক্ষে স্বোদ্ভাবিত পন্থাবিশেষ অবলম্বন ব্যতীত প্রাচীন আচার্য্যগণের শ্রদ্ধাসহকৃত পদানুসরণ ত সহজসাধ্য নহে। সেইজন্যই বোধ হয়, তিনি রামানুজকেও খণ্ডন করিতেছেন, আবার শঙ্করের বিশুদ্ধাদ্বৈতরূপ মহোচ্চ গিরিচূড়ায় বহুক্ষণ অবস্থান করিতে অক্ষম হইয়া, আবার নীচে নামিয়া আসিতেছেন!

গ্রন্থের 'সাধনা ও মোক্ষ' নামক অধ্যায়েও পূর্ব্বোক্ত দোষ জাজ্জল্যমান! 'মোক্ষ' প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াই গ্রন্থকার প্রশ্ন তুলিতেছেন,—"এই মোক্ষ ব্যক্তিগত জীবনের বিনাশ অথবা অনন্তের সহিত ইহার সূক্ষ্মভেদযুক্ত একতা?" আর উত্তরে বলিতেছেন,—"বেদান্তিক ব্রহ্মবাদ, উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ সূক্ষ্ম-ভেদগর্ভ অদ্বৈতবাদ।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা এই সূক্ষ্মভেদের মর্ম্মার্থ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

আমরা এই গ্রন্থের প্রাচ্য অদ্বৈতবাদ অংশটীরই বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। এই প্রাচ্য অদ্বৈতবাদের আলোচনাই গ্রন্থের প্রায় ⅚ অংশ অধিকার করিয়াছে। তৎপরে সুফিমতের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পাশ্চাত্য অদ্বৈতমতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ আছে। পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে গ্রন্থকার স্পিনোজার মত অপেক্ষা হেগেলের মতের প্রাধান্য সূচনা করিয়াছেন; কারণ, স্পিনোজা "ব্রহ্মকে নিরবচ্ছিন্ন অভেদ ও নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন," আর "স্পিনোজার অভেদবাদের দোষসমূহ হেগেলের ভেদাভেদবাদে ক্ষালিত হইয়াছে। ভেদধারণা যে মানবীয় দুর্ব্বলতা ও ভ্রমের ফল নহে, ভেদের মূল যে পরমাত্মাতেই বর্ত্তমান, নিরপেক্ষ পূর্ণ ভেদ ভ্রমমূলক হইলেও আপেক্ষিক আংশিক ভেদ যে সত্য এবং তাহা অভেদের বিরুদ্ধ নহে, এই কথা হেগেলদর্শনে পরিষ্কাররূপেই দেখান হইয়াছে।" হায় রামানুজ, তুমি কি অপরাধ করিলে?

যাহা হউক, গ্রন্থের সিদ্ধান্তাংশ সম্বন্ধে আমরা তীব্র সমালোচনা করিলাম বটে, কিন্তু, গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত অবিচারিতচিত্তে গ্রহণ বিষয়ে সাবধান থাকিয়া, তল্লিখিত বিভিন্ন অদ্বৈতবাদের বিবরণগুলি পাঠ করিলে অনেকে উপকৃত হইবেন বলিয়া বোধ হয়।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আমরা এই সকল প্রাচীন শ্রদ্ধেয় দার্শনিকগণের আপাতবিরুদ্ধ মতগুলির কোন প্রকার সমন্বয়সাধনে সমর্থ কি না, তদুত্তরে আমরা সংক্ষেপে বলি, দার্শনিক মত হিসাবে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা যুক্তিগর্ভ মত কোনকালে জগতে প্রচারিত হয় নাই বা ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া আশাও করি না। অভেদকে পারমার্থিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া আপেক্ষিকভাবে তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদাভেদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এমন কি, দ্বৈতবাদসমূহেরও স্থান করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, এই সকল দার্শনিক বিচারের উপর অধিক জোর দিলে তাহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, যেমন আমাদের দেশে বা পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিকগণের বাগ্‌বিতণ্ডা কোন কালে মিটে নাই, ভবিষ্যতেও তদ্রূপ মিটিবে না। কেবল যদি স্বীকার করা যায় যে, সাধকের অধিকার ও অবস্থাবিশেষে এই সকল বিভিন্ন মতই অবলম্বনীয় হয়, যতদিন দেহাত্মবোধ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে, ততদিন দ্বৈতভাব, কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতভাব ও সাধনার চরমাবস্থায় পূর্ণ অদ্বৈতভাব অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকটা সামঞ্জস্য হইতে পারে। সাধকের হৃদয়ে এই সকল বিভিন্ন ভাবের বিকাশের সময় তাহার আন্তরিক স্বাভাবিক ভাবের দৃঢ়তাসম্পাদনোদ্দেশ্যে, উহার দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য মতবিশেষের সাময়িক উপযোগিতা থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে ইহাও কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে এবং সর্ব্বদেশের ধর্ম্মেতিহাস এ কথার সমর্থন করে যে, যে কোন দার্শনিক মতাবলম্বীই হউক না কেন, সাধনার তারতম্যে তাহার অন্য ভাবের ভাবুক হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে—অদ্বৈতবাদী দার্শনিক কার্য্যতঃ ঘোর দ্বৈতবাদী এবং দার্শনিক মতে দ্বৈতবাদী হইয়াও সাধক উপাস্যের সহিত প্রেমযোগে তন্ময় হইয়া যথার্থ অদ্বৈতভাবের ভাবুক হইতে পারে।

গ্রন্থে মূল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অবান্তর প্রসঙ্গও অনেক আছে—'পরকালবাদ ও পুনর্জ্জন্ম' সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটা অধ্যায়ই লিখিত হইয়াছে—

ইহাতে পুনর্জ্জন্মবাদ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। হিন্দু পক্ষে ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই, তবে 'মানবজন্ম হইতে আর নিম্ন যোনিতে অবরোহণ সম্ভব নহে'—গ্রন্থকারের এই মত হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং পাশ্চাত্য evolution মতের অযথা প্রভাবই যে এইরূপ মতাবলম্বনের কারণ এবং উহার যে যৌক্তিক কোন ভিত্তি নাই, একথা বলিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। যদি সমগ্র জগৎ এক বস্তুরই পরিণাম বা বিবর্ত্ত হয়, তবে কর্ম্মবশে নিম্ন জীব হইতে উন্নত জীবের অভ্যুদয় হওয়া সম্ভব হইলে, উন্নত জীবও নিকৃষ্টকর্ম্মফলে নীচ যোনি কেন প্রাপ্ত হইবে না, ইহার কারণ ত আমাদের বুদ্ধিগম্য হয় না। আমরা কঠোপনিষদের

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥

এই শ্লোকটীকেই এই তত্ত্বের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করি। উচ্চ নীচ যোনি প্রাপ্ত হওয়া কোনরূপ নিয়তিবশে নহে, উহা মানবেরই কর্ম্মাধীন।

যাহা হউক, আমরা গ্রন্থকারকে ভবিষ্যতে এই সকল বিষয়ে আরও বিস্তৃত ও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করিতে দেখিলে বিশেষ সুখী হইব।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৫ই হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকার অন্তর্গত দত্তপাড়া গ্রামে কলেরার তীব্র প্রকোপ দমনকল্পে সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন। অন্য নানাবিধ সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা ৩১ জন রোগীর চিকিৎসাভার লইয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৪ জন আরোগ্য লাভ করে। এই কার্য্যে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ৫৪৸০, এবং ব্যয়ের পরিমাণ ৫০৷৴৯ পাই। গত ২৪শে মার্চ্চ উক্ত মিশন লাঙ্গলবাঁধ ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে প্রায় ১০০ সেবক প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্নানকালে সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা একটী জলমগ্ন স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিয়া বহুচেষ্টায় তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। তাঁহারা ২২টী কলেরা রোগী, ১টী বসন্তরোগী, ও ৩টী অন্যরোগীর চিকিৎসাও করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৬ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ৯৪ জন হারান লোককে তাহাদের আত্মীয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কার্য্যে প্রাপ্ত দানের পরিমাণ ৯১৴৩, ও ব্যয়ের পরিমাণ ৮৭৷৶০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শ্রীযুত মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাহ্মোৎসব।

(স্বামী সারদানন্দ)

আমাদের বেশ মনে আছে, সেটা হেমন্তকাল; গ্রীষ্মসন্তপ্তা প্রকৃতি তখন বর্ষার স্নানসুখে পরিতৃপ্তা হইয়া শারদীয় অঙ্গরাগ ধারণপূর্ব্বক শীতের উন্মেষ অনুভব করিতেছিল এবং স্নিগ্ধ শীতল নিজাঙ্গে সযত্নে বসন টানিয়া দিতেছিল। হেমন্তেরও তিনভাগ তখন অতীতপ্রায়। এই সময়ের একদিনের ঘটনা আমরা এখানে বিবৃত করিতেছি। ঠাকুরের পরমভক্ত, আমাদিগের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু * সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহার প্রথামত পঞ্জিকা-পার্শ্বে ঐ তারিখ চিহ্নিত করিয়া ঐকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জানিয়াছি, ঘটনা সন ১২৯০ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ সোমবারে, ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে উপস্থিত হইয়াছিল।

তখন কলিকাতার সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে আমরা অধ্যয়ন করি এবং ইতিপূর্ব্বে দুই তিন বার মাত্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছি। কোন কারণে কলেজ বন্ধ থাকায় আমরা † ঐ দিবস অপরাহ্নে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইব বলিয়া পরামর্শ স্থির করিয়াছিলাম। স্মরণ আছে, নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কালে আরোহীদিগের মধ্যে একব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় ঠাকুরের নিকটে যাইতেছেন শুনিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল; আমাদিগের ন্যায় অল্পদিন ঠাকুরের দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছেন। একথাও স্মরণ হয়, নৌকামধ্যে অন্য এক আরোহী আমাদের মুখে ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষপূর্ণ

---

* বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু।

† কুমিল্লা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদা সুন্দর পাল এবং চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)।

বাক্য প্রয়োগ করিলে, বৈকুণ্ঠনাথ বিষম ঘৃণার সহিত তাহার কথায় উত্তর দিয়া তাহাকে নিরুত্তর করেন। যখন গন্তব্য স্থলে উপাস্থত হইলাম তখন বেলা ২টা বা ২॥টা হইবে।

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পাদপ্রান্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "তাইত, তোমরা আজ আসিলে; আর কিছুক্ষণ পরে আসিলে দেখা হইত না; আজ কলিকাতায় যাইতেছি, গাড়ি আনিতে গিয়াছে; সেখানে উৎসব, ব্রাহ্মদের উৎসব। যাহা হউক, দেখা যে হইল, ইহাই ভাল, বস। দেখা না পাইয়া ফিরিয়া যাইলে মনে কষ্ট হইত।"

ঘরের মেজেতে একটী মাদুরে আমরা উপবেশন করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনি যেখানে যাইতেছেন সেখানে আমরা যাইলে কি প্রবেশ করিতে দিবে না?" ঠাকুর বলিলেন, "তাহা কেন? ইচ্ছা হইলে তোমরা অনায়াসে যাইতে পার। সিঁদুরিয়াপটীর মণিমল্লিকের বাটী।" একজন নাতিকৃশ গৌরবর্ণ রক্তবস্ত্র-পরিহিত যুবক ঐ সময়ে গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে এদের মণিমল্লিকের বাটীর নম্বরটা বলিয়া দেত।" যুবক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, '৮১নং চিৎপুর রোড, সিঁদুরিয়াপটী'। যুবকের বিনীত স্বভাব ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি দেখিয়া' আমাদের মনে হইল, তিনি ঠাকুরবাটীর কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্র হইবেন। কিন্তু দুই একমাস পরে, তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া বাহির হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, আমাদের ধারণা ভুল হইয়াছিল। জানিয়াছিলাম, তাঁহার নাম বাবুরাম; বাটী তারকেশ্বরের নিকটে আঁটপুরে; কলিকাতায় কম্বুলিয়াটোলায় বাসা বাটীতে আছেন; মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া অবস্থান করেন। বলা বাহুল্য, ইনিই এক্ষণে স্বামী প্রেমানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিত।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ঠাকুর বাবুরামকে নিজ গামছা, মশলার বেটুয়া ও বস্ত্রাদি লইতে বলিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রণামপূর্ব্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। বাবুরাম পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল লইয়া গাড়ির অন্যদিকে উপবিষ্ট হইলেন। বোধ হয় অন্য এক ব্যক্তিও সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম তাঁহার নাম প্রতাপচন্দ্র হাজরা।

ঠাকুর চলিয়া যাইবার পরেই আমরা সৌভাগ্যক্রমে একখানি গহনার নৌকা পাইয়া কলিকাতায় বড়বাজার ঘাটে উত্তীর্ণ হইলাম এবং উৎসব সন্ধ্যাকালে হইবে ভাবিয়া এক বন্ধুর বাসায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নবপরিচিত বৈকুণ্ঠনাথ, যথাকালে উৎসবস্থলে দেখা হইবে বলিয়া কার্য্যবিশেষ সম্পন্ন করিতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইলেন।

প্রায় ৫ টার সময় আমরা অন্বেষণ করিয়া মণিবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করায় একব্যক্তি আমাদিগকে উপরে বৈঠকখানায় যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঘরখানি উৎসবার্থে পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়াছে এবং কয়েকটি ভক্ত পরস্পর কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মধ্যাহ্নে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়া গিয়াছে, সায়াহ্নে পুনরায় উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইবে, এবং স্ত্রীভক্তদিগের অনুরোধে ঠাকুরকে কিছুক্ষণ হইল অন্দরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

উপাসনাদির বিলম্ব আছে শুনিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলাম। পরে সন্ধ্যা সমাগতা হইলে, পুনরায় উৎসবস্থলে আগমন করিলাম। বাটীর সম্মুখের রাস্তায় পৌঁছিতেই মধুর সঙ্গীত ও মৃদঙ্গের রোল আমাদের কর্ণগোচর হইল। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে বুঝিয়া আমরা দ্রুতপদে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা বলিবার নহে। ঘরের ভিতরে বাহিরে লোকের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে এবং পশ্চিমের ছাদে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে, সেই ভিড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করা এককালে অসাধ্য। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া গৃহমধ্যে ভক্তিপূর্ণ স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে; পার্শ্বে কে আছে, না আছে, তাহার সংজ্ঞা মাত্র নাই। সম্মুখের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ অসম্ভব বুঝিয়া, আমরা পশ্চিমের ছাদ দিয়া ঘুরিয়া বৈঠকখানার উত্তরের এক দ্বারপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। লোকের জনতা এখানে কিছু কম থাকায় কোনরূপে গৃহমধ্যে মাথা গলাইয়া দেখিলাম—

অপূর্ব্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে

হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে ; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐরূপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন। এবং ঐরূপে যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াসে গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব নৃত্য !—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই ; আছে কেবল, আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি ! নির্ম্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ-সংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। ঐরূপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন ; কখন বা তাঁহার পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়া যাইতেছিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল ; আবার কখন বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, মৃদু-বৈরাগ্যবান্‌কে তীব্র বৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান করিতেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেই ক্ষণের জন্য কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রমিত হইয়া তাহাদিগকে ভাববিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ত কথাই নাই, অন্য ব্রাহ্মভক্তসকলের অনেকেও সেদিন মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। আর সুকণ্ঠ আচার্য্য চিরঞ্জীব সে দিন একতারা-সহায়ে 'নাচরে আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে'—ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ঐরূপে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক-কাল কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত হইলে, 'এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে'* এই পদটি গীত হইয়া সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ভক্ত্যাচার্য্যদিগকে প্রণাম করিয়া সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের বেগ সে দিন শান্ত হইয়াছিল।

আমাদের স্মরণ আছে, কীর্ত্তনান্তে সকলে উপবিষ্ট হইলে ঠাকুর আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে 'হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে' † এই সঙ্গীতটি গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ভাবাবিষ্ট হইয়া উহা দুই তিন বার মধুরভাবে গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রূপরসাদি বিষয় হইতে মন উঠাইয়া লইয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের পরম শান্তি লাভ হয়, এই প্রসঙ্গে ঠাকুর সম্মুখস্থ লোক-দিগকে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। স্ত্রীভক্তেরাও তখন বৈঠকখানা-গৃহের পূর্ব্বভাগে চিকের আড়ালে থাকিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা

---

* গীতটি আমাদের যতদূর মনে আছে নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে।
এ নাম নিতাই এনেছে, না হয় গৌর এনেছে,
না হয় শান্তিপুরের অদ্বৈত সেই এনেছে।

† হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
(একবার) লুটয় অবনীতল হরি হরি বলে কাঁদ রে।
(গতি কর কর বলে)
গভীর নিনাদে হরি, হরি নামে গগন ছাও রে।
নাচ হরি বলে দুবাহু তুলে হরিনাম বিলাও রে।
(লোকের দ্বারে দ্বারে)
হরি প্রেমানন্দরসে, অনুদিন ভাস রে।
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, (যত) নীচবাসনা নাশ রে।

প্রশ্ন করিয়া উত্তর লাভে আনন্দিতা হইতে লাগিলেন। ঐরূপে প্রশ্ন সমাধান করিতে করিতে ঠাকুর প্রসঙ্গোত্থিত বিষয়ের দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিবার জন্ম মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) নাম আরম্ভ করিলেন এবং একের পর অন্য করিয়া, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক ভক্তগণ-রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত করিতে থাকিলেন। উহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত গীত কয়টি যে তিনি গাহিয়াছিলেন ইহা আমাদের বেশ স্মরণ আছে—

(১) মজ্‌ল আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

(২) শ্যামাপদ আকাশেতে মনঘুড়িখান উড়্‌তেছিল।

(৩) এ সব খ্যাপা মাগীর খেলা।

(৪) মন বেচারীর কি দোষ আছে। তারে কেন দোষী কর মিছে।

(৫) আমি ঐ খেদে খেদ করি। তুমি মাতা থাক্‌তে আমার
জাগা ঘরে চুরি।

ঠাকুর যখন ঐরূপে 'মার' নাম করিতেছিলেন তখন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ গৃহান্তরে যাইয়া কতকগুলি ভক্তের নিকটে তুলসীদাসী রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। সায়াহ্ন উপাসনার সময় উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া তিনি এখন পুনরায় বৈঠকখানাগৃহে উপস্থিত হইলেন। বিজয়কে দেখিয়াই ঠাকুর বালকের ন্যায় রঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বিজয়ের আজ কাল সঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ। কিন্তু সে যখন নাচে তখন আমার ভয় হয়, পাছে ছাদ শুদ্ধ উলে যায়! (সকলের হাস্য) হাঁগো, ঐরূপ একটি ঘটনা আমাদের দেশে সত্য সত্য হয়েছিল। সেখানে কাঠমাটি দিয়েই লোকে দোতলা করে। এক গোস্বামী গুরু শিষ্যবাড়ী উপস্থিত হয়ে ঐরূপ দোতলায় কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কীর্ত্তন জম্‌তেই নাচ্‌ আরম্ভ হল। এখন, গোস্বামী ছিলেন (বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) তোমারই মতন একটু হৃষ্টপুষ্ট। কিছুক্ষণ নাচ্‌বার পরেই ছাদ ভেঙ্গে তিনি একেবারে একতলায় হাজির হয়েছিলেন। তাই ভয় হয়, পাছে তোমার নাচে সেইরূপ হয়।' (সকলের হাস্য) ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের গেরুয়া বস্ত্র ধারণ লক্ষ্য করিয়া এইবার বলিতে লাগিলেন, 'আজকাল এঁর (বিজয়ের) গেরুয়ার উপরেও খুব অনুরাগ। লোকে

কেবল কাপড়চাদর গেরুয়া করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা, মায় জুতা জোড়াটা পর্য্যন্ত গেরুয়ায় রঙ্গিয়েছে। তা ভাল, একটা অবস্থা হয় যখন ঐরূপ করতে ইচ্ছা হয়—গেরুয়া ছাড়া অন্য কিছু পর্‌তে ইচ্ছা হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই গেরুয়া সাধককে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগে ব্রতী হয়েছে।' গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এইবার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'ওঁ শান্তি, শান্তি, প্রশান্ত হউক তোমার।'

ঠাকুর যখন 'মায়' নাম করিতেছিলেন, তখন আর একটি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহাতে বুঝিতে পারা যায়, অন্তর্মুখে সর্ব্বদা অবস্থান করিলেও তাঁহার বহির্বিষয় লক্ষ্য করিবার শক্তি কতদূর তীক্ষ্ণ ছিল। গান গাহিতে গাহিতে বাবুরামের মুখের প্রতি দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, সে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছে। তাঁহার অগ্রে সে কখনই ভোজন করিবে না একথা জানিয়া, তিনি নিজে খাইবেন বলিয়া কতকগুলি সন্দেশ ও এক গেলাস জল আনয়ন করাইয়াছিলেন, এবং উহার কণামাত্র স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক অধিকাংশ শ্রীযুত বাবুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট, উপস্থিত ভক্তসকলে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

সে যাহা হউক, বিজয় প্রণাম করিয়া সায়াহ্নের উপাসনা করিতে নিম্নে আসিবার কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুরকে আহার করিতে অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা ঐ অবকাশে শ্রীযুক্ত বিজয়ের উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উঠানেই একত্রে উপাসনার অধিবেশন হইয়াছে এবং উহার উত্তর-পার্শ্বে নির্ম্মিত বেদিকার উপরে বসিয়া আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ, ব্রাহ্মভক্ত সকলের সহিত সমস্বরে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক উপাসনা আরম্ভ করিতেছেন। উপাসনাকার্য্য ঐরূপে কিছুক্ষণ চলিবার পরেই ঠাকুর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং অন্য সকলের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া উহাতে যোগদান করিলেন। প্রায় দশপনর মিনিট তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার জন্য

গাড়ি আনয়ন করিতে বলিলেন। পরে হিম লাগিবার ভয়ে মোজা, জামা ও কানঢাকা টুপি ধারণ করিয়া তিনি বাবুরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে সভাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া যথারীতি উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত অবকাশে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া আমরাও গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

ঐরূপে ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুর যে ভাবে আনন্দ করিতেন তাহার পরিচয় আমরা এই দিবসে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মণিবাবু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই যে, তৎকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধতি অনুসারে দৈনিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেন, ইহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। ইঁহারই পরিবারস্থ একজন রমণী উপাসনাকালে মন স্থির করিতে পারেন না জানিতে পারিয়া, ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কাহার কথা ঐ কালে মনে উদয় হয় বল দেখি?' রমণী অল্পবয়স্ক নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালনপালন করিতেছেন এবং তাহারই কথা তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা উদয় হয় জানিতে পারিয়া, ঠাকুর তাঁহাকে ঐ বালককেই বাল-শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি জানিয়া সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিয়াছি, রমণী ঠাকুরের ঐরূপ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে করিতে কিছুকালের মধ্যেই ভাবসমাধিস্থা হইয়াছিলেন। একথা আমরা লীলা-প্রসঙ্গের অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। সে যাহা হউক, ঠাকুরকে আমরা অন্য এক দিবস কয়েক জন ব্রাহ্মভক্তকে লইয়া অন্যত্র আনন্দ করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই চিত্রই এখন পাঠকের সম্মুখে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

বেদান্তের একটী মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ক্যাণ্টের প্রমাণ।

(শ্রীসরসীলাল সরকার)

আমাদের মনের দুইটী অংশ আছে বলিতে পারা যায়—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-বোধ। এই মনের দ্বারাই আমরা বাহ্যবিষয়সকলকে উপলব্ধি করিতেছি—অর্থাৎ তাহারা যে ভাবে মানবজ্ঞানে প্রতিভাত হইতেছে সেইরূপ ভাবে উপলব্ধি করিতেছি। অন্য কথায়, দেশকালে অভিব্যক্ত এই সমগ্র বাহ্যজগৎ কেবলমাত্র আমাদের মনের দ্বারাই আমরা জানিতে পারিতেছি। কিন্তু আমাদের মন, তাহার নিজের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে বস্তুর ভাবচিত্র ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে দিতে পারে না। সুতরাং সমগ্র বাহ্যজগৎ (এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহও) যে পরিমাণে আমাদের মনের দ্বারা আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি,—যে পরিমাণে তাহারা দেশ ও কালের মধ্য দিয়া আমাদের মনে প্রতিবিম্বিত হয়—সেই পরিমাণে তাহারা আমাদের নিজ মনের ভাব-চিত্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

কিন্তু আমাদের মন বাহ্যজগৎকে যে ভাবে আমাদিগের নিকট উপস্থাপিত করে তাহা যে তাহাদের আপাত-প্রতীয়মান ব্যবহারিক রূপ, তাহাদের যে বাস্তবসত্তা নহে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমাদের জ্ঞানে আমরা যে ভাবে বস্তুসমূহকে প্রতিবিম্বিত দেখি, তাহার অতীত ও তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের বাস্তবসত্তা কি, তাহাই জানিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। ইহাই মূল জ্ঞাতব্য বিষয়।

ইহা জানিতে হইলে আমাদের মন যে সংস্কারসমূহে গঠিত তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, এই সংস্কার-সকলের কোন্ অংশ অনাগত বা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান। আর কোন্ অংশ আগত বা জন্মের পরবর্ত্তী। আমাদের মনের যে নিজস্ব অংশটী সমুদায় বাহ্য বা আন্তর বিষয়বোধের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ যাহা

আমাদের জ্ঞানেরই একান্ত স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাকেই আমরা অনাগতসংস্কার বলিতেছি। এবং যাহা আমরা বাহ্য বা আন্তর বিষয়বোধের দ্বারা লাভ করি তাহাকেই বলিতেছি আগতসংস্কার। আর এই বিষয়বোধলব্ধ আগতসংস্কারকেই আমরা, বাস্তবসত্তার সম্পর্কিত বা বাস্তবসত্তার ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারি। এই হিসাবে প্রত্যেক ভাবচিত্রেরই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই অংশ আছে। জ্ঞাতা ছাড়াও কোন ভাবচিত্র নাই—জ্ঞেয় ছাড়াও কোন ভাবচিত্র হইতে পারে না।

জনৈক দার্শনিক একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে এই বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন :—"আমাদের বিষয়বোধের অন্তর্গত এই জগৎকে আমরা একখণ্ড বস্ত্রের সহিত তুলনা করিতে পারি। তাঁতে যেরূপ টানা ও পড়েনে পরস্পরে মিলিয়া বস্ত্র বয়ন করে, আমাদের জগৎও সেইরূপ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দুইয়ের সংযোগে রচিত। আমাদের জগৎ রচনায় যাহা কিছু জ্ঞেয়—আমাদের মন হইতে স্বতন্ত্র, বাহির হইতে আগত, সেগুলিকে পড়েনের সুতার সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। আর আমাদের মনের যে সকল অনাগত বস্তু, নিজস্ব জিনিষ—যাহারা বাহিরের আগত বস্তুকে গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহাদিগকে টানার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। আর এই যে আগত ও অনাগত, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—টানা ও পড়েন, এই দুয়ে মিলিয়াই আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান—সম্পূর্ণ জগৎ-রচনা।"

বস্তুসকল যে ভাবে আমাদের মনের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের প্রকৃত অর্থাৎ বাস্তবসত্তা কিরূপ তাহাই নির্দ্ধারণ করা দর্শনের কার্য্য। তাহা করিতে হইলে বস্তুজ্ঞানের মধ্যে আমাদের মন বা বুদ্ধির দত্ত যে অংশ আছে তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে পৃথক্ করিতে হইবে। মনের যে সকল নিজস্ব অনাগত সংস্কার, যে গুলি পূর্ব্ব হইতেই যেন ছাঁচের মত মনের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, এবং বাহির হইতে আগত উপাদানসমূহ যাহাদের সঙ্গে মিলিয়া বস্তুজ্ঞানের রচনা করিতেছে—মনের সেই অন্তর্নিহিত মূল ধর্ম্মগুলির কথাই এখানে বলিতেছি।

এখন কিরূপে আমাদের বস্তুজ্ঞান হইতে মনের এই সকল মূল ধর্ম্মকে পৃথক্ করা যায়? নিম্নে আমরা ছয়টী লক্ষণের পরিচয় দিতেছি। সেই-

গুলির দ্বারা জ্ঞানের অনাগত সংস্কারসমূহ নিজস্ব মূলধর্ম্ম হইতে আগতসংস্কার-সমূহ বা বিষয়বোধলব্ধ অংশকে পৃথক্ করা যাইতে পারে। রাসায়নিক ব্যাপারে যেমন দ্রব্যবিশেষের সহায়তায় কোন পদার্থকে তদন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করা যায়, অথবা বৈজ্ঞানিক যেমন চুম্বক দ্বারা লৌহকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করেন, এই লক্ষণগুলির দ্বারাও আমরা আমাদের জ্ঞানকে উহার উপাদানসমূহে বিভক্ত করিতে পারি, অনাগত সংস্কার হইতে আগতসংস্কারকে পৃথক্ করিয়া জানিয়া লইতে সমর্থ হই।

এই লক্ষণগুলি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্টই প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার "Critique of Pure Reason" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছিলেন। আর এই গ্রন্থখানিকেই আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই লক্ষণগুলির দ্বারা ক্যাণ্ট তর্কশাস্ত্রের প্রণালী অনুসারে বেদান্তের একটী মূলতত্ত্ব প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন। এই মূলতত্ত্ব আমাদের অন্তর্দর্শী ঋষিরা সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন; আর ক্যাণ্ট ইহাকে যুক্তির অনিশ্চিত মার্গে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ক্যাণ্টের সেই লক্ষণগুলি নিম্নে দেওয়া গেল:—

১। বাহ্য জগৎ হইতে আমরা যে বেদনা (Sensation) পাই, তাহাকে বিষয়বোধে (Perception) পরিণত করিতে হইলে, অন্য একটী উপাদানের প্রয়োজন। এই উপাদানটী সমুদায় বিষয়বোধের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ইহা ব্যতীত বিষয়বোধ হইতেই পারে না। সুতরাং এই উপাদান বাহির হইতে আসিয়াছে বলা যাইতে পারে না—ইহা আমাদের অন্তর হইতেই আসিয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে।

২। যাহা বাহির হইতে আমাদের জ্ঞানে আসে, তাহা অনিশ্চিত লক্ষণযুক্ত। ইহা অন্যরূপ হইতে পারিত, অথবা একেবারে নাও হইতে পারিত, অর্থাৎ আমি ইহার অভাব কল্পনা করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার ভাবচিত্রসকলের মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান আছে, যাহাদের অভাব আমি কল্পনা করিতে পারি না—সেগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা হইতে বোধ হয় যে, সেই উপাদানগুলি আমা হইতে স্বতন্ত্র বাস্তবসত্তার ধর্ম্ম-বিশিষ্ট নহে—পরন্তু আমার জ্ঞানের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

৩। এই কারণেই বাহির হইতে যাহা আসে, তাহা কেবল বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহার নিশ্চয়তার কথা কিছু বলে না; অর্থাৎ সেই বস্তু সেই প্রকারই হইবে, অন্য প্রকার হইতে পারে না, ইহা তাহার দ্বারা জানা যায় না। বিষয়বোধের মধ্যে নিশ্চয়তার ভাব নাই। সুতরাং বস্তুজ্ঞানের মধ্যে যে নিশ্চয়তার ভাব থাকে তাহা কখনই বাহ্যবিষয় হইতে আসে না—আমাদের অন্তরের মধ্য হইতেই আসে।

৪। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে সকল বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ নির্বিরোধ প্রমাণযুক্ত বা প্রতিবাদের অতীত, তাহারা ঐ তত্ত্বগুলি বিষয়বোধ হইতে পাইতে পারে না। সুতরাং যে সকল বিষয় তাহাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত সেগুলি নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধির নিজস্ব ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্কবিশিষ্ট।

৫। বিষয়বোধ কেবল আমাকে কতকগুলি বেদনা দিতে পারে। এই বেদনাগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্কীয়। ব্যাপারটী বুঝা একটু কঠিন হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য যে বাহ্যজগৎ হইতে আমরা যে সকল বেদনা পাই তাহারা কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বেদনা ছাড়া আর কিছুই নহে। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, কেন না তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ বা বন্ধন থাকে না। সম্বন্ধ বা বন্ধন বেদনা হইতে স্বতন্ত্র। যাহা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বেদনাসকলকে একত্ববন্ধনে বাঁধে এবং আমার ভাবচিত্রসকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে, সেটী আমার মনের নিজস্ব ধর্ম্ম বা অনাগতসংস্কার। সুতরাং যাহা কিছু বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক ব্যাপারসকলের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতার কার্য্য সাধন করে, তাহা আমার বুদ্ধিরই নিজস্ব বা মৌলিক ধর্ম্ম।

৬। বিষয়বোধ কখনই অসীমত্ব বা অনন্তত্বের ধারণা দিতে পারে না। সুতরাং আমরা বস্তুজ্ঞানের মধ্যে যদি এমন উপাদান দেখি, যেগুলিকে অসীমত্বের লক্ষণযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি, তবে ইহা নিশ্চিত যে, সেগুলি বিষয়বোধ হইতে পাওয়া যায় নাই—আমার বুদ্ধির মধ্য হইতেই আসিয়াছে। সেই জন্য বিষয়বোধের যতই প্রসার করি না কেন, আমাদের বুদ্ধির যে ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার অনন্তত্বের সম্বন্ধ, সেই ধর্ম্মকে সে কখনই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। আর ইহাই প্রকৃতপক্ষে তাহার অনন্তত্ব-বোধের হেতু।

এই লক্ষণগুলি দ্বারা ক্যাণ্ট দেখাইয়াছিলেন যে আমাদের জ্ঞানলব্ধ বাহ্যজগতের বা জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে তিনটী উপাদান আছে, যেগুলি আমার মনেরই ধর্ম্ম। এইগুলি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আছে; আর ইহাদেরই সঙ্গে জুড়িয়া বিষয়বোধের উপাদানগুলিকে আমরা পূর্ণ বিষয়-বোধ বা ভাবচিত্রে পরিণত করি। প্রকৃতি হইতে আমাদের মনের এই তিনটী ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকেই বাস্তব-সত্তা বা বাস্তবসত্তার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মনের এই তিনটী মূলধর্ম্ম এই :—

১। দেশ; ২। কাল; ৩। নিমিত্ত বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।

এই তিনটী দ্বারাই আমাদের জ্ঞানলব্ধ বাহ্যজগৎ বা ব্যবহারিক জগৎ বাস্তবসত্তা বা সৎবস্তু (ব্রহ্ম) হইতে ভিন্নরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ এইরূপে ক্যাণ্ট বেদান্তের মায়াতত্ত্বই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম "দেশকালানবচ্ছিন্ন," "সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত"। ব্রহ্ম বা সৎবস্তুতে দেশ, কাল বা কার্য্যকারণসম্বন্ধের যে অধ্যাস হইতেছে, তাহা মায়ার ধর্ম্মবশতঃ। এই মায়াকেই ক্যাণ্ট মনের মূলধর্ম্ম বা অনাগত সংস্কার বলিয়াছেন। আর তাহার দ্বারাই আমরা বাস্তব সত্তা বা সৎ বস্তুকে দেশ ও কালের দ্বারা ভিন্ন বা কার্য্যকারণসম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া অনুভব করিতেছি।

নিম্নে আমরা দেশ ও কাল সম্বন্ধে ক্যাণ্টের প্রমাণের পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বে যে ছয়টী লক্ষণের উল্লেখ করা গিয়াছে, ক্যাণ্ট সেইগুলির দ্বারাই এই দুটীকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানলব্ধ বাহ্যজগৎ যে সকল উপাদানের দ্বারা গঠিত তাহার মধ্যে "দেশ" একটী। এই "দেশ" দ্বারাই আমাদের জ্ঞানে বাহ্যবস্তুসকলের পরস্পরের সংস্থান-সম্বন্ধ নির্ণীত হয়; অর্থাৎ বাহ্যবস্তুসকল পরস্পরের সম্বন্ধে কি ভাবে অবস্থিত আছে তাহা দেশ-দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই "দেশ" আমা হইতে স্বতন্ত্র কিছু হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহা আমার মনেরই একটী মূল ধর্ম্ম।

প্রথম প্রমাণ।—আমার মনে দেশজ্ঞান হইতেছে। এই দেশজ্ঞান হয় বাহ্যবিষয় বোধ হইতে, অথবা আমার মনের মধ্য হইতেই আসিতেছে। এখন, এই দেশজ্ঞান বিষয়বোধ হইতে আসিতে পারে না; কেননা সমস্ত

বিষয়বোধের গোড়াতেই এই দেশজ্ঞান। দেশজ্ঞান ব্যতীত বিষয়বোধ হইতেই পারে না। বিষয়বোধ ব্যাপারটা কি তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। আমরা বহির্জ্জগৎ হইতে কতকগুলি বেদনা পাইতেছি। বহির্জ্জগতের কোন কিছুর সঙ্গে আমরা সেই সকল বেদনার সম্বন্ধনির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি; আবার সেই সকল বেদনা পরস্পরের সম্বন্ধে যেরূপভাবে অবস্থিত তাহাও নির্ণয় করিতেছি। ইহাই বিষয়বোধ। এখন দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব হইতেই এই দেশজ্ঞান না থাকিলে কোন বিষয়বোধই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব এই দেশজ্ঞান বিষয়বোধ হইতে আসিতে পারে না। ইহা আমাদের মন হইতেই আসিয়াছে বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ।—আমরা বাহ্যজগতের ভাবচিত্র হইতে সকলই চিন্তাদ্বারা উড়াইয়া দিতে পারি, তাহাদের অভাব কল্পনা করিতে পারি। কেবল পারি না দেশকে উড়াইয়া দিতে। "দেশ" নাই এ কল্পনা আমি করিতে পারি না। কিন্তু বাহ্যবস্তুসকলের অভাব আমি অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি। ইচ্ছা করিলে বিশ্বজগতের সকল বস্তুকেই আমি কল্পনা দ্বারা উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু বিশ্বান্তর্গত দেশকে আমি উড়াইয়া দিতে পারি না; কেননা দেশের অভাব কল্পনা করা অসম্ভব। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জ্ঞেয় বস্তুসকলের সঙ্গে দেশের কোন সম্বন্ধ নাই; উহা আমারই মনের ধর্ম্ম। আর সেই কারণেই যখন আমি বস্তুসকলের অভাব কল্পনা করি, তখন দেশের অভাব কল্পনা করিতে পারি না।

তৃতীয় প্রমাণ।—"দেশে"র সমস্ত বিশিষ্টবোধ, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুসম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ "দেশ"-নির্দ্দেশ নিশ্চয়তা-লক্ষণযুক্ত; অর্থাৎ উহা সেইরূপই হইবে, অন্যরূপ হইতে পারে না এবং উহার বিপরীত কল্পনা করা অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন বস্তুকে পাইতে হইলে, ঐ বস্তু ও আমার মধ্যস্থিত দেশের ব্যবধানকে অতিক্রম করিতেই হইবে; উহার কোন স্থানেই না থাকা বা এক সময়ে দুই স্থানে থাকা অসম্ভব, ইত্যাদি। ঐ সকল স্থলে বিশিষ্ট দেশবোধের মধ্যে যে নিশ্চয়তার ভাব আছে, পুনঃ পুনঃ সংঘটিত বিষয়বোধের দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না। কেন না, বিষয়বোধ আমাকে শুধু ইহাই বলে যে, এপর্য্যন্ত কোন বস্তু এইরূপই ছিল, অন্যরূপ হয়

নাই। কিন্তু সেই বস্তু যে নিশ্চয়ই সেইরূপ, অন্যরূপ হইতে পারে না, বিষয়বোধ তাহা আমাকে বলিতে পারে না। অতএব যে দেশজ্ঞান সর্ব্বদাই নিশ্চয়াত্মক, তাহা অনিশ্চিত বিষয়বোধ হইতে কখনই আসিতে পারে না। তাহা আমার মন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিতে হইবে।

চতুর্থ প্রমাণ।—জ্যামিতির প্রতিপাদ্য বিষয়সকল নির্ব্বিরোধ প্রমাণ-সহকারে সিদ্ধ, অর্থাৎ তাহারা নিশ্চয়তার লক্ষণযুক্ত। এই কারণেই ঐ বিদ্যাতে প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধবাদ বা অনুমিতির অস্তিত্ব নাই। অন্যান্য অনুমানমূলক বা পরীক্ষামূলক সকল বিদ্যাই এই প্রকার বিরোধবাদ ও অনুমিতির দ্বারা পূর্ণ। উহা হইতেই নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, জ্যামিতির তত্ত্বগুলি বিষয়বোধ হইতে পাওয়া যাইতে পারে না, আর সেই কারণেই এই বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি পরীক্ষাসাপেক্ষ নহে। এখন, জ্যামিতির প্রতি-পাদ্য বিষয় "দেশ", আর এই "দেশ"-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবার জন্যই জ্যামিতি বিন্দু, রেখা, বস্তুপৃষ্ঠ, বস্তু, এই সকলের কল্পনা করিয়া থাকে। নাট্যকার তাঁহার ঈপ্সিত-চরিত্র-অঙ্কনের জন্য নানারূপ কাল্পনিক ঘটনা-সংযোগ করিয়া থাকেন। কেন না, সেই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়াই নাটকীয় চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়া উঠে। জ্যামিতিতেও তেমনই "দেশে"র নিয়মাবলী আবিষ্কারের জন্য রেখা, বিন্দু ইত্যাদি কল্পিত হইয়া থাকে, আর সেই সকলের মধ্য দিয়াই দেশসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রকটিত হইয়া থাকে। অতএব দেশ যে আমার মনেরই মূলধর্ম্ম—অনাগত সংস্কার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পঞ্চম প্রমাণ।—প্রত্যেক বাহ্য বিষয়বোধ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বলা যাইতে পারে;—সেগুলি বহিরাগত অসংখ্য পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বেদনা। তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে আমার মনের সম্বন্ধ আছে কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই। যদ্দ্বারা সেই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বেদনাসমূহ সংযুক্ত ও সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া একটা অখণ্ড বিষয়বোধে পরিণত হয়, সেই ধর্ম্ম বাহির হইতে আসিতে পারে না। আমার অন্তর হইতেই আসে। আর এই যে ধর্ম্ম, যাহা বাহ্য বেদনাসমূহের সংযোগ-সেতু-স্বরূপ, যাহার দ্বারা অসংখ্য বিচিত্র বাহ্যবেদনা একত্র গ্রথিত হইয়া অখণ্ড

বাহ্য বিষয়বোধে পরিণত হয়, তাহাই দেশ। সুতরাং দেশ যে বাহিরের জিনিষ নহে, আমার ভিতরেই, তাহা স্থিরনিশ্চিত।

ষষ্ঠ প্রমাণ।—"দেশ" অনন্ত। সমস্ত সৌরজগতের বাহিরে, যেখানে দূরবীক্ষণের দৃষ্টি যায় না, কোন বিষয়বোধই যে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, আমি নিশ্চয় জানি যে সেখানেও "দেশ" আছে। এই দেশ-জ্ঞান বিষয়বোধ হইতে আমি পাইতে পারি না। সুতরাং ইহা আমার মনেরই মূলধর্ম্ম—অনাগত সংস্কার।

ক্যাণ্ট দেখাইয়াছেন যে "দেশ" যেমন বস্তুসকলের পরস্পরের সংস্থিতি বা অবস্থিতির সম্বন্ধ, "কাল" সেইরূপ তাহাদের আনন্তর্য্যের সম্বন্ধ, আবার "নিমিত্ত" বা কার্য্যকারণবোধ তাহাদের ক্রিয়াসম্বন্ধ-জ্ঞাপক। সুতরাং "দেশ"কে অনাগত সংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করা হইল, কাল ও কার্য্যকারণ বোধ সম্বন্ধেও সেই সকল প্রমাণ আবশ্যকমত ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন বেদান্তের ভাবে আরও কতদূর পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে অন্য প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ভগবান বুদ্ধ ও ভিক্ষুদ্বয়।

(পালি গল্প)

(শ্রীগোকুলদাস দে)

শ্রাবস্তী নগরে দুইজন বন্ধু বাস করিতেন; একজন বয়সে কিছু প্রবীণ, অপরটী অল্পবয়স্ক। তাঁহারা একদিন বিহারে (মঠে) ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশবাণী শ্রবণে পার্থিব সুখসকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পঞ্চবর্ষকাল আচার্য্য (যিনি মঠভুক্ত করেন) এবং উপাধ্যায়ের (যিনি সন্ন্যাস দেন) নিকট বাস করিবার পর তাঁহারা উভয়ে একদিন শাস্তার নিকট আসিলেন এবং

ধর্ম্মের পথ কি কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পথ দুইটী; একটী একান্তে অনিত্য পদার্থসকল চিন্তা করিয়া বৈরাগ্যের দ্বারা মনের বিশুদ্ধি আনয়ন করা (বিপস্‌সনাধুর), এবং অপরটী ত্রিপিটকাদি বুদ্ধবচনাত্মক সমস্ত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর করা (গন্থধুর)। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি বলিলেন, "ভগবন্, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা লইয়াছি, সেজন্য গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া অর্হত্ব লাভ আমার দ্বারা হইবে না, অতএব আমি ধ্যানধারণা দ্বারা তাহা অর্জ্জন করিব।" তৎপরে তিনি অর্হত্ব লাভের নিমিত্ত শাস্তার নিকট হইতে ধ্যানের বিষয়সকল জ্ঞাত হইয়া তাহা অধ্যবসায়ের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে চতুর্ব্বিধ দিব্য জ্ঞানের (পটিসম্ভিদা) সহিত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অপর বন্ধুটী বলিলেন, "আমি গ্রন্থপাঠরূপ মার্গ অবলম্বন করিব।" তদনুসারে তিনি ত্রিপিটকনিবদ্ধ বুদ্ধবচনাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া, যেখানে যেখানে গমন করিতেন সেইখানেই ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিতেন, মধুরভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন, পঞ্চশত ভিক্ষুর উপদেষ্টা হইয়া বিচরণ করিতেন এবং অষ্টাদশ ছাত্রসঙ্ঘের আচার্য্যরূপে পরিগণিত হইলেন। অপর ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট স্ব স্ব ধ্যানের বিষয়সকল জ্ঞাত হইয়া প্রবীণ ভিক্ষুটীর নিকট আগমন করিতেন এবং তাঁহার উপদেশে অর্হত্ব লাভ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা পূর্ব্বক বলিতেন, "আমাদের শাস্তাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।" স্থবিরও তাঁহাদিগকে অনুমতি দিয়া বলিতেন, "ভ্রাতৃগণ, যাও, আমার হইয়া শাস্তাকে ও অশীতি মহাস্থবিরকে বন্দনা করিও এবং আমার বন্ধু ভিক্ষুকেও, 'আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন' এই বলিয়া বন্দনা করিও।" তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক শাস্তার নিকট আগমন করিয়া ঐরূপ করিতেন। একবার তাঁহারা ঐরূপ নিবেদন করিলে অল্পবয়স্ক গ্রন্থধর ভিক্ষু বলিলেন, "তিনি আবার কে?" তাঁহারা বলিলেন, "তিনি আপনার বন্ধু।"

"তোমরা তাঁহার নিকট কি শিখিয়াছ? 'দীর্ঘনিকায়' মধ্যে কোন নিকায় (অর্থাৎ অংশ), না ত্রিপিটকের কোন এক পিটক?"

ইঁহারা নীরব হইলেন। ভিক্ষু ভাবিলেন, "তিনি চারি-পদ-বিশিষ্ট গাথা জানেন না, প্রব্রজ্যা লইয়াই জীর্ণচীর ধারণ করিয়া অরণ্যমধ্যে বহু শিষ্য

পাইয়াছেন মাত্র; এখানে আসিলেই আমি তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।”

অপর এক সময় সেই স্থবির শাস্তাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বন্ধু ভিক্ষুর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার আশ্রমে স্বীয় পাত্র এবং পরিধেয় কাষায়বস্ত্র রক্ষা করিলেন, এবং শাস্তার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং অশীতি মহাস্থবিরকে বন্দনা করিয়া বন্ধুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুটীও তাঁহার যথাবিধি আতিথ্য বিধান করিয়া সমতুল্য এক আসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মানসে উপবেশন করিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে শাস্তা এই ঘটনা জানিতে পারিলেন, এবং পাছে বীতস্পৃহ নিজ পুত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা তাপিত করিলে স্থবিরা ভিক্ষুকে নিরয় ভোগ করিতে হয়, এই ভাবিয়া তাঁহার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া যেন বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বকল্পিত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। যেখানেই ভিক্ষুগণ বসিতেন সেখানেই তাঁহারা ভগবানের জন্য একটী পৃথক্ 'বুদ্ধাসন' রচিত করিয়া রাখিতেন। সেই নিমিত্ত শাস্তা স্বকীয় নির্দ্দিষ্টাসনে বসিলেন। গ্রন্থধর ভিক্ষুর আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল না। পরন্তু, শাস্তা উপবেশনানন্তর তাঁহাকে প্রথম ধ্যানের বিষয় প্রশ্ন করিলেন। তিনি তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। পরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, প্রভৃতি অষ্টবিধ ধ্যানের বিষয় প্রশ্ন করিলেন। তিনিও তাহাদের যথাবিধি উত্তর প্রদান করিলেন; কেন না এ সমস্ত বিষয় গ্রন্থে লিখিত আছে। অনন্তর শাস্তা স্রোতাপত্তি-ফলবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্রোতাপত্তি অর্হত্ত্ব লাভের প্রথম সোপান। যিনি নির্ব্বাণ-মার্গরূপ স্রোতকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসবান হন। তাঁহার নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মাইবার আর আশঙ্কা থাকে না এবং তিনি সাত জন্ম পরে নিশ্চিত নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহা উপলব্ধির বস্তু, সুতরাং গ্রন্থধর ভিক্ষু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তৎপরে ভগবান্ বীতস্পৃহ ধ্যানী ভিক্ষুকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদান করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে বহু সাধুবাদ প্রদান করিয়া আবার গ্রন্থধর ভিক্ষুকে সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎফলবিষয়ক প্রশ্ন

করিলেন। সকৃদাগামী স্রোতাপন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন, তিনি আর এক জন্মেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। অনাগামী পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয় অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে আর জন্ম না লইয়া অত্যুচ্চ ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। অর্হৎ চতুর্থ এবং শেষ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। ইনি পূর্ণজ্ঞানী, ইহ জন্মেই রিপুসকল বশীভূত ও কামনাসকল ক্ষয় করিয়া পরম শান্তি (নির্ব্বাণ) লাভ করিয়াছেন। ইনি মৃত্যুর পর পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অর্থাৎ সংস্কার-বিহীন হইয়া আর কখনও কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ না করিয়া পরিপূর্ণ বোধিতে লীন হইবেন। গ্রন্থধর ভিক্ষু এ সকল বিষয় উপলব্ধি করেন নাই বলিয়া তাহাদের উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু বাসনারহিত ভিক্ষু তাহাদের প্রত্যেকেরই যথাযথ উত্তর দিলেন। শাস্তা প্রতিবারেই তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। ইহা শুনিয়া, পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তলোকবাসী দেবতা, নাগ এবং সুপর্ণগণ সকলেই সাধুবাদ দিয়া উঠিলেন।

এই সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া গ্রন্থধর ভিক্ষুর শিষ্যমণ্ডলী এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন, "শাস্তা কি করিলেন? যে বৃদ্ধ ভিক্ষু কিছু জানেন না তাঁহাকে চারি বিষয়েই সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এবং আমাদের আচার্য্যদেব যিনি সমস্ত বুদ্ধবচন কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং পঞ্চশত ভিক্ষুগণের নেতা তাঁহাকে এতটুকুও প্রশংসা করিলেন না!"

অনন্তর শাস্তা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কথা কহিতেছ?" তাঁহারা উক্তরূপ বলিলে, তিনি বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের আচার্য্য আমার ধর্ম্মের ঠিক বৃত্তিজীবী গোপালকের মত, কিন্তু আমার পুত্র দধি দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পঞ্চবিধ গব্যবস্তু পরিভোগী গো-স্বামীর ন্যায়।" এই বলিয়া ধম্মপদের নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় কহিলেন;—

'বহুং পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো,
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং
ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি।

'অপ্পং পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মস্‌স হোতি অনুধম্মচারী
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং
সম্মপজানো, সুবিমুত্তচিত্তো
অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা
স ভাগবা সামঞ্‌ঞস্‌স হোতীতি।'

"যিনি বহু হিতযুক্ত বুদ্ধবচন কেবল মাত্র আবৃত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য না করিয়া অলসভাবে দিন যাপন করেন, তিনি অপরের গোপালকের ন্যায় কেবল বৃত্তি লাভ করেন মাত্র। সন্ন্যাসগ্রহণের কোন ফল প্রাপ্ত হন না।"

"যিনি অল্পমাত্রও হিতযুক্ত বুদ্ধবচন কহেন এবং সদ্ধর্ম্মের সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করেন, রাগ দ্বেষ মোহাদি ত্যাগ করিয়া সম্যক্‌জ্ঞানলাভে যিনি নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, যাঁহার ইহলোকে বা পরলোকে কোন প্রকার আসক্তি নাই, তিনিই সন্ন্যাসফলের অধিকারী হন।"

বেদান্ত ও ভক্তি।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

আমাদের বাঙ্গালা দেশে 'অমুক বেদান্তী' বলিলেই অনেকের মনে এখনও এই ভাব জাগরিত হয় যে, লোকটা একরূপ নাস্তিক,—তাহার দেবদেবীতে, মন্দিরে প্রতিমায়, সাধারণ প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। এই ধারণা বাঙ্গালীর অন্তরে কিরূপে বদ্ধমূল হইল, এই ধারণার বাস্তবিক কোন যথার্থ ভিত্তি আছে কি না, এই বিষয়ের অনুসন্ধান বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু বেদান্তের চর্চ্চা করিয়াছি তাহার ফলে, সৌভাগ্যক্রমে যে সকল যথার্থ বৈদান্তিকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাঁহাদের জীবন ও উপদেশে, এবং নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বরং তাহার

বিপরীত ভাবই সম্পূর্ণ সত্য। এই ধারণার উৎপত্তির কারণ, বঙ্গদেশে বেদান্তশাস্ত্রের প্রচারের অপ্রাচুর্য্য এবং নাস্তিককল্প, কালাপাহাড়তুল্য কতকগুলি ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের অযথাভাবে আপনাদিগকে বৈদান্তিক বলিয়া অভিহিত করা, এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ অ-বৈদান্তিক মতকে বেদান্তের নাম দিয়া বেদান্তের আবরণে চালান। ইহার আরও একটী বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। শঙ্করমতাবলম্বী অদ্বৈতবেদান্তিগণই কতকটা জোর করিয়া আপনাদিগকেই একমাত্র বৈদান্তিক বলিয়া অযথা দাবী করেন, আবার রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের সম্প্রদায়ভুক্তগণ আপনাদিগকে বৈদান্তিক আখ্যায় পরিচিত করিতে গৌরব বোধ না করিয়া, আপনাদিগকে 'ভক্ত' নামক এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত করিতে ভালবাসেন, যদিও তাঁহাদিগকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতস্থাপনার জন্য বেদান্তকেই মূলভিত্তি করিতে হইয়াছে—কারণ, দেখা যায়, এই ভারতে যিনি বেদান্তপ্রমাণের উপর নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা না করিয়াছেন, তাঁহার মত অতি উৎকৃষ্ট, যুক্তিপূর্ণ ও উচ্চ জীবনের সহায়ক হইলেও সর্ব্বসাধারণের মনে তাদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই।

আমরা যে তিনটী কারণের নির্দ্দেশ করিলাম, একে একে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু প্রথমেই বেদান্ত জিনিষটা কি, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া রাখিলে, আলোচ্য বিষয় বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে। সদানন্দ যোগীন্দ্র তৎপ্রণীত বেদান্তসারে বেদান্তের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন। "বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।" অর্থাৎ উপনিষদ্‌ই মূল বেদান্ত, সেই উপনিষদ্ ভালরূপে বুঝিবার যাহাতে সাহায্য হয়, সেই শারীরক সূত্র প্রভৃতিকেও গৌণভাবে বেদান্তপদবাচ্য বলা যাইতে পারে। পাঠক এখানে দেখুন, মূল বেদান্ত বলা হইতেছে উপনিষদ্‌কে —ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রও তত্তুলনায় গৌণ—শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের উহার সহিত ত একান্ত সম্বন্ধই নাই।

আমাদের বঙ্গদেশে এখনও উপনিষদ্‌গ্রন্থের যথার্থ আদর ও বহুল চর্চ্চা আরম্ভ হয় নাই। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি, গীতারচর্চ্চা বঙ্গদেশে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়াছে। এমন কি, গীতা পড়ে নাই এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীই

নাই, এ কথা বোধ হয় অতিরঞ্জনদোষদুষ্ট না হইয়া অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। কত মহাত্মা গীতামূল পাঠের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন, গীতার কত প্রকার পকেট এডিশন, কত প্রকার বিস্তারিত ভাষ্যটীকাটিপ্পনী-সমেত, অথবা বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনাযুক্ত সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, উহার কত উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, গীতা অবলম্বনে কত পণ্ডিত ও সাধকের সুচিন্তিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ও পুস্তকরাশি প্রকাশিত হইয়াছে; এমন কি, উহার বঙ্গানুবাদ আমরা এক পয়সায় ফিরি করিতে দেখিয়াছি। গীতা আলোচনার জন্য কত স্থায়ী ও অস্থায়ী সভাসমিতিরও প্রতিষ্ঠা ও আয়োজন হইয়াছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? এই গীতার আলোচনায় যে বঙ্গদেশীয় সমগ্র হিন্দুসমাজ ও সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ই কিছু না কিছু উপকৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই, কিন্তু এক হিসাবে গীতাকে অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থ ও জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্নমতের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যকারী গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও উপনিষচ্চর্চ্চারহিত কেবল গীতাপাঠে দোষ ও অসম্পূর্ণতা উভয়ই থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ, গীতায় শ্রীকৃষ্ণোক্তিরই প্রাধান্য—সেই শ্রীকৃষ্ণ অধিকাংশ স্থলে 'আমাকে উপাসনা কর' বলিতেছেন। এস্থলে 'আমাকে' শব্দে যদিও বহু প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকার 'ব্রহ্মকে' বুঝিয়াছেন, কিন্তু অনেকে ইহাতে যে কৃষ্ণরূপধারী ভগবানেরই ইঙ্গিত পাইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি কৃষ্ণমূর্ত্তির উপাসনাই গীতার বাস্তবিক মত হয়, তবে শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বঙ্গ-দেশীয় প্রবল সম্প্রদায়সমূহের গতি কোথায়? সুতরাং এক হিসাবে গীতাকে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিলেও বিশেষ অন্যায় হয় না। আর এক কথা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, গীতার মূল কোথায়? উপনিষদের কয়েকটী শ্লোক অপরিবর্ত্তিত বা আংশিক পরিবর্ত্তিতভাবে গীতায় উদ্ধৃত দেখা যায়। কোন মহাপুরুষ উপনিষদ্ ও গীতার সম্বন্ধে বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মের অতিশয় অপরিণত অবস্থা হইতে কিরূপে চরম তত্ত্ব ধীরে ধীরে সোপানক্রমে বিকশিত হইতেছে, উপনিষদে তাহার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্যই উহাকে এক প্রকাণ্ড অরণ্যাণীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন জঙ্গলে নানাবিধ গাছপালা, তন্মধ্যে হয়ত একটী গোলাপগাছে একটী অতি উৎকৃষ্ট

গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। গোলাপ ফুলটাকে গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লইলে তাহার সৌন্দর্য্যসম্ভোগ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে এইরূপে স্থানভ্রষ্ট করাতে, জঙ্গলের অন্যান্য গাছের, এবং গোলাপ গাছেরই পাতা, শিকড়, কাঁটা, ডালপালা প্রভৃতির তুলনায় উহার আপেক্ষিক মূল্য, এবং উহার উৎপত্তি ও বিকাশরহস্যও বুঝিতে পারা যায় না—সুতরাং আমরা তাহার উপযুক্ত আদর করিতে পারি না। তবে এই ব্যস্ততার যুগে এইরূপ আলোচনা ও গবেষণায় কয়টা লোকের সময় আছে? তাই স্বয়ং ভগবানরূপ মালীই যেন ঐ জঙ্গলেরই নানাস্থান হইতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া গীতাকারে সাধারণের হস্তে উপহার দিয়াছেন। আমি বলি, ফুলের তোড়া লইয়া খুব নাড়াচাড়া হইয়াছে, আরও হউক—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনায় উহার যথার্থ তত্ত্ব ও উৎপত্তিরহস্যও আলোচিত হইতে আরম্ভ হউক। রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে উপনিষৎ-চর্চ্চার সূত্রপাত করিয়া যান—কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত উহা পর্য্যাপ্ত প্রচার লাভ করিল না। এমন কি বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও ভিতর উপনিষদের বিশেষ চর্চ্চা না দেখিয়া হতাশ্বাস হইতে হয়। ইহার একটা কারণ বোধ হয় অনেকে উপনিষদের শব্দার্থ হৃদয়ঙ্গম করাও অতি কঠিন—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করেন। কিন্তু একবার আরম্ভ করিলে অতি সামান্য চেষ্টায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প সংস্কৃত জ্ঞানের সহায়তায়ই উহার শব্দার্থ অনায়াসে আয়ত্ত করা যায়। আমাদের প্রস্তাব—উপনিষৎসমূহের বিশুদ্ধ সুলভ উৎকৃষ্ট সংস্করণসমূহ প্রকাশিত হউক, বিভিন্ন স্থানে প্রধানতঃ উপনিষৎ চর্চ্চার জন্য সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক, সুবক্তা ও সুকথকগণ উপনিষদ্বিষয়িনী বক্তৃতা ও কথকতা করুন। মাসিক ও অন্যান্য পত্রিকায় উপনিষৎসম্বন্ধে সহজবোধ্য, সরল ও সুচিন্তিত প্রবন্ধসমূহ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হউক—এই সকল ও এতদ্বিধ বিবিধ উপায়ে উপনিষৎকে 'লোকায়ত' (popular) করা হউক—দেখা যাইবে, বেদান্তের উপর সাধারণের অযথা ধারণা দূরীভূত হইতেছে।

উপনিষদের পরেই ব্যাসরচিত ব্রহ্মসূত্র, শারীরক-সূত্র, বেদান্তসূত্র বা উত্তর-মীমাংসা। সাধারণতঃ ইহা বিনা ভাষ্যসাহায্যে অধীত হয় না। সূত্রগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে, অনেক স্থলে তাহাদের যথার্থ তাৎপর্য্য ভাল বুঝা যায় না।

সুতরাং সাধারণতঃ বর্ত্তমানে যে সর্ব্বপ্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায়, সেই শাঙ্কর-ভাষ্যই উহার সঙ্গে অধীত হইয়া থাকে। ইহার একটী মহান্ দোষ এই যে, সূত্রকারের যথার্থ অভিপ্রায়টী কি, তাহা একরূপ চাপা পড়িয়া ভাষ্যকারের মতই মুখ্য হইয়া পড়ে। সেই কারণে শঙ্কর ও চৈতন্যপ্রচারিত দার্শনিক-মতের মধ্যে যেটীই যুক্তিযুক্ত বা উৎকৃষ্টতর হউক না কেন, সে বিচার রাখিয়া, চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের মুখনিঃসৃত বলিয়া উল্লিখিত, "তিনি ব্রহ্মসূত্র বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, 'ভাষ্যমেঘ' ঐ সূত্রার্থ আচ্ছাদন করিয়াছে", এ বাক্যের ভিতর একটী গভীর সত্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। সূত্রার্থ—ব্যাসের অভিপ্রায় স্বাধীনভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশীয়—বঙ্গদেশীয় বা বলি কেন, বোধ হয় ভারতবর্ষীয় কোন পণ্ডিতই ঐ বিষয়ে আধুনিককালে কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। একমাত্র জর্ম্মণদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত পরলোকগত থিব সাহেব তাঁহার শাঙ্করভাষ্যসম্বলিত ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদের প্রারম্ভে সুদীর্ঘ অবতরণিকায় এ বিষয়ে তাঁহার সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার আলোচনাকে রামানুজের প্রতি অযথা পক্ষপাত-দুষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহাকেও ত ঐ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিতে অথবা উক্ত সাহেব পণ্ডিত যে ভাবে উক্ত তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, সেই ভাবে তাঁহার আলোচনার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে দেখিলাম না। এ দেশে কি পাণ্ডিত্য ও সমালোচনাশক্তির এতই অভাব হইয়াছে? উক্ত সমালোচনা-শক্তির বিকাশ না হইলে ব্রহ্মসূত্র যে একমাত্র অদ্বৈতপ্রতিপাদক, এই মতই অন্ধ বিশ্বাসের ন্যায় বলবান থাকিবে। সুতরাং আমাদের বিচার্য্য বিষয় হওয়া উচিত, প্রথমতঃ—ব্যাস সূত্রে কি মীমাংসা করিয়াছেন, কেবল সূত্রের শব্দার্থ আলোচনা করিয়া আমরা তাহা অনেকটা নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারি কি না; দ্বিতীয়তঃ—ব্যাসের যে সিদ্ধান্ত, তাহা উপনিষৎ-সম্মত কি না। এই বিচারের উপযুক্ত পণ্ডিত কি আমাদের বঙ্গদেশে নাই? কেবলই কি চির-কাল অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয়েই থাকিতে হইবে? যাহা হউক, এই বিচার সুগম করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের একখানি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সাময়িক অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বোধ হয়,

এই বিচারে এই একটা উৎকৃষ্ট ফল ফলিবে যে, বেদান্ত বা উপনিষৎ কেবল বাদ-বিশেষের সমর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন না হইয়া সাধনার বিভিন্ন অবস্থাবিশেষে সকল বাদেরই সত্যতাপ্রতিপাদক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে দার্শনিক মতবিশেষের পূর্ণ সত্যতা ও তদ্বিরোধী মত-সমূহের সম্পূর্ণ ভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে একটা মস্ত চেষ্টা চলিয়াছে, তাহার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইবে এবং উদারতর বিচার-পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব হইবে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টিবলে অতি সহজ ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—"মিছরির রুটি সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে।" দার্শনিকের চুলচেরা বিচারে, বিভিন্ন দার্শনিকের বিভিন্ন শব্দ-প্রয়োগে—বস্তুর কিছু তারতম্য হয় না। বহুত্বের ও ভেদের নয়নান্ধকারী ধূলিজাল ভেদ করিয়া জ্ঞানী সাধক একত্বের নির্ম্মলপ্রকাশদর্শনে কৃতার্থ হন।

এই সকল ব্যতীত উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের যত বিভিন্ন ব্যাখ্যা-প্রণালী আছে, তাহাদের সমুদায়কে বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রচার করিতে হইবে, এবং এইরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যার ভিতর কতটাই বা যথার্থ পার্থক্য ও কতটাই বা একত্ব, তাহার তুলনায় সমালোচনা করিতে হইবে। শুধু দার্শনিক মতে নহে, শিক্ষাপ্রণালী ও অনুষ্ঠানেও আমরা এখানে মোটামুটি এ কথা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, এইরূপ আলোচনা করিলে সাধন-প্রণালী এবং মুখ্য অনুষ্ঠানগুলিতে এই সকল বিভিন্ন দার্শনিক মতাবলম্বীদের ভিতর অল্প প্রভেদই দৃষ্ট হইবে।

একজন অদ্বৈতমতাবলম্বীর কথা ধরুন। অদ্বৈতবাদী যদি এখনও সাধক হন, অর্থাৎ যদি অদ্বৈতজ্ঞান এখনও তাঁহার অপরোক্ষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সাধনা কি প্রকার হইবে? অদ্বৈতবাদীর সাধনপ্রণালীর আলোচনা করিতে গেলে আবার পূর্ব্বোদ্ধৃত সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার হইতেই বেদান্তের অধিকারী সম্বন্ধে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিতে হয়।

তাঁহার মতে, যিনি বেদের অর্থ মোটামুটি একরূপ জানিয়াছেন, যিনি কাম্য ও নিষিদ্ধ বর্জ্জনপূর্ব্বক ইহজন্মে বা জন্মান্তরে নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়-শ্চিত্ত ও উপাসনা কর্ম্ম করিয়াছেন, যিনি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া একান্ত নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন এবম্বিধ মানবই বেদান্তের অধিকারী।

এখন দেখুন, নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনার ভিতর সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান পূজাদি আসিয়া পড়ে কি না। উপাসনা শব্দের অর্থ করা হইয়াছে —'সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক-মানস-ব্যাপার-রূপাণি শাণ্ডিল্য-বিদ্যাদীনি।' এই শাণ্ডিল্যবিদ্যা ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে, তাহাতে ব্রহ্মকে 'তজ্জলান্' অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সমুদয় জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়, সুতরাং সর্ব্বস্বরূপ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ, সমুদয় রূপরসাদিযুক্ত প্রভৃতি রূপে আত্মার সহিত অভেদভাবে চিন্তা করিতে হয়। ইহা কেবল মাত্র মানস-ব্যাপার বটে, কিন্তু এই মানসব্যাপারে কৃতকার্য্য হইবার জন্যই বাহ্য উপাসনার বিধান—সুতরাং যিনি মানস উপাসনাশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি যে স্বভাবতঃই বাহ্য উপাসনার অনুষ্ঠানে নিরত হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। তার পর উক্ত অধিকারীর লক্ষণে আর একটী কথা আছে যে, যিনি পূর্ব্বজন্মে এগুলি করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, পূর্ব্বজন্মে যে কেহ উক্ত অনুষ্ঠানগুলি করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি?—না "নিতান্ত-নির্ম্মলস্বান্তঃ"—যাঁহার চিত্ত অতিশয় নির্ম্মল হইয়াছে, এইরূপ অতি নির্ম্মলচিত্ত দেখিয়াই অনুমান করিতে হইবে যে, ইঁহার এই সকল অনুষ্ঠান পূর্ব্বজন্মে করা আছে। যাঁহার বাহ্য ক্রিয়া ও উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া এত সহজে মন তন্ময় হইয়া যায় যে, আর কর্ম্ম করিবার শক্তি থাকে না, তাঁহাকেই বাস্তবিক শুদ্ধচিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের জীবনই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—যিনিই তাঁহার জীবন একটু নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, তিনি কখনও কোন অনুষ্ঠান বা উপাসনা ইচ্ছা-পূর্ব্বক জোর করিয়া ত্যাগ করেন নাই—কেবল যখনই তাঁহার সমাধি অবস্থা হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করাইয়াছে, তখনই তিনি কর্ম্ম বা উপাসনা পরিত্যাগ করিতে যেন বাধ্য হইয়াছেন।

এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অনেক সময় আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই লোকদেখান, ভাবশূন্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠানের সময়ও আমরা সকল সময় আন্তরিকতার সহিত উহা করিতে পারি না, আবার আমাদের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণও অনেক সময় এক কৃত্রিম প্রাণহীন ব্যাপার মাত্র হইয়া থাকে। যদি ভাবের সংযোগ থাকিত, তবে

উভয়ই শোভন হইত। আবার যাঁহারা কোনরূপ অনুষ্ঠানাবলম্বী না হইয়াই গলা হইতে পৈতাটাকে কোন গতিকে ফেলিতে পারিলেই এবং মূর্ত্তিপূজাদিতে যোগ না দিলেই আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ত আরও বাহাদুরি।

আমরা বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, যাঁহারা ধর্ম্মজীবনকে যথার্থ জাগ্রৎ ও সরস রাখিতে চান, তাঁহারা প্রথমাবস্থায় যতই ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হন, ততই যেন তাঁহাদের নানাবিধ বাহ্যানুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, কেবল ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর অনুষ্ঠানের প্রকারভেদ হয়, এই মাত্র। আবার কেহ বা অল্পানুষ্ঠানেই তৃপ্ত, কেহ বা বহু অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত। কিন্তু অনুষ্ঠান সকলেরই—সকল আস্তিকেরই করিতে হয়। কেবল প্রকৃত নাস্তিকের পক্ষেই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যেহেতু অদ্বৈতবাদী একান্তিক নাস্তিক নহেন, সেই হেতু তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিজ দার্শনিক মত জীবনে সম্পূর্ণ পরিণত করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ অনুষ্ঠান লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন। তিনি দ্বৈতবাদীর ন্যায় পবিত্র বোধে গঙ্গাদি তীর্থজলে স্নান করেন এবং মন্দিরাদিতেও সর্ব্বদা তাঁহার গতিবিধি থাকে। কেবল দ্বৈতবাদীর সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ এই যে, দ্বৈতবাদী যদি কেবল স্থানবিশেষে মাত্র ভগবদাবির্ভাব বিশ্বাস করেন এবং তথায়ই ভগবৎসাক্ষাৎকারের চেষ্টা বিশেষভাবে আবদ্ধ রাখেন, অদ্বৈতবাদী কিন্তু যেমন গঙ্গায় তেমন ডোবানালায়, যেমন মন্দিরে দেবপ্রতিমায় তদ্রূপ সাধারণ গৃহে সাধারণ মূর্ত্তিতে, যেমন অবতার ও অবতার-কল্প পুরুষসমূহে, তেমন আমাদের ন্যায় 'কাপুরুষের' ভিতরও তাঁহার হৃদয় দেবতার, তাঁহার ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা করেন। অদ্বৈতবাদী অভক্ত?—তাঁহার অপেক্ষা ভক্তিমান্ কে? তিনি কিছু মানেন না?—তাঁহার অপেক্ষা অধিক মানে কে? তিনি নাস্তিক?—তাঁহা অপেক্ষা অধিক আস্তিক কে? ভক্ত ভগবানকে পিতা, মাতা, জায়া, পুত্র, স্বামী, দয়িত প্রভৃতি ভাবে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত—অদ্বয়বাদী কিন্তু তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষের চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র বলিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, যতক্ষণ না তিনি গভীর প্রেমে বলিতে পারেন—সোঽহং, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম—ততক্ষণ তাঁহার প্রাণ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। তিনি তাঁহার প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া 'আপনার

হইতেও আপনার' করিয়া নিজের সঙ্গে যতক্ষণ না অভেদে মিশাইতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। তাই বলি—'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে', এ সকল কথা অদ্বৈতবাদীর পক্ষে প্রযুক্ত হয় না—উহা কেবল শুষ্ক তার্কিকদের পক্ষে প্রযুজ্য। জ্ঞানী অদ্বৈতবাদী জানেন—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, তিনি জানেন, প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব তর্কে নির্ণয় হয় না। তাই তিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অর্থাৎ গুরু ও বেদান্ত বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী হইয়া সাধনপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। দ্বৈতবাদী সাধক ইহা অপেক্ষা আর কতদূর আস্তিকতা, কতদূর শ্রদ্ধা, কতদূর অনুষ্ঠানানুরাগ দেখাইতে পারেন?

পূর্ব্বেই আমরা এক শ্রেণীর তথাকথিত বৈদান্তিকের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহাদের বাস্তবিক বৈদান্তিক নামে অধিকার নাই; তাঁহাদিগকে ইংরাজীতে পরিচয় দিতে হইলে iconoclast ও বঙ্গভাষায় কালাপাহাড়কল্প বা মূর্ত্তি ও অনুষ্ঠানদ্বেষ্টা বলা যাইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের ভিতরই যে কেবল এই শ্রেণীর জীব দেখা যায় তাহা নহে,—বরং বর্ত্তমানকালে আমরা দ্বৈতবাদীদের মধ্যেই ইঁহাদের বিশেষভাবে অভ্যুত্থান দেখিতেছি। কিছুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ও নানকপন্থী সমুদায়ে এবং অত্যন্ত আধুনিক কালের ব্রাহ্ম, বিশেষতঃ আর্য্য-সমাজে এই দলের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়।

এখানে আমরা বৈদান্তিক সম্প্রদায়-বিশেষের যে অদ্ভুত আচারের কথা শুনিয়াছি, কৌতূহলী পাঠককে তাহা উপহার না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঐ সম্প্রদায়ের শিষ্য যখন গুরুর নিকট সন্ন্যাস বা তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করে, তখন না কি উক্ত উপদেশান্তে শিষ্যকে গুরুর মস্তকে জুতা মারিতে হয়। সাম্যভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তই বটে! কাশীর দণ্ডীরা শিবকে প্রণাম করেন না, শিবের মন্দিরে তাঁহাদের দণ্ডের অগ্রভাগ ঠেকাইয়া থাকেন। কোন কোন তথাকথিত বৈদান্তিক ঈশ্বরকে জীবের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহাকেও মায়ার অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে জীব হইতেও ঘৃণিত, অধম, সুতরাং জীবের উপাসনার অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করেন; কেহ বা জগৎকে মায়াময় ও মিথ্যা বলিয়া, 'জগৎ আওর দেহ তিন কালমে হ্যায় নেই' প্রতিপাদন করেন, এদিকে নিজের ডাল রুটির

একটুকু ত্রুটি হইলে জগৎ অন্ধকার দেখেন ও গৃহস্থের চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করেন না, কেহ বা ঘোর ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পাপ-পুণ্যের সমন্বয় ও নিজের সাক্ষিস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করেন। এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কুটীরখানি অগ্নিদেব ভস্মসাৎ করিতেছেন, অপর সন্ন্যাসী তাহারই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া 'প্রপঞ্চ হায়' বলিয়া হাস্য করিতেছে, তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতেছে না; এক সন্ন্যাসী রোগে ক্লিষ্ট হইলে পাছে মায়িক-সম্বন্ধের উদ্রেক হয়, এই ভাবে অপর সন্ন্যাসীর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া, সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঘোর অনাচার-পরায়ণ হওয়া—এ সকল সাধারণ না হইলেও একেবারে বিরল দৃশ্য নহে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, সকল সম্প্রদায়েই উন্নত-চরিত্র ও উদার-ভাবাপন্ন পুরুষ আছেন, কিন্তু এই সকল তথাকথিত বৈদান্তিক-নামধারী স্বেচ্ছাচারীর দল যত শীঘ্র নিজেদের যথার্থ পরিচয় দিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করে, ততই সমাজের মঙ্গল,—ততই বেদান্তের নাস্তিকতাপবাদ খণ্ডন হইবে,—ততই প্রকৃত বেদান্তের দিকে লোকের শ্রদ্ধা হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অদ্বৈতবাদীকেও ভক্তিসাধনায় যথেষ্ট সময় যাপন করিতে হয়, সুতরাং অদ্বৈতী হইলেই ভক্তি বা মূর্ত্তিপূজা বা অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে; কিন্তু সে যাহা হউক, অদ্বৈতীই, যে আপনা-দিগকে একমাত্র বেদান্তবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার এ দাবির কি যথেষ্ট কারণ আছে? জনসাধারণেই বা একথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন কেন? ইহার একটী বিশেষ কারণ এই দেখা যায় যে, অদ্বৈতবাদী নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণে শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করেন, দ্বৈত বা অন্যান্য বাদিগণ সে পরিমাণে করেন না। কিন্তু কথা এই, সর্ব্বমত-প্রসবিনী শ্রুতি হইতেই কি দ্বৈতবাদ-সমর্থক যথেষ্ট প্রমাণরাশি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে না? কার্য্যতঃ কিন্তু দেখা যায়, অদ্বৈতবাদীরা শ্রুতি হইতে যেন ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িয়া অধিক পরিমাণে পৌরাণিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছেন।

এই শ্রুতিপ্রমাণ সম্বন্ধেও আমাদের সহজ জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দুই চারি কথা বক্তব্য আছে। শাস্ত্রে শ্রুতির অনাদিত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব ও চরম প্রামাণ্য

সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া আমরা এস্থলে এই আলোচনা করিতে চাই যে, শ্রুতিপ্রমাণের উপর নির্ভর আমাদের ধর্ম্ম ও দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের কতটা কল্যাণ এবং কতটাই বা অনিষ্ট করিয়াছে। গ্রন্থবিশেষকে এইরূপ উচ্চাসন দিয়া এই শুভফল ফলিয়াছে যে, যে কেহ কোনরূপ অলৌকিক সত্য সাক্ষাৎকারের দাবি করিয়াছে, তাহার মত বা তৎপ্রণীত গ্রন্থকে শ্রুতির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইতে হইয়াছে, ও এইরূপে অনেক বাজে জিনিষ আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে এইরূপে দার্শনিক বিভিন্ন মতসমূহকে শ্রুত্যনুযায়ী করিতে গিয়া যে কত কষ্টকল্পিত কপট ব্যাপার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। শঙ্কর এক স্থলে বলিতেছেন—যদি শ্রুতির সহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধ হয়, সেখানে উপায় কি? যথা, শ্রুতির কোন স্থলে যদি 'শিলা ভাসিতেছে' এইরূপ প্রত্যক্ষবিরোধী কথার উল্লেখ থাকে, সেখানে শ্রুতি মানিব কিরূপে? শঙ্কর মীমাংসা করিতেছেন—তথায় নিশ্চিত ঐ শিলার অর্থ পাথর নহে, অন্য কিছু। কারণ, শ্রুতি অভ্রান্ত। আমরা বর্ত্তমান যুগে কাহাকেও এইরূপ অদ্ভুত বিশ্বাসী হইতে বলি না, আর ইহাও বলি না যে, শ্রুতিতে যে সাধন বা ধর্ম্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে, পরবর্ত্তী পুরাণ বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে অন্ততঃ তাহার কোন কোন অংশ বিশেষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তবে আমাদের মনে হয় যে, শ্রৌতযুগেই এমন এক সময় ছিল, যখন ধর্ম্মতত্ত্বের ও সাধনের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছিল; যখন জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম্ম প্রভৃতি পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পরে যখন অদ্বৈতবাদীর অভ্যুদয় হইয়া ক্রমে জ্ঞানমার্গ নামক পথকে স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইতে লাগিল এবং শঙ্করেরও বহু-পরবর্ত্তী যুগে ক্রমাগত বিচারজাল বিস্তার হইয়া জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তি-যোগকে প্রায় একরূপ নির্ব্বাসিত করিল, জ্ঞানমার্গটী উপনিষৎমূল হইলেও তাহার নানাপ্রকার শাখা প্রশাখা বিস্তার হইয়া উহা একটী স্বসম্পূর্ণ স্বতন্ত্রকল্প তন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, তখনই প্রতিক্রিয়াও আরব্ধ হইল—উপেক্ষিত-প্রায় শ্রদ্ধা ও ভক্তিরও স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ আরম্ভ হইল এবং রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, চৈতন্য প্রভৃতিতে উহাও এক স্বতন্ত্র মতবাদাকারে পরিণতি লাভ করিল।

ভগবদ্গীতা সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে বিরচিত। তাহাই যদি হয়, তবে উহার নিবিষ্ট অধ্যয়নে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্করের বহুপূর্ব্ব হইতেও এরূপ বিবাদ চলিয়াছিল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভায় ঐ সকল বিক্ষিপ্ত জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি যোগে একবার যথাসাধ্য সামঞ্জস্যও হইয়াছিল; কিন্তু আবার বিরোধ সুরু হইল। টীকাকারগণ আবার স্ব স্ব স্বতন্ত্র মতবাদ লইয়া গীতাকে সেই সেই মতবাদের মুখপত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

বর্ত্তমানযুগে আমরা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। তাঁহার ও তদীয় প্রতিভাশালী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও উপদেশে তথাকথিত শুষ্ক বেদান্ত কবিত্বময় সরস ও ভক্তিমাখা হইয়াছে এবং ভক্তিও বেদান্তের সৌরকরবিমণ্ডিত হইয়া মহামহিমাময় ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আসুন পাঠক, এই নবসামঞ্জস্যের যুগে আমরা বেদান্ত ও ভক্তির এই অনর্থক বিবাদ ভুলিয়া গিয়া উভয়কে সমান ভাবে আদর করিতে শিখি।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)*

পাশ্চাত্য পাঠকপাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারযুগের শেষ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর বেশে চিকাগো প্রদর্শনীর অন্তর্গত ধর্ম্ম মহাসভার মঞ্চে দণ্ডায়মান হন, সেদিন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম আপনাকে প্রচারশীল-ধর্ম্ম বলিয়া ভাবে নাই। হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষকতা-কার্য্যই যাঁহাদের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই ব্রাহ্মণগণ নাগরিক ও গৃহস্থ বলিয়া হিন্দু সমাজেরই এক

* সিষ্টার নিবেদিতার "The Master as I saw him" নামক ইংরাজী পুস্তকের ক্রমশঃ প্রকাশ্য অনুবাদ।

অঙ্গস্বরূপ ছিলেন এবং সেই হেতু সমুদ্রযাত্রাধিকার হইতেও বাঞ্চিত ছিলেন। আর হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত পরিব্রাজক সাধুগণ—যাঁহাদের মধ্যে উচ্চতম অধিকারিগণ প্রভুত্ব হিসাবে জন্মমাত্রে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ততটা উচ্চে অবস্থিত, যতটা সিদ্ধ পুরুষ বা অবতার, পুরোহিত বা পণ্ডিত অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত—তাঁহারা তাঁহাদের স্বাধীনতায় যে এবম্প্রকার ব্যবহার করা চলে তাহা আদৌ ভাবেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দও চিকাগোর দুয়ারে স্বীয় বিশ্বস্ততাজ্ঞাপক কোন পরিচয়পত্র লইয়া উপস্থিত হন নাই। যেমন তিনি ভারতের এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, ঠিক তেমনই তিনি কতিপয় অনুরাগী শ্রদ্ধাবান মান্দ্রাজী শিষ্যের প্রেরণায় প্রশান্ত মহাসাগর-পারে আগমন করিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসিগণও স্বজাতিসুলভ আতিথ্য ও সরলতাগুণে তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার একটী সুযোগ দিলেন। বৌদ্ধ প্রচারকগণের বেলায় যেমন, তাঁহার বেলায়ও তেমনি, একজন মহাপুরুষের শক্তিই তাঁহাকে জোর করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি এই মহাপুরুষের পাদমূলে বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া তাঁহার জীবনের সঙ্গিস্বরূপ হইয়াছিলেন। তথাপি পাশ্চাত্য দেশে তিনি কোন বিশেষ আচার্য্যের কথা কহেন নাই, কোন এক সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ঘোষণা করেন নাই। "হিন্দুগণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণাবলী"—ইহাই তাঁহার চিকাগো, বক্তৃতার বিষয়ীভূত ছিল; এবং ইহার পরেও, যে সকল তত্ত্ব বহু অংশে বিভক্ত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি এবং উহার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, কেবল সেইগুলিই তাঁহার বক্তৃতায় স্থান পাইত। সুতরাং ইতিহাসে এই প্রথমবার, একজন অতি উচ্চদরের মনীষাসম্পন্ন হিন্দু অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া হিন্দুধর্ম্মকেই বিশ্লেষণ, ও বিশ্লিষ্ট অংশগুলির সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে যত্নপর হইয়াছিলেন।

স্বামিজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আমেরিকায় অবস্থান করেন, তৎপরে প্রথমবার ইউরোপে আগমন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছেন এবং প্রায় একমাস পরে লণ্ডনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লণ্ডনে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে।

ইহা মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু ইহা নিশ্চিতই আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, যদিও আমি আমার গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী, তাঁহার ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ এই উভয়বার ইংলণ্ড আগমন কালেই শ্রবণ করিয়াছিলাম, তথাপি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে, আমি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতাম; এমন কি, কিছুই জানিতাম না, বলিলেও চলে। সৌভাগ্য, কেন না এই পূর্ব্বপরিচয় না থাকাতেই আমি এই সুফল পাইয়াছি যে, আমি মানসনেত্রে আমার গুরুদেবকে, তাঁহার চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত্তির প্রতিপদে, ভারতীয় অরণ্য, নগর ও রাজপথরূপ তাঁহারই উপযুক্ত দৃশ্যাবলীর মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পাই—প্রাচ্য আচার্য্যকে প্রাচ্য জগতেরই মধ্যে দেখিতে পাই। এমন কি সুদূর লণ্ডনেও যখন আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি, সে সময়, এখন যেমন আমার উহা স্মরণ করিয়া হইতেছে, সেইরূপ নিশ্চিত তাঁহার মনেও সৌরকরোদ্ভাসিত স্বদেশের রাশি রাশি স্মৃতিপরম্পরা উদয় হইয়া থাকিবে। সময়টী নভেম্বর মাসের এক রবিবারের ঠাণ্ডা বৈকালবেলা, এবং স্থান ওয়েষ্ট-এণ্ডের (West-End) একটী বৈঠকখানা; তিনি অর্দ্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া এবং কক্ষের অগ্নি রাখিবার স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন; আর যখন তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তৎপ্রদত্ত উত্তরটীর উদাহরণস্বরূপ, কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন সেই গোধূলি ও অন্ধকারের সঙ্গম-সময়ে তত্রত্য দৃশ্যটী তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই ভারতীয় উদ্যানের, অথবা সূর্য্যাস্ত-সময়ে কূপান্তিকে বা গ্রামের উপকণ্ঠে তরুতলে উপবিষ্ট কোন সাধুর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দেরই এক কৌতুককর রূপান্তর বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ডে আচার্য্য হিসাবে স্বামিজীকে আমি আর কখনও এমন সাদাসিধাভাবে দেখি নাই। ইহার পরে তিনি সর্ব্বদাই বক্তৃতা দিতেন; অথবা তিনি যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাহা এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রোতৃ-

বৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও কর্তৃক পদ্ধতি অনুযায়ী জিজ্ঞাসিত হইত। শুধু এই প্রথমবারেই আমরা মাত্র পনর ষোল জন অভ্যাগত ছিলাম, আমাদের মধ্যে অনেকে আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম; স্বামিজী তাঁহার গেরুয়া পোষাক ও কোমরবন্ধ পরিয়া আমাদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন।—যেন আমাদিগের নিকট কোন এক দূর দেশের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। মাঝে মাঝে এক একবার "শিব! শিব!" বলিতেছেন, উহা আমাদের নিকট কেমন নূতন নূতন ঠেকিতেছে—আর তাঁহার মুখমণ্ডলে, লোকে খুব ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের বদনে যে মিশ্রিত কোমলতা ও মহত্ত্বের ভাব দেখিতে পায়, তাহাই লক্ষিত হইতেছিল; হয় ত উহা সেই ভাব, যাহা রাফেল আমাদিগকে তাঁহার Sistine Childএর * ললাটফলকে আঁকিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

সে অপরাহ্নের পর আজ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এবং সে দিনকার কথোপকথনের একটু আধটু মাত্র এখন মনে পড়িতেছে। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সেই বিস্ময়কর প্রতীচ্য স্বরসহযোগে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহা কখনও ভুলিবার নহে; উহা আমাদের গীর্জাসমূহে প্রচলিত গ্রিগরি-প্রবর্ত্তিত † স্বরের কথা এত মনে পড়াইয়া দেয়, অথচ উহা হইতে কত ভিন্ন!

তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি উহার উত্তর দিতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন, এবং একটী প্রশ্নের উত্তরে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার পাশ্চাত্য আগমনের কারণ এই যে, তিনি বিশ্বাস করেন, জাতিসমূহের মধ্যে, বর্ত্তমানে পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের ন্যায়, পরস্পর আদর্শ বিনিময়েরও সময় আসিয়াছে। এই সময় হইতে বরাবর কথাবার্ত্তা বেশ সহজভাবে চলিয়াছিল। তিনি প্রাচ্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-রূপ অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এবং তৎপ্রসঙ্গে বিবিধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানগুলিকে সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুরই বিভিন্ন

* এই বিখ্যাত চিত্রখানির মধ্যস্থলে শিশু ঈশা ও তাঁহার জননী মেরীর জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তি, বামে সেণ্ট সিক্সটাসের, দক্ষিণে সেণ্ট বার্ব্বারার, এবং নিম্নে দুইটী দেবশিশুর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহা এখন ড্রেসডেনে।

† পোপ প্রথম গ্রিগরি—ইনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন এবং অনুবাদ করিয়া দিলেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব",—সূত্রে যেমন বহু মণি গাঁথা থাকে, সেইরূপ আমাতেও এই সমস্ত রহিয়াছে।

তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেও প্রেমই ধর্ম্মভাবের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকৃত হয়।

তিনি আমাদিগকে আরও বলিলেন যে, হিন্দুগণ শরীর মন উভয়কেই আত্মানামক এক তৃতীয় পদার্থ দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত বলিয়া জ্ঞান করেন। এটী আমার খুব মনে লাগিয়াছিল; এবং ইহারই বলে আমি পরবর্ত্তী শীত ঋতুতে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে জগৎকে দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছিলেন, এবং আমার মনে আছে তিনি শান্তভাবে এই কথা কয়টী বলিয়াছিলেন, "বৌদ্ধগণ ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।"

সুতরাং এই হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্ম আধুনিক অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী ছিল; বরং, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান মনেরই খেয়াল মাত্র, সুতরাং অনুমানও তাহাই, এইরূপ সন্দেহ অজ্ঞেয়বাদের মূলমন্ত্র বলিয়া উহা অনেকটা হিন্দুধর্ম্মেরই সদৃশ হইল।

আমার মনে আছে, তিনি বিশ্বাস (Faith) শব্দটীতে আপত্তি প্রকাশ করেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে দর্শন (Realisation) কথাটী ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতে বলিতে তিনি একটী ভারতীয় প্রবাদ উদ্ধৃত করিলেন—"কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু উহাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া মরা অতি ভয়ঙ্কর।"

আমার মনে হয় যে, পুনর্জ্জন্মবাদও সম্ভবতঃ এই কথাপ্রসঙ্গেই আলোচিত হইয়াছিল। বোধ হয়, তিনি কর্ম্ম, ভক্তি, ও জ্ঞান এই তিনটীকে আত্মার তিনটী পথ বলিয়া উল্লেখ করেন। আমার বেশ মনে আছে, তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া মানবের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকেন। তিনি আরও বলেন যে, সকল ধর্ম্মের একমাত্র শিক্ষা এই—"ত্যাগ কর, ত্যাগ কর"।

ভারতবর্ষে উচ্চতম ধর্ম্মের সহিত পুরোহিত এবং মন্দিরাদির কোনই সম্পর্ক নাই—এই ভাবের দুই একটী কথাও হইয়াছিল; তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন

যে, স্বর্গকামনা তাঁহার দেশে খুব ধার্ম্মিক লোকদের নিকট "কতকটা নীচু থাকের জিনিস" বলিয়া বিবেচিত হয়।

আত্মার মুক্তস্বভাবরূপ আদর্শটীর তিনি নিশ্চয়ই উল্লেখ করিয়া থাকিবেন; পাশ্চাত্যে, নরসেবাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের যে ধারণা আছে, তাহার সহিত তাঁহার মতের কিছু আপাতবিরোধও ঘটিয়াছিল। কারণ, আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, তিনি সে দিন অপরাহ্ণে "Society" (সমাজ) শব্দটী এমন একটী অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহা আমি কখনও ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। আমার যতদূর মনে হয়, তিনি পূর্ব্বোক্ত আদর্শটীর উল্লেখ করিয়াই আমাদের সম্ভাবিত আপত্তিগুলি আপনা হইতেই উত্থাপন করিলেন, এবং বলিলেন, "তোমরা বলিবে যে ইহাতে Societyর (সমাজের) কোন উপকার হয় না। কিন্তু এই আপত্তি গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে, তোমাদিগকে প্রথমে দেখাইতে হইবে যে, Societyর (সমাজের) স্থায়িত্ব জিনিসটী স্বয়ংই একটী উদ্দেশ্য বা সাধ্যস্বরূপ।"

সে সময়ে আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি Society (সমাজ) শব্দে সমগ্র মানবজাতিকেই (Humanity) উল্লেখ করিতেছেন, এবং ভাবিয়াছিলাম, বিচার করিয়া দেখিলে, জগৎ নশ্বর, সুতরাং তাহার উপকারার্থ যাহা করা যায় তাহাও নশ্বর,—তিনি এই মতই প্রচার করিতেছেন। এই অর্থই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল কি? তাহাই যদি হয়, তবে নরসেবাই যে, চিরকাল তাঁহার সমগ্র জীবনব্রত ছিল, তাহার সহিত এই মতের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? অথবা, তিনি শুধু একটী ভাব মাত্রেরই বর্ণনা করিতেছিলেন, এবং নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া ঐ ভাবটীকে যতদূর সম্ভব সমর্থন করিতেছিলেন? অথবা, তাঁহার 'Society' শব্দটী শুধু সেই অদ্ভুত প্রাচ্যদেশীয় 'সমাজ' শব্দটীর একটী ভ্রান্ত অনুবাদ মাত্র? প্রাচ্যে সমাজ বলিলেই তৎসঙ্গে ঈশতন্ত্র শাসনের * কিছু কিছু বুঝাইয়া যায়, এবং অন্য নানা ভাবের সঙ্গে, আমাদের দেশে Church বা যাজক সম্প্রদায়ের শাসন সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পরিব্রাজক আচার্য্য হিসাবে তাঁহার নিজের পদমর্য্যাদা কি, এ প্রশ্নেরও

* ঈশতন্ত্র শাসন (Theocracy)—যে রাজ্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা তৎপ্রতিনিধি যাজকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এ মতে রাজ্যের আইনগুলি মানবকৃত নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরাদেশ।

তিনি কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন, এবং ধর্ম্মসঙ্ঘ-বিষয়ে, অথবা, একজনের কথায় বলিতে গেলে, "যে ধর্ম্মমতের পরিণতি সম্প্রদায়ে, তৎসম্বন্ধে" ভারতবাসিগণের আস্থার অভাব, এই কথা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের বিশ্বাস, সঙ্ঘ হইতে চিরকালই নূতন উৎপাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।"

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, তৎকালে পাশ্চাত্যে বহুলপ্রচলিত কতিপয় ধর্ম্মসম্প্রদায় কাঞ্চনাশক্তি বশতঃ অচিরেই বিনষ্ট হইবে। তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে, মানুষ ভ্রম হইতে ভ্রমে অগ্রসর হয় না, সত্য হইতে সত্যেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

বাস্তবিকই, এই মূল সত্যটীকেই তিনি সর্ব্বদা নানাভাবে প্রচার করিতেন যে, সকল ধর্ম্মই সমভাবে সত্য, এবং আমাদের পক্ষে কোন অবতারেরই বিরুদ্ধ সমালোচনা করা অসম্ভব, কারণ তাঁহারা সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই প্রকাশ মাত্র। এইস্থলে তিনি গীতার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লোক উদ্ধৃত করেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

—যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

আমরা যে কয়জন এই "হিন্দু যোগীকে" (তৎকালে, লণ্ডনে তিনি ঐ নামেই অভিহিত হইতেন) দেখিতে আসিয়াছিলাম, আমাদের মধ্যে কেহই তেমন ধর্ম্মে আস্থাবান বা বিশ্বাসপ্রবণ ছিলাম না। বিশ্রুতকুলোদ্ভবা যে পলিতকেশা রমণী স্বামিজীর বাম পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন এবং অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে সুমার্জ্জিত শিষ্টাচারের সহিত প্রশ্ন করিতেছিলেন, তিনিই বোধ হয় ধর্ম্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম উদারভাবাপন্ন ছিলেন, এবং তিনি ফ্রেডারিক ডেনিসন মরিসের বন্ধু ও শিষ্যা ছিলেন। আমরা যে মহিলার গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম তিনি এবং অপর দুই একজন, আজকালকার যে সকল সম্প্রদায় মনস্তত্ত্বকে স্পিরিচুয়ালিজমরূপ আর এক

রাজ্যে লইয়া গিয়া, উহাকেই ধর্ম্মবিশ্বাসের কেন্দ্রস্বরূপে অবলম্বন করেন, তাঁহাদেরই গতিবিধি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা সহজে কোন ধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহিতাম না বলিয়া, এবং মোটের উপর ধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারটাতেই যে কিছু সত্য থাকিতে পারে এই বিষয়টী আমাদিগকে সহজে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিবে না বলিয়াই, সে দিন অপরাহ্ণে আমাদের মধ্যে অনেককে বাছিয়া বাছিয়া নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

সেদিনকার নিমন্ত্রণ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় আমরা বক্তা মহোদয়-সম্বন্ধে যেরূপ গর্ব্ব ও উদাসীনতার সহিত নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া-ছিলাম, আমার এখন মনে হয় যে, অবিবেচনা-প্রসূত অনুরাগের হস্ত হইতে বিচারবুদ্ধিকে সর্ব্বদা বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনবশতঃ যে অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাই ইহার একমাত্র ওজর স্বরূপে বলা যাইতে পারে। বিদায় লইবার পূর্ব্বে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে আমরা এক এক করিয়া অভিযোগ করিলাম, "ইহা নূতন কথা নহে।"—এই সব কথা পূর্ব্বে কেহ না কেহ বলিয়াছে।

কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, সেই সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি করিয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে আমার মনে হইল যে, এক অপরিচিত দেশের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে পুষ্ট, একজন নূতন রকমের চিন্তাশীল ব্যক্তি যে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া শুধু যে অনুদারতার পরিচায়ক, তাহাই নহে, অধিকন্তু উহা অন্যায়। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তৎকথিত প্রত্যেক মতটীর প্রতিধ্বনি বা তাহারই মত আর একটী মত ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া বা ভাবিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমার ভাগ্যে এমন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভ ঘটে নাই, যিনি সামান্য এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে, আমি এতাবৎকাল যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতাম, সে সমস্তই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বামিজী লণ্ডনে থাকিতে, থাকিতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার যে দুইটীমাত্র সুযোগ মিলিয়াছিল, আমি তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম।

অতি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত আমাদের মনে যে ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়, তাহা বার বার শ্রবণদ্বারা পুষ্ট ও ঘনীভূত হয়। সেইরূপ, সেই দুইটী

বক্তৃতার লিপিবদ্ধ সারাংশ এখন পড়িতে পড়িতে, উহারা আমার নিকট তখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, আচার্য্যদেবের কথাগুলি তখন আমি যেভাবে গ্রহণ করিতাম, তাহাতে এমন একটা অন্ধত্বের ভাব ছিল যে, তজ্জন্য আমার কোন অনুশোচনাই পর্য্যাপ্ত হইবে না। যখন তিনি বলিতেছিলেন, "জগৎ মাকড়সার জালের মত, আর মনগুলি সব মাকড়সা; কারণ, মন এক, আবার বহু"—তখন তিনি আমার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিলেন আমি লিখিয়া লইলাম, উহা আমার নিকট ভাল লাগিল, কিন্তু আমি তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না, মানিয়া লওয়া ত দূরের কথা। তাঁহার উপদেশাবলী আমি কিরূপভাবে গ্রহণ করিতাম, ইহাই তাহার মোটামুটী স্বরূপবর্ণন; পর বৎসরেও (তখন আমি তাঁহার একবারকার সমস্ত বক্তৃতা শুনিয়াছি), শুধু তাহাই বা কেন, যেদিন আমি ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করি, সম্ভবতঃ সেইদিন পর্য্যন্ত, আমার এইরূপ ভাবই বিদ্যমান ছিল।

স্বামিজীর উপদেশে এমন কতকগুলি বিষয় ছিল, যাহার সত্যতা লোকের শ্রবণমাত্রই বোধগম্য হইত। কোন ধর্ম্মই, সচরাচর উহাদিগকে যেভাবে সত্য বলিয়া দাবি করা হয়, সে ভাবে সত্য না হইলেও, সকল ধর্ম্মই যে এক হিসাবে বাস্তবিকই সমভাবে সত্য—এই মতটীতে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ সায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন তিনি বলিলেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে নিরাকার হইলেও, ইন্দ্রিয়রূপ কুহেলিকার মধ্য দিয়া দৃষ্টি করাতেই তাঁহাকে সাকার বলিয়া বোধ হয়,—তখন আমরা ভাবটীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলাম। যখন তিনি বলিলেন যে, যে ভাববশে কোন কার্য্য করা যায়, তাহা ঐ কার্য্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী; অথবা যখন তিনি নিরামিষ ভোজনের প্রশংসা করিলেন,—তখন আমরা ভাবিলাম, হঁ, এ দুইটী বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, সমষ্টিভাবে, তাঁহার ধর্ম্মমতগুলিকে আমি সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে লাগিলাম। জগতের কতকগুলি ধর্ম্মমত এরূপ যে, লোকে উহাদিগকে প্রথমটা মানিয়া লয় বটে, কিন্তু শেষে নিশ্চিতই উহাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায় এবং উহাদিগকে পরিত্যাগ করে; আমার মনে হইল, স্বামিজীর ধর্ম্মমতগুলিও

সেই প্রকারের। আর, এইরূপ মতপরিবর্ত্তনে কতটা যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা ভাবিলে, আর কেহ ওপথে অগ্রসর হইতে চাহে না।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই সকল কথা খুলিয়া বলা কঠিন। স্বামিজীর ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্ব্বেই এমন দিন আসিয়াছিল, যখন আমি তাঁহাকে "গুরুদেব" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম। ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং তাঁহার স্বজাতিপ্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য স্বীকার, ইহা শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই। ধর্ম্মোপদেষ্টা হিসাবে, আমি দেখিলাম যে, তাঁহার জগৎকে দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র মতবাদ আছে বটে, কিন্তু যদি তিনি দেখেন যে, সত্য উহাতে না থাকিয়া অন্য কিছুতে আছে, তাহা হইলে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঐ মতান্তর্গত কোন কিছুই সমর্থন করিবেন না। আর, এইটী ধরিতে পারায় যতটা বুঝায়, ততটাই আমি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলাম। বাকী যাহা কিছু, তজ্জন্য আমি তাঁহার উপদেশাবলী উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, উহার কোন অংশে অসংলগ্নতা নাই; কিন্তু তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে হাতে কলমে প্রমাণিত না করা পর্য্যন্ত, আমি উহাদের চরম সত্যতার নিকট আত্মসমর্পণ করি নাই। আর, তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্যে অতীব মুগ্ধ হইলেও, আমি সে সময় তাঁহার, এবং আমার জানিত যে কোন চিন্তাশীল বা প্রতিভাশালী ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য আমি পরে দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই।

ক্লাসের অপর সকলে আমার এই সন্দেহের ভাব বিশেষভাবেই জানিতেন, এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান একজন শিষ্য বহু পরে স্বামিজীর সমক্ষে এই বিষয় লইয়া আমাকে খোঁটা দিতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন যে, তিনি স্বামিজীর মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছেন, তৎসমস্তই মানিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বামিজী সে সময় এই কথাবার্ত্তায় কোন মনোযোগ দিলেন না বলিলেই হয়, কিন্তু পরে যখন লোকজন কেহ ছিল না, এমন একটী সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "কেহ যেন এই বলিয়া দুঃখ না করেন, যে, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য অপর কাহাকেও বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল! আমি আমার গুরুদেবের সহিত দীর্ঘ ছয়

বৎসরকাল ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছিলাম; ফলে এই হইয়াছে যে, আমি রাস্তার কোথায় কি আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া জানি, এতটুকুও আমার অজ্ঞাত নাই।"

এই প্রথম কথাবার্ত্তাগুলির মধ্যে দুই একটী বিষয় স্মৃতিপটে স্পষ্টভাবে জাগরূক রহিয়াছে। এককালে আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম বলিতে, ঈশ্বরকে পিতাজ্ঞানে উপলব্ধি করাই বুঝিতাম। কিন্তু বহুকাল যাবৎ আমি এইভাবের উপাসনায় বিশ্বাস হারানর জন্য দুঃখিত ছিলাম, এবং ইহার বাস্তব সত্যতা বা অসত্যতার দিকে না দেখিয়া, শুধু ধারণা বা কল্পনা হিসাবে ইহার মূল্য কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কারণ, আমার একটু একটু মনে হইয়াছিল যে, যাঁহারা এইরূপ ধারণা করিবেন, তাঁহাদের চরিত্রের, এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের সত্যতারও উপরে এই ধারণা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবে। কিন্তু তুলনা করিবার উপাদানের অভাববশতঃ এই বিষয়টীকে আমি খুব বেশী দূর অনুধাবন করিতে পারি নাই। আর, কি আশ্চর্য্য, আমি এমন একজন লোক পাইলাম, যিনি পাঁচ পাঁচটী উপাসনা-প্রণালীর কথা বলিলেন, যাহাতে ঈশ্বরকে এইরূপে ব্যক্তিভাবে ধারণা করা হইয়া থাকে! তিনি এমন একটী ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন, ধর্ম্মভাবগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করাই যাহার প্রথম সোপান!

তারপর, আমি কতকগুলি ভারতীয় ভাবের নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য্যে অতীব মুগ্ধ হইলাম—উহাদিগের সহিত আমার এই প্রথম পরিচয়। এই সকল রূপকের এবং চিন্তাপ্রণালীর নূতনত্বহেতুই আমি উহাদিগকে সম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সাধুর গল্পটী ধরুন, যিনি চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, সে ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া ভয়ে যে সকল বাসন ফেলিয়া পলাইতেছিল, সেইসব লইয়া ছুটিয়াছিলেন এবং সেগুলি তাহার পাদমূলে রাখিয়া সজলনয়নে বলিয়াছিলেন, "প্রভো! আমি জানিতাম না আপনি ওখানে ছিলেন! এগুলি গ্রহণ করুন, এগুলি আপনার! সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন!" আবার সেই সাধুটীরই সম্বন্ধে আমরা আর একটী গল্প শুনিলাম, কিরূপে তিনি গোখুরা সর্পের দংশন হইতে নিশাগমে আরোগ্যলাভ করিয়া এই বলিয়া উহার বর্ণনা করিয়াছিলেন,—"প্রিয়তমের নিকট হইতে আমার নিকট একটী দূত আসিয়াছিল।" তারপর, মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনে স্বামিজীর নিজের যে জগৎসম্বন্ধীয় অনুমান তাহার কথা ধরুন। পনর

দিন ধরিয়া তিনি উহা দেখিয়াছিলেন এবং সর্ব্বক্ষণই উহাকে জল বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া, এখন তিনি উহাকে আবার পনর দিন ধরিয়া দেখিতে পারেন, কিন্তু উহাকে বরাবর মিথ্যা বলিয়াই জানিবেন। যে উপলব্ধির ফলে তিনি এই অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং যে দর্শনের বলে তিনি এই মরুভূমির মধ্য দিয়া যাত্রা ও জীবন—এই দুয়ের মধ্যে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, শুধু ইহাদিগকে বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইল না কি?

কিন্তু স্বামিজীর উপদেশগুলিতে এ দুইটী ছাড়াও আর একটী জিনিস ছিল, যাহা অপ্রত্যাশিত বলিয়া আমার কিঞ্চিৎ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। অন্যান্য কতিপয় উচ্চ উচ্চ ভাব-ব্যাখ্যাতা, যাঁহাদিগকে আমি ধর্ম্মমন্দিরেও বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের ন্যায় ইনি যে শুধু বক্তা মাত্রই নহেন, তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ধনাঢ্য ও অলস উচ্চশ্রেণীর লোকদের তৃপ্তির জন্য কবিতা ও তর্কযুক্তির সৌখীন ভোজ্যসামগ্রী তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া, তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। সামান্য একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক, অথবা 'মুক্তিফৌজের' কর্ম্মচারী যেমন জগদ্বাসিগণকে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করেন, তিনিও, অন্ততঃ তাঁহার নিজের মনে, ঠিক সেইরূপই একজন ধর্ম্মপ্রচারক—সকল নরনারীকে ধর্ম্মের নামে আহ্বান করিতেছেন। তথাপি তিনি আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। আমি তাঁহার 'পাপ একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র,' এই ঘোষণার কথা বলিতেছি না। আমি জানিতাম যে, এরূপ মতবাদ কোন জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যার অঙ্গ মাত্র হইতে পারে, এবং জানিতাম যে, 'কেহ আমাদিগের জামা চুরি করিলে তাহাকে আল্‌খাল্লাটীও দিয়া দেওয়া উচিত' এই মতটী আমাদিগের নিকট যতটুকু সত্য, বাস্তবজগতে পূর্ব্বোক্ত মতটী উহার ব্যাখ্যাতার নিকট তদপেক্ষা একচুলও অধিক সত্য নহে। তাঁহার একটী দৃষ্টান্ত আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহার শ্রোতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভ্রান্তবংশীয়া অল্পবয়স্কা জননী ছিলেন; রাস্তায় সহসা তাঁহাদিগের সম্মুখে একটা বাঘ

আসিলে তাঁহারা কিরূপ ভীত হইয়া পলায়নপর হইবেন, তিনি এই কথা বলিতেছিলেন। হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মনে কর, একটী কচি ছেলে বাঘটার সম্মুখে পড়িয়াছে! তখন তোমরা কোথায় স্থান গ্রহণ করিবে বল দেখি? বাঘের মুখে—তোমাদের প্রত্যেকেই—আমি ঠিক জানি!"

সুতরাং, সেইবার শীতকালে স্বামিজীর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা গমন করিবার পর, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কয়েকটী কথা স্মরণ এবং চিন্তা করিতাম:—প্রথমতঃ, তাঁহার উদার ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাদীক্ষা; দ্বিতীয়তঃ তিনি আমাদিগকে যে সকল ভাব দিয়াছেন তাহার যুক্তিপ্রণালীর অপূর্ব্ব নূতনত্ব ও মনোহারিত্ব; তৃতীয়তঃ, তাঁহার এই আহ্বান যে, মানব প্রকৃতিতে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা সবল ও সুন্দর তাহারই প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল, আদৌ উহার নীচ ভাবগুলির প্রতি নহে, এই বিষয়টী। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(৺প্রমদাদাস মিত্রকে, সম্ভবতঃ গাজিপুর হইতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে লিখিত)

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয় বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি কোথায় পাইব? তাহারই চেষ্টায় ভবঘুরেগিরি করিতেছি। যদি কখনও যথার্থ বৈরাগ্য হয়, মহাশয়কে বলিব; আপনিও যদি কিছু পান, আমি ভাগীদার আছি মনে রাখিবেন। কিমধিকমিতি

দাস
বিবেকানন্দ।

(৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত)

বরাহনগর।
১০ই মে, ১৮৯০।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

পূজ্যপাদেষু—

বহুবিধ গোলমালে ও পুনরায় জ্বর হওয়ায় আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। অভেদানন্দের পত্রে আপনার কুশল অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত

হইলাম। গ— ভায়া বোধ হয় এতদিনে ৺কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ স্থানে এ সময়ে যমরাজ বহু বন্ধু এবং আত্মীয়কে গ্রাস করিতেছেন, তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছি। নেপাল হইতে আমার কোন পত্রাদি বোধ হয় আইসে নাই। বিশ্বনাথ কখন এবং কিরূপে আমাকে rest (বিশ্রাম) দিবেন জানি না। একটু গরম কমিলেই এ স্থান হইতে পলাইতেছি. কোথা যাই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমার জন্য ৺বিশ্বনাথ সকাশে প্রার্থনা করিবেন, উনি যেন আমাকে বল দেন। আপনি ভক্ত, এবং "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ" ইতি ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে বিনয় করিতেছি। কিমধিকমিতি—

দাস
বিবেকানন্দ।

(৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত)

ঈশ্বরো জয়তি।

৫৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।
২৬শে মে, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

বহু বিপদঘটনার আবর্ত্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার যুক্তাযুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা বিবেচনা করিয়া উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

১। প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি রামকৃষ্ণের গোলাম— তাঁহাকে "সেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু" করিয়াছি। তাঁহার নিদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি প্রেম ও বিভূতিবান হইয়াও অকৃতার্থ হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

২। আমার উপর তাঁহার নিদেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ, বা নরক, বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।

৩। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবক যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিক ওদিক বেড়াইতে গেল, সে আলাহিদা কথা—কিন্তু সে বেড়ান মাত্র—তাঁহার মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত; আপনা আপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

৪। অতএব উক্ত নিদেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসিমণ্ডলী বরাহনগরে একটি জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন, এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্ব্বাহ এবং বাড়ী ভাড়াদি দিতেন।

৫। নানা কারণে ভগবান্ রামকৃষ্ণের শরীর অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদি এবং প্রতিকৃতি যথানিয়মে আমাদিগের মঠে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্য্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পূজার ব্যয়ও উক্ত দুই মহাত্মা বহন করিতেন।

৬। যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগিমণ্ডলী University Men (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ) হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে?

৭। পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয়, এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন, এবং সুরেশ বাবু তজ্জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন; এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরাম বাবুর মৃত্যুসংবাদ আপনি পূর্ব্ব হইতেই জানেন।

৮। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই (বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন)। তাঁহারা সন্ন্যাসী; তাঁহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাহাদিগের এই দাস মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছে, এবং ভগবান্ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

৯। ১০০০৲ টাকায় কলিকাতার সন্নিকটে জমি এবং মন্দির হওয়া অসম্ভব, অন্যূন ৫।৭ হাজার টাকার কমে জমি হয় না।

১০। আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার মান এবং সম্ভ্রম এবং আলাপও যথেষ্ট; আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার যদি অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধার্ম্মিক ধনবান্‌দিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করা আপনার উচিত কিনা বিবেচনা করিবেন। যদি ভগবান রামকৃষ্ণের সমাধি এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব এবং এই কার্য্যের জন্য, আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। বিশেষ বিবেচনা এবং বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কথা অনুধাবন করিবেন। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান, সৎকুলোদ্ভূত যুবা সন্ন্যাসিগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের Ideal (আদর্শ) ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের "অহো দুর্দ্দৈবম্"।

১১। যদি বলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?"

—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধন-ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ও ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি। আপনাকে পরম আত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আপনাকে বলিয়া আসিয়াছি, আপনার বিচারে যাহা হয় করিবেন।

১২। যদি বলেন, ৺কাশী আদি স্থানে আসিয়া করিলে সুবিধা হয়, আপনাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার জন্মভূমে ও তাঁহার সাধনভূমে সমাধি হইবে না, কি পরিতাপ! বঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়, ত্যাগ কাহাকে বলে, এদেশের লোকে স্বপ্নেও ভাবে না; কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান্ এদেশে বৈরাগ্য ও অসংসারিত্ব প্রেরণ করুন। এ দেশের লোকের কিছুই নাই, পশ্চিম দেশের লোকের, বিশেষ ধনীদিগের, এ সকল কার্য্যে অনেক উৎসাহ—আমার বিশ্বাস। যাহা বিবেচনা হয় উত্তর দিবেন। গ— আজিও পৌঁছান নাই—কালি হয়ত আসিতে পারেন। তাঁহাকে দেখিতে বড়ই উৎকণ্ঠা। ইতি

পুঃ—উল্লিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন।

দাস
বিবেকানন্দ।

অয়কেন (Rudolf Eucken.)

(শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল)

ব্যক্তিগত।

অয়কেন জার্ম্মানি দেশের একজন নূতন দার্শনিক পণ্ডিত। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ ৫ই জানুয়ারী তারিখ ইঁহার জন্মদিন। সুতরাং, অয়কেনের বয়স এখন ৬৯ বৎসর। ইনি এখনও জীবিত আছেন। ফ্রিসিয়ান গোষ্ঠী (Frisian Stock)-সম্ভূত বলিয়া, ইংরাজ রক্তের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এবং তজ্জন্যই ইঁহার উদ্ভাবিত নূতন দর্শনে ইংরাজজাতিসুলভ নৈতিক

(Ethical) ও কার্য্যকারী (Practical) আদর্শগুলি শুধু বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

ছাত্রজীবনে, প্রাচীন ইতিহাস ও গ্রাক্দর্শন তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে। লোট্জের (Lotze) বক্তৃতা তিনি খুব শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন না। অন্ততঃ লোট্জে তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তিনি কিছুদিনের জন্য বার্লিনে গিয়া ট্রেনডেলেনবার্গের (Trendelenburg) নিকট অধ্যয়ন করেন। গ্রীক চিন্তার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার এইখানে লাভ হয়। অয়কেন যে প্রথম হইতেই তাঁহার দর্শনশাস্ত্রকে সর্ব্ব-প্রকার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যার সহিত জড়িত করিয়া উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ ট্রেনডেলেনবার্গের নিকট শিক্ষার ফল।

কিছুদিন একটা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া অয়কেন ১৮৭১ খৃঃ অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়সে বেসেল (Basel) বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ১৮৭৪ খৃঃ জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়িরূপে দর্শনের অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেন। এবং গত ৪১ বৎসর ধরিয়া তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়াই দর্শনবিষয়ে তাঁহার যাহা কিছু বলিবার বলিয়া আসিতেছেন।

অয়কেন-রচিত গ্রন্থাদি।

দার্শনিক জগতে অয়কেন প্রথমতঃ আরিষ্টটলের ছাত্র ও সমালোচকরূপে পরিচিত হন। আরিষ্টটল সম্বন্ধে ১৭৮০ খৃঃ তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ আরিষ্টটলের প্রণালী (Aristotelian Method) সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা বাহির হয়। "Main Currents of Modern Thought" (আধুনিক চিন্তার মুখ্য গতি) নামক তাঁহার গ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ আমরা দেখিতে পাই, তাহাও প্রায় ১৮৭৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রথমতঃ ঐতিহাসিক গবেষণামূলক ছিল। পরে অয়কেন ইহার সহিত তাঁহার নিজের দার্শনিক মত, ও ইউরোপের সাধারণ দার্শনিক মতের ক্রম-বিকাশের ধারাকে সংযুক্ত করিয়া দেন। ১৮৮৫ খৃঃ, তিনি স্বভাববাদ (Naturalism) ও বুদ্ধিবাদের (Intellectualism) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করেন। ১৮৮৮ খৃঃ 'The Unity of the Spiritual Life in the Consciousness and Action of Mankind' (মানব জাতির জ্ঞানে ও কর্ম্মে আধ্যাত্মিক জীবনের একতা) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময়েই 'The Problem of Human Life' (মানব-জীবনের সমস্যা) এই গ্রন্থ বাহির হয়। এই গ্রন্থে (১) আমাদের জীবনের উপর ইতিহাসের প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের চিন্তার প্রভাব ও (২) সাধারণতঃ মানুষের জীবনের সহিত তাহার দার্শনিক মতবাদের সম্পর্ক ও যোগ, এই দুইটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু এই গ্রন্থে একটা বড় সমন্বয়ের আভাস থাকিলেও তাহা সম্যক্ সফলতা লাভ করে নাই। এবং ঐতিহাসিক গবেষণামূলক দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে ইহাই অয়কেনের শেষ গ্রন্থ।

ইহার পর হইতেই অয়কেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কিছু প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং কালে উঠিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা ও বিচারে প্রবৃত্ত হন। এই সমস্ত গ্রন্থাদির মধ্যে, 'The Truth of Religion' (ধর্ম্মের সার সত্য), 'Life's Basis and Life's Ideal' (জীবনের ভিত্তি এবং জীবনের আদর্শ), 'Christianity and New Idealism' (খৃষ্টানধর্ম্ম ও নূতন বিজ্ঞানবাদ),'The Meaning and Value of Life' (জীবনের অর্থ ও মূল্য কি ?), 'The Life of the Spirit' (অধ্যাত্ম জীবন) এই কয়খানি সমধিক প্রসিদ্ধ। খৃষ্টানধর্ম্ম সম্বন্ধে অয়কেনের মত 'Can we still be Christians ?' (আমরা কি এখনও খৃষ্টান থাকিতে পারি ?) এই গ্রন্থে খুব বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। সম্প্রতি 'Knowledge and Life' (জ্ঞান ও জীবন), 'The Theory of Knowledge' (জ্ঞান-তত্ত্ব) প্রভৃতি বাহির হইয়াছে।

অয়কেনের মাথার চুল সব সাদা হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও তিনি যুবকের মত উদ্যম লইয়া নূতন নূতন গ্রন্থাদি রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

অয়কেনের উপর পূর্ব্বতন মতসমূহের প্রভাব।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে অয়কেনের উপর কে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে অয়কেন-দর্শনের মূল

তত্ত্বটি কি তাহা আমাদের বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কেননা এই অয়কেন-দর্শনের মূল তত্ত্বটির সহিত ঐতিহাসিক দার্শনিক মতসমূহের বিরোধ ও মিলনের দ্বারাই আমরা উক্ত মতসমূহের প্রভাব কোথায় কি ভাবে কতটা কার্য্য করিয়াছে, তাহা সম্যক্ বিচার করিতে পারিব।

হিন্দু প্রভাব।

অয়কেন একজন এযুগের নূতন দার্শনিক। কিন্তু খুব একটি প্রাচীন প্রশ্নকেই তিনি তাঁহার দার্শনিক জগতের কেন্দ্র করিয়া ক্রমে চিন্তাজাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। অয়কেনের প্রশ্ন হইতেছে,—'স্বভাব না আত্মা ?' 'জড় না চেতন ?'—'Nature or Spirit ?' কোন্‌টি হইতে কোন্‌টির উদ্ভব ? জড়ই (Matter) কি আদি সত্তা (Reality) এবং চেতন শুধু তাহার একটা ক্রমপরিণাম (bye-product) ? অথবা আদি সত্তা চৈতন্য যাহার উপর এই জড় জগৎ ও তাহার ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে ? উপনিষদের ঋষিগণ জগৎ সম্বন্ধে এই সমাধান করিয়াছিলেন যে, কেহ বলে—'কাল' ইহার নিয়ন্তা, কেহ বলে 'স্বভাব' ইহার পরিচালক, কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, এক পরমাত্মার শক্তি দ্বারাই এই বিশ্ব সফল ও সজীব হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। সেই ঋষিগণের সহিত এ যুগের এই জার্ম্মান দার্শনিকের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ আমরা লক্ষ্য করিতেছি। তিনি যে সেই প্রাচীন ঋষিদিগের মত একই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে ; পরন্তু তাঁহাদের উদ্ভাবিত ও মীমাংসিত সত্যকেই তাঁহারও চরম মীমাংসা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অয়কেন জড়ের অন্তরাল-বর্ত্তী, স্বভাব (Nature) ও তাহার ক্রিয়ার অন্তরালবর্ত্তী এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন, অথচ বিশ্বব্যাপক পরমাত্মায় বিশ্বাস করেন। জড় বা স্বভাব এই Spirit বা আত্মার ক্রিয়া মাত্র। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে কিছু জড়ের বা স্বভাবের (Nature) ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাই মানুষের সমস্তটা, বা শেষ পরিণতি নয়, মানুষের মধ্যেও একটি আধ্যাত্মিক জীবন আছে, তাহা স্বভাবের (Nature) জীবন হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, এবং স্বভাবের ক্রিয়া অপেক্ষাও সত্য। সুতরাং অয়কেন বলেন যে, মানুষের পক্ষে এই আধ্যাত্মিক জীবনই চরম পরিণতি, ও পরম সত্য।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াকলাপ ও মানবজীবনের জটিল প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া উপনিষদের ঋষিরা প্রায় সকলেই স্বভাবের উপর আত্মার প্রভুত্বের যে দিব্য মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন, ও যে দেবদুর্লভ অতুলনীয় ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অয়কেনও এযুগে অনেকাংশে সেইরূপ একটি সমীচীন মীমাংসার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে উপনিষদের সহিত অয়কেনের যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এবং উপনিষদ্ দ্বারা অয়কেন যে কোনরূপে প্রভাবান্বিত, একথা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অয়কেনের দু একটা মারাত্মক রকমের ভ্রম ও ত্রুটির নিদর্শন পাইয়া কেহ বলিতে সাহস করিবেন, এমন মনে হয় না।

গ্রীক প্রভাব।

হিন্দু মনীষা বা হিন্দুদর্শনের প্রভাব অয়কেনের উপর বিশেষ নাই, ইহা আমরা দেখিলাম। তবে গ্রীক মনীষা ও খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান যুগের জড়বাদ (Materialism) অয়কেনকে কিরূপে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য। অয়েকেনের উপর গ্রীক প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমরা দেখিয়াছি যে, আরিষ্টটলের সমালোচনা হস্তেই অয়কেন সর্ব্বপ্রথম দার্শনিকদের আসরে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। অয়েকেনের বিশ্বাস, সমগ্র গ্রীক ইতিহাস জড় হইতে চেতনের দিকে, স্বভাব (Nature) হইতে আত্মার (Spirit) দিকে ক্রমপরিণতি বা ক্রমবিকাশেরই * ইঙ্গিত করিতেছে।

গ্রীক চিন্তার গতি সম্বন্ধে অয়কেনের সহিত সকলেই যে একমত হইবেন, এমন আশা আমরা করি না। তথাপি অয়কেনের ইঙ্গিত অনুসারেই আমরা গ্রীক মনীষার ক্রমবিকাশের ধারাকে নিম্নে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিব।

প্লেটোর পূর্ব্বেই গ্রীক চিন্তা জড় (Matter) এবং আত্মা (Spirit) এই দুইটি বিভিন্ন দিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ডেমোক্রিটাস ও প্রোট্যাগোরাস আইওনিয়ান দর্শনকে (Ionian Philosophy) সম্পূর্ণই জড়বাদী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা মানবাত্মার অমরত্বকে অস্বীকার ক

* 'The Life of the Spirit'—P. 210.

করিয়াছিলেনই, এমন কি মানবাত্মাকে পরমাণুসমূহের এক বিচিত্র সমন্বয় ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। অন্যপক্ষে পাইথাগোরাস, এম্পেডক্লিস এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ আত্মার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে খুব দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিয়া আত্মার এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র, অদৃশ্য জগতের কথা স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

প্লেটো।

কাজেই প্লেটোর কার্য্য অনেকটা সমন্বয়মুখী না হইয়া থাকিতে পারিল না। প্লেটো কিন্তু বিজ্ঞানবাদী (Idealist)। তিনি ভাব বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অস্তিত্ব, ও জড়ের অতিরিক্ত আত্মার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে একবারে নিঃসংশয়রূপে ঘোষণা করিলেন। কাজেই প্লেটোর সমন্বয় বস্তুমূলক (materialistic) না হইয়া ভাবমূলক (idealistic) হইয়া পড়িল। অয়কেনের উপরে প্লেটোর প্রভাব সামান্য নহে। দুইটি বিভিন্ন যুগের দেশগত ও কালগত ঐতিহাসিক পার্থক্যসত্ত্বেও জড় ও আত্মা সম্বন্ধে অয়কেনের এ যুগের দার্শনিক মীমাংসা বা সমন্বয় অনেকাংশে প্লেটোর সমন্বয়কে অনুসরণ করিয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্লেটো ও অয়কেন উভয়ই বলিতেছেন --

(ক) জড়জগতের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক জগৎ বিদ্যমান।

(খ) মানুষের এই স্বভাবের জীবন (Life in Nature) অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবন (Life in Spirit) বড় ও বেশী সত্য।

(গ) আধ্যাত্মিক রাজ্যে (Spiritual sphere) ও স্বভাবের রাজ্যে (Natural sphere) বিশেষ বিভিন্নতা বিদ্যমান। এই দুই রাজ্য স্বতন্ত্র ও পৃথক -- অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী।

প্লেটোর সহিত অয়কেনের আবার অনেক স্থলে মতের মিল নাই। প্লেটোর বুদ্ধিবাদ (Intellectualism) বা অতীন্দ্রিয় সত্তাবাদে (Transcendentalism) অয়কেনের কোনও সহানুভূতি নাই। যাহা হউক, ভাবরাজ্য (Spirit) ও বস্তুরাজ্যের (Nature) প্রকৃতি ও এই দুই রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে প্লেটো এবং অয়কেন অনেকটা একমত, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম।

আরিষ্টট্‌ল।

প্লেটোর পরে আরিষ্টট্‌ল আসিয়া একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক রাজ্যের উপর বিশেষ জোর দিলেন না। বরং তিনি এই বাস্তবজগতের মধ্যেই ইহার এক অংশের সহিত অন্য অংশের ও বিভিন্ন অংশের সহিত সমগ্রের একটা যোগবিধান বা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আরিষ্টট্‌ল ও তাঁহার শিষ্যদের হাতে গ্রীক্ চিন্তা প্লেটোর বিজ্ঞানবাদ হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিল, এবং ক্রমে আরিষ্টট্‌ল প্রদর্শিত বাস্তবজগতের মধ্যেও কোন বিশেষ গভীর ঐক্য বা সমন্বয় খুঁজিয়া পাইল না। এইরূপে প্লেটোর বিজ্ঞানবাদ, এবং আরিষ্টট্‌লের বাস্তবজগতের সমন্বয়, এই দুয়েরই বাহির হইয়া গ্রীক চিন্তার একটি প্রধান অংশ আত্মনিষ্ঠ ও আত্মকেন্দ্রাভিমুখী হইয়া পড়িল। ষ্টোয়িসিজ্‌ম্, এপিকিউরিয়ানিজ্‌ম্ এবং স্কেপ্‌টিসিজ্‌ম্ ইত্যাদি মতবাদ গ্রীকমনীষার বিবর্ত্তনপথে আসিয়া দেখা দিল।

প্লটিনাস্।

ইহার ঠিক পরেই প্লটিনাস (Plotinus) ও তাঁহার শিষ্যবর্গের হস্তে জড় ও আত্মার সমস্যা সম্পূর্ণ একদেশদর্শী মীমাংসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা আত্মাকে স্বীকার করিতে যাইয়া জড়কে একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিলেন। কি বিশ্বের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়, কি মানবের ও সমাজের জীবনে—ইঁহারা জড়কে উড়াইয়া দিয়া কেবল আত্মার মহিমাই ঘোষণা করিলেন।

খৃষ্টানধর্ম্ম।

খৃষ্টানধর্ম্ম এই সময় আসিয়া প্লটিনাস্ ও নব্য প্লেটো-মতাবলম্বিগণের (Neo-Platonic) বিজ্ঞানবাদের সহিত মিলিত হইল। প্লেটো-মতাবলম্বীরা বলিলেন, এই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া তবে আত্মার জগতে উঠিতে হইবে। খৃষ্টধর্ম্ম ঘোষণা করিল, ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়া আত্মার জগৎ হইতে এই বাস্তব জগতে, স্বর্গ হইতে এই পৃথিবীর ধূলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যীশু ভগবানের অবতার। জীবের উদ্ধারকল্পে অবতীর্ণ।

বর্ত্তমান যুগ।

তারপর বর্ত্তমান যুগ আসিয়া উপস্থিত। জার্ম্মানীর ধর্ম্মসংস্কার (Reformation) ও ফরাসীর রাষ্ট্রবিপ্লব (Revolution) এই জড় ও আত্মার সমস্যাকে আরও বেশী জটিল করিয়া তুলিল। মানবাত্মা ভগবানের সহিত নিজের সাক্ষাৎ যোগস্থাপনের জন্যই রিফরমেশনের মধ্য দিয়া বিপ্লব আনয়ন করিল। রাষ্ট্রবিপ্লবেও প্রজাশক্তির প্রত্যেক অংশই সচেতনভাবে নিজের সহিত রাষ্ট্রের একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধের জন্য ভৈরব হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিল। মূল কথা, মানবাত্মার স্বাধীনতাই বর্ত্তমান যুগের মূলমন্ত্র।

স্পিনোজা ও ক্যাণ্ট।

স্পিনোজা জড় বা কেবলমাত্র স্বভাবের (Nature) নিষ্পেষণ হইতে মানবাত্মাকে এক জ্ঞানের রাজ্যে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। নব্য প্লেটোমতাবলম্বীদের কিছু কিছু প্রভাব স্পিনোজার মধ্যেও লক্ষিত হয়। ক্যাণ্ট কিন্তু স্পিনোজার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। ক্যাণ্ট বলিলেন, জ্ঞান শুধু এই জড় বা স্বভাবের রাজ্যে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আধিপত্য দিতে পারে। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক রাজ্যের আধিপত্য জ্ঞানের সাধ্যায়ত্ত নহে। মানুষ শুধু স্বভাবে আবদ্ধ নয়, সে এক নৈতিক জীব (moral being, as opposed to natural being), এবং মানুষের অন্তর্নিহিত এই নীতিবোধই মানুষকে এই জড় রাজ্যের অতিরিক্ত এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্তায় বিশ্বাস করায়। যতক্ষণ মানুষ স্বভাবের রাজ্যে বাস করে ততক্ষণ সে জড়ের অধীন—পরাধীন। যখন মানুষ নিজেকে একটা নৈতিক জীব বলিয়া উপলব্ধি করে, তখনই সে এই জড়ের উপরে এক আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করে। তখনই মানুষ স্বাধীন। অয়েকেনের সহিত ক্যাণ্টের এই জড় ও আত্মার সমস্যার মীমাংসাবিষয়ে সাদৃশ্য বেশ স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে।

ফিক্তে, শেলিং ও হেগেল।

ফিক্তে, শেলিং, হেগেল,—ইঁহাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ ও বৈষম্য সত্ত্বেও, ইঁহারা তিন জনেই প্রায় বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃত সত্তা (Ultimate

Reality) এক অখণ্ড পরমাত্মা,—যাহা জড়ে ও চেতনে, স্বভাবের (Nature) ও আধ্যাত্মিক (Spirit) রাজ্যে এক নিয়মানুসারে ক্রমশঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইতিহাসের যুগ-পরম্পরার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

অয়কেনের উপর হেগেলের প্রভাব আমাদের চক্ষুকে এড়াইতে পারে না। বাধা বিঘ্ন ও বিরোধের মধ্য দিয়া (Hegelian Dialectic) মানব-জীবন ক্রমশঃই এক পরমপরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে। বাধাকে যে মধ্যযুগের সন্ন্যাসীদের মত ডিঙ্গাইয়া নয়, কিন্তু 'রক্তমাখা-চরণ-তলে' দলিয়া, মাড়াইয়া তবে আধ্যাত্মিক জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, অয়কেন ইহা নিশ্চয়ই হেগেলের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দী।

ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীটি জড়বাদী (Materialistic)। শুধু যে অয়কেনের এরূপ ধারণা, তাহা নহে। অন্যান্য দার্শনিকদের সহিত ইংলণ্ডের জন্ মর্লি ও ফ্রেডারিক হ্যারিসনেরও এই মত। প্রাচীনযুগে গ্রীকচিন্তা যেমন জড়জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবজগতে আসিয়া শেষ হইয়াছিল, বর্ত্তমানযুগ তেমনি ভাবজগৎ হইতে জন্মলাভ করিয়া জড়জগতের মধ্যে বহুধা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানযুগ আত্মাকে ছাড়িয়া জড়োপাসনা করিতেছে, এবং এই জড়োপাসনা মূর্খের উপাসনা। মানুষ আজ আত্মার কথা ভুলিয়া, আধ্যাত্মিক জীবনের কথা ভুলিয়া, শুধু একটি স্বভাব-তাড়িত, প্রবৃত্তিচালিত জীবনের মধ্যে নিয়ত ঘুরপাক খাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ভুলিয়া ভুলপথে ক্রমাগতই অধঃপতিত হইতেছে।

অয়কেন বর্ত্তমানযুগের মানুষকে আবার জড়ের উপাসনা ছাড়িয়া আত্মার উপাসনার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। চারিদিকে যাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অয়কেন তাহাকে গুছাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। অয়কেন একজন সমন্বয়কারী বিজ্ঞানবাদী (Synthetic Idealist)।

(ক্রমশঃ)

অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ। *

(সমালোচনা)

এ পর্য্যন্ত ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, (গৌড়পাদীয় কারিকা-সহ), ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকের একখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে তৎকালপ্রকাশিত ঈশ, কেন ও কঠ এই তিনখানি উপনিষদের সমালোচনা উপলক্ষে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলাম। আমরা প্রকাশককে আনন্দগিরির টীকাটীও ইহার সহিত বঙ্গাক্ষরে সংযোজিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রারম্ভ হইতে আমাদের সেই অনুরোধ প্রতিপালিত হইতেছে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। অধ্যবসায়শীল প্রকাশক মহাশয় যখন সুবৃহৎ ছান্দোগ্যটী সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন, তখন আশা হয়, বৃহদারণ্যকটীও অচিরে—সম্ভবতঃ এক বৎসরেই সম্পূর্ণ হইবে। এই দুইখানির তুলনায় অবশিষ্ট সমুদয় উপনিষদ্‌গুলিই ক্ষুদ্রকায়। সুতরাং অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ সমাপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সমগ্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, বঙ্গভাষা যে এক অমূল্য ধনে ধনী হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহাদেরই উপনিষদের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকা আবশ্যক। ইহাই 'শ্রুতিশিরঃ' (অর্থাৎ বেদের মস্তক) শব্দবাচ্য। ইহাই বেদের শ্রেষ্ঠ ও সারাংশ—জ্ঞানকাণ্ড। ইহাই প্রকৃত বেদান্ত শব্দবাচ্য এবং ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের মূল ভিত্তিই এই উপনিষদ্। সাংখ্যাদি ভারতীয় শিষ্ট-পরিগৃহীত অন্যান্য সকল দর্শনই নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মত উপনিষৎসম্মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। কি জ্ঞান, কি ভক্তি, কি যোগ—ভারতীয় সকল প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্ম-

* মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা, শাঙ্করভাষ্যানুবাদ ও টিপ্পনী সমেত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। সত্ত্বাধিকারী. সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত। লোটাস্ লাইব্রেরী, ২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্প্রদায়ই উপনিষদ্‌কেই মূল প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ বিশেষ মতের পরিণতি ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং উপনিষৎ-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা হিন্দুমাত্রেরই শোভা পায় না। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানি উপনিষদের ভাষ্য ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যরচনার পূর্ব্বে দ্রবিড়-ভাষ্যাদি প্রচলিত থাকিলেও উহারা এত বিস্তৃত ও জটিল যে, সাধারণের তাহাতে তত সুবিধা হইত না। এই কারণেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই উদ্যম। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য উত্তমরূপে বুঝিতে গেলে তৎপ্রণীত উপনিষদ্ভাষ্যগুলিও অধ্যয়ন করা বিশেষ আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, উপনিষদের মূলের অর্থ বুঝিলেই যথেষ্ট। কিন্তু মূলের আক্ষরিক অর্থ উত্তমরূপে জানিলেও ভাষ্য ব্যতীত অনেক স্থলে উহার বিভিন্ন অংশের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমই হয় না। কিন্তু উক্ত ভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলিয়া বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যতীত কাহারও উহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। ইহার পূর্ব্বে একবার বঙ্গভাষার সাহায্যে সভাষ্য উপনিষৎপ্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই উদ্যম সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত করিয়াই বলিতে পারা যায়। সুতরাং আমরা উপনিষদের বর্ত্তমান সংস্করণটিকেই বঙ্গভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাধারণকে উহার আলোচনা করিতে অনায়াসেই অনুরোধ করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "শালগ্রাম শিলার ন্যায় যেদিন বেদ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজিত হইবে, সেই দিনই বাঙ্গালীর যথার্থ উন্নতি হইবে।" আমরাও বাঙ্গালীকে এই শ্রুতিশিরঃ উপনিষদ্ ঘরে ঘরে রাখিয়া পূজা করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের এই সংস্করণের ছান্দোগ্য পড়িতে গিয়া দু একটা কথা যাহা মনে উদয় হইয়াছে, তাহাও এস্থলে বলিতে ইচ্ছা করি। পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছে, যদি আনন্দগিরিরও বঙ্গানুবাদ থাকিত, তবে আরও উত্তম হইত। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিতে হইয়াছে যে, ইহাতে পুস্তকের কলেবর এতদূর বর্দ্ধিত হইত যে, ক্রেতৃগণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইত। পণ্ডিত মহাশয় আনন্দগিরির টীকা অবলম্বন করিয়া কতকগুলি টিপ্পনী সংযোজিত করাতে এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু বোধ হয় সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক আনন্দগিরি অবলম্বনে আরও কতকগুলি

টিপ্পনী সংযোজিত করিয়া পুস্তকের কলেবর অতিরিক্ত বর্দ্ধিত না করিয়াও পুস্তকখানিকে আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারা যাইত।

আর একটী বিষয়ে আমাদের অভিযোগ আছে। আমাদের মনে হয়, আর একটু অধিক মনোযোগ দিলে, অনেক স্থলে গ্রন্থের অস্পষ্টতাদি দোষ দূর হইত। ছান্দোগ্য হইতেই দুই একটী উদাহরণ দ্বারা আমাদের কথা পরিস্ফুট করিব :—

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই আছে—

জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ—ইত্যাদি। এই অংশের অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা :— পৌত্রায়ণঃ (পুত্রস্য পৌত্রঃ) জানশ্রুতিঃ (জনশ্রুতস্য অপত্যং) হ (ঐতিহ্যে)।

মূলানুবাদ—পুরাকালে পুত্রের পৌত্র—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি নামক (রাজা)।

শাঙ্করভাষ্য—জানশ্রুতিঃ জনশ্রুতস্য অপত্যম্। হ ঐতিহ্যার্থং। পুত্রস্য পৌত্রঃ পৌত্রায়ণঃ। ভাষ্যানুবাদ—জানশ্রুতি অর্থ জনশ্রুতের পুত্র। 'হ' শব্দের অর্থ ঐতিহ্য (পুরাবৃত্ত), পৌত্রায়ণ অর্থ পুত্রের পৌত্র।

এক্ষণে দেখুন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা কি অর্থ প্রতীত হইতেছে। 'পুত্রের পৌত্র'—কাহার পুত্রের পৌত্র—অথবা 'পুত্র' নামক কোন ব্যক্তিবিশেষের পৌত্র? ভাষ্যে আছে—জনশ্রুতস্য অপত্যং; ভাষ্যানুবাদে আছে—জনশ্রুতের পুত্র। অপত্য ও পুত্র কি এক কথা? আনন্দগিরির টীকা দেখিলে অবশ্য এই সমুদয় সন্দেহেরই একেবারে ভঞ্জন হয়। তিনি বলিয়াছেন –

জনশ্রুতস্য পুত্রো যঃ তস্য পৌত্রং পৌত্রায়ণঃ স চ প্রকৃতো জনশ্রুতিরেবেত্যাহ পুত্রস্যেতি। ইহাতে আমরা বুঝিলাম, এখানে জনশ্রুত নামক রাজার ছেলের নাতিকে বুঝাইতেছে। সুতরাং মূলানুবাদটী এইরূপ হইলে কি আক্ষরিক অথচ স্পষ্টতর হইত না? 'জনশ্রুতি নামক রাজার বংশধর—তাঁহার পুত্রের পৌত্র'—

অথবা মূলানুবাদ যেমন আছে তেমনটী রাখিয়া আনন্দগিরির টীকা অবলম্বনে একটী টিপ্পনী দিলেও বোধ হয় চলিত।

ভাষ্যানুবাদে 'জনশ্রুতস্য অপত্যং' এই বাক্যের অর্থ 'জনশ্রুতেরপুত্র' করাতে শ্রুতির সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে—ওখানে বোধ হয়, অপত্য অর্থে বংশধর করিলে চলিত, কারণ, অপত্য বলিতে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি সকলকেই বুঝাইতে পারে।

আর দুইটী স্থানমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব ঃ—উক্ত উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে,—

'স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ'—

ইহার অন্বয় ও মূলানুবাদে 'পরার্দ্ধ্যঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় 'পরস্য ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধং স্থানং অর্হতীতি পরার্দ্ধ্যঃ ব্রহ্মাবলম্বনযোগ্য' এবং 'পরমাত্মার বাসযোগ্য'—এই ব্যাখ্যাগুলি ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু উহার শাঙ্কর ভাষ্য "পরার্দ্ধ্যঃ অর্দ্ধং স্থানং, পরঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধং তদর্হতীতি পরার্দ্ধ্যঃ—পরমাত্মস্থানার্হঃ" ইত্যাদির বঙ্গানুবাদে যে করা হইয়াছে—

"পরার্দ্ধ্য—অর্দ্ধ—**অৰ্দ্ধস্থান**, যাহা পর এবং অর্দ্ধ, তাহাই পরার্দ্ধ, সেই **পরার্দ্ধস্থানের** যোগ্য বলিয়া পরার্দ্ধ্য।"—ইত্যাদি

এখানে অর্দ্ধ শব্দের প্রতিশব্দে 'অর্দ্ধস্থান' এবং পরে আবার 'পরার্দ্ধস্থান' শব্দ প্রয়োগ করাতে কি পাঠকের মনে এই ধাঁধা লাগে না যে, এখানে কি অর্দ্ধেক স্থানের কথা বলা হইতেছে না কি? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে অর্দ্ধ শব্দের অর্থই স্থান, সুতরাং, 'অর্দ্ধ—স্থান' এবং 'পরার্দ্ধস্থানের পরিবর্ত্তে 'পরম স্থান' এইরূপ করিলেই কি স্পষ্টতর হইত না? ঐ খণ্ডেরই অপর এক স্থলের (১।১।৯) দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। প্রায় সর্ব্বস্থলেই অন্বয় ও মূলানুবাদে শাঙ্কর ভাষ্যের অভিপ্রেত অর্থই অনুসৃত হইয়াছে এবং তাহাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই শ্রুত্যংশের অন্তর্গত 'মহিম্না রসেন' বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—মহিম্না (মাহাত্ম্য-সমুদ্ভূতেন) রসেন (হবিষা)। অন্বয়—মহিমসম্ভূত রস দ্বারা অর্থাৎ হবিঃ দ্বারা।

কিন্তু শাঙ্করভাষ্যে রহিয়াছে—

"মহিম্না রসেন—কিঞ্চ এতস্যৈবাক্ষরস্য মহিম্না মহত্বেন ঋত্বিগ্‌যজমানাদিপ্রাণৈরিত্যর্থঃ। তথা এতস্যৈবাক্ষরস্য রসেন ব্রীহিযবাদিরসনির্ব্বর্ত্তেন হবিষেত্যর্থঃ।"

ভাষ্যানুবাদঃ—"অপিচ, মহিমা ও রস দ্বারা এই অক্ষরেরই মহিমা মহত্ত্ব অর্থাৎ ঋত্বিক্ (যজ্ঞে ব্রতী) ও যজমান প্রভৃতির প্রাণসমূহ দ্বারা (যজ্ঞ সম্পাদিত হয়)। সেইরূপ এই অক্ষরেরই রস দ্বারা অর্থাৎ ব্রীহি যবাদি-রসনিষ্পন্ন হবি দ্বারা নিষ্পাদিত হয়।"

ভাষ্যে, 'মহিমা দ্বারা' (ও) 'রস দ্বারা'—এই ভাবে দুইটাকে পৃথক্ পৃথক্ করা হইয়াছে, কিন্তু অন্বয়ে মহিমাকে রসের বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে—'মহিমা-সম্ভূত' রস।

ইহা কি পাঠকের পক্ষে একটু গোলমেলে ঠেকিবে না?

আমরা সমগ্র গ্রন্থটী উত্তমরূপে মিলাইয়া অধ্যয়ন করিবার অবকাশ এখনও পাই নাই। সুতরাং সমুদয় গ্রন্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু সন্দেহ হয়, এরূপ দোষ আরও আছে। সেই কারণে আমরা এক্ষণে চাহি—প্রথম সংস্করণে একটী বিস্তারিত শুদ্ধিপত্র, দ্বিতীয় সংস্করণে আমূল উত্তমরূপে সংশোধন এবং যেগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের সম্পাদনে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন। সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয় বোধ হয়, ইহা আমাদের অন্যায় দাবি বলিয়া গণ্য করিবেন না।

আমরা এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আরও দুই একটী কথা বলিতে চাই। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের কোন সাহেব পণ্ডিতকৃত ইংরাজী, ও বাঙ্গালী পণ্ডিতকৃত বাঙ্গালা অনুবাদ আছে, যথা ব্রহ্মসূত্র শারীরক ভাষ্যের Thibaut কৃত ইংরাজী এবং পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ। সেইগুলির মূল সংস্কৃত বুঝিতে গিয়া আমরা অনেক স্থলে ইংরাজী অনুবাদ হইতে অধিক সাহায্য পাইয়াছি এবং আমাদের অনুমান হইয়াছে যে, ইংরাজী অনুবাদে যে পরিমাণে সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে, বঙ্গানুবাদে তাদৃশ হয় নাই। ইহার কারণ কি? আমাদের দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়গণ বৈদেশিক পণ্ডিতগণ হইতে অবশ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অর্থ খুব ভালই বুঝেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাহার পরিচয় পাই না কেন? আমাদের বোধ হয়, প্রকাশক মহাশয়গণ ইচ্ছা করিলে ইহার অনেকটা প্রতীকার করিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয়গণকে অধিকতর অবকাশ দিলে, তাঁহাদের ঘাড়ে একেবারে অত্যধিক কাযের ভার না চাপাইলে বোধ হয় তাঁহারা সম্পাদনকার্য্যে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থক্রেতৃবর্গেরও এই বিষয়ে একটী গুরুতর দায়িত্ব আছে। ক্রেতার সংখ্যা খুব না বাড়িলে প্রকাশকগণও ত আর ঘরের অর্থ অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া গ্রন্থসম্পাদনের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করিতে পারেন না। অতএব বোধ

হয় যত দিন না দেশে সংস্কৃতচর্চ্চার অনুরাগ আরও প্রবল হইবে, ততদিন আমাদের এ দুর্ভাগ্য একেবারে ঘুচিবে না।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপ কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও উপনিষদের এই সংস্করণ পূর্ব্ব প্রকাশিত সংস্করণবিশেষ হইতে শতগুণে উৎকৃষ্ট, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি এবং ধর্ম্ম ও প্রাচীন গ্রন্থানুরাগী সকলেরই আমরা এই গ্রন্থ ক্রয় করিয়া নিজ নিজ গৃহে এক একখানি করিয়া রাখিতে অনুরোধ করি। ভগবৎ-সকাশে প্রার্থনা করি প্রকাশক মহাশয়ের এই মহান্ ব্রত সত্বরে নির্ব্বিঘ্নে উদযাপিত হউক।

পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্যপ্রার্থনা।

কিছুদিন হইতে আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি যে, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার কোন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়াছে। সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আমরা জনৈক সেবককে চাঁদপুরে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেন যে, দুর্ভিক্ষের কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমরা নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ থানার অধিবাসিগণের নিকট হইতেও দারুণ অন্নকষ্টের মর্ম্মভেদী সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের প্রধান অবলম্বন পাটের ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায় লোকে যে কয়দিন পারিল, সঞ্চিত অর্থে দিনপাত করিল। পরে গৃহের তৈজসপত্র, এমন কি, চাসের বলদ পর্য্যন্ত বেচিয়া, কোন ক্রমে চালাইতে লাগিল। ফলে, বর্ত্তমানে অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, নোয়াখালি জেলায়, লোকের কোন দিন অনশনে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে যাইতেছে। মজুরী করিয়াও জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নাই, কারণ, মজুর খাটাইবে কে?—সকলেই যে সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আগামী শ্রাবণ ভাদ্রমাসে আউস ধান্য কাটা হইবে, তখন লোকের অবস্থা কতকটা সচ্ছল হইবে। সুতরাং এই দুই আড়াইমাস কাল তাহাদিগকে কোন মতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু শত নরনারী অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আমরা বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহে সাহায্য-কেন্দ্র খুলিবার জন্য নয়জন সেবককে ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছি। তাঁহারা

উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান পরিদর্শন করিয়া, হাজিগঞ্জ, পাইকপাড়া, রামগঞ্জ ও খালিশপাড়া এই ৪টী কেন্দ্র খুলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী ত্রিপুরা জেলায় ও শেষোক্ত দুইটী নোয়াখালি জেলায়। প্রথম সপ্তাহের চাউল বিতরণ হইয়া গিয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

	গ্রামের সংখ্যা	কয়ঘর লোক	মোট সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
হাজিগঞ্জ কেন্দ্র	১০	৭৯	১৫০	মণ ৭৮২
পাইকপাড়া "	৪২	২৮২	৪৬২	" ১৬/৫
রামগঞ্জ "	১৩	৬০	১২৬	" ৬।৬।৹
খালিশপাড়া "	৮	৫৩	১০৫	" ৫।২

এখনও সকল গ্রাম পরিদর্শন শেষ হয় নাই। হাজিগঞ্জ কেন্দ্র হইতে প্রায় ৩০খানি গ্রাম, পাইকপাড়া হইতে প্রায় ৫২খানি, রামগঞ্জ হইতে প্রায় ৬০খানি ও খালিশপাড়া হইতে প্রায় ২৫খানি গ্রাম লইবার সঙ্কল্প আছে।

সেবকগণ লিখিতেছেন যে, সকল স্থানেই লোকের অবস্থা অতি শোচনীয়; নিম্নে ডুমুরিয়া নামক একটী গ্রামের দুরবস্থার কথা তাঁহাদের পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রামটী হাজিগঞ্জ কেন্দ্র হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী।

"গ্রামে ৪০।৫০ ঘর লোক হইবে। ইহার মধ্যে ১৩ খানি ঘরের অবস্থা বিশেষ খারাপ দেখিলাম। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই এক বেলারও খাওয়া নিয়মমত জুটে না, কেহ একদিন বা দুই দিনের পর গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়াছে। কাউফল (একপ্রকার অত্যন্ত টক বুনো ফল), পাট পাতা ও ডাটা সিদ্ধ খাইয়া রহিয়াছে। দুইটী ঘরে দুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্র দেখিলাম। ছেলেমেয়েদের হাত, পা, গাল শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরাগত, পেট ফুলা। ছেলেমেয়েদের থোড় খাইতে দিয়াছে দেখিলাম। স্ত্রী পুরুষের অবস্থার ত কথাই নাই। মেয়েরা বস্ত্রাভাবে আমাদের নিকট আসে নাই। একটী বাড়ীতে মশারীর কাপড় পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছে; কাপড় অভাবে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না। এখন হইতে এই ভীষণ অন্নকষ্টের প্রতিবিধান না করিলে শেষে যে উহা আরও ভীষণতর হইবে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রামের অবস্থা প্রায় এইরূপ। অবস্থা বুঝিয়া চাউল বিতরণ করা হইতেছে।"

অবস্থা বড়ই শোচনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। স্থানীয় লোকের অভিমত যে, আর এক মাস কাল যথোচিত সাহায্য দিতে পারিলে অবস্থা অনেকটা ভাল হইবে। কিন্তু এই এক মাস তাহাদের পক্ষে এক যুগ। কারণ শেষ কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত তাহারা ব্যয় করিয়া বসিয়া আছে। এখন সত্বর সাহায্য দিতে না পারিলে পরিণাম কি ভীষণ হইবে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিতেছেন।

রামগঞ্জ থানায় শীঘ্র আরও দুইটী কেন্দ্র খোলা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে আমরা তাহা করিতে সাহসী হইতেছি না। এই কেন্দ্র দুইটী খোলা হইলে, অতি সন্তর্পণে খরচ করিয়াও গড়ে মাসিক ৮।৯০০০৲ টাকা খরচ পড়িবে। বর্ত্তমানে আমরা গত বন্যা-কার্য্যের উদ্বৃত্ত ৭৭৬০॥৶১৫ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য, তন্মধ্যে অনুমান পাঁচশত টাকা, বর্ত্তমানে ভুবনেশ্বরে অগ্নিদাহক্লিষ্টগণের সাহায্যার্থ আমাদের যে কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে ব্যয় হইবে।

বলা বাহুল্য, উপস্থিত আমাদের হাতে যে টাকা আছে, তাহা অতি সত্বরই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, সুতরাং এই কার্য্য চালাইতে হইলে এখনই অর্থের প্রয়োজন। আমরা বঙ্গের অনশনপীড়িত নরনারীগণের পক্ষ হইতে সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আশু অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি। এই ঘোর দুর্দ্দিনের সময় অতি অল্প সাহায্যও অনেক সাহায্যের ন্যায় কাজ করিবে। বুভুক্ষু নারায়ণগণের সেবাকল্পে যিনি যাহা দান করিবেন, সাদরে গ্রহণ ও প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। অর্থসাহায্য ব্যতীত নূতন ও পুরাতন বস্ত্র, হোমিওপ্যাথিক, ও ক্লোরোডাইন, একোয়া টাইকোটিস্ প্রভৃতির ন্যায় এলোপ্যাথিক ঔষধেরও প্রয়োজন। সাধারণের নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করেন:—উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। অথবা—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোষ্ট আঃ, জেলা হাওড়া।

নিবেদক—সারদানন্দ।

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত কুম্ভমেলায় কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে যাত্রীদিগের ক্লেশ নিবারণ এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবার্থ যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) আশ্রমে একটী দাতব্য ঔষধালয় থাকা সত্ত্বেও, মেলার সময় যাহারা আশ্রমে আসিয়া ঔষধ লইয়া যাইবে, তাহাদের সুবিধার জন্য, হরিদ্বার যাইবার সাধারণ রাস্তার উপর একটী নূতন ঔষধালয় স্থাপিত হয়। এই দুইটী ঔষধালয় হইতে সর্ব্বসমেত ৩৫৩৭ জন রোগীকে ঔষধ দান করা হয়। ইহাদের মধ্যে ২৬ জন কলেরা রোগী ছিল। (২) রোগিগণকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য কয়েকটী অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তথায় ৩০টী কলেরা রোগীকে চিকিৎসা করা হয়। তন্মধ্যে ৯টী মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বাকি আরোগ্য লাভ করে। এতদ্ব্যতীত ১০২টী রোগীকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়, ইহাদের মধ্যে ২টী বসন্ত রোগী ছিল। (৩) একজন ডাক্তার, একটী কম্পাউণ্ডার ও একজন সেবককে কতকগুলি ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহারা মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে বিভিন্ন রোগাক্রান্ত ২৫৫জন লোককে চিকিৎসা করেন। (৪) যাহাতে সংক্রামক রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িতে না পারে, তজ্জন্য কয়েকজন ব্রহ্মচারীর উপর ভার দেওয়া হয়। ইঁহারা এ কার্য্য সফলতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। (৫) শব সৎকারার্থ একদল সেবক রাখা হইয়াছিল; ইঁহারা যখন যেখানে আবশ্যক হইয়াছিল তখনই তথায় গমন করিয়া এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। (৬) যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটী জিজ্ঞাসা বিভাগও খোলা হইয়াছিল। এখান হইতে অনেক যাত্রীকে মেলাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জ্ঞাপন করা হইত। ইহাতে বহু লোকের সুবিধা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।
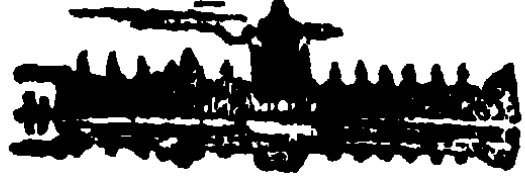
শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর।

(স্বামী সারদানন্দ)

সিদূরিয়াপটির শ্রীযুত মণিমোহনের বাটীতে ঠাকুরের কীর্ত্তনানন্দ ও ভাবাবেশ দেখিয়া, আমরাই যে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা নহে; বন্ধুবর বরদাসুন্দরও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং আবার কবে কোথায় আসিয়া ঠাকুর ঐরূপে আনন্দ করিবেন, তদ্বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ চেষ্টা ফলবতী হইতে বিলম্ব হয় নাই। কারণ, উহার দুই দিবস পরে, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ২৮শে নভেম্বর বুধবার প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, 'আজ অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কমল-কুটীরে কেশব বাবুকে দেখিতে আসিবেন এবং পরে সন্ধ্যাকালে মাথাঘসা পল্লীর জয়গোপাল সেনের বাটীতে আগমন করিবেন, দেখিতে যাইবে কি?' শ্রীযুত কেশব তখন বিশেষ অসুস্থ, এ কথা আমাদিগের জানা ছিল। সুতরাং আমাদিগের ন্যায় অপরিচিত ব্যক্তির কমল-কুটীরে গমন করায় তখন বিরক্তির কারণ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, আমরা সন্ধ্যায় শ্রীযুত জয়গোপালের বাটীতেই ঠাকুরকে দেখিতে যাইবার কথা স্থির করিলাম।

কলিকাতায় মাথাঘসা পল্লী বড়বাজারের কোন অংশের নাম হইবে ভাবিয়া, আমরা সেখানেই প্রথমে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে শ্রীযুত জয়গোপালের ভবনে পৌঁছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মণিমোহনের বাটীতে উৎসবের দিনের ন্যায় আজও বৈকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। কারণ, বেশ মনে আছে, রাস্তায় কাদা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছিলাম। এ কথাও স্মরণ হয় যে, মণিমোহনের বাটীর ন্যায় জয়গোপাল বাবুর ভবনও পশ্চিম-

দ্বারী ছিল এবং পূর্ব্বমুখী হইয়া আমরা উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রবেশ করিয়াই এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া আমরা ঠাকুর আসিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনিও তাহাতে আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া পূর্ব্বের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রশস্ত বৈঠকখানায় যাইতে বলিয়াছিলেন। দ্বিতলে উক্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত. বসিবার জন্য মেজেতে ঢালাও বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে এবং উহারই একাংশে ঠাকুর কয়েক জন ব্রাহ্মভক্ত-পরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নববিধান সমাজের আচার্য্যদ্বয়—শ্রীযুত চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও শ্রীযুত অমৃতলাল বসু যে তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন, এ কথা স্মরণ হয়। তদ্ভিন্ন গৃহস্বামী শ্রীযুত জয়গোপাল ও তাঁহার ভ্রাতা, পল্লীবাসী তাঁহার বন্ধু দুই তিন জন এবং ঠাকুরের সহিত সমাগত তাঁহার দুই একটি ভক্তও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মনে হয়, হুট্‌কো বলিয়া ঠাকুর যাহাকে নির্দ্দেশ করিতেন, সেই ছোট গোপাল নামক যুবক ভক্তটিকেও সে দিন তথায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। ঐরূপে দশ বারো জন মাত্র ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকটে সে দিন উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম, অদ্যকার সম্মিলন সাধারণের জন্য নহে এবং এখানে আমাদিগের এইরূপে আসাটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। সে জন্য সকলকে আহার করিতে ডাকিবার কিছু পূর্ব্বে আমরা এখান হইতে সরিয়া পড়িব, এইরূপ পরামর্শ যে আমরা স্থির করিয়াছিলাম, এ কথাও স্মরণ আছে।

সে যাহা হউক, গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রণাম করিলাম, এবং 'তোমরা এখানে কেমন করিয়া আসিলে' —তাঁহার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, 'সংবাদ পাইয়াছিলাম, আপনি আজ এখানে আসিবেন, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।' তিনি ঐরূপ উত্তর শ্রবণে প্রসন্ন হইলেন বলিয়া বোধ হইল এবং আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। তখন নিশ্চিন্তমনে উপবিষ্ট হইয়া আমরা সকলকে লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহার উপদেশগর্ভ কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ইতিপূর্ব্বে অল্পকাল মাত্র লাভ করিলেও তাঁহার অমৃতময়ী বাণীর অপূর্ব্ব আকর্ষণ আমরা প্রথম দিন হইতেই উপলব্ধি করিয়া-

ছিলাম। উহার কারণ তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও এখন বুঝিতে পারি, তাঁহার উপদেশ দিবার প্রণালী কতদূর স্বতন্ত্র ছিল। উহাতে আড়ম্বর ছিল না, তর্কযুক্তির ছটা, অথবা বাছা বাছা বাক্যবিন্যাস ছিল না, স্বল্প ভাবকে ভাষার সাহায্যে ফেনাইয়া অধিক দেখাইবার প্রয়াস ছিল না, কিংবা দার্শনিক সূত্রকারদিগের ন্যায় স্বল্পাক্ষরে যতদূর সাধ্য অধিক ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাও ছিল না। ভাবময় ঠাকুর ভাষার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতেন কি না, বলিতে পারি না, তবে যিনি তাঁহার কথা একদিনও শুনিয়াছেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্তরের ভাব শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য তিনি কিরূপে তাহাদিগের জীবনে নিত্য পরিচিত পদার্থ ও ঘটনাসকলকে উপমাস্বরূপে অবলম্বন করিয়া চিত্রের পর চিত্র আনিয়া তাহাদিগের সম্মুখে ধারণ করিতেন। শ্রোতৃবর্গও উহাতে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যেন তাহাদিগের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার কথার সত্যতায় এককালে নিঃসন্দেহ ও পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত। ঐ সকল চিত্র তাঁহার মনে তখনি তখনি কিরূপে উদয় হইত, এ বিষয় অনুধাবন করিতে যাইয়া আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতিকে, অদ্ভুত মেধাকে, তীক্ষ্ণ দর্শনশক্তিকে অথবা অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রত্যুৎপন্নমতিকে কারণস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ঠাকুর কিন্তু একমাত্র মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপাকেই উহার কারণ বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন ; বলিতেন, 'মার উপরে যে একান্ত নির্ভর করে, মা তাহার অন্তরে বসিয়া যাহা বলিতে হইবে, তাহা অভ্রান্ত ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলাইয়া থাকেন ; এবং স্বয়ং তিনি (শ্রীশ্রীজগদম্বা) ঐরূপ করেন বলিয়াই তাহার জ্ঞানভাণ্ডার কখনও শূন্য হইয়া যায় না। মা তাহার অন্তরে জ্ঞানের রাশি ঠেলিয়া দিয়া সর্ব্বদা পূর্ণ করিয়া রাখেন ; সে যতই কেন ব্যয় করুক না, উহা কখনও শূন্য হইয়া যায় না।' ঐ বিষয়টি বুঝাইতে যাইয়া তিনি একদিন নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন—

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর উত্তর পার্শ্বেই ইংরেজ-রাজের বারুদ-গুদাম বিদ্যমান আছে। তথায় অনেকগুলি সিপাহী নিয়ত পাহারা দিবার জন্য থাকে। উহারা সকলে ঠাকুরকে নিরতিশয় ভক্তি করিত এবং কখন কখন তাঁহাকে তাহাদিগের বাসায় লইয়া যাইয়া ধর্ম্মবিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া

লইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন তাহারা প্রশ্ন করিল, সংসারে মানব কি ভাবে থাকিলে তাহার ধর্ম্মলাভ হইবে? অমনি দেখিতেছি কি, কোথা হইতে সহসা একটি ঢেঁকির চিত্র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! ঢেঁকিতে শস্য কুটা হইতেছে এবং একজন সন্তর্পণে উহার গড়ে শস্যগুলি ঠেলিয়া দিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, মা বুঝাইয়া দিতেছেন, ঐরূপে সতর্কভাবে সংসারে থাকিতে হইবে। ঢেঁকির গড়ের সম্মুখে বসিয়া যে শস্য ঠেলিয়া দিতেছে, তাহার যেমন সর্ব্বদা দৃষ্টি আছে, যাহাতে তাহার হাতের উপর ঢেঁকির মুষলটি না পড়ে, সেইরূপ সংসারের প্রত্যেক কাজ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, ইহা আমার সংসার বা আমার কাজ নহে, তবেই বন্ধনে পড়িয়া আহত ও বিনষ্ট হইবে না। ঢেঁকির ছবি দেখিবামাত্র, মা মনে ঐ কথার উদয় করিয়া দিলেন এবং উহাই তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারাও উহা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। লোকের সহিত কথা বলিবার কালে ঐরূপ ছবিসকল সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালীতে অন্য বিশেষত্ব যাহা লক্ষিত হইত, তাহা ইহাই—তিনি বাজে বকিয়া কখনও শ্রোতার মন গুলাইয়া দিতেন না। জিজ্ঞাসু-ব্যক্তির প্রশ্নের বিষয় ও উদ্দেশ্য ধরিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্ত-বাক্যে উহার উত্তর প্রদান করিতেন এবং উহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পূর্ব্বোক্তভাবে উপমাস্বরূপে চিত্রসকল তাহার সম্মুখে ধারণ করিতেন। উপদেশ-প্রণালীর এই বিশেষত্বকে আমরা সিদ্ধান্তবাক্যের প্রয়োগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, কারণ, প্রশ্নোত্থ বিষয় সম্বন্ধে তিনি যাহা মনে জ্ঞানে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই কেবলমাত্র বলিতেন, এবং ঐ বিষয়ের অপর কোনরূপ মীমাংসা যে হইতে পারে না, এ কথা তিনি মুখে না বলিলেও তাঁহার অসঙ্কোচ বিশ্বাসে উহা শ্রোতার মনে দৃঢ়-মুদ্রিত হইয়া যাইত। পূর্ব্ব-শিক্ষা ও সংস্কারবশতঃ যদি কোন শ্রোতা তাঁহার সাধনালব্ধ মীমাংসাগুলি গ্রহণ না করিয়া বিরুদ্ধ তর্কযুক্তির অবতারণা করিত, তাহা হইলে অনেক স্থলে তিনি 'আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ন্যাজা-মুড়া বাদ দিয়া নাও না' বলিয়া নিরস্ত হইতেন। ঐরূপে কখনও তিনি শ্রোতার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার ভাবভঙ্গে উদ্যত হইতেন না।

ভগবদিচ্ছায় শ্রোতা উন্নত অবস্থান্তরে যতদিন না পৌঁছিতেছে, ততদিন প্রশ্নোক্ত বিষয়ের যথার্থ সমাধান তাহার দ্বারা হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়াই কি তিনি নিবৃত্ত হইতেন ?—বোধ হয়।

আবার, তাঁহার সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল হৃদয়ঙ্গম করাইতে ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত ভাবে কেবলমাত্র উপমা ও চিত্রসকলের উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু প্রশ্নোক্ত বিষয়ের তিনি যে মীমাংসা প্রদান করিতেছেন, অন্যান্য লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাধকেরাও তৎসম্বন্ধে ঐরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতাদি গাহিয়া এবং কখন কখন শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তসকল শ্রোতাকে শুনাইয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, উহাতে উক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এবং উহার দৃঢ় ধারণা পূর্ব্বক সে তদনুসারে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইত।

আর একটি কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গের চরমেই সাধক উপাস্যের সহিত নিজ অভেদত্ব উপলব্ধি করিয়া অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা ঠাকুর বারংবার আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। "শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান এক (পদার্থ)"—"সেখানে (চরম অবস্থায়) সব শিয়ালের এক রা (একই প্রকারের উপলব্ধির কথা বলা)"—ইত্যাদি তাঁহার উক্তি-সকল ঐ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে। ঐরূপে অদ্বৈত বিজ্ঞানকে চরম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও কিন্তু তিনি রূপরসাদি বিষয়ভোগে নিরন্তর ব্যস্ত সংসারী মানব-সাধারণকে বিশিষ্টাদ্বৈত-তত্ত্বের কথাই সর্ব্বদা উপদেশ করিতেন এবং কখন কখন দ্বৈতভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কথাও বলিতে ছাড়িতেন না। ভিতরে ঈশ্বরে তাদৃশ অনুরাগ এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকলের উপলব্ধি নাই, অথচ মুখে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতের উচ্চ উচ্চ কথাসকল উচ্চারণ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখিলে তাঁহার বিষম বিরক্তি উপস্থিত হইত এবং কখন কখন অতি কঠোর বাক্যে তাহাদিগের ঐরূপ কার্য্যকে নিন্দা করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না। আমাদিগের বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পঞ্চদশী-টসী পড়েছ ?" শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ তাহাতে উত্তর করেন, 'সে কার নাম, মহাশয়, আমি জানি না।' শুনিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "বাচ্‌লুম্,

কতকগুলো জ্যাটা ছেলে ঐ সব পড়ে আসে ; কিছু কর্‌বে না, অথচ আমার হাড় জ্বালায়।”

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন, অদ্য শ্রীযুত জয়গোপালের বাটীতে ঠাকুরকে এক ব্যক্তি, ‘সংসারে আমরা কিরূপে থাকিলে ঈশ্বর-কৃপার অধিকারী হইতে পারিব’ এইরূপ প্রশ্নবিশেষ করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মত তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং তিন চারিটি শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে গাহিয়া ঐ কথার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথার সার সংক্ষেপ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

মানব যতদিন সংসারটাকে ‘আমার’ বলিয়া দেখিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, ততদিন উহাকে অনিত্য বলিয়া বোধ করিলেও সে উহাতে আবদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং ইচ্ছা করিলেও উহা হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখিতে পায় না। ঐরূপ বলিয়াই ঠাকুর গাহিয়াছিলেন—“এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে ; ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জান্‌তে পারে” ইত্যাদি। অতএব এই অনিত্য সংসারকে ভগবানের সহিত যোগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—এক হাতে তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া থাকিয়া অপর হাতে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহার (ঈশ্বরের), আমার নহে। ঐরূপ করিলে মায়ামমতাদিতে কষ্ট পাইতে হইবে না এবং যাহা কিছু করিতেছি, তাঁহার কর্ম্মই করিতেছি, এইরূপ ধারণার উদয় হইয়া মন তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি, বুঝাইতে ঠাকুর গাহিলেন, “মন রে কৃষি-কাজ জান না”—ইত্যাদি। গীত সাঙ্গ হইলে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, ‘ঐরূপে ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সংসার করিলে ক্রমে ধারণা হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহারই (ঈশ্বরের) অংশ। তখন সাধক পিতা-মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী জ্ঞানে সেবা করিবে, পুত্র-কন্যার ভিতর বালগোপাল ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ দেখিবে, অপর সকলকে নারায়ণের অংশ-জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত ব্যবহার করিবে। ঐরূপ ভাব লইয়া যিনি সংসার করেন, তিনিই আদর্শ-সংসারী এবং তাঁহার মন হইতে মৃত্যুভয় এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তি বিরল হইলেও একেবারে যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে।’

পরে, ঐরূপ আদর্শে উপনীত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিলেন,— বিবেক বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে যাইয়া সংযতচিত্তে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয়; তবেই মানব পূর্ব্বোক্ত আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারে। * ঐরূপে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ঠাকুর নিম্নলিখিত রামপ্রসাদী গীতটি গাহিয়াছিলেন,—'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী কল্পতরুমূলে গেলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' আবার, 'বিবেকবুদ্ধি' কথাটি প্রয়োগ করিয়াই ঠাকুর উহা কাহাকে বলে, সে কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐরূপ বুদ্ধির সহায়ে সাধক ঈশ্বরকে নিত্য ও সার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে এবং জীব ও জগৎকে অনিত্য ও অসার জানিয়া পরিত্যাগ করে। ঐরূপে নিত্য বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার পরে কিন্তু ঐ বুদ্ধিই তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, যিনি নিত্য, তিনিই লীলায় জীব ও জগৎ-রূপ নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এবং ঐরূপ বুঝিয়াই সাধক চরমে ঈশ্বরকে নিত্য ও লীলাময় উভয় ভাবে দেখিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর আচার্য্য চিরঞ্জীব একতারা-সহায়ে "আমায় দে মা পাগল করে"— সঙ্গীতটি গাহিতে লাগিলেন এবং সকলে তাঁহার অনুসারী হইয়া উহার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঐরূপে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন অন্য সকলেও ঠাকুরকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ গানটি সাঙ্গ করিয়া শ্রীযুত চিরঞ্জীব, "চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় রে" গানটি আরম্ভ করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত গীতটি গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিবার পরে ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিয়া সেদিনকার কীর্ত্তন শান্ত হইল ও সকলে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই দিনেও ঠাকুর মধুরভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুত মণিমোহনের বাটীতে তাঁহার যেরূপ বহুকালব্যাপী গভীর ভাবাবেশ দেখিয়াছিলাম, অদ্য এখানে ততটা হয় নাই। কীর্ত্তনান্তে উপবেশন করিয়া ঠাকুর শ্রীযুত চিরঞ্জীবকে বলিয়াছিলেন, "তোমার

* ঠাকুরের অদ্যকার কথার সারসংক্ষেপের কিয়দংশের জন্য আমরা শ্রদ্ধাস্পদ 'কথা'কারের নিকট ঋণী রহিলাম।

এই গানটি ('চিদাকাশে হল' ইত্যাদি) যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন কেহ উহা গাহিবামাত্র (ভাবাবিষ্ট হইয়া) দেখিতাম, এত বড় জাযন্ত পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হইতেছে!"

অনন্তর শ্রীযুত কেশবের ব্যাধি সম্বন্ধে শ্রীযুত জয়গোপাল ও চিরঞ্জীবের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমাদের স্মরণ আছে, শ্রীযুত রাখালের * শরীর সম্প্রতি খারাপ হইয়াছে, এই কথা ঠাকুর এই সময়ে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত জয়গোপাল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রকে যে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং ব্রাহ্মসঙ্ঘের সকলের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহ। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া নামক স্থানে ইঁহার উদ্যানে শ্রীযুত কেশব কখন কখন সদলবলে যাইয়া সাধনভজনে কালাতিপাত করিতেন এবং ঐ উদ্যানে ঐরূপ এক সময়ে ঠাকুরের সহিত প্রথম সম্মিলিত হইয়াই তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিকতা ক্রমে গভীরভাব ধারণ করিয়া উহাতে নববিধানরূপ সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুত জয়গোপালও ঐ দিন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কখন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট গমন করিয়া, কখন বা নিজ বাটীতে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া ধর্ম্মালাপে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুরের কলিকাতায় আসিবার গাড়ীভাড়ার অনেকাংশ শ্রীযুত জয়গোপাল এক সময়ে বহন করিতেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। যাহা হউক, রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা এইবার ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ

* স্বামী শ্রীব্রহ্মানন্দ নামে এখন যিনি শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসঙ্ঘে পরিচিত আছেন।

অয়কেন (Rudolf Eucken) ।

(শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-এল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অয়কেন ও তাঁহার সমসাময়িক মতবাদ।

'নেদং যদিদমুপাসতে'; এইরূপ ঠিক একটা নিষেধাত্মক ধারণা লইয়া অয়কেন তাঁহার সমসাময়িক প্রায় সকল মতবাদগুলিকেই প্রথমে বর্ত্তমানের অনুপযোগী, এইরূপ প্রমাণ করিয়া, তৎপরে তাঁহার নিজের সমন্বয়কারী ক্রিয়া-বাদের (Syntagamatic Activism) মূলপত্তন করিয়াছেন।

স্বভাব-বাদ (Naturalism)।

অয়কেন স্বভাব-বাদকে অস্বীকার করেন। স্বভাব-বাদ বলিতে অয়কেন এই বুঝেন যে, জ্ঞানরাজ্যে ইহা বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুর ধার ধারে না। সকল প্রকার আত্মাসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে স্বভাব-বাদীরা কাল্পনিক ও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন। শিল্পে ও কলা-সাহিত্যে, চারিপাশের প্রাকৃতিক জীবন ও দৃশ্যাবলী, হুবহু চিত্রে অঙ্কিত ও কাব্যে ব্যক্ত করিতে পারিলেই হইল। শিল্প-সাধনার কোন কাল্পনিক আদর্শের অনুসরণ পণ্ডশ্রম মাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাই প্রধান সুখ। সামাজিক ব্যবহারমধ্যেও যাহাতে মানুষ যত বেশী এই স্বাভাবিক ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে (অয়কেন-প্রণীত Life's Basis, ২৮ পৃষ্ঠা)। এইরূপ স্বভাব-বাদ এ যুগের একটি চিহ্ন।

ইহার উদ্ভবের কারণ, পদার্থ বিজ্ঞানের আশাতিরিক্ত উন্নতি ও তজ্জন্য বস্তুজগতের উপর মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্য; ঐতিহাসিক প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির প্রতি আধুনিক মানুষের মনে মনে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা; মানুষের চারিদিকের ও বাহিরের জিনিসকে আয়ত্ত করিতে যাইয়া আত্মার জীবনসম্বন্ধে উদাসীনতা ও উপেক্ষা।

এই স্বভাব-বাদের বিরুদ্ধে অনেক কারণে অয়কেন নিতান্ত বিরক্ত। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, ইহা মানুষের আত্মার জীবনকে, স্বভাবাতি-রিক্ত আধ্যাত্মিক জীবনকে একেবারে অস্বীকার করে। আধ্যাত্মিক

জীবনের যে সমস্ত প্রকাশ আমরা কখন কখন দেখিতে পাই, তাহাও এই স্বভাবেরই একটা সূক্ষ্ম পরিণাম বা বিকার—অয়কেন ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধার কথা বলিয়া অস্বীকার করেন। অয়কেন বলেন, আত্মার জীবনই এযুগে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে বেশী দরকার।

তারপর, কি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া, কি অতীন্দ্রিয়সত্তার দিক দিয়া, এই স্বভাব-বাদ আমাদের জ্ঞানের দরজায় কোনরূপ আঘাত করিতে পারে না, দ্বার উদঘাটন ত দূরের কথা। জড় ও আত্মার সমস্যারও কিছু বিশেষ মীমাংসা আমরা ইহাতে পাই না। আমাদের আত্মার চারিদিকে যে একটি মগ্ন চৈতন্যের (Subconscious) রাজ্য আছে, সে সম্বন্ধে স্বভাব-বাদের মুখে একটি কথাও নাই। জীবনের অভিজ্ঞতায় উত্তরোত্তর আমরা যাহা লাভ করি, সেই সমস্ত সঞ্চিত উপলব্ধির বেশীর ভাগ সম্বন্ধেই স্বভাববাদ নিরুত্তর।* কাজেই স্বভাব-বাদের মীমাংসা এ যুগে, অয়কেনের মতে একেবারে অগ্রাহ্য।

জড়বাদ (Materialism)

জড় হইতে চেতনের উদ্ভব এই যে মত, অয়কেন ইহাকে জড়বাদ আখ্যা দিতে চান। এবং বলা বাহুল্য যে ইহাকে তিনি অস্বীকার করেন। ক্যাবানিস্ (Cabanis) লিখিয়াছিলেন যে, মনের চিন্তা মস্তিষ্কেরই একটা ক্রিয়ার ফল মাত্র। এপিফেনোমেন্যালিজ্‌ম (Epiphenomenalism) বলিয়া যে মতবাদের কথা আমরা শুনিতে পাই, তাহার সহিত হাক্সলির নাম জড়িত আছে। হাক্সলি বলেন যে, আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে কোন একটা পরিবর্ত্তন হইলে তাহার ফলে আমাদের চৈতন্যের (Consciousness) মধ্যেও একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—যাহাকে সাধারণতঃ লোকে মন (Mind) বা আত্মা (Soul) বলিয়া থাকে।

কিন্তু হার্ব্বার্ট স্পেনসার ও টিণ্ড্যাল (Tyndall) উভয়েই বলেন যে, শরীর ও মন এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। কি করিয়া যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনের সহিত জ্ঞানের বা চৈতন্যের মধ্যে পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

* Main Currents of Modern Thought—p. 235.

বেইন, স্পেন্সার, হোফডিং, এবং বুণ্ড (Wundt) প্রভৃতি বলেন যে শরীর ও মন একই চরম সত্তার দুইটি বিভিন্ন দিক মাত্র। তবে ইহাদের পরস্পরের পরিবর্ত্তনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা গেলেও কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ইহাদের মধ্যে নাই। ইহারা সকলেই শরীর ও মন পরস্পর পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে থাকিয়া কার্য্য করে—এই মতে (Psycho-physical Parallelism) বিশ্বাসী। অয়কেন বলিতে চান এই মতবাদ কিছুমাত্র টেকসই নয়। কেন না—এই মতবাদ হয় জড় হইতে চেতন, না হয় চেতন হইতে জড়ের উদ্ভব,—এই দুইটি বিভিন্ন মতবাদকেই শুধু একটা কাল-পর্দ্দার আড়ালে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার প্রয়াস করে। কোন দিকেই সোজা ভাবে হাঁ বা না বলিবার সাহস এই মতবাদের নাই। অয়কেন জড় হইতে চেতন বা চেতন হইতে জড়—শরীর হইতে মন বা মন হইতে শরীর উদ্ভূত হইয়াছে কি না এসম্বন্ধে কোন কথাই না বলিয়া, শুধু বলেন যে, শরীর ও মন, জড় ও চেতন, এ দুইই আধ্যাত্মিক জীবনের নিম্নস্তর মাত্র। তবে স্বভাব হইতে আত্মায়, মানুষ শুধু বুদ্ধি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা উঠিতে পারে না। একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম বা বিরোধের মধ্য দিয়া মানুষকে স্বভাব হইতে আত্মায় উঠিতে হয়। ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

জীবনবাদ (Vitalism)।

জড়বাদ ও বস্তুতন্ত্রতার উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক দেওয়ায় স্বভাবতঃই প্রতিক্রিয়ার ফলে জড়ের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সম্প্রতি ভাইট্যালিজম্ বলিয়া একটা মতবাদের উদ্ভব আমরা দেখিতেছি। জড়বাদ জীবন ও আত্মা সম্বন্ধে যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা বা প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া কোনমতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে বা চোখ বুজিয়া ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত প্রশ্নই ভাইট্যালিজমের ক্ষেত্রে আসিয়া হাতিয়ারবাঁধা সৈনিকদলের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন সত্যকেই এ যুগে শুধু ডিঙ্গাইয়া অতিক্রম করিবার আর জো নাই।

এই সমস্ত মতবাদীরা বলেন যে, জড় বা জড়ের অন্তর্নিহিত যে শক্তি (Matter or Energy), তাহা হইতে জীবন (Life) সম্পূর্ণই পৃথক

প্রকৃতির বস্তু। জড় বা জড়ের শক্তি হইতে জীবন একেবারে ভিন্ন, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। জড় বা শক্তি হইতে জীবনবস্তুর এই প্রকৃতিগত পার্থক্য ঘোষণা করাই এযুগে ভাইট্যালিজ্‌ম্ বাদের প্রধান কার্য্য।

বার্গসোঁ (Bergson) ও অয়কেন উভয়েই এই মতবাদের সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বার্গসোঁ প্রাণী ও উদ্ভিদ এই উভয় শ্রেণীতেই জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন, এই জীবনের সাধারণ লক্ষণ বা চিহ্ন এই যে, ইহা প্রথমতঃ একটা শক্তি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করে—ইহা জীবনের আহরণ বা সঙ্কোচন ক্রিয়া; পরে শক্তি সংগৃহীত হইলে তাহাকে নানা দিকে, নানা আকারে, বিভিন্ন স্রোতের ধারার মত ছড়াইয়া দেয়, বা সম্প্রসারণ করে (Main Currents, ১৮৫ পৃঃ) বার্গসোঁর মতে ইহাই জীবনধর্ম্মের বিশেষত্ব। অয়কেন আরও বেশী স্পষ্টরকমে জড় হইতে জীবনের পার্থক্য ঘোষণা করিয়াছেন। অয়কেন বলেন যে, এখন ইহা একরূপ অসম্ভব কল্পনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে যে, জীবন জড়েরই একটা বিকাশ মাত্র। আমরা এখন ক্রমশঃই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, জড় হইতে জীবন সম্পূর্ণই পৃথক ও স্বাধীন। জীবনের এই স্বাধীনতা আর আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। * সুতরাং আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, জড় হইতে আত্মার দিকে যে ইউরোপের চিন্তা প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে, তাহা এই জীবনবাদ বা ভাইট্যালিজ্‌মের মধ্য দিয়াই পথ খুঁড়িয়া চলিয়াছে।

বুদ্ধিবাদ (Intellectualism)।

বার্গসোঁ ও অয়কেন উভয়েই বুদ্ধিকে (intellect) বহু পরিমাণে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

বার্গসোঁ বলেন যে, বুদ্ধি (intellect) ও বোধি (intuition) ইহাদের কার্য্য (function) যে শুধু পৃথক্, তাহাই নহে, পরন্তু গোড়া হইতেই ইহাদের প্রকৃতিও পৃথক্। ইহাদের এক হইতে অন্যের উদ্ভব হয় নাই। ইহারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবেই অবস্থান করে। তবে প্রথম অবস্থায় ইহারা মনের মধ্যে এমন মেশামিশিভাবে থাকে যে, অনেক সময়ে কোনরূপ

* Creative Evolution, পৃঃ ২৬৭।

বিশ্লেষণ দ্বারাই ইহাদের পার্থক্য স্পষ্ট রকমে ধরা যায় না। তাই আমরা সাধারণতঃ একেকে অন্য বলিয়া ভুল করি, অথবা এক হইতে অপরের উদ্ভব ভ্রান্তিবশতঃ কল্পনা করিয়া বসি। সুতরাং বুদ্ধি ও বোধির পার্থক্য বিষয়ে বার্গসোঁ প্রধানতঃ মনস্তত্ত্বের (psychology) উপরেই বেশী নির্ভর করিলেন।

কিন্তু অয়কেন বুদ্ধি ও বোধির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বার্গসোঁর মত মনস্তত্ত্বের বিশেষ কোন প্রমাণ (psychological proof) উত্থাপনই করেন নাই; পক্ষান্তরে, তিনি মনস্তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের (Historic evolution) প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন; অবশ্য বার্গসোঁ এরূপ করেন নাই। The Problem of Human Life (মানবজীবনের সমস্যা) নামক গ্রন্থে অয়কেন দুই শ্রেণীর দার্শনিকদের কথা বলিয়াছেন। এক শ্রেণী—যাঁহারা শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ দার্শনিক চিন্তার জাল বুনিয়া যান বা গিয়াছেন, যেমন স্পিনোজা, হেগেল, স্পেনসার; অপর শ্রেণী—যাঁহারা শুধু বুদ্ধির কথা বলেন না, পরন্তু বোধি বা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত উপলব্ধির কথা বলেন, ও স্বকীয় জীবনে তাহার সাক্ষ্য দেন, যেমন প্লটিন্যাস, অগষ্টাইন, লুথার। ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের এই শেষোক্ত শ্রেণীর কার্য্যকারিতার উপরেই অয়কেন অধিকতর বিশ্বাসী এবং মোটের উপরেও প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতি তিনি বেশী সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

পরমার্থসত্তা যে শুধু একটা জ্ঞান, এবং তাহা যে বোধির (intuition) অধিগম্য না হইয়া শুধু বুদ্ধির (intellect) অধিগম্য, এই গ্রন্থেই (১০২ পৃঃ) হেগেল-দর্শনকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও প্রতিবাদ করিতে যাইয়া অয়কেন তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। অয়কেন বলেন যে, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, যখনই একটা নূতন শক্তি, নূতন ভাব বা আদর্শ মানব-সমাজকে একটা বিরাট আন্দোলনে বা প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তখনই তাহার মূলে বুদ্ধি ও বোধিলব্ধ আধ্যাত্মিক জীবনের একান্ত মিলন বর্ত্তমান। যেখানে বুদ্ধি এইরূপ বোধি বা ধর্ম্মজীবনের উপলব্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন, সেখানেই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনে সেই শুষ্ক বুদ্ধির কূটতর্কজাল নিষ্ফলতা প্রসব করিয়াছে। (Main Currents—৮৫ পৃঃ) সাক্ষী

পাশ্চাত্যজগতে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান। পাণ্ডিত্যাভিমানী, বুদ্ধিসর্ব্বস্ব দার্শনিকগণ খৃষ্টের ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রথম প্রথম কি অবজ্ঞা বা করুণার চক্ষেই না দেখিয়াছিলেন! এমন কি, লুথারের ধর্ম্মসংস্কারেও দেখা যায় যে, ইরাসমাসের শুষ্ক পাণ্ডিত্য অপেক্ষা লুথারের ধর্ম্মজীবনের একাগ্রতা ও সিংহ-বিক্রমই খৃষ্টানধর্ম্মকে এক মহা দুর্দ্দিনের সময় রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং অয়কেন শুধু বুদ্ধি ও বোধিকে স্বতন্ত্র বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, পরন্তু বর্ত্তমান যুগে বুদ্ধি অপেক্ষা বোধির অনুশীলনই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। ঐতিহাসিক দুর্দ্দিন ও সঙ্কটের সময় বুদ্ধি একা কোন দিনই কিছু করিতে পারে নাই। আজও একটা ঐতিহাসিক সঙ্কটের দিন উপস্থিত এবং এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য বার্গসোঁ ও অয়কেন উভয়েই বুদ্ধি অপেক্ষা বোধির শরণাপন্ন হইতে পাশ্চাত্য জগৎকে তারস্বরে আহ্বান করিতেছেন।

যদিও বার্গসোঁ মনস্তত্ত্বের উপর এবং অয়কেন ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের উপর, বুদ্ধি ও বোধির স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তথাপি পরমার্থতত্ত্ব (ontology) ও জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) এই দুই দিক হইতে বার্গসোঁ ও অয়কেন প্রায় একই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধি ও বোধির পার্থক্য ঘোষণা করিয়াছেন। চরম সত্য (ultimate reality) যে কি, সে সম্বন্ধে বার্গসোঁ ও অয়কেন খুব একমত না হইলেও, তাহা যে হেগেল বা হেগেল-অনুকারীদের শুধু একটা জ্ঞানময় সত্তা নয়, ইহা তাঁহারা উভয়েই স্বীকার করেন। চরম সত্য যে শুধু বুদ্ধির বা চিন্তার অধিগম্য নয়, এ বিষয়েও বার্গসোঁ ও অয়কেন সম্পূর্ণ-একমত। তার পর বুদ্ধির দ্বারা আমরা যে সমস্ত সত্য জানিতে পারি না; যাহা জানি, তাহা যে আংশিক সত্য মাত্র; এমন কি, আমাদের জীবনেরই অনেক রহস্য যে বুদ্ধি কোনক্রমেই উদ্ঘাটন করিতে পারে না,—এ বিষয়েও তাঁহারা উভয়ে একমত।

অয়কেন ও বার্গসোঁ-দর্শন কাজেই একরূপ বুদ্ধি-প্রত্যাখ্যানকারী দর্শন (Anti-intellectual Philosophy)। কিন্তু এ বিষয়ে ক্যাণ্টই তাঁহাদের পূর্ব্বগামী। বরং ক্যাণ্টই অধিকতর বুদ্ধিপ্রত্যাখ্যানকারী দার্শনিক। ক্যাণ্ট বলেন, বুদ্ধি শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা (phenomena) জানিতে পারে। ঈশ্বর, পরলোক, আত্মার অমরত্ব এই সব বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কাজেই

বুদ্ধি ইহাদের বিষয়ে সম্পূর্ণই নির্ব্বাক্। ইহাদের বিষয়ে কেবল বিশ্বাসই মানুষের একমাত্র সম্বল। ক্যাণ্টের এই বিশ্বাস (Faith) এবং এ যুগের বার্গসোঁ, অয়কেনের বোধি (Intuition) প্রায় এক। কেনন, বিশ্বাস ও বোধির কার্য্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় এক। কিন্তু এই স্থানে আমাদের একটি কথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, ক্যাণ্টের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত সত্তায় (Phenomenon and Noumenon) যে পার্থক্য বা যে একটা দ্বৈতাভাস লক্ষিত হয়, অয়কেনের স্বভাব (Nature) এবং আত্মায়ও (Spirit) প্রায় সেই রকম একটা দ্বৈতবোধ আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু বার্গসোঁর জড় (Matter) ও আত্মায় (Spirit) সে রকম একটি দ্বৈতভাব আমরা পাই না। কেননা, বার্গসোঁ স্পষ্টই ক্যাণ্টের ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (noumena and phenomena) এই শ্রেণীবিভাগকে অস্বীকার করিয়া জড় ও আত্মাকে একই চরম সত্তার দুইটি বিভিন্নমুখী ও বিভিন্ন বেগের গতি (Two opposed movements) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন

হিতকারী সত্য-বাদ (Pragmatism)।

উইলিয়ম জেম্স্ এই মতের উদ্ভাবনকারী। তিনি বলেন যে, প্র্যাগ-ম্যাটিজ্ম্ মতবাদের দুইটি দিক আছে। প্রথমতঃ ইহা একটি প্রণালী (Method) মাত্র, যদ্দ্বারা আমরা যাহা আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে হিতকারী ও কার্য্যকারী (Practical), তাহা বাছিয়া লইতে পারি, এবং যাহা নিরর্থক, যাহার তর্কে ও মীমাংসায় কোন লাভ নাই, এমন কি, আজ পর্য্যন্ত যাহার কোন সমীচীন মীমাংসা সম্ভব হইল না, তাহা পরিত্যাগ করি। দ্বিতীয়তঃ ইহা সত্যের একটা নূতন ব্যাখ্যা (theory of truth) স্থাপনে প্রয়াসী। এই মতবাদ নূতন নহে, সক্রেটিস, আরিষ্টট্ল, লক, বার্কলি, হিউম, সকলেই অজ্ঞাতসারে এই মতের পোষক ছিলেন। শুধু বর্ত্তমানে ইহা একটা নূতন দৌত্য লইয়া সভ্যজগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে মাত্র। (জেম্স্ প্রণীত Prag-matism—৫০ পৃঃ) যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার (experience) ভিতরে আসিয়া পড়ে, তাহারই সম্বন্ধে আমরা সত্য বা মিথ্যা বলিতে পারি, যাহা মানব মনের অভিজ্ঞতার বাহিরে, তৎসম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কিছু বলিতে যাওয়া

শুধু মূর্খতা নয়, মনের একটা কুসংস্কার, যাহার আক্রমণ হইতে মনকে উদ্ধার করিবার জন্য এ যুগে এই প্র্যাগম্যাটিক্ মত-বাদ দৃঢ়সঙ্কল্পে দণ্ডায়মান।

কোন বস্তু (Things or Realities) সত্য কি মিথ্যা, তাহা বলা সঙ্গত হয় না। বস্তুর আবার সত্য মিথ্যা কি ? তাহারা আছে। সেই বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, উপলব্ধি ইত্যাদি সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে। আর বস্তু সম্বন্ধে—তা সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হউক, আর আদর্শই হউক—আমাদের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। কাজেই সমস্ত কালের জন্য কোন বস্তু বা আদর্শ সম্বন্ধে একটা অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য সত্য ধারণা আমরা করিতে পারি না। একযুগের সত্য ধারণা অন্যযুগে মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। আর, আমাদের হিতাহিত সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র যে সমস্ত চিরন্তন সত্যের কথা আমরা এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি, তাহা ভ্রমাত্মক, অন্ততঃ নিরর্থক। সত্য আমাদের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতেই পারে না।* প্রকৃতপক্ষে আমরাই সত্যকে তৈয়ার করি (The making of truth)। আবশ্যক হইলে আবার আমরাই তাহাকে ভাঙ্গি এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিই। তোমার সত্য হয় ত আমার কাছে মিথ্যা, মধ্যযুগের সত্য বর্ত্তমান যুগে মিথ্যা, জার্ম্মাণীর সত্য হয় ত ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে মিথ্যা। তবেই, মানুষ নিজেই যখন তাহার সত্যের স্রষ্টা, তখন এই সত্যসৃষ্টি-ব্যাপারে ত তাহার একটা আদর্শ থাকা দরকার ?—নিশ্চয়।

প্র্যাগম্যাটিক্ মতবাদীরা এ বিষয়ে খুব সাহসী ও স্পষ্টভাষী। তাঁহারা বলেন, যাহা জীবনে (ব্যক্তির ও সমাজের) কার্য্যকারী ও হিতকারী তাহাই সত্য। কোন কিছুর হিতকারিতা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে প্রমাণ দিতে পারিলেই তাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই প্র্যাগম্যাটিকেরা কার্য্যকারী ও হিতকারী সত্যবাদী।

ইউরোপের দার্শনিকগণ এই মতবাদ সম্বন্ধে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল সমর্থনকারী, অন্য দল প্রতিবাদকারী। বার্গসোঁ ও তাঁহার শিষ্য

---

* The Meaning of Truth—pp. 217-220. W. James.

উইলবোয়া (Wilbois) ইহার সমর্থনকারী। অয়কেন ইহার প্রতিবাদকারী। শুধু অয়কেন কেন, ব্রাডলি, রয়েস, টেলর, ম্যাক্‌ট্যাগার্ট, ল্যাড্ প্রভৃতিও ইহার প্রতিবাদকারী। অবশ্য ইহার সমর্থনকারী দলের সংখ্যাও কম নয়। যাহা হউক অয়কেন এই মতের প্রতিবাদকারী হইলেও এই মত সম্বন্ধে অয়কেনের একটু বিশেষত্ব আছে। অয়কেন বলেন যে, আমাদের স্বভাবের অধীনতা হইতে আত্মার স্বাধীনতায় উঠিতে হইবে। এবং ইহা বুদ্ধি দ্বারা হইবে না; বলপূর্ব্বক একটা নৈতিক সংগ্রাম দ্বারা সিদ্ধ হইবে। স্বভাবের শৃঙ্খলকে জোর করিয়া ছিন্ন করিতে হইবে। কাজেই অয়কেন-দর্শনের নাম একটিভিজম্ (Activism)। যাহা কিছু এই অধ্যাত্মিক জীবনে পৌঁছিতে, স্বভাবের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করিতে সাহায্য করিবে তাহাই সত্য, কেননা তাহাই হিতকারী ও কার্য্যকারী। আর অয়কেন ইহাও বলেন য আধ্যাত্মিক জীবন একটা স্থির ভূমি নয় যে, সেখানে শুধু চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে। সেখানে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করিয়া উন্নত হইতে হইবে, আরও উন্নত সোপানে উঠিতে হইবে। কাজেই সত্যের সহিত আমাদের সম্পর্ক অনেকটা অনিশ্চিত ও উন্নতিমুখী। একদিনে সমগ্র সত্যকে আমরা হঠাৎ গ্রাস করিয়া বসিতে পারি না, কেননা সত্য উন্নতিশীল এবং নিয়তই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছেনা। সত্য একটা নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র বাহিরের বস্তু নয় যে তাহাকে গিয়া অধিকার করিতে হইবে। স্বভাব (Nature) হইতে আত্মার (Spirit) রাজ্যে উঠিবার পথে যাহা সহায়তা করে তাহাই সত্য, যাহা করে না, তাহাই মিথ্যা। কাজেই জীবনের পথে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সত্য তৈয়ার করিয়া চলিয়াছি। অয়কেনের এই সমস্ত যুক্তির সহিত উইলিয়ম জেম্‌সের বহু সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাই। তদ্ব্যতীত সত্য সম্বন্ধে জেম্‌স্ যে সমস্ত লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন (The Meaning of Truth, ৬১—৭৮ পৃঃ), তাহার সহিত অয়কেনের সম্পূর্ণই সহানুভূতি আছে।

কিন্তু তথাপি অয়কেন, জেম্‌সের এই প্র্যাগম্যাটিক মতবাদকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। একজন প্র্যাগম্যাটিক্ কি করিয়া একটা সত্য আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া, নিজে চিন্তা করিবার একটা দায়িত্ব বোধ

করিবেন, রয়েস্ তাহা ভাবিয়া পান না। ব্রাডলি বলেন যে, যাঁহারা যে কোন একটা খামখেয়ালী মতকে সত্য বলিয়া যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহাদের ঠেকায় কে? টেলর আবার বলেন যে, প্র্যাগম্যাটিকগণ যাহা খুসী তাহাই বিশ্বাস করিয়া পরে বলিলেই হইল যে ইহাই সত্য।

অয়কেন ঠিক এই শ্রেণীর 'খেলো' যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্র্যাগ-ম্যাটিক মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন না, ইহা নিশ্চয়। অয়কেন বলেন যে, শুধু মানুষের উপকার বা হিত যাহাতে হয় তাহাই সত্য এমন কথা বলা বড় দুঃসাহসের কার্য্য। কেননা মানুষের কিসে হিত হয় তাহা অনেক সময়ে মানুষের নিজের বুদ্ধির উপর বা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। সত্যকে এইরূপে একটা উপকার লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইলে, হয় ত তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সত্য কখনই কোন কিছুর উপায় নয়, সে ভাবে সত্যকে গ্রহণও করা চলে না, সত্যই উদ্দেশ্য। উপায়স্বরূপ সত্যকে ব্যবহার করিলে, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন কৃশ, মলিন হইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। সত্য অন্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে না, জেম্স্ যেরূপ বলিতে চান। সত্য নিজেই নিজের প্রমাণ।

সামাজিক সাম্যবাদ (Socialism)

সোসিয়ালিজ্ম্ মতবাদ এ যুগের আর একটি লক্ষণ। যদিও 'রিফর-মেশনে' খৃষ্টানজগৎ ধর্ম্মে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তথাপি আর্থনীতিক স্বাধীনতা এখনও তাহারা পায় নাই, যাহার জন্য ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে স্বাধীনতা কোন বিশেষ উপকারেই আসিতেছে না। এখন জমি, মূলধন ও পরিশ্রম, অর্থ উপার্জ্জনের এই তিনটি উপায় বা বস্তুকে একটা সাম্যবাদমূলক সমাজের অধীনে আনিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলেই, এবং এইরূপে সকলের একসঙ্গে উপার্জ্জিত অর্থকে সমাজের সহায়তায় সকলের মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে বণ্টন করিয়া দিলেই আর্থনীতিক স্বাধীনতালাভ করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই সোসিয়ালিজ্ম্ মতবাদের উদ্ভব। নানা ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা এই মতবাদের উদ্ভবব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। সাধারণতঃ প্রচলিত ধর্ম্ম-

সমূহে মানুষের অনাস্থা ও অবিশ্বাস, এবং অর্থ উপায়ের জন্য নিজ শক্তি অপেক্ষা দলবদ্ধ যৌথ ব্যবসায়িগণের উপর অবশ্যম্ভাবী নির্ভরতা, মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণও সোসিয়ালিজম্‌কে জন্ম দিয়াছে।

এখন অয়কেন বলেন যে এই মতবাদ ত স্বভাবের রাজ্য হইতে মানুষকে আত্মার রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবার কোন আশা ভরসা দেয় না। এই মতবাদের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সফল হইলেও মানুষের বিশেষ কিছু লাভ নাই। আর সামাজিক ব্যবস্থার কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া দ্বারা, মানুষ প্রকৃতভাবে একটা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে, ইহা অয়কেন বিশ্বাসই করেন না। সাংসারিক কতকগুলি দুঃখ, ও তৎসঙ্গে কিছু সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা এই মতবাদের উদ্দেশ্য মাত্র। তাহা আর এমন বেশী কি? আর জীবনের এমন অনেক অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ও দারিদ্র আছে, যাহা কোনরূপ সামাজিক ব্যবস্থার কৌশল দ্বারা শুধু ভোগলালসা তৃপ্তির জন্য দূর করিয়া দিতে পারিলেও, তাহাতে বিশেষ কোন উপকার না হইয়া বরং জীবনকে হীন ও যন্ত্রবৎ করিয়া তোলা হয়। দুঃখ ও দারিদ্র না থাকিলে জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই যে ইংলণ্ডে সম্প্রতি সন্তানহীনা যুবতী স্ত্রীদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদের এই দুঃখ ও অপেক্ষাকৃত দারিদ্রহীন জীবন কি অবাধ ভোগবিলাস সত্ত্বেও, খুব একটা শ্লাঘার জিনিষ? অয়কেন তাহা মনে করেন না।

ব্যক্তিত্বই (Personality) সমাজ-জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল। কিন্তু এই সামাজিক সাম্যবাদ—মানুষের এই ব্যক্তিত্ব, তাহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য একেবারে পিষিয়া নষ্ট করিয়া দিবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক জীবন, যাহা এ যুগে সবচেয়ে বেশী দরকার, এই মতবাদ তাহার কোন একটা অভাবই অনুভব করে না। মানুষকে তাহার আত্মার জীবনের কথা না শুনাইয়া, কেবলমাত্র সামাজিক-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারা, তাহার কোন স্থায়ী মঙ্গলবিধান করা অয়কেন কল্পনাই করিতে পারেন না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)।

প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে অনাস্থা এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রাজ-

শক্তির অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলে এবং অনেকটা সোসিয়ালিজমের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ারূপে এক উগ্ররকমের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও এযুগের একটি চিহ্নরূপে লক্ষ্য করা যায়। নিট্‌শেকে (Nietzsche) এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দলের মুখপাত্ররূপে গ্রহণ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে হয় ত সকলে একমত হইতে পারেন না। কিন্তু ইহা সত্য যে, বর্ত্তমান যুগে যদি কেহ ভয়ঙ্কর রকমে একটা দুর্দ্দম ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের মহিমা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিট্‌জে। নিট্‌জের অসামান্য প্রতিভা, কবিজনোচিত দৃষ্টি, ভবিষ্যদ্বক্তার প্রেরণা ও উদ্যম, এ সমস্তই মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে 'ব্যক্ত' করিয়া, মানুষকে তাহার পূর্ণ, পরিণত, প্রখর ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই নিয়োজিত হইয়াছিল। নিট্‌জের অতিমানুষ (Superman) নিশ্চয়ই খুব প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী মানুষ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অয়কেনের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবিষ্ট যে মানুষ (Spiritual man), তাহার সহিত নিট্‌জের অতিমানুষের একটা তুলনামূলক বিচার সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় হইলেও এ প্রবন্ধে তাহা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

কিন্তু একথা সত্য যে অয়কেন নিট্‌জে-নীতি ও প্রণালীর বিষম বিরোধী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থে অয়কেন বুঝেন, আত্মার রাজ্যে না পৌঁছিয়া, স্বভাবের রাজ্যের মধ্যেই বাস করিয়া, প্রবৃত্তির হাতের মাত্র একটা ক্রীড়নক হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নামই এ যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তা ছাড়া বেঞ্জামিন কিডের সহিত অয়কেনেরও বিশ্বাস যে, এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সামাজিক জীবনের একটা অস্বাস্থ্য ও রোগের চিহ্ন মাত্র। ইহা সমাজ-ধ্বংসকারী, গঠনকারী নহে। ইহার দমন সমাজের হিতের জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অয়কেন বলেন, এই সমস্ত প্রচলিত মতবাদ যে সম্পূর্ণই ভ্রান্ত আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহা নহে। আংশিক সত্য ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। কিন্তু পূর্ণ সত্যের আদর্শ ইহারা কেহই ধরিতে পারে নাই। সে আদর্শ মানুষকে স্বভাবের (Nature) হাত ও আধিপত্য হইতে উদ্ধার করিয়া আত্মার (Spirit) স্বাধীনতায় উঠাইয়া দেওয়া। স্বভাবের বিরুদ্ধে একটা প্রবল নৈতিক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করিয়া তবে মানুষ আত্মার জীবন

লাভ করিতে পারে কিন্তু প্রচলিত কোন মতবাদই সেরূপ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়াই অয়কেন তাহাদিগকে 'নেদং যদিদমুপাসতে' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অয়কেনের নিজের মতবাদ সম্বন্ধে আগামী বারে আলোচনা করিব।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

পর বৎসর এপ্রিল মাসে স্বামিজী লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সেণ্টজর্জেস্ রোডের যে বাড়ীতে তিনি তাঁহার সদাশয় বন্ধু মঃ ই, টি, ষ্টার্ডির সহিত বাস করিতেছিলেন তথায়, ও পুনরায়, গ্রীষ্মাবকাশের পর ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের সন্নিকটে এক বৃহৎ ক্লাস্-অধিবেশন-গৃহে ক্রমাগত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁহার বন্ধু মিষ্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার ও মিস্ এইচ, এফ, মুলারের সহিত, ফ্রান্স, জর্ম্মনী ও সুইজর্লণ্ডে ভ্রমণ করিলেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে রোম হইয়া ভারত যাত্রা করিলেন, এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী তারিখে সিংহলান্তর্গত কলম্বোয় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির অধিকাংশ পরে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে সমগ্র জগদ্বাসী, তাঁহার জগৎকে কি দিবার ছিল এবং এবং কিরূপে তিনি উহা সকলের বোধগম্য হয়, এমন ভাবে ব্যাখা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে পারেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনরূপ হিন্দুগণের যে বিশ্বাস, তিনি আমাদের নিকট তাহারই প্রচারকরূপে আসিয়াছিলেন,

এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সত্য কিনা, তাহা তিনি আমাদিগের সকলকে নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তখনই বা কি, আর পরেই বা কি, আমি তাঁহাকে কখনও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট কোন বিশেষ আকারপ্রাপ্ত ধর্ম্মের পক্ষসমর্থন করিতে শুনি নাই। তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলির উদাহারণস্বরূপে তিনি অসঙ্কোচে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির (Sects)—উহাদিগকে সম্প্রদায় না বলিয়া ধর্ম্মমত (Churches) বলিলেই ভাল হয়—উল্লেখ করিতেন বটে, কিন্তু ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীতে যে দর্শন সকল ধর্ম্মমতেরই ভিত্তিস্থানীয়, তদ্ভিন্ন তিনি অপর কিছুই কখনও প্রচার করেন নাই। বেদ, উপনিষদ, ও ভগবদ্গীতা ব্যতীত তিনি অপর কোন গ্রন্থ হইতে কোন কিছু উদ্ধৃত করিতেন না। সাধারণসমক্ষে তিনি কদাপি তাঁহার গুরুদেবের উল্লেখ করেন নাই, অথবা হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানসমূহের অংশ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মতামতও প্রকাশ করেন নাই।

তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে সাদরে নিজ অঙ্গভুক্ত করিয়া লইবার জন্য, এবং সমগ্র জগৎ একসূত্রে গ্রথিত হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ স্থানবিশেষে আবদ্ধ পৌরাণিক আখ্যানসমূহের যে ধ্বংস, তাহার পরেও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, পাশ্চাত্য ধর্ম্মভাবকে ভারতীয় চিন্তার সাহায্য লইতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মমতকে শুধু এমন এক আকার প্রদান করিতে হইবে, যে উহা যেন সত্যকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া যাঁহারা উক্ত পথাবলম্বী তাঁহাদিগকে স্ববশে রাখিতে সমর্থ হয়। তাঁহার এক বক্তৃতায় তিনি আবেগভরে বলিতেছেন, "বিচারমূলক ধর্ম্মের উপরেই ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করিতেছে।" আবার তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "জড়বাদী ঠিকই বলিতেছেন। একটী বই বস্তু নাই। শুধু, তিনি সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে জড়নামে অভিহিত করিতেছেন, আর আমি উহাকেই ঈশ্বর বলিতেছি।" আর একস্থলে তিনি বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মভাবের পুষ্টি ও উহার বিভিন্ন আকারগুলির মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ, এই বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "প্রথমে লক্ষ্য বস্তু বহু দূরে, জড় প্রকৃতির

বহির্দ্দেশে এবং উহা হইতে বহু অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। লক্ষ্য বস্তুকে ক্রমশঃ নিকটে আনিতে হয়, কিন্তু উহাকে হীন বা নিকৃষ্ট করিয়া নহে; নিকটতর হইতে হইতে স্বর্গস্থ ঈশ্বর জড়প্রকৃতির মধ্যগত ঈশ্বররূপে পরিণত হন; জড়প্রকৃতিমধ্যগত ঈশ্বর আবার প্রকৃতিরূপী ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ান; ক্রমে এই দেহমন্দিরাধিষ্ঠাতা ঈশ্বর হন; তার পর এই দেহমন্দিরই তিনি, এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়; এবং সর্ব্বশেষে মানবাত্মাই তিনি, এইরূপ হইয়া যায়। এইরূপে জ্ঞানের চরমসীমা উপস্থিত হয়। যাহাকে ঋষিরা এই সকল স্থানে অন্বেষণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি আমাদেরই হৃদয়ে। তত্ত্বমসি—তুমিই সেই, হে মানব, তুমিই সেই।"

তিনি নিজে বরাবর তাঁহার মায়া সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলিকেই এই কালে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশস্থল বলিয়া মনে করিতেন। এইগুলি মনোযোগসহকারে পাঠ করিলেই তবে বুঝিতে পারা যায়, উক্ত ভাবসমূহকে আধুনিক ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি কি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ অধ্যায়গুলির আদ্যোপান্ত আমাদের ইহাই মনে হয় যে, একটী স্পষ্টরূপে অনুভূত ভাবকে তাহার প্রকাশের অনুপযোগী এক ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য একটী প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন, "মায়া শব্দটী ভুল করিয়া মিথ্যাজ্ঞান অর্থে বুঝা হয়। প্রথম প্রথম, উহাতে ইন্দ্রজালের মত একটা কিছু বুঝাইত, যেমন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—"ইন্দ্র মায়ায় নানারূপ ধারণ করিলেন।" কিন্তু এই অর্থ লোপ পায়, এবং শব্দটী এক এক করিয়া বহু অর্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কিরূপে এই বিভিন্ন অর্থসমূহের মধ্য হইতে একটী অর্থ চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, তাহার একটী নিদর্শন নিম্নলিখিত বাক্যে পাওয়া যায়—

"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা অসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি।"—

অর্থাৎ "আমরা বৃথাবাক্যালাপ করি বলিয়া, ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি বলিয়া, এবং বাসনারই অনুবর্ত্তন করি বলিয়া, সত্যবস্তুকে যেন একটী কুয়াশার দ্বারা আচ্ছাদিত করি।" অবশেষে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকেই শব্দটী উহার শেষ অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, দেখিতে পাই—

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

—"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়াই জানিবে, আর যিনি মায়াধীশ তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।"

স্বামিজী বলিতেছেন, "বেদান্তের মায়া শব্দদ্বারা উহার শেষ বিকাশপ্রাপ্ত অর্থে, ঘটনাসমূহের বর্ণনামাত্র বুঝায়—আমরা যাহা আছি, এবং যাহা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে দেখিতেছি, তাহাই বুঝায়।"

কিন্তু এই কথাগুলি যে সংজ্ঞানির্দ্দেশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা যিনিই ঐ মায়া সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলি আদ্যোপান্ত নিজে পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তথায় ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে মায়া শব্দে জগৎকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া যেরূপ জানা যায়, শুধু তাহাই লক্ষ্য করা হয় নাই, কিন্তু ঐ জ্ঞান যে কুটিলপথগামী, ভ্রমপূর্ণ ও স্ববিরোধী তাহাও বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বামিজী বলিতেছেন, "এই জগৎ যে 'ধোঁকার টাটী', ইহাতে যে সুখের লেশমাত্র নাই, কেবল পরিশ্রমই সার, আমরা যে ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, অথচ জানি না একথাও বলিতে পারি না—ইহা মতবাদ নহে, ঘটনাসমূহের উল্লেখ মাত্র। স্বপ্নের মধ্যে অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় সঞ্চরণ করা, আমাদের সারা জীবন এক কুহেলিকার মধ্যে যাপন করা,—ইহাই আমাদের প্রত্যেকের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। সমগ্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই এই দশা। ইহারই নাম জগৎ।" তাঁহার ব্যাখ্যার অন্যান্য অংশের ন্যায় এস্থলেও আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় শব্দবিশেষকে ঠিক ঠিক ভাবে ইংরাজীতে অনুবাদ করা যায় না; এবং উহা বোধগম্য করিবার একমাত্র উপায় এই যে, এখানে সেখানে এক আধটী বাক্যের উপর সমস্ত মনোযোগ না দিয়া বরং বক্তা যে ভাবটী বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছেন তাহা ধরিতে চেষ্টা করা। সুতরাং মায়া শব্দে সেই চকিতের ন্যায় প্রকাশমান, এই আছে, এই নাই, অর্দ্ধ সত্য অর্দ্ধ মিথ্যা, জটিল কোন কিছুকে বুঝায়, যাহাতে বিশ্রাম নাই, তৃপ্তি নাই, কোন চরম নিশ্চয়তা নাই, এবং যাহা আমরা ইন্দ্রিয়ের ও তদাশ্রয়ী মনের সাহায্যে জানিতে পারি। অথচ,—"আর যিনি এই সকলের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিও।"— "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"।

এই দুইটী ভাবকে পাশাপাশি বসাইলেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বকে পাশ্চাত্যদেশে কি ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাই। আর সব উপদেশ ও ভাব এই দুইটীরই অনুবর্ত্তী মাত্র। ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের ব্যাপার মাত্র। "ক্রমাগত—সত্তা ও পরিণাম (Being and Becoming), থাকা ও হওয়া, এই দুইয়ের ব্যাপার মাত্র।" কিন্তু এই ক্রমবিকাশের মূলে ঐ দুই মুখ্য ঘটনা থাকা চাই, এবং ভারকেন্দ্রটী যেন একটী হইতে অপরটীতে—মায়া হইতে আত্মায়—ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয়। মায়াতে তন্ময় হইয়া থাকার নাম প্রাচ্য মতে 'বন্ধন'। ঐ বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলার নামই 'মুক্তি'; এমন কি উহাকে 'নির্ব্বাণ' পর্য্যন্ত বলা হয়। যিনি ঐ বন্ধন ভাঙ্গিতে চাহেন তাঁহাকে ভোগান্বেষী হইলে চলিবে না; তাঁহাকে ত্যাগমার্গে বিচরণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে স্বামিজী, যাহা সকল ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, শুধু তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র;—তিনি নিজেই সে কথা বলিলেন। কারণ, ভারতীয়, এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্মই সুখান্বেষণ করিতে করিতে কোন না কোন স্থানে "আর নয়" বলিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। সকল ধর্ম্মই সংসারকে নাচঘরে পরিণত না করিয়া বরং সমরাঙ্গণরূপে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সকল ধর্ম্মই মানবকে জীবন অপেক্ষা বরং মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য বল দিয়াছেন। আমার মতে স্বামিজীর অন্যান্য আচার্য্যগণ হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য এইখানে যে, তিনি সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতাকে ত্যাগেরই কোন না কোন রূপান্তর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনার মুখে আমি শুধু 'ত্যাগ ত্যাগ' এই কথাই শুনিতে পাইয়াছি।" কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমার মনে হয় যে, 'জয় কর' এই কথাটীই তাঁহার প্রকৃতির অধিকতর অনুযায়ী ছিল; কারণ, তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ষ্টিফেনসনের কথা ধরিলে, তাঁহার বাষ্পীয় ইঞ্জিন অবিষ্কার ত্যাগের দ্বারাই, অর্থাৎ—বহুদিনব্যাপী ঐকান্তিক চেষ্টা, নির্জ্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কঠিন সমস্যাপূরণে তন্ময় হইয়া থাকা এবং দেহসুখ বর্জ্জন করিয়া ক্লেশকে বরণ করিয়া লওয়া—এই সকলের দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, প্রার্থনা বা চিন্তাসহায়ে রোগ

আরাম করিবার জন্য যতটা একাগ্রতার প্রয়োজন, ভৈষজ্যবিজ্ঞান আরোগ্য-সম্পাদন ব্যাপারটীর উপর মানবমনের ততটা একাগ্রতারই পরিচায়ক। তিনি আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করাইয়াছিলেন যে, অধ্যয়ন মাত্রেই কোন বিশেষ জ্ঞান লাভোদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তপস্যাবিশেষ। সর্ব্বোপরি, তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মভাবের বন্যাকে স্থায়িত্ব প্রদান করিবার শক্তি একমাত্র চরিত্রেই বর্ত্তমান। তাঁহার মতে অন্যায়ের প্রতিকার করাই গৃহীর কর্ত্তব্য, আর অপ্রতিকার সাধুর ধর্ম্ম। ইহার কারণ এই যে, সকলের পক্ষে বল লাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ। তিনি বলিয়াছেন, "যখন তুমি অসংখ্য দেবসেনা আনয়ন করিয়া সহজে জয়লাভও করিতে পারিবে, তখনই ক্ষমা করিও।" কিন্তু যতক্ষণ জয় সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ততক্ষণ তাঁহার মতে শুধু কাপুরুষ ব্যক্তিই এক গালে চড় খাইয়া অপর গালও ফিরাইয়া দিবে।

তাঁহার গুরুদেব এক বালকের গল্প করিতেন, যে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার শক্তি লাভ করিবার জন্য বার বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিয়াছিল; ঐ গল্পেও আমরা ঐ উপদেশ দেখিতে পাই। এক সাধু তাহাকে বলিলেন, "বাঃ, মাঝিকে এক পয়সা দিয়া লোকে যে কার্য্য সম্পন্ন করে, তুমি তাহাই করিবার জন্য বার বৎসর পরিশ্রম করিয়াছ!" বালকটী উত্তর দিতে পারিত যে, সে বার বৎসর সহিষ্ণুতার সহিত পরিশ্রম করিয়া যে চরিত্রদার্ঢ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ লাভ করিয়াছে, তাহা কোন মাঝি তাহার আরোহিগণকে দিতে পারিবে না। কিন্তু ইহা অতি সত্য যে, এই সকল পরম বিবেচক আচার্য্যের নিকট জগতের নৌবিদ্যারও সমুচিত মূল্য ও উপযুক্ত স্থান আছে। বহুবর্ষ পরে প্যারিসে এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে ভারতীয় চিন্তাসমূহের ক্রমপরিণতির সাধারণ ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নটী এই—"সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এককেই সৎ ও বহুকে অসৎ বলিয়াছেন, আবার বুদ্ধ কি বহুকেই সৎ ও তদধিষ্ঠাতা অহংকে অসৎ বলেন নাই?" স্বামিজী উত্তর দিলেন, "হাঁ। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি উহাতে শুধু এইটুকু যোগ করিয়াছি যে, বহু ও এক উভয়ে, একই মনের দ্বারা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধ সেই একই সত্য।"

অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকায় এবং

অদ্ভুত গাম্ভীর্য্যময় এক প্রাচীন সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন বলিয়া, তিনি আমাদের নিকট সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিক জীবনেরই মাহাত্ম্য-প্রচারক ঋষিরূপে, বহির্জ্জগৎ অন্তর্জ্জগতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে —এই মত-প্রচারক ঋষিরূপে প্রতিভাত হইতেন। একবার তিনি জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "মনে রাখিও, 'আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে, প্রকৃতিই আত্মার জন্য', —এই বাণীই ভারত ঘোষণা করিতেছে।" তিনি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং যেদিক হইতে উহা করিতেন, তাহারা যুক্তিবিচার গুণে উপভোগ্য হইলেও উহাদের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ এই গুরুগম্ভীর ধ্বনিটীই, এই সুগভীর মূল সুরটীই ত শ্রুতিগোচর হইত। যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভেদ এইরূপ বোধ হইবে,—একটী যেন প্রত্যুষে বহুদূরে কোন নদীতীর হইতে আগত বংশীধ্বনির ন্যায়; উহা মিষ্ট-জগতের বহু সুমধুর গীতের মধ্যে অন্যতম; অপরটী, সেই স্বরলহরীই, শ্রোতা যখন ক্রমশঃ নিকটতর হইতে হইতে অবশেষে উহাতে তন্ময় হইয়া গিয়া নিজেই গায়ক হইয়া যান, তখন যেরূপ হয়— সেইরূপ। আর উহার সঙ্গে সঙ্গেই ত্যাগের মাহাত্ম্য জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠে। এমন নহে যে, ঐ শব্দটী তাঁহার উপদেশসমূহে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার প্রযুক্ত হয়; কিন্তু সেই মুক্ত, অপরিসীম, অপ্রতিহতপ্রভাব জীবনের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। এ অবস্থায় লোককে মৌনব্রতী কপর্দ্দকবিহীন সাধুর জীবন সম্যক্ যাপন করিবার অধিকার লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার, এবং অসহ্য হইলেও, নিজ মনকে আত্মনিবেদনরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ফেলার প্রলোভনকে দমন করিয়া রাখিতে হয়।

একটী সময় উপস্থিত হইল যখন এই আহ্বান অতি গম্ভীর নির্ঘোষে উচ্চারিত হইল। একদিন প্রশ্নোত্তর-ক্লাসে কথায় কথায় কিছু বাদানুবাদ হইল। সহসা স্বামিজী, তিনি যাহাকে 'বজ্রপাতের ন্যায় লোককে চমৎকৃত করা' বলিতেন, সেইরূপ এক সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আজ জগতে কিসের অভাব জান? জগৎ চায়, এমন বিশজন নরনারী, যাহারা সদর্পে ঐ রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, 'আমাদের ঈশ্বর ভিন্ন আপনার বলিতে আর কিছুই নাই।' কে কে যাইতে প্রস্তুত?"

বলিতে বলিতে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, এবং তদবস্থায় শ্রোতৃবর্গের দিকে একে একে চাহিয়া দেখিতেছেন, যেন তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সহিত যোগদান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। বলিলেন, "কিসের ভয় ?" তারপর বজ্রগম্ভীর নাদে অচল অটল বিশ্বাসের সহিত যে কথাগুলি বলিলেন তাহা এখনও আমার কাণে বাজিতেছে,—"ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অন্য কিছুতে আর কি প্রয়োজন ? আর যদি ইহা সত্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের জীবনেই বা ফল কি ?"

তিনি তাঁহার জনৈক ছাত্রকে এই সময়ে লিখিত একপত্রে বলিতেছেন, "জগতে চরিত্রবলেরই প্রয়োজন। জগৎ এমন সব লোক চাহিতেছে যাহাদের জীবন জ্বলন্ত, নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাহুতিস্বরূপ। ঐ প্রেমের শক্তিতে প্রতি কথাটি বজ্রের ন্যায় কার্য্য করিবে। জাগো, জাগো মহাপ্রাণগণ ! জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তোমাদের ঘুমের কি অবসর আছে ?"

চরিত্রই যে সত্যকে অপরের উপর প্রভাবশালী করে; কোন সাহায্যের অন্তরালে যে প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই যে উহাকে সফলতা প্রদান করে;—এবং কোন উক্তির পিছনে যে পরিমাণে চিত্তৈকাগ্রতা থাকে তদনুসারেই যে উহার বলবত্তা ও শক্তিমত্তা নির্ণীত হয়;—ভারতবাসিগণের এই ধারণা তখন আমার নিকট কত নূতন ঠেকিয়াছিল, তাহা আমার মনে আছে। স্বামিজী বলিলেন, এই জন্য বাইবেলের 'কুমুদ ফুলগুলির কথা ভাব দেখি, তাহারা কেমন স্বতঃই বিকাশ প্রাপ্ত হয়'—এই কথাগুলির সৌন্দর্য্যই যে শুধু আমাদের মনোহরণ করে তাহা নহে, কিন্তু উহাতে যে গভীর ত্যাগের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই আমাদের মুগ্ধ করে।

ইহা কি সত্য ? আমি অনুভব করিলাম যে, পরীক্ষা দ্বারা প্রশ্নটীর সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে ; এবং কিছুকাল পরে এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, ইহা সত্যই। এক জন লোক—যাঁহার ভাষার অন্তরালে ভাব রহিয়াছে, তাঁহার একটী মাত্র সাদাসিধা কথাতেই তৎক্ষণাৎ কাজ হইয়া গেল, কিন্তু ঐ কথাটীই, যিনি চিন্তার ধার ধারেন না, এমন এক লোকের মুখে উচ্চারিত হইলে কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে না। খলিফ আলি (Caliph Ali) যে

একটী কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া পাঠ করা যায়, তদপেক্ষা আমি এতদ্বিষয়ক প্রকৃষ্টতর উদাহরণ জানি না। অনেকেই এই ইসলামধর্ম্মী পুরুষসিংহের "সংসারে তুমি যে পদ লাভ করিবে তাহা তোমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে; অতএব তুমি উহার অন্বেষণ না করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাক"—এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছেন এবং শ্রবণ করিয়া কেহই নিশ্চিত মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা কথা-গুলিকে উহাদের বক্তার জীবনের সহিত গ্রথিত করি—যাঁহাকে চারি বার তাঁহার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য খলিফার পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া অপরকে ঐ পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল—যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা জানি কিরূপে ঐ ব্যক্তির সমগ্র জীবনের স্পন্দন, ঐ কথা কয়টীর মধ্যে অনুভূত হইতেছে, ততদিন আমরা ঐ সামান্য বাক্যটীর মধ্যে যে অসাধারণ শক্তি রহিয়াছে তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না।

আমি আরও দেখিয়াছিলাম যে, যে কথা শুধু শ্রোতার শ্রবণগোচর না করাইয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার মনের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে উহার বিপরীত প্রক্রিয়াটী অপেক্ষা অধিক সাড়াই পাওয়া গিয়া থাকে। আর এই সকল মনস্তত্ত্ববিষয়ক আবিষ্ক্রিয়া করিতে করিতে আমি ক্রমশঃ এটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, যদিও বিচারবলে চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে রেখা টানিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া ফেলা অসম্ভব, একথা বহুপূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় যে, এই দুইটীর মধ্যে অদ্বিতীয় সত্তার যে দিকটাকে আমরা জড় বলি সেইটাই বরং, যাহাকে আমরা চৈতন্য নামে অভিহিত করি, তাহার ফলস্বরূপ, কিন্তু উহার বিপরীত পক্ষটী সত্য নহে। ইচ্ছাশক্তি নয়—শরীরকেই জীবত্বের একটী গৌণফল মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা হইতে আবার দেহ অপেক্ষা উচ্চতর এক চৈতন্যের ধারণা আসিল—যাহা জড়ের অধীন না হইয়া বরং জড়কে পরিচালিত করিতেছে; সুতরাং শরীর যেমন জীর্ণত্বক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ উহাও যে জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ এই শরীরটাকেই ত্যাগ করিতে পারে, এরূপ কল্পনা কষ্টসাধ্য নহে। অবশেষে আমি দেখিতে পাইলাম যে, আমার নিজের মনই স্বামিজীর—

"শরীর আসে ও যায়" এই অমরত্বজ্ঞাপক মহান্ উক্তিটীর প্রতিধ্বনি করিতেছে। কিন্তু এই চিন্তার পরিণতি ধীরে ধীরে সংসাধিত হইয়াছিল, এবং উহার পূর্ণতালাভ ঘটিতে অনেক মাস লাগিয়াছিল।

ইতিমধ্যে, এই সময়ের প্রতি পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া আমি ইহাই অনুভব করি যে, স্বামিজীর ক্লাসগুলিতে আমরা তর্কযুক্তিমূলক ব্যাখ্যা অপেক্ষা নূতন ও উচ্চ ভাবময় জীবনই সমধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাম। ভারতে উহা 'দর্শন' বা 'প্রত্যক্ষানুভূতি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভগবান্‌কে গোপালভাবে উপাসনা করার বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা স্বামিজীকে, "আমরা তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাই নাকি?"—এইরূপ বিস্ময়োক্তি করিতে শুনিলাম। "প্রেম চিরকালই আনন্দের বিকাশমাত্র," সুতরাং কোন যন্ত্রণা বা অনুশোচনা, স্বার্থপরতা ও দেহসুখসর্ব্বস্বতারই নিদর্শনমাত্র—আমরা এই উপদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলাম। আমাদের ও অপরের মধ্যে অণুমাত্র ভেদদৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তিও 'ঘৃণা' পদবাচ্য এবং উহার বিপরীতই 'প্রেম'—এই কঠোর আদেশবাণী আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। যাঁহারা শৈশবের ধর্ম্মমতে আর বিশ্বাসী নহেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এইরূপ অনুভব করিয়াছেন যে, অন্ততঃ পরোপকার জিনিসটী একটী শ্রেষ্ঠ আদর্শ, আর, আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য জীবসেবার সম্ভাবনাটা ত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মতে বিশ্বাসী হওয়ায়, "ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠদান, তাহার একধাপ নীচে বিদ্যাদান, আর সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ও জড়বস্তুমূলক সাহায্য সর্ব্বনিম্নস্থানীয়"—এই ভব্য প্রাচ্যদেশীয় উপদেশটা শুনিয়া যে, আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা আজি এই দশবৎসর পরে আমার নিকট কৌতুককর বলিয়া বোধ হইতেছে। রোগদারিদ্র্যপীড়িতগণের প্রতি আমাদের উচ্ছ্বসিত দয়ারাশির এইভাবে স্থান নির্দ্দেশ করা! ইহা বুঝিতে আমার বহুবৎসর লাগিয়াছে, কিন্তু আমি এখন জানি যে, উচ্চতর দানটীর পিছনে পিছনে নিম্নতর দানটী আপনা হইতে না আসিয়া থাকিতে পারে না।

ঐরূপে, আমরা পাশ্চাত্যদেশে, বিশুদ্ধ বায়ু চাই এবং আশপাশের লোকালয়সমূহ স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া চাই, বলিয়া যে উৎকট আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি — যেন উহারাই মহা সাধুত্বের লক্ষণ—তাহার বিরুদ্ধে আমরা

এই কঠোর শিক্ষা পাইলাম—'জগতের প্রতি উদাসীন হও।' সত্য কথা বলিতে গেলে, এ শিক্ষার রহস্য উদ্ভেদ করা আমাদের একেবারে সাধ্যাতীত বোধ হইল। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য হইলেও আপাততঃ অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইবে, ইহা জানিয়াও যখন তিনি সদর্পে বলিলেন যে, ঋষিরা "দৃশ্য উপভোগ করিবার জন্যই" পর্ব্বতশিখরে বাস করিতেন, এবং যখন তিনি শ্রোতৃবর্গকে পূজার ঘরে পুষ্পাদি রাখিতে ও ধূপধুনা দিতে এবং খাদ্য ও শরীর সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে উপদেশ দিলেন, তখন আমরা এই দুই বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ভাবকে কিরূপে একসূত্রে গ্রথিত করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি অস্মদ্দেশে প্রচলিত দৈহিক পারিপাট্যের মতটাই ভারতীয় আচারে প্রচার করিতেছিলেন। আর ইহা সত্য নহে কি যে, যতদিন না পাশ্চাত্যবাসী আমরা, আমাদের বড় বড় নগরগুলির হীনদশাপন্ন দরিদ্র পল্লীসমূহ (Slums) পরিষ্কার করিতে সমর্থ হই, ততদিন আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য অত্যাগ্রহ, অধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণীসমূহের আত্ম-পূজারই অনুরূপ?

যে সকল মহাপুরুষ বিশিষ্ট সফলতা ও হিসাবী বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহাদের সাংসারিক কার্য্যসকলের বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আমরা যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম, তাহারও ঐরূপ দুর্গতি ঘটিল। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঐহিক বিষয়সকলে শুধু যে উদাসীন থাকেন তাহাই নহে, তিনি উহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এবং আদৌ সহিতে পারেন না। স্বামিজী কদাপি এই উপদেশটীকে খর্ব্ব করিতেন না। ইহা ঘোষণাকালে তিনি কখনও ইতস্ততঃ করিতেন না। শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাংসারিকতা আদৌ সহিতে পারেন না।

আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এইগুলি সাধুত্বের আদর্শ-স্বরূপ। আমরা অধ্যায়ের পর অধ্যায় এক মহতী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলাম যদ্দ্বারা আমরা জগতের উদ্দেশ্যগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব। যে সকল বিষয় সামাজিক জীবন ও গৃহস্থালীধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং যাহাদিগকে আত্মোন্নতির হাতেখড়ি ("কিণ্ডারগার্টেন") স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সে সকল সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হয় নাই। একটী দেশ যে, যাহা অপর একদেশের গৌরবের স্থল, এরূপ শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব-

জ্ঞানের আদর্শসমূহের আদর করিতে শিখিয়াই সর্ব্বাপেক্ষ অধিক উন্নতি করিতে পারে, এ ধারণাটীকে তিনি আদৌ অবিশ্বাস্য বলেন নাই। সেই সঙ্গে আবার ভারতবর্ষীয় আদর্শসমূহের মূলমন্ত্রস্বরূপ এই কথাগুলি শুনিতে পাইলাম —"ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাংসারিকতা সহিতে পারেন না।" ইহার প্রতিবাদস্বরূপে আমরা সুপরিচালিত, সুসংহত, পরহিতরত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির উল্লেখ করিলাম এবং প্রাচ্যের জনকয়েক জীর্ণবস্ত্রপরিহিত, ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত ভিক্ষুকের তুলনায় আমাদের ভূরিভূরি মঠাধ্যক্ষ, যাজক, এবং মহাধার্ম্মিকা মঠধারিণীগণের উৎকর্ষ দেখাইলাম। কিন্তু আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, পাশ্চাত্যেও যখনই ধর্ম্মবহ্নি সহসা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখনই উহা প্রাচ্য আকার ধারণ করিয়াছে; কারণ, যাঁহারা মীরাবাই ও চৈতন্য, তুকারাম ও রামানুজের জন্মভূমি ভারতকে জানেন, তাঁহাদের পক্ষে আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসকেও গৈরিকমণ্ডিত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধ জাতকগুলির ইংরাজী অনুবাদের কোন একখণ্ডে, "যখন মানব সেই স্থানে উপনীত হয় যথায় সে স্বর্গকেও নরকবৎ ভয় করে"—এই কথাগুলির বারংবার উল্লেখ দেখা যায়। স্বামিজীর উপস্থিতি যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি-লাভে সহায়তা করিত তাহার পরিচয় কিরূপে এতদপেক্ষা স্পষ্টতরভাবে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমার অজ্ঞাত। যাঁহারা তাঁহাকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এমন কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যদ্দারা তাঁহারা, প্রাচ্যদেশীয়গণ কেন জন্মান্তরপরিগ্রহ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহেন তাহার অর্থ কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সকল মানসিক অবস্থার মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া অপর অবস্থাগুলিকে স্ববশে পরিচালিত করিত তাহার আভাসমাত্র ইতি-পূর্ব্বে এই কথাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে:—"যদি ইহাই সত্য হয়, তবে অন্য কিছুতে কিবা আসে যায়? আর যদি ইহা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেরই বা মূল্য কি?" কারণ, এই আচার্য্যের, তিনি স্বয়ং যে সকল সত্য শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন এবং নিজে যে সর্ব্বোচ্চ আশা পোষণ করিতেন, এই সকলগুলিকে একত্র করিবার এবং উহাদিগকে হীন উৎকোচস্বরূপে জ্ঞান

করিয়া, প্রয়োজন হইলে, অপরের কল্যাণের নিমিত্ত নির্ভীকভাবে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। বহুবৎসর পরে তিনি আমার কোন এক মন্তব্যের উত্তরে সক্রোধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এ বিষয়টী স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,—"যদি আমি কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তদ্দ্বারা কোন লোকের বাস্তবিক উপকার হয়, তাহা হইলে আমি এখনই উহা করিয়া অনন্ত নরকভোগ করিতে প্রস্তুত!" আবার তিনি আমাদিগের কাহাকেও কাহাকেও বারংবার যে বোধিসত্ত্বের গল্পটী বলিতেন—যেন উহা বর্ত্তমানযুগের বিশেষ উপযোগী—তাহাতেও এই সদিচ্ছাই প্রকাশ পাইত। এই বোধিসত্ত্ব যতদিন না জগতের শেষ ধূলিকণাটী পর্য্যন্ত মুক্তিপদবীতে আরূঢ় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিজে নির্ব্বাণগ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মুক্তির শেষ লক্ষণ তল্লাভের চেষ্টা হইতে বিরতি—ইহাই কি এতদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে? পরে আমি ভারতে প্রচলিত অনেকগুলি গল্পে কি এই বিষয়টীই লক্ষ্য করিয়াছি; দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামানুজের ব্রতভঙ্গ করিয়া পবিত্র মন্ত্র পারিয়াদিগের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া দেওয়া, বুদ্ধের কোন কিছু গোপন না রাখিয়া সমগ্র জীবন কর্ম্মে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া, শিশুপালের শীঘ্র শীঘ্র ভগবৎসকাশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে শত্রুভাবে বরণ করিয়া লওয়া; এবং সাধুগণের নিজ নিজ ইষ্টের সহিত দ্বন্দ্বের ভূরি ভূরি গল্প— এই সকলের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু স্বামিজী, সকল সময়েই যে নিজের কথা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতেন তাহা নহে। একদিন তাঁহার বক্তৃতান্তে আমরা কয়েকজন একসঙ্গে বসিয়া ছিলাম; তিনি নিকটে আসিয়া, যে বিষয়ের প্রসঙ্গ চলিতেছিল, তাহারই সম্বন্ধে বলিলেন, "আমার একটা কুসংস্কার আছে—অবশ্য ইহা আমার ব্যক্তিগত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে—যে, যিনি একসময়ে বুদ্ধরূপে আসিয়াছিলেন, তিনিই পরে খৃষ্টরূপে আসিয়াছেন।" তারপর ঐ বিষয়েরই আলোচনা-প্রসঙ্গে ক্রমশঃ তাঁহার গুরুদেবের কথা আসিয়া পড়িল। আমরা এই প্রথমবার ইঁহার এবং যিনি বিবাহের পর স্বামিকর্ত্তৃক বিস্মৃত হইয়াও সজলনয়নে তাঁহাকে আপন অভিলষিতমার্গে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, সেই বালিকার কথা শুনিতে পাইলাম। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার স্বর ক্রমশঃ মৃদু হইয়া

আসিল, অবশেষে স্বপ্নাবিষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। কিন্তু শেষে যেন স্বগতোক্তির মত, তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহকারে এই বলিয়া উক্ত আবেশের হস্ত হইতে আপনাকে জোর করিয়া মুক্ত করিলেন :—"এই সব ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, এবং আবার হইবে। যাও বৎসে, সুখে গমন কর, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে রোগমুক্ত করিয়াছে।" *

আর একদিন কথোপকথনপ্রসঙ্গে এতদপেক্ষাও সামান্য এক উপলক্ষ্য পাইয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার স্বদেশীয় নারীগণের কল্যাণ-কল্পে আমার কতকগুলি সঙ্কল্প আছে। আমার মনে হয়, উহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিতে, তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পার।" আমিও বুঝিলাম যে, আমি এক আহ্বান শুনিতে পাইলাম, যাহা আমার জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। এই সঙ্কল্পগুলি কি ছিল, তাহা আমি জানিতাম না, এবং ভাবী জীবনের যেরূপ চিত্র অঙ্কণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম তাহা পরিত্যাগ করা সেই সময়ের জন্য এত কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল, যে আমি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেও চাহিলাম না। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম যে, অন্যান্য জাতিরা জগৎকে যে চক্ষে দেখে তাহার সহিত আমার জগতের ধারণাটাকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইলে, আমাকে অনেক জিনিস শিখিতে হইবে। একবার আমি লণ্ডন-নগরীকে শোভাশালিনী করার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি এই তীব্র উত্তর দিয়াছিলেন, "আর তোমরা অন্য নগরগুলিকে শ্মশানপুরী করিয়াছ!" আমার নিকট লণ্ডনের রহস্যময়তা ও দুঃখপূর্ণতা অনেকদিন হইতে মানবজাতির সমস্যারই—সমগ্রজগৎ যাহা চাহিতেছে, তাহারই একটী ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বলিয়া বোধ হইত। "আর তোমরা তোমাদের এই নগরীটাকে সৌন্দর্য্যশালিনী করিবার জন্য অন্য নগরগুলিকে শ্মশানপুরী করিয়াছ!"—তিনি আর অধিক কিছু বলিলেন না, কিন্তু কথাগুলি অনেকদিন ধরিয়া আমার কাণে বাজিতে লাগিল। আমার চক্ষে আমাদের নগরী সৌন্দর্য্যশালিনী ছিল না। স্বামিজী আমার প্রশ্নটী ভুল বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ভুল বুঝা হইতেই আমি দেখিতে পাইলাম যে, বিষয়টীকে আর এক দিক দিয়া দেখা চলে। আচার্য্যদেব

* বাইবেল—সেণ্ট ম্যাথিউ, ৯ম অধ্যায়।

একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, "ইংরাজেরা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং দ্বীপেই বাস করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে।" আর আমার জীবনের এই অংশটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাঁহার এই উক্তি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ, আমার আদর্শগুলি এতাবৎকাল খুব বিশেষরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ভারতবাসীরা জগৎকে কি চক্ষে দেখে তৎসম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু জানিতে পারি নাই। আমার যে মহিলা-বন্ধুটী আমায় পরে ভারতে তাঁহার সহকারিণী হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে লণ্ডনে স্বামিজী ও আমি ঘণ্টা খানেকের জন্য তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে, স্বামিজীকে জানাইয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিতে সম্মত আছি। দেখিলাম, তিনি ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার কথা ধরিতে গেলে, আমি স্বদেশবাসিগণের উন্নতিকল্পে এই যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে, দুইশত বার জন্ম পরিগ্রহ করিব।" এই কথাগুলি এবং অপর কয়েকটী কথা যাহা তিনি আমার যাত্রা করিবার প্রাক্কালেই আমায় লিখিয়াছিলেন, আমার মানসপটে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে,—"তুমি ভারতের কল্যাণকল্পে কার্য্য কর বা নাই কর, তুমি বেদান্তমত পরিত্যাগ কর বা বেদান্তবাদী থাক, আমি তোমাকে আমরণ সাহায্য করিব। 'মরদকী বাত, হাতীকা দাঁত।' হাতীর দাঁত একবার বাহির হইলে আর ভিতরে প্রবেশ করে না। পুরুষের কথাও সেইরূপ।"

কিন্তু স্বামিজীর নিজ জন সম্বন্ধে এই সব উল্লেখ ব্যক্তিগত ব্যাপারমাত্র বলিয়া উহারা তাঁহার নিকট চিরকাল গৌণ স্থানই অধিকার করিত। তাঁহার ক্লাসগুলিতে এবং তাঁহার উপদেশাবলীতে, মানুষকে অজ্ঞানের হস্ত হইতে রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র কামনা বলিয়া মনে হইত। যাঁহারা তাঁহার কথা বা বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ প্রেম, এরূপ অনুকম্পা অন্য কোথাও দেখেন নাই। তাঁহার নিকট, তাঁহার সকল শিষ্যই শিষ্যমাত্র, সেখানে আর ভারতীয়, ইউরোপীয় ভেদ নাই। তথাপি তিনি স্বীয় প্রচারকার্য্যের ঐতিহাসিক অর্থবত্তা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। তাঁহার শেষবার

লণ্ডনে বক্তৃতার সময় [১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণে, "রয়েল সোসাইটী অব পেণ্টার্স ইন্ ওয়াটারকলার্স" নামক চিত্রশিল্পি-সঙ্ঘ-মন্দিরে] তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, ইতিহাসে একই রূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং রোমকরাজ্যে শান্তি বিরাজ করাতেই খৃষ্টধর্ম্মসংস্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল। দূরদৃষ্টির ফলস্বরূপ তাঁহার এই স্থির ধারণা ছিল যে, ভবিষ্যতে আবার একদল ভারতীয় প্রচারক পাশ্চাত্যে আগমন করিয়া, তিনি এমন উত্তমরূপে যে বীজ বপন করিয়া যাইতেছেন তাহার ফল উপভোগ করিবেন, এবং তাঁহারাও আবার তাঁহাদের ভাবী বংশধরগণের ফললাভের জন্য নূতন নূতন বীজ বপন করিয়া যাইবেন। খুব সম্ভবতঃ, তাঁহার চালচলনের যে বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্ত, গম্ভীরভাব আমাদিগকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা শুধু তাঁহার এই স্থির ধারণারই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

(ক্রমশঃ)

অযোধ্যা-ভ্রমণ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ)

পূজার বন্ধে অযোধ্যা বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম। যেদিন ইহা স্থির করিলাম, সেইদিনই রওনা হওয়া চাই; সুতরাং কাপড় চোপড় তাড়াতাড়ি বাক্সবন্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় গাড়ী করিয়া হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূজার ভিড়, হাওড়ার পুলের উপর দিয়া অসংখ্য গাড়ী চলিয়াছে, ষ্টেশনে লোকারণ্য, কষ্টে টিকিট কাটিয়া কোনও রকমে ট্রেণে একটু জায়গা করিয়া লইলাম। গাড়ীগুলি ভর্ত্তি হইয়া গেল, তবুও যাত্রীর বিরাম নাই। পিঠের উপর লাঠিতে বোচ্‌কা ঝুলাইয়া নাগ্‌রা জুতা পরিহিত হিন্দুস্থানীরা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দলে দলে আসিতে লাগিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া উদ্বিগ্নভাবে গাড়ীতে গাড়ীতে উঁকি মারিয়া স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া নীল আলো দোলাইল, তার পর, গর্জ্জন করিতে করিতে গাড়ী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল।

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে প্রকৃতির দৃশ্য অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। রেল-লাইনের উভয় পার্শ্বে ঘনবিন্যস্ত তরুলতা, তাহাদের মধ্য দিয়া লোকালয়ের দুই একটী আলোক দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কোথাও বা দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। এই সব দেখিতে দেখিতে, রাত্রি অধিক হইলে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সারা রাত্রি ধরিয়া গাড়ী ছুটিল। মোকামা ষ্টেশনে সকাল হইল। আমরা নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলাম, পৃথিবীর বক্ষে একটা নির্ম্মল শারদীয় প্রভাত ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশ, নবীন সূর্য্যালোক এবং শ্যামল শস্যক্ষেত্র, এই সকলে মিলিয়া একটী সুন্দর দৃশ্য সৃজন করিয়াছে। এবং কৃষকেরা এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের দৈনিক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

বাঁকীপুর, আরা, বক্সার প্রভৃতি ষ্টেশন পার হইয়া বেলা প্রায় দশটার সময় মোগলসরাইয়ে উপস্থিত হইলাম। এইখানে গাড়ী বদল করিতে হইবে। অযোধ্যার গাড়ী ছাড়িতে প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব ছিল। এই অবসরে স্নানাহার করিয়া লইবার জন্য আমরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালা অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

বেশীদূর যাইতে হইল না। ধর্ম্মশালার একটী কুঠরিতে জিনিসপত্র রাখিয়া আমরা স্নান করিয়া লইলাম। তারপর ভোজনাগারে গিয়া সাদাসিধা এবং পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন আহার তৃপ্তিসহকারে সমাধা করিলাম। যখন ষ্টেশনে ফিরিলাম তখন দেখিলাম গাড়ী প্রস্তুত, ছাড়িতে বেশী বিলম্ব নাই। ছুটাছুটি করিয়া সামনে যে গাড়ী পাইলাম তাহাতেই উঠিয়া পড়িলাম।

মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী অল্পদূর অগ্রসর হইলে কাশীর মনোমুগ্ধকর শোভা নয়নপথে আবিষ্কৃত হইল। ট্রেণ হইতে সেই শোভা প্রথম দেখিয়া কাহার হৃদয় না ভক্তি ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা উত্তরদিকে যেন পিতৃপাদাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছেন। সূর্য্যকিরণ মৃদু-পবনোত্থিত ক্ষুদ্রবীচিমালার উপর পড়িয়া ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। আর পড়িয়াছে গঙ্গার উচ্চতীরস্থ শ্রেণীপরম্পরায় সজ্জিত ধবলসৌধমালা এবং অসংখ্য স্বর্ণমণ্ডিত দেবমন্দিরের চূড়ার উপর। সে শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া রসনা নীরব হইয়া যায় এবং হৃদয় ভক্তিবিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

ধীরে ধীরে প্রাচীন ডাফ্‌রিণ ব্রিজ অতিক্রম করিয়া গাড়ী কাশীতে উপস্থিত হইল। কাশী নগরীর দুইটী ষ্টেশন। প্রথম ষ্টেশনটীর নাম কাশী—ঠিক গঙ্গার উপরেই। এই ষ্টেশনটী ছোট। দ্বিতীয় ষ্টেশনের নাম বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ; এই ষ্টেশনটী খুব বড়। সহর হইতে দূর হইলেও এই খানেই অধিকাংশ লোক নামিয়া থাকেন। এই দুইটী ষ্টেশনে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী যাত্রী নামিয়া গেলেন। তার পর গাড়ী অপেক্ষাকৃত লঘুভার হইয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল।

প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলাম। তাহার যেন আর শেষ নাই। অড়হর ক্ষেত্রের পাশে ছোট ছোট গ্রামগুলি দেখা যাইতেছিল। গ্রামবাসিগণ বৃক্ষচ্ছায়ায় খাটিয়া পাতিয়া বিশ্রাম করিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি কৌতূহলদৃষ্টিতে আমাদের গাড়ীগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। আমাদের প্রতিদিনকার কর্ম্মজগতের বাহিরে, দেশের কত লোক তাহাদের সুখ দুঃখের বিচিত্র সম্ভার লইয়া জীবনের পথে চলিয়াছে, তাহাদের বিষয় আমরা অতি অল্প সময়ই ভাবিয়া থাকি। ঐ যে সরল, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশীল এবং অল্পে সন্তুষ্ট লোকগুলি রহিয়াছে, উহারা আমাদের কত আপনার লোক, এ কথা যেন আমরা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করি। আর যেন মনে রাখি যে, যদি আমরা উহাদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অধিক সুখী করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন ধন্য।

গাড়ী বৈকালে অযোধ্যা পৌছিবে। দুই চারি ষ্টেশন পূর্ব্ব হইতেই পাণ্ডাদের লোকেরা শীকারের সন্ধানে গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। "বাবু আপনাদের নাম কি ?" "আপনাদের বাস কোথায় ?" "আপনাদের কোনও লোক এখানে আসিয়াছিলেন ?" এই সকল প্রশ্নের বিশদ উত্তর প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে। দুই চারি জনকে এই সকল পরিচয় প্রদান করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠে। তাহাদের ধৈর্য্য কিন্তু প্রশংসনীয়। তোমার কোনও আত্মীয় যদি কখনও এই স্থানে আসিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় তাঁহার নাম বাহির করিয়া দিবে। এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি, যে উহা করিবে, তাহারই ন্যায় সঙ্গত শীকার হইলে। অপর পাণ্ডাগুলি মাত্র লোলুপদৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাইতে পারে, এই পর্য্যন্ত।

যথা সময়ে গাড়ী অযোধ্যা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিগ্বিলম্বী হইয়াছেন। অপরাহ্নের মৃদুবায়ু আমাদের রৌদ্রতপ্ত ক্লান্ত শরীর শীতল করিতেছিল। ক্ষুদ্র ষ্টেশনটীতে আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া ট্রেণ তাহার অসমাপ্ত যাত্রার পথে চলিয়া গেল। আমরা ষ্টেশন হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়ী করিয়া সহর অভিমুখে চলিলাম।

এই কি সেই অযোধ্যা? যাহার ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় অমরকবির পুণ্যলেখনী ক্লান্তি বোধ করে নাই, আজ এই ঘনবিন্যস্ত গৃহাদির সমষ্টি, এই ধূলিমলিন নগরী, এই কি সেই অযোধ্যা? কোথায় গেল তাহার গগনস্পর্দ্ধী অট্টালিকা, কোথায় তাহার পরিখাবেষ্টিত প্রাচীর, কোথায় সেই তোরণালঙ্কৃত রাজপথ? কিছুই নাই, কালের করাল প্রবাহে সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। আছে শুধু সেই কবির বর্ণনা, আর আছে পুণ্যসলিলা ধীরবাহিনী সরযূ। সরযূর জল দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। বিশাল সলিলরাশি লইয়া স্রোতস্বিনী ধীর-মন্থর-গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। পরপারের বনরাজি-শোভিত তীরভূমি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। আজ আর সরযূ "নৌভির্বিগাহ্যমানা" নহে, আজ আর তাহার তীরে চক্রবাকের শোভা নাই। একদিন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র ইহারই সলিলে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। তাই বুঝি সরযূ এত বিষাদময়ী!

পাণ্ডাজীর বাড়ীতে পৌঁছিতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেদিন আর কিছু দেখা হইল না। পাণ্ডাজীর অবস্থা বেশ ভাল, এককালে বোধ হয় আরও ভাল ছিল। প্রশস্ত সোপানাবলী এবং সুন্দর ঠাকুরঘর দেখিতে পাইলাম, ঠাকুরঘরে সীতারামের বিগ্রহ রহিয়াছে, তথায় নিয়মিত পূজা আরতি হয়। বাটীর এক অংশে তিনি বাস করেন। অপর অংশে যাত্রীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা পছন্দমত একটি ঘরে জিনিস পত্র নামাইয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া সরযূতে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলাম। নদীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কচ্ছপ; তাহাদের জন্য বাতাসা, খৈয়ের লাড়ু প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ছুড়িয়া দিলে তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়া ফেলে। কিছুক্ষণ সরযূর সৈকতে বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম

কতলোক তর্পণ করিতেছেন। নদীতীরে স্বর্গদ্বারী ঘাট, লক্ষ্মণ ঘাট প্রভৃতি অনেকগুলি সুন্দর ঘাট রহিয়াছে। নদী হইতে বাসায় ফিরিবার সময় কয়েকটী দেবালয় দর্শন করিয়া ফিরিলাম।

অপরাহ্নে হনুমান্ গড় দর্শন করিতে গেলাম। এইটা এখানকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির। বানর-কুলজাত হইলেও সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তই এই তীর্থে সর্ব্বোচ্চ সন্মান পাইয়া থাকেন। মন্দিরটী উচ্চস্থানের উপর অবস্থিত। অনেকগুলি সোপান আরোহণ করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উঠিতে হয়। প্রাঙ্গণটী পাথরে বাঁধান। তাহার মধ্যস্থলে মন্দির, তন্মধ্যে হনুমান্জীর মূর্ত্তি। তাহারই সংলগ্ন নাটমন্দিরে একটী পণ্ডিত বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

অযোধ্যাতে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের সহিত জড়িত কয়েকটী দেখিবার স্থান আছে। যেখানে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তথায় কোনও মন্দির নাই। একটী ক্ষুদ্র আশ্রমের তলে তাঁহার শ্রীচরণচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। এই জন্মস্থানের গায়েই একটী মুসলমানদের মস্‌জিদ, কোনও মুসলমান বাদসাহের অতিরিক্ত ধার্ম্মিকতার নিদর্শন। জন্মস্থান এবং মস্‌জিদ রেলিং দিয়া পৃথক করা হইয়াছে—বোধ হয় সম্প্রতি।

পুত্র কামনা করিয়া রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গঋষিকে আনাইয়া যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং যে যজ্ঞের দেবদত্ত চরু ভক্ষণ করিয়া মহিষীত্রয় অন্তর্বত্নী হইয়াছিলেন, সেই যজ্ঞশালা আজও পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকে। শ্রীরাম-চন্দ্রের বিবাহের পর কৌশল্যা তাঁহার শয়নমন্দিরে নবোঢ়া দম্পতির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; রত্নমন্দির নামে উদ্যানমধ্যস্থিত সুগঠিত ভবন সেই স্থানটী আজও নির্দ্দেশ করিতেছে। বনগমনের পূর্ব্বে এই স্থানে অতিবাহিত দিনগুলির সুখস্মৃতি মনে করিয়া উত্তররামচরিতে শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করিয়াছেন,

> "জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
> মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ॥"

"যে সময় পিতা জীবিত ছিলেন, আমরা সবে মাত্র দারপরিগ্রহ করিয়াছি,

আর মাতৃগণ আমাদের সকল ভাবনা ভাবিতেন, আমাদের সে সকল দিবস অতীত হইয়াছে।" যে স্থানে লক্ষ্মণ সত্যরক্ষার্থ সরযূতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অগ্রজসেবার্থ উৎসর্গীকৃত পুণ্যময় জীবনের মহান্ উপসংহার করিয়াছেন, সেই লক্ষ্মণঘাট আজও দেখিতে পাইবে।

এই স্থানগুলি যে সেই সুদূর অতীতের ঘটনাগুলির যথার্থ নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার অবশ্য কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। কিন্তু ইহারা সেই সকল ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়া হৃদয়ে যে ভক্তির উৎস খুলিয়া দেয়, তাহার মূল্য কি কম? যে চরিত্র-গুণগানে ভারতভূমির আপামর জনসাধারণ মুগ্ধ, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া সুখদুঃখময় বিচিত্র অনুভূতিতে সকলের হৃদয় উদ্বেল হইয়া আসিতেছে, সেই সকল ঘটনা এই-খানেই কোনও না কোন স্থানে ঘটিয়াছিল। ভাব দেখি, উহারা যেখানে তুমি এক্ষণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ ঐ স্থানটীতেই ঘটিয়াছিল! তাহা হইলে তুমি কতকটা অনুভব করিতে পারিবে, দেশের দূরদূরান্তর হইতে আগত লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সরলবিশ্বাসপূর্ণ ও ভক্তিময় হৃদয়ে এই সকল দর্শন করিয়া কি ভাবের উদয় হয়!

অযোধ্যার বহুসংখ্যক দেবালয় দর্শন করিলাম। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বত্রই বিগ্রহত্রয়-প্রতিষ্ঠিত—মধ্যে রাম, বামে সীতা ও দক্ষিণে লক্ষ্মণ। ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা পড়িয়া গেল। সেদিন দেবীপক্ষের অষ্টমী তিথি। শুনিলাম সন্ধ্যার সময় রাজবাটীতে 'ঝাণ্ডা' হইবে। কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া রাজবাটী অভিমুখে চলিলাম। চন্দ্রালোকে সুধালিপ্ত-রাজভবনগুলি শোভা পাইতেছিল। দেখিলাম উৎসব দেখিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইয়াছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ঠাকুরবাড়ীর দরজা খোলা হইল, আমরা ভিতরে গিয়া দেখিলাম, দেবী সিংহবাহিনী অসুর বধ করিয়া বিজয়গর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছেন, অসুরের ছিন্নমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত, তাহার বক্ষ দেবীর করধৃত বর্শার অগ্রভাগ-বিদ্ধ এবং তাহার ছিন্ন গলদেশ হইতে অজস্র ধারায় শোণিতপাত হইয়া গৃহতল ভাসাইয়া দিয়াছে। এই শোণিত অবশ্য লাল জলের ফোয়ারা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমবেত লোক কিছুক্ষণ ধরিয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অদূরে একটী বালক দাঁড়াইয়া ছিল, আমরা শুনিলাম এই বালকই

গদীর উত্তরাধিকারী। বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে এইরূপ অষ্টমীর পূজা দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে গোপ্রতার ঘাট দেখিতে যাত্রা করিলাম। গোপ্রতার ঘাট অযোধ্যা হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে। ফৈজাবাদ সহর পার হইয়া এই ঘাটে আসিতে হয়। সহরটী বেশ পরিষ্কার। সহরের পর সৈন্যদের ছাউনি। তাহা অতিক্রম করিয়া গোপ্রতার ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

ঘাটের শোভা দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ হইল। সরযূ এইখানে আসিয়া অল্প স্থানের মধ্যেই অনেক খানি ঘুরিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। সেই বাঁকের উপর প্রস্তরগঠিত বিস্তৃত সোপানাবলি। মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ, নীচে স্বচ্ছসলিলা সরযূর বিশাল প্রবাহ। এইস্থলে জল অত্যন্ত গভীর। বহুদূর পর্য্যন্ত জলধারা দেখা যাইতেছিল। আমরা স্নানাদি সমাপন করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। মনে পড়িতে লাগিল সেই দৃশ্য—শ্রীরামচন্দ্র দেহ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যা হইতে চলিয়া আসিতেছেন, অযোধ্যার যাবৎ অধিবাসিবৃন্দ গৃহ ছাড়িয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছে, ঐ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-কলেবর ধীরে ধীরে সরযূর সলিলমধ্যে নামিয়া যাইতেছেন, ঐ ভরত নামিলেন, ঐ শত্রুঘ্ন নামিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পুরবাসিগণ দেহ বিসর্জ্জন করিল—"গোপ্রতরকল্লোলঃভূৎ সম্মর্দ্দস্তত্র মজ্জতাম্"—মুহূর্ত্তমধ্যে সকল কোলাহল নীরব হইয়া গেল, স্থান জনহীন হইয়া পড়িল, শুধু উদাস বায়ু নদীর বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃজন করিয়া বহিতে লাগিল।

বেলা হইয়া গিয়াছিল। আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই পবিত্র স্থান ত্যাগ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। (ক্রমশঃ)

ভগবান্ বুদ্ধ ও দেবদত্ত।

(শ্রীগোকুলদাস দে, বি-এ)

(পালি হইতে)

'সত্থরি অনুপিয়ং' (শাস্তা বা ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত) নামে মল্লদিগের এক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তাহার সমীপবর্ত্তী অনুপিয়স্থ বনে

কুমার সিদ্ধার্থের (ভগবান্ বুদ্ধের) লক্ষণ-নির্ণয় দিবসে অশীতি সহস্র শাক্য-পুত্র এবং তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, "তিনি বুদ্ধই হউন, বা রাজাই হউন, বহুক্ষত্রিয়বেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিবেন।" পরে যখন সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রব্রজ্যা লইয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিলেন। কিন্তু ভদ্দিয়রাজ, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত, তাঁহার এই ছয়জন শাক্য আত্মীয় প্রব্রজ্যা লইলেন না। ইহা দেখিয়া অন্য জ্ঞাতিরা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "আমরা আমাদের স্ব স্ব পুত্রদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইতেছি; আর ইঁহারা আত্মীয় হইয়াও যখন প্রব্রজ্যা লইলেন না, তখন ইঁহারা কখনই শাক্য নন।"

অনন্তর শাক্য মহানাম, অনুরুদ্ধের নিকট আসিয়া বলিলেন, "ভাই আমাদের কুলমধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা লয়েন নাই। হয় তুমি প্রব্রজ্যা লও, নয় আমি লই।" কিন্তু অনুরুদ্ধ বড়ই সুকুমার এবং ভোগবিলাসের মধ্যে পালিত ছিলেন; এমন কি, তিনি 'নাই' এই শব্দ কখনও শুনেন নাই। তাঁহার সরলতাও অতি অদ্ভুত ছিল। একদিবস উক্ত ছয়জন শাক্যকুমার ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাহাতে অনুরুদ্ধ কিছু পিষ্টক হারিয়া উহা আনিবার জন্য গৃহে লোক পাঠাইলেন। তাঁহার মাতা পাত্র সাজাইয়া পিষ্টক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাহা ভক্ষণ করিয়া পুনরায় খেলিতে লাগিলেন; পুনঃ পুনঃ তাঁহারই পরাজয় হইতে লাগিল। পিষ্টকের জন্য লোক পাঠাইলে তিনবার তাঁহার মাতা পিষ্টক পাঠাইলেন; চতুর্থবারে 'পিষ্টক নাই' বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন। তিনি 'নাই' কি বস্তু কখনও জ্ঞাত না থাকায় ভাবিলেন, 'এও বা এক রকম পিষ্টক হইবে' এবং সেই লোককে বলিলেন, "যাও এই 'নাই পিষ্টক' আমার জন্য লইয়া আইস।" সে গিয়া তাঁহার মাতাকে নিবেদন করিল, "মা, সেই 'নাই পিষ্টকই' আপনি দিন।" মাতা ইহা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন তাঁহার পুত্র কখনও 'নাই' কথাটী শুনেন নাই বলিয়া এরূপ চাহিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহাকে সেই ব্যাপার বুঝাইবার জন্য এক শূন্য সুবর্ণ-পাত্র অন্য এক সুবর্ণ-পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। নগররক্ষক দেবতারা ভাবিলেন, অনুরুদ্ধ আহারকালে অন্নের অগ্রভাগ ভগবদুদ্দেশে নিবেদন করিয়া "আমি যেন কখন 'নাই' এই বাক্য না শুনি এবং কিরূপে খাদ্য উৎপন্ন হয়

তাহা যেন আমায় না জানিতে হয়," এই দুই প্রার্থনা করিয়া থাকেন; যদি তিনি শূন্য পাত্র দেখিতে পান তাহা হইলে আমাদের আর দেবমণ্ডলী-মধ্যে স্থান থাকিবে না, আমাদের মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।" এই হেতু তাঁহারা সেই শূন্য পাত্র দিব্য পিষ্টকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। ক্রীড়াস্থলে সেই পাত্র খুলিবামাত্রই পিষ্টকের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া গেল, এবং উহা মুখে দিবামাত্র তাঁহাদের শরীরের সমস্ত শিরা স্পন্দিত হইতে লাগিল। অনুরুদ্ধ ভাবিলেন, 'নিশ্চয়ই মা আমাকে ভালবাসেন না, নতুবা এতদিন আমার জন্য 'নাই পিষ্টক' প্রস্তুত করিতেন না কেন? যাহা হউক এক্ষণে ইহা ব্যতীত আর অন্য পিষ্টক খাইব না।" তিনি গৃহে গিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা আমি তোমার প্রিয়, না অপ্রিয়?" মাতা উত্তর দিলেন, "বাবা একচক্ষুর একমাত্র চক্ষু যেমন প্রিয়, লোকের নিজ নিজ হৃদয় যেমন প্রিয়, তুমিও আমার তেমনি প্রিয়।" "তাহা হইলে এতদিন তুমি কি জন্য আমার নিমিত্ত 'নাই পিষ্টক' প্রস্তুত কর নাই?" তাহার মাতা বিস্মিতা হইয়া শিখাধারী ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা, পাত্রে কি কিছু ছিল?"

"হাঁ মা, পাত্র পিষ্টকে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ পিষ্টক পূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই!" তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র পুণ্যবান্, এবং সুকৃতিবশতঃ বুদ্ধত্বলাভে কৃতসঙ্কল্প হইবেন; যেহেতু দেবতারা তাঁহার পাত্র পিষ্টকপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। অনুরুদ্ধ বলিলেন, "মা, এখন হইতে আর অন্য পিষ্টক খাইব না; তুমি আমার জন্য কেবল 'নাই পিষ্টক' তৈয়ার করিবে।" তদবধি তিনিও, পুত্র পিষ্টক চাহিলে সেইরূপ শূন্য পাত্র অন্য পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন; দেবতারাও পূর্ব্বের মত উহা দিব্য পিষ্টকে পূর্ণ করিয়া দিতেন। যতদিন অনুরুদ্ধ সংসারে ছিলেন, ততদিন দেবতারা ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি জগতের কিছুই জানিতেন না, সুতরাং, প্রব্রজ্যা কি বস্তু, তাহা কেমন করিয়া জানিবেন? সেইজন্য মহানামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রব্রজ্যা কাহাকে বলে?" তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন, "প্রব্রজ্যা লইলে মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র ধারণ করিতে হয়, চৌকি বা ছোট তক্তাপোষের উপর শুইতে হয়, এবং ভিক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হয়।"

"ভাই, আমি বড় সুকুমার, প্রব্রজ্যা লইতে পারিব না।"

"বেশ ভাই, তুমি কৃষিকার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গৃহে থাক। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা লইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।"

অনুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কৃষিকার্য্য কাহাকে বলে?"

যিনি অন্ন কিরূপে প্রস্তুত হয় জানেন না, তিনি কৃষিকর্ম্মের কি জানিবেন? একদিবস কিম্বিল, ভদ্দিয় ও অনুরুদ্ধ এই তিনজন ক্ষত্রিয়কুমারের মধ্যে এই কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, "অন্ন কিরূপে উৎপন্ন হয়?" কিম্বিল বলিলেন, "ইহা মরাইয়ের ভিতর জন্মায়।" একদিন মরাই হইতে ধান্য বাহির করিতে দেখিয়া, তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল। ভদ্দিয় বলিলেন, "তুমি অন্ন কোথা হয় কিছু জান না; ইহা উদূখলের মধ্যে উৎপন্ন হয়।" একদিন উদূখলে ধান্য পিষিতে দেখিয়া তিনি উদূখলেই এইগুলি জন্মিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অনুরুদ্ধ বলিলেন, "তোমরা দুইজনেই কিছু জান না; রত্নময় কুলা হইতে সুবর্ণনির্ম্মিত থালার উপর অন্ন জন্মে।" তিনি ধান্য কুটিতে, বা চাউল সিদ্ধ করিতে, এমন কি, ভাত বাড়িয়া দিতেও কখন দেখেন নাই। সামনে অন্ন প্রস্তুত থাকে দেখিতেন মাত্র, এজন্য তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল, ক্ষুধার সময় অন্ন আপনি থালায় জন্মিয়া থাকে। তাঁহারা তিন জনেই অন্ন কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা জানিতেন না। সুতরাং অনুরুদ্ধ, কৃষিকর্ম্ম কি, জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন, প্রথমে ক্ষেত্র কর্ষণ করাইতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং এইরূপ প্রতি বৎসরই করিতে হইবে, তখন তিনি বলিলেন, "কবে ইহার শেষ হইবে এবং কবেই বা আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত দ্রব্য ভোগ করিব?" ভ্রাতা বলিলেন, "এ সকল কার্য্যের শেষ নাই।" তিনি অমনি বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি গৃহে বাস করুন। আমার আর গৃহে থাকিবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, "মা আমায় অনুমতি দিন, আমি প্রব্রজ্যা লইব।" মাতা তিনবার তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চতুর্থ বারে বলিলেন, "যদি তোমার বন্ধু ভদ্দিয়রাজ প্রব্রজ্যা লয়েন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার সহিত প্রব্রজ্যা লইও।" ইহা শুনিয়াই অনুরুদ্ধ ভদ্দিয়রাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা

তোমার উপর নির্ভর করিতেছে।" এইরূপে বুঝাইবার পর, সাত দিন গত হইলে, ভদ্দিয়রাজ তাঁহার সহিত গৃহত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর শাক্যরাজ, ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত এই ছয় জন ক্ষত্রিয়, এবং নাপিত উপালি, সর্ব্বসমেত সাত জন এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া দেবতার ন্যায় প্রচুর পরিমাণে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে, যেন মহার্হ শয্যায় শয়ন করিতে যাইতেছেন, এইরূপ ভাবে চতুরঙ্গ সেনানী পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তৎপরে অন্য রাজার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাজাজ্ঞায় অনুচরবর্গকে নিবর্ত্তিত করিলেন এবং সাধারণের মত যাইতে লাগিলেন। সেই স্থলে ছয় জন ক্ষত্রিয় স্ব স্ব বহুমূল্য আভরণসকল গাত্র হইতে খুলিয়া তদ্দ্বারা একটী পুঁটুলি প্রস্তুত করিলেন, এবং উপালিকে ডাকিয়া উহা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "উপালি, তুমি এইটী লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও। ইহাতে তোমার যথেষ্ট জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে।" উপালি তাঁহাদের পাদমূলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ও পাছে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় এই ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের বিদায়কালে সমস্ত বনস্থলী যেন রোরুদ্যমান এবং পৃথিবী যেন কম্পিত হইয়াছিল।

কিছুদূর ফিরিয়া আসিয়া উপালির মনে পড়িল—শাক্যেরা অতিশয় নিষ্ঠুর, এই পুঁটুলি দেখিয়া তাহারা বলিবে, এ নিশ্চয় কুমারদিগকে হত্যা করিয়াছে, এবং এই ধারণা করিয়া আমাকে হত্যা করিবে। আর এই শাক্য-কুমারেরা তাঁহাদের রাজসম্পদ ত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বহুমূল্য আভরণ দূরে ফেলিয়া দিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। আমি ত ইঁহাদের তুলনায় কিছুই নই! এইরূপ ভাবিয়া তিনি পুঁটুলি খুলিয়া অলঙ্কারগুলিকে একটী গাছের ডালে ঝুলাইয়া দিয়া বলিলেন—যাহার প্রয়োজন হয় সে ইহাদিগকে গ্রহণ করুক, এবং দ্রুতবেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই শাক্যকুমারদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার পুনরাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা সকলেই শাস্তার নিকট আগমন করিলেন, এবং নিবেদন করিলেন, "ভগবন্, শাক্যবংশীয় আমরা অতিশয় মানী, ইনি (উপালিকে দেখাইয়া) বহুদিন হইতে আমাদের

পরিচর্য্যা করিয়াছেন, ইঁহাকেই প্রথমে প্রব্রজ্যা দিন, আমরা ইঁহার বন্দনাদি করিয়া আমাদের আভিজাত্য দূর করিব।" এইরূপে তাঁহারা উপালিকে প্রথমে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইয়া শেষে আপনারা গ্রহণ করিলেন।

* * *

এইরূপে প্রব্রজ্যা লইয়া তাঁহারা শাস্তার নিকট বাস করিতে লাগিলেন। সেই বর্ষাকালের মধ্যেই ভদ্দিয় জন্মমৃত্যু, বাসনাক্ষয় এবং পূর্ব্বজন্ম এই তিন বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেন; অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরে 'মহাপুরুষের চিন্তা' বিষয়ক সূত্র শ্রবণ করিয়া 'অর্হৎ' পদ লাভ করিলেন; আয়ুষ্মান আনন্দ স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন, ভগু এবং কিম্বিল পরে অনিত্য বিষয়ের ধ্যান ধারণাদি করিয়া অর্হৎ পদ লাভ করিলেন এবং দেবদত্ত কতকগুলি অতি নীচ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন মাত্র।

*

ইহার কিছুদিন পরে শাস্তা কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তিনি এবং তদীয় শিষ্যসঙ্ঘ প্রচুর দ্রব্যসম্ভার এবং সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। সকলে বস্ত্র ও ঔষধাদি হস্তে লইয়া বিহারে আসিত, এবং "শাস্তা কোথায়, সারিপুত্রথের কোথায়, ভদ্দিয়থের কোথায়, অনিরুদ্ধথের কোথায়, আনন্দথের কোথায়, ভগুথের কোথায়, কিম্বিলথের কোথায়?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অশীতি প্রধান শিষ্যের বসিবার স্থান দেখিয়া যাইত। কিন্তু দেবদত্ত কোথা বসিয়া বা দাঁড়াইয়া আছেন কেহই জিজ্ঞাসা করিত না। ইহাতে দেবদত্তের মহা ক্রোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, আমি ইহাদেরই সহিত প্রব্রজ্যা লইয়াছি, ইঁহারাও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়, লোকে দান এবং সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ইঁহাদেরই কেবল অনুসন্ধান করে, আর আমার নাম পর্য্যন্ত কাহাকেও করিতে দেখি না। কাহাকে প্রসন্ন করিয়া বা কাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া অর্থ ও সম্মান লাভ করা যায়? অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিলেন, "রাজা বিম্বিসারের (তদানীন্তন মগধাধিপতি) সহিত একত্র হইতে পারিব না, কেননা তিনি ভগবান্ বুদ্ধের সহিত প্রথম দর্শনেই একাদশ অযুত ব্যক্তির সহিত স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কোশলরাজের সহিতও একত্র হওয়া দুষ্কর; কিন্তু এই

রাজকুমার অজাতশত্রু (বিম্বিসারের পুত্র) কাহারও দোষ গুণ কিছুই জানেন না, অতএব ইঁহারই সহিত মিলিত হইব।” এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি কৌশাম্বী হইতে রাজধানী রাজগৃহে আগমন করিলেন, এবং এক সুকুমার রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিয়া চারিটা বিষধর সর্পকে উভয় হস্তে এবং পদদ্বয়ে জড়াইয়া এবং আর তিনটীকে মস্তকে, স্কন্ধে এবং গলায় রাখিয়া বিমানচারী হইয়া একেবারে অজাতশত্রুর ক্রোড়দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র সশঙ্কিতচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, “কে তুমি?” দেবদত্ত বলিলেন, “আমি দেবদত্ত।” এই বলিয়া তাঁহার সেই বেশ পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র ও চীরধারী ভিক্ষু সাজিয়া রাজপুত্রের তুষ্টিসাধন করিলেন, এবং আপনার প্রচুর ধন এবং সম্মান প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিলেন।

* * * *

দেবদত্ত নীচসেব্য কতকগুলি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া অজাতশত্রু এবং তাঁহার প্রজামণ্ডলীর নিকট হইতে বহু সম্মান এবং উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কৃত হইয়া উঠিলেন এবং ভাবিলেন, “আমি সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ পালন করিব।” এই পাপচিন্তা উদয় হইবামাত্র তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল। সেই সময় শাস্তা রাজগৃহে আসিয়া বেলুবনবিহারে রাজসনাথ পরিষৎ মধ্যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ক্ষমতাগুলি হারাইয়াও দেবদত্ত তাঁহার নিকট আসিয়া বন্দনাপূর্ব্বক করযোড়ে নিবেদন করিলেন, “ভগবন্, আপনি এক্ষণে জীর্ণ, বৃদ্ধ ও প্রাচীন হইয়াছেন; আমায় ভিক্ষুসঙ্ঘ অর্পণ করিয়া পৃথিবীতে সুখে ও নির্ভাবনায় বাস করুন। আমি তাঁহাদের পালন করিব।” শাস্তা তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। এইরূপে শাস্তা কর্তৃক লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়া দেবদত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তথাগতের প্রতি তাঁহার আক্রোশের এই প্রথম সূচনা হইল।

ভগবান্ দেবদত্তের ঐ ঔদ্ধত্য রাজগৃহে সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন। দেবদত্ত স্থির করিলেন, শ্রমণ গৌতম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব তিনি তাঁহার অনর্থসাধন করিবেন। সেইজন্য অজাত-শত্রুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “হে রাজপুত্র, পূর্ব্বে মনুষ্যের অনেক দিন পরমায়ু ছিল, এখন সকলেই অল্পায়ু; ইহা খুব সম্ভব যে, আপনি রাজ্য

পাইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন; অতএব এইবেলা আপনার পিতাকে হত্যা করিয়া রাজা হউন; আমিও ভগবান্‌কে নিহত করিয়া বুদ্ধ হইব।" পরে অজাতশত্রু বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া রাজা হইলে, দেবদত্ত কতকগুলি লোককে নিযুক্ত করিয়া ভগবানের প্রাণসংহারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মহদুদার শাস্তার নিকট আসিবামাত্রই তাহারা নিজেদের চিত্তের ভ্রান্তি বুঝিয়া সকলেই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল। তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না দেখিয়া দেবদত্ত স্বয়ং ভগবানের প্রাণসংহার-বাসনায় গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন এবং ভগবান্‌কে নীচে একটী ছায়াময় প্রদেশে বেড়াইতে দেখিয়া একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর তাঁহার দিকে গড়াইয়া দিলেন। প্রস্তরখণ্ড আসিতে আসিতে আশ্চর্য্যক্রমে দুইটী চূড়ার মধ্যে থামিয়া গেল। কিন্তু তাহা হইতে একটী ক্ষুদ্র কণিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবানের পদপ্রান্ত আঘাত করিল এবং তথা হইতে রুধির বাহির হইতে লাগিল। ইহাতে সিদ্ধকাম হইতে না পারিয়া দেবদত্ত রাজগৃহে আসিলেন, এবং শাস্তাকে তথায় ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতে দেখিয়া 'নালাগিরি' নামক এক মহাকায় হস্তীকে মত্ত করাইয়া তাঁহার দিকে ধাবমান করাইয়া দিলেন। তাহাকে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া শাস্তাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অগ্রে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভিক্ষুগণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এক অতি প্রচণ্ড হস্তী এই রাস্তায় আসিতেছে! ভগবন্, ফিরিয়া যান, সুগত, ফিরিয়া যান" কিন্তু সুগত না ফিরিয়া তাঁহাদের বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ভয় না করিয়া চলিয়া আইস। অপরের ইচ্ছায় তথাগতদিগের বিনাশ কখনও সাধিত হইতে পারে না; যেহেতু, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।" হস্তী কাছে আসিলে তিনি তাহাকে ভালবাসা দ্বারা বশ করিলেন, এবং তাহার কুম্ভের উপর দক্ষিণহস্ত রাখিয়া একটী গাথা বলিয়া তাহার চিত্তের স্বাস্থ্যবিধান করিলেন। এইরূপে দমিত হইয়া হস্তী প্রস্থান করিল। শাস্তা নগর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিহারে আসিলেন এবং বহু সহস্র উপাসকাহৃত খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া সেই দিন ধর্ম্ম-পরিষৎমধ্যে অষ্টাদশকোটি রাজগৃহবাসীর নিকট সোপানপরম্পরাক্রমে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া চতুরশীতি সহস্র লোকের ধর্ম্মজ্ঞান

আনয়ন করিলেন; তৎপরে সেই জনমণ্ডলীমধ্যে, আয়ুষ্মান্ আনন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই মত্ত মাতঙ্গের সম্মুখে নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, কেবল এই-বার নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন," এবং ভিক্ষুগণ তাহা জানিতে চাহিলে, তিনি সেই পূর্ব্বজন্মবিষয়ক 'চূড়হংস', 'মহাহংস' এবং 'কর্কট' নামক জাতকসকল বর্ণন করিলেন।

বুদ্ধকে বিনাশ করিবার জন্য দেবদত্তের 'নালাগিরি' নামক হস্তীকে ছাড়িয়া দেওয়া রূপ এই শেষ কার্য্যটী পূর্ব্বগুলির অপেক্ষা দেশময় অধিক রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সেই সময় জনসাধারণ বলিতে লাগিল, "হায়, আমাদের রাজা দেবদত্তের পরামর্শে নিহত হইয়াছেন, বুদ্ধকে বধ করিবার জন্য তাহার দ্বারা লোক নিযুক্ত হইয়াছে; বুদ্ধের চরণ হইতে রুধির নির্গত করিয়া সে মহা অধর্ম্ম করিয়াছে; আবার এখন 'নালাগিরি'কে ছাড়িয়া দিয়াছে! এইরূপ পাপাসক্ত ব্যক্তিকে লইয়া রাজা বিচরণ করেন।" এই বলিয়া তাহারা মহাকোলাহল উত্থাপিত করিল। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া আর তাঁহার জন্য পঞ্চশত থালিপূর্ণ আহার্য্য লইয়া গমন করিলেন না। এমন কি, নাগরিকেরাও দেবদত্ত তাহাদের গৃহে যাইলে রিক্তহস্তে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে লাগিল।

* * *

দেবদত্ত এইরূপে রাজা ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মহাত্যাগীর ভাণ করিয়া জীবনধারণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং ভগবানের নিকট আসিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঁচটী বিষয় বিশেষরূপে পালন করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন:—(১) ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন শুধু অরণ্যেই বাস করিবেন; (২) তাঁহারা শুধু ভিক্ষালব্ধ অন্নেই জীবনধারণ করিবেন; (৩) পরিত্যক্ত জীর্ণচীর সকল গ্রথিত করিয়া সেই বস্ত্রই কেবল ধারণ করিবেন; (৪) তাঁহারা কেবল বৃক্ষমূলেই শয়ন করিবেন; এবং (৫) কদাপি মৎস্য মাংস ভোজন করিবেন না। (ভগবান্ সময়বিশেষে তাঁহার শিষ্যদের মৎস্য-মাংস আহারে আপত্তি করিতেন না।) ভগবান্ উত্তরে বলিলেন, "দেবদত্ত, আমার যাহা নিয়ম আছে, তাহাই যথেষ্ট, তবে যাহার একান্ত ইচ্ছা হয়, সে বনে গিয়া

থাকুক। তুমি আর বেশী বলিও না।" বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দেবদত্ত বলিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ, কাহার বাক্য উত্তম: তথাগতের, না আমার? আমি ত উৎকর্ষ-সাধনের জন্যই বলিতেছি।" শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "দেবদত্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উত্তম।" দেবদত্ত বলিলেন, "আচ্ছা, যিনি এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমার সহিত আসিবেন।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া কতকগুলি মন্দবুদ্ধি নবসন্ন্যাসী দেবদত্তেরই কথা উত্তম এবং তাঁহার সহিত বাসই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। দেবদত্ত পাঁচ শত ভিক্ষু লইয়া সেই পঞ্চনিয়মানুসারে তাঁহাদের উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া নিজের বেশ সংস্থান করিয়া, বুদ্ধের সঙ্ঘভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহার দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবদত্ত, তুমি কি সত্য সত্যই আমার চক্র এবং সঙ্ঘ ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছ?" দেবদত্ত বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" ভগবান্ উপদেশ দিয়া কত বুঝাইলেন এবং বলিলেন, "দেবদত্ত, সঙ্ঘ ভেদ করা মহাপাপের কার্য্য।" দেবদত্ত কিছুই শুনিলেন না। পরে তিনি একদিন আয়ুষ্মান্ আনন্দকে রাজগৃহে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "ভাই আনন্দ, তুমি জানিয়া রাখ, আজ হইতে আমি ভগবান্ এবং ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে পৃথক্‌ভাবে সঙ্ঘের ব্রতসকল পালন করিব।" আনন্দ বিহারে যাইয়া এ কথা ভগবান্‌কে বলিয়া দিলেন। ভগবান্ ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপ বিচার করিলেন, "দেবদত্ত দেব এবং মনুষ্যলোকের অনর্থকর কার্য্য করিয়া অবীচি-নরকে যন্ত্রণা পাইবার মহান্ হেতু উৎপন্ন করিতেছে।" তৎপরে এই গাথাটী বলিলেন,

"সুকরাণি অসাধূনি অত্তনো অহিতানি চ।
যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরম দুক্করণ"ন্তি॥

অর্থাৎ মন্দ এবং নিজ অহিতকর কার্য্য করা অতিশয় সুসাধ্য, কিন্তু হিত-জনক সৎকার্য্য করা অতি দুষ্কর।

এই বলিয়া আবার এই উদান গান করিলেন,—

"সুকরং সাধুনা সাধু সাধু পাপেন দুক্করং,
পাপং পাপেন সুকরং পাপং অরিয়েহি দুক্করণ"'ন্তি ॥

"সাধু ব্যক্তিরা সৎকর্ম্ম সহজেই করিতে পারেন, কিন্তু অসৎ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অতি কষ্টকর। পাপীর পক্ষে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান অতি সহজ, কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের পক্ষে তাহা সুকঠিন।"

ইহার পর একদিন দেবদত্ত স্বীয় পারিষদ্‌গণের সহিত বুদ্ধদেবের সঙ্ঘ-সমীপে উপস্থিত হইয়া একপাশে বসিয়া বলিলেন, "যিনি এই পাঁচটী নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ, তিনি শলাকা গ্রহণ করিয়া আমার সহিত চলিয়া আসুন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া পঞ্চশত স্বধর্ম্মত্যাগী ও কতকগুলি নব অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি শলাকা লইয়া তাঁহার সহিত গয়াশীর্ষ প্রদেশে গমন করিল। এইরূপে তিনি সংঙ্ঘমধ্যে ভেদের সৃষ্টি করিলেন.। শাস্তা তাঁহাদের গয়াশীর্ষে গমনবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য দুই প্রধান শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাহাদের "অত্যদ্ভুত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা" এবং "অত্যদ্ভুত ঋদ্ধিলাভ" এই সূত্রদ্বয় ব্যাখ্যাদ্বারা ধর্ম্মামৃত পান করাইয়া স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং সঙ্গে করিয়া আকাশমার্গে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। কোকালিক নামক দেবদত্তের এক ভিক্ষু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই দেবদত্ত, উঠ, সারিপুত্র ও মোদ্‌গল্যান তোমার ভিক্ষুসকল লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন; আমি কি তোমায় বলি নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস করিও না?" "সারিপুত্র ও মোদ্‌গল্যান পাপাত্মা ও পাপ ইচ্ছায় পরিচালিত," এই বলিয়া দেবদত্ত জানু দ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত বহির্গত হইল। এ দিকে আয়ুষ্মান্ সারিপুত্রকে ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া আকাশমার্গে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভগবন্, আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র যাইবার সময় আত্মদ্বিতীয় হইয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাজনতাবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে সুন্দর দেখাইতেছে।"

শাস্তা বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, শুধু এখন নহে, জীবজন্তুমধ্যে জন্মিয়াও আমার পুত্র আমার কাছে আসিবার সময় শোভা পাইয়াছিলেন।" এই বলিয়া সেই পূর্ব্বজন্ম-ইতিহাস বর্ণন করিলেন।

ভিক্ষুরা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্, দেবদত্ত আপনার দুই প্রধান শিষ্যকে দুই পার্শ্বে বসাইয়া বুদ্ধের ন্যায় সুন্দরভাবে ধর্ম্ম-বক্তৃতা করিব ভাবিয়া আপনার অনুকরণ করিয়াছিলেন।" ভগবান্ বলিলেন, "শুধু এখন নয়, পূর্ব্বেও আমার অনুকরণ করিতে সে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই।" ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি দুইটী জাতক বর্ণনা করিয়াছিলেন। অপর একদিন দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা এবং তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অধ্যবসায়ের কথা শুনিয়া দুইটী জাতক বলিয়াছিলেন। ইহার পর আর একদিন দেবদত্তের দক্ষিণা সম্মান প্রভৃতি এবং সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশ্য, এই উভয়বিধ লাভই নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ কথা শুনিয়া শাস্তা ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন, "শুধু ইদানীং নহে, পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ হইয়াছিল।" এবং তৎসংক্রান্ত পূর্ব্বের জাতকসকল কহিয়াছিলেন। শাস্তা যতদিন রাজগৃহে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি দেবদত্ত-বিষয়ক বহু জাতক বর্ণন করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়া জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন।

* * * *

ক্রমে নয়মাস অতীত হইলে দেবদত্ত অতিশয় পীড়িত হইলেন এবং আপনার শেষ সময় জানিতে পারিয়া শাস্তাকে দর্শন করিবার জন্য অতি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজ শিষ্যবৃন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "শাস্তাকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। তাঁহার কাছে আমাকে লইয়া চল।" তাহারা বলিল, "যখন আপনি সুস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত বৈরিভাব আচরণ করিয়াছেন; আমরা এখন কিছুতেই তাঁহার কাছে লইয়া যাইব না।" দেবদত্ত বলিলেন, "আর আমায় মারিও না, আমিই তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার অণুমাত্রও অহিতাচরণ করেন নাই। আহা! সেই ভগবান্ তাঁহার বিনাশেচ্ছুক দেবদত্তের প্রতি, চোর অঙ্গুলিমালকের প্রতি, ধনপাল (এক হস্তীর নাম), এবং পুত্র রাহুলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন; সেই ভগবান্‌কে আমায় দেখাও।" এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করাতে তাহারা তাঁহাকে এক শিবিকায় আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দেবদত্তের আগমন-সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে বলিলেন, "ভগবন্, দেবদত্ত আপনাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতেছেন।" ভগবান্ বলিলেন, "হে

ভিক্ষুগণ, সে এই জন্মে আর আমায় দেখিতে পাইবে না।" এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পঞ্চবিধ নিয়ম প্রার্থনা করিবার পর ভিক্ষুরা আর বুদ্ধকে দেখিতে পান না, ইহাই ধর্ম্ম।

"ভগবন্, দেবদত্ত অমুক স্থলে, অমুক স্থলে আসিয়া পড়িয়াছেন!"

"যেখানেই আসুক, সে আমায় দেখিতে পাইবে না।"

"ভগবন্, আর যে এখান হইতে মাত্র এক যোজন আছে!" "আর অর্দ্ধযোজন!" "আরও কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন!" "ভগবন্, দেবদত্ত জেতবনের পুষ্করিণীর নিকট আসিয়াছেন!" ভগবান্ বলিলেন, "এমন কি,—যদি জেতবনের মধ্যেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমায় দেখিতে পাইবে না।"

দেবদত্তের বাহকেরা জেতবন পুষ্করিণীতীরে শিবিকা রক্ষা করিয়া স্নানের জন্য পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন। দেবদত্ত উঠিয়া শিবিকায় উপবেশন করিয়া দুই পা ভূমির উপর স্থাপন করিলেন, অমনি তাহা পৃথিবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ তাঁহার পদ, জানু, কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মুখ অবধি পৃথিবী উদরসাৎ করিলেন। অন্তকালে চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি এই গাথাটী উচ্চারণ করিলেন:—

"এই ধর্ম্মের আট জন ব্যক্তি * মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, দেবতাগণের পূজনীয়, নির্ব্বাণপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের সারথি, সর্ব্বদর্শী এবং শত মহাপুরুষের লক্ষণবিশিষ্ট সেই বুদ্ধের ভবিষ্যতে সমস্ত জন্মে আমি শরণ লইলাম।"

ইহাই সিদ্ধ করিবার জন্য তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন। এইরূপে প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত না হইলে কর্ম্মদোষে তাঁহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হইত এবং তিনি জন্ম-জরা-মরণ-জনিত দুঃখের কখনই শেষ করিতে পারিতেন না; কিন্তু প্রব্রজ্যা লইয়া অধর্ম্মাচরণ করিলেও, এইরূপে বুদ্ধের শরণ লইয়া ভবিষ্যতে তাঁহার দুঃখের শেষ হইবে জানিয়া করুণাময় শাস্তা তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এখন হইতে সহস্রশত কল্প পরে তিনি প্রেতলোক হইতে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে নির্ব্বাণ

* যথা স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ; সকৃদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ; অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ; অর্হৎ মার্গস্থ এবং অর্হৎ স্বয়ং।

লাভ করিবেন, কিন্তু কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া, নিশ্চল বুদ্ধের অনিষ্ট করার নিমিত্ত তিনি নিশ্চল হইয়া এখন হইতে ঐ সময় পর্য্যন্ত নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই অবস্থা জানিয়া ভগবান্ ভিক্ষুগণকে ধর্ম্মপদের এই গাথাটী বলিলেন :—

"পাপকারী ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে উভয় স্থলেই যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। 'আমি কেবল পাপ করিয়াছি' এই বলিয়া ইহলোকে কষ্ট পায়, এবং নরকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া ততোধিক দুঃখ ভোগ করে।"

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাবশেষ অস্থিসম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

(স্বামী সারদানন্দ)

বিগত আষাঢ় সংখ্যার উদ্বোধনে, ২৬শে মে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামিজীর যে পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার ৫ ও ৬ চিহ্নিত অংশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "ভস্মাবশেষ অস্থি" সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি। আমাদিগের হিমালয় প্রদেশস্থ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী জীবনচরিতে, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' নামক গ্রন্থের কোন কোন স্থলে এবং উদ্বোধন পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত প্রবন্ধসকলের কোন কোনটিতেও বোধ হয়, ঐ সকল কথার উল্লেখ আছে। তজ্জন্য ঐ সকল কথা স্বামিজীর পূর্ব্বোক্ত পত্রের সহিত ফুটনোট আকারে পুনরায় প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনুভব করি নাই। কিন্তু ঠাকুরের ভক্তবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও ঐবিষয়ে অন্যমত জানিতে পারিয়া আমরা এখানে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

দেহাবসানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর অগ্নিতে সমর্পি॰ হইয়াছিল এবং ভস্মাবশেষ অস্থিসমূহ সঞ্চয় করিয়া একটি তাম্রকলসে রক্ষিত হইয়াছিল। পরে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তসকলে মিলিত হইয় প্রথমে পরামর্শ স্থির হইয়াছিল যে, পূত ভাগীরথীতীরে একখণ্ড জমী ক্রয় করিয়া উক্ত কলস তথায় যথানিয়মে সমাহিত করা হইবে। কিন্তু ঐরূপ করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন দেখিয়া এবং অন্য নানা কারণে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের অনেকে কিছুদিন পরে পূর্ব্বোক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রিত, অধুনা পরলোকগত ভক্ত শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ 'যোগোদ্যান' নামে প্রসিদ্ধ ভূমিখণ্ডে উক্ত কলস সমাহিত করিবার কথা নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহাদিগের ঐরূপ মত পরিবর্ত্তন ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রকলস হইতে অর্দ্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বাহির করিয়া লইয়া ভিন্ন এক পাত্রে উহা রক্ষা পূর্ব্বক তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে নিত্য পূজাদির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সকলে মিলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন, বিলম্ব হউক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু পবিত্র ভস্মাবশেষের ঐ অংশ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরেই সমাহিত করিবেন। পরে, শ্রীগুরুর পবিত্র দেহভস্মাবশেষ যথা ইচ্ছা সমাহিত করিতে সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় শ্রেণীর ভক্তদিগেরই সমানাধিকার আছে, ঐরূপ উদারভাবপ্রণোদিত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রকলস কাঁকুড়গাছিস্থ যোগোদ্যানে সমাহিত করিতে ঠাকুরের গৃহী ভক্তদিগকে যথাসাধ্য সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী দিবসে উক্ত কলস ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ কর্ত্তৃক কাঁকুড়গাছি উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার অনতিকাল পরে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণ বরাহনগরে একখানি বাটী ভাড়া করিয়া একত্রাবস্থানের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের পূত দেহভস্মাবশেষ-রক্ষিত দ্বিতীয় পাত্রটি শ্রীযুক্ত বলরাম বাবুর ভবন হইতে তথায় আনয়ন করিয়া আপনারাই সযত্নে উহার পূজা সেবাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উক্ত দ্বিতীয় পাত্রটির ভাগীরথীতীরে সমাধিস্থান তখনও করিতে পারেন নাই বলিয়াই পূজ্যপাদ স্বামিজী ৺প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে নিজ হৃদয়ের

গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পবিত্র ভস্মাবশেষ-রক্ষিত দ্বিতীয় পাত্রটি ঠাকুরের দেহাবসানের প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর পরে কিরূপে বেলুড়মঠে স্বামিজী সমাহিত করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষকার্য্য।

আমরা গতবারে যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠকবর্গ ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহের দুরবস্থার কথা অবগত হইয়াছেন। তৎপরে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। এই হেতু আমাদিগকে কার্য্যের প্রসার আরও বাড়াইতে হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ কেন্দ্রের অধীনে সুচিপাড়া, সাহাপুর এবং পড্ডা নামক তিনটী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। নোয়াখালি জেলার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়, এবং বহু গ্রাম হইতে আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন পাইয়াছি, কিন্তু অর্থাভাবে আমরা তথায় কোনও নূতন কেন্দ্র খুলিতে পারি নাই। তবে রামগঞ্জ কেন্দ্রের কার্য্য যে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা কেন্দ্রগুলির নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন :—

ত্রিপুরা জেলা।

কেন্দ্র	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	মোট সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	অস্থায়ী সাহায্যের পরিমাণ
হাজিগঞ্জ	৪৫	৩০৬	৬০৭	৩৩।৪	...
ঐ (পর সপ্তাহে)		৩৩৯	৭১১	৩৫॥২	১৷৮
ঐ	৯৭	৬১৪	১৩১৫	৬৫৸	[illegible]২
ঐ	১১১	৭০৭	১৩৭৯	৬৯৴০	৬
পাইকপাড়া	৫২	৩৯৪	৬০৫	৩০।০	২৷৩
ঐ (পর সপ্তাহে)	৫৫	৪৬৪	৬৫৯	৩১৸৮	২৷০
ঐ	৮১	৭৫৪	১০৫৪	৫২॥৮	৫৸
সুচিপাড়া	২৭	১৮৪	৩১৫	১৫৸০	১৸০
ঐ (পর সপ্তাহে)	৬২	৪২১	৭১৬	৩২৸২	২॥০

কেন্দ্র	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	মোট সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	অস্থায়ী সাহায্যের পরিমাণ
সাহাপুর	২৩	৯০	১৬২	৮/৪	৩।৬
ঐ (পর সপ্তাহে)	৫৮	২৮৬	৪৫৫	২২৸০	২।০
ঐ	৬৫	৩৯৬	৬৩৭	৩১৸৪	৩৸৭
ধড্ডা	১২	৬৫	১২০	৬॥	৵॥০
ঐ (পর সপ্তাহে)	৩৭	১৯৫	৩৫২	১৭॥৪	১৸০

নোয়াখালি জেলা।

কেন্দ্র	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	মোট সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	অস্থায়ী সাহায্যের পরিমাণ
রামগঞ্জ	৬৩	৪০০	৭৮৬	৩৯।২	৯॥৬॥
ঐ (পর সপ্তাহে)	৮৬	৭৫২	১২২৩	৬১/৬	৬৸৬॥
ঐ	৯০	৭৭২	১১৫৮	৫৭৸৬	৮৸৫॥
খালিসপাড়া	২২	৩২৭	৪০০	২০/১	৫।৭॥
ঐ (পর সপ্তাহে)	৩৮	৪১২	৬৭২	৩৩॥৪	৬॥৪

আমরা প্রত্যহ সেবকগণের নিকট হইতে তত্রত্য অধিবাসিগণের দুরবস্থা-জ্ঞাপক পত্র প্রাপ্ত হইতেছি। এই সকল পত্র পাঠ করিলে পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। আমরা এখানে দুই একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি আরও ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। আমরা পরিদর্শনের কার্য্য খুব দ্রুত চালাইতেছি। প্রাতে চিঁড়া গুড় খাইয়া বাহির হইয়া সন্ধ্যার পর আড্ডায় ফিরি। প্রায় প্রতি গ্রামেই শুনিতে পাই যে কোন কোন পরিবারের কর্ত্তা ছেলেমেয়েদের হাহাকার সহ্য করিতে না পারিয়া কোথায় গিয়াছে, ঠিকানা নাই। অনাথ ছেলে মেয়েরা কেহ কেহ ভাত চুরি করিয়া উদর পূরণ করিতেছে। জমিদার ও অবস্থাপন্ন কয়েক ঘর গৃহস্থ ব্যতীত অল্প কয়েক ঘরেরই অতি কষ্টে একবেলা আহার জুটিতেছে, আর সকলে একদিন বা দুই তিন দিনের পর আহার জুটাইতেছে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে দুর্ভিক্ষপীড়িত ছেলেমেয়েরা দুটী ভাতের জন্য তাহাদের খাইবার সময় সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। দিন দিন সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। যখনই পরিদর্শন করিবার জন্য গ্রামে প্রবেশ করি, দেখিতে পাই ছেলেমেয়েরা সব লম্বা হইয়া সারি সারি

মরার মত পড়িয়া আছে। আমাদের দেখিয়া করুণভাবে সাহায্য ভিক্ষা করে। ছেলেমেয়েদের সকলেই লেঙ্গটী পরা। স্ত্রীলোকদের মাত্র কোমরে কাপড় জড়ান; আমাদের দেখিয়া জড়সড় হইয়া সরিয়া যায়। এমন কি, চাউল লইবে এমন কাপড়ও নাই। স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয় বস্ত্রাভাবে বুকের কাপড়ে চাউল লইতেছে। একটী স্ত্রীলোকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমাদের পরিধেয় একখানা কাপড় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবার ফসল বেশ হইয়াছে বুঝা যায়, কিন্তু অনবরত এত বৃষ্টি হইতেছে যে অনেক জায়গায় ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এইরূপ ভাবে বৃষ্টি হইয়া ফসল নষ্ট হইলে তখন যে কিরূপ অবস্থা হইবে তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।"

অপর একখানি পত্র হইতেও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে। যাহারা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইতেছিল তাহাদের সংখ্যাও বাড়িতেছে। কচুর শিকড় ও পাটশাক ইত্যাদি খাইয়া আগের চেয়ে বেশী লোকের পেটের পীড়া (ওলাউঠা, আমাশয় ইত্যাদি) হইতেছে। পেটের বেদনা অভাবগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের।"

আমরা এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে আরও কয়েকটী সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হইতেছে। কলেরার প্রতীকারের জন্যও সাহায্যকেন্দ্র খোলা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সাধ্যমত প্রতিবিধানকল্পে চেষ্টা করিতেছি ও তজ্জন্য সেবকগণের সংখ্যা বাড়াইয়া দ্বিগুণিত করিয়াছি। এখন চাই অর্থ। আমরা ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট এই নিরন্ন, মৃতপ্রায় জনগণের সাহায্যার্থ কাতরভাবে আবেদন করিতেছি। এই ভীষণ অবস্থাচক্রে পড়িয়া তাহাদের কিরূপে দিনাতিপাত হইতেছে তাহা একবার মানসচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে কেহই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। সহৃদয় জনসাধারণ সমীপে আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন যাহার যেরূপ শক্তি তদনুযায়ী অর্থ, নূতন বা পুরাতন বস্ত্র, এবং ঔষধ প্রেরণ করেন। আর বিলম্বের অবসর নাই। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই অবস্থা আরও শোচনীয় হইতেছে।

আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, নোয়াখালি জেলার

কালেক্টর মহোদয় রামগঞ্জের সরকারী ডাকবাঙ্গালাটী আমাদিগকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে আমাদের দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ১০০০৲ দান করিয়াছেন; এবং বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ল্যাঙ্গ, আই, সি, এস, মহোদয় উক্ত স্থান পরিদর্শনে আগমন করিয়া আমাদের কার্য্যে প্রীত হইয়া আমাদের দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে স্বয়ং ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত এককালীন দানগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি :—

১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

মিঃ জে ভট্টাচার্য্য, কাঁকুড়গাছি ১৲
শ্রীব্রিয়াজমোহন ঘোষ, ফরিদাবাদ, ঢাকা ৪॥০
মাঃ মিঃ কে, এন, ঘোষ, ষ্টেশন মাষ্টার, কাট্রাসগড়, কয়েক দফায় ১৩০৲
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোঁদলপাড়া ১০৲
মিঃ এস, এন, সেন, কলিকাতা ১০৲
মিঃ পি, সেন গুপ্ত, কলিকাতা ৩৲
সেক্রেটারি, বার লাইব্রেরী, আলিপুর ১৬৲
ঐ ২য় দফা ১০৲
জে, বি, হাই স্কুল, মাঃ শ্রীগোপীজীবন ঘোষ ১০॥০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বক্সী, ইনায়েৎপুর ৫৲
শ্রীফকিরচন্দ্র হাজরা, দৌলতপুর ২৲
শ্রীযুত শিবপ্রসাদ রাম প্রভৃতি, মাঃ শ্রীশশিভূষণ মিত্র, কালীপাহাড়ী ৫৲
শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাকুড়পুর ২৲
মিঃ ডি, সি, মুন্সী, এড্ভোকেট, পেগু ৫৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়ালিয়র ১৲
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দাসী, আলিগড় ১০০৲
শ্রীহরেন্দ্র কর্ম্মকার, বীরভূম ১৲
" প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস, সুকচর ২৲
মাঃ শ্রীশশিভূষণ মিত্র, কালীপাহাড়ী ৩৫৲
শ্রীমহেশ্বর দাস, নাগপুর ১০৲
মিঃ জে, ভট্টাচার্য্য এবং হীরালাল দত্ত, কাঁকুড়গাছি, ২৲
লাকুরকা কোলিয়ারীর ইউরোপীয় ও দেশীয়-কর্ম্মচারিবৃন্দ, কাট্রাসগড় ৪৫৲
শ্রীযোগেন্দ্রভূষণ সেন এবং মিঃ টি, ব্যানার্জ্জি, জলপাইগুড়ি ২৲
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহিরচর ১॥০
" মণীন্দ্রনাথ বসু, গড়বেতা ২৲
" অনাথ নাথ মাইতি, অরফুলি ৫৲
" সত্যানন্দ বসু, কলিকাতা
" যতীন্দ্র কুমার গুপ্ত "
" অনন্তকুমার নাগ "
" সুরেন্দ্র নাথ সেন, পাবনা ৩৲
" সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস, শিলচর ২।৵০
মিঃ কে, সি, দত্ত, গায়নঘাট ১৲
ম্যনেজার, নিউ সরতভেক কোলিয়ারি, ঝরিয়া ১০৲
শ্রীবংশীবদন পরামাণিক, শান্তিপুর ১৲
" সুদর্শন সিংহ সেন, বেলনগঞ্জ, আগ্রা ৫৲
" সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঝাঁসী ৫৲
শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান ৫৲
ব্রহ্মচারী দেবচৈতন্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ২০৲
শ্রীবিপিনবিহারী চন্দ্র, ব্যারাকপুর ৫৲
" দুখনাথ সিংহ, কালীপাহাড়ী ৫৲
পণ্ডিত চিতর সিং দোবে, সুলতানপুরা ২৲
সম্পাদক, বেসিন দাতব্য ভাণ্ডার ২৫৲
রায় দুর্গাদাস বসু বাহাদুর, কলিকাতা ২০৲
শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস গুপ্ত, শিলং ১৫৲
শ্রীভোলানাথ ভঞ্জ, বর্দ্ধমান ১॥০
ডাঃ অক্ষয়কুমার সরকার, সর্কারগলি ২৲
শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, হেতমপুর ২৲

শ্রীযুত বি, আর, চ্যাটার্জ্জি, লাহোর ২৲
শ্রীমুকুন্দলাল গোস্বামী, পেগু ১০৲
শ্রীঅবনীকান্ত গুহ দ্বারা সংগৃহীত,
ডি, এল, ও, কলিকাতা ৬।৷০
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, ফরিদপুর ৫৲
মাঃ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ইওকোহামা
স্পিসি ব্যাঙ্ক, কলিকাতা ৪৷৷০
শ্রীশশিভূষণ বসাক, কলিকাতা ১০০৲
,, ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভদ্রেশ্বর ৪৷৷০
,, পুরুষোত্তম প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,
কলিকাতা ৪৲
শ্রীযুত ইউ, এন, মিত্র, ভামো ২৲
,, এস, পি, নিয়োগী, শ্রীনগর ৪৲
মাঃ শ্রীশৈলেন্দ্র সুন্দর মজুমদার,
ঘোড়ামারা ৫৲
,, ,, যোগেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী এবং
,, ভুবনমোহন দত্ত গুপ্ত, বালেশ্বর ৫৲
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, নওগাঁ ৫৲
জনৈক ভগিনী, কিশোরগঞ্জ ৫৲
শ্রীসংগ্রামেশ্বর সিংহ, কেঁচকাপুর ১০৲
শ্রীমতী হেমপ্রভা রায়, পুরুলিয়া ১০৲
শ্রীবিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায়,
কলিকাতা
,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, রাঁচি ২৲
,, গৌরচন্দ্র হালদার, কলিকাতা ৪৲
,, দীনবন্ধু পইথ, শিকারনগর ১০৲
,, দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৲
,, কেদার প্রসন্ন রায়, শিবপুর ৷৷০
সেক্রেটারী, বার এ্যাসোসিয়েসন্, বগুড়া ৩৲
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কর, কলিকাতা ৫৲
,, প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত, ,, ২৲
,, লক্ষণচন্দ্র ঘোষ, চাতরা ১০৲
শ্রীযুত এস, ডি, চ্যাটার্জ্জি, পরান্দপ ৷৷০
শ্রীচারুচন্দ্র পাল, কলিকাতা ৫৲
,, শশিকুমার রায়, রাঁচি ৫৲
মাঃ শ্রীযুত টি, পি, ভট্টাচার্য্য, ন্যাশানাল,
কোল কোং লিমিটেড্ ২৫৷৷৵০
শ্রীযুত জে, মুন্সী কর্ত্তৃক পেগু হইতে
সংগৃহীত ৯৮৲
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু, গড়বেতা ৫৲

শ্রীযুত ডি, পি, বসু মৈমনসিং ২
মাঃ অধ্যক্ষ, বার অ্যাসোসিয়েসন,
জলপাইগুড়ি ৪০৲
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন গুপ্ত, গয়া ১৲
,, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা
১৫৲
,, পান্নালাল সিংহ, হোয়াপ, রঙ্গপুর ২৷৷০
শ্রীযুত আর, কে, ঘোষ, টঙ্গ ২৲
শ্রীচারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ৫৲
,, ললিতমোহন দত্ত, মান্দরা ১৲
শ্রীযুত আর কে, সেনগুপ্ত পরবাদ ১৲
,, টি, বেঙ্কট রাম, গোদাবরী ৪৲
,, রজনীকান্ত তরফদার, কানপুর ১৲
,, শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুর ১০৲
,, প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ
দত্ত রাণাতুলি ২৲
মেসার্স এইচ, ডি, মান্না এণ্ড কোং,
কলিকাতা ১০৪
মাঃ শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিঘাট
১০৲
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে, টেঙ্গরা ১০৲
শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বালেশ্বর ৭
শ্রীনরসিংহদাস আঢ্য, চুঁচুড়া ৫৲
শ্রীযুত ডি, মুখার্জ্জি, ভবানীপুর ৪৲
শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,
গোঁদলপাড়া ২
,, রমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,
পাটুয়াখালি এইচ, ই, স্কুল ১৲
এডওয়ার্ড জর্জ্জ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর
ছাত্রগণ, মধুপুর ২৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১০৲
শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী, দাক্ষিণ বেঁটরা ৫৲
,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ৭৲
বিবেকানন্দ দরিদ্রভাণ্ডার, বরিশাল ৫৲
শ্রীযুত এল, এম, ঘোষ, পেগু ৫৲
মেডিক্যাল স্কুলের কর্ম্মচারী এবং ছাত্রগণ,
মুরাদপুর ৫৫৷৷৵০
শ্রীশশধর সেন, বাগেরহাট ২৲
,, তারকনাথ মিত্র, নারিকেলডাঙ্গা ২৲
পিরোজপুর মোক্তার বারের অধ্যক্ষ ১০৲

নাম	টাকা
শ্রীসত্যচন্দ্র বসু, নাগপুর	২৲
সেক্রেটারী, বেঙ্গলী বয়েজ স্কুল, দিল্লী	৫৲
শ্রীমতী উর্ম্মিলা রায়, সিমলা	৪৷৵০
শ্রীরাসবিহারী মুখার্জ্জি, চুঁচুড়া	৫৲
" বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, বাঁকুড়া	১৲
" হেমচন্দ্র ভৌমিক, সিউড়ি	৪৲
আনন্দকুটীর মেস, জামালপুর	১৷৵০
মাঃ শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীঘাট	২২৲
শ্রীআশুতোষ ধুও, উত্তর বেঁটরা	৫৲
শ্রীযুত এ, কে ঘোষ, কয়ুকটাগা	৫৲
মাঃ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, লাবান	৩৲
সেবকদ্বয়, শিলং	১৬৲
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ভাগলপুর	১৫৲
শ্রীবেণীমাধব মিত্র, বৈদ্যনাথ	১০৲
জনৈক ভদ্র মহিলা, দেওঘর	৫৲
অজ্ঞাতনামা	৫৲
শ্রীযুত কে, পার্থসারথি, আরিমালাম	১৲
" বসন্তকুমার দাস, ঢাকা	৩৲
" রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	৬৷৵০
" সুকুমার মল্লিক, বালি	৪৲
" বিনোদবিহারী রায় বর্ম্মন্, বড়পেটা	২৲
রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, কলিকাতা	১০৲
বর্দ্ধমান রাজকলেজ ইউনিয়ন	৫৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা	১৲
শ্রীভবতারণ সরকার, ইলামবাজার	২৲
চারিটী বন্ধু, গিরিধি	২৲
মাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার, রেঙ্গুণ	২৲
শ্রীযুত পি, সেনগুপ্ত, কলিকাতা	১০৲
" এস, ডি, বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	৩৲
" নাগেশচন্দ্র আগড়ওয়ালা (?)	৫০৲
মাঃ শ্রীচন্দ্রকুমার মজুমদার, শিলং	৮৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত "	১৲
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা	৪৲
" কামাখ্যা রঞ্জন সেন, ঢাকা	১২৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, সাইখিয়া	
" নটবর পাল, কলিকাতা	
" রজনীকান্ত সরকার, নীলফামারী	১৲
শ্রীযুত এন, কে, মিত্র, সাইখিয়া	৫৲
মিঃ ওয়ালেস "	৩৲
" গ্রীন "	১৲
" র‍্যাকষ্ট্রো "	১৲
" উইলিয়াম "	১৲
" অগ্ "	১৲
শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত "	৪৲
" নিকুঞ্জবিহারী দে "	২৲
মিঃ ফুলার টাঙ্গ "	২৲
শ্রীজহরলাল ঘোষ "	২৲
" খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, বড়বাসা	২৲
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফৈজাবাদ	৫৲
" বিহারীলাল নাভা, সিমলাপাহাড়	৫৲
শ্রীহেমন্তকুমার মজুমদার, বিনোদপুর	১০৲
জনৈক ভদ্রলোক, সাইখিয়া	১৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ "	১৲
শ্রীযুত মহবুবল আলম, ফতেহাবাদ	১৲

১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত বাগবাজার উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

নাম	টাকা
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা	২৲
মিঃ এস, চাটার্জ্জি, রাঁচি	২৲
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র, কটক	৫৲
" কেদারনাথ দত্ত, কোয়ালপাড়া	১৲
" হরিধন দে, কলিকাতা	১৲
কুমারী শান্তিবালা ফগু, ঢাকা	২৲
শ্রীসিদ্ধেশ্বর বসু, কলিকাতা	৫৲
" জনরঞ্জন হালদার "	২৲
শ্রীযদুনাথ বসু, এলাহাবাদ	২৲
"রামকৃষ্ণ সেবক", কুষ্টিয়া	৫৲
শ্রীহরিপদ দত্ত, কলিকাতা	৷০
" নগেন্দ্রনাথ রায়, রাঁচি,	১৫৲
মাঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার, ইব্রাহিমপুর	৪৲
শ্রীনগেন্দ্রকুমার দত্ত, কলিকাতা	১২৷৵০
" রাধারমণ সেন, গোরখপুর	১৲
ডাঃ জে, রায়, রায় সাহেব "	৩৲
মিঃ বি, রায়, "	১৲

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, পিঙ্গনা ২৲
শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়, দিতাপুর ৫৲
" সতীশচন্দ্র দে, শিলং ২৲
" ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৲
মেসার্স লছমনদাস পুরকচাঁদ, কলিকাতা ২১৲
শ্রীযুত মূলচাঁদ জয়নারায়ণ " ১১৲
" নাথুরাম হরদেও দাস " ১৫৲
" বংশীধর ভগবান দাস " ১১৲
" বৈজরাজ হুকুমচাঁদ " ১৭৲
উঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ ২০৲
শ্রীযুত আমীচাঁদ চজ্জর " ৪৲
" আনন্দলাল আঢ্য " ৭৲
" রামেশ্বর খেমকা " ১৲
" হুলস চাঁদ মুরলীধর " ৫৲
মাঃ ডাঃ বৈকুণ্ঠবিহারী মিত্র, বাঁকুড়া ১০০৲
বেঙ্গল কেমিক্যাল দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার, কলিকাতা ৮০৲
শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত, গোবরডাঙ্গা ১৲
জনৈকবন্ধু, কলিকাতা ১৲
শ্রীচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৲
" হরিপদ পাল, " ১৲
শ্রীব্রজমোহন মিশ্র, রামপেলা ১।০
" নৃপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেনারস সিটি ৪৲
" কৃষ্ণমোহন বসু, শিবপুর ১৲
সেক্রেটারি বার লাইব্রেরী, আলিপুর ১৫৲
ঐ ২য় দফা ২৫৲
আই, জি, এন, আর কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ, মাঃ শ্রীঅভয়চরণ বিশ্বাস, গোয়ালন্দ ১১৲
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, রাঁচি ৫৲
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীঘাট ১০৲
" ভোলানাথ শীল, কলিকাতা ১৫৲
মাঃ শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, চট্টগ্রাম ১০৲
হরিপাল দরিদ্রভাণ্ডারের সম্পাদক ১৫৲
জনৈক বন্ধু ২৲
রঙ্গপুর নৌতারা এস, এম, এস, ই, স্কুলের ফুটবল ফণ্ড ৫৲
শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র রায় কোম্পানী, বেলিয়াঘাটা ১৲
শ্রীনবীনচন্দ্র রায় " ১৲
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ২০০৲
" সারদাপ্রসাদ দে, দ্বারহাটা ১৲
" মোহিনীমোহন হাজরা, বৈকুণ্ঠপুর ৫৲
" দেবীপ্রসাদ শীল, কলিকাতা ৫৲
মাঃ বেঙ্গলী কাযাধ্যক্ষ ৫৲
শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৲
" সূর্য্যকুমার শীল " ২৲
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় " ১৸০
শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী " ১৲
শ্রীযুত জ্ঞানেশচন্দ্র বসু, কলিকাতা ১৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাহাদুরগঞ্জ ১৲
" হরিবিলাস মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর ২৲
শ্রীমতী প্রিয়বালা সেনগুপ্তা হবিগঞ্জ ২৲
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, গোয়ালপাড়া ১৲
রাঁচির শ্রী শ্রীশচন্দ্র ঘটক কর্ত্তৃক সংগৃহীত ২৩৷৴০
শ্রীযুত এস, কে, বসু, ঘুম ১০৲
জলপাইগুড়ির ছাত্রগণ, মাঃ শ্রীজগদিন্দ্র দেব ৫৲
মাঃ শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, মুরাদপুর ৬০৲
শ্রীযুত ভি, এ, স্বামী, বিনা ৫৲
সেহাড়াগ্রামের কতিপয় অধিবাসী ৭৷০
লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সম্পাদক ৫০৲
শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, মৈমনসিং ১০৲
" অতুলচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ১৷০
খুচরা সংগ্রহ ২।৴০
শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী, কলিকাতা ৫০৲
" সুশীলাবালা দাসী " ২৲
শ্রীমতী মহামায়া দাসী, কলিকাতা ২৲
" দুর্গাবালা দাসী " ২৲

শ্রীমতী উমারাণী দাসী, কলিকাতা	১৲	শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ, যাজপুর	৫৲
„ কমলাবালা দাসী „	।৶০	মান্দ্রাজ টি প্লিকেনের ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংএর জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত	১০৲
„ হৃদয়মোহিনী দাসী „	॥০	শ্রীযুত মঙ্গলময় শ্রীমানি, কলিকাতা	৫৲
জনৈকবন্ধু	২৲	গোবরডাঙ্গার শ্রীদুর্গাচরণ-রক্ষিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত	৪৶০
শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা	১০৲	নোয়াখালি দুর্ভিক্ষ ক্লেশনিবারণ-সমিতির অধ্যক্ষ, কলিকাতা	২০০৲
জনৈক দরিদ্রা ভগিনী, রাণাঘাট	১৲	শ্রীমানবেন্দ্রনাথ বসুর মাতা, কলিকাতা	৫৲
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে, কলিকাতা	১৲		
শ্রীমতী মৃণালনলিনী দাসী „	১৲		
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সাহা „	২৲		

ত্রিপুরা হাজিগঞ্জ কেন্দ্রে প্রাপ্ত।

জনৈক বন্ধু	৩০০০৲	নোয়াখালির ইঞ্জিনীয়ার, টেষ্ট ওয়ার্কের জন্য	৫০৲
নোয়াখালি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান	১০০০৲	জনৈক ডাক্তার, চাঁদপুর	২৲
মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন	২০৲	রামগঞ্জের দুর্ভিক্ষকেন্দ্রে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ল্যাঙ্গ কর্ত্তৃক প্রদত্ত	২০৲
শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র, বাবু অভয়চরণ মিত্রের জমীদারী হইতে, অনগঞ্জ	৫০৲		

প্রাপ্ত দ্রব্যাদি।

শ্রীদেবীপ্রসাদ শীল	৩৫ খানি নূতন কাপড়	শ্রীহরিচরণ দে ...	১০টী হোমিও ঔষধ
নানা ব্যক্তি প্রদত্ত	১৪ খানি কাপড়	শ্রীমোহিনীমোহন হাজরা ...	৯টী ঔষধ

দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে যিনি যাহা দান করিবেন, অর্থ হউক অথবা নূতন বা পুরাতন বস্ত্র হউক, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে, এবং উহার প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবেঃ—(১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ, জেলা হাওড়া, (২) উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

নিবেদক

১০ই আষাঢ়। সারদানন্দ।

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন।
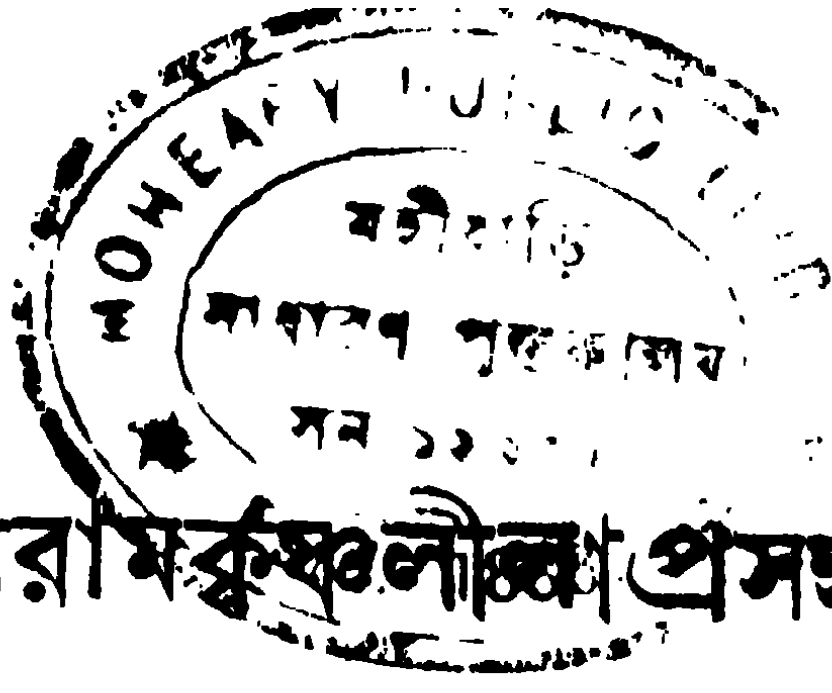
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ।

(স্বামী সারদানন্দ)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুত কেশবচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ, চিরঞ্জীব, অমৃতলাল, গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি নেতাসকলে ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও সঙ্গলাভে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগরূপ আদর্শের মহত্ত্ব বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে অনেকটা বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের সংসর্গে আসিয়া অপরোক্ষ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কি কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের অনেকে ঐ কথায় 'না' শব্দ উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারের সর্ব্বত্র আদান-প্রদানের নিয়ম চির-বর্ত্তমান। একান্ত অনভিজ্ঞ, তরলমতি বালককে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া কোন্‌ভাবে উপদেশ দিলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি উপদিষ্ট বিষয় শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে, তাহার পূর্ব্বসংস্কারসমূহ ঐ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার পথে কতদূর সহায় বা অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, এবং তৎসমুদায়ের অপনোদনই বা কিরূপে হওয়া সম্ভব ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা শিক্ষা করিয়া-থাকি। অতএব পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষারূপ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া ঠাকুর যে কিছুই শিক্ষা করেন নাই, এ কথা বলা নিঃসংশয় যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদিগের ধারণা সেজন্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমরা বলি, ব্রাহ্মসমাজ ও সঙ্ঘকে নিজ অলৌকিক সাধনলব্ধ ভাব ও আধ্যা-ত্মিক প্রত্যক্ষসমূহ প্রদান করিতে যাইয়া ঠাকুর অনেক কথা স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব উহার ফলে তিনি কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এখানে কর্ত্তব্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে আসিবার পূর্ব্বে ঠাকুর পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষার প্রভাব হইতে বহুদূরে নিজ জীবন যাপন করিতেছিলেন। পুণ্যবতী রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার নিকটে এ পর্য্যন্ত যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই তিনি সকাম প্রবৃত্তিমার্গে অথবা ভারতের সনাতন, 'ত্যাগেন একে অমৃতত্বমানশুঃ' রূপ আদর্শ অবলম্বনে জীবন পরিচালিত করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট দেখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত মথুরানাথকে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন-প্রকৃতিসম্পন্ন দেখিতে পাইলেও উক্ত ভাবে শিক্ষিত প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনই যে ঐরূপ বিপরীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, এ কথা ধারণা করিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। কারণ, তাঁহার পুণ্য-সঙ্গলাভে মথুরানাথের প্রকৃতি স্বল্পকালেই পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ বিষয়ে চিন্তা করিবার তাঁহার আবশ্যকতাই হয় নাই। অতএব ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে আসিয়া, এবং ধর্ম্মলাভে সচেষ্ট হইলেও ভারতের প্রাচীন ত্যাগাদর্শ হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত দেখিয়াই তাঁহার মন উহার কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা বর্ত্তমান ভারতবাসীর জীবনে কিরূপ বিপরীত ভাবরাশি আনয়ন করিতেছে, তদ্বিষয়ের পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঠাকুর বোধ হয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন্ত ও সাক্ষাৎ উপলব্ধ ধর্ম্মভাবসকলের পরিচয় পাইয়া কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ স্বল্পকালেই ঐ সকল সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াও যখন তাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাব ছাড়াইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল, উক্ত প্রভাব তাঁহাদিগের মনে কতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন, পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মনীষিগণ ইঁহাদের অন্তরে গুরুর স্থান চিরকালের নিমিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের ভাব ও কথার সহিত না মিলাইয়া ইঁহারা ভারতের আপ্তকাম ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল কখনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্যই ঠাকুর ইঁহাদিগকে উপদেশ দিবার পরেই বলিতেন, 'আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যাজা-মুড়া বাদ দিয়া (সারভাগ)

গ্রহণ কর।' ইঁহাদিগের ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তিনি ইঁহাদিগকে ঐরূপে স্বাধীনতা প্রদান করাতেই ইহারা তাঁহার ভাব ও প্রত্যক্ষসকল যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতের ঋষিদিগের সমষ্টীভূত ভাবঘনমূর্ত্তি ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। কারণ, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাকেই যিনি জগতের সর্ব্ববিধ ঘটনার হেতু বলিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক যিনি আপনাকে সর্ব্বাবস্থায় পরিচালিত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, সংসারের কোন ঘটনা তাঁহাকে কখনও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঐশী শক্তি মায়া নিজ স্বরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অচল অটল শান্তির অধিকারী করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই ভারতে পাশ্চাত্যভাবপ্রবেশ এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই ব্রাহ্মপ্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যভাবের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হওয়ার কথা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐরূপ দুর্ব্বলতায় বিরক্তি প্রকাশ অথবা তাঁহাদিগকে নিজ অপার স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিবেন কিরূপে? সুতরাং, ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের ইঁহারা যতটা পারেন লউন, কালে শ্রীশ্রীজগদম্বা এমন লোক আনয়ন করিবেন—যিনি উক্ত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবেন, এ কথা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

আবার, ব্রাহ্মগণ তাঁহার সকল কথা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলের অংশমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। কিন্তু, ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগ না করিলে তাঁহার পূর্ণদর্শন কখনই লাভ হইবে না—যত মত তত পথ—প্রত্যেক পথের চরমেই উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদত্ব প্রাপ্তি—মন মুখ এক করাই সাধন—এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া নিরন্তর সদসৎ বিচারপূর্ব্বক সংসারের সকল কর্ম্মফল কামনারহিত হইয়া সম্পন্ন করাই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার পথ, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক জগতের সকল গূঢ় তত্ত্বই তিনি তাঁহাদিগের নিকটে সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেন। কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে দেহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হওয়া এবং আধ্যাত্মিক

রাজ্যের সূক্ষ্ম উপলব্ধিসকল প্রত্যক্ষ করা কখনও সম্ভবে না, এ কথা শ্রীযুত কেশব-প্রমুখ কাহাকেও কাহাকেও বুঝাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে তৎকরণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপে সকল কথা বারম্বার বলিয়া বুঝাইবার পরেও অনেকের ঐ সকল ধারণা হইতেছে না দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইলে হৃদয়ে নূতন ভাব গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব, "কাঁটি উঠিবার পরে পাখীকে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম শিখাইতে প্রয়াস করিলে প্রায়ই উহা ব্যর্থ হয়," এবং পাশ্চাত্যের ইহকালসর্ব্বস্ব জড়বাদের প্রভাবেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, রূপরসাদি ভোগের ভাব যাহাদিগের মনে একবার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, ভারতের সনাতন ত্যাগাদর্শ গ্রহণপূর্ব্বক তাহারা কখনও উহা জীবনে সম্যক্ পরিণত করিতে পারিবে না। সেজন্যই তাঁহার প্রাণে এখন ব্যাকুল-প্রার্থনার উদয় হইয়াছিল, 'মা তোর ত্যাগী ভক্তদিগকে আনিয়া দে, যাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোর কথা বলিয়া আনন্দ করিতে পারি!' অতএব দৃঢ়সংস্কারবিহীন বালকদিগের মনই তাঁহার ভাব ও কথা সম্পূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক উহাদিগের সত্যতা উপলব্ধি করিতে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইবে, এ কথা ঠাকুর এখন হইতে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, বলিলে যুক্তি-বিরুদ্ধ হইবে না।

সে যাহা হউক, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃগণ ঠাকুরের অভিনব আধ্যাত্মিক ভাব যতদূর গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহার ফলে তাঁহাদিগের ভিতর যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিতে কলিকাতার জনসাধারণের বিলম্ব হয় নাই। আবার, কেশবপ্রমুখ ব্যক্তিগণ যখন ব্রাহ্মমণ্ডলী-পরিচালিত সংবাদপত্রসকলে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মতের অলৌকিকত্ব এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাণীসকলের কিছু কিছু প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন কলিকাতার জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পুণ্যদর্শন-লাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্ত-সকলে ঐরূপেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীযুত কেশবের সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের প্রায় চারি বৎসর পরে সন ১২৮৫ সালের, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত মনোমোহন মিত্র নামক ঠাকুরের গৃহস্থ

ভক্তদ্বয় কেশব-পরিচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার কথা পাঠ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ইহাদিগের জীবনে কিরূপ যুগান্তর ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুত রামচন্দ্র তৎকৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' শীর্ষক পুস্তকে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে এ কথা বলিলেই চলিবে যে, ঈশ্বরার্থে কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ঠাকুরের জীবনাদর্শ সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রভাবে ত্যাগের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। গুরু ও ইষ্টের জন্য দুঃখোপার্জ্জিত অর্থব্যয় দেখিয়া গৃহী ব্যক্তির ভক্তিবিশ্বাসের তারতম্য অনেকাংশে নিরূপণ করিতে পারা যায়। প্রথমে গুরু এবং পরে ইষ্ট স্থানে ঠাকুরকে বসাইয়া শ্রীযুত রামচন্দ্র, তাঁহাকে ও তদ্ভক্তসকলকে কলিকাতার শিমলা নামক পল্লীস্থ নিজ-ভবনে পুনঃ পুনঃ আনয়ন পূর্ব্বক উৎসবাদিতে যেরূপ অকাতরে ব্যয় করিতেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইত, তাঁহার বিশ্বাসভক্তি ক্রমে কত গভীরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে কখন কখন বলিতেন, "রামকে এখন এত মুক্তহস্ত দেখিতেছ, যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখন এমন কৃপণ ছিল যে, বলিবার নহে; এলাচ আনিতে বলিয়াছিলাম, তাহাতে একদিন এক পয়সার শুক্‌নো এলাচ আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিল! রামের স্বভাবের কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ইহা হইতে বুঝ।"

ঠাকুর যখন আপনার জ্ঞানে রাম ও মনোমোহনকে নিজ অভয় আশ্রয়ে চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অহেতুক করুণার অধিকারী হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কতদূর কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। সংসারে ঐরূপ আশ্রয় যে কখনও পাওয়া সম্ভব, এ কথা তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সুতরাং তাঁহারা যে এখন নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সকলকে উক্ত আশ্রয় গ্রহণ করাইতে প্রয়াসী হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দেখিতেও পাওয়া যায়, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের বৎসরকাল পরেই তাঁহারা নিজ নিজ আত্মীয় পরিজনবর্গকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ঐরূপে

সন ১২৮৭ সালের শেষভাগ ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের লীলাসহচর ত্যাগী ভক্তবৃন্দেরা একে একে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে সুপরিচিত স্বামী ব্রহ্মানন্দই ঠাকুরের নিকটে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বজীবনে ইঁহার নাম শ্রীরাখালচন্দ্র ছিল, শ্রীযুত মনোমোহনের ভগ্নীর সহিত ইনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উক্ত বিবাহের স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "রাখাল আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার পুত্র'!—শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম,—'সে কি?—আমার আবার ছেলে কি?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম, এই সেই বালক!"

শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে অন্য এক সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন চার বছরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া নিঃসঙ্কোচে ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে স্তনপান করিত! বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না! তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, সে জন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপের জমিদারী, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল; প্রথম প্রথম নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল—যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে; পরে যখন দেখিল, এখানে ধনী, বিদ্বান্ লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ খাতির যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।

"শ্বশুর-বাড়ীর তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা সম্বন্ধে কখনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ, মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা, সকলের এখানে আসা যাওয়া ছিল। রাখাল আসিবার কিছুকাল পরে যে দিন মনোমোহনের মাতা

রাখালের বালিকা বধূকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিল, সে দিন মনে হইল, বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত ?—ভাবিয়া, তাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম এবং বুঝিলাম, ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্ম্মপথের অন্তরায় কখনও হইবে না। তখন সন্তুষ্ট হইয়া নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে) বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যেই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, সেই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি!—তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না! তখনি বলিয়াছিলাম কিন্তু, বড় হইলে তাহার এই বালকের ন্যায় ভাবটি আর থাকিবে না।

"অন্যায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন কালীঘর হইতে প্রসাদী মাখম আসিলে সে ক্ষুধিত হইয়া আপনিই উহা লইয়া খাইয়াছিল। তাহাতে বলিয়াছিলাম, 'তুই ত ভারি লোভী, এখানে আসিয়া কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করিবি, তাহা না হইয়া আপনি মাখম লইয়া খাইলি ?' সে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল ও আর কখনও ঐরূপ করে নাই।

"রাখালের মনে তখন তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল! তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না! অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। আমার তাহাতে কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) যাহাদের এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।

"এখানে আসিবার প্রায় তিন বৎসর পরে রাখালের শরীর অসুস্থ হওয়ায় সে বলরামের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিল। উহার কিছু পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তখন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'মা, ও (রাখাল) ছেলেমানুষ, বুঝে না, তাই কখন কখন অভিমান করে, যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান হইতে কিছু দিনের

জন্য সরাইয়া দিস্, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস্।' উহার অল্পকাল পরেই তাহার বৃন্দাবনে যাওয়া হয়।

"বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল! যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সে জন্য ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন। ঐরূপে রাখালের সম্বন্ধে মা কত সময়ে কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা আবার বলিতে নিষেধ আছে।"*

ঐরূপে ঠাকুর তাঁহার প্রথমলব্ধ বালকভক্তসম্বন্ধে কত সময় কত কথা বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মা তাঁহাকে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক ধীর গম্ভীর সাধকশ্রেণীভুক্ত হইয়া ক্রমে ঈশ্বরার্থে সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ঠাকুরের ইচ্ছায় ইনি এখনও সশরীরে বিদ্যমান থাকিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধন করিতেছেন। অতএব ইঁহার সম্বন্ধে এখন অধিক কথা বলা উচিত নহে ভাবিয়া আমরা এখানে নিরস্ত হইলাম।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের তিন চারি মাস পরেই পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

(ক্রমশঃ)

* শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাসকল ঠাকুর একসময়ে আমাদিগের নিকটে না বলিলেও পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা ঐ সকল এখানে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া দিলাম।

সাধনভজন ও জীবসেবা।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

কোন ব্যক্তি নির্জ্জনে বসিয়া দিনরাত ঈশ্বরের নাম করিতেছে, আবার কেহ বা ঈশ্বরসাধনায় একেবারে মন না দিয়া সর্ব্বদা পরোপকারে—সর্ব্বদা জীবসেবায় নিযুক্ত আছে, এই দুই জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? কোন্ পন্থা প্রথম অবলম্বনীয়? অগ্রে ঈশ্বরসাধনা করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া যথার্থভাবে জীবসেবায় অগ্রসর হওয়া যায়, অথবা অগ্রেই পরোপকার-ব্রতে—জীবসেবাব্রতে দীক্ষিত হইতে হয়,—এই ভাবের প্রশ্ন আজকাল অনেক ধর্ম্মসাধনেচ্ছু ব্যক্তি করিয়া থাকেন। এই প্রশ্নের যথার্থ মর্ম্ম ও উহার উত্তর-স্বরূপে আমরা যতটা বুঝিয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যথাসাধ্য আলোচনার চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাক, আমাদের জীবনটার উদ্দেশ্য কি? কোন্ লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জীবনের জটিল বর্ত্মে অগ্রসর হইতেছি? আমাদের সকল শাস্ত্রই এই প্রশ্নের উত্তরে একবাক্যে বলিয়া থাকেন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মলাভই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা। মানব সংসারে অনিত্য বস্তুতে চিরদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তাই তাহার প্রাণ এমন এক বস্তু চায়, যাহাকে পাইলে সে চিরতরে শান্তি-সমুদ্রে অব-গাহন করিবে—যাহাকে পাইলে সে ত্রিতাপের জ্বালা একেবারে জুড়াইবে। কিন্তু তাহার উপায় কি? তাহার পথ কি? শাস্ত্রই বলিতেছেন, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বিভিন্নপথের যে কোন একটা পথকে ধরিয়া তুমি সেই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে পার। আবার কোন কোন স্থলে এই সকল যোগের একতরকে মাত্র আশ্রয় না করিয়া ইহাদের মধ্যে দুইটী বা ততোধিক কিংবা সমুদয়গুলি একত্র বা ক্রমে ক্রমে অবলম্বনেরও উপদেশ পাওয়া যায়। এক্ষণে এই যোগগুলি কি, একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। তাহা হইলেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর আপনিই সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে।

জ্ঞানযোগ আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়?—জ্ঞানযোগ বলে একজ্ঞানই জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান। আমরা যখন জ্ঞানের অতি নিম্নতম সোপানে অবস্থিত

থাকি, তখন আমরা জগতে বহু বিভিন্ন বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি—ঘটী, বাটি, টেবিল, চেয়ার, বাড়ী, ঘর-দুয়ার, মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি। জ্ঞানের তখনই উন্মেষ বা প্রারম্ভ বলা যায়, যখন এই সকল বিভিন্ন পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করা হয়। আমরা একটা বস্তু দেখিলাম, উহা শৃঙ্গ-খুরবিশিষ্ট চতুষ্পদ; আবার কিছুদূর যাইতে না যাইতে আর একটা তথাবিধ বস্তু দেখিলাম। এইরূপ বিভিন্ন 'ব্যক্তি' দেখিতে দেখিতে সহসা আমাদের মনে উদয় হয়, এই বিভিন্ন 'ব্যক্তি'গুলি এক'জাতীয়',—এইগুলি 'গো'। আমাদের 'গো' জ্ঞান হইল। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা মানবের স্বভাবসিদ্ধ। অতি অসভ্য অবস্থার ভিতরও মানুষ চলিতে ফিরিতে বসিতে শুইতে সর্ব্বদা এই শ্রেণীবিভাগ করিতেছে। যখন সে একটু উন্নত সভ্যপদবীতে আরূঢ় হয়, তখন সে এই শ্রেণীবিভাগই শৃঙ্খলাপূর্ব্বক করিতে থাকে এবং জ্ঞানরাজ্যে বিবিধ বিদ্যার সৃষ্টি করে। প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন, ভূতবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এই সকল বিদ্যাই মানবের এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ-চেষ্টারই এক একটী বিশিষ্ট ফলমাত্র। ক্রমে এই সকল বিভিন্ন বিদ্যা লইয়াও মানব তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহার প্রাণে তখন স্বতঃ এই প্রশ্ন জাগরিত হয় যে, 'কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে আমরা এই সমুদয় বস্তুরই জ্ঞান লাভ করিতে পারি? এমন কি বস্তু আছে, সমুদয় বস্তুই যাহার বিভিন্ন প্রকাশ? এই প্রশ্নের উত্তরেই ব্রহ্মবিদ্যার উদ্ভব—এই প্রশ্নই জ্ঞানযোগের মূলসূত্র এবং উহার চরম উত্তর—একজ্ঞানই জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান।

সাধারণ বিদ্যায়—আমরা বিদ্বান্ কাহাকে বলি? সাধারণ লোকে যাহাকে জল বলেন, একজন রসায়নবিৎ তাহাকে রসায়নবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে H_2O বলিয়া জানেন। তিনি হীরকখণ্ড ও কয়লাকে এক জিনিস বলিয়া জানেন। তিনি জগৎকে কতকগুলি মূলবস্তুতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন—তিনি যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই সেই মূলবস্তুগুলিরই বিভিন্ন সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা কি এখানেই তৃপ্ত হয়? তাঁহার অনুসন্ধান এমন এক বস্তুর আবিষ্কার—যাহাকে পাইলে তাহা হইতে সমুদয় তথাকথিত মূল পদার্থের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। প্রাচীন রসায়ন বা

Alchemy বা কিমিয়া বিদ্যার লক্ষ্য ছিল, নিম্নশ্রেণীর ধাতু যথা তাম্র প্রভৃতি হইতে উচ্চশ্রেণীর ধাতু যথা স্বর্ণাদির সৃষ্টি কিরূপে হইতে পারে? বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক্ষণে এই অনুসন্ধানকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিলেও ইহাই যে আধুনিক রসায়নবিদ্যার উৎপত্তির কারণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর কে বলিল, বর্ত্তমান রসায়নবিদ্যাই আর এক পদবী উন্নত হইলে সেই প্রাচীন অনুসন্ধানেই আবার অগ্রসর হইবে না? ইহার মূলে যে সেই মানবের স্বাভাবিক জ্ঞানপিপাসা বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতেছ না?—সেই এক পদার্থের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা, যাহা হইতে সমুদয়ের উদ্ভব? আধুনিক Evolution বা পরিণাম বা ক্রমবিকাশবাদের ভিত্তি কি? সমগ্র জগৎকে এক মূল বস্তু হইতে রূপান্তরিত দেখাইবার চেষ্টা নহে কি? প্রাচীন ও আধুনিক—প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সর্ব্ববিধ দর্শনশাস্ত্রের মূল অনুসন্ধানের বিষয় কি? আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত ষড়্‌দর্শনের কথাই ধর। গৌতম কণাদের জাতিদ্রব্যগুণ, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতি হইতে অগ্রসর হইয়া সাংখ্যের সেই অপূর্ব্ব প্রকৃতিতত্ত্ব—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতত্ত্ব—সর্ব্বত্র সেই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের—কি প্রাণিজগতে, কি জড়জগতে সর্ব্বত্র—এই তিনের সাম্য ও বৈষম্যময়ী লীলা দর্শন কর। আরও অগ্রসর হইয়া বেদান্তে উপনীত হও—দেখ, এখানে আর দ্বৈত নাই—একেরই লীলা—একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্ব। অপূর্ব্ব সমন্বয়ে জীবজগৎ, এমন কি, জীবজগতের স্রষ্টা ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত এক মহা-সত্তাসামান্যে পর্য্যবসান করা হইয়াছে। অদ্বৈতের এই শিরোঘূর্ণনকারী উচ্চচূড়ায় আরোহণে অনেক মনীষীরই মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছে—অনেকেই দ্বৈত-সমতলে কতকটা নামিয়া আসিয়া মানবসুলভ একটা আপোসের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মানবের স্বাভাবিক অদম্য জ্ঞানপিপাসা তাহাকে ইতিহাসে বহুবার সেই উচ্চ অদ্বৈতগিরিচূড়ায় আরোহণ করিতে, তাহার পবিত্র বায়ুর প্রাণপ্রদ নিঃশ্বাস লইতে প্রোৎসাহিত ও প্রলোভিত করিয়াছে।

এই অদ্বৈত অবস্থালাভই জ্ঞানযোগ—এই চরম একত্বানুভূতির প্রাণপণ চেষ্টাই জ্ঞানযোগ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের বিমলহৃদয়ে এই তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি তত্ত্বের স্ফুরণ; সাধারণ জীব—উহার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করুক—ইহাই জ্ঞানযোগের কথা—ইহাই সর্ব্বসাধারণের

নিকট জ্ঞানযোগের অপূর্ব্ব ঘোষণা। জীবজগৎকে যে দৃষ্টি হইতে পৃথক্ দেখিতেছ, তাহা মিথ্যা, তাহা মায়া। তত্ত্বদৃষ্টিতে জীব-জগৎ বলিয়া কিছু নাই—তত্ত্বদৃষ্টিতে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং, সেই ভূমা নিজ মহিমায় নিজে বিরাজ করিতেছেন। হে জীব, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হও, সদ্‌গুরুগণের নিকট প্রণিপাত, সেবা ও পরিপ্রশ্নের দ্বারা সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার কর। সেই মহাসমন্বয় জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া যাও। আমিই সব—

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' – (১)

'যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥' (২)

এই জ্ঞানযোগের সাধনায় ধীরে ধীরে আত্মতত্ত্ব বিচার করিতে হয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, সমাধি-অবস্থার বিচার করিতে হয়—পঞ্চকোষের বিচার করিতে হয়, পরমাণুবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিগুণবাদ, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ, বিবর্ত্তবাদের বিচার করিতে হয়—প্রাতিভাসিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য, পারমার্থিক সত্যের বিচার করিতে হয়—স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদের বিচার করিতে হয়, ব্যষ্টি সমষ্টির সম্বন্ধের বিচার করিতে হয়, সেই জগৎকারণের তুরীয়াবস্থা বা ব্রহ্মতত্ত্ব, কারণাবস্থা বা ঈশ্বরতত্ত্ব, সূক্ষ্মাবস্থা বা হিরণ্যগর্ভতত্ত্ব এবং স্থূলাবস্থা বা বিরাট্‌তত্ত্বের বিচার করিতে হয়, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধনপ্রণালীর বিচার করিতে হয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্বের বিচার করিতে হয়—আর এই সকল বিভিন্ন বিচারের ফলে এক অদ্বৈতামৃতেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। এই আধ্যাত্মিক সমুদ্রমন্থনে সময়ে সময়ে হলাহলেরও উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এই জ্ঞান-সমুদ্রমন্থনে মানবের চেষ্টার বিরাম নাই—কারণ,মানব সদাই অমৃতপ্রয়াসী—অমৃতত্বলাভের কি উপায়, তাহাতে কি গ্রহণ করিতে হয়, কিই বা ত্যাগ করিতে হয়, এই চেষ্টাই মানবের সর্ব্বক্ষণ। এই জ্ঞানযোগসাধন মানবকে সংসার-বিমুখ সন্ন্যাসী করিয়াছে, তাহাকে গিরিগুহানিবাসী করিয়াছে, তাহাকে ফলমূলাহারী

(১) আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ ও এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায়।—গীতা।

(২) যে অবস্থায় জ্ঞানবান্ ব্যক্তির সমুদয় ভূতই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শীর সেই অবস্থায় মোহ ও শোক কোথায় থাকে?—ঈশোপনিষৎ।

করিয়াছে এবং তাহার ফলে সকলে সিদ্ধির চরমশিখরে আরোহণ করিয়া জ্ঞানামৃতে তৃপ্ত না হউন, অনেককে সেই পরম পথের পথিক, পরম পথের যাত্রী করিয়াছে। অনেকে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্মহারা হইয়াছেন, আবার অনেকে সেই অমৃতের একবার আস্বাদন পাইয়া, উন্মত্ত হইয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে সেই অমৃত আস্বাদন করিবার জন্য তারস্বরে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন —

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
* * * *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥' (১)

নামরূপের গণ্ডী ভেদ করিয়া, অস্তি ভাতি প্রিয় সাগরে অবগাহন করিয়া অদ্বৈতকেশরীর কর্ণবধিরকারী গর্জ্জনে সর্ব্বজাল ছিন্ন করিয়া শেষে সর্ব্বজগৎকে সেই অমৃত পান করাইতে, 'সর্ব্বভূতহিতে রতঃ' হইয়া সর্ব্বজীবের সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন।

এখন ভক্তিযোগের তত্ত্ব কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক—

'অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥' (২)

এক বিরাট্ পুরুষ—পরম্ মহিমাময় অথচ পরম সুন্দর—তাঁহার সৌন্দর্য্যে

(১) হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর * * আমি সেই পরম পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি আদিত্যবর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করে; মুক্তির আর অন্য পথ নাই।
—মুণ্ডকোপনিষৎ।

(২) অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার চক্ষু, দিক্‌সমূহ তাঁহার কর্ণ, বেদসমূহ তাঁহার বাগিন্দ্রিয়, বায়ু তাঁহার প্রাণস্বরূপ, সমুদয় জগৎ তাঁহার অন্তঃকরণ, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয় হইতে উৎপন্ন, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ।—মুণ্ডকোপনিষৎ।

জীব আত্মহারা হও, মুগ্ধ হও—ভক্তির চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দর্শনে তৃপ্ত হও।

'পাতালমেতস্য হি পাদমূলং
হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া।' (১)

সেই 'সহস্রশীর্ষাঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' পুরুষের—সেই 'সর্ব্বাননশিরোগ্রীব' ভূমা পুরুষের মহিমায় ও সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হও। একান্ত তাহা না পার—সেই সর্ব্বাবতারবীজ আত্মপুরুষ হইতে নিঃসৃত, শক্তি-মহত্ত্ব-সৌন্দর্য্যের নিলয়স্বরূপ অবতারবিশেষ সকলের অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হও।

প্রলয়পয়োধিজলে আত্মপুরুষ বিষ্ণু শয়ান, তদীয় নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত রজস্তমোরূপী মধুকৈটভ সেই জীবরূপী ব্রহ্মাকে ভক্ষণোদ্যত, তখন তিনি সেই যোগনিদ্রারূপিণী আদ্যাশক্তির—যাঁহার বলে আচ্ছন্ন হইয়া বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত, তাঁহার—

'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা' (২)

বলিয়া অপূর্ব্ব স্তুতি করিয়া তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিতেছেন, ব্রহ্মার স্তবে প্রকাশ্যা সেই—

'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী পরাপরাণাং পরমা'(৩) দেবীর ভাবে হে ভক্ত, একবার বিভোর হও। অথবা মহিষাসুরের উৎপাতে দেবগণ বিব্রত হইয়া যখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, যখন বিভিন্ন দেবগণের শরীরনিঃসৃত তেজে—

'একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা' (৪)

(১) পাতাল সেই বিশ্বরূপ ভগবানের পাদমূলস্বরূপ, সমস্ত প্রাণীর উন্মাদকারিণী মায়া তাঁহার হাস্যস্বরূপ।—শ্রীমদ্ভাগবত।

(২) চণ্ডীতে ব্রহ্মাকৃত দেবীস্তবের প্রারম্ভ—
তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা এবং তুমি বষট্ এই সকল বৈদিক মন্ত্রস্বরূপিণী।

(৩) চণ্ডীতে ব্রহ্মাকৃত দেবীস্তুতির অংশ—
তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, সমুদয় সৌম্য বা শান্ত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে অতি মনোহর-রূপা, তুমি শ্রেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ।

(৪) দেবগণের শরীর হইতে নির্গত সমুদয় তেজ, যাহা ত্রিলোকীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সমুদয় একত্র হইয়া এক নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল।—চণ্ডী।

সেই অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তিকে—সেই মুহুর্মুহুঃ অট্টাট্টহাসকারিণী দেবীকে একবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ কর—সেই অরুণলোচনা, মহিষাসুরনিধনোদ্যতা, মধুপান-কারিণী দেবীর সৌম্যা অথচ অতিভীষণা মূর্ত্তির একবার ধ্যান কর।

আবার দেখ আর এক দৃশ্য—শুম্ভনিশুম্ভ বলপূর্ব্বক দেবাধিপত্য কাড়িয়া লইয়াছেন—দেবগণ ভয়কাতর হইয়া পরমভক্তিভরে দেবীর স্তুতি করিতেছেন—দেবী আজ পরমমনোহরা ভুবনমোহিনীরূপ ধরিয়া জাহ্নবীসলিলে স্নানার্থ আবির্ভূতা। দূতবাক্যে সেই স্ত্রীরত্নের বিষয় অবগত হইয়া শুম্ভ অম্বিকার নিকট দূত পাঠাইয়াছেন—দূত গিয়া শুম্ভাজ্ঞা নিবেদন করিলেন—

'স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্।
স ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্॥' (১)

তখন সেই দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা হইয়া—সেই দেবী—সেই

'দুর্গা ভগবতী ভদ্রা—যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' (২)

কি বলিতেছেন—একবার দিব্যকর্ণে শ্রবণ কর—

'শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা।
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥' (৩)

সেই দেবীর সেই তেজোদৃপ্ত মুখমণ্ডল একবার ধ্যাননেত্রে দেখিয়া বিভোর হও।

আবার যখন তাঁহার শরীর হইতে বৈষ্ণবী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী প্রভৃতি শক্তি-গণ নিঃসৃতা হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন, তখন শুম্ভ বলিতেছেন,—

(১) হে দেবি, আমরা তোমাকে জগতের সকল স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপিণী (শ্রেষ্ঠা) বলিয়া মনে করি, অতএব তুমি আমাদিগের নিকট আইস, যেহেতু, আমরা জগতের সমুদয় রত্নভোগের অধিকারী।—চণ্ডী।

(২) সেই ভগবতী (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী) ভদ্রা (কল্যাণী) দুর্গা (যাহাকে অতি দুঃখে লাভ করা যায়), যিনি এই সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।—ঐ।

(৩) আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা শুন—যিনি আমায় সংগ্রামে জয় করিবেন, যিনি আমার দর্প দূর করিবেন, যিনি বলে আমার সমকক্ষ, তিনিই আমার স্বামী হইবেন।—ঐ।

'বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী।' (১)

দেবী ইহার উত্তরে—

'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।' (২)

বলিয়া নিজাঙ্গে তাঁহার সর্ব্ববিভূতি উপসংহার করিয়া লইলেন—সেই একে বহুর বিলয়, বহুর একে পরিণতির দৃশ্য ও একবার ধ্যাননেত্রে সাক্ষাৎকার কর।

আবার দেখ, তোমার চক্ষের উপর দিয়া দশমহাবিদ্যামূর্ত্তি এক এক করিয়া আবির্ভূতা আবার অন্তর্হিতা হইতেছেন—এই নগ্না, আলুলায়িতকেশা, লোল-জিহ্বা, ভীষণা কালীমূর্ত্তি, আবার ঐ প্রত্যালীঢ়পদা ব্যাঘ্রাম্বরা তারা, ঐ যে আবার বৃদ্ধা ধূমাবতীমূর্ত্তি, ওঃ কি ভীষণ—ছিন্নমস্তা—নিজ মস্তক নিজে ছিন্ন করিতেছেন, উহা হইতে নিঃসৃত রক্তধারা ডাকিনী বর্ণিনী উভয়ে পান করিতেছেন—পদতলে বিপরীতরতা যুগলমূর্ত্তি—আবার সিংহাসনস্থা কমনীয়া কমলাদেবীর বিভিন্নভাবযুক্তা এই সকল বিভিন্নমূর্ত্তি দেখিয়া, অথবা সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যস্থা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নের অধিষ্ঠাত্রী কুমারী, যুবতী ও বৃদ্ধারূপ দেখিয়া ভাবে বিভোর হও।

আবার অন্য দৃশ্য—

ঐ যে রজতগিরিনিভ, পরশুমৃগবরাভীতিহস্ত, ফণিভূষণ, শশধরতিলকভাল, জটাজূটধারী, বাঘাম্বর, পদ্মাসীন, দেবদেবমূর্ত্তি—উনি কে? শ্মশানে মশানে বাস—ভূতপ্রেত সঙ্গ, জগতের প্রতি করুণায় তীব্র হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ—উনি সেই মহাযোগী মহেশ্বর—সদা ধ্যানে মগ্ন—কাহার ধ্যানে তিনি মগ্ন?

(১) হে দুর্গে, তুমি নিজ বলের অহঙ্কারে অহঙ্কৃতা ও অতি দুষ্টস্বভাবা, তুমি অহঙ্কৃতা হইও না, কারণ, তুমি অতি মানিনী হইলেও অন্য শক্তিসকলের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ।—চণ্ডী।

(২) জগতে আমিই একমাত্র অবস্থিত আছি, আমা ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে আছে? হে দুষ্ট, দেখ, এই আমার বিভূতি বা শক্তিগণ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।—ঐ।

'স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং।
কেনাপি কামেন তপশ্চচার॥' (১)

তিনি আত্মধ্যানে বিভোর হইয়া—

'অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্। (২)

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এদিকে নন্দী আশ্রমের দ্বারদেশে বেত্রহস্তে পরিক্রমণ করিয়া ধ্যানবিঘ্ন নিবারণ করিতেছেন—ধ্যানপরায় আশ্রমপদ 'নিভৃতদ্বিরেফং'(৩) হইয়াছে—

এমন সময়ে দেবাদেশে মদনের পঞ্চশরযোজনা—মহাদেবের সাময়িক ধ্যানভঙ্গ—পুনরায় ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া মদনকে উহার কারণ অবগত হওয়া এবং তখনই

'ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥' (৪)

সেই দেবদেবের পবিত্র ক্রোধোদ্দীপ্ত বদনমণ্ডলের একবার ধ্যান কর

তপস্যায় কৃশা অপর্ণা জটাবল্কলপরিহিতা হইয়া তীব্রতর তপস্যা আশ্রয় করিয়াছেন—এমন সময়ে বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপে মহাদেবের আবির্ভাব—নিজ মুখে

(১) যিনি স্বয়ং তপস্যার ফলসমূহের বিধাতা, তিনি কোন্ কামনায় স্বয়ং তপশ্চরণ করিয়াছিলেন?—কুমারসম্ভব।

(২) বৃষ্টিপাত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে (আকাশব্যাপী) মেঘসমূহের যেরূপ গম্ভীর অবস্থা হয়, একেবারে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত জলাশয়ের যে অবস্থা হয়, এবং নির্ব্বাতপ্রদেশে অবস্থিত নিষ্কম্প প্রদীপের যেরূপ অবস্থা হয়, দেহান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণবায়ুর নিরোধবশতঃ মহাদেবের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে।—কুমারসম্ভব।

(৩) (মহাদেবের আশ্রমে) ভ্রমরগণও নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে।—ঐ

(৪) হে প্রভো ক্রোধ সম্বরণ করুন, ক্রোধ সম্বরণ করুন, দেবগণের এই বাণী আকাশপথে আসিতে আসিতেই মহাদেবের নেত্রোদ্ভব অগ্নি মদনকে ভস্মসাৎ করিল।—ঐ

নিজ নিন্দা—পার্ব্বতীর অবিচলিতভাব দর্শনে সেই জগৎপ্রভুর সেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' মূর্ত্তির হস্ত ধরিয়া

'অদ্যপ্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ'(১)

বলিয়া অপূর্ব্ব বিনয়—এতদবস্থাগত 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' (২) জগতের পিতামাতা সেই অৰ্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিরও একবার ধ্যান কর।

আবার সেই ব্রজভূমে 'শ্যামলং বাসুদেবং' মূর্ত্তির একবার চিন্তা কর। বালিকাসুলভ কোমল অথচ বীরদর্পে দর্পিত তেজোদীপ্তমূর্ত্তি, বংশীবদন, যমুনা-পুলিনবিহারী গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ—শরচ্চন্দ্রকিরণে ব্রজনা উদ্ভাসিতা—সেই বিনোদ মন্মথমন্মথ 'নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং' (৩) মৃদুবেণু বাজাইতেছেন; ব্রজরমণীগণ সব ফেলিয়া তাঁহার মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণবদনে তীব্র অনুরাগ—অথচ অপূর্ব্ব প্রশান্তি—গোপরমণীগণকে পথে ভাসাইয়া আবার তাহাদিগকে উপেক্ষা—আবার তাহাদের সহিত রাসানন্দ, সেই অবরুদ্ধসৌরত, সাংখ্যযোগস্থিত দিব্যপুরুষের দিব্যলীলা একবার ধ্যান কর—সেই 'স্ময়মানমুখাম্বুজে'র

'সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্। (৪)

অধরামৃত পানের জন্য একবার ঔৎসুক্য অনুভব কর।

---

(১) হে অবনতাঙ্গি (যিনি অধিক উন্নতাঙ্গী বা ঢেঙ্গা নহেন), অদ্য হইতে আমি তোমার দাস হইলাম।—কুমারসম্ভব।

(২) বাক্য ও তাহার অর্থের মধ্যে যেমন নিত্য সম্বন্ধ, যে হরপার্ব্বতীর সম্বন্ধ তদ্রূপ অচ্ছেদ্য (রঘুবংশের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য)

(৩) জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দ—

'নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং।' ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণ মৃদুভাবে বংশীনিনাদ করিতেছেন—সেই বংশী এমন ভাবে বাজাইতেছেন যে সঙ্কেতে তাহাতে রাধার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকেই আহ্বান করা হইতেছে।

(৪) গোপীগীতা। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা হইয়া বলিতেছেন,—

হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার অধরামৃত অনঙ্গবর্দ্ধক, তাহাতে সমুদয় শোকদুঃখ বিদূরিত হইয়া যায়, স্বরশালী বংশী দ্বারা উহা সর্ব্বদা উত্তমরূপে চুম্বিত, উহাতে অন্য বিষয়ের অনুরাগ একেবারে ভুলাইয়া দেয়। হে বীর, তোমার সেই অধরামৃত আমাদিগকে পান করাও।

আজ আবার সেই গোবিন্দ পার্থ-সারথিবেশ ধরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রপ্রাঙ্গণে মত্ত কৌরব পাণ্ডব উভয় সৈন্যের অস্ত্রঝন্‌ঝনা—শঙ্খনিনাদে কুরুক্ষেত্রপ্রাঙ্গণ মুখরিত—তন্মধ্যে

শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব—(১)

সেই নরনারায়ণমূর্ত্তি।

কৃষ্ণ সেই মহা কোলাহলের মধ্যে স্থির প্রশান্ত—অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া তাহাদিগকে সংযত করিতেছেন—সখার প্রার্থনায় উভয় সৈন্যের মধ্যভাগে রথস্থাপনা করিতেছেন, আবার যখন অর্জ্জুনের বিষাদযোগ উপস্থিত, যখন তিনি শোকসংবিগ্নমানস হইয়া সশর চাপ পরিত্যাগ করিয়া রথোপস্থে উপবেশন করিয়া রহিলেন, তখন হৃষীকেশ—

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।' (২)

বলিয়া—তাঁহাকে যুদ্ধে উত্তেজনা করিতেছেন;

আবার যখন তিনি নিজেকে 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব' ও 'ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা' বলিয়া 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' (৩) বলিয়া শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে—

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' (৪)

বলিয়া তাঁহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের এই অবস্থার প্রশান্ত ও সহাস্য মুখমণ্ডল একবার চিন্তা কর।

---

(১) শ্বেতাশ্বযুক্ত মহান্ রথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন (দিব্যশঙ্খ বাজাইলেন)। গীতা।

(২) হে অর্জ্জুন, তুমি ক্লীবভাব প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমাতে সাজে না, হে শত্রু-তাপন, তুমি ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।—ঐ

(৩) আমি তোমার শিষ্য, আমি তোমার শরণাগত হইলাম, আমাকে তুমি শিক্ষা দাও।—ঐ

(৪) যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ অথচ জ্ঞানের কথা কহিতেছ।—ঐ

এইরূপে কোন না কোন অবতারের, নররূপে অভিব্যক্ত নারায়ণের উপাসনাই ভক্তিযোগের মূল কথা। ইঁহাদের একতরের বা সমুদয়ের উপাসনাবলম্বনে অগ্রসর হইয়া অবশেষে যখন মানব—

'তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষুঃ সূর্য্যস্তব প্রভো
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং ঈশ ত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বম্।
স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥' (১)

বলিতে পারে, তখনই সে

'এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম॥' (২)

এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, হরিকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।

আবার যোগসাধনের কথা ধর। যোগীর লক্ষ্য চিত্তের একাগ্রতা-সাধন। বিক্ষিপ্ত চিত্ত নানাদিকে ছুটিতেছে—এই চিত্তে কোন তত্ত্বের নিশ্চিত নিরূপণ হয় না—সদাই সন্দেহ। যেমন বিরলাবয়ব সূর্য্যকিরণকে আতসী-কাচ যোগে ঘনীভূত ও পুঞ্জীভূত করিলে তাহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিয়া সব বস্তুই দগ্ধ করা যায়, তদ্রূপ একাগ্র চিত্তবলে জগতের এমন কোন জ্ঞান নাই,

(১) বেদ তোমার নিঃশ্বাস, সমুদয় জগৎ তোমার স্বেদ বা ঘর্ম্মজলস্বরূপ, সমুদয় জগৎই তোমার পদস্বরূপ, স্বর্গ তোমার মস্তকস্বরূপ, তোমার নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, বনস্পতিসমূহ তোমার লোম, চন্দ্রমা তোমার মন হইতে উৎপন্ন, হে প্রভো, সূর্য্য তোমার চক্ষুস্বরূপ। তুমিই সব, তোমাতেই সব, হে ঈশ্বর, এই সমুদয়ই তোমার দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তুমি স্তবকর্ত্তা, স্তব ও স্তবের উদ্দিষ্টও তুমিই তোমাকে বারম্বার নমস্কার।

(২) পণ্ডিতগণ হরিকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতকে এইরূপে অকপটে ভক্তি করিবেন।

যাহার আহরণ না করা যাইতে পারে—আবার জ্ঞান আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও আসিয়া থাকে। সুতরাং যোগী যেমন যোগপথে—একাগ্রতার পথে—অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার নব নব জ্ঞান, নব নব শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য কি? তাঁহার লক্ষ্য দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান—আত্মা স্ব-স্বরূপে নিশ্চল হইয়া থাকিবেন, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য। সকল শক্তিকে পদদলিত করিতে হইবে, অষ্টসিদ্ধিকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় তুচ্ছ করিতে হইবে—মৈত্রীকরুণামুদিতায় বিমণ্ডিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মমেঘ-সমাধি লাভ করিতে হইবে—যে সমাধিলাভে তাঁহার হৃদয় হইতে অজস্র বিবিধ ধর্ম্ম স্বতঃই মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় ক্ষরিত হইতে থাকিবে।

এই যোগাভ্যাসের মূল কি? প্রাচীন যোগিসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শিবাবতার গুরু গোরক্ষনাথের জীবনকথার আলোচনা কর। বালক গোরখ প্রান্তরে গোচারণ করিতেছেন—পরিব্রাজক যোগিগুরু মীননাথ যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত। আজ সেই দেবদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ কৃপাভাজন মৎস্যেন্দ্রনাথ যেন শিষ্যকে কৃপার জন্যই পিপাসার্ত্ত—পানীয় চাহিলেন, পরম শ্রদ্ধায় গোরখ পত্রপুটে গাভীদুগ্ধ দোহন করিয়া দিল। গুরু বিনিময়ে কিছু দিতে চাহিলেন, কারণ, সাধুগণ কিছু বিনিময়ে না দিয়া প্রতিগ্রহ করেন না। বালক গোরখ কি চাহিবেন, ভাবিয়া কুলকিনারা পাইলেন না। মান-যশ চাহিবেন, না ধনরত্ন চাহিবেন, না রাজত্বপদ চাহিবেন, না অষ্টসিদ্ধি চাহিবেন? কোনটীকেই যোগিবরের নিকট চাহিবার উপযুক্ত বোধ হইল না। তখন করযোড়ে বলিলেন, প্রভো, আপনি যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন। যোগিরাজ বলিলেন, তথাস্তু, কিন্তু বৎস, উহা লাভ করিবার পূর্ব্বে আমার একটী বাক্য পালন করিতে হইবে, পারিবে ত? 'আপনার কৃপায় কেন না আপনার আদেশ পালনে সমর্থ হইব?' আচ্ছা, তবে আমি যতদিন না আসিতেছি, ততদিন কোন ইচ্ছা করিও না। এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। গোরখ দাঁড়াইয়া ছিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বপ্নের মত এ কি ভোজবাজি হইয়া গেল! তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বহুক্ষণ দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিয়া পদদ্বয়ে বেদনা বোধ হইতে লাগিল, বসিবার ইচ্ছা হইল। অমনি স্মরণ হইল, গুরুদেব ত ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, আর বসা হইল না। ক্রমে পদদ্বয় অসাড়

হইয়া আসিল, মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হইয়া পড়িয়া গেলেন। যে পাশে পড়িয়াছেন, সেই পাশেই পড়িয়া আছেন, ক্রমে পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ইচ্ছা হইল ; অমনি গুরুবাক্য স্মরণ ও সেই ইচ্ছার দমন। ক্রমে শারীরিক ধর্ম্মে শৌচাদির ইচ্ছা, ক্ষুধার উদ্রেক, ভোজনেচ্ছা—শৌচপ্রস্রাবাদি অসাড়ে হইয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বালককে বহুক্ষণ বাড়ীতে ফিরিতে না দেখিয়া তদীয় অভিভাবকগণ বহু অনুসন্ধানে তাহাকে প্রান্তরমধ্যে শয়ান অবস্থায় প্রাপ্ত হইল এবং ধরাধরি করিয়া বাটীতে লইয়া গিয়া বহু জিজ্ঞাসাবাদের পরও যখন তাহার নিকট কোন উত্তরই পাইল না, তখন তাহার কঠিন পীড়া নিশ্চয় করিয়া বৈদ্য আনাইয়া নানাবিধ চিকিৎসা করাইতে লাগিল। কিন্তু এ যে দেবের অসাধ্য রোগ! এ রোগের চিকিৎসা স্বয়ং যোগিরাজ ছাড়া আর কে করিবে? কয়েক দিন এইরূপে কাটিয়া যাইবার পর যখন মীননাথ স্বয়ং রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখনই সব রোগ সারিয়া গেল। গোরখা যোগিরাজের শিষ্যত্বে পরিগৃহীত হইয়া কঠোর যোগসাধনে দীক্ষিত হইল এবং অবশেষে সিদ্ধ হইয়া পরে গুরুর পতন হইলে তাঁহারও উদ্ধার সাধন করিয়াছিল।

এইরূপে সর্ব্ব ইচ্ছার দমনযোগে তীব্র ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হইলেই যোগপথের পথিক হওয়া যায়। ইহার চরম লক্ষ্য কি? চরম লক্ষ্য সেই অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ সমাধি, যে অবস্থায়

> 'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
> ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥' (১)

কিন্তু আবার শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

> 'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
> সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ (২)

তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি সর্ব্বভূতের সুখদুঃখ আপনারই সুখদুঃখরূপে অনুভব করেন, কারণ, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন।

(১) সর্ব্বত্র সমদর্শন, যোগে একাগ্রচিত্ত যোগী সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় অবস্থিত দর্শন করিয়া থাকেন।—গীতা।

(২) লোকের সুখই হউক বা দুঃখই হউক, যে যোগী নিজের তুলনায় তাহাকে আত্মসুখ ও আত্মদুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকেন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।—ঐ

তখন তিনি অপূর্ব্ব যোগমহিমাবিমণ্ডিত হইয়া সমগ্র জগতে সমগ্র জীবের কল্যাণসাধন করিয়া বিচরণ করেন।

এক্ষণে একবার কর্ম্মযোগের তত্ত্ব একটু হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা যাক। ভগবদ্গীতায় এই কর্ম্মযোগতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথমেই আমাদিগকে 'কর্ম্মযোগ' এই শব্দটীর প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে ইহা কর্ম্মযোগ, শুধু কর্ম্ম নহে। কর্ম্ম ত বন্ধনেরই কারণ, কিন্তু এই কর্ম্মযোগ 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'। কর্ম্মের মধ্যে এমন একটু কৌশল আছে, যাহা দ্বারা এই বন্ধনাত্মক কর্ম্মকেও মুক্তির সোপানে পরিণত করিতে পারা যায়। আমরা কর্ম্ম করি ফলবিশেষ লাভের জন্য, কিন্তু কর্ম্মযোগীর লক্ষ্য নিজেকে নিষ্কামরূপে পরিণত করা। তাই তাঁহার সমুদয় কর্ম্মেরই লক্ষ্য নিজ অন্তরশুদ্ধি। তিনি বুঝিয়াছেন, যতই সৎকর্ম্ম করা যাক না কেন, তাহার ফলকামনা ত্যাগ করিতে হইবে; কেবল সেই কর্ম্মের দ্বারা যে আত্মতৃপ্তি, তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কর্ম্ম জীবসেবাত্মক, এই জীবসেবা আবার বর্ণাশ্রমভেদে অর্থাৎ সাধকের বিভিন্ন অবস্থাভেদে বহু প্রকার হইতে পারে। অন্নবস্ত্রদান হইতে রোগী ও আর্ত্তের সেবাশুশ্রূষা, বিদ্যাদান ও পরিশেষে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানদান। এই সমুদয় কর্ম্মেই কর্ম্মযোগীর লক্ষ্য গৌণভাবে পরোপকার ও মুখ্যভাবে আত্মহিত-সাধন এই কর্ম্মযোগে সদাসর্ব্বদা মনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। মন চায় ধনজন, মান, সম্পদ—এই সমুদয় ধীরে ধীরে উপেক্ষা করিতে হইবে। নিজ সুখ, নিজ আরাম ভুলিয়া পরের সুখকেই আত্মসুখ করিতে হইবে। তুমি অপরের সেবা করিতেছ, ভাবিওনা অপরে তোমাকে ইহার জন্য প্রশংসা করিবে। তুমি বহু নির্য্যাতন, বহু অশান্তি ভোগ করিবে, কিন্তু 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি'—কর্ম্মত্যাগে যেন কখনও তোমার প্রবৃত্তি না হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কর্ম্ম আপনি ছাড়িয়া যায়। কর্ম্মযোগী যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী নাও হন, তথাপি তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বার্থবিসর্জ্জনের, সম্পূর্ণ অহং বিসর্জ্জনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে। আর ঈশ্বরবিশ্বাসী হইলে তাঁহাতে ফল সমর্পণ—সর্ব্বজীবে নারায়ণ-বুদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে যিনি কর্ম্মযোগ-সাধনায় অকপট, তাঁহার কর্ম্ম ও উপাসনা এক হইয়া যায়—ইহাই তাঁহার কর্ম্ম,

আবার ইহাই তাঁহার সাধন-ভজন ; তাঁহারও চরম পরিণতি পূর্ণ অহংবিসর্জ্জনে বা সর্ব্বত্র নারায়ণ-সাক্ষাৎকারে।

সংক্ষেপে বিভিন্ন যোগতত্ত্ব যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে এটী স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, মানবের সংস্কারগত, রুচিগত, উন্নতির সোপানগত বিভিন্ন তারতম্যানুসারে সে নানাবিধ পথ অবলম্বন করে বটে, কিন্তু চরমে সেই এক লক্ষ্যেই সকলের গতি। সেই এক লক্ষ্য সর্ব্বভূতে আত্মসাক্ষাৎকার বা ভগবৎসাক্ষাৎকার। সুতরাং কেহই এক পথের পথিককে অপর পথের পথিক হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, অথবা এইটী অগ্রে করিতেই হইবে, নতুবা অপরটীতে অধিকার হইবে না, তাহাও বলিতে পারেন না ; প্রত্যেকটীরই সাধনাবস্থা আছে, ক্রমপরম্পরা আছে, আবার সিদ্ধাবস্থা আছে। প্রত্যেকটীতেই কতকগুলি সুবিধা এবং কতকগুলি বিঘ্নও আছে। সুতরাং ইহার একতর সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তি অপর সাধনায় প্রবর্ত্তকমাত্র সাধকের নিম্নাবস্থা বা দুর্ব্বলতা দেখাইয়া কখন তাহার নিকট নিজ সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে পারেন না। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক সাধনাই ইচ্ছা করিলে রুচি ও প্রবৃত্তিভেদে সম্পূর্ণরূপে অন্য সাধনা-নিরপেক্ষ হইয়া অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে কেহ গোড়া হইতেই জ্ঞানপথের পথিক হইতে পারেন। তবে ইহার মধ্যে এটীও বুঝিবার বিষয় যে, এই যে বিভিন্ন পথগুলির কথা বলা হইল, এগুলি কেবল এক এক ভাবের সাময়িক প্রাধান্য লইয়া। নহিলে সচরাচর সংসারে একমাত্র পথের সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ সাধক অতি বিরল দেখা যায়। যিনি সর্ব্বদা ভগবৎ-নাম-স্মরণে উৎসুক, তাঁহাকেও তাঁহার সাধনার অবকাশকালে পরোপকার বা জীবসেবাব্রতে সময়ে সময়ে দীক্ষিত দেখা যায়, তদ্রূপ জীবসেবা-পরায়ণ ব্যক্তির উহাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইলেও তাঁহাকেও সেই জীবসেবার উদ্দীপনা লাভের জন্য তদ্গতভাবে ভগবৎসাধন-পরায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

একভাবে বলা যাইতে পারে, সকলকেই কোন না কোনরূপে সেবা-পরায়ণ হইতে হইবে। যখন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে জগতের নিকট কোন না কোনরূপ সেবা গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন সেবাপরায়ণ না হওয়াই আমার পক্ষে ঘোর অধর্ম্ম। সেই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

'এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।'*

তবে বলিতে পার, এই সেবা সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাব ও ধারণা আছে। শুধু একটী ভাবকেই সেবা বলিয়া অপর ভাবগুলিকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আর সর্ব্বদা সেই চরম লক্ষ্য মনশ্চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া রাখিতে হইবে।

এই কর্ম্মযোগের আর একটী মহদুপকার আছে। আমরা সকলেই অল্প বিস্তর নানা সংস্কারে আবদ্ধ। এই সংস্কার-জাল ছিন্ন না হইলে মুক্তি-সোপানে আরূঢ় হইবার উপায়ান্তর নাই। কর্ম্মযোগ এই সংস্কার-জাল ছিন্ন করিবার অমোঘ উপায়। এ যেন কাঁটা দ্বারা কাঁটা তুলিয়া উভয় কাঁটা ফেলিয়া দিবার মত। সদ্‌গুরুর উপদেশে বা নিজের বিচারানুযায়ী কোন শুভকর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহাতে মাতিয়া যাও ও সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা কর, প্রভো, আমার সব কর্ম্মবন্ধন ঘুচাইয়া দাও, আমাকে তোমার করিয়া লও। দেখিবে, ক্রমে সংস্কারের দাসত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে—অজ্ঞান-মেঘ ধীরে ধীরে কাটিতেছে।

তমোগুণ সাধকের এক প্রধান শত্রু—উহা আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, প্রমাদ প্রভৃতি আনিয়া মানবাত্মাকে ঘোর বন্ধনে বাঁধিতে চায়। কর্ম্মযোগ এই তমো-গুণের প্রবল শত্রু। ইহা দ্বারা আলস্য, প্রমাদ, তন্দ্রা, নিদ্রা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে জিত হয়, মহারজোগুণের আবির্ভাব হয়, ঐ রজোগুণ আবার সত্ত্বানুগত। ক্রমে তীব্র চেষ্টার ফলে রজোগুণের উপসংহার ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশ, শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে মুক্তি করতলগতা হইয়া থাকে।

হে সাধক, এই ঘোর কলিযুগে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের সাধনা বড়ই কঠিন, বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল। বিরল কোন কোন মহাত্মা উহাদের পথিক হইতে পারিলেও ভক্তিসহকৃত কর্ম্মযোগই এ যুগের যুগধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্মে দীক্ষিত হও, ভগবানের নাম লইয়া, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবসেবা-ব্রতে,

* হে অর্জ্জুন, যিনি এইরূপ প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্রের অনুসরণ না করেন (অর্থাৎ দেবগণের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞভাগ দান না করেন (দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিলেই সেই প্রসাদে সর্ব্বভূতের অধিকার হইল), তাঁহার আয়ু পাপময়, ইন্দ্রিয়সুখেই তাঁহার একমাত্র পরিতৃপ্তি, তিনি বৃথাই জীবনধারণ করিয়া থাকেন।

দেশসেবা ব্রতে, সমগ্র মানবসেবা ব্রতে দীক্ষিত হও এবং মহাপুরুষদের ও শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদবলে সকল যোগের চরম ফল একত্বানুভূতি ও সমদর্শনলাভে কৃতার্থ হও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন আদর্শের সঙ্ঘর্ষ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

স্বামী বিবেকানন্দ একবার তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "তিনি বেদান্তের মত মতান্তরের ধার ধারিতেন না। তিনি শুধু সেই মহৎ জীবন যাপন করিয়াই যাইতেন, উহা ব্যাখ্যা করিবার ভার তিনি অপরের উপর ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।" আর, কোন মহাপুরুষের জীবনে যে এমন সব অংশ থাকিতে পারে, যাহার অর্থ সেই মহাপুরুষ নিজেই বুঝেন না,—এই অর্থে কথাগুলি তাঁহার নিজ জীবনালোচনাপ্রসঙ্গে আমার অনেকবার মনে পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্যে স্বামিজী আমাদিগের নিকট শুধু ধর্ম্মাচার্য্যরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এখনও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেই আমরা তাঁহাকে সেই পুরাতন বক্তৃতা-গৃহে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই; দেখি তিনি বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্তভাবে এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই আধুনিক জগতে সুদূর অতীতের সেই বাণী পুনরায় উচ্চারিত হইতেছে। ত্যাগ, মুক্তি-পিপাসা, বন্ধনক্ষয়, অগ্নিবৎ পবিত্রতা, সাক্ষিস্বরূপ হওয়ার আনন্দ, সাকারকে নিরাকারে লয়করণ—শুধু এই সকল বিষয়ই উক্ত আলোচনার বিষয়ীভূত হইত। সত্য বটে এক আধবার ক্ষণিকের মত আমরা তাঁহাকে মহা দেশভক্তরূপে দেখিয়াছি।

তথাপি, নিয়তি যথায় আহ্বান করে তথায় ইঙ্গিতমাত্রই যথেষ্ট হয়, এবং যে সকল মুহূর্ত্ত একজনের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তাহারা হয়ত অপর একশত জনের চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইলেও কেহ তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। পাশ্চাত্যে আমরা স্বামিজীকে ভারতের উন্নতিকামী কর্ম্মী-রূপে দেখি নাই, হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছি। তিনি আবেগভরে বলিয়াছিলেন, "আহা! যিনি বাস্তবিকই মানবের দেবত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য কিরূপ শান্তিপূর্ণ! এইরূপ লোকের পক্ষে মানুষের চোখ খুলিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিবার নাই; বাকী সমস্ত আপনা হইতেই হইয়া যায়।" আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম বা শুনিয়াছিলাম তাহা এইরূপ কোন অগাধ শান্তির ফলস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

কিন্তু, আমার ভারতবর্ষে পদার্পণের মুহূর্ত্ত হইতেই আমি এই সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে নিহিত একটী সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বস্তু দেখিতে পাইলাম—যাহা এরূপ অদ্ভুতভাবে এই আমার প্রথম জ্ঞানগোচর হইল, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বা তৎসম্বন্ধীয় ধারণাসকল নহে। উহা আমার গুরুদেবের নিজ ব্যক্তিত্বের জালবদ্ধ সিংহবৎ পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টা ও তজ্জনিত দুঃসহ ক্লেশ। কারণ, যেদিন আমি জাহাজ হইতে অবতরণকালে তাঁহাকে জেটীতে দেখি, সেই দিন হইতে, যখন তিনি গোধূলির সময় দেহটীকে ভাঁজকরা পোষাকের মত ফেলিয়া রাখিয়া এই জগৎরূপ গ্রামখানি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া যান, সেই শেষ শান্ত মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত, আমি এই ভাবটীকে তাঁহার জীবনের অপর ভাবটীর সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু এই সঙ্ঘর্ষের মূল কোথায়? কেন তিনি আপনাকে উদ্দেশ্য-সাধনে পুনঃপুনঃ বিফলপ্রযত্ন ও বাধাপ্রাপ্ত বোধ করিতেন? এক মহান্ উদ্দেশ্যের ধারণা তাঁহার যতই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা-বোধও ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল—ইহাই কি তাহার কারণ? তাঁহার ভারতবর্ষে সসম্মান-অভ্যর্থনার যে সকল প্রতিধ্বনি তাঁহার ইংরাজ বন্ধুবর্গের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল তৎসঙ্গে এক বন্ধুর মুখে আমি নিজে এই বিষয়টীই শুনিতে পাইয়াছিলাম। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্ষমতা চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া হিমালয়ে নির্ব্বাসিত

হইয়া তিনি তাঁহার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উহা হতাশার কাতর ক্রন্দন। উহা পাঠ করিয়া আমাদের মধ্যে কয়েকজন, যে কোন উপায়ে হউক তাঁহাকে ভারতের কার্য্যভার অপরের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া পাশ্চাত্য প্রত্যাগমনে সম্মত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার সময়, ঐ সকল কার্য্য কি প্রকারের এবং উহা সম্পন্ন করিতে হইলে কত কঠিন ও বহু-অঙ্গ-বিশিষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা আমরা অতি অল্পই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

এই সঙ্ঘর্ষ বাস্তবিক কিসের জন্য? উহা কি, যাহাকে তিনি 'মন বুদ্ধির অগোচর' বলিতেন তাহাকেই সাধারণ জীবনে বহন করিয়া আনার প্রাণান্তকর চেষ্টাপ্রসূত? একথা নিঃসন্দেহ যে, তিনি যে কার্য্য করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এত কঠিন যে উহা শুধু বীরেরই সাধ্য। প্রচলিত আদর্শসমূহের নিরাপদ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, পুরাতন উপায়সমূহের আপাতবিরোধী উপায়সকলের দ্বারা কোন নূতন আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাওয়ার মত দুষ্কর কার্য্য এ জগতে আর নাই। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ "নরেন্দ্র"কে (তখন স্বামিজী ঐ নামেই অভিহিত হইতেন) তাঁহার বাল্যাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার জীবনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ কি?" তিনিও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "সর্ব্বদা সমাধিস্থ থাকা।" শুনা যায়, তাঁহার গুরুদেব এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন, এবং উত্তরে শুধু এই বলিয়াছিলেন, "বাবা, আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি আরও কিছু বড় অধিকার লাভের জন্য জন্মিয়াছ!" উক্ত মুহূর্ত্তটী যে শিষ্যের জীবনে একটী নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল, একথা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও বিলম্ব হইবে না। এ কথা নিশ্চয় যে, ভবিষ্যতে, বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশবাসিগণের প্রতি শ্রেষ্ঠদানস্বরূপ এই যে সাড়ে পাঁচ বৎসর ইহাতে, তিনি নিষ্কাম-কর্ম্ম বা পরার্থকর্ম্মকেই ধর্ম্মজীবনের একটী শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহারই ফলস্বরূপ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়া উঠিল, যাঁহারা নূতন নূতন রকমের সামাজিক কর্ত্তব্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টিসাধনেই বদ্ধপরিকর হইলেন। ইউরোপে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মভাব লাভ করা প্রাচ্যের তুলনায় অতি অল্পই ঘটিয়া

থাকে বলিয়া এবং লোকে উহা খুব কমই বুঝে বলিয়া সাধারণের চক্ষে এইরূপ পরার্থকর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে সাধুসম্প্রদায়ের নিকট লোকে প্রধানতঃ এই আশা করিয়া থাকে যে, উহা হইতে মহাপুরুষগণ উৎপন্ন হইবেন। আর, যে সন্ন্যাসী পরম্পরাগত সমাধিমূলক জীবনের মাহাত্ম্য বজায় রাখিতে আপনাকে নিয়োজিত না করিয়া সমাজকে উন্নীত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহার মূল্য প্রাচীনকালের লোকেরা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন না।

পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষায় প্রধান অধিকার করিত, স্বামিজীর প্রণালীমতে এই সকল সৎকর্ম্মই সেই সেই স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনের চরমপন্থী—অদ্বৈতীর পক্ষে "একমেবাদ্বিতীয়ং" অবস্থালাভই আদর্শ। যিনি এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উপাসনা অনন্ত হইয়া উঠে, কারণ তাঁহার নিকট উপাস্য, উপাসক কেহই নাই; এবং সকল কর্ম্মই তাঁহাদের অন্তরালে অবস্থিত একত্বের তুল্য বিকাশ বলিয়া, কোন কর্ম্মকেই বিশেষভাবে উপাসনাখ্য বলিয়া পৃথক্ করা যাইতে পারে না। তাঁহার নিকট উপাস্য, উপাসক, উপাসনা সবই এক, তথাপি অদ্বৈতীও স্বীকার করেন যে, ভগবৎগুণ-বর্ণনা ও প্রার্থনায় সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। কারণ, এ কথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অন্য সকল উপায় অপেক্ষা ঈশ্বর-চিন্তা দ্বারাই অহং-জ্ঞানকে সহজে দমন করিয়া রাখা যায়। সুতরাং উপাসনা উচ্চতর আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সোপান বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু স্বামিজী কর্ম্ম বা নরসেবাকেও ঠিক এই পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এইরূপ বোধ হয়। চিত্তশুদ্ধির অর্থ—স্বার্থপরতা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাওয়া। উপাসনা করা—ব্যবহার করা বা খাটাইয়া লওয়ার ঠিক বিপরীত ভাব বটে, কিন্তু সেবা বা দানও ইহার অপর একটী বিপরীত ভাব। এইরূপে তিনি সাহায্যদান-ব্যাপারটাকে ত পবিত্রতামণ্ডিত করিলেনই, অধিকন্তু মানবের নামও পবিত্রতাময় করিয়া তুলিলেন। এমন কি, আমি একজন শিষ্যের কথা জানি, যিনি এই সঙ্ঘ স্থাপিত হইবার অনতিকাল পরেই এই ভক্তির আবেগে এতদূর পূর্ণ হইয়াছিলেন যে, তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তগণের যাতনা উপশম করিবার জন্য তাহাদের ক্ষতগুলি

ঢুকিয়াছিলেন। অবশ্য, পীড়িতগণের সেবাশুশ্রূষা ও দরিদ্রগণকে ভোজনদান প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণের স্বাভাবিক কার্য্য ছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই কার্যগুলি বিপুলতর আকার ধারণ করিল। তাঁহারা উহাদিগকে জাতীয় দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহে সাহায্য দিবার জন্য, কোন বিশেষ সহরে স্বাস্থ্যবিধিগুলি পালন করাইবার জন্য, অথবা কোন তীর্থে ব্যাধিগ্রস্ত ও মুমূর্ষুগণকে সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য মঠ হইতে লোক পাঠান হইতে লাগিল। একজন মুর্শিদাবাদে একটী অনাথাশ্রম ও শিল্পবিদ্যালয় খুলিলেন, অপর একজন দাক্ষিণাত্যে একটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, ইহারা ধর্ম্মবাহিনীর জঙ্গল-সাফ-করা ও রাস্তা-তৈয়ার-করা দল (sappers and miners)। তাঁহার সঙ্কল্প কিন্তু এতদপেক্ষা অনেক ব্যাপক ছিল। ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষাবিধান ও দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ষোল আনা হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। পরার্থে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইতে দুঃখভোগের ক্ষমতা কত বৃদ্ধি পায়, তাহা কেবল ভুক্তভোগীরাই বুঝেন। যে "ত্রিশ কোটী টাকা" পাইলে তিনি ভারতবর্ষকে তাহার পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিতে পারিতেন বলিতেন, তাহা না আসিয়া জুটায়, সত্য সত্যই কি (সময়ে সময়ে তাঁহার যেরূপ মনে হইত) তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছিল ? অথবা ইহা কোন উচ্চতর বিধানসমূহেরই খেলা, যাহাতে অন্তিমে, তিনি এক জীবনে যে কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন তদপেক্ষা অনেক অধিক সফলতা আনয়ন করিবে ?

তাঁহার দৃষ্টি যেমন ব্যাপক, তেমনি গম্ভীর ছিল। ভারতে যে উন্নতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহার উপাদানগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ভারতকে একটী অভিনব আজ্ঞাবহতার আদর্শ শিক্ষা করিতে হইবে। এইহেতু, ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার সকল প্রচলিত ধারণার প্রতিকূল হইলেও মঠটী সঙ্ঘবন্ধনের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। এখন হাজার নূতন নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিগত করিয়া লইতে হইবে। সেই হেতু তিনি নিজে খুব সাধাসিধাভাবে থাকিতে

অভ্যস্ত থাকিলেও, দুই তিনটী ঘর আসবাবে সজ্জিত হইল। মাটী খোঁড়া, বাগান করা, দাঁড় টানা, ব্যায়াম, ও গবাদি পালন এইগুলি ক্রমে ক্রমে তরুণ ব্রহ্মচারিগণের ও তাঁহার নিজের জীবনের অঙ্গীভূত হইল। তিনি আবার পূর্ণ উৎসাহের সহিত কূপ খনন বা পাউরুটী প্রস্তুতকরণাদি গুরুতর সমস্যার সমাধানার্থ দীর্ঘ পরীক্ষা-পরম্পরাতেও যোগদান করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ চড়ক পূজাদিবসে একটী ব্যায়ামসমিতি মঠে ক্রীড়া দেখাইয়া পারিতোষিক লাভের জন্য আগমন করেন। স্বামিজী এতদুপলক্ষে বলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা, (খ্রীষ্টানদের লেণ্ট স্থানীয় *) এই হিন্দু পাব্বণটী অতঃপর বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম প্রদর্শন দ্বারা সুসম্পন্ন হউক। তাঁহার মতে, যে শক্তিটা এতাবৎকাল শরীর-নিগ্রহে ব্যয়িত হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে পেশীসমূহের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিলে উহার সদ্ব্যবহারই করা হইবে।

পাশ্চাত্যগণের নিকট ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, স্বামিজীর জীবনে ইহার মত প্রশংসার্হ আর কোন কিছুই নাই। বহুপূর্ব্বে তিনি প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের উচ্চতম আদর্শগুলিকে জীবনে প্রতিফলিত করিয়া উহাদিগের পরস্পর বিনিময় সঙ্ঘটন করাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আর এই বিষয়ে তিনি যেমন শিক্ষাদানসামর্থ্য দ্বারা, তেমনি শিক্ষাগ্রহণসামর্থ্য দ্বারাও নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এবম্বিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু তিনি যে সময়ে সময়ে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া মর্ম্মযাতনা ভোগ করিবেন, ইহা ত অনিবার্য্য। হিন্দুগণ আদর্শ ধর্ম্মজীবন বলিতে ইহাই বুঝেন যে, উহা সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সদা সাক্ষিস্বরূপ, অচল অটল অস্পর্শ, পরব্যোমে অবস্থিত দেবদেবেরই এই মর্ত্ত্যধামে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ। এই ধারণা তাঁহাদের মনে এত সুস্পষ্ট ও বদ্ধমূল যে, কেহ নিজে মানসিক দ্বন্দ্বরূপ বিপুল ক্ষতিস্বীকার না করিয়া এই আদর্শকে অন্য কোন নূতন মার্গে লইয়া যাইতে পারেন না।

---

* Lent—ভগবান্ ঈশার উপবাসের স্মরণার্থ খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত চল্লিশ-দিনব্যাপী উপবাস।

কোন ভাস্করকে একটী নূতন আদর্শের প্রবর্ত্তনা করিতে হইলে কি মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা কেহ অনুভব করিয়াছেন কি? সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ধরিবার ও অনুভব করিবার যে ক্ষমতা তাঁহার কার্য্যসাধনের জন্য অত্যাবশ্যক, যে নৈতিক উচ্চাবস্থা তাঁহার হস্তের বাঁটাস্বরূপ, তাহারাই আবার তাঁহার অবসর-মুহূর্ত্তগুলিতে সন্দেহ ও গুরুতর দায়িত্ববোধরূপে তাঁহাকে চাপিয়া ধরে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির নিকট, যাঁহাদের জীবন অতিকঠোর হইলেও জনসাধারণের অনুকরণ-প্রবণ নৈতিক জ্ঞানদ্বারা আরব্ধীকৃত ও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহাদের জীবন কত সুখময় বলিয়া বোধ হয়! অনেকস্থলেই আমি দেখিয়াছি, যেন বোধ হয় আমাদের জীবনে দুইগাছি সূত্র ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া রহিয়াছে—একগাছি, যাহা আমরা স্বেচ্ছায় করি, অপরগাছি, যাহা আমরা সহ্য করিয়া যাই। কিন্তু এক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব দুইটী পৃথক্ আদর্শের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল—ইহাদের প্রত্যেকটীই নিজ নিজ জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষ মতাবলম্বীর পক্ষে প্রায় পাতকতুল্য।

কখনও কখনও কোন সহচরের নিকট তিনি হয়ত অন্যমনস্কভাবে দুই একটী কথা বলিয়া ফেলিতেন, তাহা হইতেই এই ভিতরের সঙ্ঘর্ষ ধরা পড়িত। একদিন তিনি খেতড়ীরাজের সহিত অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, রাজার হাত কাটিয়া খুব রক্ত পড়িতেছে; এবং জানিতে পারিলেন যে, তিনি যাহাতে নিরাপদে যাইতে পারেন—তজ্জন্য রাজা একটী কাঁটা-ডাল সরাইয়া ধরাতেই ঐরূপ হাত কাটিয়া গিয়াছে। স্বামিজী ভর্ৎসনা করিলে রাজপুত-বীর ব্যাপারটীকে এই বলিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন, "স্বামিজী, আমরা কি চিরকালই ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা নহি?" গল্পটী বলিয়া স্বামিজী আরও বলিলেন, "দেখ, তার পর আমি তাঁহাকে বলিতে যাইতেছিলাম, 'আপনাদের একজন সন্ন্যাসীকে এত সম্মান দেখান উচিত নহে,' এমন সময়ে হঠাৎ আমার মনে হইল যে, সব দিক দেখিলে হয়ত তাঁহারাই ঠিক করিতেছেন। কে জানে! হয়ত আমিও তোমাদের এই আধুনিক সভ্যতার ক্ষণস্থায়ী অত্যুজ্জ্বল ছটার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি!" একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার মতে, যিনি চতুর্দ্দিকে জ্ঞান বিস্তার করিতে করিতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতেন এবং

একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবার সময় নাম পরিবর্ত্তন করিতেন, সেই 'রম্‌তা সাধুই' বহু চিন্তা ও বহুকার্য্যভারপীড়িত বেলুড়মঠের মোহান্ত অপেক্ষা বড় ছিলেন।"* এতদুত্তরে তিনি শুধু এই কথা কয়টী বলিয়াছিলেন, "আমি জড়াইয়া পড়িয়াছি।" জনৈক আমেরিকাবাসিনী আমায় যে গল্পটী বলিয়াছিলেন, তাহাও আমার মনে আছে। তাঁহার স্বামী এই অদ্ভুত অতিথিকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাকে এস্থান হইতে চিকাগো যাইতে হইবে, আমি আহ্লাদপূর্ব্বক অর্থ দিতেছি; আমরা আপনার মুখ হইতে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতে পাইলে কৃতার্থ হইব।" উক্ত মহিলা বলিয়াছিলেন, "এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মুখখানি এমন হইয়া গেল যে, তাহা মনে করিতেও কষ্ট বোধ হয়। ইহাতে যেন তাঁহার শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন কিছু তখনই তখনই ছিঁড়িয়া গেল, যাহা আর কখনও জোড়া লাগিবার নহে।" পাশ্চাত্যে একদিন তিনি মীরাবাইয়ের গল্প করিতেছিলেন। মীরাবাই এক সময়ে চিতোরের রাণী ছিলেন, আবার পরে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন বলিয়াছিলেন, শুধু তাঁহাকে রাজান্তঃপুর মধ্যে থাকিতে হইবে। কিন্তু কেহ তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন বিস্ময়-সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিন্তু কেন তিনি থাকিবেন না?" স্বামিজীও উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন থাকিবেন? তিনি কি এই জগতের এই পচা পাঁকের মধ্যে থাকিতেন?" শ্রোতাও সহসা স্বামিজীর মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং সামাজিক জীব হিসাবে জীবন যাপনে কত অসংখ্য অবান্তর-সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় এবং উহা যে অসহ্য বন্ধন ও তীব্র অন্তর্দ্দাহের কারণ হয়, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মাচার্য্য হিসাবে স্বামিজী রবিকরোদ্ভাসিত অম্বরবৎ অনাবিলতা ও শিশুসুলভ শান্তি দ্বারা মণ্ডিত থাকিলেও, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাঁহার স্বদেশে আসিয়া এই দেখিতে পাইলাম যে, আর একদিক হইতে দেখিলে তিনি একেবারে পুরাদস্তুর মানবভাবাপন্ন। আর, এই ক্ষেত্রে, যদিও তাঁহার চেষ্টা-সমূহের ফল আমাদের অনেকেরই অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বা অধিকতর স্থায়ী হইত, তথাপি ঐ সকল ফল পাইবার জন্য তাঁহাকেও

ঠিক আমাদেরই ন্যায় অন্ধকার ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দীর্ঘ শ্রমস্বীকার করিয়া, কালে-ভদ্রে আলোকের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইত। প্রায়ই, বিফলপ্রযত্ন হইয়াছি, এইরূপ ধারণার হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি না পাওয়ায়, প্রায়ই যে দেহরূপ যন্ত্রসাহায্যে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইতেছে ও যাহাদিগকে তিনি গড়িয়া পিটাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, এই উভয়ই তাঁহার মনের মত না হওয়ায় তাঁহাকে যে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইতেছিল, তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতে থাকায়, যেমন বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, ভবিষ্যতের জন্য ধরাবাঁধা মত্‌লব আঁটিবার, অথবা যে সকল বিষয় অজ্ঞাত, তৎসম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলিবার সাহসও তাঁহার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "সব দিক ভাবিয়া দেখিলে, সত্যই আমরা জানি কি? মাই সব জিনিস নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছেন। আমরা শুধু আনাড়ীর মত হাতড়াইয়াই বেড়াইতেছি।" সম্ভবতঃ মহাপুরুষগণের জীবনের এই অংশটী তাঁহাদের জীবনচরিতকারগণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। তথাপি, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা তাঁহার জগদীশ্বরীর প্রতি নিম্নলিখিত অনুযোগবাক্য হইতেই ইহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই :—"মা এ কি করিলি? আমার সব মনটা এই ছেলেগুলার উপর পড়িয়াছে যে মা!" আর ধর্ম্মপদের একাদশ অধ্যায়ে, ঘটনার পর চতুর্ব্বিংশতি শতাব্দী অতীত হইয়া যাইলেও, আমরা এখনও আর একজন আচার্য্যের চিত্ত-মহাহ্রদের তটভূমিতে ঐরূপ ঝঞ্ঝা-সমূহেরই তরঙ্গাভিঘাতচিহ্ন দেখিতে পাই।*

---

* অনেকজাতি-সংসারং সন্ধাবিস্‌সম্‌ অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনং॥
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা॥

আমি এই দেহরূপ গৃহের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বহু জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছি। হায়, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি দুঃখদায়ক! হে গৃহনির্ম্মাণকারিণী তৃষ্ণে, আমি তোমায় দেখিতে পাইয়াছি। আর তুমি গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না।

কিন্তু একটী জিনিস আচার্য্যদেবের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ছিল—যাহাকে তিনি কিরূপে ঠিকমত রাখিবেন, তাহা নিজেই জানিতেন না। উহা তাঁহার স্বদেশ-প্রেম এবং স্বদেশের দুর্দ্দশার প্রতীকারেচ্ছা। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম; দেখিতাম, ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাসপ্রশ্বাসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সত্য বটে তিনি কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে চাহিলে একেবারে উহার মূলে না গিয়া ছাড়িতেন না; তিনি "জাতীয়ত্ব" শব্দটীও ব্যবহার করিতেন না বা বর্ত্তমান যুগকে 'জাতি-গঠনেরই' যুগ বলিয়াও ঘোষণা করিতেন না; তিনি বলিতেন, 'আমার কাজ মানুষ গড়া।' কিন্তু তিনি প্রেমিকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর জন্মভূমিই তাঁহার আরাধ্যদেবতা ছিল। একটী ঘণ্টাকে চারিদিকের ভার সমান করিয়া নিপুণভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন উহা যে কোন শব্দ দ্বারা তাড়িত হইবামাত্র ঝঙ্কৃত ও স্পন্দিত হইয়া উঠে, তাঁহার জন্মভূমিসংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ করিয়া উঠিত। ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে যে কোন কাতরধ্বনি উঠিত, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিরূপে উত্তর পাইত। ভারতের প্রতি ভীতিসূচক চীৎকার, দুর্ব্বলতাপ্রসূত গাত্রকম্প, অপমানজনিত সঙ্কোচ বোধই তিনি জানিতেন এবং বুঝিতেন। তিনি ভারতকে তাহার পাপাচরণ-সমূহের জন্য তীব্র তিরস্কার করিতেন, তাহার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উপর খড়্গহস্ত ছিলেন; কিন্তু সে কেবল তিনি ঐ দোষগুলিকে তাঁহার নিজেরই দোষ মনে করিতেন বলিয়া। পক্ষান্তরে, আবার কেহই তাঁহার ন্যায় ভারতের ভাবী মহিমা কল্পনায় অভিভূত হইতেন না। তাঁহার নিকট ভারত ইংরাজী সভ্যতার প্রসূতি বলিয়া প্রতিভাত হইত। তিনি বলিতেন, "দেখ না কেন, আক্‌বরের ভারতের তুলনায় এলিজাবেথের ইংলণ্ড কি ছিল? শুধু তাহাই বা কেন, ভারতবর্ষের ধনভাণ্ডার পশ্চাতে না থাকিলে ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডই বা কি হইত? তাহার সভ্যতা কোথায় থাকিত? তাহার অভিজ্ঞতা কোথায় থাকিত?" তাঁহার মুখ হইতে স্বদেশের ধর্ম্ম, ইতিহাস, ভূগোল ও

তোমার গৃহের সমস্ত পার্শ্বক (চালের "রুয়া") ভগ্ন হইয়াছে এবং শীর্ষকাষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্ত সংস্কারবিহীন হইয়া তৃষ্ণাসকলের ক্ষয়সাধন করিয়াছে। —ধর্ম্মপদ।

জাতিতত্ত্বের কথা অবিরত ধারায় প্রবাহিত হইত। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাবেই তিনি ভারতীয় প্রসঙ্গে কথা কহিতে সমান আনন্দ অনুভব করিতেন—অথবা তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট এইরূপই বোধ হইত। এমন কি, সময়ে সময়ে এমনও হইত যে, যদি কেহ স্বামিজী ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মনে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আর অধিক শুনা তাঁহার শক্তিতে কুলাইত না। কিন্তু আবার যদি কেহ উহাদিগকে সম্বদ্ধভাবে মনে রাখিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, আরও দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন-গুলির, অথবা বিভিন্ন প্রদেশের জাতিগত আচার ব্যবহারের খুঁটীনাটীগুলির, অথবা কোন জটিল অধ্যাত্মবাদ বা ধর্ম্মতত্ত্বের অবিশ্রান্ত ধারায় বিশ্লেষণ চলিয়াছে।

তাঁহার এই সকল কথোপকথনে রাজপুতগণের বীরত্ব, শিখদিগের বিশ্বাস, মারহাট্টাগণের শৌর্য্য, সাধুদিগের ঈশ্বরভক্তি, এবং মহানুভাবা নারীগণের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা—এই সব যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিত। আর মুসলমান যে এই প্রসঙ্গে বাদ পড়িবেন, তাহা তিনি হইতে দিতেন না। হুমায়ুন, সেরশা, আক্‌বর, সাজাহান,—ইঁহাদের এবং আরও একশত লোকের নাম তিনি কোন না কোন দিন এই ইতিহাস-পৃষ্ঠোজ্জ্বলকারী নামাবলীর আবৃত্তিপ্রসঙ্গে যথাস্থানে উল্লেখ করিতেন। এই তিনি অদ্যাপি দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় গীত, তানসেনরচিত আক্‌বরের সিংহাসনাধিরোহণ-বিষয়ক গানটী তানসেনেরই স্বরলয়ে আমাদিগকে গাহিয়া শুনাইতেছেন; এই আবার বুঝাইয়া দিতেছেন যে, মোগলবংশে বিবাহিত হিন্দুরমণীগণ বিধবা হইলে কখনও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতেন না, তাঁহারা হিন্দুরমণীর ন্যায় পূজাপাঠে মগ্ন থাকিয়াই জীবনের সঙ্গহীন বর্ষগুলি যাপন করিতেন। অন্য এক সময়ে তিনি, যাঁহার মহতী প্রতিভা মুসলমান পিতা ও হিন্দু মাতা হইতে ভারতীয় সম্রাট্‌গণের জন্ম হওয়া উচিত, এইরূপ বিধান করিয়াছিলেন, সেই জাতীয় গৌরব আক্‌বরের কথা কহিতেন। আবার এক সময়ে তিনি আমাদিগের নিকট সিরাজুদ্দৌলার উজ্জ্বল, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে ক্ষণস্থায়ী রাজত্বের বর্ণনা করিতেন, কিরূপে পলাশী-ক্ষেত্রে হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল, বিশ্বাসঘাতকতাবশতঃ প্রদত্ত একটী

আদেশ শ্রবণে—"তাহা হইলে আজিকার যুদ্ধে জয়াশা নাই!"—এই আক্ষেপোক্তি করিয়া অশ্বসমেত গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন; আর কিরূপে সিরাজের সতীসাধ্বী স্ত্রী নিজ আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে বৈধব্যের শ্বেতবাস পরিধান করিয়া দীর্ঘ বর্ষের পর বর্ষ পরলোকগত স্বামীর কবরের উপর দীপদান করিয়া যাইতেন।—আমরা রুদ্ধশ্বাসে তাঁহার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিতাম এবং শুনিতে শুনিতে উক্ত দৃশ্যগুলি যেন আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠিত।

কখনও কখনও কথোপকথন অপেক্ষাকৃত কৌতুকপরিহাসময় হইত। কোন সামান্য ঘটনা হইতেই ঐরূপ হইত। কোন মিষ্টান্নপ্রাপ্তি অথবা মৃগনাভি বা জাফরাণের মত কোন দুর্লভ বস্তুলাভ, অথবা এতদপেক্ষাও সামান্য ঘটনাই উহার সূত্রপাত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত। পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে আর একবার তিনি, প্রদোষে কোন ভারতীয় গ্রামের বহির্ভাগে কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া ক্রীড়ারত বালকবালিকাগণের তন্দ্রাজড়িত কোলাহল, সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি, গোপালকগণের চীৎকার এবং স্বল্পকালস্থায়ী গোধূলির আধ-অন্ধকারে শ্রুত অস্ফুট কণ্ঠস্বর—এই সকল সান্ধ্য আওয়াজ পুনরায় শুনিবার জন্য তিনি কত উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আশৈশব তিনি যাহা শুনিয়া আসিয়াছেন, সেই আষাঢ়ের বারিপাতশব্দ শুনিয়া তাঁহার দেশের জন্য কত মন কেমন করিয়াছিল! বৃষ্টি, অথবা জলপ্রপাত, অথবা সমুদ্রের জলের শব্দ তাঁহার নিকট কত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইত! একবার তিনি দেখিয়াছিলেন, একটী জননী উপলখণ্ড হইতে উপলখণ্ডান্তরে পাদবিক্ষেপ করিয়া একটী পার্ব্বত্য তটিনী পার হইতেছেন, আবার উহারই মধ্যে এক একবার মুখ ফিরাইয়া পৃষ্ঠস্থিত শিশুসন্তানটীকে খেলা দিতেছেন ও আদর করিতেছেন। এই দৃশ্যটীই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য বলিয়া মনে পড়িত। তাঁহার চক্ষে, হিমালয়ের অরণ্যানীমধ্যস্থ এক পর্ব্বতপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া, নিম্নে স্রোতস্বিনীর অবিরাম 'হর হর' ধ্বনি শুনিতে শুনিতে শরীর ছাড়িয়া দেওয়াই আদর্শ-মৃত্যু।

স্পাইর্যালের (ক্রমসূক্ষ্মাকার পেঁচ) বেড়গুলি যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোটা হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিতে উঠিতে শেষে এক বিন্দুতে পর্য্যবসিত

হয়, স্বামিজীর স্বদেশভক্তিরূপ আবেগও যেন সেইরূপ একটী বিরাট্ বস্তু; স্বদেশের মৃত্তিকার প্রতি ভালবাসা ও নিসর্গপ্রেমই উহার সর্ব্বনিম্ন বেড়গুলি; জাতি, অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, এবং চিন্তা—এই সকল সম্পর্কীয় যাহা কিছু, সমস্তই উহার পরবর্ত্তী বেড়গুলির অন্তর্গত; আর, সমস্তটা সরু হইয়া আসিয়া একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। ভারত যে উহার সমালোচকগণের ধারণামত স্থবির ও জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই, পরন্তু যুবাবস্থই আছে এবং উহার ভাবী সমৃদ্ধি-বীজ যে পরিপক্ক হইয়াছে, আর উহা যে, এই বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে, পূর্ব্বে যাহা কখনও হয় নাই, এরূপ এক মহান বিকাশের পথে পদার্পণ করিয়াছে—এই দৃঢ় বিশ্বাসই ঐ কেন্দ্রস্থানীয় বিন্দু। কিন্তু একবারমাত্র আমি তাঁহাকে এই ভাব কথায় প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। খুব শান্তিপূর্ণ একটী মুহূর্ত্তে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি নিজেকে বহুশতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বলিয়া অনুভব করিতেছি। **আমি দেখিতেছি যে, ভারত যুবাবস্থ।**" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রত্যেক কথাটীতেই এই উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার প্রত্যেক গল্পটীতে ইহার স্পন্দন অনুভূত হইত। যাহা কিছু ভারতসংক্রান্ত তাহার জন্য ন্যূনতা স্বীকার করাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন, আর কোন মিথ্যা অপবাদ বা অবজ্ঞাসূচক সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করিতে করিতে, অথবা কিরূপ বিশ্বাস ও ভালবাসা লইয়া স্বদেশসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তন্ময়ভাবে এই বিষয়ে কাহাকেও শিক্ষা দিতে দিতে (অবশ্য, এই বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁহার নিজের বিশ্বাস ও ভালবাসার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া হওয়া ব্যতীত কখনও আর কিছুই হইতে পারিত না), কতবারই না মনে হইত, তাঁহার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার ভিতর হইতে যোদ্ধার বর্ম্ম বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

তাই বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে করিবেন না যে তিনি, এই সকল বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কতটা প্রলোভনও আসিয়া যায়, তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি যখন সবেমাত্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"সত্য বটে, তাহার মনের উপর অজ্ঞানের একটী পর্দ্দা আছে। সেটুকু আমার ব্রহ্মময়ীমাই রাখিয়া দিয়াছেন,

তাঁহার কাজ হইবে বলিয়া।" কিন্তু উহা ফিন্‌ফিনে কাগজের পর্দ্দার মত পাত্‌লা, নিমেষেই ছিঁড়িয়া ফেলা যায়।" এইরূপে, যে ব্যক্তি গৃহপরিজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সে যেমন উহাদিগের চিন্তাকে স্ববশে রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, সেইরূপ তিনিও বার বার দেশ ও ইতিহাসঘটিত এই সকল চিন্তাকে দমন করিয়া, যাহাতে তিনি সকল দেশ ও সকল জাতির প্রতি সমদৃষ্টি, নিঃসম্বল, পরিব্রাজকমাত্র হইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতেন কাশ্মীরে, তাঁহার জীবনের একটী মহান্ দর্শনলাভের পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি শিশুর ন্যায় সরলভাবে বলিয়াছিলেন,—"আর এইরূপ ক্রোধ করা চলিবে না। মা বলিলেন, 'বাঃ, যদিই বা ম্লেচ্ছ আমার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমার প্রতিমা-সকল অপবিত্র করে, তাহাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস্; না আমি তোকে রক্ষা করি?'"

তাঁহার নিজের আদর্শ ছিলেন সেই সিপাহী-বিদ্রোহকালের সন্ন্যাসী, যিনি একজন ইংরাজ সৈনিক কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া পনর বৎসরের মৌনভঙ্গ করিয়া তাঁহার ঘাতককে বলিয়াছিলেন, "আঘাত করিয়াছ, তাহাতে কি?—তুমিও তিনিই—'তত্ত্বমসি'।"

তিনি সর্ব্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্কানুসারী হইতে চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহার নিজের কোন বাণীর উল্লেখ যেন তাঁহার নিকট স্বধর্ম্মচ্যুতি বলিয়া বোধ হইত। এতদ্ভিন্ন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যে শক্তি শুধু ভাব-প্রবণতায় ব্যয়িত হয়, তাহা বৃথাই নষ্ট হয়,, এবং শক্তিকে সংযম করিলেই তাহা সঞ্চিত হইয়া কর্ম্মের' আকারে প্রকাশ পায়। তথাপি, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লোককে দান করিবার প্রবল বাসনা আবার তাঁহাকে অভিভূত করিত, এবং তিনি উহা জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই তিনি আবার তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে প্রেম ও আশাপূর্ণ চিন্তাসকল চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে থাকিতেন। এই সকল চিন্তাবীজ অনেক স্থলে, যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদ্ধারণক্ষম ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, এবং ইতিমধ্যেই ভারতের দূরদূরান্তর প্রদেশসমূহে ইহাদের অঙ্কুরোদ্গমও হইয়াছে। যাঁহারা জন্মভূমির প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁহারই জন্য মনঃ-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিগণই এই অঙ্কুর! শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ কোন পুস্তক না পড়িয়াও বেদান্তের মূর্ত্তিমান্

সারনিষ্কর্ষ-স্বরূপ ছিলেন। শ্রীবিবেকানন্দও সেইরূপ জাতীয় জীবনের সারনিষ্কর্ষ-স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু ইহার বিচারমূলক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না। তাঁহার গুরুদেবের প্রতি প্রযুক্ত তাঁহার নিজমুখের কথাতেই বলিতে হয়,—"তিনি শুধু সেই মহৎ জীবন যাপন করিয়া যাইতেন; তাহার ব্যাখ্যা অপরে খুঁজিয়া বাহির করুক!"

অযোধ্যা-ভ্রমণ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবমীর দিন সন্ধ্যাবেলা অযোধ্যাতে রামলীলা হয়; আমরা সে দিন রামলীলা দেখিতে গেলাম। সরযূর ঠিক উপরেই রামলীলা হইতেছিল। দূর হইতেই লোকের ভিড় টের পাইলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাপ্রকার খাবারের দোকান অতিক্রম করিয়া আমরা রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলাম। দীর্ঘ একখণ্ড ভূমির এক প্রান্তে একটী উচ্চ মঞ্চের উপর তিনটী লোক রাজবেশ পরিয়া বসিয়া আছে। শুনিলাম, তাহারা রাবণ, ইন্দ্রজিৎ এবং কুম্ভকর্ণ। অপর প্রান্তে ঐরূপ আর একটী মঞ্চ, তাহার উপর ৭।৮ বৎসরের দুইটী সজ্জিত বালক বসিয়া আছে; ইহারা রাম ও লক্ষ্মণ। এই মঞ্চের নিকট ভূমির উপর আসন পাতিয়া বহুসংখ্যক পণ্ডিত বসিয়া আছেন। রঙ্গভূমির উপর কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। তাহার চারিদিকে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী গৃহের ছাদে মেয়েদের বসিবার স্থান হইয়াছে। রামলক্ষ্মণের মঞ্চের নিকট একটী পণ্ডিত বাল্মীকির রামায়ণ হইতে বিশিষ্ট স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং তদনুরূপ অভিনয় হইতেছে। একদল লোক রাক্ষস সাজিয়াছিল, আর একদল বানর সাজিয়াছিল। তাহাদের অস্ত্র, প্রত্যেকের করস্থিত এক একটী চর্ম্ম-গোলক। সঙ্কেত পাইয়া উভয় দলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইখানে তাহারা অভিনয় ছাড়িয়া সত্য সত্যই মারামারি করিতে লাগিল। চামড়ার গোলকগুলি আঘাত-প্রঘাতে ছিঁড়িয়া গেল।

তখন রিক্ত-হস্তে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুই চারিজন বীর উভয় হস্তে শস্ত্রপাত করিতে করিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে রাক্ষসের দলেই বলবান্ লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। বানরের দল আর পারিতেছিল না। তাহারা ক্রমশঃই হটিয়া যাইতেছিল। উপস্থিত যে কয়জন যোদ্ধা পাওয়া গেল, তাহাদিগকে বানরদলের সাহায্যে নিয়োগ করিলেও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না। মাতব্বর লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। আমাদের ছৈলবিহারী পাণ্ডা ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অনুনয়বিনয়ে রাক্ষসদের দলের যুযুৎসা কিছু কমাইতে পারা গেল। বানরের দল তখন মহা উৎসাহে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেল।

রামলক্ষ্মণের সহিত রাবণের যুদ্ধ দেখিলাম। রামলক্ষ্মণবেশধারী শিশুদ্বয় নির্ভয়ে ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাবণ একটা মস্ত জোয়ান লোক, রামলক্ষ্মণ বহুক্ষণ তাহার বিপক্ষে যুদ্ধের অভিনয় করিতে লাগিল। অবশেষে শক্তিশেল আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইলেন। পণ্ডিতজী রামায়ণ হইতে রামের বিলাপ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। হনুমান্ গন্ধমাদন লইয়া আসিল। লক্ষ্মণ আবার বাঁচিয়া উঠিলেন।

সেই রাত্রেই আমাদিগকে অযোধ্যা ত্যাগ করিতে হইবে, সুতরাং আমরা আর থাকিতে পারিলাম না, চলিয়া আসিলাম। যে সরযূ একদিন রামের প্রকৃতলীলা দেখিয়াছিল, সে আজ তাহার তীরে রামলীলার এই অভিনয় দেখিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখনও ট্রেণ আসিতে বিলম্ব আছে। কিছুক্ষণ ষ্টেশনে পাদচারণ করিয়া ক্লান্তিবশতঃ সতরঞ্চি পাতিয়া উপবেশন করিলাম। বসিয়া বসিয়া শুইতে ইচ্ছা করিল,—একটু শুইলাম। যখন নিদ্রা প্রায় আসিয়াছে, বিশ্রামের জন্ম শরীর অত্যন্তই কাতর, তখন গোলমাল হইল,—"গাড়ী আ গিয়া" "গাড়ী আ গিয়া"। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, লাইনস্ম্যান নীল আলো দোলাইতেছে, লোকজন ব্যস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে, হুস্ হুস্ শব্দ করিতে করিতে ষ্টেশন কাঁপাইয়া গাড়ী আসিয়া পড়িল। আমরা তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া গাড়ীতে

উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুপ্তিমগ্ন নগরীর নিকট বিদায় লইয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

আমাদের গাড়ীতে বেশী ভিড় ছিল না, আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রিত জনপদের মধ্য দিয়া নিদ্রামগ্ন আরোহী লইয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। যখন উদীয়মান সূর্য্যের পুরোগামী আলোকপ্রবাহে পূর্ব্বাকাশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসারিত হইতেছিল। তরুলতা এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রনিচয় ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে মাঠের মধ্যে দুই চারিটী করিয়া গ্রামবাসী দেখা যাইতে লাগিল। পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। পৃথিবীর বক্ষে স্বর্ণরশ্মি পড়িয়া হাস্য করিতে লাগিল। প্রভাতেই গাড়ী কাশীতে পৌঁছিল। আমরা নামিয়া পড়িলাম।

কাশীতে আমারা কোথায় উঠিব, কিছুই ঠিক ছিল না। ঠিক ছিল,—শুধু একটী পাণ্ডা। মোটা পেট এবং দীর্ঘ লাঠি লইয়া পাণ্ডাজী দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভাঙ্গা বাঙ্গালাভাষায় তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন যে আমাদের জন্য একটী বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা রওনা হইলাম। কিন্তু যে বাসায় তিনি আমাদিগকে লইয়া গেলেন, দেখিলাম, সেখানে বাস করা অসম্ভব—অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে, বায়ুর চলাচল রহিত। অগত্যা অন্য একটী বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। কলিকাতায় শুনিয়াছিলাম যে, মানমন্দিরে ভাড়া দিয়া থাকিতে পারা যায়। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম তাহা হইবে না। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট দুই চারিটী বাসা দেখিলাম। একটী বাটী পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু সে বাটীর গৃহ-স্বামী নিজে পাণ্ডা, আমাদের পাণ্ডার ন্যায় তাঁহারও হাতে দীর্ঘ লাঠি ছিল, উভয় পাণ্ডাতে মারামারি হয় আর কি! আমরা সে বাটীর আশা ত্যাগ করিলাম। এ দিকে বেলা বাড়িয়া যাইতেছিল; গাড়োয়ান চ্যাঁচামেচি করিতেছিল। তখন একটী পছন্দমত বাটী অত্যন্ত অপছন্দ মূল্যে স্থির করিয়া তাহাতেই আশ্রয় লইলাম।

সে দিন বিজয়া-দশমী। শুনিলাম, সন্ধ্যার সময় বহুসংখ্যক প্রতিমা নৌকা করিয়া গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করাইয়া অবশেষে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে।

নৌকায় চড়িয়া ঐ দৃশ্য দেখিতে নাকি বড়ই সুন্দর। অনেক কষ্টে একখানি নৌকা যোগাড় করা গেল। বৈকালে আমরা তাহাতে উঠিলাম। দশাশ্বমেধের দীর্ঘসোপানশ্রেণীযুক্ত উচ্চ ঘাটগুলি লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। দুই একখানি করিয়া দুর্গা-প্রতিমা আসিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; কাশীর অসংখ্য দেবালয় হইতে আরতির শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। নগরী আলোকমালায় বিভূষিতা হইল। গঙ্গার চঞ্চল জলে পড়িয়া আলোকরশ্মি নৃত্য করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অনেকগুলি প্রতিমা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিমাগুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত। নহবৎ, কনসার্ট প্রভৃতির ধ্বনিতে নৈশবায়ু আন্দোলিত হইতেছিল। গঙ্গাবক্ষ অসংখ্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে এক একখানি করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হইতে লাগিল। ক্রমে উৎসব-দৃশ্য মলিন হইয়া আসিল। আমরা বাড়ী ফিরিলাম। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, আজ বঙ্গের প্রতি গ্রাম বিদায়ের করুণ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মা যে আজ ঘর আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন—যে মা আসিবেন বলিয়া সন্তানগণ দীর্ঘ এক বৎসর উৎসুক-হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিল, যাঁহার অবস্থানের তিন দিন আনন্দ ও উৎসবের মধ্যে কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহার ঠিক ছিল না, সেই মায়ের আনন্দমূর্ত্তি জলে ভাসাইয়া দিয়া বাঙ্গালী আজ নিরানন্দহৃদয়ে ঘরে ফিরিতেছে।

কাশীতে আমরা ৪।৫ দিন ছিলাম, থাকিতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। আমাদের বাটী দশাশ্বমেধ-ঘাটের নিকটেই থাকায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিবার সুবিধা ছিল। একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিলাম। আওরঙ্গজেবের মস্‌জিদের সংলগ্ন উচ্চ ধ্বজার উপর আরোহণ করিয়া ঘন-সৌধ-গঠিত মন্দির-বহুল কাশীনগরের এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশের শোভা দর্শন করিলাম। কুইন্‌স্ কলেজের গঠন-সৌন্দর্য্য এবং তাহার চারিদিকে সুন্দর বাগান অতি তৃপ্তিদায়ক বোধ হইল। কেদারঘাট, তিলভাণ্ডেশ্বর, কালভৈরব প্রভৃতি দর্শন করিলাম। দুর্গাবাড়ীর রক্তপ্রস্তরগঠিত মন্দির এবং তাহার সুন্দর শিল্পকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কবীরের আখড়া, ভাস্করানন্দের মর্ম্মরনির্ম্মিত সমাধিগৃহ, তুলসীদাসের স্থান প্রভৃতি দেখিলাম। কাশীতে দেখিবার

স্থান অসংখ্য। সকলের বর্ণনা করিলে বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। দুই একটীর কথা বলিব।

বিশ্বেশ্বরের আরতি কাশীতে দেখিবার জিনিষ। সন্ধ্যাবেলায় আমরা যখন মন্দির অভিমুখে যাইতেছিলাম, দেখিলাম, রাজপথ দিয়া জনস্রোত সেই দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে লোকারণ্য। কোন মতে দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রাশি রাশি প্রফুল্ল পুষ্প দ্বারা শিবলিঙ্গ সুন্দর-ভাবে সাজান হইয়াছে। চারিদিকে সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে আরতি আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণগণের সম্মিলিত স্বরে মধুর ও গম্ভীর শিবস্তোত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলী ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

প্রভাতে নৌকা করিয়া কাশীনগরীর সম্মুখে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ একটী অতি রমণীয় ব্যাপার। ধীরসমীরে গঙ্গাবারি তরঙ্গায়িত হইতেছে, নবীন সূর্য্যালোক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিন্যস্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী সৌধমালার উপর পড়িয়াছে, অসংখ্য মন্দির হইতে উত্থিত নহবতের মধুর সঙ্গীত আকাশবায়ু পরিপূর্ণ করিয়াছে, ঐটী মণিকর্ণিকার ঘাট, ঐ পঞ্চগঙ্গাঘাট, ঐ সিন্ধিয়ার ঘাট, ঐ দশাশ্বমেধ ঘাট—ঐ একটী সতীস্তম্ভ,—ঘাটে ঘাটে বিবিধবর্ণের বেশপরিহিত বিভিন্নদেশীয় স্নানার্থী, কেহ বা স্নানান্তে সমাহিতচিত্তে পূজা করিতেছে—নৌকা হইতে এই সকল দেখা যায়। ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ রাজা-মহারাজার বাটী গঙ্গাতীরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মানসিংহের মানমন্দির, চৈৎসিংহের প্রাসাদ দেখিতে পাইবেন। ঐ জানালা হইতে গঙ্গার উপর লাফ দিয়া চৈৎসিংহ পলায়ন করিয়াছিলেন। ঐ পরপারে রামনগরের আধুনিক প্রাসাদের শোভা।

কাশীতে আসিলে সকলের একবার সারনাথ যাওয়া উচিত। সারনাথ কাশী হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বরুণা নদীর প্রায়-স্রোতোহীন সলিল উত্তীর্ণ হইয়া সারনাথের বৃক্ষচ্ছায়াশীতল পথটী উভয় পার্শ্বের দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রসারিত। পথের ধারে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ও দোকান, কচিৎ দুই একটী উদ্যানবাটিকা। পথের কিয়দংশ ছোট রেল-লাইনের পাশাপাশি চলিয়াছে। সারনাথের কাছে আসিয়া পথের

বামপার্শ্বে এক প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়াইয়া গিয়া অল্পদূরেই সারনাথের ধ্বংসাবশেষ। এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড খনন করিয়া ছোট বড় নানা আকারের গৃহ, স্তূপের ভিত্তি, স্তম্ভের নিম্নাংশ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশোকের একটী অখণ্ড শিলাস্তম্ভের কিয়দংশ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। উপরের অংশ অদূরে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অশোকস্তম্ভের উপর পালিভাষায় খোদিত শিলালিপি। এই স্থান খনন করিয়া যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, তাহা প্রথমতঃ একটী ছোট খোলা-ঘরে রাখিয়া পরে সন্নিহিত মিউজিয়মে লইয়া যাওয়া হইতেছে। মিউজিয়মটী একটী দেখিবার জিনিস। অশোকস্তম্ভের সিংহশীর্ষটী (Lion capital) এখানে রহিয়াছে। ৭।৮ হাত উচ্চ একটী প্রকাণ্ড বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি এবং তাঁহার উপরিস্থ ছত্রের দণ্ড ও শিরোভাগ বিদ্যমান। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের, দেবদেবীর এবং স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতির অসংখ্য মূর্ত্তি বিদ্যমান। বহু উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা ছাড়া অতি ক্ষুদ্র হইতে অতিবৃহৎ নানা আকারের মৃন্ময় ও প্রস্তরপাত্র রহিয়াছে।

মিউজিয়ম দেখিয়া বৌদ্ধস্তূপ দেখিতে গেলাম। যে সকল স্থান খনন করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বভাগে এই প্রাচীন স্তূপটী পক্ককেশের ন্যায় লতা-গুল্মাবলীর দ্বারা আবৃত মস্তক ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সাধারণতঃ বুদ্ধদেবের শরীরের কোনও একটী ক্ষুদ্র অংশ স্থাপন করিয়া তাহার উপর এই সকল স্তূপ নির্ম্মিত হইত। স্তূপের গাঁথনি নিরেট। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনও পথ নাই। নীচের কতক অংশ সরকারের দ্বারা সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। যে অংশগুলি মেরামত হয় নাই, তাহাতে প্রাচীন শিল্পের মনোহর নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

কত শত বৎসর ধরিয়া এই স্তূপটী এখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমক্ষে কত অতীত ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছিল। অদূরবর্ত্তী ঐ বৌদ্ধবিহারের সমৃদ্ধ অবস্থা বোধ হয় সে দেখিয়াছিল, তার পর সেই বিহারের ধ্বংস হইল, পৃথিবীবক্ষ হইতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল, এই সকল ঘটনাই স্তূপটী অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত দেখিয়া আসিয়াছে। কত দুর্দ্দিনের ঝড়-জল ইহার উপর আঘাত করিয়াছে। এখনও প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ সমীর ইহার সর্ব্বগাত্র

স্পর্শ করে—তখন কি ইহার পুলকিত হৃদয়ে সুদূর অতীতের স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠে—যখন ইহার নবীন কলেবরের উপরিভাগ পুষ্প ও পতাকা দ্বারা সজ্জিত হইত এবং ইহার চারিদিকে উৎসব হইত!

যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর এই সকল অতীতের নিদর্শন রহিয়াছে তাহার দুইদিক ঘেরিয়া একটী দীর্ঘ জলাশয়ের প্রণালী বর্ত্তমান রহিয়াছে। বহুপূর্ব্বে বোধ হয় এখানে কয়েকটী দীঘি ছিল, তাহা হইতে বিহারের ভিক্ষুগণের জল সংগ্রহ হইত। এক্ষণে এই জলাশয়ের গর্ভ প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে, সামান্য পঙ্কিল জল তথায় বর্ত্তমান। তাহাতে নামিয়া গ্রাম্য স্ত্রীলোক এবং বালকেরা এক প্রকার জলজ শাক-সংগ্রহে নিযুক্ত রহিয়াছে দেখিলাম।

অদূরে একটী উচ্চস্থানের উপর সোমনাথ ও সারনাথ নামক শিবলিঙ্গ রহিয়াছেন। শিবলিঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া আমরা কাশী ফিরিলাম।

আমাদের ইচ্ছা হইল যে, কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল গিয়া সেখান হইতে কলিকাতা ফিরিব। টাইম-টেবলে দেখিলাম যে, কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত মোটর-কোচ চলে। মটর-কোচে যাওয়াই সুবিধা দেখিলাম। মোটর-কোচ কি জিনিস জানিতাম না। ভাবিলাম, অনেকটা মোটর-কারের মতই হইবে। সস্তায় মোটর-কারে চড়া হইবে, এই ভাবিয়া উৎসাহ বাড়িয়া গেল। যথা সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার বহুক্ষণ পরে মোটর-কোচ দর্শন দিলেন। ইহার কিছুমাত্র বিশেষত্ব ছিল না, ঠিক একখানি রেলগাড়ী। অনেক লোক হইল। গাড়ী গঙ্গার সেতু পার হইয়া একটী নূতন পথে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-লাইনে উপস্থিত হইল। তাহার পর পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। এক এক ষ্টেশনে গাড়ী থামে, কয়েকজন আরোহী নামিয়া যায়, আর তাহার দ্বিগুণসংখ্যক লোক গাড়ীতে আরোহণ করে। গাড়ীতে আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। বসিয়া থাকা অতিশয় কষ্টকর বোধ হইতেছিল। ভাবিলাম, মোটরকার চড়ার সুখ হইতেছে বটে।

চুণার ষ্টেশন হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাহাড়ের উপর দুর্গটী দেখা যাইতেছিল। মির্জ্জাপুর একটা বড় ষ্টেশন, তাহার পরেই এবং অতি নিকটে বিন্ধ্যাচল। বিন্ধ্যাচলে যখন পৌঁছিলাম, তখন অপরাহ্ণ। বামপার্শ্বে দেখিলাম, পাহাড়ের পর পাহাড় অনন্ত শ্রেণীপরম্পরায় অগ্রসর হইয়া দূরে

পশ্চিমগগনপ্রান্তে মিলাইয়া গিয়াছে। আমরা মোটরকোচের নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম।

গাড়ীতেই একটী পাণ্ডার লোকের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল। তাহার সহিত ষ্টেশন হইতে চলিলাম। সুদীর্ঘ ভুট্টাগাছের মধ্য দিয়া পথ। প্রথমে আমরা ধর্ম্মশালার খোঁজ লইলাম, শুনিলাম, কোথাকার রাণী সদলবলে তথায় অবস্থান করিতেছেন, অন্যের প্রবেশ নিষেধ। অগত্যা পাণ্ডাজীর আশ্রয় লইতে হইল। পাণ্ডাজীর একটী দোতলা ভাড়া ছিল, সেটী দেখিলাম বেশ সুবিধার, কিন্তু আমাদের একটী সহযাত্রী আমাদের দুর্ভাগ্য এবং তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব্বেই তাহা অধিকার করিয়াছিলেন। আর কোনও ঘর পছন্দ হইল না। অবশেষে পাণ্ডাজীর বসতবাটীরই বৈঠকখানাঘরে আশ্রয় লইলাম।

সেখান হইতে গঙ্গা অতি নিকটে। বৈকালে সে দিকে বেড়াইতে গেলাম। কি উচ্চ তীরভূমি! বহুসংখ্যক বড় বড় সিঁড়ির ধাপ—নামিয়া গিয়া জলের নিকট উপস্থিত হইলাম। বুঝিলাম এই স্থানের নাম বিন্ধ্যাচল কেন। ষ্টেশন হইতে যে পশ্চিমদিগন্তপ্রসারী পর্ব্বতমালা দেখিয়াছিলাম, তাহা বিন্ধ্যগিরির সহিত সংযুক্ত এবং সেই পর্ব্বতশ্রেণীর শেষ প্রান্ত এইখানে আসিয়া গঙ্গার সলিল স্পর্শ করিয়াছে।

বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মূর্ত্তি আছেন। সন্ধ্যার সময় একবার দর্শন করিয়া আসিলাম। শুনিলাম মায়ের প্রতিমা ভাল করিয়া সাজাইয়া আরতি করা হয়। তাই মধ্য-রাত্রে উঠিয়া পুনরায় দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরে যাইবার পথটী ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়াছে। বোধ হইল, মন্দিরটী পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থলে অবস্থিত। মন্দিরের তলভাগ চতুষ্কোণাকার ও প্রশস্ত। তাহার এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় স্থানে পাষাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অধিক রাত্রে যখন নূতন বস্ত্র এবং প্রচুর পুষ্পের দ্বারা প্রতিমা সজ্জিত হইয়াছিল, তখন দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল।

পরদিন সকালে যখন মন্দিরে পূজা দিতে গেলাম, তখন ভয়ানক ভিড় হইয়াছিল। সে দিন বুঝি শুভদিন ছিল। প্রবেশ করিবার সময় বেশী ভিড় হইবে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর যখন অভ্যন্তরস্থ

প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম, বাহির হইতে দলের পর দল লোক ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, অধিকাংশই পশ্চিমদেশীয় শ্রমজীবী। মন্দিরের প্রশস্ত গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। ভয়ানক ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। তথাপি বাহির হইতে লোক আসিতে লাগিল। শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেদিনকার কষ্ট বহুকাল মনে থাকিবে।

কলিকাতা যাইবার ট্রেণ বৈকালে এখানে উপস্থিত হইবে। এখনও অনেক সময় আছে। এখান হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অষ্টভুজার মন্দির আছে, তাহা দেখিয়া আসিব স্থির করিলাম। একখানি গাড়ী ঠিক করিলাম,—কতকটা বালিকাবিদ্যালয়ের গাড়ীর মত, কেবল উপরের আবরণ নাই এবং আকার ক্ষুদ্র। রেল-রাস্তা পার হইয়া গাড়ী শৈলশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যে পাহাড়ের উপর মন্দির অবস্থিত, তাহার তলদেশে আসিয়া আমরা গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগাত্রে প্রস্তরগঠিত সোপানশ্রেণী। নির্জ্জন স্থান। দক্ষিণে ও পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত পর্ব্বতমালা। উত্তরে গঙ্গা পশ্চিম হইতে আসিয়া পূর্ব্বদিকে বহিয়া গিয়াছে—বহুদূর পর্য্যন্ত জলপ্রবাহ দেখা যাইতেছে। অবশেষে মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। অষ্টভুজার মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। নিকটে দুই চারি ঘর লোক বাস করে। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। শুনিলাম, পর্ব্বতশিখরে অনেকখানি পরিষ্কৃত ভূমি আছে এবং তাহাতে একটা কৃত্রিম হ্রদ আছে। কিন্তু আমাদের আর তাহা দেখা হইল না। আমরা বিন্ধ্যাচলে ফিরিলাম।

বিন্ধ্যাচলে একটা স্বাস্থ্যনিবাস আছে। দেখিলাম, সেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নিজেদের খাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। বাটীর কিয়দংশে ভদ্রলোকদের সপরিবারে থাকিবারও বন্দোবস্ত আছে।

বৈকালের গাড়ীতে আমরা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ীতে খুব ভিড়। পূজার ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছে, অনেক বাঙ্গালী দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহারা মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা প্রভৃতির বর্ণনা করিতেছেন। আমরা মনশ্চক্ষে সেই সকল স্থান দেখিতে দেখিতে কলিকাতা ফিরিলাম।

(সমাপ্ত)

অয়কেন। (Rudolf Eucken.)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল)

সিন্‌ট্যাগ্‌মা (Syntagma) কি ?

অয়কেন তাঁহার নূতন দর্শনের গোড়াপত্তন করিতে গিয়া 'সিন্‌ট্যাগ্‌মা এই কথাটি বিশেষরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই অয়কেনের দার্শনিক মত বুঝিতে গেলে,—তাঁহার উদ্ভাবিত এই সিন্‌ট্যাগ্‌মা কথাটির অর্থ আমাদিগকে প্রথমে বুঝিতে হইবে।

ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক যুগেরই একটা নূতন আদর্শ আছে। সেই আদর্শকে অনুসরণ করিয়াই সেই যুগ চালিত, গঠিত ও একটা বিশেষ আকার প্রাপ্ত হয়। এক কথায় সেই আদর্শই সেই যুগের যুগধর্ম্ম। প্রত্যেক যুগের আদর্শ তাহার পূর্ব্বতন যুগসকলের আদর্শগুলিকে সমন্বয় করিয়া অর্থাৎ তাহার ভিতরকার সার সত্যগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া, এবং সেই সঙ্গে নূতন যুগের অভাব-উপযোগী নূতন মীমাংসা লইয়া—একটি অখণ্ড, পূর্ণ আদর্শরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য যে, কোন জাতির ইতিহাসে তাহার যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্কট-মুহূর্ত্তেই যুগধর্ম্মের এই নূতন আদর্শ মূর্ত্তি গ্রহণ করে ও আসিয়া দেখা দেয়। অয়কেনের বিশ্বাস,—ইউরোপের ইতিহাসে আজ তেমনি যুগ-পরিবর্ত্তনের একটা সঙ্কট মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সমস্ত মতবাদ আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে অয়কেনকে অনুসরণ করিয়া আলোচনা করিয়াছি, তাহার কোনটাই ভবিষ্যের এই নূতন যুগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এখন এমন একটা নূতন আদর্শের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, যাহা গত শতাব্দীর উদ্ভাবিত মতবাদগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া এবং অতিক্রম করিয়া, অথচ বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর নূতন অভাবগুলির মীমাংসা লইয়া ও ইহার নূতন আকাঙ্ক্ষাগুলিকে একটা পরিণতি

দান করিয়া, আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিবে। এই যে সমন্বয়কারী আদর্শ, অয়কেন ইহাকেই নূতন যুগের 'সিন্‌ট্যাগ্‌মা' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অয়কেনের দর্শন, এই নূতন সমন্বয়ের (সিন্‌ট্যাগ্‌মার) বাণী বহন করিয়া আনিতেছে। অয়কেনের এইরূপ বিশ্বাস।

অয়কেন ইউরোপের ইতিহাসে যে একটি যুগ-পরিবর্ত্তনের আভাস দিতেছেন, এবং ভবিষ্যৎ যুগের জন্য যে একটি সমন্বয়কারী আদর্শের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন, ইহা আমাদের খুব ভাবিবার বিষয়। কেননা, ইউরোপের সভ্যতার আদর্শদ্বারা ভারতবাসী আমরা এখন সম্পূর্ণরূপে চালিত না হইলেও যে বিশেষরূপে আক্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই যে সভ্যতা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার আদর্শের পরিবর্ত্তনে আমরা কি করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারি?

বাঙ্গালা দেশেরও কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষী কিছু দিন হইতে অয়কেনেরই মত, ইউরোপের যুগ-পরিবর্ত্তন ও তাহার নূতন যুগের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, তাঁহার 'বৈষ্ণব ও খৃষ্টানধর্ম্মের তুলনামূলক বিচার' প্রবন্ধের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন ইউরোপে যে একটি নূতন আদর্শের নিতান্ত আবশ্যক, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ তাহা খুব দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। তিনি হিন্দু ও গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া, এবং বর্ত্তমান দার্শনিক জগতে পাশ্চাত্য দর্শনের গতির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, গ্রীক সভ্যতা ইউরোপের পঞ্চদশ শতাব্দীর নবযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জার্ম্মনির হেগেল দর্শনে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এখন বাহির হইতে কোনরূপ সহায়তা না পাইলে, জ্ঞানের রাজ্যে শুধু একক ভাবে ইউরোপীয় চিন্তা দ্বারা আর এমন কিছু নূতন আবিষ্কার তেমন সম্ভব নয়, যদ্দ্বারা সমগ্র মানবজাতি সভ্যতার আর একটা নূতন স্তরে গিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ আবার আর একটি গুরুতর কথা বলিয়াছেন। তাহা এই—যে জিনিস পাইলে পাশ্চাত্য জ্ঞানরাজ্যের অদ্যকার এই মন্দগতি চিন্তাস্রোত পুনরায় চঞ্চল ও মুখরিত হইয়া এক প্রবল অধ্যাত্মতরঙ্গে বিশ্ব-মানবকে ভাসাইয়া সচল করিয়া

লইতে পারে, সে অপূর্ব্ব জিনিসটি জগতে কেবল এক হিন্দু সভ্যতার মধ্যেই বিদ্যমান।

স্বামী বিবেকানন্দও এই সিদ্ধান্তের উপর এক অতি সুদূর-সম্প্রসারিত আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারও মতে যে সিংহদ্বার হইতে মহাশক্তির নিষ্ক্রমণ হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল ছাইয়া ফেলিবে, এবার তাহার কেন্দ্র ভারতবর্ষে। এবার আর শুধু গ্রীসের মুখের দিকে তাকাইলে চলিবে না। (ভাববার কথা—পৃঃ ১৭-১৮।) স্বামিজী মান্দ্রাজের একটি বক্তৃতাতেও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক আদর্শের সম্মিলনের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের বুকে এক অতি বৃহত্তর ও উচ্চতর জীবনের আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইবে। (ভারতে বিবেকানন্দ—'আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য।)

এখন অয়কেনের সহিত এই সিন্‌ট্যাগ্‌মা (সমন্বয়ের আদর্শ) ব্যাপারে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের মত তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে—

(ক) ইঁহারা তিন জনেই ইউরোপের নবযুগের জন্য একটি নূতন সমন্বয়কারী আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন। সেই বিষয়ে ইঁহারা একমত।

(খ) অয়কেন ইউরোপের এই নূতন সিন্‌ট্যাগ্‌মা ব্যাপারে হিন্দু প্রতিভার প্রেরণা ও আবশ্যকতা একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর অয়কেনের অতি গুরুতর এবং ভ্রমাত্মক মতামত সিদ্ধান্তই তাহার প্রমাণ।

(গ) অয়কেন তাঁহার সিন্‌ট্যাগ্‌মা ব্যাপারে কেবল ইউরোপেই তাঁহার দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন,—পরন্তু

(ঘ) ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও তৎসঙ্গে বিশেষভাবে ভারতবর্ষ এবং সাধারণভাবে সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের উপরে সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

(ঙ) ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দু প্রতিভা ভিন্ন ইউরোপে নূতন সিন্‌ট্যাগ্‌মার উদ্ভবই হইতে পারে না, ইহা খুব জোর করিয়া

বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে অয়কেনের সহিত এই দুই বাঙ্গালী মনীষীর মর্ম্মান্তিক বিরোধ।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া হেগেল যেরূপ হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন ও তাহার উপর অবিচার করিয়াছেন, অয়কেন সেই অজ্ঞতা ও অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়াছেন মাত্র। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এ বিষয়ে তিনি হেগেলের ভ্রমে পতিত না হইয়া বরং হেগেলের ঐতিহাসিক গবেষণাকে সংশোধন করিবেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের আশা সফল হয় নাই।

এ্যাক্‌টিভিজ্‌ম (Activism) কি ?

অয়কেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ হইতে নিজের দার্শনিক মতকে 'এ্যাক্‌টিভিজ্‌ম' এই নাম দিয়া একটা পৃথক্ আসন দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখন এ্যাক্‌টিভিজ্‌ম অর্থে অয়কেন কি বুঝেন ও বুঝাইতে চান, তাহা আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

অয়কেনের মতে মানুষের জীবনে, তাহার কার্য্যে ও চিন্তায় স্বভাবের (Nature) ক্রিয়া স্পষ্টই লক্ষিত হয়। কিন্তু তথাপি মানুষের জীবনে এই স্বভাবের ক্রিয়াই সার সত্য নহে। এই স্বভাবের ক্রিয়া ছাড়াও মানুষের একটা আত্মার (Spirit) বা আধ্যাত্মিক জীবন আছে, যাহা স্বভাবের ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বা স্বাধীন; এবং এই আধ্যাত্মিক জীবনই মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও মনুষ্যজীবনের সার সত্য। যে মানুষ এই আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ না করিয়া শুধু প্রবৃত্তি-তাড়িত হইয়া স্বভাবের খেলার পুতুল হইয়া জীবন শেষ করিবে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে মনুষ্যজীবনের চরম পরিণতি বা বিকাশ হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেল। সে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, বলিতে গেলে, পশুর জীবনই যাপন করিয়া গেল, প্রকৃত মনুষ্যজীবনের স্বাদ পাইল না।

স্বভাবের জীবন হইতে আত্মার জীবনের এইরূপ পার্থক্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দও প্রায় একমত। স্বামিজীর মতে আমরা স্বভাবের জীবনকে মাত্র সহায়তা করিতে বা পরিপুষ্ট করিতে জন্মি নাই; পরন্তু স্বভাবকে অতিক্রম

করিতে, জয় করিতে জন্মিয়াছি। ("We are born not to help Nature, but to conquer Nature.")

উত্তম কথা। এখন কি করিয়া এই স্বভাবের রাজ্য হইতে আমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যে উঠিব? অয়কেন বলেন,—স্বভাবের বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্রোহ দ্বারা আমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যে উঠিতে সমর্থ। অন্য পথ নাই। আধ্যাত্মিক রাজ্যে উঠিবার পথে প্রতি পদক্ষেপেই স্বভাব বাধা দিতে থাকিবে, ইহা নিশ্চয়। তথাপি সেই বাধাকে এক অতি দুর্দ্দম ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রতিনিয়তই জয় করিতে করিতে আমরা ক্রমে স্বভাবের রাজ্য হইতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিব। শুধু জ্ঞানের ও চিন্তার জাল বুনিয়া বুনিয়া মানুষ কোন ক্রমেই স্বভাবের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। কিন্তু স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়তই এইরূপ সংগ্রাম করিয়া, স্বভাবের বা প্রবৃত্তির বাধাকে প্রতিনিয়তই বিপর্য্যস্ত করিয়া, আমাদের উঠিতে হইবে বলিয়াই আমাদিগকে এমন একটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা শুধু পঙ্গুর মত বসিয়া বসিয়া চিন্তা নয়, পরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী বীরের পদক্ষেপের মত একটা প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি ও তাহার কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা। জ্ঞানগত দার্শনিক মতবাদ হইতে অয়কেনের এই দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তিপ্রসূত কার্য্যক্ষম দার্শনিক মতের নাম তাই—'এ্যাক্‌টিভিজ্‌ম্'।

অয়কেনের সহিত এখানেও স্বামিজীর মতের সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাই। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, স্বভাবের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করিয়া জয়ী হয় নাই, মায়াপ্রসূত এই সংসারকে যে জয় করিতে পারে নাই, সে কোন ক্রমেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে না। সংসার (Nature) ও আত্মা (Soul) একসঙ্গে লাভ হইবে না। ইহার একের জন্য অপরকে অস্বীকার করিতেই হইবে। শুধু একটা নৈতিক বিদ্রোহের দিক হইতেই অয়কেন স্বভাব ও আত্মার পার্থক্য ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু স্বামিজী, শঙ্করানুবর্ত্তী হইয়া দার্শনিক মতবাদের দিক্ হইতেও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে—হয় রজ্জু, অথবা সর্প; হয় ব্রহ্ম, অথবা জগৎ;—একসঙ্গে দুই-ই দেখা অসম্ভব।

অয়কেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদগুলিকে সমালোচনা করিতে যাইয়া আরও বলিয়াছেন যে, মানুষ যতক্ষণ না এইরূপে স্বভাবের রাজ্য হইতে

আধ্যাত্মিক রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়, ততক্ষণ সে শুধু স্বভাবের রাজ্যে বাস করিয়া, সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন অংশ-বিশেষের কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ভাঙ্গা-গড়া করিয়া, বর্ত্তমানের অভাব-উপযোগী কোন সমীচীন মীমাংসায় নিশ্চয়ই উপস্থিত হইতে পারিবে না। একটা মীমাংসা করিতে যাইয়া দশটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবে মাত্র। যেমন, রাষ্ট্রের অধীনতার হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া এমন একপ্রকার উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে—যাহা পরিণামে বেঞ্জামিন কিড্‌ ও অয়কেনের মতে, সমাজকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আবার সামাজিক সাম্যবাদকে (Socialism) প্রশ্রয় দিতে গেলে, মানুষের মনুষ্যত্বকে (Personality), তাহার আধ্যাত্মিক জীবন ও প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে পিষিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। প্র্যাগ্‌ম্যাটিক মতবাদে সায় দিলে, সত্যকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, সত্যের আদর্শকে এত ছোট করিয়া দেওয়া হইবে যে, পরিণামে সঙ্কট-মুহূর্ত্তে, মানুষ দাঁড়াইবার কোন একটা বড় রকমের আশ্রয়ই পাইবে না। সুতরাং এ যুগে বলপূর্ব্বক স্বভাবের রাজ্য হইতে আত্মার রাজ্যে প্রবেশ ভিন্ন আর কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। অয়কেন এইরূপ বলেন।

খুব আশ্চর্য্যের বিষয়,—স্বামিজীও ঠিক এই রকম কথাই বলিয়াছেন। স্বামিজী যখন তাঁহার নূতন বার্ত্তা (Mission) লইয়া পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষে, অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশে প্রায় ৬০ বৎসর হইতে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি ঐ সমস্ত সংস্কারক দলের সহিত নিজের পার্থক্য, মান্দ্রাজে বক্তৃতাদ্বারা ও বাঙ্গালা দেশে তাঁহার জীবনের কার্য্য দ্বারা, বিশেষভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। শুধু সমাজের বা রাষ্ট্রের দু একটা বর্ত্তমান কুপ্রথাকে জোর করিয়া দূর করিয়া দিতে পারিলেই, আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। এবং সেরূপ সম্ভব কিনা সে বিষয়েও স্বামিজীর সন্দেহ ছিল। তিনি বৃদ্ধের শরীরে বাত রোগের দৃষ্টান্তটি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন। বাত যখন পায়ে আসিয়া ব্যথা উৎপাদন করিতেছে, তখন কৃত্রিম উপায়ে 'সেঁক তাপ' দিয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলে সে হয়ত মাথায় গিয়া উঠিতে পারে। সমস্ত শরীরটার

সংস্কার চাই। স্বাস্থ্যকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা আগে করা কর্ত্তব্য। যেমন বিধবা-সমস্যা লইয়া আমরা বিব্রত—কেন না আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন বিদ্যমান—তেমনি পাশ্চাত্য দেশে অবিবাহিত কুমারীদের সমস্যা লইয়া তাঁহারা বিব্রত; কেন না সেখানে যৌবন-বিবাহের ব্যবস্থাই সামাজিক বিধি। কাজেই স্বামিজী বলিতেন যে, মানুষের জীবনে আগে পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে—ভারতবর্ষেই হউক আর পাশ্চাত্যদেশেই হউক। মানুষের জীবনে পরিবর্ত্তন আসিলে, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা আপনিই পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু যতক্ষণ না মানুষ তাহার জীবনকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ সমাজের ও রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন, সম্ভব হইলেও, তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে না। যীশু জেরুজালেমে হাজার বার জন্মিলেও তোমার মুক্তি হইবে না, যদি না তিনি তোমার জীবনে জন্মলাভ করেন।

অয়কেন পাশ্চাত্য সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারকদের জন্য যাহা আজ বলিতেছেন, স্বামিজী বাঙ্গালার ও ভারতের উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারকদের জন্যও ঠিক তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। যাহারা অয়কেনকে এদেশে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, আশা করি তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকেও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।

উপসংহার।

(১) আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইউরোপের ইতিহাসের যে একটা অতি সঙ্কট-মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িয়াছে—তাহা অয়কেন স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন। এবং সে জন্য যে একটু শঙ্কিতও না হইয়াছেন, এমন নয়। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার বর্ত্তমান সমস্যাগুলির একটি সমীচীন মীমাংসা বা সমন্বয় করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই নূতন সমন্বয় বা সিনট্যাগমা, প্রাচ্য সাধনার, বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় সাধনার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। পরন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ও ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার বর্ত্তমান সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্য, ইউরোপকে এখন বিশেষভাবে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা ও সাধনার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। গ্রীস ও অন্য

কোথাও হইতে আর নূতন প্রেরণা আসিয়া ইউরোপকে এবার রক্ষা করিতে পারিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজসিক ভোগবিলাস এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের এত অভাব হইয়াছে যে, এই সভ্যতার আদর্শের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন না আসিলে, ৫০ বৎসরের মধ্যেই এই সভ্যতা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। ইউরোপের এই মহাকুরুক্ষেত্রের পরিণাম কি হইবে, এখন বলা যায় না। তবে সভ্যতার দীপ্ত মধ্যাহ্নে এই বিরাট ভয়াবহ যুদ্ধই কি স্বামিজীর ভবিষ্যদ্বাণীর একটা সাক্ষী নয়? বিজিত জাতির সভ্যতার আদর্শকে সম্যক্ মর্য্যাদা দিতে পরাঙ্মুখ হইয়া, হিন্দু সভ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া, আত্মকেন্দ্র ইউরোপ শুধু নিজের উপর নির্ভর করিয়া যতই তাহার সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা করুক, ইউরোপের কলকারখানার ধূম উদ্গিরণকারী চিমনীর তলায় ঘর্ম্মাক্তকলেবর কোটী কোটী নরনারী ও বালক বালিকার সমস্ত শ্রমই যেন আজ ব্যর্থ হইয়া গেল! বাঙ্গালার কবির বীণাও যেন সেই ব্যর্থ শ্রমকে ইঙ্গিত করিয়াই আজ সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে,—

"তোমরা কেউ পারবেনা গো, পারবে না ফুল ফোটাতে।
যতই বল যতই কর, যতই তারে তুলে ধর
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন আঘাত কর বোঁটাতে।
তোমরা কেউ পারবেনা গো, পারবে না ফুল ফোটাতে।"

আমাদের মনে হয় অয়কেন তাঁহার সিন্থ্যাগ্‌মা ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িয়াছেন।

(২) স্বভাব ও আত্মার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অয়কেনের আদর্শ, বাহ্যতঃ বহু পরিমাণে আমাদের সম্মুখে মধ্যযুগের স্বভাব ও আত্মার একটা পরস্পর-বিরোধী ভাব আনিয়া উপস্থিত করে। এবং অয়কেনের এ্যাক্‌টিভিজ্‌মও সেই স্বভাব ও আত্মার মল্লযুদ্ধেরই একটা আভাস মাত্র। কিন্তু এ যুগেও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য যখনি একটা তীব্র ব্যাকুলতা দেখা গিয়াছে, তখনি প্রবৃত্তির অসংযত ভোগ ও উচ্ছৃঙ্খলতার উপর একটা পাথর চাপা আসিয়া পড়িয়াছে। আবার এই প্রবৃত্তি বা স্বভাবকে (প্রাণ যাহা চায়) নির্ম্মমভাবে দলন ও পেষণ ব্যতিরেকে, কি জীবনে, কি ইতিহাসে,

ধর্ম্মের জন্য একটা জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের পরিচয়ও আমরা পাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহারা উভয়েই স্বভাবকে, প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াই ধর্ম্মজীবন লাভ হয়, এই কথা বাক্যে ও কার্য্যে দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় এদেশের মানুষকে 'গৃহস্থ' ও 'বিরক্ত' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। স্বভাবকে অস্বীকার করিয়া, ডিঙ্গাইয়া যাঁহারা আত্মায় গিয়া পৌঁছিতে চান, তাঁহারাই তাঁহার মতে এদেশে বিরক্তের দল। কিন্তু এই শেষোক্ত দল আবার রবীন্দ্রনাথের মনোমত নয়—তিনি বলেন, স্বভাবকে ডিঙ্গাইয়া ঐ রকম বৈরাগ্য সাধনে যে মুক্তি, তাহা এযুগের লক্ষ্য নয়। অসংখ্য বন্ধনের মাঝেই মুক্তির স্বাদ লাভ করা হইতেছে এযুগের আদর্শ। কেন না যিনি মুক্ত তিনি যে ইচ্ছা করিয়াই বন্ধনের মধ্যে আসিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে যে আমাদের এই সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও খুঁজিতে হইবে। এ বন্ধনও যে তাঁহার বন্ধন। কেবলই 'মায়ার' নয়। আর যদি তাই হয়, তবে সেও ত তাঁহারই মায়া, সে মায়া মিথ্যা হইবে কি করিয়া?

সুতরাং 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের' জন্যই—'বিরক্তের' (সন্ন্যাসীর) জন্য নয়—রাজা রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ, এ যুগের উপযোগী এক রকম উচ্চ ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অয়কেন-কথিত স্বভাব অস্বীকার, প্রবৃত্তির দমন অনেকাংশে রাজা রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথেরও অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই। কিন্তু অয়কেনের স্বভাব অস্বীকারের মধ্যে এমন একটা তীব্রতা আছে, এবং ইউরোপের অসংযত ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আজ এমন একটা বিষ ও বিষের জ্বালা অনুভূত হইতেছে যে, আশঙ্কা হয়, কোন কোন স্থলে, অয়কেনের এই স্বভাব অস্বীকারের তীব্রতা প্রতিক্রিয়াস্বরূপে এযুগে ইউরোপের একদল মানুষকে না আবার সন্ন্যাসের দিকে আকর্ষণ করে।

ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য অয়কেনের এই স্বভাব অস্বীকার হয়ত অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চাহিবে। ধর্ম্ম জীবনের পরিণতি, জীবনের বাহিরে নয়। সুতরাং যাহা জীবন, ধর্ম্ম তাহা হইতে সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিবে কি করিয়া? এই প্রবৃত্তিও যে জীবন, কে অস্বীকার করিতে সাহস করিবে? এই প্রবৃত্তির মূলে ও মধ্যে যে ধর্ম্মবীজ সুপ্ত নাই,

কিসে বলি? বড় বড় জীবনের অভিব্যক্তিতে, কি করিয়া তবে প্রবৃত্তির অনিবার্য্য ঝড়ের মধ্য দিয়াই, ভোগবিমুখ চিরস্থির শান্তির মহিমা দেদীপ্যমান হইয়া উঠে? ভালর মধ্যে মন্দ, মন্দের মধ্যে ভাল, ধর্ম্মের মধ্যে স্বভাব বা প্রবৃত্তি, আবার প্রবৃত্তির মধ্যেই ধর্ম্মবীজ, রাসায়নিক বা জৈবিক সংমিশ্রনে যে মিলিয়া রহিয়াছে,—অভিব্যক্তিবাদের নিকট আজিও তাহা এক মহা রহস্য। কাজেই স্বভাব ও আত্মাকে, প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মকে দুইটা পৃথক্ ঘরে আটকাইয়া রাখিবার প্রয়াস দার্শনিকের চিন্তায় সম্ভব হইলেও, মানুষের স্বাভাবিক জীবনে নিতান্তই অসম্ভব। জীবন শুধু প্রবৃত্তি নয়, আবার জীবন শুধু নিবৃত্তিও নয়। জীবন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংমিশ্রণ ও সংঘর্ষণ। অয়কেন যদি ইহাদের একের জন্য অন্যকে একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন তবে তিনি এযুগের পক্ষে খুব বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

(৩) আমরা দেখিয়াছি যে অয়কেন বুদ্ধিবাদের (Intellectualism) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং অপরোক্ষানুভূতির (Intuitionism) উপর জোর দিয়াছেন। বার্গসোঁও এই মতাবলম্বী। ইউরোপের নূতন জীবন-পন্থী দার্শনিক চিন্তার গতিই মুখ্যভাবে, বুদ্ধিবাদের বিরোধী। ইহা কতকটা হেগেল দর্শনের প্রতিবাদ স্বরূপ দার্শনিক চিন্তার রাজ্যে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সোপেনহাওয়ারের ইচ্ছাশক্তিই (will) হেগেলের জ্ঞানগত দার্শনিক চিন্তার প্রথম প্রতিবাদ। কিন্তু যাহা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ারূপে আসিয়া দেখা দেয়, তাহা সাধারণতঃ অতিরিক্তের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। বুদ্ধিবাদকে প্রতিবাদ করিতে গিয়া অন্যপক্ষে অয়কেন বার্গসোঁ প্রভৃতি নব্যদর্শন আবার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আধ্যাত্মিক প্রেরণা, কল্পনা, অদম্য ইচ্ছা-শক্তি প্রভৃতির অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিয়াছেন। ইহাও বিনা প্রতিবাদে পার হইতে পারিবে না।

বোধি বা ইন্টুইসন বলিতে অয়কেন যাহা বুঝেন তাহা, আশঙ্কা হয়, খুব স্পষ্ট করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

(ক) ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আমরা যাহা জানিতে পারি,—তাহার মধ্যেও ইন্টুইসন আছে। মনস্তত্ত্ববিৎ মাত্রেই একথা স্বীকার করিতে বাধ্য।

অয়কেন যদি বলেন যে, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা এই প্রত্যক্ষ জগৎ আমরা জানি, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের বাহিরে আরো একটা অতীন্দ্রিয় জগৎ (Transcendental world) বিদ্যমান আছে, তাহাকে দেখিতে হইলে,—বুদ্ধিকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া,—কেবলমাত্র ইণ্টুইসনের আশ্রয় লইতে হইবে. —তাহা হইলে মনস্তত্ত্বের দিক হইতে অয়কেনের এই মীমাংসা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। বুদ্ধি (Intellect) বা একটা উন্নতরকমের জ্ঞানকে (Rationality) একেবারে তফাৎ করিয়া, মানুষ কেবল একটা ইণ্টুইসন লইয়া চাহিয়া থাকিলে,—জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য কি অদ্ভুত জগৎ যে আসিয়া দেখা দিবে—কে জানে? আর মানুষের পক্ষে বুদ্ধিবিরোধী ইণ্টুইসন, সম্ভব কিনা—মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে মীমাংসা করিয়া অয়কেনকে সমর্থন করিলে তারপর প্রশ্ন হইবে যে, সেরূপ ইণ্টুইসন সমীচীন কি না? অয়কেন মনস্তত্ত্বে বিশেষ পণ্ডিত নহেন। ইহা বোধ হয় তিনি নিজেও জানেন।

(খ) বুদ্ধিসংযুক্ত একরূপ ইণ্টুইসনের কথা অয়কেনের পূর্ব্বে কেহ কেহ কহিয়াছেন। যেমন স্পিনোজা। সমস্ত ঐতিহাসিক ধারাকে, পরিবর্ত্তনকে বুদ্ধির দ্বারা জানিয়া, দেশে ও কালে তাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও, —দেশ কালের ঊর্দ্ধে উঠিয়া এক অখণ্ড সমগ্র দৃষ্টিদ্বারা (Sub specie æternitatis) নিখিল বিশ্বকে এক মুহূর্ত্তে সমগ্র ভাবে (বুদ্ধি দ্বারা যেমন খণ্ড ভাবে, তেমন নহে) দেখিবার কথা স্পিনোজা দর্শনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অয়কেনের ইণ্টুইসন, স্পিনোজার ইণ্টুইসন হইতে পৃথক হইলে, এই পার্থক্য অয়কেন দর্শনের গৌরব না অ-গৌরব, তাহা বিবেচনার বিষয়।

(গ) আমাদের শাস্ত্রে দেখা যায় যে যাঁহারা শঙ্করানুবর্ত্তী অদ্বৈতবাদী,—তাঁহারা যতক্ষণ না জীব সমাধি অবস্থায় সম্পূর্ণ ব্রহ্ম হইয়া যান, ততক্ষণ তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি (ইণ্টুইসন) স্বীকারই করেন না। দ্বৈতজ্ঞান থাকা সত্ত্বে ইণ্টুইসন অসম্ভব। অয়কেন নিশ্চয়ই শঙ্করানুবর্ত্তী অদ্বৈতবাদী নহেন। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহার কথিত ইণ্টুইসন বা বোধি মাত্র বুদ্ধিরই একটা উন্নত স্তর, অপরোক্ষানুভূতি নহে।

সুতরাং কি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া, কি অতীন্দ্রিয় সত্তার উপলব্ধির দিক দিয়া, অয়কেনের ইণ্টুইসন বাদ আমাদের নিকট খুব অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

(৪) অয়কেন, স্বভাব হইতে আত্মার রাজ্যে উঠিবার কথা কহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে, গীতার উপদেশে, পাতঞ্জল ও সাংখ্য দর্শনে স্বভাব হইতে আত্মায় উঠিবার সোপান ও তাহার সাধনার প্রক্রিয়া যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অয়কেন তাঁহার নব্যদর্শনে সেরূপ কিছু করেন নাই। প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি বিষয়ে অয়কেন প্রায় নীরব। এযুগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জ্ঞানযোগের পাশাপাশি রাজযোগকে যেরূপ স্থান দিয়াছেন, অয়কেন দর্শন তাহা করে নাই। স্বভাব হইতে আত্মায় উঠিবার কথা অয়কেন কহিয়াছেন, কিন্তু উপায় নির্দ্দেশ করিতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এ্যাক্‌টিভিজ্‌ম দর্শনের এই-খানে আমরা বিশেষ অসম্পূর্ণতা ও দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই। এবং অয়কেনের সিন্‌ট্যাগ্‌ম বা সমন্বয়ে হিন্দু প্রতিভা ও সাধনার বিষয়ে অজ্ঞতাকেই ইহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

তথাপি অয়কেন দর্শন ইউরোপে একটি বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে ও করিবে বলিয়া আশা করি। বহুধা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও কর্ম্মের ধারাকে অয়কেন আজ আত্মার দেদীপ্যমান মহিমার দিকে চাহিয়া দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন,—ইহা ইউরোপের পক্ষে আজ ঔষধ ও পথ্য দুইই।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সমালোচনা।

মহাভারতীয় নীতিকথা—দ্বিতীয় খণ্ড। ভীষ্মপর্ব্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। ২৬৩ পৃষ্ঠা। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বি-এল প্রণীত; মূল্য ৸০ আনা। ৯১২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নববিভাকর প্রেস হইতে প্রকাশিত।

আমরা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সমালোচনাকালে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা প্রকাশ করিয়াছি। যাঁহারা মূল মহাভারত বহু বিস্তৃত বলিয়া পড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের পক্ষে রাজেন্দ্র বাবুর সঙ্কলিত পুস্তকখানি যে

অতি উপযোগী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ মূলের সহিত তুলনায় অতি ক্ষুদ্র হইলেও, এই অল্প পরিসরের মধ্যে মহাভারতের নীতিতত্ত্বগুলি অতি দক্ষতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'যুধিষ্ঠিরের সার্ব্বজনীন প্রেম,' 'কুন্তীর আত্মত্যাগ' প্রভৃতি সতেরটী অধ্যায়ে গ্রন্থকার নীতিগুলি লোকসমক্ষে ধরিয়াছেন; অথচ ইহাতে গল্পের ধারাবাহিকতা কোনরূপে নষ্ট হয় নাই। এইজন্য পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা সংস্কৃতবহুল, উহা আর একটু সরল হইলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। ৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজী, ৬০০ পৃঃ, উৎকৃষ্ট কাগজে বাঁধান, মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রকাশক নিবেদনে বলিয়াছেন যে, বহুবর্ষব্যাপী অনুসন্ধান, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রন্থকার এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে। উত্তর এবং মধ্য ভারতে যে সকল বাঙ্গালী স্বকীয় উদ্যম, অধ্যবসায় ও চরিত্রবলে ধন্যনামধন্য হইয়াছেন, প্রবাসভূমে লোকহিতকর কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্মিগণের চরিত্র এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। কেবল তাহাই নহে, উত্তর ও মধ্য ভারতের যে যে বিভাগ এই সকল কীর্ত্তিমান পুরুষগণের রঙ্গভূমি সেই সকল স্থানের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বিবরণও এই পুস্তকে অতি সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু চিত্রে ভূষিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং মনোজ্ঞ, এবং চরিত্রচিত্রণে গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ পাঠকই উপন্যাস নাটকের ভক্ত; কাল্পনিক চরিত্রে যাঁহারা বিস্ময়রসে অভিভূত হন, এই পুস্তকের জীবন্ত চরিত্রগুলির আলোচনায় তাঁহাদিগের উপলব্ধি হইবে যে, বাস্তব অবাস্তব হইতে অধিকতর বিস্ময়কর। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে ইহার যথার্থ গুণগ্রহণ করা যায় না। পুস্তকখানি আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর কর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্বোধনে অশেষ সহায়তা করিবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্রীমেহার মাহাত্ম্য (মহাকাব্য)—শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুত টি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজী, ১০৬ পৃঃ। মূল্য ৷৵০ আনা।

পুস্তকখানি মেহারের প্রসিদ্ধ সাধকাগ্রণী শ্রীমৎ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের জীবন-চরিত। কাজেই বড় আগ্রহ করিয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার ইহাকে মহাকাব্য আখ্যায় অভিহিত করিলেও রচনাভঙ্গীর দোষে ইহা একেবারে প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। মুখবন্ধে গ্রন্থকার মহা আড়ম্বরে লিখিয়াছেন, "বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচারে কোথাও বা সংস্কৃতবৎ কোথাও বা একেবারে প্রাকৃতবৎ ভাষা রচিত হইয়াছে।" উভয়-বিধ ভাষারই যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু প্রয়োগনিপুণতার অভাবে কিরূপ লজ্জাকর খিচুড়ীর সৃষ্টি হয় তাহা আলোচ্য গ্রন্থখানি হইতে যদৃচ্ছা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"খপ্ করিয়া যোগীর গায়ে কি একটা পড়িল; অমনি ধ্যানভঙ্গ! চাহিয়া দেখিলেন, অসৃগ্-লিপ্ত আমিষখণ্ড। * * * বৃক্ষোপরিগত ভীষণ বিষধর বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তিকর্ত্তৃক এইরূপে নিহত হইল।

"আরূঢ় অবাধে অবরূঢ় হইলে, যোগী নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন,"

"হুড়্ মুড়্ দুদ্দুড়্! হু, উঁ উঁ!—

"হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ!—'এইবার পেমা মরেছে, পেমাকে যমে ধরেছে'—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা মতে মুগ্ধবোধ সুপদ্ম পাণিনি প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে করিতে, অশেষ বিদ্যা-বিশারদী রসনাগ্র-সরস্বতী সপ্তপল্লীকল্লোলিনী সহসা সুপ্তোত্থিতা শ্রীমতী পেমার মা সত্বর গাত্রোত্থানে প্রবৃত্তা।"

"এদিকে উগ্রচণ্ডার মুহুর্মুহু হুহুঙ্কার, আর অন্ধকারে ইতস্ততঃ খানাতল্লাসি।"

"উদ্দাম ইন্দ্রিয়দাম-বিক্ষোভিত মানস যখন প্রমত্ত মহিষাসুরবৎ উদয়াস্তাচল উল্লম্ফনে সমুদ্যত, অলঙ্ঘ্য বিধাতৃবিধান বিলঙ্ঘনে বদ্ধপরিকর, তখন সুদৃঢ় প্রণয়-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া আমার সেই উন্মার্গগামী দুরন্ত দুর্ব্বৃত্ত-চিত্তের দমন পূর্ব্বক, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গবৎ স্বসঙ্গসম্বদ্ধ করিয়া রাখিলে!"

"ক্রমে যখন সন্তান-জনক সংসারী হইলাম, প্রভাতপ্রারম্ভে প্রদোষ যাবৎ অশেষ বিধিবিধানে আজীব্য আহরণে ব্যতিব্যস্ত, স্বিন্ন ক্লিন্ন কলেবরে ম্লানমুখে ম্লানচিত্তে পথ্যাশী পিপাসু—মুমূর্ষুবৎ দিনশেষে ক্ষীণশ্বাসে, অপার্য্যপদসঞ্চারে যখন আমি আমার জীর্ণ পর্ণকুটীরদ্বারে প্রত্যাবৃত্ত—"

স্থানাভাবে আর উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ইহাই যদি আদর্শ ভাষা হয় তাহা হইলে ভয়ের কথা বটে। গ্রন্থখানির কুত্রাপি কলাকৌশলের পরিচয় নাই। তাই এমন মহাপুরুষের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও পুস্তকখানি কয়েকটী স্থল ভিন্ন প্রায় অপাঠ্য হইয়াছে। এরূপ লঘুতার সহিত সাধক-জীবনী লিপিবদ্ধ করিলে তাহাতে সাধকের অপমানই করা হয়। যদি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকার মহাশয় যেন ভাষার ও ভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। নতুবা কয়জন লোক পয়সা দিয়া এরূপ পুস্তক ক্রয় করিবে?

শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের দুর্ভিক্ষকার্য্য।

নিম্নে আমাদের ১৫ই জুলাই ও ৭ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত দুইটী কার্য্যবিবরণের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পাঠকবর্গ উহা হইতেই দুর্ভিক্ষ ও বন্যাজনিত ক্লেশের হ্রাসবৃদ্ধির মোটামুটি আভাস পাইবেন।

(১)

আমাদের গত বারের কার্য্যবিবরণী প্রকাশের পর ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে কোথাও অবস্থা কিছু ভাল, কোথাও কিছু খারাপ হইয়াছে। তদনুসারে কোথাও কেন্দ্র বন্ধ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং কোথাও নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলার লাকসাম, কুঠি ও বিটঘরে এবং নোয়াখালি জেলায় দত্তপাড়া গ্রামে নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। হাজিগঞ্জ, পাইকপাড়া, সুচিপাড়া, সাহাপুর ও চড্ড—ত্রিপুরা জেলায় এই কেন্দ্র কয়টী শীঘ্রই বন্ধ হইবে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। নিম্নে চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে;—

ত্রিপুরা জেলা।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
হাজিগঞ্জ	১১৩	৭০৯	১১৭৩	মণ ৫৮।৬
পাইকপাড়া	৮৪	৭৪৬	৯৭০	৪৮।০

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
সাহাপুর	৭০	৪০৪	৬৬২	মণ ৩৩/৪
সুচিপাড়া	৬৫	৫০৮	৮৫৩	" ৪৪।১
ধড্ডা	৩৭	২০৮	৩৬২	১৮/৪
ঐ (পরসপ্তাহে)	ঐ	১৮৩	২৭৫	১৩৸০
লাকসাম	৪৫	১৯৯	২২২	১১/৪
বিটঘর	৭	৫০	৫৭	২৸৪

নোয়াখালি জেলা।

রামগঞ্জ	৯২	৮৭৪	১২৮৫	৬৪।০
খালিসপাড়া	৩৮	৪৩৩	৭৬৩	৩৮/৬
দত্তপাড়া	১৪	৮৯	১৫৫	৭৸০

এতদ্ব্যতীত ২৭।৩ সের চাউল সকল কেন্দ্রগুলি হইতে অস্থায়িভাবে বিতরিত হইয়াছিল।

এই অঞ্চলে সাহায্যদান-কার্য্য বন্ধ হইল, তাহার কারণ—সৌভাগ্যক্রমে দেশের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে।

হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ ও কচুয়া থানার মিশনের কার্য্য বন্ধ হইলেও এ সপ্তাহ হইতে নোয়াখালি জেলার লক্ষ্মীপুরা, রায়পুরা, এবং রামগঞ্জের যে অংশে সরকার বাহাদুর কাজ করিতেন, তাহা মিশনের হাতে আসিল। সুতরাং মোটের উপর কার্য্যের প্রসার পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিই পাইল নিশ্চিত বলিতে হইবে। অপর দিকে ত্রিপুরার মুরাদনগর থানা, দেবীদ্বার থানা, কসবা থানা, কোতালী থানা, নবীনগর থানা প্রভৃতি অঞ্চল জলময়। এ জল নিকাশ হইতে না পারিলে আমন ধান্যের আশা নাই। পাট ও আউশ ধান প্রায় নষ্ট হইয়াছে। সে সকল স্থানে শীঘ্র কার্য্যারম্ভ করিয়া আগামী কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত রিলিফ দিতে হইবে বলিয়া স্থানীয় লোক বলিতেছেন এবং মিশনের কয়েকজন সেবকও সেই মত দিয়াছেন।

অপর দিকে "সন্দ্বীপে" হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। নোয়াখালি জেলার কার্য্য আর ৩ সপ্তাহ হইতে কোথাও এক মাস পর্য্যন্ত চলিবে। সহৃদয়

কালেক্টর বাহাদুর মিশনের হস্তে নূতন দুইটী থানা অর্পণ করিয়াছেন এবং তাহার ব্যয়ের জন্য অর্থ প্রদান, করিয়াছেন।

নবীনগর থানায় বিটঘরে ও কসবা থানায় কুঠিতে কেন্দ্র খুলিয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, শীঘ্রই ঐ দিকে কার্য্যের প্রসার ঘটিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, চট্টগ্রামের বণিক্‌সভা শ্রীরামকৃষ্ণমিশনকে ৯৮০/০ মণ চাউল সাহায্য-কার্য্যের জন্য দান করিয়াছেন।

আমরা সানন্দে ইহাও জানাইতেছি যে, নোয়াখালির সহৃদয় কালেক্টর মহোদয় লাকসামে আমাদের জনৈক সেবককে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রজার দুঃখে কাতর গভর্ণর বাহাদুরও দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

(২)

আমাদিগের গতবারের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর, নোয়াখালি জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। তথায় আউশ ধান্য প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়াছে, এবং কাটা হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য উক্ত জেলার কেন্দ্রগুলি বন্ধ করা হইয়াছে। নোয়াখালি জেলার কালেক্টর মহোদয় যে দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন, তাহা উক্ত জেলাস্থ বুভুক্ষু অধিবাসিগণের সেবাকল্পে ব্যয়িত হইয়াছে, এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় যে দুই শত টাকা দিয়াছিলেন, তাহা বদলকোট কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কয়েকটী পুষ্করিণীর সংস্কারার্থে ব্যয় করা হইয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণ ত্রিপুরার অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে; তজ্জন্য ঐ অঞ্চলের কেন্দ্রসমূহও বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু কাছাড় এবং উত্তর ত্রিপুরা অঞ্চলে সম্প্রতি যে ভীষণ বন্যা হইয়াছে, তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। আমরা এখন সাধ্যমত উক্ত বন্যাপীড়িত স্থানসমূহের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা শিলচর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা পরিদর্শন করিয়া কুঠি, বিটঘর, আখাউড়া, দেবগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং শিলচরে সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। শীঘ্রই অন্যান্য স্থানে কেন্দ্র খোলা হইবে। শ্রীহট্ট প্রদেশের বন্যাপীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য আমরা কয়েকজন সেবক প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা তত্রত্য অবস্থা তত শোচনীয়

নহে বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন। শিলচরের অবস্থা অতি শোচনীয়, তথায় অতি সত্বর সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছে। শিলচরের সন্নিকটস্থ গ্রামগুলিতে শতকরা প্রায় আশীখানি ঘর পড়িয়া গিয়াছে, এবং গোমহিষাদিও অনেক নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। শিলচরে চারি প্রকার বস্তুর বিশেষ অভাব হইয়াছে—বীজধান্য, খাইবার চাউল, গৃহ, এবং গবাদির খাদ্য। এই জেলায় বন্যার জল যেমন উচ্চে উঠিয়াছিল, তেমনই প্রবল হইয়াছিল। সেই জন্য এখন সমস্ত জল নিকাশ হইয়া গেলেও অধিবাসিগণ নিরন্ন ও গৃহশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

সন্দ্বীপে স্থানীয় রিলিফ-কমিটী কার্য্য করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা উক্ত স্থলে সাহায্য-কেন্দ্র খুলি নাই।

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। শেষোক্ত কেন্দ্রদ্বয় অস্থায়িভাবে খোলা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কেন্দ্র-গুলির কার্য্যবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

ত্রিপুরা জেলা।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
সূচীপাড়া	৬৫	৫৬৬	১১৪৯	মণ ৫৩/০
লাকসাম	৫৩	২১২	২৩৩	১১৷৬
সাহাপুর	৭০	৩৯১	৭৬৫	৩৮৷০
ধড্ডা	৩৭	১৮৩	২৭৫	১৩৸০

নোয়াখালি জেলা।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
খালিশপাড়া	৬৭	৬০৮	১১৩২	৫৬৷৪
ঐ (পর সপ্তাহে)	৮৪	৬৯০	১৩৫৬	৬৭৸২
ঐ	২৪	১২৬	৩০০	১৫/০
রামগঞ্জ	১০৯	১০২৬	১৫৯৭	৭৯৸০
ঐ (পর সপ্তাহে)	১১২	১১০৮	১১৯৪	৬০৷৬
দত্তপাড়া	৬৭	৪২৭	৬৯১	৩৪৷২
ঐ (পর সপ্তাহে)	৯৪	৬৮২	৯৫২	৪৭৷৮
ঐ	৯৪	৫৭৬	১০২৩	৫১/৬

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
বদলকোট	১১	১২৩	১৬০	৪/০
ঐ (পর সপ্তাহে)	৮৯	৮২৭	১১২১	৫১/২
ঐ	৮৯	৫৫০	৭৭১	৩৬॥২
রায়পুর	১৭	২০৪	২৬৩	১৩/৬
ঐ (পর সপ্তাহে)	২১	৩৪৯	৫০৪	২৫/৮
ঐ	২৪	৪৭২	৬৪২	৩২/৪
বিজয়নগর	২৩	১৯৩	৩৯২	১৯॥৪
মান্দারী	৪৭	৩০২	৩০৪	১৫/৮

এতদ্ব্যতীত উক্ত কেন্দ্রগুলি হইতে মোট ৭৪॥৮॥০ সের চাউল অস্থায়িভাবে বিতরিত হইয়াছিল। অভাবগ্রস্তদিগকে কাপড়ও দেওয়া হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শিলচরের, বিশেষতঃ শিলচরের বন্যাক্লিষ্ট অধিবাসিগণকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। ঐ সকল লোকের দুরবস্থার কথা একবার ভাবিয়া দেখিলে কেহই স্থির থাকিতে পারিবেন না, ইহাই আমাদের ধারণা। আমরা বুভুক্ষু নারায়ণগণের পক্ষ হইতে সহৃদয় জনসাধারণ-সমীপে সাহায্যভিক্ষা করিতেছি। সাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত এ সকল কার্য্যে সফলতার আশা নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। আমাদের বিশ্বাস, পরদুঃখকাতর দেশবাসিগণ এই সেবাকার্য্যে আমাদিগকে সাধ্যমত সাহায্যদানে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, লোহাপটির সহৃদয় ব্যবসায়িগণ হিতবাদী কার্য্যালয়ের মারফত ১৫০০৲ টাকা, মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসন ১০০০৲ ও সূতাপটির মেজার্স বিশ্বরাজ হুকুমচাঁদ ১০০ জোড়া নূতন কাপড় আমাদিগকে এই কার্য্যের জন্য দান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যিনি যাহা দান করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে, সাদরে গৃহীত হইবে, এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে। (১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ, জেলা হাওড়া; (২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন-কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

নিবেদক, সারদানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকার।

১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

নাম	টাকা
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গড়বাড়ী, হুগলী	৩৲
,, ছেদালাল সিং, শ্রীনগর কাশ্মীর	৩৲
,, চারুচন্দ্র রায়, কলিকাতা	৪৲
,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ,,	১০৲
,, রাধাবল্লভ সান্ন্যাল, বে িয়া	২৲
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেনারস	১৲
শ্রীযুত জে, সি, দাস গুপ্ত, শিয়ালদহ	৫৲
,, কে, ভি, আয়ার, কলিকাতা	৫৲
শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী, কলিকাতা	১০৲
,, বসন্তকুমার বসু ,,	২০৲
,, সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ, মুরাদপুর	২॥৴০
,, কালীশ্বর গুহ, গোয়ালপাড়া	১৲
,, দ্বারকানাথ রায়, পীরগঞ্জ	১০৲
মাঃ শ্রীযুত এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতবাদী, কলিকাতা,	২০০৲
শ্রীকালীকুমার দত্ত,	১৲
রাজ-রাজেশ্বরীর পূজারী, ঢাকা	২৲
শ্রীশ্যামাচরণ সাংখ্যতীর্থ, দিনাজপুর	১৲
শ্রীযুত এস, এন, সেন, রেঙ্গুন	৩০০
,, শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বালি	১০৲
,, প্রফুল্লকুমার সরকার, উড়িষ্যা	১০৲
,, সারদাচরণ খাস্তগির, চট্টগ্রাম	১০৲
,, সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি, বালি	১৲
,, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফরপুর	৫৲
(সাঁইথিয়া)	
সৈয়দ ফজল রাহামান	॥০
শ্রীকৃত্তিবাস সাহা	১৲
,, মহেন্দ্রনাথ সাহা	॥০
,, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০
,, ননীলাল মিস্ত্রী	॥০

নাম	টাকা
শ্রীযুরামদাস ঘটক	
,, কীর্ত্তিবাস দাস	
,, কালীচরণ রায়	॥০
,, শশধর মুখোপাধ্যায়	॥০
,, নিকুঞ্জবিহারী প্রামাণিক	॥০
মিঃ স্কট	১৲
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
,, আশুতোষ ঘোষ	
,, পরেশনাথ রায়	
ষ্টেশনের ভৃত্যগণ	১৲
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
জনৈক ভদ্রলোক	১৲
আর একজন ভদ্রলোক	১৲
শ্রীরামদাস সেন	॥০
,, ভগবান দাস	॥০
,, বিধুভূষণ সিংহ	॥০
(রামপুরহাট)	
,, কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
,, শ্যামলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
,, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, যুগলবিহারী মাকড়	২৲
,, হরিরঞ্জন রায়	২৲
শ্রীযুত ডি, এল, সেনগুপ্ত	২৲
শ্রীসতীশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ভুজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, মুদেশ্বর হোসেন	৩৲
,, শরৎচন্দ্র ভদ্র	১৲
,, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, রাম চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, তারাসুন্দর মুখোপাধ্যায়	১৲
,, উপেন্দ্র চাকলাদার	১৲

শ্রীবিভূতিচরণ মিত্র	১৲
" শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" মহিমচন্দ্র মণ্ডল	১৲
" রজনী হাজরা	১৲
" সমদেশ্বর বিশ্বাস	১৲
" শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" নরেন্দ্র দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" বেণুকর সরকার	১৲
" মৃগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়,	২৲
" অনুকূল চট্টোপাধ্যায়	১৲
" গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
" রাধিকাপ্রসাদ দে	১৲
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২৲
খুচরা আদায়	১।০
শ্রীগণেশলাল ভকত, চাতরা	৪৲
" কেশবলাল মুখোপাধ্যায়, জামালপুর	।।০
জনৈক বন্ধু, শিউড়ি	১৲
জনৈক ভদ্রলোক	১৲
মিঃ উইলসন্, বোলপুর	২৲
শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন, শিউড়ি	১৲
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাগ্রাম	১৲
" কৃষ্ণচরণ পাণ্ডা, তরীগ্রাম	১৲
" অনন্তলাল প্রামাণিক, বিষ্ণুপুর	১৲
মাঃ শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাস, পুষা	২২৲
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মণ্ডল, কলিকাতা	৫৲
মাঃ শ্রীবসন্তকুমার বসু, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুক্ত সি, এস, নাইডু, বসোরা	৫৲
" কে, এন, বরদোলই, ডুমডুমা	১০৲
শ্রীঅতুলচন্দ্র মল্লিক, হুগলী	২০৲
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু, ঢাকা	।।০
" নেপালচন্দ্র দাস গুপ্ত, মানভূম	৫৲
" গোপীবল্লভ সরকার, বর্দ্ধমান	৫৲
" অসকৃৎচন্দ্র চৌধুরী, বর্দ্ধমান	৪৲
(দিনাজপুর)	
" গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৲
" বরদাকান্ত রায়	।।০
" হরিচরণ সেন	।।০
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন	১৲
" প্রবোধচন্দ্র সেন	১৲
" শ্যামাচরণ সেন	১৲
" সুধীরচন্দ্র সেন	১৲
" যোগেশচন্দ্র সেন	১৲
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	।।০
" আশুতোষ নিয়োগী	।।০
" কিশোরীমোহন নিয়োগী	।।০
" গোবিন্দচন্দ্র সেন	১৲
" অমূল্যদেব পাঠক	১৲
" বিনোদবিহারী রায়	১৲
" জীবিতনাথ দাস	।।০
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" বিপিনবিহারী বসু	২৲
খুচরা আদায়	১৸/০
জনৈক বন্ধু	৯৲
জনৈক মহিলা	৫৲
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রংপুর	২৲
" ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ, দেওঘর	২৫৲
শ্রীযুক্ত কে, এন, ঘোষ, মানভূম	৫৲
শ্রীআলতাব মুন্সী, ময়মনসিং	২।৶০
" শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর	১০৲
" ললিতমোহন সেনগুপ্ত, ঢাকা	৩৲
মাঃ শ্রীউমাপতি রায়, জলপাইগুড়ি	২৫৲
শ্রীদ্বারকানাথ রায়, রংপুর	২৫৲
শ্রীযুত এম্, শ্রীনিবাসম্, কুম্ভকোনম্	২৲
শ্রীগোপীজীবন ঘোষ, ভদ্রেশ্বর	৫৲
" সতীশচন্দ্র সেন, বগুড়া	২৫৲
বাদুড়বাগানের ভ্রাতৃবর্গ	৩৲
শ্রীযুত জে, এল, চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	৫৲
" জে, এম্, সেন, পেগু	৩৪।।০
" এ, এন, গুপ্ত, কলিকাতা	১০৲
শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ফরিদপুর	৫৲
" চন্দ্রভূষণ ঘোষ, বাঁকুড়া	৫৲
শ্রীযুক্ত এন, সি, চৌধুরী, হাজারীবাগ	৫৲
(রামপুরহাট)	
শ্রীতিনকড়ি ঘোষ	১৲
" মহাতাপচরণ ঘোষ	।।০
" গৌরচন্দ্র মণ্ডল	।।০
" হরেন্দ্রকুমার মিত্র	১

(সাঁইথিয়া)

শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র ভদ্র ১৲
,, কুঞ্জলাল সাহা ৪৲
,, কেদারচন্দ্র চন্দ্র ১৲
,, দেবেন্দ্রনাথ গড়াই ঐ ১৲
,, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲
,, রামধন লাল ১৲
,, আনন্দপ্রসাদ মজুমদার ॥৹
,, ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥৹
,, জগন্নাথ রাম ॥৹
,, বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ॥৹
শ্রীযুত বি, কে, বসু ১৲
শ্রীবিপিনবিহারী বিশ্বাস ॥৹
,, মহেন্দ্রনাথ গুঁই ১৲
শ্রীবঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১
,, অরুণচন্দ্র দত্ত ১৲
জনৈক ভদ্রলোক ১৲
অপর একজন ভদ্রলোক ॥৹
খুচরা আদায় ২১৶৹
মিঃ ডবলিউ, এ, পিন, আহম্মদপুর ৩৲
,, উপেন্দ্রনাথ সেন ,, ১,
মিঃ জে, মেস ,, ॥৹

(আহম্মদপুর)

শ্রীযুত জগদীশ্বর সাধু ॥৹
,, রামরঞ্জন দে ১৲
,, রাধারঞ্জন দে ১৲
,, বিহারী চন্দ্র ১৲
,, চৈৎমল মগনমল ১৲
শ্রীযুত এ, জি ঘোষ ১৲
জর্জ্জ এডওয়ার্ড স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ, মধুপুর ২৫৲
মাঃ শ্রীকৃষ্ণ নায়ার, ইন্‌সিন ২৭।৵৹
রামকৃষ্ণ সেবক-সমিতি, রেঙ্গুন ২৫৲
শ্রীযুত টি, কে, রাজগোপালন, কলিকাতা ৭৲
,, সি, ভি, রামন ,, ৫৲
ছাত্রভাণ্ডার, রাঁচি ২৲
মাঃ শ্রীযুত জে ভট্টাচার্য্য, কাঁকুড়গাছি ২॥৹
হোয়াইট হল ফারমেসি, কলিকাতা ৫৲
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাণাঘাট ৪

মেসার্স জে এণ্ড এফ্ গ্রেহাম এণ্ড কোং রেঙ্গুন ১৬৲
বগুড়া জিলা স্কুল ৪।৹
শ্রীহরিচরণ দাস, কলিকাতা ১৲
,, প্রফুল্লকুমার বসু পিংনা ১০।৹

(কুণ্ডলা)

শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মেসার্স ইন্দুকান্ত মুখার্জ্জি ব্রাদার্স
শ্রীরামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৩৲
,, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৪৲
,, শম্ভুদাস মুখোপাধ্যায় ১৲
,, নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১
,, রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১
,, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৲
,, সরযূকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৲
,, যতীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲
,, ভোলাদাস মুখোপাধ্যায় ১৲
,, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ॥৹
,, গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২
জনৈক ভদ্র লোক ১
শ্রীসত্যরঞ্জন সাংখ্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ ১৲
,, হরিপদ সেনগুপ্ত, সাঁইথিয়া ১৲
,, জ্যোতিঃপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার মাতা ,, ১৲
,, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বর্দ্ধমান ১
,, প্রমথনাথ সিংহ, রাইপুর
,, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাঁইথিয়া ১
শ্রীযুত পি, এন চৌধুরী, বেসিন ২০৲
মাঃ সেক্রেটারী, বার এসোসিয়েসন বগুড়া ২৫৲
মাঃ শ্রীনলিনচন্দ্র মিশ্র, বালি ১৫৲
শ্রীমাখনলাল দে, কলিকাতা ৫৲
শ্রীযুত বি, সি, দাস গুপ্ত, তেজপুর ১৮৲
দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার, শৈলকুপা ১০৲
শ্রীমণিলাল সোনার কলিকাতা ১

(কুণ্ডলা)

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১০৲
রায় রজনীভূষণ মুখোপাধ্যায় ৫

শ্রীবন্দীরাম মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডলা ২৲
,, শ্যামলদাস খান্না, বর্দ্ধমান ৫৲
,, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, রাণীগঞ্জ ৪৲
মেজার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ,, ১৲
কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ,, ২৲
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ,, ১৲
মেজার্স গোপালখান এণ্ড কোং ,, ২৲
মেজার্স কে, সি, দে এণ্ড সন্স, কলিকাতা ৫৲
মাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার, রেঙ্গুন ২৫৲
শ্রীযুত কে, আর, নাথ, অ্যাট, সুরাট ৫৲
রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, ভাঙ্গামোড়া ২৲
ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ
বোম্বাই ৩০৲
শ্রীযুগলকিশোর মিত্র, দুবরাজপুর ২
,, কিশোরীলাল দাস ,, ১৲
,, মহম্মদ কাসেম আলি ,, ২৲
,, গোপেশ্বর মিত্র ,, ১৲
শ্রীনন্দলাল দে প্রভৃতি, কলিকাতা ৩৬৶০
মাঃ শ্রীতারিণী চরণ সেনগুপ্ত ,, ৮৶০
শ্রীশরৎচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি ,, ১০৲
শ্রীযুত জে, ভট্টাচার্য্য, কাঁকুড়গাছি ৪৲
জনৈক ভদ্রলোক, কালীপাহাড়ি ৬৲
মাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র দে, শৈলেরকান্দা ৬৲
শ্রীযুত সি, এস, ত্রিবেদী, ক্যাম্বে ৫৲
,, রজনীকান্ত সরকার বর্ম্মা,
দেওটানগুডার ১৲

(মানপুর)

শ্রীযুত আফসল সা ২৲
,, মুল সিং ২৲
,, জি, এল, করভন ২৲
,, সত্যেন্দ্রমোহন শেঠ ২৲
,, বি, এল চতুর্ব্বেদী ১৲
,, ওয়াজির আলি ১৲
,, রামদাস ১৲
,, বেহারীলাল চুসালাল ১৲
,, বিনায়ক রাও ৷৹
,, লাল বাহাদুর ৷৹
,, রামলাল ৷৹
,, চণ্ডীচরণ কুণ্ডু, সেওড়াফুলি ৫৹
সেক্রেটারী, বালি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার ১০৲

(দুবরাজপুর)

শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৲
,, অশ্বিনীকুমার দে ১৲
,, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲
,, হরিপদ ঘোষ ১৲
,, অবিনাশ চন্দ্র সিংহ ১৲
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
,, যোগেশচন্দ্র আস ১৲
শিঙ্গুর হাইস্কুলের ছাত্রগণ ১০৲
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ সরকার,
জামালপুর ১৫৷৶০
,, প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, কুমারখালি ৮৲
,, মথুরা সিং, আরা ১৲
,, কে, এন ,, ১৲
,, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ,, ১৲
,, বিজ্ঞানন্দ সহায় ,, ১৲
,, নর্ম্মদেশ্বর প্রসাদ ,, ১৲
,, অথনসি ভগবৎপ্রসাদ ,, ১৲
,, ভবানীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ,, ২৲
,, রামচাঁদ প্রসাদ ,, ১৲
,, এম, এন, বি ,, ১৲
,, মুরলীধর ,, ১৲
,, ভামপ্রকাশ ,, ১৲
,, গঙ্গু প্রসাদ ,, ১৲
,, রামরক্ষা সিংহ ,, ১৲
,, অথনসি উমাকান্ত ,, ১৲
,, শ্যামসুন্দর দাস ,, ১৲
,, সুরথনাথ চৌধুরী ,, ৪৲
,, মৌলভী সাহাবুদ্দিন খাঁ ,, ১৲
রায় সাহেব শ্রীযুত ইউ, এন, ঘোষ ,, ১০৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুত এইচ, পি, ঘোষ ,, ১০৲
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মিত্র ,, ৪৲
বিবেকানন্দ দরিদ্র-ভাণ্ডার, বরিশাল ২৲
শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দে, কলিকাতা ৫২৲
৩৬।৪.৩ নং বেনিয়াটোলা
মেস হইতে ২৲
শ্রীনলিনচন্দ্র মিশ্র, বালি ১৫৲
মাঃ শ্রীযুত এম, সি, কর, রঙ্গপুর ১০০৲

নাম	টাকা
শ্রীসূর্য্যকান্ত রায়	২/০
শ্রীযুত বি, এন, কথক, কলিকাতা	৩৲
,, বি, এন, সেন এবং কর্ম্মচারিগণ, দার্জ্জিলিং	৫
,, গোকুলকৃষ্ণ ধর, হুগলী	১॥০
,, মন্মথনাথ মিত্র, সাংখিয়া	১৲
,, বসন্তকুমার সাহা, খাগড়া	২৲
,, শশধর বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা	২৲
,, কামিনীমোহন বিশ্বাস, কুষ্টিয়া	১৲
,, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	১৫৲
,, হেমন্তকুমার মৈত্র, নারায়ণগঞ্জ	১০৲
,, জগদীশ আয়ার, কুম্ভকোনম	১৲
,, রজনীকান্ত দে, জলপাইগুড়ি	।০
মাঃ শ্রীবসন্তকুমার রুদ্র, গোপালদ্বীপ	১০৲
শ্রীপ্রমথনাথ সরকার, ফরিদপুর	১৫৲
,, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া	১৪৲
,, রামময় দে, বদনগঞ্জ	১০৲
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী, তেজপুর	২৫৲
মান্দাইল হিতসাধিনী সভার অধ্যক্ষ, রমনা, ঢাকা	৪৲
(দুবরাজপুর)	
মাঃ শ্রীযুগলকিশোর মিত্র	২৲
শ্রীগৌরীদত্ত এবং কেদারনাথ	২৲
,, মহাদেও লাল রামানবাস	৪৲
,, কালীনাথ মারোয়ারী	১৲
,, গোপালচন্দ্র মারোয়ারী	১৲
,, বাণীলাল কবিরাজ	৪৲
,, নগেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি	১৲
,, কিশোরীমোহন বসু	১৲
,, কুঞ্জলাল চাটার্জ্জি	১৲
,, রামনারায়ণ গুহ	১৲
,, শিবলাল সেন	১৲
শ্রীযুত সেখ সৈয়দ হোসেন আছিদ	১৲
স্থানীয় চাঁদা	৭৲
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং বাটলার কোম্পানির দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ, মজঃফরপুর	১০৲
শ্রীদুর্গাচরণ দাস, বরিশাল	৯৲
নৈশ বিদ্যালয়, বীরহাটা	২৲

নাম	টাকা
কলেজ হাঁসপাতালের ছাত্রগণ, ভবানীপুর	২৲
শ্রীমাণিকচরণ পাল, কলিকাতা	৫৲
,, শরৎচন্দ্র দে ,,	৫
শ্রীযুত বি, সি, বিশ্বাস, খিদিরপুর	১০৲
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, হাওড়া	৫৲
ব্যায়াম সমিতি, ভবানীপুর	১০৲
শ্রীরতনকৃষ্ণ সাহা, রেঙ্গুন	৫৲
শ্রীযুত এস, ঘোষ, বগুড়া	১৲
শ্রীসুবোধকুমার চন্দ, মানভূম	২৲
(মাঃ শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল, আরা)	
রায় হরিপ্রসাদ ঘোষাল বাহাদুর	১০৵০
রায় সাহেব শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ	২
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সুর	১
শ্রীভুবনেশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মা	১৲
শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	॥০
শ্রীঅভয়চরণ ঘোষাল	১৲
শ্রীপদরথ রাম	১
শ্রীবিমলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়	॥০
খুচরা আদায়	১।৵০
(চন্দননগর)	
শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস	১
শ্রীপূর্ণচরণ গোস্বামী	॥০
শ্রীহরমোহন দে	১
শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দাস	॥০
শ্রীনেপালচন্দ্র সিং	॥০
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ	১
শ্রীযোগীনচন্দ্র সাধুখাঁ	১৲
খুচরা আদায়	৩৸০
শ্রীমহম্মদ আলী ও আবুদ আলী	১৫৲
শ্রীযুত জে, সি, চক্রবর্ত্তী	১৬৲
,, এন, এম, মুখার্জ্জি	১
,, ডি, ভি, চন্দ্র, হলদিবাড়ী	৫৲
শ্রীগোলাম রহমান মিয়া, রাজসাহী	১৪৸০
উকীল-সম্প্রদায়, হাওড়া	৩০৲
শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী, কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুত সি, সি, চাটার্জ্জি, ,,	২০৲

(মাঃ শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস, চন্দননগর)

শ্রীমতী মহামায়া দেবী	॥০
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
শ্রীপাঁচকড়ি হাউলী	॥০
শ্রীদীননাথ পৈড়ালী	২৲
শ্রীপঞ্চানন অধিকারী	১
বহুবাজার বারোয়ারী	১
শ্রীমঙ্গলচন্দ্র পাল	১
শ্রীআবদুল্লা মুরজী	২
শ্রীনিবাস আদক	১৲
শ্রীযুত কে, এন, ঘোষ	৫৲

(মাঃ শ্রীমতী কমলা মুখোপাধ্যায় দামো, মধ্যপ্রদেশ)

মিসেস জি, বোথাস	২০৲
শ্রীযুত টিকেকার	৫৲
মিসেস ট্রুটগল	৩৲
„ আলেক্‌জেন্দ্রা	২৲
„ বকলে	২৲
„ গার্ডকেল	১৲
„ নকরাজ	১৲
„ দামোদর রাও	২৲
„ লক্ষ্মী-শঙ্কর	২৲
„ গোকুল চাঁদ	২৲

(সাগর, মধ্যপ্রদেশ)

শ্রীমতী প্রভাবতী মুখোপাধ্যায়	৫৲
শ্রীমতী সরযূবালা মুখোপাধ্যায়	৫৲
শ্রীযুত রজনীমোহন মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীমতী তরুলতা গোস্বামী	২৲
শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জী	১৲
শ্রীনবচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা	১৯৲
শ্রীকেদারনাথ দে, মুক্তাগাছা	৫৲
ফরিদপুর ঈশান স্কুলের ছাত্রবৃন্দ	৪।/০
ফরিদপুরের মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ	৩৲
শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, টেপাখোলা, ফরিদপুর	৭৲
„ অন্নদাচরণ বণিক, ফেনী	॥০
„ নন্দলাল ঘোষ, কাঁচড়াপাড়া	॥০
„ রামবল্লভ নন্দন, কলিকাতা	১৲
„ যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকীপুর	৩০৲

(মাঃ শ্রীযুগলচন্দ্র মিত্র, দুবরাজপুর)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	২৲
শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার	২৲
শ্রীগৌরচন্দ্র সিংহ	১৲
শ্রীগোষ্ঠবিহারী কবিরাজ	॥০
শ্রীউমেশচন্দ্র সেন	॥০
„ রামচরণ স্বর্ণকার	॥০
„ সুরেন্দ্রলাল দে	॥০
„ রামরঞ্জন নন্দী	১৲
ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মিত্র	॥০
„ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
শ্রীশশিভূষণ মুস্তফী	১৲
„ রামরঞ্জন দত্ত	১৲
„ উমেশচরণ দত্ত	১৲
খুচরা আদায়	৪৵০
শ্রীঅভয়চরণ ভুঁই	॥০
শ্রীরাখালচরণ দে	॥০
শ্রীগিরিশচরণ খনগড়	॥০
শ্রীদুর্গাদাস সিংহ	॥০
শ্রীশম্ভুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০
শ্রীব্রজেশ্বর নায়ক	॥০
শ্রীযুত হরদৎ মাড়োয়ারী	॥০
„ পাঁচুলাল কানাইলাল	১৲
„ হেদিলাল বনোয়ারিলাল	১৲
„ গিরিধারীলাল রামেশ্বর	১৲
„ প্রয়াগচাঁদ খেতসি দাস	১৲
মাঃ শ্রীরাজবল্লভ মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান	১৫৲
মহামায়া বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, সিঙ্গুর	১০৲
শ্রীনবচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা	১৫৲
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ সরকার, আদাপুর	৫৲
শ্রীযুত বি, সি, বানার্জ্জি, কলিকাতা	২৲
মিঃ এস, সি, সরকার, ফরিদপুর	২৲
শ্রীদিবাকর সিংহ, দরিয়াপুর	॥০
শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বালি	১৫৲

মাঃ শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস, চন্দননগর

খুচরা আদায়	৪৸৵
শ্রীগয়ারাম ফকির	॥০
„ গদাধর পাত্র	॥০
„ উদ্ধবচরণ দাস	১৲

,, নগেন্দ্রনাথ কালি	।০
শবদাহ সমিতি	৭।০
মাঃ শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য্য, বাঁকিপুর	৮৸০
শ্রীহরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশী	১৲
শ্রীমতী দুর্গাসুন্দরী দেবী	১৲
,, কৃষ্ণসুন্দরী দেবী	॥০
শ্রীযুক্ত চিতরসিং দোবে	
,, কে, সুব্বারাম, মান্দ্রাজ	১৲
,, আশুতোষ দত্ত, উত্তরপাড়া	১৲
,, মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, গৌহাটী	৩৲
,, প্রফুল্লমোহন রুদ্র, ঢাকা	১৸৶০
রাণীগঞ্জের জনৈক ছাত্র ও শিক্ষক	৩৲
বিবেকানন্দ দরিদ্র-ভাণ্ডার	১।০
শ্রীকুলদানাথ বিশ্বাস	১৲
মাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা	৪৲
শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেন, তমলুক	৫৲
বার লাইব্রেরী, তমলুক	২৫৲
মাঃ শ্রীঅধীরশরণ বসু, শালকারী	৫৲
(মাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, হালসা)	
শ্রীযুত জি, বি চ্যাটার্জ্জী	৩৲
,, বি, কে, কুণ্ডু	১৲
,, এস, সি, মজুমদার	
,, আই, সি, চ্যাটার্জ্জি	
,, কে, পি, রায়	
,, এচ, এন, ভট্টাচার্য্য	
,, এ, এল, বিশ্বাস	
,, এস, এস, মল্লিক	॥০
,, ডি, এন, ঘোষ	১৲
,, ইউ, এন, কর	১৲
,, আর, বি, ভট্টাচার্য্য	১৲
,, পি, সি, দাস	১৲
" ইতবার আলি মণ্ডল	॥০
,, ডি, এন, মুখার্জ্জি	১৲
,, দাশরথি মুখোপাধ্যায়	১৲
,, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	॥০
শ্রীযুত গুরুদীন উপাধ্যায়	১৲
,, দুলপত সিং	॥০
,, বদরীনারায়ণ দোবে	১৲
,, অতুমিয়া মিস্ত্রী	॥০
শ্রীসুন্দর কাহার	১৲
,, বিপিনবিহারী	॥০
,, মতিলাল বিশ্বাস, মৈমনসিং	২০৲
অপরিচিত বন্ধু, কলিকাতা	১০৲
চানক রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম, বারাকপুর	১০৲
শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল	
বার লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান	৬৲
শ্রীসুদর্শন শেঠ, আগরা	৫৲
মাঃ শ্রীচন্দ্রকুমার সেন, বাহারী	৫
শ্রীছেদোলাল সিং, শ্রীনগর	৫৲
,, কেদারনাথ দে, খেকুজানি	৫৲
জনৈক বন্ধু, গয়া	৪৲
জনৈক বন্ধু, থালিয়া	২৲
হেড মাষ্টার, সুজানগর	৮৲
শ্রীসনাতন সেন, কারমাটার	২
,, রামমোহন তালুকদার, লোহাগঞ্জ	১
মাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সালিখা	৪৫
টাঙ্গুর দেশীয় অধিবাসিগণ	৩৮
(মাঃ শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষাল, আরা)	
শ্রীরাধারমণ সাহা	
,, বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়	
,, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়	
,, পরমেশ্বরীদয়াল	
,, দ্বারকানাথ মাথুর	
,, অবধ বিহারীলাল	
,, রামমোহন প্রসাদ	
,, ব্রজবিলাস প্রসাদ	
মৌলভী এম, য়ুনেস	১
,, মহম্মদ সাফিউদ্দীন	১
শ্রীবেণীমাধব ঘোষাল	২৲
,, যোগীন্দ্রনাথ লাহিড়ী	২৲
,, হরিকৃষ্ণ রায়	১৲
,, বাবুলাল	॥০
,, অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০
মৌলভী মাফেজ আলাম	১৲
শ্রীইন্দ্রবিহারী শরণ	
,, শ্যামসুন্দর প্রসাদ	
রায় জ্বালাপ্রসাদ বাহাদুর	

শ্রীনন্দকুমার লাল	১৲
„ শিউনন্দন প্রসাদ	১৲
„ যতীন্দ্রলাল মিত্র	১৲
(মাঃ শ্রীনিত্যলাল মুখোপাধ্যায়, গয়া)	
শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র	৪৲
„ নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়	২৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র সাথিয়া	১৲
„ যোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	২৲
শ্রীযুত টি, এস, সরকার	১৲
„ কে, সি, মিত্র	১৲
„ কে, সি, সেন	৷৹
„ এম, এন, মুখার্জ্জি	১৲
রায় সাহেব বিন্ধ্যেশ্বরী	৫৲
(মাঃ শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস, চন্দননগর)	
শ্রীমতিলাল মারবারী	৷৹
„ গোষ্ঠবিহারী সাহা	৷৹
„ মণীন্দ্রনাথ সাহা	১৲
শেখ লাল গোলখান	৷৹
শ্রীমতী পূর্ণশশী দাসী	৷৹
„ বসন্তকুমারী দাসী	৷৹
শ্রীশ্যামাচরণ দাস	৷৹
„ নিতাই চন্দ্র পাল	১৲
„ যুগলকিশোর দে	১৲
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	৷৹
„ হরিদাস নিয়োগী	৷৹
„ গঙ্গাধর দোবে	৷৹
„ কালীচন্দ্র দাস	৷৹
শ্রীহেমন্তকুমার মজুমদার, বিনোদপুর	৩০৲
শ্রীমতী রাজকুমারী হেমাঙ্গিনী, " কলিকাতা	১০৲
শ্রীরাজনাথ ঘোষ, কলিকাতা	৬৷৵৹
মাঃ শ্রীশশিভূষণ মিত্র, কালীপাহাড়ী	৫৲
শ্রীগৌরহরি পাল, অচিপুর	২৲
„ দ্বারকানাথ রায়, পীরগঞ্জ	২৲
শ্রীযুত এম, আরুমুগম, ব্যাঙ্গালোর	১৲
„ শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নারায়ণগঞ্জ	১৲
„ টি, এন, চ্যাটার্জ্জী, বর্দ্ধমান	২৲
„ বি, কে, চ্যাটার্জ্জি, কালীঘাট	২০৲
„ বিক্রমকুমার বসু, কলিকাতা	৫৲
রামকৃষ্ণ দরিদ্রভাণ্ডার, দ্বারহাটা	১০
মাঃ শ্রীযুত কে, এন ঘোষ, কাট্রাসগড়	৪০৲
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র পাল কলিকাতা	৫০৲
খুচরা আদায়	১৯।০
মাঃ শ্রীজানকীপ্রসাদ আইচ, আসানসোল	২৫৲
„ হেডমাষ্টার, রঙ্গপুর	২১৷৵০
„ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়, কাঞ্চনতলা	১০৲
„ শ্রীহরিদাস রায়, কটক	১৫৲
„ মিঃ বি, সি. বিশ্বাস, খিদিরপুর	২৫৲
„ শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাদিপুর	১১৸৵০
„ শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস, শ্রীহট্ট	১০৲
„ শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান	৫৲
„ শ্রীসবিনয়চরণ রায়, ডিব্রুগড়	৫৲
„ সম্পাদক, সেরপুর বার লাইব্রেরী, মৈমনসিংহ	৫৲
„ মিঃ রামদাস আইচ, ক্যাম্বে	৩৲
„ শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী, ভুপাল	২
„ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বর্দ্ধমান	২৲
„ শ্রীমঙ্গলচন্দ্র দাস, কলিকাতা	৷৹
„ শ্রীরাসবিহারী সেনগুপ্ত, খিদিরপুর	১৩৲
পূর্ব্ববাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ-সাহায্যভাণ্ডার, বালি	১০৲
স্থানীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ ও সহৃদয় জনসাধারণ, ন্যাশিও	১১৫
মাঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মুখার্জ্জি, সিমলা	২৲
শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ভবানীপুর	২৲
„ ভোলানাথ ঘোষ, মেদিনীপুর	৫৲
মাঃ শ্রীচন্দ্রকুমার মজুমদার, শিলং	১০৲
„ „ সুরেন্দ্রনাথ সাহা, কাটিহার	২৫
„ „ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সিমলা	৮৩
„ „ দেবেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণনগর	৫০৲
চুঁচুড়া ট্রেণিং একাডেমির প্রথমশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ	২৩
পুরুলিয়ার উকীল এবং মোক্তারগণের কর্ম্মচারিগণ	২০৲
(মাঃ শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস, চন্দননগর)	
শ্রীভূষণচন্দ্র দাস	৷৹
শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী	৫৲
শ্রীগোবর্দ্ধনচন্দ্র পাল	৷৹

সেখ রাখাল ||০
শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত ||০
,, সারদাপ্রসাদ সেন
,, অক্ষয়কুমার পাল
,, বিনোদবিহারী দাস ||০
ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ পালিত ১
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ
,, বটকৃষ্ণ ধাড়া
,, চন্দ্রভূষণ নন্দী
,, হরিদাস দাস
শ্রীসেখাত দর্জ্জি
মাঃ শ্রীযুত জানকীপ্রসাদ আইচ, আসানসোল ১৫
বয়েজ্ এসোসিয়েসন্, খুলনা ১০
মাঃ রামকৃষ্ণসেবক-সমিতি, রেঙ্গুন ১৩৮৲
শ্রীমতী সুখবালা ঘোষ, কিশোরগঞ্জ ১০
(মাঃ শ্রীবিহারীলাল নিকারী, ঝান্সী)
শ্রীমঙ্গর্ত রায় ১
,, বিহারীলাল ১
,, বৃন্দাবন ১
,, চেজ্জু সিং ১
শ্রীপ্রমথনাথ সেন, কলিকাতা ৫
,, ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য, কাশী ৫
,, নারায়ণচন্দ্র দত্ত, মিরাট ২৸৵০
স্বামী সেবানন্দ, কাশী ১
শ্রীযুত ডি, কে, নাটু, আলিবাগ ২
শ্রীরাজকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, শিয়ালদহ ১
,, হরিচরণ দাস, কলিকাতা ১
,, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাসাগ্রাম ||০
,, হাবড়ার উকীলগণ ৩৫

১৫ আগষ্ট পর্য্যন্ত বাগবাজার উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত

শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী, আলিপুর ৫৲
বেঙ্গল কেমিকেল ফেমিন ফণ্ড ৪৭৲
শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার সহকারিবৃন্দ, নাজিরপুর ১০৲
শ্রীগোকুলদাস দে, কলিকাতা ১৲
,, কানাইলাল মিত্র ,, ১৲
শ্রীযুত বি, সি, ঘোষ, পাণ্ডগে ৫৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ২৫৲
শ্রীমতী হেমনলিনী বসু ,, ২৲
শ্রীনলিনাক্ষ মুখার্জ্জি, আগ্রা ১৲
অনারারী সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, লক্ষ্ণৌ ১৫৲
মাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘটক, রাঁচি ৩||৴০
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, জগতী ৫||০
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন সাহা মহাশয়ের মাতা এবং স্ত্রী ৩৲
শ্রীমতী পূর্ণলক্ষ্মী বসু, বেনারস ১৲
শাঁখারীটোলা অর্চ্চনালয়, কলিকাতা ১০৲
সেক্রেটারী বার-লাইব্রেরী, আলিপুর ১৪২।০
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে, কলিকাতা ৫৲
জনৈক বন্ধু ,, ১০০৲
সেখ ঈশান আলি ,, ৬৲
শ্রীপ্রভাতকুমার ব্যানার্জ্জি ,, ৩৲
শ্রীঅখিলনাথ সরকার, পোড়াদহ ৫৲
সেক্রেটারী, দরিদ্রভাণ্ডার, হরিপাল ১৫৲
শ্রীসতীশচন্দ্র দে, শিলং ২৲
শ্রীহরেন্দ্রকুমার গুহ ,, ১৲
শ্রীযুক্ত আই, এম্, রাহা, সেক্রেটারিয়েট্, রাঁচী ২৲
সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়, মিরাট ১০৲
গবর্ণমেণ্ট প্রেসের কর্ম্মচারিগণ, রাঁচি ৮৲
বাঁকুড়া কলেজ হোষ্টেলে সংগৃহীত ২৮৶০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, ধিত্পুর ৪৲
শ্রীআবদুল গফুর, শিলং ৫০৲
শ্রীঅধরলাল দত্ত, কলিকাতা ১০৲
শ্রীমতী উষাঙ্গিনী দেবী, ,, ৬৶০
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন সেন, ,, ১৲
শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, কলিকাতা ১০৲
প্রেসিডেণ্ট, নোয়াখালি রিলিফ কমিটি ৪০০৲
মাঃ শ্রীশশিভূষণ সিংহ, কলিকাতা ৪৩৲
শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ,, ১৲
রামকৃষ্ণ অনাথভাণ্ডার, চন্দনপুকুর ২৫৲
শ্রীযুক্ত আর, চক্রবর্ত্তী, বারহাট্টা ৫৲

মাঃ প্রমোদের মাতা, রাঁচি ১২৷৵০
মাঃ শ্রীকেদারনাথ দত্ত, কোয়ালপাড়া ২০৲
শ্রীযুক্ত কে, বি, চৌধুরী, শিলং ১০৲
শ্রীশশিভূষণ মাইতি, জঙ্গিপুর ১৲
জি, সি, প্রেসের কর্ম্মচারিগণ
মাঃ শ্রীযুক্ত এল্, এন্, ভড়, দিল্লী ১৪৲
হিতবাদী ফেমিন-রিলিফ-ফণ্ড, কলিকাতা ৭৫০৲
শ্রীদুর্গাদাস সরকার, ১৲
মাঃ বেঙ্গলীপত্রের ম্যানেজার, কলিকাতা ৩৭৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু ,, ১।০
শ্রীদুর্গানাথ গুপ্ত ,, ১৲
শ্রীশ্যামাদাস কবিরাজ ,, ৫০৲
জনৈক বন্ধু, পাবনা ৫৲
শ্রীবামদাপ্রসাদ রায়, কলিকাতা ৫৲
শ্রীরামকৃষ্ণ বসু ,, ২৫৲
শ্রীহেমচন্দ্র সেন ,, ১৫৲
শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস ,, ৭॥০
শ্রীযুক্ত কে, এ, দুরাস্বামী আয়ার, চিটুর ১৲
শ্রীযুত লুডো দত্ত, কলিকাতা ১৲
শ্রীগিরিশচন্দ্র চন্দ্র ,, ২০৲
শ্রীজানকীনাথ সাহা, কলিকাতা ১৫৲
ন্যাশন্যাল ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানী ,, ৩০৲
লোহাপটী বারোয়ারী ফণ্ড, মাঃ হিতবাদী কার্য্যালয় ১৫০০৲
শ্রীসুশীলকুমার ব্যানার্জ্জি, খিদিরপুর ১৲
শ্রীভূপালচন্দ্র বসু, শিলং ২৲
শ্রীশান্তিচন্দ্র মজুমদার, বাঙ্গলা ১৲
শ্রীযোগেশগোবিন্দ মজুমদার, ঘারিন্দা ৫৲
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, কলিকাতা ৪৫৲
বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসম্প্রদায় ৮০৲
শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীহট্ট ১০০৲
মিঃ এল্, এম্, স্নেলগ্রোভ, ১১, গড়পার রোড ৩০৲
মিঃ স্মিথ ,, ২৲
মিঃ ডবলু গ্রিন্ ,, ১৲
মিস্ বারবার ,, ১৲
মিঃ জিঃ বি, মারশ্যাল ,, ২৲
মিঃ এ, ক্রো ,, ১৲
মিঃ সি, সি, আগষ্টাইন গড়পার রোড ১৲
মিঃ ভি, এল, ক্যাণ্টার্ণ ,, ১৲
মিঃ জে, মরিসন ,, ২৲
শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি ,, ১৫৲
জনৈক বন্ধু ,, ২৲
শ্রীমণীন্দ্রবিহারী চট্টোপাধ্যায় ,, ২৲
শ্রীচন্দ্রকান্ত নাগ ,, ॥০
শ্রীআশুতোষ নন্দী ,, ১৲
শ্রীনদেরচাঁদ দত্ত ,, ১৲
শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ,, ১৲
শ্রীযুক্ত এন্, বোস্ ,, ১৲
মিঃ এস্, কে, ইডো ,, ২
মিঃ ধুমন ,, ১৲
শ্রীযুক্ত কে, এল, ঘোষ ,, ১৲
শ্রীযুত বি, আর, দাস, গড়পার রোড ১৲
,, এন, বি, মল্লিক ,, ॥০
,, পদরত ,, ১৲
,, ইন্দ্রসেন ,, ২৲
,, এফ, সি, দত্ত ,, ২৲
জনৈক ভদ্রলোক ,, ২৲
,, বি, এন, ব্রহ্মচারী ,, ॥০
শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত ,, ২৲
শ্রীযুত জঙ্গলী ,, ॥০
,, বালগোবিন্দ ,, ২
শ্রীশৈলেশচন্দ্র সিংহ ,, ॥০
,, সত্যচরণ মিত্র ,, ১৲
শ্রীযুত জে, এন, মৈত্র ,, ২৲
,, রামলোচন ,, ১৲
,, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ,, ১৲
শ্রীযুক্ত বি, সি, মিত্র ,, ১৲
,, কুঞ্জ ,, ২৲
মাঃ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা ৮৪৷৶১৫
ডাঃ কৃষ্ণধন ব্যানার্জ্জি, গয়া ২৲
শ্রীঅম্বিকাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৭৲
,, চারুচন্দ্র দাস ,, ৫৲
শ্রীমতী সুখবালা ঘোষ, কিশোরগঞ্জ ১০৲
শ্রীগঙ্গাধর ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ২০৲
প্রেসিডেণ্ট, সেবা-সমিতি, দর্জ্জিপাড়া ২০০৲

শ্রীমতী প্রভাবতী দাসী, কলিকাতা	৫৲
শ্রীমতী নীহারবালা দাসী, কলিকাতা	১৲
„ স্বর্ণ দাসী „	১৲
„ ভগবতী দাসী „	১৲
„ প্রমীলা দাসী „	১৲
„ রাধারাণী দাসী „	১৲
„ সুহাসিনী দাসী „	১৲
„ পরিমল দেবী „	১৲
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র হালদার „	১৲
„ চুনিলাল শেঠ „	॥০
শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী, কৃষ্ণনগর	২৲
শ্রীযুত জে, রায়, রায় সাহেব, গোরখপুর	২৲
ডাঃ আর, বি, রায় „	১৲
শ্রীশ্যামলাল „	১৲
„ রাধারমণ সেন „	১৲
ঢাকা, মদনগঞ্জের ছাত্রগণ	১৫৲
শ্রীকামদাকান্ত ব্যানার্জ্জি, ঝালকাটী	১৲
খুচরা সংগ্রহ	৩/০
„ ৺ ভীমচরণ রায়, সিরাজগঞ্জ	৫৲
„ শ্রীদেবনাথ কালিদাস চৌধুরী „	২৲
„ মৃণালচন্দ্র কর „	২
„ ভূপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী „	১৲
„ শ্রীদামচন্দ্র রাধাবল্লভ চৌধুরী „	২৲
শ্রীঅম্বিকাচরণ গাঙ্গুলী „	১৲
„ বৈকুণ্ঠনাথ মজুমদার „	১৲
বোলপুর বান্দগোড়া স্কুলের ছাত্রগণ	২৫৲
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সরকার, কাইথি	১০৲
ভবানীপুর রামকৃষ্ণ দরিদ্র-ভাণ্ডার	৩৲
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, কুষ্টিয়া	৯
„ দক্ষিণারঞ্জন আচার্য্য „	১৲
„ কুমুদবিহারী নন্দী „	১৲
জনৈক বন্ধু „	১৲
জনৈকা ভগিনী „	১৲
শ্রীমাখনলাল সাহা „	১৲
মারকেন্টাইল হাউস্ অফ বেঙ্গল „	১৲
কুষ্টিয়া দেশীয় ভাণ্ডার	১৷০
মৌলভী খোদাদাদ্ খাঁ কুষ্টিয়া	১৲
শ্রীউমেশচন্দ্র চৌধুরী „	১৲
„ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী „	১৲
„ কালীপদ মুখার্জ্জি „	১৲
শ্রীহৃদয়নাথ মজুমদার „	১৲
„ শ্রীশচন্দ্র দত্ত „	১৲
„ রাধাগোবিন্দ চৌধুরী „	॥০
„ জনৈক বন্ধু „	॥০
শ্রীহেমলাল কর „	॥০
„ সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় „	১৲
„ মনোমোহন দাসগুপ্ত „	১
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায় „	১
„ যতীশচন্দ্র গুপ্ত „	১৲
„ নগেন্দ্রনাথ বসু „	১
„ যতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য „	॥০
„ বৈদ্যনাথ অধিকারী „	॥০
শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, সুখচর	৪/০
„ কেদারনাথ সাহা, দেওঘর	২৫৲
শ্রীযুত এন, বি, বন্দ্যোপাধ্যায়, কিষণগড়	৫৲
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট (কলিকাতা)	৫৩৲
শ্রীচণ্ডীচরণ কুণ্ডু	১০৲
মেসার্স বেণীমাধব পাল এণ্ড কোং	২৫৲
মেসার্স হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এণ্ড কোং	১০৲
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	৭৲
„ মতিলাল বসু	৫৲
„ কালিপদ বসু	৫৲
„ অখিলচন্দ্র মজুমদার	৫৲
মেসার্স মুকুন্দলাল পাল এণ্ড মণীন্দ্রনাথ পাল এণ্ড কোং	৫৲
„ সতীশচন্দ্র বিশ্বাস এণ্ড কোং	৫৲
„ অবিনাশ চন্দ্র সরকার এণ্ড কোং	৪৲
„ গিরিধর নন্দী এণ্ড সন্স	৪৲
„ রায় এণ্ড কোং	৪৲
শ্রীগিরিজানাথ চক্রবর্ত্তী	২৲
মেসার্স হেরম্বনাথ বেনার্জ্জি এণ্ড কোং	২৲
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু	২৲
মেসার্স রজনীকান্ত দত্ত এণ্ড কোং	১৲
„ রায় বেনার্জ্জি এণ্ড কোং	১৲
„ অবিনাশচন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং	১
„ জানকীনাথ সরকার এণ্ড কোং	১৲
„ ভুবনমোহন মিত্র এণ্ড কোং	১৲
„ বোস সরকার এণ্ড কোং	১৲

মেজাস বেনার্জ্জি গুপ্ত এণ্ড কোং
,, বিনয়কুমার ঘোষ এণ্ড কোং
,, কালাচাঁদ দীনবন্ধু সাহা রায় এণ্ড কোং
,, লালবিহারী ঘোষ এণ্ড কোং
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার
,, বিনোদবিহারী ঘোষ
,, নকুলচন্দ্র বসু
,, কৃষ্ণসখা ব্যানার্জ্জি
,, যোগীন্দ্র নাথ বসু
,, কালিদাস মিত্র
শ্রীগিরিশচন্দ্র চন্দ, কলিকাতা
শ্রীকুঞ্জবিহারী মজুমদার ,,
মাঃ প্রিন্সিপাল, মেট্রোপলিট্যান ইন্‌ষ্টিটিউসন ,, ১০
অধ্যক্ষ, বালি অনাথভাণ্ডার ১৫৲
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, ইথোরা ৫৲
বীণাপানী ডিবেটিং ক্লব, কলিকাতা ৫
জনৈক বন্ধু, গয়া ৫৲
জনৈক উদ্বোধন-গ্রাহক ২৫৲
শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সম্বলপুর ১৲
,, গৌরীকান্ত বিশ্বাস ,, ১৲
,, সরোজাক্ষ মিত্র ,, ॥০
,, অঘোরচন্দ্র পাল ,, ॥০
,, সন্তোষকুমার নাথ ,, ॥০
,, হরিচরণ মজুমদার ,, ॥০
,, এম, এম, সেরিফ ,, ॥০
,, মুরলীধর বাহিদার ,, ॥০
জনৈক বন্ধু ,, ॥০
শ্রীনলিনীমোহন রায় ,, ১৲
,, জনৈক বন্ধু ,, ॥০
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ,, ১
,, ই, বি ,, ॥০
,, রোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৲
,, কৃত্তিবাস পাটনায়েক ,, ॥০
,, দেওরাজ দয়া ,, ১।০
,, প্রিয়নাথ দে, কলিকাতা ৫।৵০
,, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, বুনারা ৩৲
,, সুরেন্দ্রনাথ দাস, শিলচর ১॥০
মহেশপুর হাই স্কুল ৭৲

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, হাওড়া ১৲
মাঃ শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র ঘটক, রাঁচি ৫৸০
রিপণ কলেজ দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার, মাঃ শ্রীকিরণকুমার বসু ৭৫৲
শ্রীত্রিগুণাকুমার চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ৫।০
লিথো বিভাগ, সারভেয়ার জেনারেলের অফিস, কলিকাতা ১৫৲
ইটলী অর্চ্চনালয় ৩৬৲
শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার নাথ, বারহাটা ১০৲
শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায়, নয়াবাজার
,, এন, ডি বন্দ্যোপাধ্যায়, কিষণগড় ৫৲
জিয়াগঞ্জ ই, সি, ইন্‌ষ্টিটিউসন ১৩৲
শ্রীযুত কালীপদ গাঙ্গুলী, মল্লিপুর ১৲
,, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা ৩৲
,, মোহিনীমোহন ঘোষ, বোম্বাই ২৲
,, প্রমোদেন্দু ঘোষ, কাঞ্চনতলা ২৲
পুঁটিয়া স্কুল সেবা ভাণ্ডার ১
শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১॥০
জনৈক বন্ধু ,, ২৲
জনৈক বন্ধু , ৫০৲
শ্রীযুত নিখিলেশ্বর সান্ন্যাল ,, ৫৲
,, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় , ১৲
শ্রীমতী দুর্গাসুন্দরী দেবী ৪
,, সুবালা দেবী ,, ২
,, নলিনীবালা দেবী ,, ১৲
,, চারুহাসিনী দেবী ,, ১৲
,, সতিয়া ,, ১৲
শ্রীযুত নিতাইচন্দ্র দাস ,, ॥০
শ্রীযুত মহেশ, কলিকাতা ॥০
চাপাইর এম, ই স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ ৫
শ্রীমতী শৈলবালা দেবী, রাঁচি ১৲
কতিপয় ছাত্র, বিষ্ণুপুর ১৸৵০
শ্রীযুত সীতানাথ পাল, দিনাবাজার ৩৲
মাঃ বেঙ্গলী অফিস, কলিকাতা ২০০৲
শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ, মোরাদপুর ১৬৲
,, বরদাপ্রসাদ নিয়োগী, গার্ডেন রিচ ১৫৲
নিউ মার্কেটের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ২৮।/০
পুরী জেলা স্কুলের ছাত্রগণ ১০৲

মাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কুচবিহার ৪০৲
শ্রীযুত এন, এন, ভড়, দিল্লী ৩।০
জ্যোৎসিরাম সেবাশ্রম ৬৸/০
শ্রীযুত নেপালচন্দ্র দাসগুপ্ত, জামাদোবা ৫৲
শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত, হাসাড়া ১৲
শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, পুরী ২০৲
,, এ, সি, চট্টোপাধ্যায়, কাশী ১০৲
মাঃ শ্রীযুত বিধুভূষণ সেন, ভেটারিনারী কলেজ, বেলগাছিয়া ১৯।।০
শ্রীযুত মনোমোহন দেব, মৈমনসিং ১০৲
,, প্রবোধ প্রকাশ রায়, টিটাগড় ৫৲
,, বসন্তকুমার চন্দ, ভাঙ্গাবাজার ৫৲
,, আশুতোষ সাহা, ভাদুড়ীপাড়া ১৲
মাঃ শ্রীসীতানাথ কর্ম্মকার, উপাসি ১০৲
শ্রীযুত ধরণীধর গোস্বামী, কলিকাতা ১৲
খুচরা দান ৩৲

এইচ, জি, সি, সি, আই ৩।।০
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, পূর্ববঙ্গদুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার, মাঃ শ্রীযুত বসন্তকুমার বসু, ভবানীপুর ১৪৭।।৶০

(ফিরোজপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট)

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ ১৲
,, লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী ১
,, রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲
,, ফকির বাবু ১৲
,, পরেশ বাবু ১৲
,, কানাই বাবু ।।০
,, ক্ষেতুবাবু ।।০
,, অরুণ বাবু ।।০
,, মহম্মদ হাইয়ৎ খাঁ ।।০
মিঃ ডি, ডি, গান্ধার ।।০
,, আর, টি, টিয়ার ১৲

স্থানীয় কেন্দ্রসমূহে সংগৃহীত।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সুহৃদসঙ্ঘ আশ্রম, চট্টগ্রাম ৩৬৲
শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র দত্ত ,, ২০৲
বিবেকানন্দ লাইব্রেরী, মৈমনসিং ৫০৲
শ্রীযুত হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী, ঢাকা ৩।৶০
,, অবিনাশচন্দ্রদাস গুপ্ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫৲
মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, কলিকাতা ২৫৲
শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত ১৶০

লক্ষ্মীপুর হাই স্কুলের ছাত্রগণ ৫৲
শ্রীযুত কুমুদভূষণ বসু, চট্টগ্রাম ১০৲
নোয়াখালী জেলার ইঞ্জিনিয়ার, টেষ্ট ওয়ার্কের জন্য ৫০৲
নোয়াখালী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ১০০০৲
শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, চট্টগ্রাম ২০৲
মাঃ শ্রীমতিলাল বিশ্বাস, মৈমনসিং ১০৲

প্রাপ্ত দ্রব্যাদি।

বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র সাধু খাঁ, কপিলমুনি
৬ খানা নূতন কাপড়
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার, চন্দ্রকোণা
৪ খানা পুরাতন কাপড়

শ্রীমতী এন্, এন্, পালিত, দেওঘর
২৮ খানা পুরাতন কাপড়
শ্রীসিদ্ধেশ্বর দে, কলিকাতা
এক গাঁটরি পুরাতন কাপড়
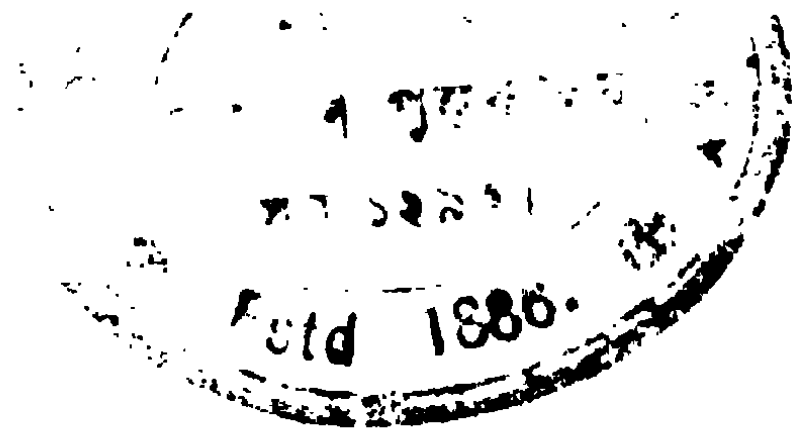
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়।

(স্বামী সারদানন্দ)

বেদপ্রমুখ শাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ হয়েন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্য ধ্রুবসত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দেখা যায়, তিনি যে এখন কেবলমাত্র ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ উভয় ভাবের এবং ব্রহ্মশক্তি মায়ার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত হইয়া সকল প্রকার সংশয় ও মলিনতার পরপারে গমন-পূর্ব্বক স্বয়ং সদানন্দে অবস্থান করিতেছেন তাহা নহে; কিন্তু ভাবমুখে সর্ব্বদা অবস্থানপূর্ব্বক মায়ার রাজ্যের যে গূঢ় রহস্য যখনই জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন তখনই তাহা জানিতে পারিতেছেন। তাঁহার সুসূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মনের সম্মুখে উহা আর নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ঐরূপ হইবারই কথা। কারণ, ভাবমুখ ও মায়াধীশ ঈশ্বরের বিরাট মন, যাহাতে বিশ্বরূপ-কল্পনা কখন প্রকাশিত এবং কখন বিলুপ্তভাবে অবস্থান করে—উভয় একই পদার্থ; এবং যিনি আপনার ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপসাধনপূর্ব্বক উহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বিরাট মনে উদিত সমুদয় কল্পনাই তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়। উক্ত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগের আগমনের পূর্ব্বেই নিজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসকলের কথা জানিয়া লইয়াছিলেন। বিরাট মনের কোন্ বিশেষ লীলা প্রকাশের জন্য তাঁহার বর্ত্তমান শরীরধারণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত লীলার পুষ্টির জন্য কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর সাধক ব্যক্তি ঈশ্বরেচ্ছায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, একথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই

লীলাপ্রকাশে তাঁহাকে অল্পাধিক সহায়তা করিবেন এবং তাঁহারাই বা তাহার ফলভোগ মাত্র হইয়া কৃতার্থ হইবেন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ভক্তদিগের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মায়ার রাজ্যের অন্তরে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত গূঢ় রহস্যসকল যিনি জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

নিজ চিহ্নিত ভক্তসকলের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া দিব্যভাবারূঢ় ঠাকুর এইকালে তাঁহাদিগের জন্য কিরূপ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের তাঁহার নিকটে প্রথমাগমনের কথা অনুধাবন করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, ঠাকুরের নিকটে তাঁহার আগমনের প্রায় সমসমান কালে কলিকাতায় সিমলা নামক পল্লীনিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শ্রীযুত সুরেন্দ্র ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং স্বল্পকালেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথকে, ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্য নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পরস্পর পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা ঐরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন সন ১২৮৭ সালের হেমন্তের শেষভাগ—ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইবে; এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক নরেন্দ্রনাথ ঐ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবামাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক সুগায়ক যুবকের পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিবস তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সকাশে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে স্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে

নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার সহিত দুই একটি কথা কহিয়া অবিলম্বে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্-এ পরীক্ষা হইয়া গেল এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা সহরের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, পাত্রী শ্যামবর্ণা ছিল বলিয়া তাহার পিতা উক্ত বিবাহে দশ সহস্র মুদ্রা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়বর্গ তাঁহার পিতার প্রেরণায় তাহাকে উক্ত বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিষম আপত্তিতে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই। রামচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথের পিতার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে চিকিৎসক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। ধর্ম্মভাবের প্রেরণা হইতেই নরেন্দ্র বিবাহ করিলেন না, এ কথা বুঝিতে পারিয়া তিনি এখন তাহাকে এক দিবস বলিয়াছিলেন, "যদি ধর্ম্ম লাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থলে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে চল।" প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথও তাঁহাকে এই সময়ে এক দিবস তাঁহার সহিত গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত হইয়া দুই তিন জন বয়স্য সমভিব্যাহারে সুরেন্দ্রনাথের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঐ দিবস ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা তিনি একদিন সংক্ষেপে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"পশ্চিমের, গঙ্গার দিকের দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন, এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থেই ইতরসাধারণের মত একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলগা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্ব্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে!

"মেজেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে সে দিন দুই চারি জন আলাপী ছোকরাও আসিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়; ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান সে দুই চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে'—গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

"পরে, সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে বলিবার নহে। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে মনে হইত বুকের ভিতরটা যেন কে গামছা নিংড়াইবার মত জোর করিয়া নিংড়াইতেছে! তখন আপনাকে আর সামলাইতে পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশের ঝাউতলায়, যেখানে কেহ বড় একটা যায় না—যাইয়া 'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকৃতে পার্‌চি না রে,' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম! খানিকটা এইরূপে কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম! ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ঐরূপ হইয়াছিল! আর সব ছেলেরা যারা এখানে আসিয়াছে, তাদের কাহারও কাহারও জন্য কখন কখন মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে!"

নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া ঠাকুরের মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার অনেকটা যে চাপিয়া ঢাকিয়া তিনি ঐরূপে আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ একদিন উক্ত দিবসের কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"গান ত গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তরে হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারাণ্ডার থামের অন্তরালগুলি

ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল ; সুতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারাণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জ্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এত দিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের সহিত কথা কহিয়া কহিয়া আমার ঠোঁট পুড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে ; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয় আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!'—ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মত আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ, ইত্যাদি!

"আমি ত তাঁহার ঐরূপ আচরণে একবারে নির্ব্বাক—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ ত একবারে উন্মাদ—না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখম, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে খাবার-গুলি দিন, আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইগে,' তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও'—বলিয়া সকল-গুলি আমাকে খাওয়াইয়া তবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকটে একাকী আসিবে?' তাঁহার ঐরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আসিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।

"বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চাল চলনে, কথা বার্ত্তায়, অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মত কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল সত্য সত্যই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন। 'তোমাদিগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাদিগের সহিত যেমন কথা কহিতেছি এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু ঐরূপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রী পুত্রের শোকে ঘটী ঘটী চক্ষের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য ঐরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরূপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরূপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে দেখা দেন,'—তাঁহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্ম্মপ্রচারক-সকলের ন্যায় কল্পনা বা রূপকের সহায় লইয়া ঐরূপ বলিতেছেন না, সত্য সত্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন। তখন তাঁহার ইতিপূর্ব্বের আচরণের সহিত ঐ সকল কথা সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া এবারক্রম্বি প্রমুখ ইংরাজ দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে যে সকল অর্দ্ধোন্মাদের (monomaniac) উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল দৃষ্টান্ত মনে উদয় হইল এবং দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম, ইনিও ঐরূপ হইয়াছেন। ঐরূপ নিশ্চয় করিয়াও কিন্তু ইঁহার ঈশ্বরার্থে অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলাম না। নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম; উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহা পবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐ জন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণ বন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।"

যাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুরের মনে ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাঁহার পূর্ব্বকথা পাঠকের জানিবার স্বতঃই কৌতূহল হইবে, এজন্য আমরা এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন কেবলমাত্র বিদ্যার্জ্জনে এবং সঙ্গীত-শিক্ষায় কাল-

যাপন করিতেছিলেন না—কিন্তু ধর্ম্মভাবের তীব্র প্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-পালনে ও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিরামিষভোজী হইয়া ভূমি অথবা কম্বলশয্যায় রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ের সন্নিকটে তদীয় মাতামহীর একখানি ভাড়াটিয়া বাটী ছিল; প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইতে উহার বহির্ভাগের দ্বিতলের একটি ঘরেই তিনি প্রধানতঃ বাস করিতেন। যখন কোন কারণে সেখানে থাকার অসুবিধা হইত তখন উক্ত বাটীর নিকটে একখানি ঘরভাড়া করিয়া, তিনি আত্মীয় স্বজন ও পরিবারবর্গ হইতে দূরে পৃথক্‌ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক নিজ উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সদাশয় পিতা ও বাটীর অন্যসকলে জানিত বাটীতে বহুপরিবারের নানা গণ্ডগোলে পাঠাভ্যাসের সুবিধা হয় না বলিয়াই তিনি ঐরূপে পৃথক্ অবস্থান করেন।

শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজেও গমনাগমন করিতেছিলেন এবং নিরাকার সগুণ-ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার ধ্যানে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেন। তর্কযুক্তিসহায়ে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠামাত্র করিয়াই তিনি ইতর সাধারণের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব পুণ্যসংস্কারসমূহের প্রেরণায় তাঁহার প্রাণ তাঁহাকে নিরন্তর বলিতেছিল, যদি শ্রীভগবান্ সত্য সত্যই থাকেন তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বানে তিনি কখন নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া রাখিবেন না, তাঁহাকে লাভ করিবার পথ তিনি নিশ্চয়ই করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগের স্মরণ আছে একসময়ে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রে শয়ন করিলেই দুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধনজন সম্পদ ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হইয়াছে, সংসারে যাহাদের বড় লোক বলে তাহাদিগের শীর্ষস্থানে যেন আরূঢ় হইয়া রহিয়াছি, মনে হইত ঐরূপ হইবার শক্তি আমাতে সত্য সত্য রহিয়াছে। আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভরপূর্ব্বক কৌপীন ধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া কাল

কাটাইতেছি, মনে হইত ইচ্ছা করিলে আমি ঐভাবে ঋষিমুনিদের ন্যায় জীবন যাপনে সমর্থ। ঐরূপে দুই প্রকারে জীবন নির্ম্মিত করিবার ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। ভাবিতাম ঐরূপেই মানব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, আমি ঐরূপই করিব। তখন ঐপ্রকার জীবনের সুখ ভাবিতে ভাবিতে ঈশ্বর-চিন্তায় মন নিমগ্ন হইত এবং ঘুমাইয়া পড়িতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যহ অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐরূপ হইয়াছিল!"

ধ্যানকেই নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের একমাত্র প্রশস্ত পথ-রূপে এই বয়সেই স্বতঃধারণা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারজ জ্ঞান বলিয়া বেশ বুঝা যায়। তাঁহার বয়স যখন চারি পাঁচ বৎসর হইবে তখন সীতারাম, মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃন্ময়মূর্ত্তিসকল বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনয়নপূর্ব্বক পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়া উহাদিগের সম্মুখে ধ্যানের ভানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিষ্পন্দভাবে বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে চাহিয়া দেখিতেন ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় সুদীর্ঘ জটা লম্বিত হইয়া বৃক্ষাদির মূলের ন্যায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল কি না!—কারণ, বাটীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক-দিগের নিকটে তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, ধ্যান করিতে করিতে মুনিঋষিদের মাথায় জটা হয় এবং উহা ঐপ্রকারে মাটির ভিতর নামিয়া যায়। তাঁহার পূজনীয়া মাতা বলিতেন, ঐ সময়ে একদিবস নরেন্দ্রনাথ হরি নামক এক প্রতিবেশী বালকের সহিত সকলের অজ্ঞাতে বাটীর এক নিভৃত-প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এত অধিককাল ঐরূপ ধ্যানের ভানে বসিয়া ছিলেন যে, সকলে বালকের অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল পথ হারাইয়া বালক কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে বাটীর ঐ অংশ অর্গলবদ্ধ দেখিয়া একজন উহা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখে—বালক তথায় নিষ্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে! বাল্য-কল্পনা হইলেও উহা হইতে বুঝা যায় শ্রীযুত নরেন্দ্র কিরূপ অদ্ভুত সংস্কার লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রায় কেহই জানিতেন না যে, তিনি নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিয়া থাকেন। কারণ রাত্রিতে সকলে শয়ন করিবার পরে গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া তিনি ধ্যান

করিতে বসিতেন এবং কখন কখন উহাতে এতদূর নিমগ্ন হইতেন যে, সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইবার পরে তাঁহার ঐ বিষয়ের জ্ঞান হইত!

এই কালের কিছু পূর্ব্বের একটি ঘটনায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের ধ্যান করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ উৎসাহলাভ করিয়াছিল। বয়স্যবর্গের সহিত তিনি একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের পূজ্যপাদ আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি যুবকগণকে সেদিন সাদরে নিকটে বসাইয়া অনেক সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিত্য ঈশ্বরের ধ্যানাভ্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সে দিন বলিয়াছিলেন, তোমাতে যোগীর লক্ষণসকল প্রকাশিত রহিয়াছে, তুমি ধ্যানাভ্যাস করিলে যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ফলসকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করিবে। মহর্ষির পুণ্যচরিত্রের জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঐরূপ কথায় তিনি যে, এখন হইতে ধ্যানাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাল্যকাল হইতেই নানাবিষয়ে নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমগ্র সূত্রগুলি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এক বৃদ্ধ আত্মীয় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া পিতৃপুরুষের নামাবলী, দেবদেবী-স্তোত্রসমূহ এবং উক্ত ব্যাকরণের সূত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সকালে তিনি রামায়ণের সমগ্র পালা কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাড়ার কোন স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে শুনিলেই তথায় উপস্থিত হইতেন। শুনা যায়, তাঁহার বাটীর নিকটে এক স্থলে এক রামায়ণ-গায়ক এক দিবস পালাবিশেষ গাহিতে গাহিতে উহার কোন অংশ স্মরণ করিতে পারিতেছিল না, নরেন্দ্রনাথ তাহাকে উহা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিয়া তাহার নিকটে বিশেষ সমাদর ও কিছু মিষ্টান্ন লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ শুনিতে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ তখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন, শ্রীরামচন্দ্রের দাস মহাবীর হনুমান তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত গান শুনিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন কি না! শ্রুতিধরের ন্যায় নরেন্দ্রনাথে প্রবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ ছিল। কোন বিষয় একবার শুনিলেই উহা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। আবার, ঐরূপে এক-

বার কোন বিষয় আয়ত্ত হইলে তাঁহার স্মৃতি হইতে উহা কখনও অপসারিত হইত না। সেই জন্য শৈশব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতর-সাধারণ বালকের ন্যায় ছিল না। বাল্যে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরে দৈনিক পাঠাভ্যাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "তিনি বাটীতে আসিলে আমি ইংরাজী বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকগুলি তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া কোন্ পুস্তকের কোথা হইতে কত দূর পর্য্যন্ত সে দিন আয়ত্ত করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া যদৃচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকিতাম। মাষ্টার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরূপ ভাবে পুস্তকগুলির ঐ সকল স্থানের শব্দ অর্থাদি সকল বিষয় দুই তিন বার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐ সকল আমার আয়ত্ত হইয়া যাইত।" বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার দুই তিন মাস মাত্র থাকিবার কালে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকসকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন; অন্য সময়ে আপন অভিরুচি মত অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। ঐরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালার সমগ্র সাহিত্য ও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে কখন কখন অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে, একদিন তিনি পূর্ব্বোক্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "প্রবেশিকা পরীক্ষার আরম্ভের দুই তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি, জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই; তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলাম!" ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।

অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ কাল কাটাইতেন শুনিয়া কেহ যেন না মনে করেন তিনি নভেল নাটকাদি পড়িয়াই সময় নষ্ট করিতেন। এক এক সময়ে এক এক বিষয়ের পুস্তক পাঠে তাঁহার একটা ঝোঁক্ আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন ঐ বিষয়ক যত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সকল আয়ত্ত করিয়া লইতেন। যেমন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার

বৎসরের আরম্ভ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসসমূহ পড়িবার তাঁহার ঝোঁক উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মার্শম্যান, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিক-সকলের গ্রন্থসকল পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,—এফ্‌-এ পড়িবার কালে ন্যায়শাস্ত্রের যত প্রকারের ইংরাজী গ্রন্থ ছিল, যথা, হোয়েটলি, জেভন্‌স্‌, মিল প্রমুখ গ্রন্থকারগণের পুস্তকসকল একে একে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বি-এ পড়িবার কালে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের সকল প্রদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস ও ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিবার তাঁহার একান্ত বাসনা হইয়াছিল—এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

ঐরূপে বহু গ্রন্থ পাঠের ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কাল হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথের দ্রুতপাঠের শক্তি বিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "এখন হইতে কোন পুস্তক পাঠ করিতে বসিলে উহার প্রতি ছত্র পর পর পড়িয়া গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিবার আমার আবশ্যক হইত না। প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করিলেই উহার ভিতর কি বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতাম। ক্রমে ঐ শক্তি পরিণত হইয়া প্রতি প্যারাও আর পড়িবার আবশ্যক হইত না। প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণ পড়িয়াই বুঝিয়া ফেলিতাম; আবার পুস্তকের যেখানে গ্রন্থকার কোন বিষয় তর্কযুক্তির দ্বারা বুঝাইয়েছেন, সেখানে প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা যুক্তিবিশেষ বুঝাইতে যদি চারি পাঁচ বা ততোধিক পৃষ্ঠা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত যুক্তির প্রারম্ভ মাত্র পড়িয়াই ঐ পৃষ্ঠাসকল বুঝিতে পারিতাম।"

বহু পাঠ ও গভীর চিন্তার ফলে শ্রীযুত নরেন্দ্র এই কালে বিষম তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা তর্ক কখন করিতেন না, মনে জ্ঞানে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তর্কের দ্বারা সর্ব্বত্র তাহারই সমর্থন করিতেন। কিন্তু তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহার বিপরীত কোন প্রকার ভাব বা মত কেহ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিলে তিনি চুপ করিয়া উহা কখনও শুনিয়া যাইতে পারিতেন না। কঠোর যুক্তি ও প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডন করিয়া বাদীকে নিরস্ত করিতেন। বিরল ব্যক্তিই তাহার যুক্তি-সকলের নিকট মস্তক অবনত করিত না। আবার তর্কে পরাজিত হইয়া অনেকে যে তাঁহাকে সুনয়নে দেখিত না, এ কথা বলা বাহুল্য। তর্ককালে

বাদীর দুই চারিটি কথা শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে কিরূপ যুক্তি-সহায়ে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবে এবং উহার উত্তর তাঁহার মনে পূর্ব্ব হইতেই জোগাইয়া থাকিত। তর্ককালে বাদীকে নিরস্ত করিতে ঐরূপ তীক্ষ্ণ যুক্তি প্রয়োগ তাঁহার কিরূপে মনে উদয় হয় এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি এক-দিন বলিয়াছিলেন,"পৃথিবীতে কয়টা নূতন চিন্তাই বা আছে? সেই কয়টা জানা থাকিলে এবং তাহাদিগের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি এপর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই কয়টা আয়ত্ত থাকিলে বাদীকে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, বাদী যে কথা যে ভাবেই সমর্থন করুক্ না, উহা ঐ সকলের মধ্যে পড়িবেই পড়িবে। জগৎকে কোন বিষয়ে নূতন ভাব ও চিন্তা প্রদান করিতে সক্ষম এমন ব্যক্তি বিরল জন্মগ্রহণ করেন।"

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদৃষ্টপূর্ব্ব মেধা ও গভীর চিন্তাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সকল বিষয় স্বল্পকালে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। সে জন্য পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহার ও বয়স্যবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ করিবার অবকাশের অভাব হইত না। লোকে তাঁহাকে ঐরূপে অনেককাল কাটাইতে দেখিয়া ভাবিত তাঁহার লেখা পড়ায় আদৌ মন নাই। ইতরসাধারণ অনেক বালক আবার তাঁহার দেখাদেখি আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতে যাইয়া কখন কখন আপনাদিগের পাঠাভ্যাসের ক্ষতি করিয়া বসিত।

(ক্রমশঃ)

মানুষ।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতায়, কথাবার্ত্তায় প্রায় বলিতেন, I want to preach a man-making religion—আমি এমন ধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে চাই, যাতে মানুষ তৈয়ারি হয়। মানুষ কাকে বলে?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের মধ্যে স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, যথা মানুষ কিনা মান হুঁস—মানুষ যারা জ্যান্তে মরা ইত্যাদি।

আজ আমরা এই দুর্ব্বলতা, অশান্তি ও অসফলতার দিনে—এই অমানুষ ভাবের প্রাচুর্য্যের দিনে একবার মহাপুরুষগণের পূর্ব্বোক্ত অমর বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া এই মানুষের তত্ত্ব আলোচনা করিতে চাই। আমরা আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই, কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে প্রভেদ আছে, যেমন হিন্দুতে হিন্দুতে, খ্রীষ্টানে খ্রীষ্টানে প্রভেদ আছে, সেইরূপ মানুষে মানুষে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। আমরা মানুষ খুঁজিতে চাই, নিজেরা মানুষ হইতে চাই।

মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্বন্ধে মনীষিগণ কত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সমাজ কত প্রকার তত্ত্ব, কত প্রকার সাধনা, কত প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, কত প্রকার সঙ্ঘ, কত প্রকার বিধি-নিষেধ, আচার-ব্যবহার, মত-মতান্তর আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন, তবু আমাদের লক্ষ্যে এখনও পঁহুছিতেছি না কেন?—ইহার একমাত্র উত্তর—আমরা এখনও মানুষ খুঁজিয়া পাই নাই, এখনও আমরা নিজেরা মানুষ হইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করি নাই অথবা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

এ দেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কর্ত্তাভজারা সহজ মানুষ, মনের মানুষ প্রভৃতির কথা প্রায় উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা উক্ত সম্প্রদায়ের নাম শুনিলে ঘৃণায় দশ হাত পিছাইয়া যাই, কিন্তু তাঁহাদের ঐ সকল চলিত কথার মধ্যে কি গভীর অর্থ নিহিত আছে, মানব-জীবনের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কত উচ্চ কল্পনা গুপ্ত রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে?

স্বামীজি বড়ই আক্ষেপের সহিত তাঁহার 'আমার সমরনীতি' নামক মান্দ্রাজ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

"দেশের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, যথেষ্ট সমাজ ঘুরিয়াছি, ঢের কাগজ পড়িয়াছি, এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া এই মহাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসেন? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন?' এইরূপ লোক চাই।" (ভারতে বিবেকানন্দ)

বস্তুতঃ চিরদিনই আমরা মানুষ খুঁজিতেছি, চিরদিনই খুঁজিব—যতদিন না বাহিরে বা ভিতরে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন মিলে।

মৎস্য-কূর্ম্মাদির কথা ছাড়িয়া দাও—যাঁহাদিগকে আমরা অবতার পুরুষ বা মহাপুরুষ বা মহাত্মা আখ্যা প্রদান করি, তাঁহারা কি? তাঁহারাই যথার্থ মানুষ—সাধারণ তথাকথিত মানুষের বীজস্বরূপ, আর ইঁহারা সেই বীজের প্রস্ফুটিত কুসুম। কোথায় সেই মানুষের আমরা সাক্ষাৎ পাইব, কিরূপেই বা পাইব?

একটী সুবৃহৎ সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করি, তার পর হয় ত নিজের উন্নতিসাধনের জন্য নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ সঙ্ঘ বা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করি, নানারূপ আচার-অনুষ্ঠানের দাসত্ব করিয়া, নানারূপ মত-মতান্তরকে সময়ে সময়ে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অগ্রসর হই—কত ছাইভস্ম লিখি, কত লোকের কত লেখা পড়ি, কত কথা বলি এবং কত কথা শুনি। কিন্তু তথাপি কি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে? কখন রাজনীতি, কখন সমাজনীতি, কখন ধর্ম্মনীতি কত কি পথ অবলম্বন করিয়া কত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করিতে থাকি, কিন্তু লক্ষ্য যেন দূর হইতে সুদূরেই প্রতীত হয়—আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকি। কেন না, আমরা মানুষের সাক্ষাৎ সহজে পাই না—আমরা নিজেরাও মানুষ হইতে পারি না।

কয়েকজন মানুষই জগৎকে শাসন করিতেছেন—তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—ইত্যাদি কয়েকটী নামই জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত দেখিতে পাই। এই সকল নামের দোহাই দিয়াই আমরা সকলে চলিতেছি, ইঁহাদের নামেই নানা সমাজ, সমিতি, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিতেছি, কিন্তু কদাচিৎ বহুযুগান্তে আবার আমরা একটী মহৎ নামের সাক্ষাৎকার পাই। যে সম্প্রদায়ে বা যে সমাজে এই মানুষের অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায় বা সমাজই মহৎ হইয়া যায়, তাহাই ধন্য হইয়া যায়—দলে দলে পতঙ্গের ন্যায় মানবকুল সেই হুতাশনতুল্য তেজস্বী নরদেবের পদতলে আপনাকে আহুতি দিতে অগ্রসর হয়। মনীষী কার্লাইল তাঁহার Heroes and Hero-worship গ্রন্থে এই মহান্ তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যেখানে মানুষ জন্মে না, সে দেশ মৃত, সে সমাজ মৃত, সে রাজ্য মৃত—যে সংহতি বা organisationএর ফলে মানুষ জন্মে না, সে organisation কোন কাজের নহে, যে অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ

জন্মে না, সে অনুষ্ঠানের জীবন গিয়াছে—যেমন আত্মার অভাবে দেহ জড়পিণ্ড মাত্র, তদ্রূপ মানুষের অভাবে লোকের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলেই মানুষ। এই মানুষ কতকগুলি বিধিনিষেধের দাস বা ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্র নহে—মানুষের লক্ষণ সে স্বাধীন সেই বিধিনিষেধের সৃষ্টি করে, সেই তাহার ব্যাখ্যা করে, আবার সেই একবিধ বিধিনিষেধ ভাঙ্গিয়া উহাকে নূতন জীবন, নূতন আকার দেয়।' মানুষের আর একটী লক্ষণ সে সদাই সজীব সদাই সচেতন, সদাই তাহার হুঁস—সে কখন হুঁস হারায় না, সে সদাই নবীন—পুরাতন পচা জিনিসের উপর তাহার বিজাতীয় ঘৃণা, কিন্তু সে নূতনের মধ্যে নিত্য পুরাতনের নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সদা সচেষ্ট। সে প্রত্নতত্ত্বান্বেষী হয় প্রত্নতত্ত্বের জন্য নহে, সেই প্রত্নকে নবীন জীবনে কাজে লাগাইবার জন্য—তাহার ইতিহাস-পাঠ বর্ত্তমানের জন্য—অতীতের নেশায় বিভোর হইবার জন্য নহে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সে হা-হুতাশ করে না, নূতন তাজা বিশুদ্ধ রক্ত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত হয়—তাহাকে কিছুতে প্রাচীন করিতে পারে না। সে বেদ, পুরাণ, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণ পড়ে—নূতন বেদ, নূতন বাইবেল গঠনের জন্য—নিজের জীবনটাকে বেদস্বরূপ করিবার জন্য সত্য ও তাহার মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী, কোন ব্যবধান টিকিতে পারে না, সে সাক্ষাৎ সত্যের সংস্পর্শে আসে—যে স্বয়ং ঋষি, স্বয়ং মন্ত্রদ্রষ্টা হয়, তাহার মুখ দিয়া অনর্গল সত্যের বাণী বাহির হইতে থাকে। সে স্বয়ং ব্যাস, স্বয়ং রাম, স্বয়ং বুদ্ধ, স্বয়ং খ্রীষ্ট হইতে চায় এবং প্রাণপণ চেষ্টায় অবশেষে কৃতকার্য্যও হয়।

মানুষ যাঁহারা সকলেই 'জ্যান্তে মরা' হইয়াছেন। সকলেই নিজের অহং-টার সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করিয়া উহাকে শেষে মারিয়াছেন। নিজে শির দিয়াছেন, শিরদার হইয়াছেন, তবেই সর্দ্দার হইতে পারিয়াছেন।

এই মানুষ হইবার মূলমন্ত্র 'মনমুখ এক করা' বা অকপটতা। তাহা যদি তোমার থাকে, তবে তুমি যেখানেই থাক না কেন, যাহাই কর না কেন, তোমার মুখশ্রী সদাই এক অপূর্ব্বভাবে উদ্ভাসিত থাকিবে—তোমার দর্শনমাত্রেই অপরের হৃদয়ে প্রবলবেগে তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত হইবে—তুমি তখন সমাজেই থাক বা সমাজ ত্যাগ করিয়া গুহাবাসীই হও, কিছুতে কিছু আসে যায় না, তুমি

তখন সংবাদপত্রে লেখ বা নাই লেখ, বক্তৃতা দাও বা নাই দাও, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না, কেহই তোমার পূতপ্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে না।

মানুষ যে সে original হয়, original এর অর্থ ইহা নহে যে, সে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক হইবে—কারণ, নূতনতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে জগতে কিছুই নাই, সেই সনাতন সত্যই সে নিজভাবে নূতন করিয়া আয়ত্ত করে; ইহাই তাহার originality। তিনি প্রকৃতির অনুকারক কখনই হইবেন না—প্রকৃতি যে সকল বেষ্টনী, যে সকল বন্ধন তাঁহার চারিদিকে দিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে ছাড়াইবার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন, এবং যে পরিমাণে তিনি বন্ধনমুক্ত হইবেন, সেই পরিমাণেই তাঁহার ভিতর মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে।

পাঠক হয় ত বলিবেন, মানুষের যে লক্ষণ দিলে, এ ত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হইল—আধ্যাত্মিক ছাড়িয়া—আধিভৌতিক রাজ্যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে কি মানুষের আবির্ভাব হইতে পারে না? কেন পারিবে না? পাঠক—আধ্যাত্মিকের সঙ্কীর্ণ অর্থ ত্যাগ করিয়া উহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ কর—দেখিবে, জগতে একই জিনিষের অস্তিত্ব আছে—মানুষ সর্ব্বত্রই একইরূপ—তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়িয়া তাহার বিভিন্নরূপ অভিব্যক্তি হয় মাত্র—ভিতরে মানুষটা কিন্তু একইরূপ—শুধু একইরূপই বা বলি কেন? একই জন—একজনেরই এই সব নানা অভিব্যক্তি—সেই নরই যখন নরোত্তম হয়, তখনই সেই নরনারায়ণ—ত্বত্ত্বমসি—সোঽহং ব্রহ্মাস্মি।

প্রত্যক্ষবাদী কোম্‌ত একদিন এই মানুষের তত্ত্বানুসন্ধানেই Humanityর উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষের মধ্যে সেই পরোক্ষের সন্ধান না পাইয়া তাঁহার দর্শন, তাঁহার ধর্ম্ম জড়বাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই মানবোপাসনারূপ মহান্ তত্ত্বের ছায়া লইয়াই বিকৃত গুরুবাদ, বিকৃত অবতারবাদাদির উৎপত্তি হইয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, মানবকে তাহার অনন্ত উন্নতিপথে ক্রমাগত বাধা দিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই মানুষের অন্বেষণ সংসার হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। মানুষ আইন-কানুনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, জড় পদার্থে—ধনরত্নে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সে চায় মানুষ। এই মানুষ খুঁজিতে গিয়া সে কত বিকৃত পথে গিয়াছে—কখন

সে নারীকেই জীবনের আদর্শ মনে করিয়া তাহার পদতলে জীবন লুটাইতে গিয়াছে—কামতাড়নায়, রূপজ মোহের আকর্ষণে, আসঙ্গলিপ্সাবশে সে অনাত্মায় আত্মবোধে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু এ মানুষের অন্বেষণ যে নিজ আত্মার অভ্যন্তরেই করিতে হয়—

কর্ত্তাভজাদের যেমন আছে—'এই মানুষের ভিতর মানুষ গুপ্তভাবে বসে'—এই মানুষের ভিতর মানুষের সন্ধান করিতে হইবে—সেই

'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্,—

বস্তুকে নিজ আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

'তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।'

আদর্শ-মানুষ ও ভগবানে কোন প্রভেদ নাই—বিন্দুমাত্র নাই তাঁহাকে মহাত্মাই বল, অবতারই বল, শ্রীকৃষ্ণই বল, চৈতন্যই বল, আর রামকৃষ্ণই বল—তুমি সেই একজনের কথাই বলিতেছ। এস দেখি ভাই, একবার দলাদলি ছাড়িয়া সকলে মিশিয়া সেই মানুষের অন্বেষণে মহাযাত্রার যাত্রী হই। এস ভাই, উহার জন্য সকলে আমরা সাধন করি—অপরকে শিক্ষা-দানরূপ উন্মত্তচেষ্টা হইতে ক্ষণিকের জন্য বিরত হইয়া নিজের শিক্ষাদীক্ষায় প্রাণপণ করি। এস ভাই! একবার নিজের হৃৎপদ্মকে ফুটাইবার চেষ্টা করি—প্রাণের মধ্যে অনন্ত মধু সঞ্চয় করি—হৃদয়ে এই মধু লইয়া যেন প্রাণের সহিত 'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীর্মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতি-র্মধুমাঁও অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু'—এই বেদবাণী উচ্চারণ করিতে পারি। একবার এস ভাই, অন্য সকল বাক্য ত্যাগ করি—আমি আমাকে বুঝিতে, আমাকে চিনিতে, আপনাতে আপনি থাকিতে চেষ্টা করি। একবার প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করি, সকলেই সত্যের পথে অগ্রসর—কেহই ভ্রান্ত নহে—কেহ না হয় সত্যের নিম্ন ধাপে রহিয়াছেন, কেহ বা উচ্চধাপে উঠিয়াছেন, কিন্তু সকলেই সেই সত্যপথের যাত্রী। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে দুই দলে পথে সাক্ষাৎ হইলে যেমন উভয় দলই উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে, আমরাও তদ্রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে পৃথক্ বা দলবদ্ধভাবে

অগ্রসর হইতে হইতে অপর ব্যক্তির বা দলের সাক্ষাৎ পাইলেই যেন ঘৃণার পরিবর্ত্তে এইরূপ জয়ধ্বনি উচ্চারণই করি, সকলের শুভ কামনাই যেন হৃদয়ের সহিত পোষণ করি, সকলকেই ভাই ভাই বলিয়া যেন আলিঙ্গন করি। অপরের দোষদৃষ্টি করিবার আমার কি অধিকার আছে, আমাকে সর্ব্বদা আত্মদোষান্বেষী হইতে হইবে, যাহাকে দুর্ব্বল দোষযুক্ত বলিয়া দেখিতাম, ভাবিতে হইবে, তাহা সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের নিম্নতম অভিব্যক্তি মাত্র—তাহার অভিব্যক্তির সহায়তা যদি না করিতে পারিলাম, তবে বৃথা তাহাকে দোষারোপ করিয়া আমি স্বয়ং পতিত হই কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আইন কানুনে মানুষ হয় না—No man can be made good by an Act of Parliament. পূর্ব্বেই বলিয়াছি—টাকায় মানুষ হয় না—Money does not make a man, but it is man that makes money.—বই পড়িয়া মানুষ হয় না, লেক্‌চার দিয়া, গ্রন্থ লিখিয়া মানুষ হয় না, কতকগুলি বিধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেই, কতকগুলি সদাচার সদনুষ্ঠানের যন্ত্রবৎ অনুষ্ঠানে মানুষ হয় না, কতকগুলি বিশুদ্ধমতবাদের অনুমোদনেই মানুষ হয় না—

তবে কি ঐগুলি বৃথা?—

অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর—সে বলিবে—বৃথা কিছুই নহে; কোনরূপ চেষ্টাই বৃথা নহে—উন্নতির জন্য জগতে যতরূপ প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই বৃথা নহে—তবে কথা এই, চরম আদর্শের সহিত ঐ আদর্শ-লাভের প্রণালীগুলিকে এক মনে করিয়া ভ্রমে পড়িও না—আইন-কানুনও চাই, টাকাও চাই, সমাজ-সম্প্রদায়ও চাই, লেখাপড়াও চাই, বক্তৃতাও চাই, মত-মতান্তরও চাই, শাস্ত্রও চাই—কিন্তু সর্ব্বোপরি চাই মানুষ। যিনি ভগবৎ-কৃপায় সৌভাগ্যক্রমে এই মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন—কেবল মানুষগুরু যাঁহার কানে মন্ত্র দেন নাই, কিন্তু জগদ্‌গুরু যাঁহার প্রাণে মন্ত্র দিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চয় করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে তিনি নিজ হৃদয়ের জ্ঞানা-লোক জ্বালিয়া দিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই মনুষ্যত্ব-সাধনের পথে বহুদূর অগ্রসর। আমরা যদি সেই নরদেবের এখনও সাক্ষাৎকার না পাইয়া থাকি, তবে নিভৃতে বসিয়া আমাদিগকে কাতরকণ্ঠে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতে

হইবে, ব্যাকুল হইয়া বলিতে হইবে, হে নরদেব, শীঘ্র আমার নিকট প্রকাশ হও—ওজোঽসি, ওজো ময়ি ধেহি, বলমসি, বলং ময়ি ধেহি, বীর্য্যমসি, বীর্য্যং ময়ি ধেহি, হে উমানাথ শঙ্কর, হে গৌরি, হে কৃষ্ণ, হে বুদ্ধ, হে চৈতন্য, হে রামকৃষ্ণ, হে বিবেকানন্দ, বাহিরে আদর্শ-মানবরূপে, আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া, অথবা যদি তোমার ঐ লীলা দেখাইতে ইচ্ছা না হয়, অন্তরে অন্তর্য্যামী চৈতন্যগুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া, নিজ অপূর্ব্ব-মহিমামণ্ডিত জ্ঞানযোগভক্তিপ্রোজ্জ্বল দিব্যমানুষমূর্ত্তি দেখাইয়া আমায়ও মানুষ কর।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

গঙ্গাতটস্থ শষ্পাবৃত ভূমি ও তরুরাজির মধ্যেই আমি, যাঁহার কার্য্যে আমি ইতিপূর্ব্বেই জীবন সমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই লোকশিক্ষকের বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছিলাম। আমার ভারতবর্ষে পদার্পণের সময় (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী) বেলুড়ে সবেমাত্র একখণ্ড জমি ও একটী বাড়ী ক্রয় করা হইয়াছিল; উহাই পরে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মঠরূপে পরিণত হয়। আরও কয়েক সপ্তাহ পরে কতিপয় বন্ধু আমেরিকা হইতে আগমন করেন, এবং স্বভাবসুলভ নির্ভীকতার সহিত ঐ ধ্বংসাবশেষপ্রায় বাড়ীখানি অধিকার করিয়া উহাকে সাদাসিধা অথচ স্বচ্ছন্দবাসের উপযোগী করিয়া লইলেন। এই বন্ধুগণের অতিথিরূপে বেলুড়ে এইখানে বাসকালে এবং পরে কুমায়ুন ও কাশ্মীরে ভ্রমণকালেই, আমি তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষকে ভাল করিয়া চিনিতে ও স্বামিজী নিজদেশে নিজজনের মধ্যে কিরূপ জীবন যাপন করেন তাহা উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমাদের বাড়ীখানি কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমতীরে এক উচ্চ সমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত ছিল। জোয়ারের সময় ছোট পান্সীগুলি (এইগুলিই গঙ্গাতীরবাসিগণের পক্ষে গাড়ীর কাজ করে) একেবারে সিঁড়ির নীচেই আসিয়া লাগিত। আমাদের এবং অপর পারের গ্রামখানির মধ্যে নদীটী বিস্তারে অর্দ্ধ হইতে তিন-চতুর্থাংশ মাইল হইবে। উহার পূর্ব্বতটে আরও প্রায় এক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও বৃক্ষশীর্ষগুলি দৃষ্টিগোচর হইত; এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যানেই স্বামিজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণপদপ্রান্তে বাস করিতেন। যে বাড়ীটী এই সময়ে মঠরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা আমাদের বাড়ীখানির দক্ষিণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই মঠ ও আমাদের মধ্যে অনেকগুলি বাগানবাড়ী এবং অন্ততঃ একটী জলনির্গমপ্রণালী ছিল। আধখানি তালগাছের তৈয়ারী এক পুলের উপর দিয়া উহা পার হইতে হইত; পুলটীকে দেখিলে, উহা ভার সহিতে পারিবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইত। আমাদের এই বাড়ীখানিতেই স্বামিজী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একাকী বা কতিপয় গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে আগমন করিতেন। এইখানেই বৃক্ষতলে আমাদের প্রাতঃকালীন জলযোগ সমাপ্ত হইবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্ত, আমরা বসিয়া বসিয়া একমনে স্বামিজীর সেই অফুরন্ত ব্যাখ্যাপ্রবাহ শ্রবণ করিতাম। ভারতীয় জগতের কোন না কোন গভীর রহস্য তিনি ঐ কালে আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতেন। উহাতে কদাচিৎ প্রশ্নোত্তর স্থান পাইত। এই কালের কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, আমি এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, কি প্রকারে এরূপ চিন্তা ও অভিজ্ঞতাসম্ভার সঞ্চয় করা যাইতে পারে, আবার সঞ্চয় করিলেই বা কি প্রকারে উহার বিতরণকালে এরূপ প্রবল শক্তি আসিতে পারে? যাঁহাদের উচ্চদরের কথোপকথনসামর্থ্য আছে তাঁহাদের মধ্যেও স্বামিজীর একটী বিষয়ে বিশেষত্ব ছিল। কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। তিনি যাঁহাদের সহিত বার্ত্তালাপ করিতেন তাঁহাদের মনোবৃত্তির সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিতেন না। যাঁহারা একটী অব্যক্ত সহানুভূতি ও ভক্তির ভাব লইয়া কথোপকথনে যোগদান করিতেন, শুধু সেই সকল শ্রোতার উপস্থিতিকালেই

তাঁহার গভীরতম উক্তিগুলি শ্রবণগোচর হইত, কিন্তু তিনি স্বয়ং এ বিষয় জানিতে পারিতেন এরূপ মনে হয় না। কোন বাহ্য ঘটনা যে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে এরূপ একেবারেই মনে হইত না। এমন অনেক ঘটিয়াছে যে তিনি উত্তেজিত হইয়া জোরের সহিত কথা কহিয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল অবস্থা তাঁহার মনের অতি মধুর অবস্থাগুলির ন্যায় কোন অজ্ঞাত কারণ-সম্ভূত ছিল; উহারা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ কারণসমূহ হইতে উদ্ভূত হইত, কোন ব্যক্তিবিশেষ উহাদের কারণ নহে।

এইখানেই আমরা ভারতীয় চেষ্টাসমূহের সর্ব্বজনবিদিত মূলমন্ত্র কি এবং কি আদর্শ দ্বারা উহারা নিয়ন্ত্রিত তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, কথোপকথনগুলিতে, সর্ব্বোপরি, বিভিন্ন আদর্শেরই ব্যাখ্যা হইত। একথা সত্য যে, ইতিহাস, সাহিত্য এবং অপর সহস্র স্থল হইতে ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হইত, কিন্তু উদ্দেশ্য সকল সময়েই সেই এক সিদ্ধি বা পূর্ণতালাভ-সম্বন্ধীয় কোন এক ভারতীয় আদর্শকে আরও বিশদ করা। আর এই আদর্শগুলিকে যত সহজবোধ্য মনে করা যাইত, সকল সময়ে তাহারা তত সহজবোধ্য হইত না। এই ভারতীয় জগতে পরোপকার-প্রবৃত্তি অপেক্ষা চিত্তৈকাগ্রতা-বিষয়েই সমধিক পুষ্টিসাধন-চেষ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ভারতের কল্যাণ বা অকল্যাণের হেতু, তাহা তর্কযুক্তিসহায়ে প্রমাণ করিবার এখনও সময় আসে নাই। ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামিজীর নির্ভীক উপদেশ এই যে, আমাদিগকে ব্যক্তিত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদিগকে শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করিতে হইবে, এই আদেশ অপেক্ষা "সাক্ষিস্বরূপ হও" এই আদেশই অধিক শ্রুত হইত। জগতে আমার কোন শত্রু আছে, এইরূপ চিন্তা করাই এই মনীষীর চক্ষে দ্বেষবুদ্ধির প্রমাণ। তিনি বিশেষভাবে বলিতেন, প্রেম 'অহেতুক' না হইলে প্রেমই নহে; পাশ্চাত্য বক্তা হইলে এই ভাবটীই "উদ্দেশ্যবিরহিত" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে বক্তার জোর কতকটা কমিয়া যাইত। ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। আমাদের সকল চিন্তার মধ্যে বিরাজ করিতেন শ্রীমহাদেব, যাঁহাকে তাঁহার সৃষ্ট ত্রৈলোক্যের রাজত্ব বা পিতৃত্ব, ঐশ্বর্য্য বা সুখ, কিছুই

প্রলোভিত করিতে পারে না; আবার যিনি সংসারিক ব্যাপারে 'একজন অতি সাদাসিধা লোক,' যাঁহার কোন কৌতূহল নাই, যিনি সহজে প্রতারিত হন; এবং যিনি প্রতিদিন লোকের দ্বারে দ্বারে তণ্ডুলমুষ্টি ভিক্ষা করেন। তিতিক্ষা ধর্ম্মজীবনের একটী চিহ্ন। আমরা পাশ্চাত্য দেশে ইহার একটী উদাহরণ দেখিতে পাই সেই সাধুতে—যিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন এবং যিনি তাঁহার অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহ হইতে ক্রমিগুলি পড়িয়া যাইলে, হেঁট হইয়া উহাদিগকে তুলিয়া, "খাও, ভাইসকল" বলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিয়া দিতেন। রঘুনাথের দর্শনলাভ জীবের চরমোৎকর্ষসমূহের মধ্যে অন্যতম, এবং যে সাধুটী, সম্মুখে কয়েকটী বলদকে তাড়িত হইতে দেখিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার পৃষ্ঠে সেই চাবুকের দাগগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তিনি উক্ত সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। স্বামিজী আমাদিগকে আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল পূর্ব্বধারণা হইতে আকাশপাতাল তফাৎ একটী ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করিতে আহ্বান করিলেন,—বলিলেন যে, দেহবুদ্ধির একান্ত অভাবই পূর্ণ সাধুত্বের লক্ষণ। এই দেহবোধরাহিত্য এত গভীর হয় যে, সাধু জানিতেই পারেন না তিনি উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছেন। কারণ, বিশেষ বিশেষ স্থলে নগ্নতারও একটী উচ্চতর অর্থ আছে' বলিয়া সূক্ষ্মদর্শিগণ বুঝিতে পারেন; পাশ্চাত্যে উহার বিকাশ ললিতকলায়, ভারতে উহার বিকাশ ধর্ম্মে। আমরা যেমন একটী গ্রীক্ প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সৌন্দর্য্যাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই উপলব্ধি করি, হিন্দুও তেমনি উলঙ্গ সাধুতে শুধু মাহাত্ম্য ও বালকসুলভ পবিত্রতাই দেখেন।

কিন্তু এই নূতন চিন্তা-জগতে একটী আকাঙ্ক্ষা চিত্তৈকাগ্রতারই ন্যায় ধর্ম্মজীবনে মুখ্যভাবে এবং সকল বিষয়ে প্রযোজ্য বলিয়া গণ্য।—উহা জীবাত্মার স্বাধীনতা। চিন্তা, মতামত এবং কার্য্য, এসকল বিষয়ের সকল ছোটখাট অধিকারগুলিও উহার অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র এই অধিকারটীকেই সাধুগণ নিজস্ব অধিকার বলিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন, একমাত্র এই সম্পত্তিটীতেই তাঁহারা কোন অনধিকারপ্রবেশ সহ্য করিতে পারেন না। আর দৈনন্দিন জীবনে এই ব্যাপারটীকে লক্ষ্য করিতে করিতে আমি দেখিলাম যে, ইহা একপ্রকার ত্যাগের ভাবেই দাঁড়াইয়া যায়। যাহাতে বন্ধনশৃঙ্খল লুক্কায়িত

রহিয়াছে, এমন কোন কিছু সুখকর হইলেও গ্রহণ না করা; এক কথায়, যাহাতে বন্ধনের ইঙ্গিতও আছে এমন সকল সম্পর্ক ছেদন করিতে প্রস্তুত থাকা;—যিনি এরূপ করিতে পারেন তাঁহার চিত্ত কিরূপ নির্ম্মল হওয়া চাই, ইচ্ছাশক্তি কিরূপ বিশুদ্ধ হওয়া চাই! কিন্তু আবার এই আদর্শ হইতেই অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত অল্প পরিপুষ্টির যে ইহাই কারণ তাহা কাহারও বঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ প্রাচীনকালে ধর্ম্মজীবনের আদর্শস্থানীয় মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা একাকী থাকিতেন, তা পরিব্রাজকই হউন, আর কুটীচকই হউন। আমাদের সন্নিকটস্থ মঠটীতে এমন সব লোক ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাইলাম, যাঁহারা তাঁহাদিগের নেতার স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাক্যালাপ করা পছন্দ করিতেন না; অপর কতকগুলি লোক ছিলেন যাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ডমাত্রেই আপত্তি ছিল। একজনের ধর্ম্মকে শক্তিমানের পূজা দ্বারা প্রশমিত আস্তিকতা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে; অপর একজনের ধর্ম্ম তাঁহাকে এমন অনুষ্ঠানপরম্পরায় প্রবৃত্ত করিত, যাহা আমাদের অনেকেরই পক্ষে অসহ্য ভার বলিয়া বোধ হইবে; কতকগুলি লোক মহাপুরুষ, ধ্যান ও অলৌকিক দর্শনাদির রাজ্যে বাস করিতেন, অপর কতকগুলি লোক এইরূপ অর্থহীন ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইয়া তর্কের চুলচেরা বিচারসহায়ে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। এই সমস্ত লোক যে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে একত্র হইতে পারিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহারা যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন একথা নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হয়। আবার আমি তখন এবং পরেও ইহা না ভাবিয়া থাকিতে পারি নাই যে, ভারতে প্রাচীন শাসনপদ্ধতিগুলির কোন কোন বিষয়ে বিফল হওয়ার কারণও উহাই। কারণ, যাহাতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণ নগর ও রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যে আপনাদিগকে সম্যক্‌রূপে নিয়োজিত করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের এরূপ ধারণা থাকাই খুবই আবশ্যক যে, এবম্বিধ সঙ্ঘবন্ধনকার্য্যই তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সম্মানজনক উদ্যম। কিন্তু প্রাচীনযুগের ভারতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী আধ্যাত্মিক আদর্শসকলেই—এই স্বাধীনতাবোধও তাহাদের অন্যতম—এত তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে, নগর ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত সুনিয়ম

স্থাপনের প্রতি তাঁহারা আগ্রহান্বিত হইতেই পারিতেন না। আর ইহাতে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই যে, তাঁহাদের ক্ষমতা ও চরিত্রবল থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বিধিব্যবস্থার যে সকল সুফল, তাহাদের কতকগুলিকে প্রমাণিত করিবার ভার আধুনিক লোকদিগেরই উপরে পড়িয়াছে। তথাপি এই সকল কার্য্যকে সম্যক্‌রূপে ধারণা ও পোষণ করিয়া উহাদিগকে নিজ উন্নতির অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি যে হিন্দুধর্ম্মের আছে, আমার বিশ্বাস তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় শিষ্য শ্রীবিবেকানন্দের উদ্ভব ও জাতীয় চিন্তা-ভাণ্ডারে তাঁহাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট দান হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

যাহা আমরা শুধু নিজেদেরই কল্যাণকর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি তাহাকে জোর করিয়া অপরের উপর প্রয়োগ করিবার চেষ্টাকে স্বামিজী পাশ্চাত্যগণের চরিত্রের এক মহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আর তিনি যে গম্ভীর-ভাবে আমাদিগকে ঐ দোষ পরিহার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেন, তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার চিরাভীপ্সিত 'আদর্শ-বিনিময়েরই' অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু আবার যখন তাঁহার কতিপয় আপনার লোক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "আপনি ইংরাজগণকে তাহাদের দেশে থাকিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। আপনার মতে তাহারা কোন্ জিনিসটার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষসাধন করিয়াছে!"—তখন তিনি উত্তর দেন, "আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কিরূপে আজ্ঞাবহ হওয়া চলে, এইটা তাহারা শিখিয়াছে।"

কিন্তু বেলুড়ে আমরা শুধু স্বামিজীকেই দেখি নাই। সারা মঠই আমাদিগকে তাঁহাদের অতিথি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেই জন্য এই অতিথিসৎকারপরায়ণ সাধুগণ কখনও আমাদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ এবং কখনও সেবা-উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিতেন। যে গরুটী আমাদের দুধ দিত তাহা তাঁহারাই দোহন করিতেন এবং যে ভৃত্যের উপর রাত্রিতে ঐ দুগ্ধ আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার ছিল, সে একদিন পথে গোখুরা সাপ দেখিয়া ভয় পাইয়া আর যাইতে অস্বীকার করায়, সাধুগণের মধ্যে একজনই এই ভৃত্যজনোচিত কার্য্যে তাহার স্থান গ্রহণ করিলেন। আমাদের ভারতীয় গৃহস্থালীর নিত্য নূতন সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য প্রত্যহ একজন করিয়া ব্রহ্মচারী মঠ হইতে প্রেরিত

হইতেন। আর একজনের উপর বাঙ্গালা শিখাইবার ভার ছিল। সঙ্ঘের পুরাতন সাধুগণ প্রায়ই লৌকিকতা-ব্যপদেশে বা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আর যখন স্বামিজী স্বয়ং কয়েক সপ্তাহের জন্য অন্যত্র গমন করিলেন, তখন ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ অতিথি-গণের সৎকার ও সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য আপনাকেই দায়ী ভাবিয়া নিয়মমত আগমন করিয়া প্রাতঃকালের চায়ের টেবিলে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতেন। এই সকল এবং এইরূপ সহস্র অন্য উপায়ে, আমরা সেই সকল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, যাঁহাদের মধ্যে আমরা সেই উজ্জ্বল স্মৃতির প্রকাশ দেখিতে পাইতাম, যে স্মৃতিরূপ 'টানা'র উপর এই সমুদয় ত্যাগীর জীবন 'পড়েনে'র মত বোনা হইয়াছিল।

কারণ, এই যে সন্ন্যাসিগণ আমাদিগকে দর্শনদানে অনুগৃহীত করিতেন, ইঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার 'শয্যাগ্রণী স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ। স্বামিজী মাত্র তের চোদ্দ মাস হইল তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, এবং এখনও তাঁহাদের সেই প্রথম দর্শনজনিত আনন্দ ও বিস্ময় অপনীত হয় নাই বলিলেই হয়। তাহার পূর্ব্বে প্রায় ছয় বৎসর কাল তিনি তাঁহাদের নিকট একরূপ অদর্শনই ছিলেন। সত্য বটে, তিনি শেষাশেষি তাঁহাদের সহিত ঘন ঘন পত্রব্যবহার করিতেন, এবং কোন সময়েই তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া তাঁহার গতিবিধির একেবারে খেই হারাইয়া ফেলেন নাই, তথাপি যখন তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার আমেরিকাদেশে প্রথম সফলতার কথা শুনিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, "উহার দ্বারা জগতের অনেক কাজ হইবে", তাঁহার গুরুদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর দৃঢ়বিশ্বাস করিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইনি তাঁহাদেরই স্বামী বিবেকানন্দ।

যাঁহারা কোথাও কোন মহাত্যাগীর জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে, নিজের আমিত্বকে দূর করিব, যে সকল বস্তু অতি তুচ্ছ ও যাহাদের কেহ খোঁজখবর রাখে না এরূপ সব বস্তুর সহিত মিশিব, লোক-সঙ্গ হইতে দূরে চলিয়া যাইব, এবং লোকে আমার স্মৃতিপর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলুক—এইরূপ একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগাগ্রহের একটী অঙ্গস্বরূপ। আমার মনে হয়, এই প্রকার ধর্ম্মের, বহুকালব্যাপী মৌন ও নির্জ্জনগুহাবাস,

এবং বন হইতে বনান্তর ও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে অঙ্গে মৃত্তিকা বিভূতি আদি লেপন প্রভৃতি যে সকল অসংখ্য আকারভেদ আছে, এবং পাশ্চাত্য দর্শক বাহির হইতে যাহার অর্থবোধ করিতে পারেন না, সে সকলের ইহাই ব্যাখ্যা। এই ভাবটী শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর প্রথম কয়েক বৎসর স্বামিজীর মনে খুব অধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। এবং তিনি যে বারবার আর কেহ কখনও তাঁহার সন্ধান না পায় এই উদ্দেশ্যেই ক্ষুদ্র ভ্রাতৃমণ্ডলীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, একথা নিশ্চয়। একবার তিনি এইরূপ একটী যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃমণ্ডলী শুনিতে পাইলেন যে তিনি হাথরাসে পীড়িত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কারণ তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে, বিশেষতঃ স্বামিজীর সহিত তাঁহাদের এমন প্রেমসম্বন্ধ ছিল যে, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহার সেবা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মঠে আসিবার কয়েক-মাস পরেই তাঁহার এক শিষ্যও মঠে আগমন করিলেন। ইঁহাকে তিনি ভ্রমণকালে শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সন্ন্যাসের নাম স্বামী সদানন্দ। ইঁহারই ভাঙ্গা ভাঙ্গা অথচ সতেজ ইংরাজীর সাহায্যে কথিত বিবরণ হইতে আমি, এইকালে স্বামিজী মঠে কিরূপ জীবন যাপন করিতেন তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বাশ্রমের গৃহ হইতে কলিকাতা আসিবার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি রেলে চাকরী স্বীকার করেন। এই কার্য্যে তাঁহার দুই তিন মাস লাগিয়াছিল। যখন তিনি মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দেখিলেন যে স্বামিজী পুনর্ব্বার যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, কেবল বাহির হইলেই হইল। কিন্তু তাঁহার জন্য স্বামিজী এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন, এবং সেই দিনই যে যাত্রা করিবার কথা, তাহা এক-বৎসরের পূর্ব্বে আর করা হয় নাই। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামিজীর এই প্রথম শিষ্য সগর্ব্বে বলিলেন, "স্বামিজীর জগদ্ধিতায় কর্ম্মের আরম্ভ আমাকে লইয়াই।"

এই বৎসর আচার্য্যদেব "একদমে চব্বিশঘণ্টাই কাজ করিয়া যাইতেন। তিনি পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার এত কাজ ছিল!" অতি প্রত্যুষে, অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া 'জাগো,

জাগো সকলে, অমৃতের অধিকারী”—এই গানটী গাহিতে গাহিতে অপর-সকলকে উঠাইতেন। তখন সকলে ধ্যান করিতে বসিতেন, এবং তৎপরে যেন অজ্ঞাতসারেই ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে উপনীত হইতেন। উহা দ্বিপ্রহর বা তারও পর পর্য্যন্ত চলিত। স্তবপাঠ ও ভজন হইতে হইতে ইতিহাসের প্রসঙ্গ উঠিত। কখনও ইগ্নেশিয়াস্ লয়োলার * গল্প, কখন বা জোয়ান অব আর্ক অথবা ঝান্সীর রাণীর গল্প হইত। আবার কখনও স্বামিজী কার্লাইলের “ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব” হইতে লম্বা লম্বা অংশ আবৃত্তি করিতেন, এবং সকলে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দুলিতে দুলিতে সমস্বরে “সাধারণতন্ত্রের জয় হউক!” “সাধারণতন্ত্রের জয় হউক!” এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন। অথবা তাঁহারা সেণ্ট ফ্র্যান্সিস্ অব অ্যাসিসির কথায় তন্ময় হইয়া যাইতেন, এবং নাট্যকার যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে স্বভাববশেই নাটকীয় পাত্রগণের সহিত এক হইয়া যান, তাঁহারাও তেমনি উক্ত মহাপুরুষের “এস, এস, ভাই মৃত্যু!”—এই বাক্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বেলা একটা দুইটার সময় হয়ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—তিনিই একাধারে এই সঙ্ঘের পাচক, গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক এবং পূজারী ছিলেন—তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া স্নানাহার করিবার জন্য উঠাইয়া দিতেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহারা আবার একত্র হইতেন, আবার ভজন ও সৎপ্রসঙ্গ চলিত; এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, এবং তৎসঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের দুইঘণ্টাব্যাপী আরাত্রিক সম্পন্ন হইত। অনেক সময়, ইহাতেও

* Ignatius de Loyola (১৪৯১—১৫৫৬ খৃঃ)—ইউরোপের বিখ্যাত জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি স্পেনের এক সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব সন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে যুদ্ধবিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। পরিশেষে একবার আহত হইয়া দীর্ঘকাল হাঁসপাতালে ছিলেন। তথায় উপন্যাসাদি নিঃশেষিত হওয়ায় “মহাপুরুষগণের জীবনী” পাঠ করিতে বাধ্য হন। এই পুস্তক পাঠে তাঁহার জীবনে ধর্ম্মভাবের প্রবল বন্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ইনি জেরুজেলেমে তীর্থযাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে অপূর্ব্ব সেবাভাব ও তপস্যার বিকাশ দেখান। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ঈশা-সমিতি (Society of Jesus) স্থাপন করেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি পুষ্টাবয়ব হইয়া পোপ তৃতীয় পল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইনি “সেণ্ট” আখ্যায় ভূষিত হন।

তাঁহাদের তন্ময়ভাব ভঙ্গ হইত না, আবার ভজন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হইত; আবার তাঁহারা ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন। ছাদের উপর বসিয়া সময়ে সময়ে মধ্যরাত্রির অনেক পর পর্য্যন্ত, তাঁহারা "জয় সীতারাম!" বলিয়া নামগান করিতেন। সকল ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ পর্ব্বগুলি তদুপযোগী বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানসহকারে সম্পন্ন হইত। যেমন, বড়দিনের সময় তাঁহারা একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া, কিরূপে এক জনকোলাহলশূন্য স্থানে কতকগুলি মেষপালক বাঁকা-মাথা পাঁচনবাড়ি হস্তে মেষযূথের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় কিরূপে দেবদূতগণ তাঁহাদিগের নিকটে শুভাগমন করেন, এবং কিরূপে সেই দিনই জগতের প্রথম ঈশ্বরস্তুতিগান উচ্চারিত হইল,—এই সকল সম্বন্ধে অনুচ্চস্বরে আলোচনা করিতেন। কিরূপে তাঁহারা একবার গুড্ ফ্রাইডের উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সে গল্পটী অতি কৌতুকাবহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, এবং তাঁহারা ক্রমে, উক্ত উৎসব-ব্রতিগণের যে উৎকট ভাবাতিশয্য লাভ হইয়া থাকে তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আহারের ত নাম পর্য্যন্ত করা চলিবে না, তাহারা কয়েকটা আঙ্গুর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহারই রস বাহির করিয়া লইয়া জলের সহিত মিশান হইল। সকলে একই পাত্র হইতে উহা পান করিবেন। এইরূপ আয়োজন চলিতেছে এমন সময় দ্বারে একজন ইউরোপীয় অতিথির কণ্ঠ শুনা গেল, "কে আছ, খৃষ্টের দোহাই, দ্বার খোল।" অনির্ব্বচনীয় আনন্দসহকারে তাঁহারা দশ পনর জন মিলিয়া ছুটিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে একত্র হইলেন,—সকলেই একজন খৃষ্টানের মুখ হইতে ঐ দিনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, তিনি মুক্তিফৌজের লোক, গুড্-ফ্রাইডের কথা কিছুই জানেন না, তাঁহারা শুধু জেনারেল বুথের জন্মদিনে উৎসব করিয়া থাকেন। স্বামী সদানন্দ বলিলেন, "তিনি আরও কি কি বলিলেন, আমার মনে নাই।" বলিতে বলিতে বক্তার বদন ও কণ্ঠস্বর যেন বিষাদময় হইয়া গেল; তাহা হইতেই, সাধুগণ এই সংবাদ শ্রবণে সহসা কিরূপ বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বোধ হয় যে, তাঁহারা আশাভঙ্গের প্রথম মুহূর্ত্তেই, "তোমার ইহা রাখিবার

অধিকার নাই" বলিয়া পাদ্রী বেচারার হস্ত হইতে বাইবেলখানি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যায় যে, তাঁহাদেরই একজন অন্য একটী দ্বার দিয়া চুপে'চুপে ঘুরিয়া গিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন, এবং কিঞ্চিৎ ভোজ্য প্রদান করিয়া গোপনে তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করেন।

যিনি এই সকল কথার বর্ণনা করিতেছিলেন তিনি উৎসাহভরে বলিতে লাগিলেন, "সে সময় সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকিতে হইত, এক মুহূর্ত্তেরও বিশ্রাম ছিল না। অনেক বাহিরের লোক আসা যাওয়া করিতেন, অনেক পণ্ডিত তর্ক আলোচনাদি করিতেন, কিন্তু স্বামিজী এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাজছাড়া থাকিতেন না। কখনও কখনও তিনি কিছুক্ষণের জন্য একাকী থাকিবার অবসর পাইতেন, সেই সময় তিনি 'হরিবোল, হরিবোল!' অথবা 'মা, মা!' বলিতে বলিতে পায়চারী করিতে থাকিতেন। এই সকল উপায়ে তিনি আপনাকে উদ্দিষ্ট মহৎকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমি সর্ব্বদা দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতাম, এবং কোন একটী অবসরে বলিতাম 'আপনি খাইবেন না?' প্রত্যেক বারেই তিনি কোন না কোন কৌতুকপূর্ণ উত্তর দিতেন।" কখনও কখনও রাঁধিতে রাঁধিতে অথবা ঠাকুরপূজার আয়োজন করিতে করিতে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিত, এই সকল কর্ম্মে সকলেই ভেদবিচার না করিয়া যোগদান করিতেন। এই সময়ে সাধুরা নির্ধন হইলেও অনেকেই তাঁহাদের নিকট আহারপ্রার্থী হইয়া আসিত। তাঁহাদের নিজেদের সম্বল অতি অল্পই ছিল। মঠের বাহিরে গায়ে দিয়া যাইবার মত চাদর তাঁহাদের একখানি মাত্র ছিল। সেইখানি একগাছি দড়িতে ঝুলান থাকিত, এবং যিনিই বাহিরে যাইতেন তিনিই উহা লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় উত্তরীয় রাখিবার সঙ্গতি ছিল না। তথাপি কোন রকমে দরিদ্র ও অভ্যাগতদিগের জন্য আহার্য্য সংগৃহীত হইত। সাহায্য বা উপদেশলাভের জন্যও অনেকে আসিতেন। সাধুরা আবার অর্থ সংগ্রহ করিয়া কয়েক শত খানি গীতা ও Imitation of Christ ("খৃষ্টের অনুসরণ") ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। এই দুই খানি পুস্তক ঐ সময়ে সঙ্ঘের বড় আদরের বস্তু ছিল। বহু বৎসর পরে ঐ পুস্তকের একটী মাত্র বাক্য স্বামিজী যদৃচ্ছাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিলেন, "ওহে লোকশিক্ষক-সকল,

চুপ কর! ওহে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরাও থাম! হে প্রভো, একমাত্র তুমিই আমার অন্তরাত্মার সহিত কথা কহ!” টমাস-আ-কেম্পিসের গ্রন্থের শুধু ঐ অংশটুকুই তাঁহার মনে ছিল। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের এই হিন্দুকুলোদ্ভব সন্তানগণের মন হইতে এই পুস্তকখানির প্রভাব যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া উহাকে শুধু স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত করিতেছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে গীতার সৌন্দর্য্য ও প্রভাবই দিন দিন প্রস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। তৎপর স্বামিজী পওহারী বাবাকে * দর্শন করিতে গাজীপুরে গমন করেন। ইনিই সেই সাধু যাঁহাকে স্বামিজী চিরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নেই আসন দিতেন। তথায় যে অমূল্যধন লাভ করিলেন তাহা অপর সকলের সহিত একত্রে সম্ভোগ করিবার জন্য তিনি দুই মাস পরেই ফিরিয়া আসিলেন। সহসা সংবাদ আসিল যে, স্বামী যোগানন্দ নামক এক গুরুভ্রাতা বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া এলাহাবাদে পড়িয়া আছেন। অমনি কয়েকজন ভ্রাতা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য ছুটিলেন; স্বামিজীও তাঁহাদের পশ্চাদ্গমন করিলেন।

আমরা পুনরায় স্বামী সদানন্দের বর্ণনার অনুবর্ত্তন করিব। এলাহাবাদে অনেক দিবস ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যতীত হইল। স্বামী যোগানন্দের পীড়া যেন একটী সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র হইল; যেন তাঁহার দ্বারা সকলকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হইল, আর সমস্ত নগরটী যেন মহা ব্যগ্রভাবে যাতায়াত করিতে লাগিল। বহুদিন ও বহুরাত্রি ব্যাপিয়া লোক ক্রমাগত ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া আসিতে এবং দর্শন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বামিজীর মনও এই সময়ে সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ভাবসমূহে আপ্লুত থাকিত। একদিন তিনি এক মুসলমান পরমহংস সাধুকে দর্শন করেন; “তাঁহার অঙ্গের প্রত্যেক রেখাটী বলিয়া দিতেছিল যে ইনি একজন পরমহংস।” এই মিলনাবসরটী একটী অপূর্ব্ব ক্ষণ ছিল, সন্দেহ নাই।

“দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।

* ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হোমাগ্নিতে নিজদেহ আহুতি দিয়া এই যোগী মানবলীলা সম্বরণ করেন।

উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্ ॥”

আত্মবিৎ পরমহংসগণ কখনও দিগম্বর হইয়া কখনও বা বসন পরিধান করিয়া, কখনও বল্কল বা চর্ম্ম পরিধান করিয়া, কখনও জ্ঞানাম্বরে আচ্ছাদিত হইয়া, উন্মত্ত, বালক বা পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

বিবেকচূড়ামণি হইতে এই পরমহংসলক্ষণগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে, শিষ্য বলিলেন, তাঁহারা একরাত্রি ধরিয়া নানাবিধ চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানাপ্রকার ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সম্ভবতঃ একপক্ষ কাল কাটিয়াছিল; তৎপরে তাঁহারা এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া দুই দুই বা তিন তিন জন করিয়া গঙ্গাতীরস্থ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে স্বামিজী ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মহাদিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে তিনি আর সেথায় প্রত্যাগমন করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

অয়কেন। (Rudolf Eucken.)

(শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল)

উপসংহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫) অয়কেন, ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়াই, তাঁহার স্বতন্ত্র দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে গেলে ঐতিহাসিক গবেষণাকেই তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি বা অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

অয়কেনের এই ইতিহাস আলোচনা আমাদের সম্মুখে নূতন কোন গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হেগেল ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানুষ যুগে যুগে আত্মো-

পলব্ধি (Self-realisation) করিতেছে। প্রথমে গ্রীসে ও রোমে অল্প-সংখ্যক লোকে এই আত্মোপলব্ধির সুযোগ লাভ করিত। খৃষ্টের আগমনের পরে অধিকাংশ লোকেই—এবং ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতিই,—স্ত্রীপুরুষ ও জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে আত্মোপলব্ধি করিয়া মুক্ত হইবে। সমস্ত মানবজাতির ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে এইরূপে মুক্ত হওয়াই হেগেলের মতে, ইতিহাসের ইঙ্গিত। হেগেলীয় ঐতিহাসিক আলোচনার ইহাই একটি বিশেষ অঙ্গ। কোম্‌ৎ (Comte) ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানুষের ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে তিনটি ধাপ বা সোপান আছে। প্রথম ঈশ্বর-বিশ্বাসের যুগ (Theological stage), দ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতে বিশ্বাসের যুগ (Metaphysical stage), তৃতীয়—যাহা বর্ত্তমানে চলিতেছে ও ভবিষ্যতে চলিবে—প্রত্যক্ষে বিশ্বাসের যুগ (Positive stage) বা বিজ্ঞানের যুগ (Scientific stage)। ভাইকো (Vico) ইটালীতে এক সময়ে এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। ভাইকোর মতে ঈশ্বরবিশ্বাসের যুগ (Divine), অভিনব বীরত্বের যুগ (Heroic) এবং মানবীয়ভাব ও ইতিহাসের যুগ (Human) একের পর আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইতিহাসের ধারায় নিয়ত দেখা দিতেছে। কোম্‌ৎ যেমন বলেন প্রত্যক্ষে বিশ্বাসের যুগ বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী হইবে ভাইকো তাহা স্বীকার করেন না। ভাইকোর মতে এই প্রত্যক্ষবিশ্বাসের যুগের পর নিয়ত ঘূর্ণিত চক্রের (Cyclical order) ধারার মত আবার ঈশ্বরবিশ্বাসের যুগ আসিবে। কোম্‌ৎ ও ভাইকোর ইতিহাস আলোচনার ইহাই আবিষ্কৃত তত্ত্ব। স্পেন্সার ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে মানবসভ্যতা সামরিক আদর্শ দ্বারা (Military stage) পূর্ব্বে পরিচালিত হইয়া ক্রমে এক্ষণে ব্যবসাবাণিজ্যের আদর্শ দ্বারা (Industrial stage) পরিচালিত হইতেছে। সামরিক যুগ অপেক্ষা এখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্রমবিকাশই স্পেন্সারের ইতিহাস আলোচনার আবিষ্কার।

এই সমস্ত শ্রেণীর চিন্তাশীল মনীষীদের ইতিহাস আলোচনা ও তাহার ফলের সহিত অয়কেনের ইতিহাস আলোচনা বা তাহার ফল তুলনা করিলে আমরা কোনমতেই অয়কেনকে প্রথমশ্রেণীর চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে

স্থান দিতে পারি না। অয়কেন পূর্ব্বোক্ত মনীষীদের মত বিশেষ কোন একটি নূতন তত্ত্ব, ইতিহাস আলোচনা করিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। আমাদের যতদূর মনে হয়, অয়কেন ইতিহাসের উপর গবেষণা করিতে যাইয়া, সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভ বা রচনা লিখিয়াছেন মাত্র। তাঁহার ইতিহাস আলোচনায় তিনি যে যাঁহারা কেবল দার্শনিক বা ভাবুক, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা কর্ম্মী ও তেজস্বী, তাঁহাদের স্থান উচ্চে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি। একটি স্বতন্ত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

ইতিহাস আলোচনার সিদ্ধি বা ফলের দিক ছাড়িয়া দিলেও অয়কেনের ঐতিহাসিক আলোচনার পদ্ধতি এযুগের পক্ষে সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি না। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,—ইতিহাসের মূলে দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং বর্ত্তমান ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা-পদ্ধতির ভুল কোথায় ও তাহার সংশোধন কিরূপে সম্ভব? (On the true conception of the Philosophy of History and a suggested correction of the Historico-Comparative Method.)—এই প্রশ্নের উত্তরে বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস আলোচনা করিবার পক্ষে যে সমস্ত সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, এবং তৎপ্রতি অমনোযোগী হইলে যে সমস্ত ভ্রম ত্রুটির মধ্যে পতিত হইবার আশঙ্কা করিয়াছেন, অয়কেন, আমাদের যতদূর মনে হয়, সেই সমস্ত ভ্রম ত্রুটির মধ্যেই পড়িয়াছেন।

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন, যে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক সভ্যতার মূলে একটি বিশেষ প্রেরণা ও সম্মুখে একটি বিশেষ আদর্শ থাকে। উহারাই তাহাকে চালিত করে। কোন সভ্যতাকে বিচার করিতে হইলে তাহার প্রেরণা ও আদর্শের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া তবে তাহাকে বিচার করিতে হইবে। এই বিষয়ে অমনোযোগিতাই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার উপর অবিচারকে প্রশ্রয় দেয়। সমগ্র মানব-সভ্যতার একটি সাধারণ অভিপ্রায় থাকিলেও, বিভিন্ন সভ্যতার ভিন্ন উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্পষ্ট বিদ্যমান, এবং বিভিন্ন সভ্যতার এই সমস্ত বিশেষ আদর্শের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই মানব-সভ্যতার পরিপুষ্টি। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথের এই মত। আমাদের বিশ্বাস, অয়কেন বিভিন্ন সভ্যতা বা

ধর্ম্মগুলিকে তাহাদের বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অনুপাতে বিচার করিতে সক্ষম হন নাই। এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্ম্মগুলিকে এইরূপ উচ্চ সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিবার অক্ষমতাই অধুনাতন ইউরোপের চিন্তা-জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক। যতদিন ইতিহাস আলোচনার এই পদ্ধতিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথের সতর্কতায় প্রণোদিত হইয়া সংস্কৃত করিয়া না লন, ততদিন ইতিহাস আলোচনা হইতে আমরা এ যুগে আর কোন বিশেষ বড় তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিব, এমন আশা করিতে পারি না। ততদিন মানব-সভ্যতার এক অখণ্ড ইতিহাসের মূলে কোন এক গভীর তত্ত্বের আবিষ্কার ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র পাশ্চাত্য মানব-সভ্যতার খণ্ড-আদর্শ ও তন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন তত্ত্বের কথা কখন কখন শুনিব মাত্র। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথের কথায়, জগতের ইতিহাসের পরিবর্ত্তে, ইউরোপের এক বিচ্ছিন্ন ছবি পাইব মাত্র। ("For the world's panorama it will give us European side-views of Humanity.") ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু আদর্শের তারতম্য অনুসারেই সভ্যতা বা বিভিন্ন ধর্ম্মের বিচার করিতে বলেন নাই। তিনি প্রত্যেক বিশেষ সভ্যতা বা ধর্ম্মকে তাহার ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করিয়া অন্য সভ্যতা বা ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিতে বলিয়াছেন। কোন সভ্যতা ক্রমবিকাশের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যে সমস্ত বিশেষত্বগুলিকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলে, সেই সমস্ত বিশেষত্বগুলি যদি বাহ্য দৃষ্টিতে অপর কোন সভ্যতার আদিম অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তবে ক্রমবিকাশের অবস্থাভেদে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরের সভ্যতার বাহিরের বিশেষত্বগুলির বাহ্য সাদৃশ্য কোন মতেই সমভাবে তুলনীয় হইতে পারে না। হিন্দু-সভ্যতার নারায়ণজ্ঞানে শালগ্রামশিলাকে পূজা করা, আর নিগ্রোজাতির কাল পাথরকে পূজা করা (Fetichism)—একই শ্রেণীর নহে—উহা এক বস্তুও নহে। পৌত্তলিক-হিন্দু-আত্মার কল্যাণকামী খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের তুলনামূলক বিচারপদ্ধতি এযুগে একেবারেই টিকিবে না।

অয়কেন, সভ্যতা ও ধর্ম্মের আলোচনায় এইরূপ ক্রমবিকাশের পথে স্তরভেদ ও সোপানভেদ বিশেষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আদর্শের ও ক্রমবিকাশের স্তরভেদ না করিয়া ধর্ম্ম ও সভ্যতার উপর ঐতিহাসিক

গবেষণায় যদি কোন বড় পণ্ডিতও হস্তক্ষেপ করেন, তথাপি তাহার পরিণাম বা ফল খুব ছোট দাঁড়াইয়া যাইবে, আমাদের এইরূপ ধারণা। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, অয়কেন যে তাঁহার ঐতিহাসিক আলোচনায়, ক্রম-বিকাশের তত্ত্বকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন, বা কোন বিশেষ সভ্যতার, বিশেষতঃ খৃষ্টান সভ্যতার, ক্রমবিকাশে বিভিন্ন যুগে ইতিহাসের যে সমস্ত শক্তির ধারা আসিয়া তাহাকে পরিপুষ্টি ও পরিণতি দান করিয়াছে, তাহা একেবারেই ধরিতে পারেন নাই বা অস্বীকার করিয়াছেন, এমন অপবাদ আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে সমর্থন করি না। তবে তিনি বর্ত্তমান যুগের পক্ষে খুব একটা উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া জগতের সভ্যতাগুলি সম্বন্ধে একটা বিশদ আলোচনা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না; আমরা শুধু তাহাই বলিয়াছি।

অয়কেন-প্রসঙ্গ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। আমরা এই আলোচনার প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে হিন্দু প্রভাব অপেক্ষা অয়কেনের উপর গ্রীক প্রভাবের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। এবং যাহা কিছু হিন্দু-প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহাও একরূপ অয়কেনের অজ্ঞাতসারে। আমাদের একটি বন্ধুর সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে অয়কেনের পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। আমরা সেই সমস্ত পত্রাদি দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। একখানি পত্রে স্পষ্টই অয়কেন স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দু প্রভাব যাহা কিছু তাঁহার উপর কার্য্য করিয়াছে, তাহা অনেকাংশে অজ্ঞাতসারে। অয়কেনের স্বভাব ও আত্মার দ্বন্দ্ব এবং সাধন প্রণালীর ও সিদ্ধান্তসমূহের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়াও আমরা হিন্দু সভ্যতার সহিত সম্যক ও সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাবকেই ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু অয়কেনের চিঠি পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ও জানিতে ইচ্ছুক। মানুষের নিজের সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ধারণা থাকে। অনেক সময় তাহা সত্যও হয় দেখা যায়। অয়কেনের হিন্দু সভ্যতার জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার নিজের একটি ধারণা বা সংবিৎ আছে,—এরূপ তাঁহার চিঠি পড়িয়া বুঝা যায়। তাহা সত্ত্বেও হিন্দু সভ্যতার সহিত অয়কেনের পরিচয় ও অয়কেনের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা পরিবর্ত্তন

করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভব করি না। আমাদের বন্ধুর চিঠিতে অয়কেন যখনই হিন্দু-ধর্ম্ম বা সভ্যতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তখনই এমন একটা শ্রদ্ধার ভাব ও আরও জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাতে অয়কেনের প্রতি আমাদের সম্ভ্রম, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, এই সমস্ত চিঠিপত্র না পড়িলে তাহা হইত কিনা সন্দেহ। অয়কেনের চিঠি পড়িয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত ত বটেনই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী মনে হয়, তিনি একজন সাধু পুরুষ।

সমাপ্ত)

অয়কেন-দরবারে।

(সমালোচনা)

গত আষাঢ় হইতে উদ্বোধনে রুডল্‌ফ্‌ অয়কেনের ব্যাখ্যান বাহির হইতেছে। আমি উদ্বোধনের একজন পাঠক এবং ঐ ব্যাখ্যান পড়িয়া থাকি। এ অবস্থায় যদি ঐ প্রসঙ্গে দু-একটা মন্তব্য ব্যক্ত করি, তবে বোধ হয় অপরাধ হইবে না।

ব্যাখ্যানকার উপসংহারে আমাদের দেশের কয়েকজন মহারথীকে অয়কেনের দরবারে হাজির করিয়াছেন। কৌশল যে খুব ভাল সন্দেহ নাই; এরকম "তুলনায় সমালোচনা" অনেকের উপকারে আসে। কিন্তু এই দরবারে লেখক মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কি তাঁহার প্রকৃত পরিচয়? আমার উত্তর—না, এবং সেই জন্যই কয়েকটী কথা বলা।

৫০৫ পৃষ্ঠায় লেখক দুইটী মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। একটী মতের পোষক শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, অপরটীর পোষক রাজা রামমোহন রায় ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। প্রথম মতে, ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে "স্বভাবকে, প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া" অথবা "স্বভাবকে অস্বীকার করিয়া, ডিঙ্গাইয়া" আত্মায় গিয়া পৌঁছিতে হয়। দ্বিতীয় মতের প্রতিষ্ঠাতৃ-

গণ "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জন্যই এ যুগের উপযোগী এক অতি উচ্চ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন।" * যথা রবীন্দ্রনাথ বলেন, "স্বভাবকে ডিঙ্গাইয়া ঐ রকম বৈরাগ্যসাধনে যে মুক্তি, তাহা এ যুগের লক্ষ্য নয়। অসংখ্য-বন্ধনের মাঝেই মুক্তির স্বাদ লাভ করা হইতেছে এ যুগের আদর্শ। কেন না যিনি মুক্ত তিনি যে ইচ্ছা করিয়াই বন্ধনের মধ্যে আসিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে যে আমাদের এই সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও খুঁজিতে হইবে এ বন্ধনও যে তাঁহারি বন্ধন। কেবলই 'মায়ার' নয়। আর যদি তাই হয়, তবে সেও ত তাঁহারই মায়া, সে মায়া মিথ্যা হইবে কি করিয়া?"

এই দুটী মতের মধ্যে প্রথমটী, রাজা রামমোহন রায়ের ভাষায় "বিরক্ত"দের মত, দ্বিতীয়টী গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠদের মত। লেখকমহাশয় স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম মতের বা পক্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় করিয়াছেন।

ভাল, লেখকের মত কি? সে রহস্যের উদ্‌ঘাটন হইয়াছে অয়কেনের সমালোচনায়, ৫০৫ পৃষ্ঠার শেষ পাঁচ লাইন ও ৫০৬ পৃষ্ঠার প্রথম ১২ লাইনে। আমরা, পাঠকের দল, এই কয় লাইন পড়িয়া সহজেই বুঝিলাম যে অয়কেনকে প্রথমে স্বামীজির সঙ্গে এক পক্ষে দাঁড় করাইয়া, তারপর সেই অয়-কেনের মতের সমালোচনায়—"তিনি এ যুগের পক্ষে খুব বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না"—এই মৃদুমন্দ তেহাই জুড়িয়া দিয়া, বহুঅধ্যয়ন-শীল বিজ্ঞ লেখক স্বামীজির বিরুদ্ধেই রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি কিছুই অবশ্য অন্যায় করেন নাই, কারণ রায় সম্পূর্ণই বিচারকের ইচ্ছাধীন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যাঁর ওকালতি তাঁরই রায় কিনা,

* স্বভাব বা Nature সম্বন্ধে স্বামীজির মত ও অয়কেনের মত এক নহে। অয়কেন স্বভাব ও আত্মার পাশাপাশি সত্তা স্বীকার করিয়াছেন, কেবল স্বভাব নীচে ও আত্মা উপরে। ইহাকে তিনি Noological মত বলিয়াছেন। যে সাধক স্বভাবের স্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠিতে যাইতেছেন, তাহাকে প্রথমতঃ Negative Method অবলম্বন করিতে হইবে; এই নৈতিভাব দ্বারা যখন সে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হইবে, তখন আর ঐ প্রণালীর তেমন দরকার নাই, কেবল নীচে পতনসম্ভাবনাকে সামলাইয়া গেলেই হইল। স্বামীজির মায়াবাদ যে এই মত হইতে পৃথক ও আরও গম্ভীর তত্ত্ব, সে কথা বলা বাহুল্য।—"শ্রীলেখক"।

তাই ওকালতির দোষ ধরিলেই রায়ের দোষ ধরা হইল। স্বামী বিবেকানন্দকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের মতের বিপক্ষবাদী বলিয়া খাড়া করিয়া, লেখক মহাশয় কি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন ?

স্বীকার করি, স্বামীজি বারম্বার বলিয়াছেন যে স্বভাব বা nature কে পরাজিত বিধ্বস্ত করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে হইবে। কিন্তু সে সংগ্রাম মানে কেবল যে ঘর দ্বার ছাড়িয়া পলাইয়া সাধুগিরি করা তাহা নহে। স্বামীজি বলিতেছেন যে, সে সংগ্রামে কীট পতঙ্গাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ-দেবতারা পর্য্যন্ত লিপ্ত রহিয়াছে। তিনি জীবন বা Life এর Definition বা স্বরূপ লক্ষণ দেখাইতে গিয়া ঐ সংগ্রামকেই দেখাইয়া দিতেছেন। প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করা ও সেই জীবন-সংগ্রামের একটা অংশ মাত্র। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে চেতন জীবমাত্রেই, নানা আকারে ও প্রকারে মুক্তি চাহিতেছে।* এই মুক্তিলিপ্সার ফলে জীব প্রতিপদক্ষেপে যাহাকে আমরা Nature বা প্রকৃতি বলি তাহাকে ডিঙ্গাইয়া যাইবার বা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ রকম মুক্তিলিপ্সা ও স্বভাবকে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া জীবমাত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে, তা তিনি মুক্তিকে ভক্তির দাসীই বলুন, বা অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও মুক্তির আস্বাদই পান।

লেখকের ধরা হইতেছে এই যে "স্বভাবকে অস্বীকার করিয়া, ডিঙ্গাইয়া যাঁহারা আত্মায় গিয়া পৌঁছিতে চান," তাহারাই "এদেশে বিরক্তের দল"। কিন্তু স্বামীজি বলিতেছেন যে সকলেই "স্বভাবকে অস্বীকার করিয়া ডিঙ্গাইয়া আত্মায় গিয়া পৌঁছিতে" চাহিতেছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে লেখক মহাশয় স্বামীজিকে বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। এই হইল মূলে ভুল।

তার পর এ যুগের আদর্শের কথা। লেখক মহাশয়ের মত এই যে, যিনি সন্ন্যাসী, তিনি এ যুগের আদর্শ হইতে হটিয়া পড়িয়াছেন। কারণ কি ? কারণ এই যে ধর্ম্মজীবনের পরিণতি, জীবনের বাহিরে নয়। সুতরাং যাহা জীবন, ধর্ম্ম তাহা হইতে সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিবে কি করিয়া ? এই প্রবৃত্তিও যে জীবন, কে অস্বীকার করিতে সাহস করিবে?" সন্ন্যাসীরা প্রবৃত্তির ন্যায্য স্থান প্রবৃত্তিকে দেয় না, অতএব প্রকৃত জীবন হইতে বাহিরে

হটিয়া যায়; এ অবস্থায় বর্ত্তমান যুগের জীবনাদর্শের সহিত সন্ন্যাসের খাপ খাওয়া অসম্ভব। এই সিদ্ধান্তটী লেখক মহাশয় উদ্বোধন-পৃষ্ঠায় খোলাখুলি ব্যক্ত না করিলেও, উহা অব্যক্ত থাকিয়া যায় নাই। "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের" ধর্ম্মজীবনের আদর্শই যে এ যুগের উপযোগী আদর্শ, তাহা স্পষ্ট কথায় না বলিয়া দিলেও, পাঠককে উহা বুঝাইয়া দিতে তিনি বাকি রাখেন নাই। তাঁহার মতে সন্ন্যাসের আদর্শ যে এ যুগের জন্য নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

সন্ন্যাসকে কোন্ যুগেই বা লোকে যুগাদর্শ বলিয়া ঠাওরাইয়াছে? সংসার ত সব যুগেই সন্ন্যাসকে আপনার গণ্ডীর বাহিরে স্থান দিয়াছেন; এ আর নূতন কথা কি? আর সন্ন্যাসীরাও সব লোককে মাথা মুড়াইয়া দিতে কোনও যুগেই ক্ষেপিয়া উঠে নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পার যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অনেক যুগেই লোকে সন্ন্যাসকে ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া আদর করিয়াছে। কিন্তু এক ভারতীয় আশ্রম-চতুষ্টয়ের যুগ ছাড়া, আর কোনও যুগেই সংসার অধিকাংশ লোকের সামনে সন্ন্যাসকে তাহাদের অবলম্বনীয় আদর্শ বলিয়া তুলিয়া ধরে নাই। আর আজও যে ধরিবে এমন প্রত্যাশা স্বামী বিবেকানন্দ কেন, কোন সন্ন্যাসীই করেন নাই। কস্মিন্‌কালেও যুগাদর্শের আসনটী সন্ন্যাস সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিতেছে না। গার্হস্থ্য ধর্ম্মজীবন ও সন্ন্যাস—এই দুইটী আলাদা কোট ধর্ম্মসাধনার মধ্যে চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিয়া যাইবে। সন্ন্যাসী কখনও গৃহস্থের কোটটী একেবারে রদ করিয়া দিতে যান নাই; গৃহস্থও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিপরীত চেষ্টায় চেষ্টিত হন নাই। কেবল বর্ত্তমান যুগেই শুনা যাইতেছে যে অনেক প্রচণ্ড দার্শনিক ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে সন্ন্যাসের যে কোনও ন্যায্য অধিকার আছে, তাহা অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে জীবন লইয়াই ধর্ম্ম; সন্ন্যাসীরা এই জীবনক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাওয়ায় ধর্ম্মসাধনার প্রকৃত ক্ষেত্র হইতে নিজেদেরই নিজেরা বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

"ধর্ম্ম জীবনের পরিণতি, জীবনের বাহিরে নয়",—আমাদের সুবিজ্ঞ লেখক মহাশয়ও গম্ভীরস্বরে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, এই জীবনটী কি পদার্থ? এমন কি পদার্থকে এই আধুনিক দার্শনিকরা

জীবন নামে অভিহিত করেন যে, সে পদার্থ সন্ন্যাসীর মধ্যে তাঁহারা খুঁজিয়া পান না ? একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে গৃহ, সমাজ, দেশ ও জগতের নানা মানবীয় সম্বন্ধ ও আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের যে অভিব্যক্তি, তাহাকেই ইঁহারা মানবজীবন বলেন। এখন যেহেতু সন্ন্যাসীরা ঐ সব সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান হইতে পলাইয়া যায়, সেইহেতু সিদ্ধান্ত এই যে, তাহারা ঐ অভিব্যক্তির ক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া পড়ে, অর্থাৎ জীবনক্ষেত্র হইতে ছট্‌কিয়া পড়ে। জীবনটাকে একটা বিশেষ সীমানার অন্তর্ভুক্ত অভিব্যক্তি বলিয়া যে একটা ধারণা তাহা আধুনিক যুগের চিন্তা-বিগ্রহের হাড়ে হাড়ে, শিরায় শিরায়, ঢুকিয়া গিয়াছে ধন্য ডারউইন, ধন্য স্পেন্সার, তোমাদের মহিমার বলিহারি যাই !!

অন্যকেন্ প্রসঙ্গে লেখক মহাশয় আত্মা স্বীকার করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার মতে এমন এক সত্য আছে যাহা একাধারে জীবনের প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ্য। তাই যদি হয় তবে জীবনের যে সাংসারিক বিকাশ, সেই বিকাশ বা অভিব্যক্তিই কি ঐ সত্যের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থল, না, বিকাশ হইতে স্বতন্ত্র,নিরপেক্ষ,কোন একটা প্রতিষ্ঠা ঐ সত্যের রহিয়াছে ? ঐ সত্যের প্রতিষ্ঠা আপনাতে,—না বিকাশে ? আধুনিক যুগে যে সমস্ত মনীষীদের কাছে আপনার আদর্শ আদায় করিতেছে তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান পাণ্ডারা এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সত্যের স্বরূপের মধ্যেই বিকাশ রহিয়াছে, অতএব বিকাশ হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সত্যের নাই। সত্যের এই বিকাশসাপেক্ষ স্বরূপ ভারতীয় সন্ন্যাসশাস্ত্র স্বীকার করেন না। সেই জন্য জীবনের প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ্য যে সত্যে, সেই সত্য লাভ করিতে গেলে যে জীবনের বিকাশ-স্রোতের সঙ্গে সাঁতার কাটা ছাড়া উপায় নাই, এ কথা সন্ন্যাসীরা মানিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, বিকাশ বা অভিব্যক্তির দ্বারা সত্য বাড়েও না, কমেও না ; সত্য স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বপ্রকাশ। সে সত্যকে লাভ করিতে গেলে বিকাশের দ্বারস্থ হইতে হইবে না ; সে সত্যকে যিনি শ্রবণ করিতে পারেন তিনি মনন ও লাভ করিতে পারেন। সাংসারিক জীবনের যে ধারাটী স্বভাব বহাইয়া দিতেছে, সে ধারার অনুসরণে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু সে বিকাশ-রহস্য বুঝিয়া দেখ, দেখিবে আসল, স্থায়ী, যাহা কিছু উন্নতি হয় তাহা মানুষের অন্তরের দিকে,

মানুষের আত্মার দিকে। স্বভাবের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া এই যে আত্মাভিমুখী গতি আমরা আখেরে পাইতেছি, এই গতিকে আরও বাড়াইয়া দিবার একটা বিজ্ঞান আছে। পশুপক্ষী স্বভাবের হাতে আপনাদের ছাড়িয়া দিয়াও আখেরে নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দতা যোগাড় করে। কিন্তু মানুষ স্বভাবকে কায়দায় ফেলিয়া সময়ের অনেক সংক্ষেপ করিয়া যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধান করে। বিজ্ঞানের একটা প্রধান কর্ম্মই ঐরূপ করা। সংসারে স্বভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া যে মনুষ্যত্ব-বিকাশ বা আত্মাভিমুখী গতি ঘটিয়া থাকে, উহারই সম্যক্ পরিপুষ্টি স্বভাবের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান স্বভাবকে যে কায়দার মধ্যে ফেলে তাহার নাম সন্ন্যাস। সন্ন্যাস মানে একটা অস্বাভাবিক, অবৈজ্ঞানিক, "বিদঘুটে" কাণ্ড নহে।

তারপর যদি বল যে গৃহ, সমাজ, স্বদেশ ও জগতের যে সব সম্বন্ধ ও আদান প্রদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় মানুষ গড়িয়া উঠে, সে সকল সম্বন্ধ ও আদান প্রদানকে অবহেলা করায় কি সন্ন্যাসীর ক্ষতি হয় না? হাঁ, ক্ষতি নিশ্চয়ই হইত যদি ঐ সব সম্বন্ধ ও আদান প্রদান স্বরূপে ও মূলে মানুষের ভিতরকারই তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ না হইয়া শুধু মানুষের বাহিরেরই ব্যাপার হইত। সহজেই বুঝা যায় যে ঐ সব সম্বন্ধ ও আদান প্রদান মানুষের প্রেমেরই লীলামাত্র। ভিতরের প্রেমবস্তুই বাহিরে নানা আকার ধারণ করিতেছে। সন্ন্যাসী যখন সেই আসল প্রেমবস্তুরই ঐকান্তিক সন্ধানে উহার সাংসারিক লীলাক্ষেত্র ত্যাগ করে, আর সেই প্রেমবস্তু যখন অন্তরেরই বস্তু, তখন সন্ন্যাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত কি করিয়া ভাবিব? যদি আধুনিক দার্শনিকদের মত ভাবিতাম যে, বস্তু স্বপ্রকাশ নহে, বস্তুর প্রকাশ লীলাসাপেক্ষ, লীলা ব্যতিরেকে বস্তু Abstract, * লীলাযুক্ত

* এই Abstract শব্দটী পাশ্চাত্য দর্শনের এক অদ্ভুত শব্দ। সেখানে উহা যৌগিক নয়, রূঢ়ী। যেমন হিগেলের Abstract Universal। এই Universal বা সমষ্টিতত্ত্ব Abstract হওয়াতে যেন উহার হানি হইয়াছে, Concrete হইলেই তাঁহার পূর্ণতা। যাহা ইন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিগম্য তাহাই Concrete, তাহার সত্তা পাকা, তাহাকে সাধারণ মানবজীবনের একতারে পাওয়া যায়। যাহাকে বুদ্ধির বিশ্লেষণে পাই, অথচ

হইলে তবে Concrete, তবে না হয় বলিতাম যে প্রেমের লীলাক্ষেত্র ছাড়িয়া যাওয়ায় সন্ন্যাসী নিজেকে প্রেম হইতে বঞ্চিত করে। ভগবান্ বুদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া বা স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হইয়া যে অগাধ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন, সে জলন্ত দৃষ্টান্ত চাপা দিয়া কি করিয়া আজকালকার পণ্ডিতম্মন্য দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিব? কি করিয়া বলিব যে, প্রেমের সাংসারিক লীলাক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া পড়িলেই প্রেমের উৎস হইতে মানুষ বঞ্চিত হয়?

আর আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে গৃহ, সমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সন্ন্যাসী বেশী করিতে পারিয়াছে, না গৃহস্থ পারিয়াছে, সে খবর কি লেখক মহাশয় রাখেন? আজ পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের চর্ব্বিতচর্ব্বণে মস্তিষ্ক পোষিত করিয়া আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকই সন্ন্যাসকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু সহস্র স্বাভাবিক উত্থানপতনের ভিতর দিয়া আজও যে ভারত আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আজও যে ভারত জগৎকে শিক্ষা দিবার শক্তি ধারণ করে, এ গৌরবের কারণপরম্পরা যদি অনুসন্ধান করিতে চাও, তবে যে সন্ন্যাসেরই গৈরিক আভা অনুসরণ করিতে করিতে সে গৌরবের ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

সে সব ইতিহাসের কথা এখন থাক্। আমাদের আসল বক্তব্য এই যে "গৃহস্থ" ও "বিরক্ত" এই দুটা সরাসরি পক্ষ সৃষ্টি করিয়া উভয়ের ধর্ম্মজীবনের আদর্শকে আলাদা আলাদা খাড়া করিয়া দিয়া, স্বামী বিবেকানন্দকে গৃহস্থদের বিপক্ষবাদী ও বিরক্তদের স্বপক্ষবাদী বলিয়া ঘোষণা করায়, অয়কেন্ ব্যাখ্যাকার স্বামীজির প্রকৃত পরিচয় দেন নাই। ধর্ম্মজীবন লাভের পথ যে কেবল সন্ন্যাস এমন কথা স্বামীজি বলেন নাই; সমস্ত ধর্ম্ম-পিপাসুকেই তিনি সন্ন্যাস লইতে

যাহা জীবনের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই বোধ হয়, পাশ্চাত্য দর্শনের Abstract। পাতঞ্জলদর্শনে যে প্রত্যক্ষ সংযম নামে কথিত, সে প্রত্যক্ষ যদি পাশ্চাত্য দর্শন জানিত, তবে Abstract শব্দের অর্থ অন্যরূপ হইত; তাহা হইলে যেখানটা তাহারা "ভূত" দেখে, সেখানটা Abstract বলিয়া চাপা দিত না; আর Abstract সত্তার ও Concrete সত্তার অন্ততঃ সমান গৌরব হইত,—সমান কেন, Abstract এর গৌরব বেশীই হইত। —"শ্রীলেখক"।

আহ্বান করেন নাই। সন্ন্যাসীর যাহা সাধ্য গৃহস্থেরও তাহা সাধ্য হইতে পারে। সন্ন্যাস কেবল একটা বিশেষ সাধনপ্রণালী। যদি তোমার এমন অনুভব হয় যে সংসারত্যাগ করিলে সাধনার সুবিধা হইবে, তবে ত্যাগের চেষ্টা কর; কিন্তু যদি মনে হয় যে সংসারেই তোমার সাধনার সুবিধা হইতেছে, সংসারেই থাক। কে বাপু তোমার গায়ে পড়িয়া বলিতে গিয়াছে যে সংসারে জীবের উদ্ধার নাই? কে বাপু হলপ্ করিয়া তোমায় বলিতেছে যে অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় না? তুমি সে স্বাদ পাইয়া থাক, বহুৎ আচ্ছা; তাহাতে সন্ন্যাসের সাধনাকে যুগধর্ম্ম হইতে, দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে কেন? তুমি যদি সাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটা নিবিড় সামঞ্জস্য পাইয়া থাক, আনন্দের কথা; তুমি সেই সামঞ্জস্যটাকে তোমার জীবনে গন্ধে গন্ধে, বর্ণে বর্ণে, শব্দে শব্দে, ফলাইয়া তুল, আর যাহারা সন্ন্যাসী হইতে চায় না তাহাদের জন্য একটা নূতন পথ খুলিয়া দাও, কিন্তু সন্ন্যাসের উপর চোট্ ঝাড় কেন বাপু? বেদ যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর দাঁড়ায়, তেমনি করিয়া এখনও ত তুমি প্রমাণ করিয়া দাও নাই যে আত্মার মহিমা নামরূপ বিকাশের মধ্যে একদম ধরা পড়িয়া গিয়াছে, ঐ গণ্ডির বাহিরে সে মহিমা খুঁজিতে গেলে অশ্বডিম্ব মিলিবে! যেদিন সে প্রমাণ দিতে পারিবে, সেদিন বলিও যে সন্ন্যাস আর কোন যুগেরই ধর্ম্মের আসরে ঠাঁই পাইবে না। আর নামরূপের খেলা না হইলে যে আত্মার প্রকাশ হয় না, যে আত্মার প্রকাশ নামরূপের বিকাশের উপর নির্ভর করে, যে আত্মা স্বপ্রকাশ, স্বপ্রতিষ্ঠ নহেন, যে আত্মস্বরূপে পাখীর ডানার মত নামরূপ অঙ্গীভূত, যেমন ডানা ছাড়া পাখী পাখীই নয়, সেই আত্মার তত্ত্ব লইয়াই কি আজ লেখকের মতে ভারতের বাণী ইউরোপে অয়কেনকথিত সিন্‌থ্যাগমার উদ্ভব করিবে? কেন হিগেল কি দোষ করিলেন?

জন্মাষ্টমী, ভাদ্র ১৩২২।　　"হিমারণ্য"।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

প্লেটো।

(শ্রীকানাইলাল পাল এম-এ, বি-এল)

(২১৮ পৃষ্ঠার পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি জগদ্ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইয়া প্লেটো ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে আর একটী পদার্থ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ইংরাজীতে এই পদার্থের "Matter" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উহাকে আমাদের ভাষায় জড়পদার্থ বলা উচিত নয়, কারণ জড় বলিতে আমরা যাহা বুঝি প্লেটোর "Matter" তাহা হইতে একান্ত বিভিন্ন পদার্থ। বলিতে গেলে ইহাকে সাংখ্যের "প্রকৃতি" বা বেদান্তিকের "মায়া" বরং বলা চলে কিন্তু তাহা হইলেও দোষ থাকিয়া যায়।

পারিভাষিক শব্দের অভাবে আমরা ইতিপূর্ব্বে এই "Matter"কে "প্রকৃতি" আখ্যা দিয়াছিলাম কিন্তু তাহা হইলেও ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা বর্ত্তমান; সুতরাং অতঃপর আমরা ইহাকে "অভাব" (Non-Being) পদার্থ বলিব। পরন্তু ন্যায় শাস্ত্রের "অভাব" পদার্থের সহিত ইহার পার্থক্য আমাদের সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে।

সাংখ্যবাদী প্রকৃতি বলিতে পুরুষ-ব্যতিরিক্ত স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট পদার্থকে বুঝেন; সেই প্রকৃতি মূলতঃ অব্যক্ত ও বহুধা বৈচিত্র্যের কারণ। প্লেটোর "অভাব" পদার্থ মূলতঃ অব্যক্ত ও সকল বৈচিত্র্যের কারণ; সেই হিসাবে ইহার সহিত সাংখ্যের 'প্রকৃতি'র সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সেই "অভাব" পদার্থের স্বাধীন সত্তা নাই। বেদান্তিক বলেন বহুধা বৈচিত্র্যের মূল কারণ মায়া বা অবিদ্যা, এই মায়ার স্বাধীন সত্তা নাই, ইহা একপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান মাত্র। তবে কি প্লেটো মায়াবাদী ছিলেন? এ কথার উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। রিটার প্রমুখ দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহাসিকগণ প্লেটোর মত সম্বন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সে সমস্ত আলোচনা করিলে প্লেটোকে বিজ্ঞানবাদী ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। পক্ষান্তরে জেলার

প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ রিটারের কথার প্রতিবাদ করেন। আমরা তাই প্লেটোকে বিজ্ঞানবাদী বা মায়াবাদী বলিতে সাহসী হই না।

এই "অভাব" পদার্থ স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট জড়পদার্থ নয়, একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহা কি তবে সম্পূর্ণই অসৎ? উত্তরে প্লেটো বলেন, না, ইহাকে সৎও বলিতে পার না অসৎও বলিতে পার না। তবে কি ইহাকে সদসৎ আখ্যা দিব? রিটার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ প্লেটোর "অভাব" পদার্থকে এই সদসৎ আখ্যাই প্রদান করিতে প্রস্তুত। আমরা তাঁহাদের বক্তব্যই প্রথমে আলোচনা করিব। অবশ্য প্লেটোর মূলগ্রন্থে অধিকার না থাকায় প্লেটো সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক কি কি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই আলোচনা করিয়া প্লেটোর মতবাদের পরিচয় দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি মূল ভাবপদার্থ একমাত্র। একথা প্রচার করিয়াও প্লেটো বহু ভাবপদার্থের অস্তিত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। রিটার বলেন প্লেটোর মতে যখন মূল ভাবপদার্থেরই একমাত্র স্বাধীন সত্তা আছে, তখন বহু ভাবপদার্থের সত্তা স্বাধীন হইতে পারে না, অন্য কথায় এই বহু ভাবপদার্থ আপেক্ষিক সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ মাত্র। জ্ঞানের সহিত সত্তার সম্বন্ধ বিচার করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে এই বহু ভাবপদার্থের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ এবং আপেক্ষিক। মানুষ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভের চেষ্টা দেখা যায়। এই চেষ্টা বা জিজ্ঞাসা ব্যাপারেই পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। যাহা চিরনিত্য চিরসিদ্ধ সে বিষয়ে কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না। এই আপেক্ষিক জ্ঞানের কারণ অভাব পদার্থ। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পরিবর্ত্তন ব্যাপারের (Becoming) কারণ এই "অভাব" পদার্থ।

এখন ভাবপদার্থের কথা স্থগিত থাক, বাহ্য জগতের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক।

এখানে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে বাহ্যজগৎ ও ভাবজগৎ বলিয়া পৃথক দুইটী জগৎ প্লেটো স্বীকার করিতেন না। অনেক দার্শনিক-ঐতিহাসিক এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রিটার অবশ্য সেই শ্রেণীর

অন্তর্গত নন। বাহ্যজগৎ ভাবজগতের বিকাশ, আর ভাবজগৎ মূল ভাব-পদার্থের বিকাশ এই কথা বলিলেই যেন প্লেটোর বক্তব্য যথাযথ বলা হয়। আমাদের বাহ্য পদার্থের যে প্রতীতি হয় তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক অবভাস—Sensuous perception আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই যে ঐন্দ্রিয়ক অবভাস, এটী কি? অবশ্য এটী যে অসম্পূর্ণ জ্ঞান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এটী যে আপেক্ষিক সে বিষয়েও মতদ্বৈধ নাই। কথাটী উদাহরণ সাহায্যে একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করা যাউক—একটী বৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে; আমি একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া তাহার একটী শাখার অংশ দেখিতেছি, অপরে অপর একটী ছিদ্র দিয়া কয়েকটী পত্র দেখিতেছে—কেহ বা তৃতীয় ছিদ্র দ্বারা তাহার গুঁড়ি দেখিতেছে—সকলেই এক এক ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া দেখিতেছে। ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বৃক্ষ দর্শনে যেমন বৃক্ষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মায় মাত্র সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের মূলসত্তার আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র লাভ হয়। ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যপ্রতীতির এক একটী দ্বার মাত্র; চক্ষু দ্বারা দর্শন,—কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয়। প্লেটো বলেন মানবের দৃষ্টিশক্তির অভাব নাই, তাহার সম্মুখে একটী আবরণ রহিয়াছে তাই তার জ্ঞান অসম্পূর্ণ, তাই পূর্ণ সত্তা তার নিকট বিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশ পায়। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া জগৎ দেখে—ইন্দ্রিয়দ্বার না থাকিলে তার এইরূপ জগৎ-প্রতীতি হইত না। বুঝা গেল প্রণালীবিশেষের সাহায্য না লইলে এই জগৎ-প্রতীতি হইত না। রিটার বলিতে চান, প্লেটোর মতে "অভাব" পদার্থ জগৎ-রচনার মূল প্রণালীবিশেষ। কথাটী আবার উদাহরণসাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। দেশে ও কালে সুসজ্জিত না হইলে বাহ্য পদার্থের কোন প্রতীতিই হয় না। চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে হইলে সীমাবদ্ধ দেশ থাকা চাই। দর্শনের মূলে দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ব্যাপারেই এই দেশ ও কালের মূলতঃ স্থিতি প্রয়োজন। অবশ্য এস্থলে বলা আবশ্যক প্লেটো অভাব পদার্থকে দেশরূপে উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু কালের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায়, আমরা মূল সত্তাকে

সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিচ্ছিন্নরূপে দেখি, ইহাই আমাদের জগৎ-প্রতীতির কারণ। কেন দেখি, এ প্রশ্নের প্লেটো কোন সদুত্তর প্রদান করেন না বটে কিন্তু এই "অভাব" পদার্থকে অনাদি বলিয়া উল্লেখ করেন।

জেলার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কিন্তু রিটারের কথার প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন সকল বিষয়েরই অভিব্যক্তি আছে; "অভাব" পদার্থ জ্ঞান-বিকাশের মূল প্রণালী, একথা আধুনিক যুগের কথা। দার্শনিক লিবনিজই প্রথমে প্রচার করেন, প্রত্যক্ষ জগৎ ঐন্দ্রিয়ক আভাস মাত্র (Sensuous notion), বাহ্য জগৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ফল মাত্র। এই তত্ত্ব প্রচারে লিবনিজ বিজ্ঞানবাদের সূত্রপাত করেন, সেই বাদ পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া হেগেলের অধ্যাত্মবাদে (Transcendental Idealism) পরিণত হইয়াছে। জেলার বলেন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪০০ অব্দে প্লেটো আধুনিক যুগের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন একথা স্বীকার করা অযৌক্তিক।

অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদ অকাট্য এ কথা জোর করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। সুতরাং জেলার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের আপত্তি কতদূর গ্রাহ্য পাঠকবর্গই বিচার করিবেন। আমাদের মনে হয় যাহা সত্য তাহা নিত্য। প্রাচীন আর্য্য ঋষির যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অতুল বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন পাশ্চাত্য জগৎ আজ সে সত্যোপলব্ধির জন্য লালায়িত কেন?

জেলার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলেন এই "অভাব" পদার্থ স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট পদার্থ না হইলেও ইহা আত্মার একটা প্রকাণ্ড খেয়াল মাত্র নহে, এবং এই উক্তি করিয়া রিটারের কথার প্রতিবাদ করেন। আমাদের মনে হয় উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন মতভেদ নাই। অবশ্য স্থলবিশেষে রিটার ঐন্দ্রিয়ক আভাসের প্রতি অধিক জোর দিয়া কথা কহিয়াছেন। সে সব কথা পড়িলে মনে হইতে পারে রিটার যেন বলিতে চান এই জগৎ আত্মার সম্পূর্ণই মনঃ-কল্পিত পদার্থ, কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। মূল বক্তব্য এই যে, বিশ্বজগৎ বিশ্বাত্মারই বিকাশ মাত্র; এ জগৎ তাঁরই লীলাক্ষেত্র।

এখন এই "অভাব" পদার্থের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ কি দেখা যাউক।

যাহার কোন সত্তা নাই তাহার জ্ঞানও অসম্ভব। কথাটী দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় জ্ঞানই সত্তা, জ্ঞানই সৎ। সত্তা বা সৎ বলিয়া জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই; যখন আমরা বলি কোন পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন সেই বস্তু জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝায় না। যাক্ সে কথা, জ্ঞান ও সত্তা অভিন্ন।

প্লেটো বলেন, অভাব যদি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় একেবারেই অসৎ পদার্থ হইত তবে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান (knowledge) লাভ হইত না। তৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা প্রতীতি (perception) ও সম্ভব নয়, কারণ তদন্তর্গত পদার্থই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে দেশগত পদার্থবিশেষই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দেশের কখনও প্রতীতি হয় না। সুতরাং রিটার যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেটী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়।

অতঃপর আমরা কয়েকটী আপত্তি বিচার করিব—

কেহ কেহ আপত্তি করেন ভাবপদার্থ অপরিবর্ত্তনীয় তবে ইহা কেমন করিয়া বহু ও পরিবর্ত্তনশীল হইবে? তাঁরা আরও আপত্তি করেন, যদি বল বহুর প্রত্যেকটীতে এই ভাবপদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা হইলে ইহা বিভাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। উত্তরে প্লেটো বলেন, বহুর অস্তিত্ব আপেক্ষিক মাত্র, বহুজ্ঞান আপেক্ষিক জ্ঞান—সত্যজ্ঞান নয়, সুতরাং এক বহু হইয়াছে আপত্তি করা অযৌক্তিক। এক একই আছে, বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। তারপর আরও একটী আপত্তি উঠে, যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহার সহিত অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থের সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব? বিপরীতের সম্বন্ধ কেমন করিয়া সংঘটিত হয়। তদুত্তরে প্লেটো বলেন, বিপরীত সত্তার সম্বন্ধ আশঙ্কা করা বৃথা, প্রতীয়মান বাহ্য জগতের সত্তাও ভাবপদার্থেরই সত্তা, সুতরাং বিপরীত সদ্ভাব কোথায়?

আর একটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্লেটোর মতে প্রত্যক্ষ জগৎ সেই ভাবজগতের প্রতিকৃতি মাত্র। ভাবজগৎ আবার সেই মূল ভাবপদার্থের বিকাশ মাত্র, এ কথা শুধু যে, রিটার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নয়, এরিষ্টটলেরও সেই মত। 'অভাব' পদার্থের সাহায্য

প্রভাবে (বৈদান্তিক হইলে বলিতেন অবিদ্যার বলে) সেই মূল ভাবপদার্থ হইতে প্রত্যক্ষ জগৎ ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই এক "অভাবের" বলেই এই বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে"। ভাবজগৎকে প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে একবোরে পৃথক্ করিয়া অনেক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক এরিষ্টটলকেও ভ্রান্ত মনে করেন; কিন্তু সে মত গ্রহণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই—কারণ, এরিষ্টটল প্লেটোর সমসাময়িক লোক, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ও জগতের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক। কথাটা এই, জ্ঞানের সহিত সত্তার অভিন্নতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন। আপাত-দৃষ্টিতে সত্তা ও জ্ঞানকে দুটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে হয় ও জ্ঞেয় পদার্থকে জড়, ও জ্ঞানকে চৈতন্য আখ্যা দেওয়া হয়। জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ বলিয়া মনে করায় যত তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। এ দুয়ের অভেদ হৃদয়ঙ্গম করিলে জগৎ বিজ্ঞানময় হইয়া প্রকাশ পায়, তখন জ্ঞান হইতে জড়ের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইল, এ প্রশ্নের আর কোন অর্থ থাকে না। জেলার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এরিষ্টটলকে ভ্রান্ত মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা এ কথাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্লেটোর শেষ রচনায় ভাবজগতের ও প্রত্যক্ষ জগতের ভেদ লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। দার্শনিকপ্রবর শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের দুইটী ছত্র মনে পড়ে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সেই কথায় শেষ করি—

ভাবে ভায় অভাব, অভাবে ভায় ভাব,
ভাবাভাবে ভায় শুধু সত্যের প্রভাব।

(ক্রমশঃ)

মন না মতি।

(গল্প)

(শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল)

শ্রদ্ধাস্পদেষু :—

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সংসারে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহাতে মানুষের কৃতিত্ব কতটুকু দেখিতে পাওয়া যায়? সম্ভবতঃ আমার পূর্ব্ব-পত্রে বর্ণিত "নন্দলালের" জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া আপনার মনে এই প্রশ্ন উদিত

হইয়াছে। দার্শনিকের ভাষায় আপনার প্রশ্নের মর্ম্ম এই ঃ—দৈব ও পুরুষকার ইহাদের মধ্যে কে বলবান্? সাদা কথায়, মানুষ স্বাধীন কি না, ও স্বেচ্ছা দ্বারা নিজের জীবনগতি চালিত বা নিয়মিত করিতে পারে কি না? এই free-will বা স্বাধীন ইচ্ছা লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভিতরও বিস্তর তর্ক-বিতর্ক আছে। এ সকল দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা করা আমার সাধ্যাতীত, তবে ঘটনা যেরূপ শিক্ষা প্রদান করে, তাহাতে সময়ে সময়ে মনে হয়, কথিত free-will বা স্বাধীন ইচ্ছা একটা বস্তুহীন নাম মাত্র। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন,—"খোঁটায় বাঁধা গরু যতদূর ঘুরে ফিরে, মনে করে স্বাধীন, কিন্তু দড়ি যতটুকু লম্বা, তার বাহিরে তার যাবার যো নেই।" ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথাই বলেন নাই কি? "নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্।" ঘটনার অনুকূল স্রোতে মানুষ যখন পাল তুলিয়া যায়, তখন মনে করে সে বড় বাহাদুর; কিন্তু নৌকা বানচাল হইতে একটু সামান্য ঝট্‌কার প্রয়োজন। আপনি কি দেখেন নাই, কি অতি তুচ্ছ কারণে কত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে? অশ্ব, গজ, মন্ত্রী প্রভৃতি পূর্ণ বল বিদ্যমান থাকিতে, কত রাজা একটা নগণ্য বড়ের কিস্তিতে মাত হইয়া যায়। স্বাধীন ইচ্ছা ত দূরের কথা, আমি তো দেখি, মানুষের স্বাধীন চিন্তারও অধিকার নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদসৎ, সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব মানবের অন্তরে নিরন্তর চলিতেছে বটে, কিন্তু জয়-পরাজয় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সম্ভাবিত হয়—পুরুষকার দ্বারায় নয়। এই জন্যই 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।' আমার মামার বাড়ীতে দিগম্বর বলিয়া একজন সরকার ছিল, সময়ে সময়ে সে আমাদের বাড়ীতে আসিত। কখন না কখন আপনি তাহাকে দেখিয়া থাকিবেন। তাহার উপর আমার মাতামহের অগাধ বিশ্বাস ছিল, পঁচিশ, ত্রিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কখন কখন তাহার কাছে গচ্ছিত থাকিত। কখনও সিকি পয়সার তঞ্চক হয় নাই। কিন্তু একদিন দিগম্বর পাঁচশত টাকার লোভ সামলাইতে না পারিয়া নোট চুরি করিয়া পলায়ন করে। টাকার জন্য নহে, স্নেহবশতঃই মাতামহ তাহার অনেক খোঁজ করাইলেন। তাহার দেশে ও আত্মীয়-স্বজনের স্থানে, যেখানে যেখানে তাহার থাকা সম্ভব ছিল, সকল স্থানেই খোঁজ হইল, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। তিন সপ্তাহ

পরে, একদিন সে আপনি আসিয়া উপস্থিত। পায়ে জুতা নাই, গায়ে চাদর নাই, একখানা ময়লা কাপড় পরা, দেহ অনাহার-শুষ্ক, রুক্ষকেশ, যেন পাগলের মত—আসিয়াই পাঁচশত টাকার নোট মাতামহের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া, পা জড়াইয়া ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। ক্ষমা চাহিল; মাতামহ সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু দিগম্বরকে চাকুরীতে আর রাখিতে পারিলেন না। মাতামহ কত বুঝাইলেন, দিগম্বর বলিতে লাগিল, "আমার নিজের উপর আর আমার বিশ্বাস নাই।" বলুন দেখি দিগম্বর নোট চুরিই বা কেন করিল, ফিরাইয়াই বা কেন দিল,—দুর্ম্মতিই বা কে দিল, সুমতিই বা কেন হইল? আর একটী ঘটনা বলিব:—

আপনার কাপ্তেনকে মনে আছে কি?—সেই যে ছোকরা দিনকতক এক অভিনেত্রীর কুহকে পড়িয়াছিল। আপনি বোধ করি জানেন না, ইহার পিতা অনেককে মজাইয়া কিছু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন কাপ্তেনের বয়স আন্দাজ পনের ষোল বৎসর। পিতা খুব হিসাবী লোক ছিলেন, বিষয়-সম্পত্তি উইল করিয়া দুই জন অছি নিযুক্ত করিয়া যান—এটর্ণি যোগেশপ্রসাদ ও আমার পিতা। আমার পিতা অছি ছিলেন বলিয়া আমি কাপ্তেন সম্বন্ধে সকল ঘটনা বিশেষ অবগত। অছি হইতে আমার পিতার বড় ইচ্ছা ছিল না। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ছাড়া অন্য কাজকর্ম্ম তিনি বড় কিছু দেখিতেন না, আর দেখিবারও তাদৃশ সুযোগ হইত না, কেননা, তিনি তখন অধিকাংশ সময়ই বর্দ্ধমানে থাকিতেন। সম্পত্তি ও কাপ্তেনের বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতেন এটর্ণি মহাশয়। সম্পত্তি-সংক্রান্ত দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি যোগেশ বাবুর আফিসে সুরক্ষিত ছিল। এইরূপে দিন যায়, কাপ্তেনও ক্রমে বড় হইতে লাগিল। কুক্ষণে সে একদিন থিয়েটার দেখিতে গেল, সেই সময় হইতে সে কথিত অভিনেত্রীর কুহকে পড়ে। এটর্ণি যোগেশ যে দিন এই কথা শুনিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি কাপ্তেনকে নিত্য দুই এক ঘণ্টা করিয়া লেক্‌চার দিতে আরম্ভ করিলেন। ভারত, পুরাণ, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি নৈতিক গ্রন্থ হইতে এটর্ণি বাবু খুঁজিয়া খুঁজিয়া, বাছিয়া বাছিয়া সচ্চরিত্রতার উদাহরণ বাহির করিতেন এবং কাপ্তেনকে শুনাইতেন। ইহাতে কাপ্তেনের জীবন ক্রমে বিষময় হইয়া

উঠিল। একদিকে তাহার চরিত্র-সংশোধনের জন্য এটর্ণি বাবুর যেমন উদ্যম, অন্যদিকে তাঁহাকে অছির অধিকার হইতে সরাইবার জন্য কাপ্তেনের তেমনি আগ্রহ। এমন কি, ছুতা পাইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেও প্রস্তুত। ছুতা পাইতেও অধিক বিলম্ব হইল না।

এটর্ণি যোগেশের পসার বড় বেশী ছিল না। সুতরাং আফিসের আড়ম্বরও তেমন বেশী নহে। দুই তিনটী মাত্র কর্ম্মচারী, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ উমাশঙ্কর অনেক দিনের লোক। এটর্ণি বাবু নিজে লোক বড় মন্দ ছিলেন না, আয় অল্প হইলেও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। সেই সময়ে তূলার খেলা লইয়া কলিকাতা উন্মত্তপ্রায়। এটর্ণি বাবুও খেলিতে আরম্ভ করিলেন। কখনও কিছু লাভ হয়, কখনও লোকসান, তবে লোকসানের মাত্রাটা বেশী। বৃদ্ধ উমাশঙ্কর একদিন তাঁহাকে খতাইয়া দেখাইয়া দিলেন যে, মোটের উপর তাঁহার আট হাজার টাকা লোকসান দাঁড়াইয়াছে। ঠিক সেই সময়ে এটর্ণি বাবুর খেলার এক সঙ্গী আসিয়া বলিল, 'আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, আজ নম্বর আসিবে ছয়, এই ছয়ের দর আমি দেখিয়া আসিয়াছি আজ নয় টাকা, ছয় নম্বরে হাজার টাকা ধরিলে নয় হাজার টাকা আসিবে।' এই খেলার সঙ্গীর কথা ২।৪ দিন সত্যও হইয়াছে, যোগেশ লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। উমাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্যাশে কিছু টাকা আছে ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "হাজার টাকা আছে, কিন্তু সে টাকা ত খরচ করা যায় না, রায় কিশোরীপ্রসাদের টাকা, কৌঁসুলির ফির জন্য জমা দিয়া গিয়াছে,—পরশু তার মকদ্দমা, পরশু সকালে কৌঁসুলিকে সে ফি দিলে তবে তিনি দাঁড়াইবেন।"

এটর্ণি বাবু বলিলেন, "সে জন্য ভাবনা নেই, তুমি টাকাটা নিয়ে এস, নেহাত যদি লোকসান হয়, কাল যেমন করে পারি হাজার টাকা যোগাড় করে পরশু কৌঁসুলির ফি দেব।"

উমাশঙ্কর তথাপি বলিলেন,—"মক্কেলের টাকা যদি কোনরূপে যোগাড় করিতে না পারা যায়, পসার মাটী এবং অপমান হইবার সম্ভাবনা।"

কিন্তু যোগেশ কোন কথাই শুনিলেন না। মক্কেলের হাজার টাকা

লইয়া খেলিতে গেলেন এবং লোকসানও হইল। যোগেশ হতাশ হইয়া খেলার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে?"

সঙ্গী চারিদিক চাহিয়া বলিল, "তাইতো!"

"আমি যে তোমার কথায় মক্কেলের টাকা ভাঙ্গলুম—"

সঙ্গী বলিল, "তাইতো—"

বুদ্ধিমান এটর্ণি বুঝিলেন, ইহার 'তাইতো'র বেশী আর কিছু বলিবার নাই। তখনই মক্কেলের টাকার যোগাড় করিতে বাহির হইলেন। কিন্তু টাকা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, বন্ধক না দিলে কেহ টাকা দিতে চাহে না। পরিবারের অলঙ্কার প্রায় সমস্তই আবদ্ধ—বাধা দিবেন কি? যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, পরিবার তাহা দিতে চাহে না। জীবনে কখন কখন এমন সঙ্কটের সময় উপস্থিত হয় যে, মানুষের হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান থাকে না। কাপ্তেনের পিতা যোগেশের নিকট যে সকল দলিল-পত্রাদি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি বাছিয়া লইয়া এক গদিতে বন্ধক দিয়া, যোগেশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। কেঁপুলির ফি দেওয়া হইল। এটর্ণি বাবু আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু দলীল খালাস করিবার উপায় নাই। এ দিকে উমাশঙ্করের কন্যাদায়, পাত্রপক্ষকে হাজার টাকা নগদ দিতে হইবে। যোগেশ শুনিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তুমি তো ভারি স্বার্থপর!" "স্বার্থপর!"—উমাশঙ্কর এতদিন চাকুরী করিতেছেন, মনিবের মুখে এরূপ দুর্ব্বাক্য কখনও শোনেন নাই। খুব দক্ষ লোক, হাতে দুই দশটা মক্কেলও আছে জানিয়া অন্যান্য এটর্ণি তাঁহাকে চাকুরী দিবার জন্য সাধা-সাধি করিয়াছে—কেহ কেহ দুশো পাঁচশো বোনাস দিতেও চাহিয়াছে—কিন্তু প্রভুভক্ত উমাশঙ্কর যোগেশকে ত্যাগ করিয়া যাইতে রাজী হন নাই। অন্য আশ্রয়ে যাইলে, হয় তো কন্যাদায়ের জন্য আজ তাঁহাকে ভাবিতে হইত না, তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইত, দুই দশ টাকা উপরিও পাইতেন। কিন্তু পুরাতন প্রভুর মায়ায় তিনি স্বার্থের দিকে একবারও চাহিয়া দেখেন নাই। সেই প্রভু বলিতেছেন,—"স্বার্থপর"! উমাশঙ্করের দারুণ অভিমান হইল, ক্রোধও হইল। সন্ধ্যার পর গোপনে কাপ্তেনের কাছে আসিয়া উপস্থিত। কাপ্তেন তখন সেই কুহকিনীর আকর্ষণে ছুটিতেছিল, উমাশঙ্করের দর্শনমাত্রেই

চটিয়া লাল ;—বলিল, "তুমি সেই যোগেশ বাবুর লোক না ? তোমার কোন কথা এখন আমি শুনিতে পারিব না।"

উমাশঙ্কর। শুনিলে বাবুজীর বিশেষ সন্তোষের কারণ হইতে পারে।

কাপ্তেন। তবে শীঘ্র বলিয়া ফেল।

উমা। গোপনে বলিব।

"আঃ, ভাল ছিনে জোঁক!" বলিতে বলিতে কাপ্তেন একটী ঘরে গিয়া বসিল। উমাশঙ্করও আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আমার কন্যাদায়।"

"আঃ, তবে তো আমি হাতে স্বর্গ পেলুম," বলিয়া কাপ্তেন উঠিতে যায়, এমন সময়ে উমাশঙ্কর আবার বলিলেন, "আমি ভিক্ষা করিতে আসি নাই।"

কা। তবে কি, আমার মাথা কিন্‌তে এসেছ ?

উমাশঙ্কর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এটর্ণি যোগেশ বাবুকে জব্দ করিতে পারিলে বাবুজী বোধ করি বিশেষ সন্তুষ্ট হন ?"

কা। সন্তুষ্ট তো হই, কিন্তু কি উপায়ে ?

উ। আমি এমন উপায় বলিয়া দিতে পারি, যে শুধু জব্দ কেন, এটর্ণি বাবুর জেল পর্য্যন্ত হইতে পারে।

অতীব আগ্রহসহকারে বাবুজী বলিলেন, "বল কি, বল কি ? তা হলে তো ভারি চমৎকার হয়, জেলে বসিয়া খুব সচ্চরিত্রতার লেক্‌চার দেবেন। এখন কি বল্‌তে এসেছ বল।"

"আজ্ঞে বলেছি তো, আমার কন্যাদায়, পাত্রপক্ষকে হাজার টাকা দিতে হবে।"

"ওঃ—বুঝেছি ; আমি তোমায় সেই হাজার টাকা দিলে তুমি উপায় বলে দিবে। দেখ, যা রয় সয়, এমন কথা বল্‌তে হয়, দুশো, একশো হয় পারি, হাজার টাকা হবে না।"

"যে আজ্ঞে,—" বলিয়া উমাশঙ্কর উঠিল। কাপ্তেন বলিল, "যাও কোথা ?"

উমা। বাসায়।

কাপ্তেন ভাবিতে লাগিল—উমাশঙ্কর তখন সিঁড়িতে নামিতেছে।—আবার ডাকিয়া বলিল, "তোমাকে হাজার টাকাই দিব, কি উপায় বল দেখি ?" কাপ্তেনের সম্পত্তি-সংক্রান্ত দলীল বন্ধক দিবার কথা উমাশঙ্কর সমস্ত

বিবৃত করিলেন, বন্ধকী লেখাপড়াও দেখাইলেন। কাপ্তেন বুঝিল, এটর্ণিকে শিক্ষা দিবার অমোঘ উপায় সে হাতে পাইয়াছে। হাজার টাকা লইয়া উমাশঙ্কর বাসায় ফিরিলেন। কাপ্তেন জরুরী তার করিয়া বর্দ্ধমান হইতে বাবাকে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করিল। বাবা পরদিন কলিকাতায় আসিলেন এবং কাপ্তেনের নিকট সকল বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, "চল সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ ও দলীলাদি চেক করিবার জন্য যোগেশের আফিসে যাই।"

এই দুই জনকে এক সঙ্গে আফিসে আসিতে দেখিয়া এটর্ণি বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বন্ধকী দলীল তখনও খালাস করিয়া আনিতে পারেন নাই, কিন্তু বুকে সাহস বাঁধিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন সময় কলিকাতায় ?"

বাবা। সময় পাই নাই বলিয়া অনেক দিন আসিতে পারি নাই—আজ একটু অবসর আছে, অছির কর্ত্তব্য পালন করা ত আবশ্যক, নহিলে জবাবদিহি করিব কিরূপে ? আজ হিসাব ও দলীল চেক্ করিব বলিয়া আসিয়াছি।

এটর্ণি। আজ আমার কোর্টে একটু বিশেষ কাজ ছিল, কালকে করিলে হয় না ?

বাবা। না, কাল আর সময় পাইব না, আজই কাজটা সারিয়া যাই।

এটর্ণি। বেশ, ভাল কথা।

উমাশঙ্করকে ডাকিয়া হিসাব-নিকাশ দেখা হইল। তার পর বাবা উমাশঙ্করকে দলীল পরীক্ষা করিবার জন্য লোহার সিন্দুকের চাবী আনিতে বলিলেন। পাণ্ডুমুখে এটর্ণি বাবু নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। উমাশঙ্কর চাবী আনিয়া একে একে তালিকার সঙ্গে সকল দলীল মিলাইয়া দিলেন এবং বাবার সহি করাইয়া লইলেন। সে সময় যদি পরলোক হইতে কাপ্তেনের বৃদ্ধ পিতা আসিয়া দলীল দেখিতে বসিতেন, এটর্ণি বাবু অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। কাপ্তেনের যে দলীল তিনি বন্ধক দিয়াছিলেন, কোন অলৌকিক উপায়ে সেগুলি লোহার সিন্দুকে ফিরিয়া আসিয়াছে। আর কাপ্তেন এমন ভাবে উমাশঙ্করকে দেখিতে লাগিল যে, যদি তার চক্ষু বন্দুক এবং রোষকষায়িত কটাক্ষ গুলির আকার ধারণ করিত, তাহা হইলে উমাশঙ্কর ইহ-জীবনের মত কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। বাবা হিসাব-নিকাশ, দলীল চেক

করিয়া, সহি করিয়া দিয়া সেই দিনই বর্দ্ধমান রওনা হইলেন। আর সেই দিনই সন্ধ্যার পর কাপ্তেন দরওয়ান পাঠাইয়া, উমাশঙ্করকে ধরিয়া আনিল। উমাশঙ্কর সেই ঘরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কাপ্তেন নীরবে খানিকক্ষণ তাঁহাকে দেখিল, তার পর বলিল, "ওঃ, তোমার তো আচ্ছা সাহস—এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ?" উমাশঙ্কর বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবুজী অনুমতি না করিলে বসি কেমন করিয়া"—বলিয়াই বসিয়া পড়িলেন।

কা। তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেচ—

উমা। কি মিথ্যা?

কা। তুমি আমার কাছে বলিয়াছিলে, এটর্ণি বাবু আমায় না ব'লে দলীল বন্ধক দিয়েছেন!

উমা। আজ্ঞে, সত্যই তিনি বন্ধক দিয়েছিলেন।

কা। এখনও বল্‌ছো, তিনি সত্যি বন্ধক দিয়েছিলেন?

উমা। আজ্ঞে সত্য সকল সময়েই সত্য, এখন তখন কি—

কা। তবে এরি মধ্যে লোহার সিন্দুকে ফিরে এল কেমন ক'রে?

উমা। আমিই এনে রেখেছিলুম, বাবুজী। বাবুজী, কাল যখন এই ঘৃণিত কার্য্যে আপনার সহায়তা করবো ব'লে আমি স্বীকৃত হই, আপনার কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়ে আমার অন্নদাতার সর্ব্বনাশ করবো ব'লে আপনার কাছে প্রতিশ্রুত হয়ে যাই, তখন একজন প্রবল অন্তরায়ের কথা ভাবিনি। দোহাই ধর্ম্ম! দোহাই জগদীশ্বর! আমি বাসায় ফিরে গিয়ে শয়নের পূর্ব্বক্ষণ অবধি স্থিরসংকল্প ছিলুম—শয়নের পর একজনের তাড়নায় আমার সকল সংকল্প ভঙ্গ হলো।

সাগ্রহে কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল,—"কে সে? তোমার পরিবার বুঝি?"

উমা। না বাবু, তিনি আমার স্ত্রী নন, প্রণয়িনী নন—কিন্তু গুপ্তভাবে আমার নিভৃত অন্দর-মহলে বাস করেন। তিনি আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সকলের চেয়ে আপনার। তাঁকে কিছুই গোপন করবার যো নেই। তাঁর সম্মতি না পেলে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। তাঁর তাড়নায় সমস্ত রাত আমার নিদ্রা হয় নাই। তিনি সমস্ত রাতই আমায় বলেছেন, 'ছি ছি—তোমার অন্নদাতার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে মহাপাপে নিমগ্ন হয়ো না।' তাঁরই

উত্তেজনায় প্রত্যূষেই আমি দলীল খালাস ক'রে এনে গোপনে লোহার সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলুম।

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কে ?"

উমা। তিনি আমার অন্তরাত্মা !

কাপ্তেন। অন্তরাত্মা তো আর দলীল খালাস কর্‌বার জন্য টাকা দেননি !

উমা। বাবুজী, টাকা তো আপনিই দিয়েছিলেন।

বাবুজী বুঝিলেন, তাঁহার অর্থে তাঁহার শত্রুর অপকার সাধিত হওয়া দূরের কথা, উপকারই হইয়াছে। কাপ্তেনের অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল :—"নিকালো হিঁয়াসে !"

এখন বলুন দেখি, উমাশঙ্করকে দুর্ব্বুদ্ধিই বা কে দিল—সুবুদ্ধিই বা কে দিল ? ঘটনাটী একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয় না কি—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"

ভবদীয়
শ্রী---

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

বাগবাজার, কলিকাতা।
৬ই জুলাই, ১৮৯০।

প্রিয়—

তোমাদের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শুনিতে পাই, আলমোড়া এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, তথাপি তোমার জ্বর হইয়াছে ; আশা করি, ম্যালেরিয়া নহে। —র নামে যা লিখিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে যে তিব্বতে যাহা তাহা খাইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। * * আর টাকা তোলার কথা লিখিয়াছ—সে ব্যাপারটা এই—তাহাকে মাঝে মাঝে উদাসী বাবা নামে এক ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করিতে এবং তাহার রোজ বার আনা, এক টাকা করিয়া ফলাহার যোগাইতে হইত। — বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ব্যক্তি একজন পাকা মিথ্যাবাদী, কারণ, সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত প্রথম যায়, তখনই সে

তাহাকে বলিয়াছিল যে, হিমালয়ে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। আর — এই সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস এবং স্থান না দেখিতে পাইয়া তাহাকে পুরাদস্তুর মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিল। তা— ইহার সাক্ষী। বাবাজীর চরিত্র সম্বন্ধেও সে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ পাইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার এবং তা—র সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইতেই সে উদাসীর উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল এবং এই জন্যই উদাসী প্রভুর এত রাগ। আর পাণ্ডারা—সে পাজীগুলা একেবারে পশু ; তুমি তাহাদের একটুকুও বিশ্বাস করিও না।

আমি দেখিতেছি যে, — এখনও সেই আগেকার মত কোমল-প্রকৃতির শিশুটীই আছে, এই সদা ভ্রমণের ফলে তাহার ছট্‌ফটে ভাবটা একটু কমিয়াছে ; কিন্তু আমাদের এবং আমাদের প্রভুর প্রতি তাহার ভালবাসা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।—নির্ভীক, সাহসী, অকপট এবং দৃঢ়নিষ্ঠ।

শুধু এমন একজন লোক চাই, যাহাকে সে আপনা হইতে ভক্তিভাবে মানিয়া চলিবে, তাহা হইলেই সে একজন অতি চমৎকার লোক হইয়া দাঁড়াইবে।

আমার দেশে আসিবার অথবা গাজীপুর পরিত্যাগ করিবারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কা—র পীড়ার সংবাদে আমাকে কাশী আসিতে হইল এবং ব—র আকস্মিক মৃত্যু আমায় কলিকাতা টানিয়া আনিল। দেখিতেছ, তাহারা দুই জনেই ইহলোক হইতে চলিয়া গেল। — মঠের খরচ চালাইতেছেন এবং আপাততঃ ভালয় ভালয় দিন গুজরান হইয়া যাইতেছে। আমি শীঘ্রই (অর্থাৎ ভাড়ার টাকাটা যোগাড় হইলেই) আলমোড়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া খুব একচোট বসিয়া যাইবার ইচ্ছা, এবং — আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি।

আমার মনে হয়, তোমাদের কলিকাতা আসিবার জন্য অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে, কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা এ পর্য্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটী তোমাদের করা উচিত ছিল, সেইটীই কর নাই, অর্থাৎ কম্মর বাঁধো এবং বেঠ্ যাও। আমার মতে জ্ঞান

জিনিসটা মনে করিলেই হয় না। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন যুগেই দুই চারিজনের অধিক লোক জ্ঞানলাভ করে না, এবং সেই হেতু আমাদের ক্রমাগত এ বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকা এবং অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত; তাহাতে মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার। এই আমার পুরাণ চাল, জানই ত। আর আজকালকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের যে ধারণা, তাহা যে ঠকবাজী, তাহার আমি বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছি। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাক এবং বীর্য্যবান্ হও। — রা—র সঙ্গে বৃন্দাবনে আছে—সোনা প্রভৃতি তয়ারি করিতে শিখিয়াছে, আর একজন পাকা জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে, বা— লিখিতেছে। ভগবান্ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তোমরাও বল শান্তিঃ! শান্তিঃ!

আমি এখন একরকম ভালই আছি, আর গাজীপুর হইতে যে সকল কাজ করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা শেষ করিতে কিছুকাল লাগিবে। সেই আগেও যেরূপ বোধ হইত, আমি এখানে যেন কতকটা ভীমরুলের চাকের মধ্যে রহিয়াছি। এক দৌড়ে ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এবার আর পওহারী ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। একেবারে উপরে যাইতেছি। ওখানে জল হাওয়া কিরূপ লাগিতেছে? শীঘ্র লিখিও। সা—, বিশেষ করিয়া তোমার আসিয়া কাজ নাই। একটা জায়গায় সকলে মিলিয়া গুলতোন করায় আর আত্মোন্নতির মাথা খাওয়ায় কি ফল? মূর্খ ভবঘুরে হইও না,— উহা ভাল বটে, কিন্তু বীরের মত অগ্রসর হও। "নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ" ইত্যাদি। ভাল কথা, তোমার আগুনে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা হইল কেন? যদি দেখ যে, হিমালয়ে সাধনা হইতেছে না, আর কোথাও যাও না।

এই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছ, ইহাতে তুমি যে নামিয়া আসিবার জন্য উতলা হইয়াছ, শুধু মনের এই দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। শক্তিমান্, উঠ এবং বীর্য্যবান্ হও। ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও, বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হও। অলমিতি।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল, শুধু বা—র একটু জ্বর হইয়াছে।

তোমাদেরই

বিবেকানন্দ।

(৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত)

(ইংরাজীর অনুবাদ).

৩৯ নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট,

লণ্ডন দক্ষিণ-পশ্চিম।

মহাশয়—

পুস্তিকাগুলি ও গীতাখানি পাঠানর জন্য বহু ধন্যবাদ।

ভবদীয়—বিবেকানন্দ।

(৺প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত)

আলমোড়া।

৩০ মে, ১৮৯৭।

সুহৃদ্বরেষু—

শুনিতেছি, অপরিহার্য্য সাংসারিক দুঃখ আপনার উপর পড়িয়াছে। আপনি জ্ঞানবান্, দুঃখ কি করিতে পারে? তথাপি ব্যবহারিকে বন্ধু-জন-কর্ত্তব্যবোধে এ কথার উল্লেখ। অপিচ, ঐ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন করে। কিয়ৎকালের জন্য যেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্য-সূর্য্যের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্দ্ধেক বন্ধন খুলিয়া যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ়—লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষাও অধিক; তাও যেন একটু শ্লথ হইয়া পড়ে। মন যেন অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পায় যে, লোকের কথা মতামত অপেক্ষা অন্তর্য্যামী প্রভুর কথা শুনাই ভাল। আবার মেঘ ঢাকে, এই ত মায়া। যদিও বহুদিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পত্রাদি ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত হই। মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এক গীতার অনুবাদ ইংলণ্ডে আমায় প্রেরণ করেন। তাহার মলাটে এক ছত্র ভবৎ হস্ত-লিপি মাত্র ছিল। শুনিলাম, তাহার উত্তর-পত্রে অতি অল্প কথা থাকায় মহাশয়ের মনে আপনার প্রতি আমার অনুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে।

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরাজি গীতার মলাটে ঐ এক ছত্র মাত্র আপনার হস্তলিপি দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই, তখন পড়িবার অবকাশ কি হইবে? দ্বিতীয়তঃ,

শুনিলাম, গৌরচর্ম্মবিশিষ্ট হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়তঃ, আমি ম্লেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা তা খাই, যার তার সঙ্গে খাই,—প্রকাশ্যে সেখানে এবং এখানে। তা ছাড়া মতেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত—এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তাহারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—ঐ সকল ব্যক্তিবিশেষের নাম ঈশ্বর, যদি হয় ত বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্ত্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।

ঐ প্রকার ঈশ্বর জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা, ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র—রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ, ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ। রামানুজ শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে প্রীতি নাই—পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই—শুষ্ক পণ্ডিতাই—আর আপনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব!! তাহা কি হয় মহাশয়? কখনও হইয়াছে, না হইবে? "আমির" লেশ মাত্র থাকিতে কি কিছু হইবে?

অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহা ভেদকরী ও মায়ার মূল—জন্মগত বা গুণগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক—বাহিরে, ব্যবহারিকে, জাতি আদি রাখিতে হইবে বৈকি। * * * মনে মনে অভেদবুদ্ধি (পেটে পেটে যার নাম বুঝি), আর বাহিরে পিশাচ-নৃত্য—অত্যাচার-উৎপীড়ন—গরীবের যম, আর চণ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্ম্মের রক্ষক!!!

তাহাতে আমি পড়িয়া শুনিয়া দেখিতেছি যে, ধর্ম্মকর্ম্ম শূদ্রের জন্য নহে, সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদির বিচার করে ত তাহাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শূদ্র, ম্লেচ্ছ—আমার আর ও সব হাঙ্গামে কাজ কি? আমার ম্লেচ্ছের অন্নে বা কি, আর হাড়ীর অন্নে বা কি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়—

ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি তাঁহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।

আর এক কথা বুঝিয়াছি যে, পরোপকারই ধর্ম্ম, বাকি যাগ-যজ্ঞ সব পাগলাম—নিজের মুক্তি ইচ্ছাও অন্যায়—যে পরের জন্য সব দিয়াছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা "আমার মুক্তি" "আমার মুক্তি" করিয়া দিন-রাত মাথা ভাবায়, তাহারা "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই পাঁচ রকম ভাবিয়া মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় নাই। এ সব সত্ত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব—ইতি

দাস—

বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষকার্য্য।

আমাদের ৭ই আগষ্টের রিপোর্টে, আমরা সহৃদয় জনসাধারণকে শিলচর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় বন্যার বিষম প্রকোপের কথা জানাইয়াছি। এই তিন সপ্তাহে অবস্থা একটুও ভাল হয় নাই। সুতরাং এই অঞ্চলে আমাদের কার্য্য আপাততঃ অল্পপরিমাণে আরম্ভ হইলেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন নূতন গ্রাম পরিদর্শন করা হইতেছে, এবং প্রয়োজন বুঝিলে, তথায় সাহায্য দান করা হইতেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অধিকাংশ জমী এখনও জলের নীচে। এ জল দু-এক মাসে নিকাশ হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই অঞ্চলে সাহায্য-কার্য্য এখনও অনেক দিন ধরিয়া চালাইতে হইবে। আবার চতুর্দ্দিক্ জলময় বলিয়া আমাদের কার্য্যেরও কতকটা অসুবিধা হইয়াছে, কারণ, কোথায় স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইবে, তাহা স্থির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। আমাদের কুঠী, আখাউড়া, দেবগ্রাম ও গঙ্গাসাগরের কেন্দ্রগুলি কিছু দিন সাময়িক সাহায্য দিবার পর বন্ধ করা হইয়াছে। বন্যা-পীড়িত স্থানে এরূপ সাময়িক সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ছয়টী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, তাহাদের নাম—নাসিরনগর, সুলতানপুর, সুইলপুর, অষ্টগ্রাম, গোকর্ণ ও ভোলাকট। শিলচর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং বিটঘরে আমাদের যে তিনটী পুরাতন কেন্দ্র ছিল, তাহা লইয়া বর্ত্তমানে সর্ব্বসমেত নয়টী কেন্দ্র। শিলচরে বীজধান বিতরণ করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিপন্ন মধ্যবিত্ত লোকদিগকে ও বিধবাগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা হইতেছে। সকল কেন্দ্র হইতে প্রয়োজনমত বস্ত্রও বিতরিত হইয়াছে। নিম্নে চাউল বিতরণের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
গঙ্গাসাগর	১৬	১১০	১৫২	মণ ৭॥৪
ঐ (পর সপ্তাহে)	১৫	১১১	১৩৮	৬৸৬
সুলতানপুর	৬	২৭	৫৩	২॥৬
ঐ (পর সপ্তাহে)	১২	১৪৭	২৮২	১৪৴৪
সুইলপুর	১০	১৬৯	২৬৮	১৩।৬
ঐ (পর সপ্তাহে)	২০	২৬৮	৫৩৪	২৬॥৮
নাসিরনগর	৮	৮২	১৫৫	৭৸০
ঐ (পর সপ্তাহে)	১৫	২০৬	৩৮৩	২০৴০
বিটঘর	৮	৪২	৫২	২॥২
ঐ (পর সপ্তাহে)	১২	৮৭	১৪৮	৭।৬
ঐ	১৬	১২৯	২১৯	১২৸৫
অষ্টগ্রাম	৮	১১৯	১৭৪	৮॥৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৮	২০৪	২৯১	১৪৸৪
ঐ (পর সপ্তাহে)	৩০	২৩২	৩৯৪	২৯॥৮
গোকর্ণ	৭	৪৮	৮০	৪৴০
ভোলাকট	১০	১১২	২০৫	১০।০
ঐ (পর সপ্তাহে)	১৩	১৩৯	২২৮	১২॥৮
শিলচর	২৫	১৯৮	৪৮০	২৪৴০
ঐ (পর সপ্তাহে)	৫৩	৪৫৬	১১৪৭	৫৭।৪

এতদ্ভিন্ন সকল কেন্দ্র হইতে ৫৫॥৪ সের চাউল সাময়িক সাহায্যরূপে বিতরিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা সহৃদয় দেশবাসিগণকে আর একটী দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিতে চাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলার অধিবাসিগণ অন্নাভাবে শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদিগের সত্বর সাহায্য করা প্রয়োজন। তাহারা নিরক্ষর বলিয়া সংবাদ-পত্রে তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে পারে নাই; সুতরাং জনসাধারণের দৃষ্টিও তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। দু-এক দিনের মধ্যেই আমাদের সেবকগণ বালেশ্বর জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিতে যাইবেন। আমরা যথাসময়ে তাঁহাদের রিপোর্ট সাধারণ-সমক্ষে উপস্থিত করিব।

বাঁকুড়াতে দুর্ভিক্ষের প্রবল সূচনা দেখা যাইতেছে। আমাদের বন্ধুগণ তথায় অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং ৭।৮ দিনে অল্প পরিমাণে সাহায্যদান আরম্ভ করিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে কার্য্য-পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিব এবং অর্থসাহায্য করিব।

আমাদের সম্মুখে গুরুতর কার্য্য রহিয়াছে। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি। দানধর্ম্ম ভারত-বাসীর চিরন্তন সম্পত্তি। আমাদের বিশ্বাস, দরিদ্র বুভুক্ষু নারায়ণগণের সেবাকল্পে আমাদের কখনও অর্থের অভাব হইবে না। দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যিনি যাহা দান করিবেন, অর্থ হউক অথবা নূতন বা পুরাতন বস্ত্র হউক, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে তাহা সাদরে গ্রহণ ও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।—(১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ, জেলা হাবড়া; (২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

নিবেদক,

৩০শে আগষ্ট। সারদানন্দ।

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন

মিশনের দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকার।

১৬ই আগষ্ট হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

মাঃ শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র ঘোষ, বালি ২০৲
" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল, কলিকাতা ৫৲
" " শচীন্দ্রনাথ বসু, মহিষাদল ৪॥৵
" " গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কনকদিয়া ১৲
" " জানকীপ্রসাদ আইচ, আসানসোল ২৫৲
" " কামিনীকুমার সেন গুপ্ত, ধানবাদ ৩৫৲
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ২৫৲
রামকৃষ্ণ সেবক-সমিতি, রেঙ্গুন ২৪০৲
শ্রীযুক্ত এস্, সি, কর, ডোমার ৫০৲
" পি, সি, সরকার, কলিকাতা ১
শ্রীমতী মনোরমা ঘোষ, বাজিতপুর ১
" হেমাঙ্গিনী বসু, "
" মৃণালিনী দাস "
" জ্ঞানদাসুন্দরী দাস "
জনৈক বিধবা ভগ্নী "
জনৈক বিধবা "
জনৈক ভগ্নী "
দরিদ্র-ভাণ্ডার-সম্পাদক "
মাঃ শ্রীযুক্ত এস, এন, সেন, রেঙ্গুন ৎ
মাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার, মহেশপুর ২।০
শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ, কলিকাতা ১৲
জলঢাকা ছাত্রবৃন্দ ৮৲
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখার্জ্জি, কোন্নগর ১৲
মাঃ শ্রীবসন্তকুমার চাটার্জ্জি, কলিকাতা ৫
মাঃ শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী, কলিকাতা ৪॥০
জনৈক বন্ধু ৫৲
মাঃ শ্রী এন্, সি, সরকার, টঙ্গু ২৫৲
" " নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অভয়পুর ১৬৲
" " যোগেশচন্দ্র মজুমদার, ঢাকা ১০৲

শ্রী পি, কে, চাটার্জ্জি, ভবানীপুর ১০৲
বগুড়ার ছাত্রবৃন্দ ২০
মাঃ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দে, খেরনাজানি ১।৵
" " কামিনীকুমার সেন গুপ্ত, ধানবাদ ৩০৲
" " সুরেন্দ্রলাল দাস, পুষা ১৫৲
" " জানকীনাথ ঘোষাল, আরাঃ
শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ ঘোষাল, আর, বি ৭৲
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, আর, এস ২৲
" পঙ্কজকুমার চাটার্জ্জি ২৲
" রামানুজ চক্রবর্ত্তী ১৲
" ফণীন্দ্রমোহন চাটার্জ্জি, তমলুক ১০
মাঃ শ্রীযুক্ত হেমলাল ঘোষ, সাতক্ষীরা ১০৲
" " শীতলদাস রায় নিশ্চিন্দিপুর ১০৲
ডাঃ সি, সি, দত্ত, আমতা ১০৲
মাঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, রাণীগঞ্জ ৫।৵০
ছাত্রভাণ্ডার, রাইগঞ্জ ১০৲
" " নিবারণচন্দ্র ঘটক, সিয়ারসোল ১৲
শ্রীযুত এম, এল্, চাটার্জ্জি, মান্দালয় ৩০৲
জামাডোবা কোলিয়ারীর কর্ম্মচারিবৃন্দ ১০৲
মাঃ শ্রীমতী সরোজিনী গুপ্তা, শিলং ১০৲
" শ্রীযুত কালীপদ রায়, রাধানগর ৫৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, কটক ৫৲
শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ, রঙ্গপুর ৫৲
" বৈকুণ্ঠকান্ত রায়, বল্লা রতনগঞ্জ ১৲
" তুষ্টচন্দ্র অম্বল, খড়দহ ২৲
জর্জ্জ ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রবৃন্দ, বৈদ্যপুর ৪০৲
মহামায়া ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রবৃন্দ, সিঙ্গুর ১০৲
শ্রীমতী সত্যবালা ঘোষ, কিশোরগঞ্জ ১০৲
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত কাঞ্জিলাল, ধল্লা ১০৲
" ডি, এন্, সান্ন্যাল, কাথিরাড়ি ৫৸৵০

ভ্রম সংশোধনঃ—গত মাসের উদ্বোধনের ৫২৮ পৃষ্ঠায় শ্রীযুত মনোমোহন দেব, ময়মনসিংহ ১০৲ এই লাইনটী উঠিয়া যাইবে।

শ্রীযুত এস, কে, ঘোষ, ঢাকা ১৲
হাওড়ার উকীলবৃন্দ ৩৫৲
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের কর্ম্মচারিবৃন্দ ৯১।৶৫
বি, এন্, রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ ১২৮৲
কার্কউড বার লাইব্রেরী, ময়মনসিং ২৫
রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, তমলুক ২৫৲
মাঃ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন গুপ্ত, ধানবাদ ২৫৲
„ „ সুরেন্দ্রনাথ সাহা, কাটিহার ১৫॥৹
হিতকরী সভা, দুল্লাপতিপুর ১২৲
শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সোরভোগ ৫৲
„ শিবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলফামারি ২৲
মাঃ শ্রীযুক্ত রামদাস ঘটক, সাঁইথিয়া—
মিঃ টেলার ১৲
„ এইচ, পি, টমসেট ১৲
„ জি, ডবলিউ ম্যাকমিল্যান ৫
„ এ, জি, জাজ, গা ১৲
শ্রীযুত হৃষীকেশ গাঙ্গুলী ১
„ বিভূতিভূষণ রায় ১৲
„ কালীকান্ত মজুমদার ১৲
„ নগেন্দ্রনাথ নায়ক ১৲
„ পি. চ্যাটার্জ্জি ১৲
„ কালীকিশোর সরকার ১৲
„ গণেন্দ্রমোহন গুপ্ত ১৲
„ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲
„ বগলাচন্দ্র ঘোষ ১৲
„ লালজি রাম ১৲
জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ১৲
মিঃ ফুলার টাং ২
„ সি, বেসেট ২৲
„ আর, ডি, চ্যাটার্জ্জি ১
মধুপুর এডোয়ার্ড জর্জ্জ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ২৩৲
জ্যোৎশ্রীরাম সেবাশ্রম, বর্দ্ধমান ৫
শ্রীযুত রমানাথ দত্ত, কলিকাতা ১॥৹
টঙ্গুর অধিবাসিগণ ১৫৲
মাঃ শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেন, মিনবু ১২৶৹
মেসার্স এইচ, ডি, কার্টরাইট এণ্ড কোংর দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ ১১।৹

মাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ ১।৹
শ্রীযুক্ত এস, এন্, চট্টোপাধ্যায়, পুটকু ১
রায় বি, এন, সেন বাহাদুর, বহরমপুর ৫৹
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যান্ত, আলিগড় ১০০৲
শিবপুর এইচ, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ৫৪
সিঙ্গুর মহামায়া ইনষ্টিঃ ছাত্রবৃন্দ ১০৲
শ্রীযুক্ত প্রভাচন্দ্র সিংহ, আরা ১০
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীঘাট ৫৲
„ তারকভূষণ চক্রবর্ত্তীর পুত্রকন্যারা, গাণ্ডারিয়া ২।৹
যমুনা,খগেন এবং গিরিবালা,মুলাজোড় ১৮৹
মাঃ শ্রীযুত এস, বি নিয়োগী, রেঙ্গুন ২৫১
বি, এম ইনষ্টিটিউনের ছাত্রবৃন্দ, ভাণ্ডারহাটি ২৫৲
মাঃ শ্রীযুত কামিনীকুমার সেন গুপ্ত, ধানবাদ ২৫৲
মাঃ শ্রীমতী সুনীতি দেবী, প্যাপন্ :—
শ্রীমতী শৈবলিনী দেবী „ ১০৲
„ মৃণালিনী দেবী „ ১৲
„ জাহ্নবী দেবী „ ১৲
„ হিমাংশুবালা দেবী „ ১৲
„ অনুপমা সিংহ „ ৩৲
„ কাদম্বিনী ঘোষ „ ১৲
„ চপলাময়ী দেবী „ ১৲
„ সরলা বসু „ ১৲
„ সুনীতি দেবী „ ৭৲
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রাহা „ ১৲
„ রেবতীরমণ সেন „ ১৲
„ গিরিধারী দে, বালুরঘাট ১০৲
জনৈক ভক্ত ৫৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র, ভাটা ৫৲
„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাঁইথিয়া ৩৲
দিনেশ এবং সরযূ, খলিসাবাগ ১৲
শ্রীযুক্ত কে, ব্যানার্জ্জি, নাগরাঘাটা ৩৲
„ ভগবান্দাস মিশ্র, কলিকাতা ২০৲
কোদারমার বাঙ্গালী অধিবাসিগণ ২৭৲
মাঃ শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বসু, হাসিমারা ২৬।৶৹

মাঃ শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার, কলিকাতা ৬৸/০
বোরুইখালী ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ৫।৵০
করোনেশন স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, বগুড়া ৫৲
শ্রীযুক্ত এন্, কে, গুপ্ত, আওয়াড়ি ৪৲
,, মহাবীর মাহাতো, মাদাপুর ১৲
রংপুরের অধিবাসিগণ ৫০৲
বেলগাম এবং পার্ব্বতীপুরের জমিদারঃ ২০৲
বার লাইব্রেরী, বনগ্রাম ১৬৲
রামকৃষ্ণ সেবক-সম্প্রদায়, কটক ১০৲
শ্রীপান্নালাল সিং, রংপুর ৫৲
,, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কটক ৫৲
মিসেস রাজা বাহাদুর, পাতিয়ালা ৫৲
শ্রীমতী শরৎকামিনী দাসী, ভাগলপুর ৪৲
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দেব গুপ্ত, শিলচর ২৲
,, জিতেন্দ্রনাথ বসু, রসুলপুর ১৲
চরিত্রগঠন সমিতি, কলমা ১৲
নিষ্কাম কর্ম্মমঠ, হিঙ্গিবুদরক ৫৲
শ্রীযুত কে, সাহা, হনুমান নগর ১৲
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লাহা, কলিকাতা ১৲
,, ভীম নায়েক, বরাহনগর মিল ৫৲
,, আর, বি সালমের ,, ১০৲
,, প্রসাদচন্দ্র মণ্ডল ,, ২৲
,, চুণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ,, ২৲
,, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ,, ২৲
,, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ,, ১৲
,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ,, ১৲
,, তিনকড়ি হাজরা ,, ১৲
,, হরিচরণ গুঁই ,, ১৲
,, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ,, ১৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র পাল ,, ১৲
জনৈক ভদ্রলোক ,, ৫৲
জনৈক ভদ্রলোক, কলিকাতা ২৲
মাঃ শ্রীযুত বিজয়বিহারী মুখার্জ্জি, মেদিনীপুর ৪০৲
শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র গুহ, স্যাণ্ডওয়ে ১৫৲
মাঃ ননীভূষণ ব্যানার্জ্জি, দাঁতন ২৸০
শ্রীযোগেশচন্দ্র কর, কুড়িগ্রাম ২৲

শ্রীঅসকৃৎচন্দ্র চৌধুরী, বড়পলাসন ২৲
মাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুহ, কলিকাতা—
শ্রীযুক্ত রতিকান্ত রায় ,, ১৲
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মল্লিক ,, ১৲
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দত্ত ,, ১৲
জ্যোৎশ্রীরাম সেবাশ্রম ৯৲
মাঃ শ্রীমনোমোহন ব্যানার্জ্জি, ঢাকা ৫৲
মাঃ শ্রীকুসুমকুমার মিত্র, বেণীপুর ৩।৵০
জনৈক দরিদ্র ভদ্রমহিলা, কলিকাতা ২৲
শ্রীশ্যামাপদ ব্যানার্জ্জি, খিদিরপুর ১৲
মাঃ শ্রীযুক্ত সি, এল, চাটার্জ্জি, ল্যাসিও ২৩৲
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখার্জ্জি, কোন্নগর ২৲
,, ভূতনাথ ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ২৲
,, হরিচরণ দাস, কলিকাতা ৫৲
,, চারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ৫
ডাঃ এইচ, এন্, সামন্ত, হাওড়া ৫৲
মাঃ ডাঃ নৃত্যলাল মুখার্জ্জি, গয়া ১৮৸/০
মাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র আকুটি, নোয়াখালি ১২৸/০
মাঃ প্রেফেসর এস, সি গুপ্ত, কুচবিহার ১২।৶০
শ্রীমতী ইন্দুবালা সরকার, পাগজিরা ১০৲
মডেল ইনস্টিটিউসন, কাঁথি ১০৲
ই, বি, এফ, আর, ফণ্ড, আসানসোল ৮৶০
শ্রীবসন্তকুমার চাটার্জ্জি, কালীঘাট ৫৲
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, রাজানগর ৫৲
মাঃ শ্রীমনোমোহন ব্যানার্জ্জি, রয়াল ৫৲
,, শ্রীযুক্ত এ, চাটার্জ্জি, বাগাহা ৫৲
শ্রীপ্রবোধপ্রকাশ রায়, টিটাগড় ২৲
,, নারায়ণচন্দ্র মল্লিক, ডিমলা ২৲
,, নন্দলাল গোপ, ডেকলিয়া ১৲
মাঃ শ্রীযুত বি, সি, বিশ্বাস, খিদিরপুর ১৭৲
,, ,, এস, সি, ঘোষ, কাউকনারিট ৫০৲
শ্রীমতী সরলা দেবী, নওগাঁ ২৲
মেসার্স এম, সি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, রিসড়া ১০৲
মাঃ নলিনীকান্ত কাঞ্জিলাল, ধল্লা ১৫৲
জনৈক ভদ্রমহিলা, কিশোরগঞ্জ ১০৲
শ্রীঅভয়চন্দ্র দত্ত, ময়মনসিং ১০৲
মাঃ শ্রীচন্দ্রকুমার মজুমদার, শিলং ১০৲

মাঃ শ্রীঅনুপম রায়, কলিকাতা ১০৲
মাঃ শ্রীমতী কমলা মুখার্জ্জি, দামো ৫৲
শ্রীযুক্ত টি, বেঙ্কট রাও, রাজোল ৫৲
শ্রীঠাকুরলাল মল্লিক, কলিকাতা ৪৲
মাঃ শ্রীনলিনচন্দ্র মিশ্র, বালি ২০৲
ছাত্রবৃন্দ এবং আমেরিকান বায়স্কোপ কোং রংপুর ৫৫৲
শ্রীমনোমোহন দত্ত, লাক্ষা ৫৲
শ্রীযুক্ত এম, শ্রীনিশান, শিয়ালি ৫৲
,, সত্যচন্দ্র বসু, নাগপুর ২৲
মাঃ শ্রীকামিনীকুমার সেন গুপ্ত, ধানবাদ ৪০৲
খুচরা আদায় ১২৸৴০

১৬ই আগষ্ট হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণ ২০৲
মাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সান্যাল, সেক্রেটারিয়েট রাচি ।/০
মাঃ প্রফেসার এস্, সি, গুপ্ত, কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ, ১১৮৲
সেক্রেটারী, আলিপুর বার লাইব্রেরী ১১৬৸০
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মাইতি, কলিকাতা ৫৲
,, এস, ঘোষ ,, ২৲
মাঃ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখার্জ্জি, কুচবিহার ১৫০৲
শ্রীমতী গৌরীমণি দাসী, কলিকাতা ৽৲
শ্রীযুক্ত মিশিরলাল পাঠক, গণ্টকবাজার
,, রামশঙ্কর সুকুল, ধিতপুর ১৲
,, গোকুলচন্দ্র ঘোষ, বহরমপুর ২৲
,, তেজচন্দ্র বসু, কলিকাতা ৫৲
,, রামলাল দাস ,, ১৲
মাঃ ম্যানেজার, হিতবাদী ১০০৲
মাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের কর্ম্মচারিগণ, কলিকাতা ২২৸০
শ্রীযুক্ত পি, সি, বসু, ইথোরা ১৫৲
ইমার মঠ, পুরী ৫০৲
শ্রীযুক্ত রাজশ্রী গোপালকৃষ্ণ আচার্য্য, পুরী ৫৲
রাণী যোগমায়া, পুরী ৪৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, পুরী
মর্টন ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ ৫০৲
শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা ২৫৲
শাঁখারিটোলা অর্চ্চনালয়, কলিকাতা ২০৲
শ্রীমতী হেমন্তনলিনী দাসী, কলিকাতা ৯৲
শ্রীমতী নীহারনলিনী দাসী, কলিকাতা ১৲
,, প্রতিমা দাসী ,, ১৲
,, নলিনীবালা দাসী ,, ১৲
,, রাধারাণী দাসী ,, ৫৲
শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, কলিকাতা ৪
,, শ্যামাদাস কবিরত্ন ,, ২৫৲
ব্যাটরা অনাথবন্ধু সমিতি ২০
রায়বাগানের জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১০০
শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়, ইটালী ১১
শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ মজুমদার ,, ১০
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ,, ১০
,, রামরাখাল ঘোষ ,, ৫৲
,, ললিতমোহন ঘোষ ,, ১৲
যুবক-সমিতি, পানাম ৫
বাঁশগড়া এইচ, ই, স্কুল ৫০৲
পুঁটিয়া এইচ, ই, স্কুল ৫৲
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গাঙ্গুলী, কলিকাতা ২৲
বঙ্গবাসী কলেজ দুর্ভিক্ষভাণ্ডার
মাঃ শ্রীনলিনীকান্ত সেনগুপ্ত ৪১।৴০
আরবিট্রারী ক্লাবের সদস্যগণ, কলিকাতা ৫৲
জনৈক বন্ধু ,, ৫৲
মিঃ ওয়াগ, বম্বে ১০৲
পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষ ক্লেশ নিবারণী সমিতি, কলিকাতা ১০০০৲
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, পাউণ্ডগে ৫০৲
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ,, ১২০৸০
ডাঃ এস, এন, সেন, কানপুর ৩৸০
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পারাজ ৫৲
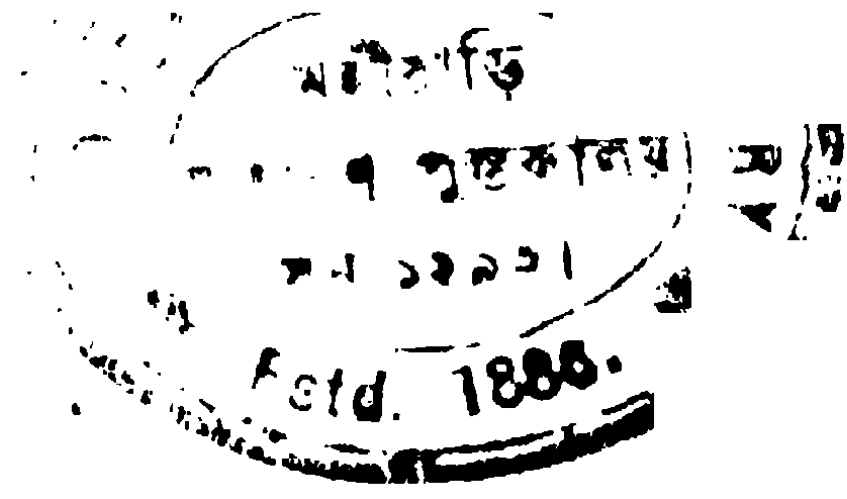
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়।

(২)

(স্বামী সারদানন্দ)

জ্ঞানার্জ্জনের ন্যায় ব্যায়াম অভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে অশেষ অনুরাগ ছিল। পিতা তাঁহাকে শৈশবে একটি ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি অশ্বচালনায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন জিম্‌ন্যাষ্টিক্, কুস্তি, মুদ্গর হেলন, যষ্টিক্রীড়া, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা শারীরিক বলের উৎকর্ষ-সাধন করে, প্রায় সেই সকলেই তিনি অল্পবিস্তর পারদর্শী হইয়াছিলেন। শ্রীযুত নবগোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তখন তখন পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা-সকলে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের পারদর্শিতার পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক পারিতোষিক প্রদান করা হইত। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ কখন কখন উক্ত পরীক্ষা-প্রদানেও অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বয়স্যপ্রীতি ও অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত। ছাত্রজীবনে এবং পরে, তাঁহাকে দলপতি ও নেতৃত্ব-পদে আরূঢ় করাইতে ঐ গুণদ্বয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সাত, আট বৎসর বয়সকালে একদিন তিনি বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতার দক্ষিণে মেটেবুরুজ নামক স্থলে লক্ষ্ণৌ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব নবাব ওয়াজিদ্‌আলি সাহেবের পশুশালা সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। বালকগণ আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া চাঁদপাল ঘাট হইতে একখানি টাপুরে ডিঙ্গী যাতায়াতের জন্য ভাড়া করিয়াছিল। ফিরিবার কালে তাহাদিগের একজন অসুস্থ হইয়া নৌকামধ্যে বমন করিয়া ফেলিল। মুসলমান মাঝি তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া চাঁদপাল ঘাটে নৌকা লাগাইবার পরে তাহাদিগকে বলিল, নৌকা পরিষ্কার

করিয়া না দিলে তাহাদিগের কাহাকেও নামিতে দিবে না। বালকেরা তাহাকে অপরের দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইতে বলিয়া উহার নিমিত্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে চাহিলেও সে উহাতে সম্মত হইল না। তখন বচসা উপস্থিত হইয়া ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায়, ঘাটে যত নৌকার মাঝি ছিল সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বালকগণ উহাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মাঝিদিগের সহিত বচসার গোলযোগে তিনি পাশ কাটাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন। নিতান্ত বালক দেখিয়া মাঝিরা তাঁহার ঐ কার্য্যে বাধা দিল না। তীরে দাঁড়াইয়া ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইতেছে দেখিয়া তিনি এখন বয়স্যবর্গকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দুই জন ইংরাজ সৈনিকপুরুষ ময়দানে বায়ুসেবনের জন্য অনতিদূরে রাস্তা দিয়া গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের হস্তধারণ করিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও, দুই চারিটি কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা যথাসম্ভব বুঝাইতে বুঝাইতে ঘটনাস্থলে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শন অল্পবয়স্ক বালকের ঐরূপ কার্য্যে সদাশয় সৈনিকদ্বয়ের হৃদয় মুগ্ধ হইল। তাঁহারা অবিলম্বে নৌকাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন এবং হস্তাস্থিত বেত্র উঠাইয়া বালকদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মাঝিকে আদেশ করিলেন। পল্টনের গোরা দেখিয়া মাঝিরা ভয়ে যে যাহার নৌকায় সরিয়া পড়িল এবং নরেন্দ্রনাথের বয়স্যবর্গও অব্যাহতি পাইল। নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে সৈনিকদ্বয় সে দিন তাঁহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে থিয়েটার দেখিতে যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত না হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবনের অন্যান্য ঘটনাও নরেন্দ্রনাথের অশেষ সাহসের পরিচয় প্রদান করে। ঐরূপ দুই একটির এখানে উল্লেখ করা প্রসঙ্গ-বিরুদ্ধ হইবে না। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যে বৎসর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্-

রূপে ভারত পরিভ্রমণে আগমন করেন, সেই বৎসর নরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দশ, বার বৎসর ছিল। বৃটিশরাজের 'সিরাপিস' নামক একখানি বৃহৎ রণতরী ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং আদেশপত্র গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতার বহু ব্যক্তি ঐ তরীর অভ্যন্তর দেখিতে গিয়াছিল। বালক নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত উঁহা দেখিতে অভিলাষী হইয়া আদেশপত্র পাইবার আশায় একখানি আবেদন লিখিয়া চৌরঙ্গীর আফিসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বাররক্ষক বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন আবেদন-কারীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। তখন অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে তিনি, যাঁহারা ভিতরে যাইয়া আদেশপত্র লইয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত আফিসের ত্রিতলের এক বারাণ্ডায় গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ঐখানেই সাহেব আবেদন গ্রহণপূর্ব্বক আদেশপত্র দিতেছেন। তখন ঐ স্থানে গমন করিবার অন্য কোন পথ আছে কি না, অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, উক্ত বারাণ্ডার পশ্চাতের ঘরে সাহেবের পরিচারকদিগের যাইবার জন্য বাটীর অন্যদিকে একপার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত লৌহময় সোপান রহিয়াছে। কেহ দেখিতে পাইলে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তদবলম্বনে ত্রিতলে উঠিয়া যাইলেন এবং সাহেবের গৃহের ভিতর দিয়া বারাণ্ডায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, সাহেবের চারিদিকে আবেদনকারীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং সাহেব সম্মুখস্থ টেবিলে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত আদেশপত্রসকলে সহি করিয়া যাইতেছেন। তিনি তখন সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং যথাকালে আদেশপত্র পাইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া অন্য সকলের ন্যায় সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া আফিসের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

সিমলা-পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য তখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপরে একটি জিম্‌ন্যাষ্টিকের আখ্‌ড়া ছিল। হিন্দুমেলা-প্রবর্ত্তক শ্রীযুত নবগোপাল মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটীর অতি সন্নিকটে থাকায় নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য আগমনপূর্ব্বক

ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক, মিত্রগণের সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহাদিগের উপরেই তিনি আখ্ড়ার কার্য্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখ্ড়ায় একদিন একটি ট্রাপিজ (দোল্না) খাটাইবার জন্য বালকেরা অশেষ চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুময় ফ্রেম্ খাঁড়া করিতে পারিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য্য দেখিতে রাস্তার লোকের ভিড় হইয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান্ ইংরাজ সেলার্‌কে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। সেও তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া বালকদিগের সহিত যোগদান করিল। তখন দড়ি বাঁধিয়া বালকেরা ট্রাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উত্তোলন করিতে লাগিল এবং সাহেব উহার পদদ্বয় গর্ত্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। ঐরূপে কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে, এমন সময়ে দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের দারুময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্য ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধিরস্রাব হইতেছে দেখিয়া, তখন সকলে তাহাকে মৃত স্থির করিয়া পুলিস-হাঙ্গামার ভয়ে যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। কেবল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের বস্ত্র ছিন্ন ও আর্দ্র করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জলসেচন ও ব্যজন করিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাহেবের চৈতন্য হইলে, তাহাকে ধরাধরি করিয়া সম্মুখস্থ ট্রেনিং একাডেমি নামক স্কুল-গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া শয়ন করাইয়া, নবগোপাল বাবুকে শীঘ্র একজন ডাক্তার লইয়া আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নহে, এক সপ্তাহের শুশ্রূষায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে সাহেব ঐ কালের মধ্যেই সুস্থ হইল। তখন পল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তির নিকটে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক সাহেবকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া নরেন্দ্রনাথ

বিদায় করিলেন। ঐরূপে বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত নরেন্দ্র সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহার উক্ত নিষ্ঠা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, 'মিথ্যা কথা হইবে বলিয়া ছেলেদের পর্য্যন্ত কখনও জুজুর ভয় দেখাই নাই, এবং বাটীতে কেহ ঐরূপ করিতেছে দেখিলে তাহাকে বিষম তিরস্কার করিতাম। ইংরাজী পড়িয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে বাচনিক সত্যনিষ্ঠা তখন এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল।'

সুদৃঢ় শরীর, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অদ্ভুত মেধা ও পবিত্রতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিয়ত সদানন্দে থাকিতে দেখা যাইত। ব্যায়াম, সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্যশিক্ষা, বয়স্যবর্গের সহিত নির্দ্দোষ রঙ্গ-পরিহাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই তিনি নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতেন। বাহিরের লোকে তাঁহার ঐরূপ আনন্দের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে তাঁহার চরিত্রে দোষকল্পনা করিয়া বসিত। তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ কিন্তু লোকের প্রশংসা বা নিন্দায় কখনও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। লোকের অযথা নিন্দাবাদকে অপ্রমাণিত করিতে তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয় কখনও নিজ মস্তক নত করিত না।

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা নরেন্দ্রনাথের আজীবন স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার শৈশবকালে বাটীতে ভিক্ষুক আসিয়া বস্ত্র, তৈজসাদি যাহা চাহিত, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া বসিতেন। বাটীর লোকেরা উহা জানিতে পারিয়া বালককে তিরস্কার করিতেন এবং ভিক্ষুককে পয়সা দিয়া ঐ সকল ছাড়াইয়া লইতেন। কয়েকবার ঐরূপ হওয়ায় মাতা একদিন বালক নরেন্দ্রকে বাটীর দ্বিতলে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জনৈক ভিক্ষুক ঐ সময়ে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় বালক গবাক্ষ দিয়া তাঁহার মাতার কয়েকখানি উত্তম বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া বসিয়াছিল।

মাতা বলিতেন, 'শৈশবকাল হইতে নরেন্দ্রের একটা বড় দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কখনও তাহার ক্রোধ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সে যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইত এবং বাটীর আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছ্‌নছ করিত। পুত্রকামনায় কাশীধামে ৺বীরেশ্বরের নিকট বিশেষ মানত্

করিয়াছিলাম। ৺ বীরেশ্বর বোধ হয় তাঁহার একটা ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! না হইলে ক্রোধ হইলে সে অমন ভূতের মত অশান্ত ব্যবহার করে কেন?' বালকের ঐরূপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ঔষধও বাহির করিয়াছিলেন। যখন দেখিতেন, তাহাকে কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, তখন ৺ বীরেশ্বরকে স্মরণ করিয়া শীতল জল দুই এক ঘড়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিতেন। বালকের ক্রোধ উহাতে এককালে প্রশমিত হইত! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথ একদিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে আসিয়া আর কিছু না হউক্, ক্রোধটা তাঁহার (ঈশ্বরের) কৃপায় আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইলে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতাম এবং পরে উহার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতাম। এখন কেহ নিষ্কারণে প্রহার করিলে অথবা নিতান্ত অপকার করিলেও তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় না।"

মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের সমসমান উৎকর্ষপ্রাপ্তি সংসারে বিরল লোকের সম্বন্ধে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহাদের ঐরূপ হয় তাঁহারাই মনুষ্য-সমাজে কোন না কোন বিষয়ে নিজ মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। আবার, আধ্যাত্মিক জগতে যাঁহারা নিজ অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়া যান, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সহিত কল্পনাশক্তির প্রবৃদ্ধও বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথের জীবনালোচনায় পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতা এক সময়ে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অধিককাল তথায় থাকিতে হইবে বুঝিয়া নিজ পরিবারবর্গকে তিনি কিছুকাল পরে ঐ স্থানে আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার ভার ঐকালে নরেন্দ্রনাথের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রের বয়স তখন চৌদ্দ, পনর বৎসর মাত্র ছিল। ভারতের মধ্যপ্রদেশে তখন রেল হয় নাই, সুতরাং রায়পুরে যাইতে হইলে শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একপক্ষেরও অধিককাল গোযানে করিয়া যাইতে হইত। ঐরূপে অশেষ শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হইলেও নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, বনস্থলীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে উক্ত কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই

তাঁহার মনে হয় নাই এবং অযাচিত হইয়াও যিনি ধরিত্রীকে ঐরূপ অনুপম বেশভূষায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অসীম শক্তি ও অনন্ত প্রেমের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, 'বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐ কালে যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মৃতির পত্রে চিরকালের জন্য দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নতশীর্ষ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ দিয়া সে দিন আমাদিগকে যাইতে হইতেছিল। পথের দুই পার্শ্বেই গিরিশৃঙ্গসকল গগন স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান; নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা ফল-পুষ্প-সম্ভারে অবনত হইয়া পর্ব্বত-পৃষ্ঠের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে; মধুর কাকলিতে দিক্ পূর্ণ করিয়া নানাবর্ণের বিহগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন অথবা আহার অন্বেষণে কখন কখন ভূমিতে অবতরণ করিতেছে—ঐ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর-গতিতে চলিতে চলিতে গোযানসকল ক্রমে ক্রমে এমন এক স্থলে উপস্থিত হইল যেখানে পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, একপার্শ্বের পর্ব্বতগাত্রে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাট রহিয়াছে এবং ঐ অন্তরালকে পূর্ণ করিয়া মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শন-স্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে! তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন এমন একটা অনন্তের ভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্যসংজ্ঞার এককালে লোপ হইল! কতক্ষণ ঐ ভাবে গোযানে পড়িয়া ছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছি। গোযানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।' প্রবল কল্পনা-সহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম।

নরেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদানপূর্ব্বক আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বহুশাখায় বিভক্ত সিমলার দত্ত-পরিবারেরা

কলিকাতার প্রাচীন বংশসকলের মধ্যে অন্যতম ছিল। ধনে, মানে এবং বিদ্যাগৌরবে উহা মধ্যবিৎ কায়স্থ গৃহস্থদিগের অগ্রণী ছিল। নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ শ্রীযুত রামমোহন দত্ত ওকালতী করিয়া বেশ উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন এবং বহুগোষ্ঠী-পরিবৃত হইয়া সিমলার গৌরমোহন মুখার্জ্জির লেনস্থ নিজ ভবনে সসম্মানে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র দুর্গাচরণ পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও স্বল্পবয়সে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। শুনা যায়, বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাধু-সন্ন্যাসিভক্ত ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি তাঁহাকে সংস্কৃত শিখিয়া শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া স্বল্পকালেই সুপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহ করিলেও দুর্গাচরণের সংসারে আসক্তি ছিল না। নিজ উদ্যানে সাধুসঙ্গেই তাঁহার অনেক কাল অতিবাহিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতামহ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার স্বল্পকাল পরেই চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও বিধাতার নির্ব্বন্ধে শ্রীযুত দুর্গাচরণ নিজ সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয়বর্গের সহিত দুইবার স্বল্পকালের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ যখন দুই তিন বৎসরের হইবে, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয়বর্গ, বোধ হয় তাঁহারই অন্বেষণে ৺কাশীধামে আগমনপূর্ব্বক কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। রেলপথ না থাকায় সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা তখন নৌকাযোগেই কাশীতে আসিতেন। দুর্গাচরণের সহধর্ম্মিণীও ঐরূপ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে শিশু বিশ্বনাথ এক স্থানে নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার মাতাই উহা সর্ব্বাগ্রে দর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। অশেষ চেষ্টার পরে সংজ্ঞাশূন্য মাতাকে জলগর্ভ হইতে নৌকায় উঠাইতে যাইয়া দেখা গেল, তিনি নিজ সন্তানের হস্ত তখনও দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঐরূপে মাতার অপার স্নেহই সেইবার বিশ্বনাথের প্রাণরক্ষার হেতু হইয়াছিল।

কাশী পৌঁছিবার পরে শ্রীযুত দুর্গাচরণের সহধর্ম্মিণী নিত্য ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে গমন করিতেন। বৃষ্টি হইয়া পথ পিচ্ছিল হওয়ায় একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে তিনি সহসা পড়িয়া যাইলেন। ঐস্থান দিয়া গমন করিতে করিতে জনৈক

সন্ন্যাসী উহা দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সযত্নে উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে মন্দিরের সোপানে বসাইয়া, শরীরের কোন স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে কি না, পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু চারিচক্ষের মিলন হইবামাত্র দুর্গাচরণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন এবং সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ দ্বিতীয়বার তাঁহার দিকে না দেখিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শাস্ত্রে বিধি আছে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পরে সন্ন্যাসী ব্যক্তি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' নিজ জন্মভূমি সন্দর্শন করিবেন। শ্রীযুত দুর্গাচরণ ঐ জন্য দ্বাদশ বৎসর পরে একবার কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক জনৈক পূর্ব্ববন্ধুর ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন— যাহাতে তাঁহার আগমনবার্ত্তা তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে প্রচারিত না হয়। সংসারী বন্ধু সন্ন্যাসী দুর্গাচরণের ঐ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে তাঁহার আত্মীয়দিগকে ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহারা সদলবলে আসিয়া একপ্রকার জোর করিয়া শ্রীযুত দুর্গাচরণকে বাটীতে লইয়া যাইলেন। দুর্গাচরণ ঐরূপে বাটীতে যাইলেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া গৃহমধ্যে এক কোণে বসিয়া রহিলেন। শুনা যায়, একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র তিনি ঐরূপে একাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন দেখা গেল, সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ সকলের অলক্ষ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত দুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ বয়োবৃদ্ধির সহিত পার্সি ও ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভপূর্ব্বক কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি হইয়াছিলেন। তিনি দানশীল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং বেশ উপার্জ্জন করিলেও কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃধর্ম্ম পুত্রে অনুগত হইয়াই বোধ হয় তাঁহাকে সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী হইতে দেয় নাই। বাস্তবিক, অনেক বিষয়েই বিশ্বনাথের স্বভাব সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ছিল না। তিনি কল্যকার ভাবনায়

কখন ব্যস্ত হইতেন না, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন, স্নেহপরায়ণ হইলেও বিদেশে দূরে অবস্থানকালে অনেকদিন পর্য্যন্ত আত্মীয়-পরিজনের কিছুমাত্র সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন—ঐরূপ অনেক বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন। সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতা সুকণ্ঠ ছিলেন এবং রীতিমত শিক্ষা না করিয়াও নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি সুন্দর গাহিতে পারিতেন। সঙ্গীতচর্চ্চাকে নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়া ধারণা ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথকে বিদ্যার্জ্জনের সহিত সঙ্গীত শিখিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী ও বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাত-ভিখারীসকলের ভজনগান একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াই সুর-তাল-লয়ের সহিত সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

খৃষ্টান পুরাণ বাইবেল পাঠে এবং ফার্সি-কবি হাফেজের বয়েৎ সকল আবৃত্তি করিতে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথের বিশেষ প্রীতি ছিল। মহামহিম ঈশার পুণ্য-চরিতের দুই এক অধ্যায় তাঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল, এবং উহার ও হাফেজের প্রেমগর্ভ কবিতাসকলের কিছু কিছু তিনি নিজ স্ত্রী-পুত্রাদিকে কখন কখন শ্রবণ করাইতেন। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্ণৌ লাহোর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানসকলে কিছু কাল বাস করিয়া তিনি মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহারের কিছু কিছুর প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিত্য পলান্ন ভোজন করার প্রথা বোধ হয় ঐরূপেই তাঁহার পরিবারমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ একদিকে যেমন ধীর-গম্ভীর ছিলেন, আবার তেমনি রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। পুত্রকন্যার মধ্যে কেহ কখন অন্যায় আচরণ করিলে, তিনি তাহাকে কঠোর বাক্যে শাসন না করিয়া তাহার ঐরূপ আচরণের কথা তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এমনভাবে প্রচার করাইয়া দিতেন, যাহাতে সে আপনিই লজ্জিত হইয়া আর কখনও ঐরূপ করিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ একদিন কোন বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে

দুই একটি কটু কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজন্য কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া, যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বয়স্যবর্গের সহিত উঠা-বসা করিতেন, তাঁহার দ্বারের উপরিভাগে একখণ্ড কয়লা দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—'নরেন্দ্র বাবু তাঁহার মাতাকে অদ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন।' নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বয়স্যবর্গ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িত এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত নিজ অপরাধের জন্য বিষম সঙ্কোচ অনুভব করিতেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়কে প্রতিপালন করিতেন। অন্নদানে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দূরসম্পর্কীয় কেহ কেহ তাঁহার অন্নে জীবনধারণ করিয়া আলস্যে কাল কাটাইত, কেহ কেহ আবার নেশা-ভাঙ্গ খাইয়া জীবনের অবসাদ দূর করিত। নরেন্দ্রনাথ বড় হইয়া ঐ সকল অযোগ্য ব্যক্তিকে দানের জন্য পিতাকে অনেক সময় অনুযোগ করিতেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাহাতে বলিতেন, 'মনুষ্যজীবন যে কতদূর দুঃখময়, তাহা তুই এখন কি বুঝিবি? যখন বুঝিতে পারিবি, তখন ঐ দুঃখের হস্ত হইতে ক্ষণিক মুক্তির জন্য যাহারা নেশা-ভাঙ্গ করে, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখিতে পারিবি!'

বিশ্বনাথের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা হইয়াছিল। তাহারা সকলেই অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিল। কন্যাগুলির অনেকেই কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভ করে নাই। তিন চারি কন্যার পরে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হওয়ায় তিনি পিতা-মাতার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে নরেন্দ্রনাথ যখন বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা সহসা হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা এককালে নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের মাতা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র সুরূপা এবং দেবভক্তিপরায়ণা ছিলেন না, কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমতী এবং কার্য্যকুশলা ছিলেন। তাঁহার পতির সুবৃহৎ সংসারের সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। শুনা যায়, তিনি অবলীলা-ক্রমে উহার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া বয়নাদি শিল্পকার্য্য সম্পন্ন করিবার মত

নিজ অবসর করিয়া লইতেন। রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ভিন্ন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর না হইলেও, নিজ স্বামী ও পুত্রাদির নিকট হইতে তিনি অনেক বিষয় মুখে মুখে এমন শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথা কহিলে তাঁহাকে শিক্ষিতা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। একবারমাত্র শুনিয়াই তিনি কোন বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং বহুপূর্ব্বের কথা ও বিষয়সকল তাঁহার কল্য সংঘটিত ব্যাপারসকলের ন্যায় স্মরণ থাকিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে দারিদ্র্যে পতিতা হইয়া তাঁহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তখন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষণ্ণ দেখা যাইত না। ঐ স্বল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সকল বন্দোবস্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে, লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক ব্যয় অনেক অধিক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক, পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী তখন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিতা হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। সংসার-নির্ব্বাহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই—অথচ তাঁহার সুখপালিতা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্র-সকলের ভরণপোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে—তাঁহার পতির সহায়ে যে সকল আত্মীয়গণ বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সাহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া তাঁহার ন্যায্য অধিকারসকলেরও লোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প—তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্ম্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—ঐরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী যেরূপ ধীরস্থিরভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার স্বতঃই উদয় হয়। ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনায় আমা-দিগকে পরে পাঠকের সম্মুখে তাঁহার এই কালের পারিবারিক অভাব প্রভৃতির

কথার উত্থাপন করিতে হইবে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয় বিবৃত করিতে আর অধিকদুর দূর অগ্রসর না হইয়া, আমরা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার আগমনের কথা এখন পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হই।

(ক্রমশঃ)

খৃষ্টান নীতি ও শক্তিবাদ।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

হে পার্থ, ক্লীবভাব প্রাপ্ত হইও না, তোমার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।

এই শ্লোকে গীতার সূচনা, এবং সমস্ত গীতার এই শ্লোকই ভিত্তি-স্বরূপ।

•

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থল ও অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভকালীন রণস্থলের দৃশ্য আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে প্রতিভাসিত হয়। জীবন-শঙ্কা-লেশমাত্রশূন্য, আত্মবীর্য্য-প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর অথচ সংযত, রণপণ্ডিত সৈন্যাধ্যক্ষগণ দ্বারা সুপরিচালিত, ইঙ্গিতমাত্রে যুদ্ধোদ্যমের অপেক্ষায় প্রস্তুত, অশ্ব গজ ও রথশ্রেণী দ্বারা নানা আকারে ব্যূহবদ্ধ—যতদূর দৃষ্টি চলে, উভয় পক্ষের সাগর-তরঙ্গের ন্যায় অপরিমেয় সৈন্যবাহিনী। এইরূপ উভয় সৈন্যদলের মধ্যবর্ত্তী শ্বেত-অশ্ববাহিত রথে স্বজননাশের আশঙ্কায় বিকলচিত্ত, বিষণ্ণবদন, শস্ত্রগ্রহণে শিথিলহস্ত, বীরশ্রেষ্ঠ মহারথী অর্জ্জুন, ও তাঁহার এক হস্তে রথরজ্জু, অপর হস্তে পাঞ্চজন্য-শঙ্খধারী সারথি, অর্জ্জুনের চিত্ত-বৈকল্য অপনোদনার্থে উৎসাহ-প্রদানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিত্র গীতা-পাঠকের নয়নের সম্মুখে যেন

উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়। আজ ইউরোপে এই যে ভীষণ সমর—যেরূপ রণতাণ্ডব ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ—ইহা আমাদের প্রাচীন ভারতের সেই মহাযুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইউরোপের এই মহাযুদ্ধেও স্বজনে স্বজনে, এমন কি, ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধার্থে পরস্পরকে সম্মুখীন হইতে হইতেছে। যে দুটি প্রবল জাতিকে উপলক্ষ্য করিয়া এই মহাযুদ্ধের উৎপত্তি, একই শোণিতধারা সেই উভয় জাতির রাজশরীরে প্রবাহিত। ইংলণ্ডের রাজ-দুহিতাই জর্ম্মণ-সম্রাটের জননী। কোন পরিবারের এক ভ্রাতা জর্ম্মণ, অপর ভ্রাতা হয় তো বহুকাল ইংলণ্ড-প্রবাসী, ইংলণ্ডের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা-বন্ধনে সংবদ্ধ। ফ্রান্স, রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া, হলণ্ড ও জর্ম্মণীতে এইরূপ ভাবে বৈবাহিক সম্বন্ধে পরস্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা প্রায় সকল স্থানেই বর্ত্তমান, সুতরাং এই ভীষণ যুদ্ধে পিতৃহস্তে কন্যার বৈধব্য, ভ্রাতৃহস্তে ভগিনীর বৈধব্য অথবা ঐরূপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের শোণিতপাতের সম্ভাবনা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। যুদ্ধস্থলে এইরূপ স্বজন-নিধনের সম্ভাবনায় হৃদয়বান্ যোদ্ধার হৃদয় হইতে যে মহারথী অর্জ্জুনের ন্যায়—

কুরুক্ষেত্রের পুনরভিনয়।

"দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥" *

এই বিলাপবাণী স্বতঃই উত্থিত হইবে, ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। কেবল তাহাই নহে—এই যে ভীষণ সমরসমুদ্র—আজ যাহার রক্ত-তরঙ্গ ইউরোপের সুখ, শোভা, সমৃদ্ধি যেন ধুইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে—প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার অভিনয় দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না হাহাকার

* হে কৃষ্ণ, যুদ্ধার্থী এই স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবশ হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার শরীরে কম্প এবং রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে, এবং চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে।

গীতা, ১ম অধ্যায়, ২৮।২৯ শ্লোক।

উত্থিত হয়। যে সকল বীরগণ শৌর্য্যে, বীর্য্যে ধরণীর শিরোভূষণ, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে এই সর্ব্বগ্রাসী সংগ্রামানলে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হইতেছে। কত শত পরিবারে মর্ম্মভেদী বিলাপধ্বনি উঠিতেছে, কত অনাথ শিশু পিতৃহারা, শস্যক্ষেত্র বিদলিত, শোভাময়ী পল্লীনগরী শোণিতপ্লাবনে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। যথায় পূর্ব্বে গার্হস্থ্যসুখপূর্ণ শান্তিময় নিশ্চিন্ত জীবন ছিল, এখন সেখানে সদা শঙ্কা, মৃত্যুভয় এবং কামানের ভীষণ গর্জ্জনের সহিত অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। দুইটি প্রবল জাতির অথবা উভয় দলে বিভক্ত বহু শক্তিশালী জাতির এইরূপ নির্ম্মমভাবে পরস্পরকে ধ্বংস করিবার একান্ত চেষ্টা—প্রথম দৃষ্টিতে অতি ভয়ানক ও বীভৎস বলিয়া মনে হয়। সভ্যতাভিমানী হৃদয়বান্ মানবের পক্ষে এরূপ ব্যবহার একেবারেই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একখানি গ্রন্থপত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়ের ন্যায় জাগতিক ঘটনা সমূহের প্রত্যেকটিরই দুই দিক্ আছে এবং তাহার ফলাফল লইয়া দুই ভাবেই বিচার করা চলে।

তুলনায় সমালোচনের উপকারিতা।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের শান্তিময় খৃষ্টান সভ্যতা ও বিজিগীষু শক্তিবাদ—ইহা যেন একখানি গ্রন্থপত্রেরই উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত পরস্পর-বিরোধী দুইটি মতবাদ। এক দিকে ভগবান্ যীশুখৃষ্ট প্রচারিত এই মহতী বাণী—"একগালে চড় খাইয়া প্রহারকারীকে অপর গাল ফিরাইয়া দিবে"—যাহার উপর সমস্ত খৃষ্টান সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, আবার অন্যদিকে শক্তির অবতার বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ানের মৃত্যুভয়হারী শক্তিবাদের অগ্নিমন্ত্র—নিরপেক্ষ দার্শনিকের দৃষ্টিতে এই উভয়দিক সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে তুলনায় সমালোচনে দুই দিকই আমাদের নিকট অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নতুবা একদেশদর্শিতা দোষে আমরা আত্মসমর্থিত ভাবকেও নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলি। ভগবান্ যীশুখৃষ্ট যে মহতী বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কেবল কথায় প্রচার করেন নাই, নিজের জীবন দিয়া আত্মমুখোচ্চারিত সেই বাণী সার্থক ও অমর করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া—"প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রেম করিও" এই উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ আবার শত্রুপরিবেষ্টিত ক্রুশবিদ্ধ অবস্থাতেও "পিতা, ইহাদের ক্ষমা কর,

ইহারা অবোধ—জানে না যে ইহারা কি করিতেছে” বলিয়া পরম শত্রুর জন্য চরম সময়ে ভগবানের চরণপ্রান্তে কুশল প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্টের “জানে না ইহারা কি করিতেছে” এই কথায়, উভয় সৈন্যদল-মধ্যবর্ত্তী রথোপবিষ্ট বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনের সেই কাতরোক্তি মনে পড়ে :—

“যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥” *

গীতা প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুনের এই উক্তির মর্ম্ম অবগত হইয়া একজন পাশ্চাত্য লেখক অর্জ্জুনের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—“যীশুখৃষ্টের উক্তির সহিতও এই উক্তির তুলনা হইতে পারে।” বস্তুতঃ অর্জ্জুনের এই উক্তি মহদ্ভাব-প্রসূত, অতি উদার ও মহান্ ভাবের উত্তেজক। তথাপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন যে তিরস্কারচ্ছলে তাহার প্রতিবাদ করিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উন্নতিশীল পাশ্চাত্য দেশের শক্তিবাদ যে কিরূপ, তদ্বিষয়ে অগ্রে একটু আলোচনা করিলে, বিচার্য্য বিষয়টি বিশদরূপে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

ফ্রান্সে মহাবীর নেপোলিয়ান মহাশক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি “অজেয় নেপোলিয়ান” এই উপাধির নিকট জীবন, এমন কি, জীবনের সুখও অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। শুধু তাহাই নহে, সেই অজেয় বীর

* যদিও লোভে অভিভূতচিত্ত হওয়ায় ইহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের জ্ঞান কেন না হইবে ?

যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রতীকারপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তাহাও আমার অধিকতর হিতজনক হইবে।

এমনই অপরাজেয় থাকিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেন যে, তিনি জয়-পরাজয়, সম্মান-নিন্দা, স্তুতি-নির্য্যাতন, তুল্যরূপে উভয়ের নিকটই অপরাজিত থাকিবেন, কাহারও দাসত্বেই আপনার উন্নত মস্তক অবনত করিবেন না। তিনি যে যশোগৌরব উপার্জ্জনের জন্য প্রাণদান অতি সামান্য কথা মনে করিতেন, সেই যশোগরিমার নিকটেও আপনাকে অবনত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার কোন জীবনী-লেখক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সহিত তাহার জীবনের তুলনা দিয়াছেন। জ্যোতিষ্কেরই ন্যায় তাঁহার জীবনের উদয় ও অস্ত উভয়ই অতি বিচিত্র। যথার্থ পক্ষে তাঁহার অভ্যুদয় ও অস্ত উভয়ই তাঁহাকে যেন গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে এবং হৃদয়গ্রাহী নাটকীয় দৃশ্যের ঘটনাবলীর ন্যায় তাঁহার জীবনের বিচিত্র ঘটনাগুলি মানব-মনের স্মৃতি-পটে মুদ্রিত হইয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আরও একটু অধিকদূর অগ্রসর হইলে, নেপোলিয়ানের জীবনের সহিত নব পাশ্চাত্য জগতের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হয়। যে মহাশক্তির আবির্ভাবে আজ নব্য ইউরোপ জাগ্রত, কর্ম্মযজ্ঞের হোতা নেপোলিয়ান তাঁহার সমগ্র জীবনে সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। উহার ফল পুত্তলিকার সজীবতা-প্রাপ্তি, মানুষের মনুষ্যত্ব-লাভ। আজ যে ইউরোপে এই ভীষণ সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, কোন্ সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এতদিন ধরিত্রী-গর্ভে এই উত্তাপ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার অন্বেষণে চিন্তাশীলের মন স্বতঃই কার্সিকা-দ্বীপের দিকে ধাবিত হইবে। নেপোলিয়ানের কোন উপাসক যদি বলেন—"তিনি নির্দ্দোষ পুরুষ ছিলেন," সে স্তুতি তাঁহার পক্ষে বৃথা চাটুকারিতা মাত্র। তাঁহার যাহা দোষ, তাঁহার যাহা গুণ, উভয়ই সমভাবে সজীব এবং তাঁহাকে সজীবতারই অবতারবিশেষ বলা যাইতে পারে। প্রচণ্ড অহঙ্কার—যাহাতে আপনার অহংজ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়, অত্যুগ্র আত্ম-সম্মানজ্ঞান—যাহার নিকট সম্মানলালসা হেয়, এবং অত্যুচ্চ প্রভুত্ব-প্রয়াস—যাহা জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, সাম্রাজ্য-দারিদ্র্য, গৌরব-অপমান প্রভৃতি পার্থিব কোন অবস্থারই এবং পারলৌকিক স্বর্গসুখ-প্রলোভনেরও দাসত্ব স্বীকার করিতে চাহে না,—যাহা আপনাকে জগৎসমাজে একক ও অদ্বিতীয় রাখিবার

মহাশক্তির উপাসক নেপোলিয়ান।

স্পর্দ্ধা করে এবং যে স্পর্দ্ধা নীচ প্রভুত্বেচ্ছা ও লোকপীড়নের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে, সেই অহঙ্কার, আত্মসম্মানজ্ঞান ও প্রভুত্ব-প্রয়াস হইতে উজ্জ্বল নেপোলিয়ান-জ্যোতিষ্কের প্রথম অভ্যুদয়। তাঁহার অন্তকালে রাজ-সিংহাসনে আত্মবংশ-প্রতিষ্ঠার বাসনা ও তৎসংস্পৃষ্ট

নব্য ইউরোপে নবজীবন-প্রতিষ্ঠা।

উচ্ছৃঙ্খলতা অহংজ্ঞানের ছায়া ফেলিয়া যদি তাঁহার সেই অত্যুজ্জ্বল অহঙ্কার ম্লান না করিত, তবে জগতের ইতিহাসের হয় তো আজ অন্যদিকে গতি হইত। যাহা হউক, নেপোলিয়ানের অতি অহঙ্কার, যথেচ্ছাচারিতা এবং বিশেষতঃ রাজ-সিংহাসনে আত্মবংশ-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রভৃতি দোষ সত্ত্বেও তিনিই যে নব্য ইউরোপের নবজীবনের প্রতিষ্ঠাতা, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার নিন্দাকারী বিরোধিগণও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, আত্মচিন্তার প্রতিস্পন্দনেই নেপোলিয়ানের প্রভাব নিশ্চয়ই অনুভব করিবেন। এক দিকে অমিত ক্ষমতাশালী পুরুষসিংহ নেপেলিয়ানের এই সর্ব্বগ্রাসী ভাবের সহিত, অপর দিকে প্রেমাবতার ভগবান্ যীশুখৃষ্টের আত্মত্যাগী ভাবের তুলনা করিলে, আমরা কতই না পার্থক্য দেখিতে পাই। প্রকৃত খৃষ্টান

খৃষ্টান নীতি ও শক্তিবাদ।

আপনার ব্যক্তিগত সত্তার ছায়ামাত্রও জগৎ হইতে মুছিয়া দিতে চাহেন। তাঁহার জীবনও কেবল অপরের জন্য, এবং তিনি পরহিতের জন্য মৃত্যুকেও বরণ করিয়া লইয়া থাকেন। উৎপীড়ক ও অত্যাচারীর কল্যাণার্থে ভগবচ্চরণে প্রার্থনাই তাঁহার নিকট অত্যাচার-প্রতীকারের 'একমাত্র উপায়। তাঁহার পরদুঃখকাতর প্রেমপূর্ণ হৃদয় মহাশত্রুর প্রতিও স্নেহশীল এবং তাহার অকপট কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। পার্থিব জগৎ তাঁহার নিকট স্বপ্নমাত্র; তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই জগদতীত ভাবে মুগ্ধ এবং এই দুঃখ-যন্ত্রণাময় পৃথিবীর পরপারস্থ এক সুখময় রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর, এই জন্য মরজগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁহার শান্তহৃদয় বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। শত অত্যাচারেও তিনি ক্ষমাশীল, সেবাই তাঁহার হস্তের ভূষণ—অস্ত্রধারণ নহে। "আমি ঈশ্বরের দাসানুদাস"—প্রকৃত খৃষ্টানের ইহাই একমাত্র গর্ব্ব; ইহা অপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয় কিছু আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

শক্তির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অপর পক্ষ সদা যুযুৎসু। জগতের পরপারে মৃত্যু-কুহেলীর অন্তরালে কি আছে না আছে, সে সমস্যাপূরণে সময়ক্ষেপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই—বরং তৎপরিবর্ত্তে এই মর-জগতের সংগ্রামাপন্ন জীবন-পণে অমরত্বলাভে সকল জয় অর্জ্জন করিতে, সকল মহত্ত্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেই তাঁহার অধিকতর আনন্দ। ঝটিকাসঙ্কুল কর্ম্ম-মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া সন্তরণে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসেই তাঁহার আনন্দ। বীরত্বের চরম শিখরে আরোহণ করিতে, মহান্ কার্য্য সাধনের জন্য প্রাণপাত করিতেই তাঁহার পরম আনন্দ।

তুলনায় সমালোচন। তাঁহার নিকট যদি কোন দেবতা উভয় হস্তে শান্তি ও সংগ্রাম এই উভয় কাম্য পদার্থ লইয়া উপস্থিত হন এবং যেটি ইচ্ছা সেইটি গ্রহণ করিতে বলেন, তিনি শান্তি উপেক্ষা করিয়া সংগ্রামই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

খৃষ্টান নীতি বলিতেছেন—"বিনয়ী নম্রচিত্ত লোকেরাই ধন্য ; কেন না, স্বর্গরাজ্যে তাহাদেরই অধিকার।"

শক্তিবাদ বলিতেছেন—"সেই তেজস্বিগণই ধন্য—যাহারা শৌর্য্যবলে পৃথিবীকেই আপনার সিংহাসন করিবেন।"

খৃষ্টান নীতি বলিতেছেন—"পরার্থে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হও।"

শক্তিবাদ বলিতেছেন—"তুমি মানুষ, অপার শক্তির অধীশ্বর ; আত্মশক্তিতে প্রবোধিত হও, জগতে তোমার অজেয় অপ্রাপ্য কিছুই থাকিবে না।"

পাশ্চাত্য নীতিবাদের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও উভয় মতবাদ-সমস্যার মীমাংসা হয় না। পাশ্চাত্য নৈতিক-গ্রন্থসমূহে নীতিবাদী মনীষিগণ নৈতিক বিচারে সদসৎ নির্ণয়ের উপায়স্বরূপ যে সকল মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া কোন এক স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য নীতিবাদের প্রকৃত ভিত্তি যে কি, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। কোন মতে—"যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের বহুল পরিমাণে হিত সাধিত হয়, তাহাই সৎপন্থা ;" আবার অপর মতে—"বহুসংখ্যকের হিতসাধনব্যপদেশে ক্ষুদ্র একটি প্রাণীরও যদি অহিত হয়, সমদর্শীর নিকট সেরূপ কার্য্য কখনই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে

পারে না।" কেহ বলেন,—"কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ, তাহা বোধের দ্বারা অনুভব করা যায়। ভাল মন্দ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই মনে একটা স্বাভাবিক সংস্কার আছে। প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলে জীবের মস্তিষ্কে এইরূপ সংস্কার ক্রমশঃ স্থায়িভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়, এবং সেই সংস্কার হইতেই ভাল-মন্দের বিচারবোধ আসে।" কোন মতে—"কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া সদসদ্‌নির্ণয় করাই যৌক্তিক। কার্য্যের ফল দেখিয়া যেরূপ কার্য্যে জনসমাজের মঙ্গলের সম্ভাবনা বোধ হয়, তাহাই নীতিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

সদসদ্‌বিচারের কয়েকটি পন্থা।

খৃষ্টান নীতি ও শক্তিবাদের সমালোচনায় "যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক ব্যক্তির বহুল পরিমাণে হিত সাধিত হয়"—এই সূত্রানুযায়ী সদসদ্‌বিচার করিলে, কিসে বহুজনের হিত এবং কিসে অহিত হয়, প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা কেহই তাহা নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ করিতে পারিবেন না। আপাতভাবে শান্তিময় খৃষ্টান নীতিকেই জনসমাজের কল্যাণকর বলিয়া মনে হয়,—শক্তি-পরীক্ষার রুদ্র তাণ্ডবে পৃথিবী যদি মানবের আবাসের পরিবর্ত্তে দানবীয় পৈশাচিকতার ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয় তবে ক্ষমা, দয়া ও তিতিক্ষার শান্তিবারি বর্ষণ ভিন্ন কিসে আর বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া জগৎ শীতল করিতে পারে? কিন্তু ধর্ম্মের নামে অনেক সময় জগতে এমন নিষ্ঠুর আচরণসকল সমর্থিত হইয়াছে যে, ভীষণ যুদ্ধেও তাহা ঘটিতে দেখা যায় না। দাস-প্রথাও বহুজনের হিতের দোহাই দিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, এমন কি, অনেক ধর্ম্ম-যাজক তাহা বাইবেলের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মিসেস্ বীচার ষ্টো তাঁহার চিরস্মরণীয় অমর লেখনী মুখে ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। ক্ষমা-মাহাত্ম্যের দোহাই দিয়া অন্যায়ের অপ্রতীকারে কত সময় কত অন্যায় জনসমাজে বদ্ধমূল হইবার সুযোগ পাইতেছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? অপর পক্ষে বহু বৎসরের সঞ্চিত অবিচার, উৎপীড়ন, স্বার্থপরতা ও প্রভুত্বেচ্ছা—যাহা মৃদুবিষে ক্ষয়প্রাপ্ত রোগীর ন্যায় নির্জ্জীব জনসমাজকে দিনে দিনে মৃত্যুমুখে লইয়া চলিতেছিল—প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার নিয়মে সংহার-লীলার অভিনয়ে রক্তস্রোতে সেই পুঞ্জীকৃত পাতকরাশি

নীতিবাদের দ্বারা উভয় মতের সদসদ্‌ বিচারের চেষ্টা।

ধৌত হইয়া জনসমাজে আবার নবজীবনের অভ্যুদয় হইতেছে, ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। বোধের দ্বারা সদসদ্-নির্ণয়ের সিদ্ধান্তেও উভয় মতবাদের সমস্যা মীমাংসিত হয় না। কেন না, উভয় পক্ষই স্বীয় সংস্কারানুযায়ী ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যাহা সৎ বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেই পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্যের ফল উভয় পক্ষেই ভাল মন্দ দুইই ফলিয়া থাকে। অতএব ফলাফল বিচার করিয়াও সমস্যা-সমাধান হয় না।

বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিতে গেলে নীতিবাদের এ সকল যুক্তির মূলেই দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। সে দুর্ব্বলতা নীতিবাদের ব্যষ্টির আশ্রয়-গ্রহণ। ব্যক্তি-বিশেষ বা বহু ব্যক্তির কার্য্যগত ব্যবহার ও তাহার ফলাফলের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গিয়া, পাশ্চাত্য নীতিবাদ মূলে সত্যাশ্রয়ী না হইয়া পল্লবগ্রাহী মাত্র হইয়াছে। ইহার কারণ, পাশ্চাত্য নীতিবাদের মূলমন্ত্র সমাজরক্ষা। "যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক ব্যক্তির বহুল পরিমাণে হিত সাধিত হয়," এরূপ সিদ্ধান্ত একরূপ কারবারের লাভ-ক্ষতির বিচার! এরূপ ব্যবসাদারী নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া বৈষয়িক ব্যাপার চলিতে পারে; কিন্তু ইহা নীতিবাদের ভিত্তি হইতে পারে না। সদসদ্বিচারের যদি ইহাই লক্ষ্য হয়, তবে মানিয়া লইতে হয়, জগতের এমন কোন নিয়ম নাই, যাহার উপর সমষ্টির মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। কেণ্টাকি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সুবিজ্ঞ সভ্যগণের অনুমোদনে তুলা-ব্যবসায়ীর হিতার্থে দাসপ্রথা দৃঢ়তর করিবার জন্য পলাতক ক্রীতদাসদিগের উপর যে রাজকীয় দণ্ডবিধি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে তুলা-ব্যবসায়িগণের প্রকৃত হিত অথবা অহিত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা কি? ব্যবসায়ের সুবিধা ও সামাজিক ধনবৃদ্ধিই যে প্রকৃত হিত, এ কথা সকলে স্বীকার করিবেন না। এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যুদ্ধে গমনোদ্যত আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী পুত্র দুর্য্যোধন মাতা গান্ধারীদেবীর পদতলে প্রণত হইলে, তিনি তাঁহাকে "তোমার যুদ্ধে জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া, "ধর্ম্মের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গান্ধারী কি তবে পুত্রের কুশলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না? এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, প্রাচ্য ধারণার অনুবর্ত্তী এই সহজ উত্তর দেওয়া যায় যে, গান্ধারীই

প্রকৃত পুত্রকুশলাকাঙ্ক্ষিণী জননী। কেননা, তিনি জানেন, ধর্ম্মের জয়ে সকলেরই প্রকৃত কল্যাণ, তাঁহার পুত্রও সেই সমষ্টির বহির্ভূত নহেন। যাহা নিখিল কল্যাণের হেতু, পুত্রের পক্ষেও তাহাই কল্যাণের, ও তদ্বিপরীত অকল্যাণের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

সদসতের স্বাভাবিক ধারণার দ্বারা যদি প্রত্যেকে ভালমন্দ বিচার করেন, তবে একের ধারণার সহিত অপরের ধারণার যে সম্পূর্ণ মিল হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। বরং একদল নির্ব্বোধের একরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব, কিন্তু দুইজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কদাচিৎ মতের সম্পূর্ণ মিল হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিগত বোধের স্বাতন্ত্র্য আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও জাতিগত ধারণার স্বাতন্ত্র্য আছে। দেশ, কাল ও অবস্থানুসারেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংস্কার ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাভাবিক বোধ বা সংস্কারানুযায়ী ধারণা হইতে কোন এক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব।

ধারণা বা সংস্কার হইতে সদসদ্‌বিচার

কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া সদসদ্‌বিচারেও কোন লাভ হয় না। এমন অনেক ফল ফলিয়া থাকে, যাহা আপাত-মধুর-আস্বাদ, পরিণামে তাহার বিষক্রিয়ায় শরীরযন্ত্র জীর্ণ হইয়া যায়; আবার এমন অনেক ফলও আছে, যাহা আস্বাদনে তিক্ত, কিন্তু পরিণামে তাহার ভেষজগুণে জীর্ণ শরীরও নববলে বলীয়ান্ হয়। তদ্ভিন্ন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহার ফল ফলিবে, এমন কোন কথা নাই। আমরা বর্ত্তমানে কার্য্যের ফলই দেখিতে পাই, কিন্তু অতীতের ধূলিতলে প্রচ্ছন্ন কোন্ কর্ম্মের বীজ হইতে যে অধুনা ফলবান্ বৃক্ষোৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ণয় করিতে পারি না।

কার্য্যের ফলাফল লইয়া সদসদ্‌বিচার।

পাশ্চাত্য মনীষিগণের সৎপন্থা নির্ণয়ের এই সকল সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য-ভাবের অর্থাৎ ব্যক্তিত্ববোধের দিক্ দিয়া দেখিলে, যদিও তাহার কোন সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তই আবার প্রাচ্যভাবের দিক্ দিয়া দেখিলে, তাহার পূর্ণ সার্থকতা অনুভব করিতে পারা যায়। "বহুজনহিতায়" কেবল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত নহে, প্রাচ্যসিদ্ধান্তও বটে; কিন্তু পাশ্চাত্য

পাশ্চাত্য "বহুজন-হিতায়" ও প্রাচ্য "বহুজন-হিতায়।"

বহুজনের 'বহু' ব্যক্তিত্ববোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ—সসীম, এবং প্রাচ্য বহুজনের 'বহু' সমষ্টি, বিরাট্ অথবা অনন্ত। পাশ্চাত্য নীতিতে বহুজনের হিতসাধনের অর্থ সামাজিক কল্যাণসাধন, অথবা পরোপকাররূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান; প্রাচ্যনীতিতে বহুজনহিতের একমাত্র তাৎপর্য্য, "বহুজনহিতায়"-রূপ অনন্ত অপরিমেয়ে ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধিজাত স্বার্থচেষ্টা, এমন কি, মুক্তির কামনা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন। নতুবা প্রাচ্যনীতি অহিত অথবা অমঙ্গলের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(সিষ্টার নিবেদিতা)

এবার তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত যাত্রা করেন। ইনি তাঁহাকে আলমোড়া লইয়া গিয়া তথায় এক গৃহস্থের অতিথি-রূপে রাখিয়া দেন। পূর্ব্বে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন তিব্বত যাত্রা করেন, সেই সময় এই গৃহস্থটী তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, পর্ব্বতের উপর দিয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে স্বামিজী একদিন ক্ষুধায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। একজন মুসলমান তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটী শশা কাটিয়া আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দেয়, এবং উহাতেই এক প্রকার তাঁহার জীবন-রক্ষা হয়। কতদিন ভ্রাতৃদ্বয় অনাহারে ছিলেন, জানি না। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি আপনা হইতে না আসিলে তিনি উহা চাহিতে পারিতেন না। অন্ততঃ তিনি যে পরে একবার ঐরূপ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। এক

ব্যক্তি স্বামিজীকে এই ভ্রমণকালে জানিতেন; তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বলেন যে, এই কঠোর সাধনকালে তিনি পাঁচ দিনের অধিক অনশনে যাপন করেন নাই।

ইহার পর আমরা তাঁহার গতিবিধির খেঁই হারাইয়া ফেলি। তিনি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন, কিন্তু সাধুগণ নিজেরাই ছোড়ভঙ্গ হইয়াছিলেন। স্বামী সদানন্দ বলিলেন, তিনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহারা বড়ই নিরানন্দে দিনযাপন করিতেন। আবার, প্রথম মঠবাড়ীটীও পরিত্যাগ করিবার কথা হইতেছিল। কারণ, গৃহস্বামী উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিবেন বলিতেছিলেন। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী কিছুতেই তাঁহাদের গুরুদেবের ভস্মাবশেষ ছাড়িয়া যাইবেন না; তিনি অচল অটল প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সম্পদে বিপদে ঐ ভস্মাবশেষ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে, তাঁহারা পুনরায় ঠাকুর-ঘরে একত্র না হওয়া পর্য্যন্ত, কিছুতেই আচ্ছাদনবিহীন হইতে দিবেন না। তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনি, স্বামী নির্ম্মলানন্দ, মধ্যে মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ নামক একজন এবং সঙ্ঘের বাসন মাজা ইত্যাদি কার্য্যে রত নবাগত সেবক স্বামী সদানন্দ—এই চারিজন কিছু দূরে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটে, একটী গৃহে স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং পূর্ব্বে যে মঠ বরাহনগরে অবস্থিত ছিল, তাহা এখন আলমবাজার মঠ নামে অভিহিত হইল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ এই সময়ে সর্ব্বদা স্বামিজীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তিনি শুনিতে পাইতেন, স্বামিজী অমুক সহরে রহিয়াছেন; শুনিয়াই তথায় ছুটিতেন; গিয়া দেখিতেন, স্বামিজী এইমাত্র চলিয়া গিয়াছেন; কোথায় গিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। একবার স্বামী ত্রিগুণাতীত গুজরাটের কোন এক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিপদে পড়েন। এই সময়ে একজন তাঁহাকে বলেন, "এক বাঙ্গালী সাধু রাজমন্ত্রীর ভবনে বাস করিতেছেন; আপনি যদি তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন ত নিশ্চয়ই সাহায্য পাইবেন।" তদনুসারে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সেই অজ্ঞাত সাধু স্বয়ং স্বামিজী। কিন্তু তিনি ভ্রাতার যে সাহায্যের প্রয়োজন তাহা করিয়া তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে বলিলেন, এবং নিজে একাকী চলিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের যে সারগর্ভ বাক্যগুলি তিনি সর্ব্বদা আবৃত্তি

করিতেন, তাহাই তাঁহার এই সময়ের মূলমন্ত্র স্বরূপ ছিল :—"সিংহ যেমন সামান্য শব্দে ভয় পায় না, বায়ু যেমন জালবদ্ধ হয় না, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তুমিও তেমনি গণ্ডারবৎ একাকী বিচরণ কর।"

আমরা এখন জানি যে, আলমোড়াতেই তিনি সংবাদ পান যে, তাঁহার শৈশবের প্রিয়-ভগিনী শোচনীয় দারিদ্র্যের পীড়নে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই তিনি, কোথায় যাইতেছেন তদ্বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিবিড়তর অরণ্যানীসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে পলাইয়া যান। বহু বৎসর পরে একজন—যিনি স্বামিজীর জীবনের ঘটনাসমূহ গভীরভাবে ্যালোচনা করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই মৃত্যুতে স্বামিজীর হৃদয়ে অতি গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল—এত গুরুতর যে, উহার তীব্র যন্ত্রণার এক মুহূর্ত্তের জন্য কখনও বিরাম হয় নাই! আর ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে তাঁহার যে প্রবল আগ্রহ দেখা যাইত, তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ যে এই মর্ম্মবেদনা-প্রসূত, তাহা আমরা বোধ হয় ভরসা করিয়া বলিতে পারি।

এই সময়ে তিনি কয়েক মাস এক পার্ব্বত্য গ্রামের ঠিক ঊর্দ্ধদেশে একটী গুহায় বাস করিয়াছিলেন। মাত্র দুইবার আমি তাঁহাকে এই সময়ের অনুভূতির উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাকে কাজ করিতে হইবে, এই ধারণা আমাকে এই সময়ে যত অভিভূত করিয়াছিল, এমন আমার সারা জীবনে কখনও হয় নাই। মনে হইত কে যেন আমাকে সবলে সেই গুহা হইতে গুহান্তরে জীবনযাপন হইতে বিরত করিয়া নিম্নে সমতল প্রদেশে বিচরণ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিল।" আর একবার তিনি একজনকে বলিয়াছিলেন, "সাধু কোন্ প্রকার জীবন যাপন করিতেছে, তাহাই তাহার সাধুত্বের পরিচায়ক নহে। কারণ, একজন গুহার মধ্যে বসিয়া থাকিয়াও অনায়াসে মনে মনে রাত্রে কয়খানা রুটী মিলিবে, এই প্রশ্নের বচারে নিমগ্ন থাকিতে পারে।"

সম্ভবতঃ এই কালের অবসানেই, এবং যে শক্তি তাঁহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারই একটী নিদর্শন-স্বরূপে, তিনি কন্যা কুমারিকায় মাতা কুমারীকে পূজা করিবেন বলিয়া ব্রত

গ্রহণ করেন। এই ব্রত-পালন তিনি ধীরে সুস্থে করিয়াছিলেন। তথাপি উহাতে তাঁহার কিঞ্চিন্ন্যূন দুই বৎসরমাত্র লাগিয়া থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি ভারতীয় জীবনের প্রত্যেক বিষয়টী লক্ষ্য ও অনুশীলন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ের যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, তাহাদের আর শেষ নাই। তিনি এত বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের সকলের নাম-নির্দ্দেশ অসম্ভব। তিনি শিখদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের নিকট মীমাংসা-দর্শন এবং জৈনদিগের নিকট জৈন-শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; রাজপুতরাজগণ কর্ত্তৃক গুরুরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন; মধ্য-ভারতে এক মেথর পরিবারের সহিত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন; মালাবারের জাতিঘটিত আহারাদির ন্যায় কূট বিষয়সকল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার জন্মভূমির বহু ঐতিহাসিক দৃশ্য ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে যখন কন্যা কুমারিকা পৌঁছিলেন, তখন তিনি এত দরিদ্র যে, মাতা কন্যা কুমারীর মন্দিরে যাইবার জন্য খেয়া নৌকার ভাড়া পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না। সুতরাং সঙ্কল্পিত পূজাদান মানসে তিনি, হাঙ্গর থাকা সত্ত্বেও, প্রণালীটী সন্তরণ দ্বারা পার হইয়া সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। মান্দ্রাজ হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই তিনি, যাঁহারা তাঁহাকে আমেরিকা প্রেরণ করিবার হেতুভূত হইয়াছিল, সেই অনুরক্ত শিষ্যমণ্ডলী লাভ করেন। অবশেষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ আন্দাজ তিনি বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িয়া উক্ত মহাদেশে যাত্রা করেন।

কিন্তু এই যাত্রা করিতেও তাঁহার আগ্রহ ছিল না। তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যেরা বলেন যে, ঐ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত প্রথম পাঁচ শত মুদ্রা তিনি তৎক্ষণাৎ পূজা-দানাদিতে ব্যয় করিয়া ফেলেন, যেন তাঁহাকে সবলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর করিয়া দিবার ভার তিনি অদৃষ্টের স্কন্ধেই জোর করিয়া চাপাইয়া দিবেন। এমন কি, বোম্বাই পৌঁছিবার পরও তিনি পাশ্চাত্যে গমন করাই সঙ্গত, এইরূপ নিশ্চয় বোধের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না হয়, এইরূপ মানসিক চেষ্টা করিতে করিতে তিনি অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার গুরুদেবের মূর্ত্তি তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত

হইয়া তাঁহাকে যাইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। অবশেষে তিনি গোপনে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে এই পত্র লিখিলেন যে, সম্ভব হইলে তিনি যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন ও আশীর্ব্বাদ করেন; এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন তিনি পুনরায় তাঁহার পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত এই নূতন রকমের কাণ্ডটার কথা কাহাকেও না বলেন। এই পত্রের উত্তরে তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ ও তিনি যে তাঁহার জন্য ভগবৎসমীপে সদা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, এইরূপ দৃঢ় আশ্বাস পাইবার পর তবে তিনি ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যে যাত্রা করেন। এবার আর অদৃষ্টকে এড়াইবার উপায় নাই। যে আত্মগোপনেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তিনি মঠ পরিত্যাগ করেন, সেই ইচ্ছার বশেই তিনি ভারতের প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছিবামাত্র নাম পরিবর্ত্তন করিতেন। ইহার অনেক বৎসর পরে একজন তাঁহার নিকট শ্রবণ করেন, কিরূপে তাঁহার 'চিকাগো নগরীর সেই প্রথম বিখ্যাত বক্তৃতার পর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তিনি এইরূপ বিজয়-গৌরব-লাভ সত্ত্বেও এই ভাবিয়া মর্ম্মযাতনা ভোগ করেন যে, তাঁহার আত্মগোপনের আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল। তিনি এখন লোকলোচনের সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে দণ্ডায়মান। অজ্ঞাত ভিক্ষুক আর অজ্ঞাত থাকিতে পারিলেন না!

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার এই সকল ভ্রমণের মধ্যেই আমি, যে সত্য-সমূহ আমার গুরুদেবে প্রত্যক্ষ ও প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাঁহার সেই সকলের উপলব্ধির তৃতীয় ও শেষ উপাদান দেখিতে পাই।

আমার মনে হয় এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ত্রিবিধ প্রভাবের ফলে তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল :—প্রথমতঃ তাঁহার ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভ; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার গুরুদেবের অলৌকিক চরিত্র যিনি, সমুদয় শাস্ত্র যে জীবনকে একবাক্যে আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই জীবনের উদাহরণ ও প্রমাণস্বরূপ ছিলেন; এবং তৃতীয়তঃ, আমার যত দূর মনে হয়, তাঁহার ভারত ও ভারতবাসিগণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান,—যাহার বলে তিনি উহাদিগকে একটী বিপুল সজীব ধর্ম্মশরীরেরই অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—তাঁহার অশেষ মহিমান্বিত স্বয়ং গুরুদেবও যেন উহার সাকার বিগ্রহ

ও বাণীমাত্র ছিলেন। আমার মনে হয়, এই তিনটী প্রভাব তাঁহার বিবিধ বক্তৃতা হইতে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেছেন ও জগতের সম্মুখে স্বদেশবাসিগণের দর্শনের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তখন তিনি অধিকাংশই প্রাচীনকালের সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন; অবশ্য যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে ও দৃঢ়তার সহিত তিনি উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা শুধু ঐ সকল গ্রন্থপ্রতিপাদ্য সত্য-সমূহ তাঁহার গুরুদেবের জীবনে একাধারে সমষ্টীভূত দেখিয়াছিলেন বলিয়া। আবার, যখন তিনি বলিতেছেন, "ভক্তির আরম্ভ, স্থিতি ও পরিণাম প্রেমে," অথবা যখন তিনি কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ করিতেছেন, তখন আবার যেন আমাদের চক্ষের সমক্ষে তাঁহার গুরুদেবকেই দেখিতে পাই; দেখিতে পাই যে, শিষ্য অপর একজনের পাদমূলে যে জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন, শুধু তাহারই কথা বলিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন মাত্র। কিন্তু যখন আমরা তাঁহার চিকাগো মহাসভাসমক্ষে পঠিত বক্তৃতা অথবা ঠিক ঐরূপই অদ্ভুত "মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর," অথবা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের লাহোরের যে বক্তৃতাগুলিতে তিনি হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য ও সাধারণ লক্ষণগুলি চিত্রিত করেন, সেইগুলি পাঠ করি, তখন আমরা এমন কিছুর পরিচয় পাই যাহা তাঁহার নিজের পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত;—এই সকল বক্তৃতার পশ্চাতে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার ভারতভূমে দীর্ঘ-ভ্রমণেরই ফল। মনে হয়, এই ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া শেষ করিবার নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাঁহার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের প্রতি শ্রদ্ধা কোন ফাঁকা ভাবুকতা বা ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ফল নহে, উহা এই প্রত্যক্ষজ্ঞানজনিত। এখানে ইহাও বলিয়া রাখি যে, তাঁহার অনুমান-প্রক্রিয়াও সতেজ ও বর্দ্ধনশীল ছিল, উহা নূতন নূতন ঘটনা-সংগ্রহের জন্য সদা উন্মুখ থাকিত, এবং প্রতিকূল সমালোচনায় কিছুমাত্র ভয় পাইত না। তিনি একবার বলিয়াছিলেন,-হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি কি, ইহাই তাঁহার সমগ্র জীবনের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতীয়গণের ধারণায় হিন্দু-সভ্যতার প্রাচীনতর ও অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা উপাদানগুলিও খুব বড় বড়

দেখাইয়াছে। তাঁহার দেশে যতদূর সম্ভব, ততদূর পর্য্যন্ত আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়াও তিনি কতকগুলি নব্যপন্থীর ন্যায়, সন্ন্যাসী বা কৃষককুলকে, যাঁহারা প্রতিমাপূজা করেন বা যাঁহারা জাতিভেদপ্রথা দ্বারা পীড়িত তাঁহাদিগকে, অখণ্ড ভারতবর্ষের অঙ্গবিশেষ নহে বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। আর এই যে কাহাকেও বাদ না দিবার দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহা তিনি যে উহাদের সহিত একত্র বহু বৎসর ধরিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলস্বরূপ।

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন মহাপুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র-স্বরূপ কতকগুলি ধারণাকে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধে জড়িত করিলেই যে উহার সম্যক্ বিশ্লেষণ করা হইল এমত নহে। আমাদিগকে এখনও সেই মূল প্রেরণার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে,—যে অফুরন্ত শক্তি আজন্ম লাভ করায় একজনের নিকট জগদ্দৃশ্য অন্যাপেক্ষা অধিকতর অর্থবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর আমি শুনিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের আশৈশব এই অন্তর্নিহিত সংস্কার ছিল যে, তিনি দেশের উপকার করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনেক পরে তিনি এই কথা মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন যে, আমেরিকা গমনের পর প্রথম প্রথম তাঁহাকে যে সকল অবস্থাবিপর্য্যয় সহ্য করিতে হইয়াছিল, যখন ওবেলার আহারের জন্য কাহার দ্বারস্থ হইবেন তাহার ঠিকানা ছিল না, সেই সময়েও ভারতে শিষ্যগণকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় একক্ষণের জন্যও বিচলিত হয় নাই। যে সকল মহাত্মা কোন বিশেষ কার্য্য সংসাধিত করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এইরূপ একটা অদম্য আশা বর্ত্তমান থাকেই থাকে। ইহা ভাবী মহত্ত্বের একটা গভীর ধারণা, ইহা ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় না; উহার একমাত্র প্রকাশ জীবনে। হিন্দুদের চিন্তাপ্রণালী অনুসারে, এই ভাবী মহত্ত্বের ধারণা এবং আত্মাভিমান—এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, এবং আমার মনে হয়, স্বামিজীর জীবনেও ইহার পরিচয় তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের তৎসম্বন্ধীয় প্রশংসা দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষরূপ পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন, এ সকল অতিশয়োক্তি মাত্র।

যখন তিনি আঠার বৎসরের বালক, সেই সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর দর্শনে আগত এক দল লোকের সঙ্গে তথায় আসিয়াছিলেন, এবং কোন এক জন, লোক সম্ভবতঃ তাঁহার কণ্ঠের অসাধারণ মাধুর্য্য এবং তাঁহার সঙ্গীতে পারদর্শিতার কথা জানিতেন বলিয়া, তাঁহার গান গাহিবার কথা উত্থাপন করিলেন। উত্তরে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের "মন চল নিজ নিকেতনে" এই গানটী গাহিলেন।

ইহাই যেন সঙ্কেতস্বরূপ হইল,—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, এই তিন বৎসর ধরিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। বাবা, তুমি এতদিনে আসিলে!" ইহা বলা যাইতে পারে যে, সেই দিন হইতে তিনি তাঁহার অনুগত বালকবৃন্দকে একমনঃপ্রাণ করিয়া এমন একটী সঙ্ঘে পরিণত করিতে ব্যাপৃত হইলেন, যাঁহাদের "নরেন্দ্রের" (স্বামিজীর তখন উহাই নাম ছিল) প্রতি অনুরাগ চিরকাল অটুট থাকিবে।

তিনি যে মহাযশের ভাগী হইবেন, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে অথবা তাঁহার প্রতিভা যে অনন্যসাধারণ, তাহা উল্লেখ করিতে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। যদি অধিকাংশ লোকের দুইটী, তিনটী অথবা দশটী বা বারটী গুণ থাকে, তবে তিনি নরেন্দ্রের সম্বন্ধে শুধু এই বলিতে পারেন যে, তাঁহার সহস্রটী গুণ আছে। তিনি সত্য সত্যই "সহস্রদল পদ্ম"। উচ্চাধিকারিগণের মধ্যেও, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যদি কাহারও যে সকল গুণ শিবত্বের লক্ষণ এরূপ দুইটী গুণ থাকে, তাহা হইলে নরেন্দ্রের অন্ততঃ আঠারটী ঐরূপ গুণ আছে।

কোন ব্যক্তি ভণ্ড কি না, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ এত চিনিতে পারিতেন যে, উহা সময়ে সময়ে তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা উপস্থিত করিত, । একবার তিনি একটী লোককে খাঁটী বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না, যদিও উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর সত্ত্বেও লোকটা 'চূনকাম করা কবর'! রাতদিন শৌচাচারী থাকা সত্ত্বেও উহার উপস্থিতি অপবিত্রতাজনক, আর নরেন্দ্র যদি ইংরেজের হোটেলে গোমাংসও খায়, তথাপি সে পবিত্রই থাকিবে, এমন পবিত্র যে, তাহার স্পর্শমাত্রেই অপরে পবিত্র হইয়া যাইবে।" এইরূপ নানা কথা বলিয়া তিনি সর্ব্বদা এই শিষ্য—যিনি ভবিষ্যতে নেতৃত্বপদবী লাভ করিবেন

এবং অপর সকলে—যাঁহারা ভবিষ্যতে তাঁহার সহায়ক হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে, প্রকৃত গুণসমূহের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত একটী স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভ্যাস ছিল যে, কোন নূতন শিষ্য তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহার যত রকমে সম্ভব শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। কারণ, একটী কলের ছোট নমুনার (মডেল) প্রত্যেক অঙ্গটী একজন দক্ষ বৈজ্ঞানিকের চক্ষে যেরূপ অর্থবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, মানবশরীরের প্রত্যেক অঙ্গটীও তেমনি তাঁহার সুশিক্ষিত চক্ষুতে অর্থবান্ বলিয়া প্রতীত হইত। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটী—নবাগতকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়া তাহার নিদ্রাকালীন মনের গতিবিধি লক্ষ্য করা। শুনিয়াছি, যাঁহারা বিশেষ সংস্কারবান্ তাঁহাদিগকে তিনি এই সময়ে আপন আপন পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত আপনা হইতেই বলিতে দিতেন; আর যাঁহারা তদপেক্ষা হীন অধিকারী তাঁহাদিগের নিকট উক্ত বৃত্তান্ত প্রশ্নদ্বারা জিজ্ঞাসা করা হইত। "নরেন্দ্র"কে ঐভাবে পরীক্ষা করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন উপস্থিত সকলকে বলিলেন যে, যে দিন এই বালক জানিতে পারিবে সে কে এবং কিরূপ উচ্চাধিকারী, সে আর এক মুহূর্ত্তও এই দেহধারণরূপ বন্ধন সহ্য করিতে চাহিবে না, এই প্রতিবন্ধসঙ্কুল জীবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, স্বামিজী এই জগতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্মরণ আছে। এই বিশেষ শিষ্যটীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সেবা লইতে পারিতেন না। পাখার বাতাস করা, তামাক সাজা, এবং অন্য হাজার রকমের ছোট-খাট সেবা যাহা সচরাচর শিষ্যেরা গুরুর জন্য করিয়া থাকে, সে সমস্তই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য অপরে নিষ্পন্ন করিত।

প্রাচ্যের বহু অদ্ভুত আচারের মধ্যে, যিনি জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ নহেন এরূপ লোকের রন্ধিত দ্রব্য ভোজন করার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার ন্যায় আর কোন আপত্তিই দৃঢ়মূল নহে। আর, এই বিষয়ে স্বামিজীর গুরুদেব স্ত্রীলোকের ন্যায় অবহিত ছিলেন। কিন্তু যাহা তিনি নিজে খাইতেন না, তাহা তিনি অবাধে তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে খাইতে দিতেন; কারণ, তিনি বলিতেন, নরেন্দ্র 'জ্বলন্ত আগুন,' সমস্ত মলিনতা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। আবার বলিতেন, এই

বালকের ভিতরে যে ঈশ্বরীয় সত্তা ছিল, তাহা পুরুষ-সত্তা, এবং তাঁহার নিজের ভিতর যে সত্তা, তাহা স্ত্রীসত্তা। এইরূপে এই বালকের প্রতি একটী প্রশংসার ভাব—কার্য্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধাও যে উহার সহিত মিশ্রিত ছিল না, এমন নহে—পোষণ করিয়া তিনি, তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অনেক মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইবে, এইরূপ একটী বিশ্বাসের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তে ঐ বিশ্বাস স্বামিজীর অনেক কাজে লাগিয়াছিল—উহারই বলে তাঁহার কার্য্যসমূহ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য এবং সমর্থিত হইয়াছিল। কারণ স্বামিজীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি সর্ব্ববিধ বন্ধনের মোচনকর্ত্তা ছিলেন। আর এটী বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল যে, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে এমন কতকগুলি লোক থাকিবেন, যাঁহারা তাঁহার আচার-উল্লঙ্ঘন, ও অলস ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষীর আচার-উল্লঙ্ঘনের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমার ভারতবাসের প্রথম প্রথম এইটী সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে এবং বারংবার চক্ষে পড়িয়াছিল যে এই সঙ্ঘের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত আদেশগুলির এই অংশটী যার পর নাই নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিতেন। যে সকল ব্যক্তির জীবন কঠোরতম আচারনিষ্ঠার, এমন কি, তপস্যার ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল তাঁহারাও, তাঁহাদের নেতা যে সকল ইউরোপীয়গণকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিতে রাজী ছিলেন। হয় ত মান্দ্রাজে কেহ কেহ স্বামিজীকে জনৈক ইংরাজ ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছিল ; হয় ত কেহ বলিল, তিনি পাশ্চাত্য-বাসকালে কখনও কখনও মদ্যমাংস স্পর্শ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ;—কিন্তু এ সকল শুনিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে এতটুকু উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যাইত না। উহার ভাল মন্দ বিচার করা, উহার কারণ নির্দ্দেশ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া, এমন কি, আদৌ উহার যথেষ্ট কারণ এবং ওজর ছিল কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করাও—তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করিতেন না। তিনি যাহাই করুন না কেন, এবং যেখানেই তাঁহাদিগকে লইয়া যাউন না কেন, তাঁহারা অবিকারে তাঁহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিবেন, এইটুকুই তাঁহারা জানিতেন। আর এ কথা নিঃসন্দেহ যে, যিনিই এই দৃশ্যের আলোচনা করিবেন, তিনিই এইটী হৃদয়ঙ্গম না করিয়া থাকিতে পারিবেন না

যে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ যেমন অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইত, স্বামিজীর পশ্চাতে এই গুরুভ্রাতৃগণ না থাকিলেও তাঁহার জীবন ও পরিশ্রম তেমনই বিফল হইয়া যাইত। প্রাচীন সাধুগণের মধ্যে একজন সম্প্রতি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে তৈয়ার করিবার জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কি তাই? না, জগন্মাতার একটীমাত্র মহীয়সী বাণীর এক অংশকে তাহার অংশান্তর হইতে নিশ্চয় পূর্ব্বক পৃথক্ করিয়া দেখা যেমন অসম্ভব, তেমনি এই দুই জনের জীবনকেও পৃথক্ করিয়া দেখা অসম্ভব? এই সকল জীবনের সম্যক্ আলোচনা করিতে করিতে অনেক সময় আমার এইরূপ মনে হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটী আত্মা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই জীবনের অর্দ্ধ-আলোকময় অংশে অনেকগুলি মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, এবং ইহাদের কোনটীর সম্বন্ধে পূর্ণ সত্যতার সহিত বলিতে পারা যায় না যে, এইখানে ইহার নিজ পরিধির শেষ, অথবা এইখানে ইহার সহিত অপর যেগুলির সম্বন্ধ, তাহাদের পরিধির শেষ।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

প্লেটো।

(শ্রীকানাইলাল পাল এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি বিশ্বজগৎ প্লেটোর মতে সদসৎ; ইহাকে সৎও বলিতে পারা যায় না, একেবারে অসৎ,—এ কথাও বলা অযৌক্তিক। ভাবপদার্থই সৎ পদার্থ; আর যে প্রণালী অবলম্বনে সেই ভাবপদার্থ আপনাকে আপনি বিকাশ করে তাহাই "অভাব" পদার্থ। বৈদান্তিক বলিবেন ইহাই 'মায়া'; সাংখ্যবাদী বলিবেন ইহাই 'প্রকৃতি'।

ভাবপদার্থ মূলতঃ এক এবং প্লেটোর মতে ইহার অপর নাম বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর। বিশ্বাত্মা বলিতে সার্ব্বজনীন ভাব বুঝায়; তাই ভাব ও অভাবের আপাতবিরোধের সামঞ্জস্যের জন্যই কি প্লেটো ঐ পদ ব্যবহার করিয়াছিলেন? বিশ্বের প্রকৃতি দ্বন্দ্বমিশ্রিত, আত্মার প্রকৃতি দ্বন্দ্বরহিত। বিশ্ব মাঝে নিয়মের দৃঢ় বন্ধন দৃষ্ট হয়, যেন তার স্বাধীন ইচ্ছা নাই বা থাকিতে পারে না; আত্মা স্বতঃই মুক্ত, স্বাধীনতাই তার জীবন। 'বিশ্বাত্মা' এই পদের দ্বারা প্লেটো এই দুইয়ের মূলতঃ ঐক্য বুঝাইতে চান। এখন প্রশ্ন হইতে পারে বাস্তবিক কি ইহাদের মূলতঃ ঐক্য আছে? ইতিপূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহার পর এ প্রশ্ন নিরর্থক; কারণ ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে সৎ পদার্থ নাই। তাহার পর আবার সৎপদার্থ হইতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয় না। তাহা হইলে আবার এক প্রশ্ন পুনরুত্থাপিত হয়, তবে অসৎ কি? ইহা আসিলই বা কোথা হইতে? বিষয়টী একটী উদাহরণ সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক:—সকলেই সুখ চায়; এমন লোক কেহ নাই যে সুখের জন্য লালায়িত নয়। কিন্তু দুঃখ না থাকিলে সুখের সুখত্ব কোথায় থাকিত? যেমন সুখ পাইতে হইলে সুখের সঙ্গে দুঃখেরও উপলব্ধি প্রয়োজন, অন্য কথায়, বিপরীতের ঐক্য-বন্ধন ভিন্ন সুখানুভূতি হয় না,—তেমনি জগৎ-জ্ঞানও বপরীতের—ভাব ও অভাবের—সম্বন্ধ ভিন্ন উদয় হয় না। সুখ যেমন আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য দুঃখকে বরণ করিয়া লয়, ভাবপদার্থও তেমনি আপনাকে বিকাশ করিবার জন্য অভাব-পদার্থের সাহায্য লয়, সাহায্য লয় বলিলাম বটে, কিন্তু সাহায্য বলিতে যে ভাবটী সচরাচর আমরা বুঝি এখানে সেটী গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। যথাযথ বলিলে বলিতে হয়, আত্মশক্তির সাহায্য।

বিশ্বাত্মা এই বিশ্বের মূল কারণ, এই বিশ্ব সেই মূল পদার্থের প্রতিকৃতি মাত্র। বিশ্বজগৎ পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং বিশ্বজগৎজ্ঞানও আপেক্ষিক। মূলপদার্থ ও সৎপদার্থ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানও নিরপেক্ষ। প্লেটোর এই কথা মনে রাখিয়া আমাদের জগতের অলোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথমেই জগতের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করা যাউক:—কবে এ জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা প্রথমেই বিচার্য্য। আমরা দেখিয়াছি

প্লেটোর মতে জগতের মূল কারণ ভাবপদার্থ। এই জগৎ-রচনা প্রণালী-বিশেষের অপেক্ষা রাখে এবং দেশ ও কাল সেই রচনার মূলপ্রণালী. জগৎকে দেশে ও কালে সুসজ্জিত না করিয়া আমরা ইহার চিন্তা করিতে পারি না। অন্য কথায়, জগৎজ্ঞান ও দেশকালের জ্ঞান পরস্পরাশ্রিত। কালের অস্তিত্ব নাই, জগতের অস্তিত্ব আছে, বা জগতের অস্তিত্ব নাই কালের অস্তিত্ব আছে—এরূপ জ্ঞান অসম্ভব। আমাদের বোধ হয়, তাই প্লেটো বলিয়াছেন জগৎ অনাদি। কালের জ্ঞান লইয়াই আদি ও অন্ত—জগৎ ও কাল যদি পরস্পরাশ্রিত হয়, তবে জগৎকে অনাদি ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? জগতের সৃষ্টিরহস্য কে বুঝিতে পারে? জগতের স্রষ্টা রহিয়াছে এবং কালে ইহার উৎপত্তি, এ কথা বলা যায় না। সৃষ্টি বলিতেই কোন সময়বিশেষে উৎপত্তি—সাধারণতঃ এইটাই বুঝায়, অথচ জগৎ কোন সময়বিশেষে উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে দোষ হয়।

এইখানে একটী প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়—মূল ভাবপদার্থ এই জগৎরূপে প্রকাশ হইবার কারণ কি? বৈদান্তিক বলেন, মায়া; বৈষ্ণব বলেন, লীলা। প্লেটো বলেন, সেই মূলপদার্থ চৈতন্যময় ও শক্তিসম্পন্ন, শক্তি থাকিলেই তার পরিচয় পাওয়াই স্বাভাবিক। এই জগৎ সেই শক্তির খেলা। সেই মূল-পদার্থ যে শুধু চৈতন্য ও শক্তি-সমন্বিত তাহাই নহে। তিনি সকলমঙ্গলালয় কল্যাণস্বরূপ সুতরাং তাঁর বিকাশে সেই মঙ্গলময়েরই ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

একথা এখন স্থগিত থাকুক। জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল সেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক। দেশ ও কাল, জগৎ-জ্ঞানের গোড়ার কথা; দেশকালকে পরিত্যাগ করিলে জগতের অস্তিত্বই থাকে না। প্রাচ্য দার্শনিকগণ বলেন, যে কোন পার্থিব বস্তু লওনা কেন, তাহাকে 'ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাচটী মূল ভূত (elements) ভিন্ন চিন্তা করিতে পারিবে না। রসায়ন শাস্ত্রে অপ্‌কে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনপরমাণুর মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ বলিলে আবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক উহাদিগকে Electron হইতে উদ্ভূত পদার্থ বলিবেন ও ঐ সকল পরমাণুকে মূল ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে। সে সকল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা

জগৎ-জ্ঞান লাভ করি এবং ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম ভিন্ন জগতের জ্ঞানলাভ অসম্ভব—এ সকল প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকের সিদ্ধান্ত। প্লেটো বলেন জগতের মূল উপাদান ক্ষিতি (earth), অপ্ (water), মরুৎ (air), তেজ (fire) এবং এই সকলের মূলে আবার দেশ (space) বর্ত্তমান। পাঠকবর্গ প্রাচীন আর্য্যঋষিদের সিদ্ধান্তের সহিত প্লেটোর মতের আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। প্লেটো পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিক গুরু, শুধু তাহাই নন, তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা বলিয়াও পাশ্চাত্য জগতে বিখ্যাত। সত্য দেশ কালের অপেক্ষা রাখে না, ইহা সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন, সুতরাং এবংবিধ মতসাদৃশ্য হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ঐ পাঁচটী মূল উপাদানকে বৈজ্ঞানিক ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণুতে বিভাগ করিতে পারেন কিন্তু ক্ষিত্যপ্তেজো-মরুদ্ব্যোম এই পাঁচটী উপাদান দর্শন শাস্ত্রে যে প্রয়োজন সাধন করে তাহা বৈজ্ঞানিকের Electron theory (ইলেক্‌ট্রন তত্ত্ব) সাধন করিতে অক্ষম। সেই মূল পদার্থ "অণোরণীয়ান্"—অণু হইতেও অণু, আবার "মহতো মহীয়ান্—মহৎ হইতেও মহান্। জানি না বৈজ্ঞানিক সেই অণুর কোন দিন সন্ধান পাইবেন কি না।

অবশ্য কি প্রণালী অবলম্বনে মূল উপাদানের সৃষ্টি হইল প্লেটো সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। যাউক সে কথা। জগতের সহিত এই উপাদানগুলির সম্বন্ধ কি দেখা যাক। কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে গেলে সেটী চক্ষুগ্রাহ্য ও স্পর্শযোগ্য হওয়া প্রথমে আবশ্যক, সুতরাং তেজ ও ক্ষিতির অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। এই দুইটী উপাদান ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অপর দুইটী উপাদান অপ্ ও বায়ুকে তিনি জগৎ রচনার মূল উপাদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটী উপাদানের মধ্যবর্ত্তী অপর দুইটী উপাদান কেন তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সকল কথার আলোচনা করিতে হইলে অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়। আশা করি সে আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জগৎ যে অনিয়মের রাজত্ব নয়, ইহার মধ্যে যে একটী নিয়ম আছে, সবই সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, একটু প্রণিধান করিলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। শৃঙ্খলা থাকিতেই হইবে, কারণ মূলে যে চৈতন্যময় পদার্থ রহিয়াছে। সেই মূল উপাদান ক্ষিতি,

অপ্, বায়ু ও তেজের মধ্যেও একটী শৃঙ্খলা থাকা চাই। ক্ষিতি ও তেজ এই দুইটীই প্রথমে স্বীকার করা প্লেটোর পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছিল, সে কথা উপরে কথিত হইয়াছে। প্লেটো বলেন, সে দুইটী উপাদানের মধ্যবর্ত্তী অপর উপাদান থাকাই স্বাভাবিক। স্বীকার করিলাম, কিন্তু সে উপাদান একটী বা তিনটী না হইয়া দুইটী হইল কেন? তদুত্তরে প্লেটো বলেন, নতুবা শৃঙ্খলা থাকে না। প্লেটো শুধু আদর্শ দার্শনিক নহেন, তিনি গ্রীসদেশে জন্মগ্রহণ করায় সৌন্দর্য্যেরও আদর জানিতেন। আর এক কথা, অঙ্কশাস্ত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ সহায়ক এবং তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার ফলে জগতের শৃঙ্খলা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া তিনি যে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য লইবেন, সেটী কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কথা নয়। অঙ্কশাস্ত্রে হারাহারি নিয়মে (Proportion) যে সকল সংখ্যা সন্নিবিষ্ট তাহাদের মধ্যে বেশ একটু শৃঙ্খলা আছে। ৪ ও ৯ এই দুইটী সংখ্যা লওয়া যাউক। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী সংখ্যার সহিত উভয়ের বেশ একটী শৃঙ্খলা আছে, যথা ৪ : ৬ :: ৬ : ৯। আরও একটী কথা—পিথাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যা দ্বারা পদার্থের, এমন কি জগতের, ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। প্লেটো পিথাগুরু সম্প্রদায়ের মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেটী স্মরণ থাকা চাই, নতুবা আমাদের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হইবে। উপরে যাহা উক্ত হইল তাহা হইতে বুঝা গেল ৪ ও ৯ এই দুইটী সংখ্যার মধ্যবর্ত্তী সংখ্যা ৬ হইলে এই তিনটী সংখ্যা বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে; অন্য কোন সংখ্যা লইলে ওরূপ শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। এখন আমাদের বক্তব্য বিষয় লওয়া যাউক। জাগতিক যে কোন পদার্থ লও না কেন তাহা ত্রিগুণাত্মক; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবে তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতা বা ঘনতা এই তিনটী গুণ স্বীকার করিতে হইবে। দুইটী ঘনক্ষেত্র (cube) লও। একটীর দীর্ঘ প্রস্থ ও ঘনতার পরিমাণ ২, ও অপরটীর পরিমাণ ৩ মনে কর। অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবে একটীর মোট ক্ষেত্রফল বা পরিমাণ ৮, অপটীর ২৭; ৮ ও ২৭ এই দুইটী সংখ্যাকে হারাহারি সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হইলে, দুইটী সংখ্যার প্রয়োজন হয়। যথা ৮ : ১২ :: ১৮ : ২৭। ১২ ও ১৮ এই দুইটী মধ্যবর্ত্তী সংখ্যা লইলে তবেই ৮ ও ২৭কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যায়। এস্থলে ১২ = ২ × ২ × ৩ ও ১৮ =

৩×৩×২। এরূপ সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা অপর কোন সম্বন্ধে সাধিত হইতে পারে না। আমরা ঘনক্ষেত্রের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিলাম; কারণ ঘনক্ষেত্রের তিনটী দিক আছে এবং পার্থিব পদার্থের সহিত উহার সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং আমরা ২ ও ৩ সংখ্যা লইলাম কারণ উহা অবিভাজ্য ও ১ এর ঠিক পরবর্ত্তী। জগতের মূল ভূতের অন্বেষণে অন্য কোন সংখ্যা লওয়া বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হয় না। প্লেটোর এবংবিধ যুক্তিকৌশলে কোন কোন দার্শনিক ঐতিহাসিক আস্থা প্রদান না করিয়া বলেন যে লঘু হইতে ক্রমশঃ গুরুতর মূল পরমাণুর পরিচয় প্রদান করিবার জন্যই প্লেটো ঐ চতুর্ব্বিধ উপাদানের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা এ বিষয়ে অধিক আর না লিখিয়া সুধী ও চিন্তাশীল পাঠকবর্গের উপর সে মীমাংসার ভার অর্পণ করিয়া আমাদের বক্তব্য অন্য বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইলাম।

প্লেটো জগতের ঐ চতুর্ব্বিধ মূল উপাদানের গঠন কি প্রকার তাঁহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। ক্ষিতিকে ঘনক্ষেত্র (cube) বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সংমিশ্রণের ফলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি—এ কথাও তিনি প্রচার করিয়া যান। অপর পক্ষে সেই অবয়বগুলিকে ত্রিকোণে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন একের সহিত অপরের সম্বন্ধ সহজেই সংঘটিত হইতে পারে এবং এই প্রসঙ্গে আরও প্রকাশ করেন যে, সেই আকৃতিগুলি সীমাবদ্ধ দেশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ)

বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে টিনেভেলির অন্তর্গত শ্রীনগরীতে বিষ্ণুভক্ত শ্রীশঠকোপ শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের কাল ঠিক নির্ণয় করা যায় না। জনশ্রুতি এইরূপ যে, কলিযুগ

আরম্ভ হইবার ৪৩ দিন পরে শ্রীশঠকোপ ভূতলে অবতীর্ণ হন। তিনি ভগবানের পার্শ্বচর বিশ্বক্সেনের অবতার। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তিনি কিছুই আহার করেন নাই। একটী পবিত্র তেঁতুল গাছের তলায় বসিয়া তিনি ১৬ বৎসর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। এই সময় মথুরাকবি নামে একটী মহাপুরুষ তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে অযোধ্যাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক দিবস রাত্রি-কালে দক্ষিণ দিগন্তে একটা উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইলেন। সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া রাত্রির পর রাত্রি চলিতে চলিতে বহু দিবস পরে তিনি শ্রীশঠকোপের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশঠকোপের সংসর্গে আসিয়া মথুরাকবির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি শ্রীশঠকোপের প্রধান শিষ্য হইলেন এবং ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।

দীর্ঘ সমাধির পর শ্রীশঠকোপের ঈশ্বর দর্শন হইল। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহার প্রচার মানসে তিনি "দিব্য প্রবন্ধ" রচনা করিলেন। "দিব্য প্রবন্ধ" চারি অংশে বিভক্ত। তাহাতে তামিল ভাষায় চারি বেদের সারভাগ সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্য শেষ হইবার পর শ্রীশঠকোপ যথাসময়ে দিব্যধামে গমন করিলেন। তিনি ৩৫ বৎসর কাল পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

বহুকাল অতীত হইল। সময়ের প্রভাবে "দিব্য প্রবন্ধের" প্রচার দেশ হইতে তিরোহিত হইল। এই সময়ে চোলরাজধানী বীরনারায়ণপুর নগরে নাথমুনি নামে এক প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ভক্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ঘটনা ক্রমে এক দিন "দিব্য প্রবন্ধের" একটী শ্লোক শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া তিনি ঐ রচনা সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করিবার মানসে শ্রীশঠকোপের জন্মস্থান শ্রীনগরীতে গমন করিলেন। তথায় শ্রীশঠকোপের বিগ্রহ বহুদিন আরাধনা করায় শ্রীশঠকোপ তাঁহাকে ''দিব্য প্রবন্ধে'' এবং যাবতীয় বিভিন্ন বিদ্যায় শিক্ষাদান করিলেন। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। পরে স্বপ্নে ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ''দিব্য প্রবন্ধে" সুরযোগ করিয়া ইহাকে স্বর্গীয় সঙ্গীতে পরিণত করিলেন। নাথমুনি তাঁহার পুত্র ঈশ্বর ভট্টকে বলিলেন, "তোমার পুত্রের নাম রাখিও যামুন। আমার শিষ্যেরা তাহাকে আমার উপদেশসকল শিক্ষা দিবে।" নাথ মুনির দেহত্যাগের পর তাঁহার

শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষ এবং তাঁহার পর রামমিশ্র গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামমিশ্র যথাকালে সংবাদ পাইলেন যে ঈশ্বর ভট্টের একটী পুত্র হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। বালকের নাম রাখা হইল যামুনাচার্য্য। এই যামুনাচার্য্যই রামানুজের গুরু।

যামুনাচার্য্য তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে অল্প আয়াসে শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মহাভাষ্য ভট্ট নামক গুরুর নিকট তিনি অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি রাজবাটীর অত্যাচারী সভাপণ্ডিতকে রাজসম্মুখে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাহার দর্পচূর্ণ করেন এবং "আড়বণ্ডয়" নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করেন।

যামুনাচার্য্য সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রামমিশ্র তাঁহার গুরুদেবের আদেশ অনুসারে যামুনাচার্য্যকে শিক্ষাদান করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। যামুনাচার্য্য এখন বড়লোক। বহু কষ্টে তিনি তাঁহার দেখা পান। রামমিশ্র যামুনাচার্য্যকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। রামমিশ্রের শিক্ষাপ্রভাবে যামুনাচার্য্যের হৃদয়মধ্যে ধূমায়মান বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে রামমিশ্র যখন তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া গিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন সেই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে যামুনাচার্য্যের হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সংসারের প্রতি তাঁহার সকল আসক্তি তিরোহিত হইল, তিনি সেই ক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা এবং শিষ্যগণকে শিক্ষাদান এই দুই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, শ্রীশৈলপূর্ণ, কাঞ্চীপূর্ণ ও মালাধরের নাম প্রসিদ্ধ।

এই শ্রীশৈলপূর্ণের দুই ভগিনী ছিল, কান্তিমতী ও দীপ্তিমতী। কান্তিমতীর গর্ভে ও কেশব সোমযাজিনের ঔরসে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। * তাঁহার ভক্তদের বিশ্বাস যে, তিনি ভগবান্ অনন্তের অবতার, ত্রেতাযুগে তিনি

* ১০১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামানুজাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দ্বাপর যুগে বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। ষোড়শ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই সময়ে যাদব-প্রকাশ নামে একজন সন্ন্যাসী অদ্বৈতমতে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামানুজ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীশৈল-পূর্ণের অপর ভগিনী দীপ্তিমতীরও একটী পুত্র হইয়াছিল। তাহার নাম গোবিন্দ। গোবিন্দও যাদবপ্রকাশের নিকট গিয়া ভ্রাতা রামানুজের সহিত বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বেদান্তের দুইটী বাক্যের অর্থ লইয়া যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের মতদ্বৈধ হয়। ইহাতে যাদবপ্রকাশ রামানুজের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। এই অভিপ্রায়ে যাদবপ্রকাশ তীর্থদর্শনের ছলে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাতীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল গঙ্গাস্নান করিতে লইয়া গিয়া রামানুজকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিবেন। তাঁহারা সকলে যখন বিন্ধ্যারণ্যের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন একদিন গভীর রাত্রে গোবিন্দ রামানুজকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া এই ভণ্ড সন্ন্যাসীর দুরভিসন্ধির কথা জানাই-লেন এবং তাঁহাকে পলাইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। রামানুজ তথা হইতে পলাইলেন কিন্তু অরণ্যমধ্যে পথ হারাইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইলেন। এরূপ সময়ে অপরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন এক ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নী তাঁহার নয়নগোচর হইলেন। ব্যাধ বলিলেন তিনি কাঞ্চী যাইবেন। রামানুজ তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। একদিবসের মধ্যে বিন্ধ্যারণ্য হইতে কাঞ্চী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী অদৃশ্য হইলেন। রামানুজ তখন বুঝিতে পারিলেন যে লক্ষ্মীনারায়ণ দয়া করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। তিনি কাঞ্চীতে বাস করিতে লাগিলেন এবং ব্যাধনির্দ্দিষ্ট কূপ হইতে প্রত্যহ এক ঘটী জল মন্দিরে ভগবানের স্নানের জন্য লইয়া যাইতেন। যাদবপ্রকাশ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। গোবিন্দ কালহস্তীতে গিয়া মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। যাদবপ্রকাশ কাঞ্চীতে আসিয়া রামানুজের প্রত্যাবর্ত্তনের বৃত্তান্ত শুনিয়া কপট অনুরাগ প্রকাশপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিল।

এদিকে শ্রীরঙ্গমে থাকিয়া যামুনাচার্য্য দুই একটী বৈষ্ণবের মুখে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। আনন্দ ও বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি রঙ্গনাথের * অনুমতি লইয়া কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাদবপ্রকাশের শিষ্যগণের মধ্যে রামানুজকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভক্তদের বিশ্বাস যে, এই সময়ে যামুনাচার্য্য তাঁহার নিজের সমগ্র শক্তি ও জ্ঞান ভাবী গুরুর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাহার পর যামুনাচার্য্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন যেন রামানুজের দ্বারা তাঁহারই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর তাঁহার সহিত রামানুজের দেখা হয় নাই।

এই সময় একটী অলৌকিক ঘটনার দ্বারা শ্রীরামানুজের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দেশের রাজকন্যাকে একটী ব্রহ্মরাক্ষস পাইয়া বসে। রাজা কত চেষ্টা করিলেন, কন্যা কিছুতেই ভাল হইল না। যাদবপ্রকাশ নীরোগ করিয়া দিবে বলিয়া খুব দম্ভ করিয়া গেল; কিন্তু ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিল। তখন রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কাহার কথা শুনিবে?" রাক্ষস বলিল, "রামানুজের কথা"। রামানুজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনুরোধ করাতে রাক্ষস রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজা রামানুজকে অনেক ধন দৌলত দিতে চাহিলেন। রামানুজ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই দুইটী বৈদান্তিক বাক্যের ব্যাখ্যা লইয়া রামানুজের সহিত যাদবপ্রকাশের তৃতীয় ও শেষবারের জন্য বিরোধ হয়। রামানুজ তথা হইতে চলিয়া আসেন এবং বরদরাজস্বামীর আরাধনায় নিযুক্ত হন। এই সংবাদ যামুনাচার্য্যের নিকট পৌঁছিল। যামুনাচার্য্য আহ্লাদিত হইয়া রামানুজকে তাঁহার নিকট আনিবার জন্য তাঁহার শিষ্য মহাপূর্ণকে কাঞ্চীতে প্রেরণ করেন। মহাপূর্ণ কাঞ্চীতে গিয়া ভগবান্ বরদরাজস্বামীর অনুমতি লইয়া রামানুজের সহিত শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নগরের নিকট জনতা দেখিয়া তাঁহারা কারণ

* শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু-বিগ্রহের নাম রঙ্গনাথ।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এইমাত্র যামুনাচার্য্যের দেহত্যাগ হইয়াছে এবং নগরবাসীরা তাঁহার অনুগমন করিয়া শ্মশানে চলিয়াছে। রামানুজ ও মহাপূর্ণ উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামানুজ বলিতে লাগিলেন, "হায়, এই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে বসিয়া আমার শিক্ষালাভ করা হইল না।" শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে উভয়ে কাবেরীর তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রামানুজ শুনিলেন যে, ব্রহ্মসূত্রের একটী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদানুযায়ী ভাষ্য লিখিবার সাধ জীবনে পূর্ণ হইল না বলিয়া যামুনাচার্য্য মরিবার পূর্ব্বে আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন রামানুজ সমবেত শিষ্যমণ্ডলী ও জনসমূহের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন যে, পরলোকগত গুরুদেবের অপূর্ণ বাসনা তিনি পূরণ করিবেন। ভক্তমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যামুনাচার্য্যের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, সেই প্রাণহীন শরীরও ইঙ্গিতের দ্বারা এই সাধু সঙ্কল্পের অনুমোদন করিল।

রামানুজ বলিলেন, "প্রভু রঙ্গনাথ আমাকে একবার গুরুদেবের অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিবার সুযোগ দিলেন না কেন? আমি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছি। আমি আর তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব না। আমি কাঞ্চীতে ফিরিয়া যাইব।" এই বলিয়া তিনি কাঞ্চী ফিরিয়া গেলেন।

রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের সাহচর্য্যে কিছুদিন থাকিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, প্রভু বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণের ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তখন রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ নিজে ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিবার মানসে তাঁহাকে নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ভোজনের দিবস, রামানুজ যখন তাঁহাকে আহ্বান করিতে আসেন, সেই সময় ভিন্ন পথ দিয়া রামানুজের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং রামানুজের স্ত্রীকে বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র অন্ন পরিবেশন করুন, আমাকে এইক্ষণেই মন্দির যাইতে হইবে।" রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের গৃহে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এ দিকে কাঞ্চীপূর্ণ ভোজন সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি ব্রাহ্মণ নয় জানিয়া রামানুজের পত্নী

উচ্ছিষ্ট সহ পাতাখানি একটী যষ্টির সাহায্যে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রামানুজ ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইলেন এবং তিনি যাঁহাকে এরূপ শ্রদ্ধা করেন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে এইরূপ হীন জ্ঞান করিয়াছেন জানিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে বলিলেন, "আপনি প্রভু বরদরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বলিয়া দেন আমি কাহার নিকট শিক্ষা পাইব।" কাঞ্চীপূর্ণ ভগবান্ বরদরাজের নিকট জানিলেন যে, রামানুজ যামুনাচার্য্যের অপর শিষ্য মহাপুর্ণের নিকট শিক্ষা পাইবেন। তদনুসারে রামানুজ শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ দিকে মহাপূর্ণও পরলোকগত গুরুদেবের শিষ্যমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া রামানুজকে শিক্ষাদান করিবার জন্য কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মধুরান্তকম্ নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। রামানুজের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মহাপূর্ণ তত্রত্য ভগবান্ তটাকপালকের মন্দির প্রাঙ্গণস্থ বকুলবৃক্ষের তলায় তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। অতঃপর উভয়ে কাঞ্চীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাপূর্ণ রামানুজের গৃহে অবস্থান করিয়া ছয় মাস কাল ধরিয়া রামানুজকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আত্মদোষানুসন্ধান ও মায়াবাদ।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

এই পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি মহাপুরুষ, সাধু পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি আখ্যা পাইয়া আমাদের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের ভিতরের দিকটা ভাল করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনার যদি আমরা সুযোগপ্রাপ্ত হই তবে দেখিতে পাই, তাঁহারা সকলেই নিজের সঙ্গে নিজে বিশেষভাবে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের নিজের দোষটা বিশেষভাবে জানিবার ও বুঝিবার বিশেষ চেষ্টা ছিল এবং তাহার ফলে তাঁহারা বড় হইতে ক্রমশঃ ছোটখাট দোষ পর্য্যন্ত ধরিয়া নিজেকে সংশোধনের জন্য প্রবল সংগ্রাম করিয়া

গিয়াছেন এবং অবশেষে অল্পাধিক পরিমাণে সফলতাও লাভ করিয়াছেন। আমরা সচরাচর পরচর্চ্চায় এতদূর নিমগ্ন হইয়া থাকি যে, আত্মচর্চ্চা ও পরমাত্মচর্চ্চা ভুলিয়াই যাই। পরের দোষটা সামান্য হইলেও খুব বড় করিয়া দেখি, আর নিজের প্রবল দোষ থাকিলেও তাহাকে সামান্য বা তুচ্ছ প্রতিপাদনের চেষ্টা আমাদের অন্তরে বিশেষ প্রবল থাকে। মহাপুরুষ যিনি, তাঁর ঠিক বিপরীত। তিনি নিজের মনে পর্য্যন্ত কখন কুচিন্তা অতি সামান্য ভাবে উঠিলেও নিজেকে ক্ষমা করেন না, নিজেকে মহা অপরাধী জ্ঞান করেন, আর কতক্ষণে কিরূপে সে দোষ হইতে নিজেকে উদ্ধার করিবেন, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। এই প্রবল চেষ্টার নামান্তরই সাধনা—ইহাতেই সাধককে নির্জ্জনপ্রিয় করিয়া তুলে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি এক একটা দোষের মূল কারণ পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিতে পারেন, ততক্ষণ সেই চেষ্টা হইতে বিরত হন না।

এইরূপ চেষ্টার বিশেষ উপকারিতা এবং মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনে উহার উপযোগিতা সম্বন্ধে বোধ হয় মতদ্বৈধ হইতেই পারে না। তবে আমরা মোহবশে অনেক সময়ই ইহা ভুলিয়া থাকি এবং প্রমাদরহিত হইয়া সদাসর্ব্বদা ইহাতে নিযুক্ত থাকি না। তজ্জন্যই মধ্যে মধ্যে এই বিষয়টী নিজে স্মরণ করিলে ও অপরকে স্মরণ করাইয়া দিলে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উন্নতির বিশেষ সহায়তা হয় বলিয়াই মনে হয়।

আমার কখন কখন মনে হয়, এই তত্ত্বটা শুধু যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেই উপযোগী তাহাই নহে, ইহার একটা দার্শনিক দিকও আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই দার্শনিক দিক্‌টাই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

এই জগৎসমস্যার আলোচনা করিতে গিয়া চিন্তাশীল মনীষী দার্শনিকগণ বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা এই জগতে সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ প্রভৃতি দ্বন্দ্বকে আলোক ও ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা সহাবস্থিত দেখিতে পাই। তবে প্রকৃতিবিশেষে কেহ সুখের দিক্‌টাই বড় করিয়া দেখেন, অপরের দৃষ্টিতে আবার দুঃখের দিক্‌টাই উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। অমঙ্গলের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল—বহু দার্শনিক এই সমস্যার মীমাংসায় ব্যাপৃত হইয়াছেন এবং তাহার ফলে কেহ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রতিযোগী শয়তান নামক পুরুষবিশেষের, কেহ বা আহ্রিমান নামক অমঙ্গল-

কারী ঈশ্বরের, কেহ বা মার, অসুর ইত্যাদি নানা কল্পনা করিয়াছেন। সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তার ফলে অবিদ্যা, মায়া প্রভৃতি নানাবিধ রহস্যময় শক্তিও এই অমঙ্গলের কারণরূপে কল্পিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই অমঙ্গলের মূল যদি আমরা বাহিরের কোন বস্তু, শক্তি বা ঈশ্বরে আরোপিত করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজের উপর আরোপিত করি, তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত সমাধানের একটা যথার্থ সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই জগতে মঙ্গলামঙ্গল যাহা কিছু আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা আমারই মনের অবস্থাবিশেষের ফলমাত্র। যদি আমি আমার মনকে সম্পূর্ণ দোষলেশশূন্য করিতে পারি, তবে আমার দৃষ্টিতে সমুদয়ই মঙ্গলময় হইয়া যাইবে। এই যে বাহিরে অত্যাচার, পাপের রাজত্ব দেখিতেছি, আমার ভিতরে উহা রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরে উহা দেখিতেছি। এই যে বাহিরে নানাবিধ জড় বস্তু দেখিতেছি, উহা আমার মনের জড়ধর্ম্ম বশতঃই। যদি আমি নিজেকে সম্পূর্ণ চৈতন্য-ময় করিতে পারি, তবে বাহিরে চৈতন্য ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইব না।

এই তত্ত্বের প্রমাণ যদি কেহ চান, তাঁহাকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিতে অবশ্য পারিব না—এমন যুক্তিজাল সান্নবেশিত করিতে পারিব না, যাহাতে ইহা একে-বারে অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই-রূপ সময় সময় মনে হয়—মনের এক একটা খেয়াল কেন আসে, সব সময় তাহার সঠিক যুক্তি দিতে পারা যায় না অথচ হৃদয় হইতে কে যেন বলে, উহা-সত্য, সত্য—উহাতে তিলমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে অবশ্য আমার এই খেয়ালের ভিত্তি সম্বন্ধে কতকটা এমন আভাস দিতে পারিব আশা করি, যাহাতে অপরের এতৎসম্বন্ধে কতকটা বিশ্বাস উৎপাদন করান যাইতে পারে।

একই বাহ্য অবস্থার ভিতরেও মনের অবস্থার তারতম্যে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, সামান্য পর্য্যবেক্ষণেই এ তত্ত্ব বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হয়। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন মহাপুরুষের দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তবে দেখিব, তাঁহার জীবন বাহ্য ঘটনার উপর মনের আধিপত্যের এক অতি উজ্জ্বল উদাহরণ। শারীরিক ব্যাধি, শোকদুঃখের নানা কারণ সত্ত্বেও মহাপুরুষ অবিচলিত—শুধু অবিচলিত নহেন, তিনি—আমরা যাহাকে দুঃখ কষ্ট

বলি, তাহা লইয়া যেন আরও বেশী বেশী গভীর আনন্দে মাতিয়া যাইতেছেন পওহারী বাবাকে গোখুরা সাপ কামড়াইল—তিনি তাহাতে অচেতন হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ হইলে বলিলেন—'পাহন দেওতা' আসিয়াছিল। আমার পরম কুটুম্ব—সেই প্রিয়তম ভগবানের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। চোরে তাঁহার পূজার বাসন কোসন চুরি করিতে আসিল, তিনি নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার নাগাল পাইয়া তাহাকে সেই সকল বাসন গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ করিতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাধু নাগমহাশয়ের বাটীতে আগুন লাগে লাগে হইয়াছে, তিনি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন—সাধু মন্মথের মাথায় ঘা হইয়া তাহাতে পোকা হইয়াছে—পোকাগুলি পড়িয়া গেলে তিনি আবার তাহাদিগকে তুলিয়া সেই স্থানে স্থাপন করিতেছেন। এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ বা বিশ্বস্তসূত্রে শ্রুত ঘটনা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহাতে বোধ হয়, ঐ সকল ব্যক্তির মনের কেন্দ্র যেন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। আমাদের কেন্দ্র বলে—সুখের জন্য প্রাণপণ কর, দুঃখকে পরিহার করিবার উপায় কর, আর উক্ত ব্যক্তিগণের মনের কেন্দ্র দুঃখকে চায়, সুখকে বিষবৎ পরিহার করে। এক কথা লোকে বলিতে পারে, উহারা পাগল। কিন্তু মস্তিষ্কের বিকারে পাগল হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা ত ইঁহাদের দেখা যায় না, বরং আমরা প্রাণে প্রাণে যে আদর্শ অবস্থা লাভের ইচ্ছা বা প্রয়াস করিয়া বার বার বিফলমনোরথ হই, ইঁহারা সেইটী পাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তাঁহাদিগকে আমরা উন্মাদ পর্য্যায়ে না ফেলিয়া মহাপুরুষশ্রেণীতে ফেলিয়া থাকি এবং তাঁহাদের প্রতি তদুচিত ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকি। আর এইরূপ পাগল যদি জগতে না থাকিত, যদি বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি পাগলের জগতে অভ্যুদয় না হইত, তবে আমরা আজ কি লইয়া থাকিতাম?

ঐ প্রকার মহাপুরুষগণ সচরাচর দুই অবস্থায় অবস্থিত থাকেন—এক অবস্থাকে বাহ্যদশা ও অপরটীকে অন্তর্দ্দশা বলা যায়। অথবা ব্যুত্থান ও সমাধি অবস্থা। দেখিতে পাই, বাহ্যদশায় তাঁহাদের জীবনের একটী প্রধান

লক্ষণ হয়—সর্ব্বভূতানুকম্পী—তাঁহাদের হৃদয় অনাথ পাপী তাপী প্রভৃতির প্রতি সতত প্রেমপ্রবণ। যদি তাঁহারা ঐ সকল লম্পট চোর ডাকাত পাপীকে আমাদের দৃষ্টিতে দেখিতেন, তবে কি তাঁহারা কখনও তাহাদের প্রতি ওরূপ প্রেমসম্পন্ন হইতে পারিতেন? কখনই না। সুতরাং তাঁহারা উহাদের ভিতর নিশ্চয়ই আরও কিছু দেখেন, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহারা নিজেরা ভাল হইয়াছেন, তাই সকলকেই ভাল দেখিয়া থাকেন—তাঁহারা 'আপ ভালা ত জগৎ ভালা' এই প্রবচনের সাক্ষাৎ উদাহরণ-স্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহারা বেশ্যা, মাতাল, চোরকে ঘৃণা করেন না, তাহাদিগকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন না—বেশ্যাকে দেখেন মা আনন্দময়ী। আবার যখন তাঁহারা অন্তর্দ্দশা বা সমাধি অবস্থায় বসিয়া থাকেন, তখন যে তাঁহারা কি দেখেন, তাহা ত আমরা অনায়াসে অনুমানই করিতে পারি। তাঁহারা তখন আর আমাদের দৃষ্ট এ জগৎ দেখেন না—কোন দিব্য জগতে, কোন অমৃত-জগতে বিচরণ করেন—দিব্য পুরুষগণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয়, তাঁহারা দিব্য বাণীসমূহ দিব্যকর্ণে শ্রবণ করেন।

মহাপুরুষগণ-উপভোগ্য এই পরমানন্দময় অবস্থা লাভই কি আমাদের সকলের প্রার্থনীয় নহে?

আত্মৈব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরতঃ আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্ এবংমন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি—

ছান্দোগ্য—৭ম প্রপাঠক।

তিনি দেখেন, আত্মা নীচে রহিয়াছেন, উপরে রহিয়াছেন, সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, সর্ব্বত্র আত্মা বিদ্যমান—সমুদয়ই আত্মা—তিনি এইরূপ দেখিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ জানিয়া আত্মাতেই রতিসম্পন্ন হন, আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মা ব্যতীত তাঁহার আর দ্বিতীয় সহচর কেহ থাকে না, তিনি আত্মাতেই আনন্দ অনুভব করেন, তিনি আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করেন।

বলিতে পার, এটা ভ্রান্ত দৃষ্টি। ইহাই সমস্যা। মহাপুরুষগণ-দৃষ্ট এই আনন্দময় অবস্থাই ভ্রান্ত বা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র পুরুষগণ-দৃষ্ট অমঙ্গলময়

সুখদুঃখপূর্ণ জগৎ? আমার ত মহাপুরুষদের দর্শনকেই সত্য বলিয়া মানিতে ইচ্ছা হয়।

আচ্ছা, বুঝিলাম, নিজদোষ দর্শন করিয়া ক্রমাগত সংশোধন করিতে করিতে যখন চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধিলাভ করিবে, তখন আমরা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম-ব্যতীত অন্য কোন সত্তা দর্শন করিব না—অদ্বৈতবাদের—মায়াবাদের যথার্থ সত্যতা বুঝিতে পারিব, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা—এই তত্ত্ব তখন প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু ইহাই ত আমার উপকার হইল—জগতের, তাহাতে দুঃখকষ্টের কি উপশম হইল? আমি না হয় একরূপ আফিমের নেশার মত ব্রহ্মানন্দে ভোর রহিলাম, কিন্তু জগতে দুঃখকষ্ট ত যেমন তেমনই চলিতে লাগিল। তবে সমস্যার মীমাংসা হইল কই? এ সম্বন্ধে আমার মনে হয় এই মীমাংসা প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টিগতই হইয়া থাকে, সমষ্টিগত কখনও হয় না, হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কিন্তু যাঁহারা ঐরূপে নিজ সমস্যা নিজে মীমাংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরে এরূপ শক্তির প্রকাশ হয় যে, তাঁহাদের গূঢ় প্রভাবে অপরের ভিতরও অল্পাধিক পরিমাণে সেই ভাব সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ক্রমে উক্ত সমস্যাপূরণে সমর্থ করে। ইহাই কি সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ নহে? কেবল লোককে জড়ীয় ও ভৌতিক সুখসম্পন্ন করিতে পারিলেই কি তাহার উপকার করা হইল? তাহাও প্রকৃতভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে মহা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়—শুধু জড়বাদ বা তৎপ্রসূত নীতির প্রেরণায় সেই লোককল্যাণশক্তি আবির্ভূত হয় না। নিঃস্বার্থতাই ত পরোপকারের মূলমন্ত্র—এই নিঃস্বার্থতা পূর্ণমাত্রায় কি করিয়া আসিবে, যদি নিজের ক্ষুদ্র অহং এর সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়া উহাকে একেবারে ক্ষাণ করিতে না পারা যায়?

আমার বক্তব্য হইতেছে এই যে, জগতের অমঙ্গল-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা এই যে, কোন বহিঃস্থ কাল্পনিক বা বাস্তব ব্যক্তি বা শক্তিকে উহার জন্য দায়ী না করিয়া সমুদয় দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লওয়া। আর নিজদোষানুসন্ধানে সচেষ্ট ও উহার সংশোধনে প্রাণপণ- ব্যক্তিরই ক্রমশঃ এই ভাবের বিকাশ সম্ভব। মূল মর্ম্মকথাটা যদি বুঝিতে চেষ্টা করা যায়, তবে বুঝা যাইবে, মায়াবাদ বা অদ্বৈত-বাদের উহাই সেই দর্শন— যাহা আমারই উপর সমুদয় দায়িত্ব নিক্ষেপ করে—

যাহা বলে, তুমি তিমির-রোগগ্রস্ত বলিয়াই দুটী চন্দ্র দেখিতেছ, প্রকৃত পক্ষে দুটী চন্দ্র নাই। তুমি ভ্রমেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝিতেছ, প্রকৃত পক্ষে রজ্জু কখনও সর্প হয় নাই।

মায়াবাদ-দর্শনকে এই ভাব দিয়া বুঝিলে উহাতে যে সকল সাধারণ আপত্তি উঠিয়া থাকে, তাহারও বড় অবকাশ থাকে না। মায়া পরমাত্মায়, না, জীবাত্মায়? যদি পরমাত্মায় মায়া থাকে, তবে তিনি মায়াগ্রস্ত আর যদি উহা জীবাত্মায় থাকে বলা যায়, তবে প্রশ্ন—এই জীবাত্মা ত 'মায়োপহিত' পরমাত্মা—তবে জীবাত্মার ভ্রমকে তুমি মায়া বলিতেছ, অথচ জীবাত্মার অস্তিত্বের পক্ষেই মায়ার সত্তা আবশ্যকীয়। আমি যে দিক্ দিয়া এই মায়াবাদে অগ্রসর হইতেছি, তাহাতে এ সকল আশঙ্কার প্রসঙ্গই থাকে না—কারণ, ইহাতে পরমাত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি ইত্যাদি ব্যাপার কল্পনার কোন প্রয়োজন হয় না। আমার অনেক দোষ আছে—আমি পূর্ণ নহি, অপূর্ণ—এ কথা অতি বালকেও বুঝিতে পারে—এই অপূর্ণতার ভাব—এই দোষের ভাব কি করিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া ঘুচাইতে পারি—ইহাই আমার একমাত্র চেষ্টা হইবে এবং আমি উহাতে যতই কৃতকার্য্য হইব, যতই আমার মন শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইবে, ততই আমি এ জগৎকে আর এভাবে দেখিব না—ক্রমশঃ ইহাকেই দেবলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক, বৈকুণ্ঠ, শিবলোকাদিরূপে দর্শন করিব, আর মনের পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহাকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপে দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

উচ্চ হইতে উচ্চতর জিনিষের কল্পনা না হইলে কখনও নিজ দোষদৃষ্টি সম্ভবপর নহে, সুতরাং এই আত্মদোষানুসন্ধান-চেষ্টায় সফলকাম হইবার প্রকৃষ্ট উপায় উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের চিন্তা বা মনন। যতই দৃষ্টি উচ্চাদর্শে নিবদ্ধ হয় ততই নিজেকে অতি হেয় বলিয়া বোধ হয়।

'অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি॥'

এই উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শকে আমাদের ধ্যানের বিষয় করিতে হইবে। আমরা যে দেবোপাসনা, ঈশ্বরোপাসনা, তত্ত্ববিচারাদি করিয়া থাকি তাহা প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চাদর্শেরই ধ্যানমাত্র। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বর।

যতদিন পর্য্যন্ত না সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে আমি নিজ অভিন্নতা সাধন করিতে পারিতেছি, ততদিন আমার দোষানুসন্ধানচেষ্টার বিরাম থাকিবে না—যখনই আমি আপনাকে অপর হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রেষ্ঠ ভাবিব, তখনই আমার অহংএর বিকাশ বুঝিতে হইবে এবং তখনই উচ্চাদর্শের ধ্যান হইতে আমার প্রচ্যুতি।

একটা সন্দেহ আসিতে পারে—নিজেকে ভগবদ্দাস, ভগবৎসন্তান বা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অথবা কোন শ্রেষ্ঠ আদর্শের সহিত অভিন্ন এইরূপ চিন্তা করাও কি চরমাদর্শলাভের অন্যতর প্রণালী নহে? তাহাতে আর নিজ-দোষানুসন্ধানের স্থান কোথায়? নিজদোষানুসন্ধান রূপ নেতিমুখ চেষ্টা মানুষের প্রথম সাধকজীবনে অবশ্য আরম্ভ হইবে, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে একটা ইতিমুখ চেষ্টাও আছে—সেইটাতে আমাদিগকে সবল ও বীর্য্যযুক্ত করিবে। আমি ভগবদ্দাস—আমাতে আর এ সংসারের দাসত্ব সাজে না, অথবা আমি ব্রহ্মস্বরূপ—কেন আপনাকে বৃথা মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি—এইরূপ চিন্তায় নেতিমুখ ও ইতিমুখ উভয় প্রকার সাধনাই সম্মিলিত থাকে—অবশ্য কোন অবস্থাবিশেষ সম্ভোগের সময় তন্ময়াবস্থায় অল্লাধিক কালের জন্য এইরূপ চেষ্টা স্থগিত থাকিতে পারে।

আত্মদোষানুসন্ধান ক্রমাগত করিলে ত দুর্ব্বলতা আসিতে পারে—আপনাকে পাপী পাপী ভাবিয়া বা কীট কীট বলিয়া মানব ক্রমশঃ আরও পাপী হইয়া দাঁড়াইতে পারে—কীটে পরিণত হইতে পারে—কারণ, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—এ আশঙ্কাও অমূলক। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি নিজ পাপিত্বের যথার্থ ধারণা করিতে হইলে পুণ্যের ধারণা ব্যতীত তাহা অসম্ভব—সুতরাং আত্মদোষানুসন্ধান যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তুমি দুর্ব্বল না হইয়া সবলই হইবে—ক্রমাগত অধোতে না যাইয়া উচ্চোচ্চতেই তুমি আরোহণ করিবে।

মূলকথা—আত্মপ্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে অগ্রসর হইতে হইবে। আমিত্বের সঙ্কোচ আর আমিত্বের প্রসার যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে একপ্রকার সাধনারই বিভিন্নভাবে বর্ণনা মাত্র। এই জীবকে সরাইয়া

তৎস্থলে শিবপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—জগৎকে সরাইয়া সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশে আপনাকে প্রকাশিত করিতে হইবে।

ওঁ তৎ সৎ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আবু পাহাড়।

১৮৯০।

প্রীতিভাজনেষু—

মন যে দিকেই যাউক না কেন নিয়মিত জপ করিতে থাকিবে। হ—কে বলিও যে, সে যেন প্রথমে বাম নাসায়, পরে দক্ষিণ নাসায়, এবং পুনরায় বাম নাসায়, এই ক্রমে প্রাণায়াম করে। বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সংস্কৃত শিখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,

বিবেকানন্দ।

আজমীঢ়।

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯১।

* * পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিও—উহাতেই সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত। * *

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আবু।

৩০ এপ্রিল, ১৮৯১।

প্রীতিভাজনেষু—

তুমি কি সেই ব্রাহ্মণ বালকটীর উপনয়ন সম্পন্ন করিয়াছ? তুমি সংস্কৃত পড়িতেছ কি? কতদুর অগ্রসর হইলে? আশা করি প্রথমভাগ নিশ্চয়ই

শেষ করিয়া থাকিবে।.........তুমি শিবপূজা পরিশ্রমের সহিত করিতেছ ত? যদি না করিয়া থাক ত করিতে চেষ্টা করিও। "তোমরা প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই সব পাইবে।" ভগবানকে অনুসরণ করিলেই ধনসম্মান তোমার উপরি পাওনা হইবে।.......কমাণ্ডার সাহেবদ্বয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইবে; তাঁহারা উচ্চপদস্থ হইয়াও আমার ন্যায় একজন দরিদ্র ফকিরের প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন বৎসগণ, ধর্ম্মের রহস্য আচরণে, ফাঁকা মতবাদে নহে। সৎ হওয়া এবং সৎ ব্যবহার করা—উহাতেই সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত। যে শুধু 'প্রভু, প্রভু' বলিয়া চীৎকার করে সে নহে, কিন্তু যে সেই পরমপিতার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে সেই ধার্ম্মিক। আলোয়ারবাসী যুবকগণ, তোমরা যে কয় জন আছ সকলেই উপযুক্ত লোক, এবং আমি আশা করি যে অচিরেই তোমাদের অনেকেই সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জন্মভূমির কল্যাণের হেতুভূত হইয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,

বিবেকানন্দ।

পুঃ—যদিই বা মাঝে মাঝে সংসারের এক আধটু ধাক্কা খাও তথাপি বিচলিত হইও না, নিমেষেই উহা চলিয়া যাইবে এবং পুনরায় সব ঠিকঠাক হইয়া যাইবে।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

যুক্তপ্রদেশ, আমেরিকা।

প্রীতিভাজনেষু—

* * সাধুতাই শ্রেষ্ঠ নীতি, এবং ধার্ম্মিক লোকের জয় হইবেই হইবে। ....বৎস, সর্ব্বদা মনে রাখিও আমি যতই ব্যস্ত, যতই দূরে অথবা যত উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গেই থাকিনা কেন, আমি সর্ব্বদাই আমার বন্ধুবর্গের প্রত্যেকের—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সামান্যপদস্থ তাঁহারও—জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং স্মরণ রাখিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

(নাইনীতালস্থ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে লিখিত)

আলমোড়া,
১৮৯৮।

প্রীতিভাজনেষু—

* * উহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের এবং চিন্তার সব শেষের কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানবসাধারণের ধর্ম্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানর বাহাদুরীটুকু পাইতে পারে, (কারণ, তাহারা কি হিব্রু, কি আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর জাতি) কিন্তু কর্ম্ম-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism) —যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে,—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকী আছে।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন, ব্যাবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে, এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপে যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইসলাম-পন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না,—এইমাত্র প্রভেদ।

এই হেতু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইসলাম ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্ম্মসকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধর্ম্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেকেই যাঁহার যেটী সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি সেইটীকেই বাছিয়া লইতে পারেন।

আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান মতের

সংহতিই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।......
আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীর দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন। * *

ভগবান আপনাকে মানবজাতির সাহায্যের জন্য একটী মহান যন্ত্রস্বরূপে গঠিত করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ।

নচিকেতা।*

কথিত আছে উদ্দালকপুত্র বাজশ্রবস মুনি বিশ্বজিৎ নামে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে মুনি এমন গোসকল দান করিয়াছিলেন, যে সকল গাভী জীবনে বেশী দিন জল পান করিবে না, তৃণ খাইবে না এবং কদাচ দুগ্ধবতীও হইবে না। দানের রকম দেখিয়া বাজশ্রবস মুনির পুত্র নচিকেতার বড় দুঃখ হইল। পুত্র জানিতেন 'কানা গরু বামুনকে দিলে' কোন পুণ্য নাই বরং প্রত্যবায় যথেষ্ট আছে। পিতার মঙ্গলের জন্য পুত্রের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। নচিকেতা বিনীতভাবে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমায় কাহাকে দিলেন?" নচিকেতা দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু পিতা কোন উত্তর দিলেন না, তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করায় পিতা রাগ করিয়া বলিলেন, "তোমায় যমকে দিলাম।"

নচিকেতা ভাবিলেন, "আমি বহু লোকের মধ্যে প্রথম এবং বহু লোকের মধ্যে মধ্যম। তবে কেন পিতা আমায় যমকে দিলেন? অধমের উপরই ত যমের অধিকার।" শ্রদ্ধাবান পুত্র বুঝিতে পারিলেন না যম তাহাকে লইয়া কি করিবে। নচিকেতা কদাচ নিজকে অধম ভাবিতে পারিলেন না। তিনি কি গুরুগৃহে, কি পিতৃসন্নিধানে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন সে শিক্ষায় তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, তিনি অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী। তিনি অমর।

---

* প্রবন্ধটী বালকদিগের জন্য লিখিত—শ্রীলেখক।

যে অমর, যমের নিকট যাইতে তাহার ভয় কোথায় ? পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য নচিকেতা পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রশান্তচিত্তে যমালয় উদ্দেশে গমন করিলেন। এ দিকে ধর্ম্মরাজ যম তিন দিন বাড়ী ছিলেন না। নচিকেতা ঠিক সেই সময় যমালয়ে উপস্থিত হইয়া যমের দর্শন না পাইয়া তিন দিন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

যম বাড়ী ফিরিয়া নচিকেতার আগমন ও তিন দিন অনাহারে বসিয়া থাকিবার কথা শুনিলেন। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নচিকেতার নিকট উপস্থিত হইয়া পূজাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রাহ্মণ ! তুমি অতিথি, তোমাকে প্রণাম ! তিন রাত্রি আমার গৃহে অনাহারে ছিলে, এজন্য প্রত্যেক রাত্রের জন্য একটী করিয়া তোমার ইচ্ছামত তিনটী বর প্রার্থনা কর। যম বলিলেন, যাহার ঘরে ব্রাহ্মণ অতিথি বিমুখ হইয়া থাকে তাহার পুত্র, বিত্ত, এবং সঞ্চিত পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অল্পায়ু, অল্পমেধা হইতে হয়। এজন্য যম স্বতঃ তিনটী বর দিতে স্বীকৃত হইলেন। নচিকেতা বলিলেন, পিতা আমার অভাবে যে অশান্তি ভোগ করিতেছেন তাহা যেন দূর হয় এবং আপনার নিকট হইতে যখন ফিরিয়া যাইব তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ করেন। যম বলিলেন, তাহাই হইবে, এখন দ্বিতীয় বর কি চাই বল ?

নচিকেতা বলিলেন, স্বর্গলাভের জন্য যে যজ্ঞ করিবার ব্যবস্থা আছে তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। অতএব সেই অগ্নিবিদ্যা আমাকে প্রদান করুন।

যম অগ্নিবিদ্যা উপদেশ করিয়া বলিলেন, এখন তৃতীয় বর কি চাও বল ?

নচিকেতা বলিলেন, মানুষ মরিলে পর, কেহ বলেন, দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা থাকেন, আবার কেহ বলেন, আত্মা থাকেন না। এই সংশয় নিবারণের জন্য, আপনার উপদেশে ইহার সত্যতা জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর।

যম দেখিলেন ব্যাপার বড় সহজ নহে। নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে চায়। লোভশূন্য পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিই একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার উপযুক্ত। নচিকেতার মন কি উপাদানে গঠিত তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য যম বলিলেন,—পূর্ব্বে দেবগণও এ সংশয় হইতে মুক্ত পান নাই ; আর জনসাধারণ বহুবার শুনিয়াও কিছু বুঝিতে পারে না, সুতরাং যাহা তুমি জানিতে

চাহিয়াছ তাহা বড় সহজ কথা নহে। ইহা অপেক্ষা যাহাতে তুমি একটা বড় রাজা হইতে পার, যাহাতে পার্থিব ও স্বর্গীয় সমস্ত ভোগ তোমার ইচ্ছামত লাভ করিতে পার, সে ক্ষমতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাক, মরণের পর কি হয় সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না।

নচিকেতা ঠিক জানিতেন, মানবদেহ ও জগৎ নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল। যাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সেই দেহ-ও জগৎ লইয়া অক্ষয় ভোগ অসম্ভব। এ বর যিনিই দান করুন না কেন—তাহা কেবল মানবমনকে ভুলাইবার জন্য কার্য্যতঃ কখনও ইহা প্রতিপালিত হইতে পারে না। তাই নচিকেতা যমকে বলিলেন, যাহা নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল তাহা লইয়া কি হইবে—যে বিষয়ে দেবগণেরও সংশয় আছে সেই বিষয় কি আমায় বলুন, বিশেষতঃ আপনার ন্যায় এ বিষয়ের বক্তা পাওয়া যখন দুর্ল্লভ, তখন মরণের পর কি হয় সেই কথাই বলুন, তাহা ছাড়া নচিকেতা আর কিছুই প্রার্থনা করে না

যম সন্তুষ্ট হইয়া নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলেন। বলিলেন—এক ব্রহ্মসত্তা সমগ্র জীব জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি অজর অমর, সর্ব্ব দ্বন্দ্বের অতীত। নচিকেতা, তুমিই তিনি শ্রবণমাত্র শুদ্ধাত্মা বালকের সকল সংশয় দূর হইল। তিনি আনন্দমনে-পিতৃসন্নিধানে ফিরিয়া আসিলেন। পিতার দুঃখ, ক্রোধ উপশম হইল। যজ্ঞ করিয়া তিনি যাহা লাভ করিতে পারেন নাই, শ্রদ্ধাবান পুত্রলাভ করিয়া তিনি সেই অমৃতের সন্ধান পাইলেন—পান করিয়া জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অন্তে মুক্তি লাভ করিলেন।

• •

যে শ্রদ্ধা বালক নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যমের সম্মুখে উপস্থিত হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছিল, সে শ্রদ্ধা কি আমাদের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিবে না? আমাদের অহংকার অভিমান দূর হইয়া আত্মপ্রত্যয় কি জাগরিত হইবে না? আমরাও কি বালক নচিকেতার ন্যায় সত্যনিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার মূর্ত্তিমান বিগ্রহস্বরূপ হইয়া কুল পবিত্র ও জননীকে কৃতার্থ করিব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষকার্য্য।

বিগত ৩০এ আগষ্টের রিপোর্টে আমরা ত্রিপুরা ও কাছাড় জেলার দুর্ভিক্ষসংবাদ ব্যতীত বালেশ্বর ও বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের কথা জানাইয়াছি। আনন্দের বিষয় সেপ্টেম্বরের প্রথম হইতে সরকার বাহাদুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে চাউল বিতরণ এবং তাগাবি ও অর্থসাহায্য করিতেছেন। এই হেতু আমরা উপস্থিত এই মহকুমার সকল কেন্দ্রগুলিতে (নবস্থাপিত রামরাইল ও কুটী কেন্দ্রদ্বয়েও) চাউল বিতরণ স্থগিত রাখিয়াছি, প্রয়োজন হইলে আবার আরম্ভ করিব। শিলচরে আমাদের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। তথায় অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে। আমরা ৯ খানি গ্রামে ১৫৯৷৩ সের বীজধান বিতরণ করিয়াছি এবং আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে এই দুই মহকুমার ২২এ আগষ্ট হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুই সপ্তাহের চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। চাউলের পরিমাণে অস্থায়িভাবে বিতরিত চাউলও অন্তর্ভুক্ত হইল।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
সুলতানপুর	৩৫	৮৪০	মন ৪৩৷৷০
ঐ (পর সপ্তাহে)	২৬	৬২৬	৩১৷৯
ভোলাকট	১৪	২২৪	১৪৷৷৯
ঐ (পর সপ্তাহে)	১৮	২৯৪	১৪৸৮
গোকর্ণ	১৩	১৪৫	৭৷১৷৷০
ঐ (পর সপ্তাহে)	১৩	১৭৬	৮৸২
অষ্টগ্রাম	১৬	৩৬০	২২৷০
ঐ (পর সপ্তাহে)	২১	৪৮৬	২৬৴০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩২	৪৪১	২২৸২
ঐ (পর সপ্তাহে)	৩৩	৪৬৭	২৯৸০

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
বিটঘর	১৮	২২৫	১৫৵০
নাসিরনগর	২১	৫৩৩	২৮৷৹
ঐ (পর সপ্তাহে)	২১	৪৭৩	২৭৵০
সুইলপুর	১৯	৫৪৬	২৬৷৷২
ঐ পর সপ্তাহে)	২০	৫৩৪	৩০৷০
রামরাইল	২০	২৬৫	১৩৷৪
কুটী	৮	১৩৩	৭৷০
ঐ (পর সপ্তাহে)	২৩	৪১৭	২৫৸
শিলচর	৬২	১৩৮১	৭১৵০
ঐ (পর সপ্তাহে)	৭৪	১৬৯৪	৮৭৷০

মধ্যবিত্তগণকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা হইয়াছে। চাউল ব্যতীত বস্ত্রও বিতরিত হইয়াছে।

এদিকে শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নিপতিত হইয়াছে। এখানকার প্রকোপ ব্রাহ্মণবাড়িয়া অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। আমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং যত শীঘ্র সম্ভব সাহায্য দান আরম্ভ হইবে।

ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়াস্থ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাতর আবেদনে আমরা তত্রত্য বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অধিবাসিগণের সাহায্যার্থ ২০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছি। ঐ টাকা তাঁহার দ্বারা ব্যয় হইবে। তিনি এই টাকার মধ্য হইতে ২২৬ জন অতি দুঃস্থ লোককে ১৭৷৹ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছেন।

বালেশ্বর জেলার সর্ব্বত্রই অন্নকষ্ট, তবে বাসুদেবপুর, ভদ্রক ও ধামনগর থানায় কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বৃষ্টির অভাবে অনেকস্থানে রোয়া বন্ধ রহিয়াছে। চারিদিকেই যে পরিমাণে কষ্ট তাহাতে বালেশ্বরবাসিগণের আগামী দুই মাস রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। বাসুদেবপুর থানায় সরকার বাহাদুর কাজ করিতেছেন। আমরা ভদ্রক থানার বস্ত নামক স্থানে প্রথম কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প

করিয়াছি। এই কেন্দ্রের কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত হইলে আমরা ঐ থানার অন্নপাল নামক স্থানে আর একটী কেন্দ্র খুলিব মনে করিয়াছি।

বাঁকুড়ার অবস্থাও অতি শোচনীয়। বৃষ্টির অভাবে গত দুই বৎসর শস্য হয় নাই; এবার আর দুঃখের অবধি নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে দুইটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া চাউল বিতরণ আরম্ভ করিয়াছি। বাঁকুড়া হইতে ৬০খানি গ্রামের ৬৯৯ জন অধিবাসীকে ৪১।৵০ মং চাউল বিতরিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের কার্য্যবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। আমাদের পরিদর্শনকার্য্য চলিতেছে এবং যেখানেই প্রয়োজন বোধ হইবে সেখানেই কেন্দ্র খোলা হইবে। দলে দলে লোক চাকরীর আশায় ঘর বাড়ী ছাড়িয়া অন্য জেলায় পলায়ন করিতেছে, কিন্তু নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। অনেক স্থানে বাড়ীর কর্ত্তারা পরিবারবর্গের দুঃসহ ক্লেশ চক্ষে দেখিতে না পারিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

অবস্থা বড়ই গুরুতর সন্দেহ নাই। এক সঙ্গে পাঁচ ছয়টী জেলায় কার্য্য চালাইতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু কে নিশ্চেষ্ট হইয়া এই সকল হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে পারিবেন? আমরা সকল দেশবাসীকে এই দুর্দ্দিনে যথাসম্ভব নিজ নিজ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া এই নিরন্ন নরনারীগণের মুখে এক এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া দিতে আহ্বান করিতেছি। আসুন আমরা সকলে একপ্রাণ হইয়া এই দরিদ্র, দুর্ব্বল ও বিপন্ন নারায়ণগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হই।

দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যিনি যাহা দান করিবেন, অর্থ হউক অথবা নূতন বা পুরাতন বস্ত্র হউক, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে তাহা সাদরে গ্রহণ ও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে:—(১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় পোঃ, জেলা হাবড়া; (২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

নিবেদক,

২১এ সেপ্টেম্বর। সারদানন্দ।

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকার।

৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১ অক্টোবর পর্য্যন্ত বেলুড়মঠে প্রাপ্ত

মাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিরোজপুর	২০
মাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, মহামুনি	১৩।৵
মাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, দিনাজপুর	১১৲
শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, কলিকাতা	৫
শ্রীবিপিনবিহারী চন্দ্র, বারাকপুর	৫
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীঘাট	৫৲
শ্রীপান্নালাল সিংহ, রংপুর	৪
শ্রীমোহিনী মোহন ধর, লণ্ডন	৩৸০
মাঃ শ্রীতারকনাথ ব্যানার্জ্জী, চাণক	৩৫৲
(মাঃ শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল, আরা)	
রায় হরিপ্রসাদ ঘোষাল বাহাদুর	১০৵০
রায় সাহেব শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৲
শ্রীকালীপ্রসন্ন শূর	২৲
শ্রীসন্তোষবিহারী বসু	২৲
শ্রীবিমলানন্দ মুখার্জ্জী	১৲
খুচরা আদায়	২৸৵০
মাঃ ফরেষ্ট রেঞ্জার, মানপুর	১১৷৵০
পানাড়ে, বি, এল, পুনা	১০৲
এ্যাঙ্গলো বেঙ্গলী স্কুল, কাশী	৭৵০
জনৈক বাঙ্গালী, তীবড়াল	৩
নীতিধর্ম্মবিধায়িনী সভা, পাহাড়পুর	১
শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভড়, কলিকাতা	১
মহম্মদ আজিমুদ্দিন আহম্মদ, শিবগঞ্জ	॥০
মাঃ শ্রীযুত জি, ভি, পি, শিবম্, বম্বে	৫০৲
(মাঃ শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষাল, আরা)	
শ্রীইন্দ্রদেব নারায়ণ	
শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ	
মৌলভী চৌধুরী কেরামৎ হোসেন	
শ্রীব্রজনন্দন সহায় (সিনিয়র)	
শ্রীসিদ্ধেশ্বর নাথ	
মৌলভী মহীউদ্দিন আহম্মদ	
শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষাল	৫।৵০
রায় হরিপ্রসাদ ঘোষাল বাহাদুর	১৫।০
শ্রীমতী জগৎমোহিনী দেবী	৫
খুচরা আদায়,	॥০
স্পেশ্যাল ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন আফিস (মাদারগঞ্জ) ধানবাদ,	২২
মাঃ শ্রীঅমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী	
মৌলভী আবদুল হাকিম	১৲
নিজাম উদ্দীন আহম্মদ	১৲
মুন্সী আয়েজ উদ্দীন	১॥০
,, রেয়াজ উদ্দীন	১৲
শ্রীভৈরবদান মারওয়ারী	১৲
শ্রীদীনবন্ধু পাল চৌধুরী	২৲
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত	১৲
শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী	১৲
হেড মাষ্টার	৫৲
খুচরা আদায়	৩৷০
মিঃ ডি, সি, মুন্সী, এ্যাড্‌ভোকেট, পেগু	১১৲
মাঃ মিঃ এন্. সি, সরকার, টঙ্গি	১০৲
এডওয়ার্ড করোনেসন ড্রামাটিক ক্লব, বালুরঘাট,	১০৲
মাঃ শ্রীআলোকচন্দ্র শিকদার, নিজিরপুর	২৲
শ্রীকুমুদবন্ধু দাস, ইনানপাট	১৲
শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার, যড়বরড়া,	১৲
(কলিকাতা)	
শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু	৬৫৴০
শ্রীমতী তারিণীমণি দাসী	৫০৲
শ্রীরাজেন্দ্রলাল নন্দন	১০৲
শ্রীহরিদাস দত্ত	১৲
ভক্তের মা	১০৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র	২
টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার নং ২৪৯৭, রেঙ্গুন	১৫০৲
মাঃ শ্রীললিতকুমার নিয়োগী, রঙ্গপুর	১৫৲

শ্রীহরিচরণ বিশ্বাস, কলিকাতা ১০৲
শ্রীমতী হেমলতা ব্যানার্জ্জি, তুফানগঞ্জ ১০৲
ছাত্র ও শিক্ষকগণ, আউটসাহী ৭/০
ছাত্রগণ, এইচ, ই, স্কুল, বজ্রযোগিনী ৬৲
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল দাস, চট্টগ্রাম ৩৲
শ্রীশরৎকুমার সাহা, সাহাজাদপুর ১৲
মাঃ শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী, নোয়াখালী ৩৷৵০
শ্রীআত্মারাম মূলরাম, রোহরী ৯৯৲
এ্যাসিঃ ইঞ্জিনিয়ার ও কর্ম্মচারিবৃন্দ, নাহার-ভাটগাঁও। ৯৫।/০
শ্রীযুত পি, সেন গুপ্ত, বরিশাল ১৫৲
" এম, এল্, গোস্বামী, পেগু ১০৲
রামকৃষ্ণ সেবক-সমিতি, রেঙ্গুন ৬৲
অনাথভাণ্ডার, বালি ১৫৲
শ্রীজিতেন্দ্রমোহন ঘটক, নাড়িয়া, ১৲
বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোর, মেসোপটেমিয়া ১০০
মাঃ মিঃ এল্, এম্, ঘোষ, চেতলা ২১৷৵০
ছাত্র ও শিক্ষকগণ, মুন্সীগঞ্জ ২১
চট্টগ্রাম ইউনিয়ন, কলিকাতা ১৫৲
সারস্বত সভা, বর্দ্ধমান ৫৲
মাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, বগুড়া ৫৲
রাজসাহী কলেজের ছাত্রগণ ২০৲
মিঃ পি, এস্, বসু, ভাগলপুর ১৫৲
শ্রীকালীচরণ ব্যানার্জ্জী, কালীঘাট ১০৲
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা, ৯৲
শ্রীসুকুমার মল্লিক, বালি, ৫৲
ছাত্রভাণ্ডার, রায়গঞ্জ ৫
মাঃ শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী, ফতেপুর ৪৷০
শ্রীচন্দ্রমোহন বিশ্বাস, গৌরীপুর ১
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, মঙ্গলকাণ্ডি ১
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ১০০৲
শ্রীআশুতোষ ঘোষ, মাথাভাঙ্গা ১০৲
হরিসভা, পুকুরপাড়া ৪৲
মাঃ শ্রীসত্যপ্রকাশ রায়, আলিপুর ২৸০
শ্রীলোকরাম, সক্কর ২৷০
মাঃ মিঃ এম্, সি, দত্ত, নামিয়াও ১৪।/০
ছাত্রবৃন্দ, এইচ, ই স্কুল, শিঙ্গুর ৫৲

একটি গরিব বন্ধু, কলিকাতা ।/০
মাঃ শ্রীযুগলকিশোর মিশ্র, দুবরাজপুর ৩২৷৵০
মাঃ শ্রীললিতমোহন বসাক, মাণিকগঞ্জ ২৮৷০
পাবলিক, রঙ্গপুর ২৫৲
(মাঃ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র বণিক, জুসার)
শ্রীচন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী ১৲
শ্রীবিশ্বেশ্বর পাল ২৲
শ্রীচিন্তামণি রুদ্রপাল ১
শ্রীভগবানচন্দ্র বণিক্ ২৲
শ্রীজয়চন্দ্র বণিক্ ১৲
শ্রীগুরুপ্রসাদ বণিক্ ১৲
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র বণিক্ ৫
খুচরা আদায় ৩৵০
পাবলিক, ভোগপুর ৫
মাঃ মিঃ কে, এন্, ঘোষ, কাট্রাসগড় ৩।/০
মাঃ শ্রীপান্নালাল সিংহ, রঙ্গপুর ২৷০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ, গুলজারবাগ ১
ছাত্রবৃন্দ, ষষ্ঠশ্রেণী, আমাদীয়া ।৵০
সেবাশ্রম, লক্ষ্ণৌ ২৪৲
শ্রীচুনিলাল, এম্, কাপাদিয়া, চিতারিবাজার ৫৲
শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী, রোয়াইল, ২৲
শ্রীভোগলাল নজনদাস সেট, বম্বে ২৲
শ্রীশ্যামাপদ ব্যানার্জ্জী, খিদিরপুর ১৲
মিঃ জে, ভট্টাচার্য্য, কাঁকুড়গাছি ২৲
শ্রীভজহরি হালদার, কলিকাতা ২৲
মাঃ মিঃ পি, এস্, বসু, আদমপুর ১৫৲
রামকৃষ্ণ সেবক-সমিতি, রেঙ্গুন ১৯৲
ছাত্রভাণ্ডার, রায়গঞ্জ ৫৲
মিঃ পি, বি, মিত্র, বাণ্ড ২৲
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, রঙ্গপুর ২৲
শ্রীউমাকান্ত পাল, কলিকাতা ৷০
কেরাণী ও সব্-এজেন্টগণ, আই, জি এন্, আর কোং, দিঘা ৩০৲
কুলিরমণী ও পুরুষগণ, লভ্ডেল ৭/০
শ্রীঅম্বুজনাথ ব্যানার্জ্জী, মজঃফরপুর ৫৲
মাঃ হেড মাষ্টার, ভাণ্ডারহাটি ৫৲

মিঃ পি, সি, মল্লিক, কলিকাতা ২৲
মাঃ শ্রীবলরাম দে সরকার, রাজাদিয় ১/০
মিঃ জে, সি, চ্যাটার্জ্জী, ম্যাণ্ডালে ৩৬৲
জনৈক ভক্ত, কুমিল্লা ১
শ্রীঅমরনাথ ব্যানার্জ্জী, কাশী ২৫
বোস এবং মিত্র, ম্যাণ্ডালে
মিঃ এ, কে, ঘোষ, কিয়ানকটগা ৭৲
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ভাগলপুর ৫৲
শ্রীমণিভূষণ পাল, কলিকাতা ১
হেড মাষ্টার, মেকলিগঞ্জ ২০৲
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জী, কলিকাতা ৪৲
মাঃ শ্রীকামিনীকুমার সেন গুপ্ত, ধানবাদ ১৫৲
মিঃ এন্, ঠাকুর, বেনারস ক্যাণ্ট ৫৲
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, বগুড়া ৫৲
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, রোঁয়া, ফ্রান্স, ৬০৲
মাঃ ছাত্রবৃন্দ, ট্রেনিং একাডেমী, চুঁচড়া ২৮।০
শ্রীভৈরবচন্দ্র শীল ১৲
শ্রীগঙ্গানারায়ণ শীল ১৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ আঢ্য ২।০
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র অধিকারী ১
খুচরা আদায় ১
শ্রীদৌলত রাম ভিরিয়া, সিন্ধ ৫৲
শ্রীযাদবচন্দ্র মৌলিক, চিল্লমা ৩৲
মাঃ মিঃ জে, ভট্টাচার্য্য, কাঁকুড়গাছী ১

৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত

„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং মাণিকচন্দ্র গোস্বামী, কলিকাতা ২৲
„ মাণিকচন্দ্র গোস্বামী „ ১০৲
„ প্রবোধচন্দ্র মল্লিক „ ২৲
জনৈক বন্ধু „ ২৫৲
ডিষ্ট্রীক্ট বার এসোসিয়েসন, আলিপুর ৫০৲
শ্রীমতী এম, দেব্যা, হালিসহর ১০
মাঃ হেডমাষ্টার জিয়াগঞ্জ, ই, সি, ইনিষ্টিটিউসন ৫৲
রাঁচি হিন্দু-নাট্যসমাজের সদস্যগণ, মাঃ শ্রীযুক্ত চুণিলাল রায় ১৯০৲
শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাণ্ডা, কাড়্‌না ১৲
„ শ্যামসুন্দর পাণ্ডা, „ ৫৲
„ নবকুমার দাস, গোপালচক্ ২৲
„ ক্ষেত্রমোহন দাস, মহম্মদপুর ২৲
„ দেবেন্দ্রনাথ দাস, „ ২৲
ক্ষীরোদচন্দ্র বাগ, নামালদিয়া ১৲
„ উপেন্দ্রনাথ সেন, কানাইদীঘি ১
„ রুদ্রনারায়ণ জানা, ছানবাড়িয়া ১
„ মহন্ত যমুনাদাস,—দেউলবার ১৲
„ গজেন্দ্রনাথ গিরী „ ১৲
„ উমাচরণ বেরা, বনিয়াজি ১৲ ২
„ রমেশচন্দ্র বেরা „ ১৲
„ জীবনকৃষ্ণ ভুঁইয়া, বোণিয়াজি ১৲
„ গৈটুপ্রসাদ পরাই, কোলনগড় ১৲
„ বংশীধর পরাই „ ১৲
„ কুমুদবন্ধু পাণ্ডে, কাবপুরা ১৲
এসিষ্ট্যাণ্ট সেটল্‌মেণ্ট অফিসার, কাঁথি ১৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, উন্‌রী ১
„ রাধাকৃষ্ণ আদক, নামালদিয়া ১
জনৈকবন্ধু, মাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, আলিপুর ১০৲
শ্রীহীরালাল শীল, কলিকাতা ১৲
স্কটিস্ চার্চ্চ কলিজিয়েট স্কুলের পঞ্চমশ্রেণী 'ক' বিভাগের ছাত্রগণ ;—
শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার পাল ২।০
„ শোভনচন্দ্র মিত্র
„ শম্ভুগোপাল বসু
মণীন্দ্রনাথ দে ১।০
„ ফণীন্দ্রনাথ দে ১।০
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে ১॥০
„ কালীকরুণ রায় ১
জনৈক ভদ্রমহিলা, উটাকামণ্ড ১০০
মাঃ শ্রীঠাকুরচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৫০

শ্রীমতী রত্নমালা বসু কলিকাতা ১
,, হেমাঙ্গিনী মিত্র ১
মাঃ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, যশোহর ৫
শ্রীকৃষ্ণলাল দাস, কলিকাতা ১.
ভারত শিল্প-ভাণ্ডার ,, ৫.
কলিকাতা এড্‌ভার্‌টাইজিং এজেন্সি ১.
সেক্রেটারী, সিয়ালদহ বার লাইব্রেরী ৫০.
মিঃ সি, মধুরাম, ত্রিবাঙ্কুর ৫
শ্রীভজহরি পরামাণিক, দুয়ার মাষিনী ৫.
,, তারাপ্রসাদ দাস, কুসবণী ২.
,, শরৎচন্দ্র গুড়িয়া, দেউলতু ২.
,, কুমার নারায়ণ দাস, মুকুন্দপুর ২
,, কৃষ্ণপ্রসাদ বারা ,, ১
,, অভয়চরণ ভুঁইয়া, গোবিন্দপুর ১.
,, বিশ্বনাথ ভুঁইয়া ,, ২
বুরুল হাই-স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ৪.
মিঃ ভন্‌কা, কলিকাতা ১
শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু, কলিকাতা ২০.
নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কলিকাতা ১৩।/
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ২৲
অজ্ঞাত, বরাহনগর ২৫৲
তুফান, কলিকাতা
ডাঃ জে, রায় সাহেব, গোরখপুর
,, আর, বি, রায় ,,
শ্রীরাধারমণ সেন ,,
শ্রীযুক্ত তিরুমলাচারিয়ার, বাঙ্গালোর ১৫৲
জনৈক বন্ধু, নারিকেলডাঙ্গা
মাঃ স্বামী শিবানন্দ, আলমোড়া ১৭৲
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার মজুমদার, মিন্দোয়া ২৲
মাঃ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান, ঘাটাল হাই স্কুল ২৬৲
শ্রীউমেশচন্দ্রনাগ, ময়মনসিং ১৲
বসাক ফ্যাক্টরি, কলিকাতা ১০০৲
শ্রীযুক্ত এন, সি, বসাক, কলিকাতা ২০৲
মেঃ বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং, কলিঃ ১০০৲
মেঃ পাল ব্রেণ্ডস্‌ এণ্ড কোং, কলিঃ ১০০৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ধর, নাটশাল ২৫৲
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘটক, রাঁচি ১।০
,, যুগলপদ মণ্ডল, কারসিয়ং ২৲
খুচরা আদায় ১৪॥/০

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতার "বন্দে মাতরম্‌ সম্প্রদায়" সিষ্টার নিবেদিতার বাগবাজারস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহ-নির্ম্মাণ কল্পে ৮০০০৲ টাকার মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ও নগদ ১১০॥৶০ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এই টাকার মধ্য হইতে দলিল রেজেষ্টারী খরচা ১।০ ও গাড়ীভাড়া, ট্রামখরচা ইত্যাদি বাবদে ২৮/৫ খরচ হইয়াছে। বাকী ৮১০৬॥/১৫ টাকা জমা রহিল।

দেশের কুমারী ও পুরস্ত্রীগণের মধ্যে সৎশিক্ষাবিস্তারের এইরূপ সুযোগ করিয়া দিয়া "বন্দে মাতরম্‌ সম্প্রদায়" দেশভক্তমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সম্প্রদায়ের এই শুভ অনুষ্ঠানের ফলে দেশে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন।

(৩)

(স্বামী সারদানন্দ)

স্থিরলক্ষ্য এবং যথার্থ পুরুষকারসম্পন্ন পুরুষসকলে অপরে মহত্ত্বের পরিচয় পাইলে মুক্তকণ্ঠে উহা স্বীকার পূর্ব্বক প্রাণে অপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিতে থাকেন। আবার সেই মহত্ত্ব যদি কখন কাহারও মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভাবনীয়রূপে প্রকাশিত দেখেন তবে তচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া তাঁহাদিগের মন কিছুকালের জন্য মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ হইলেও কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাদিগকে নিজ গন্তব্য পথ ও লক্ষ্য হইতে বিচলিত করিয়া ঐ পুরুষের অনুকরণে কখন প্রবৃত্ত করে না। অথবা বহুকালব্যাপী সঙ্গ, সাহচর্য্য ও প্রেমবন্ধন ব্যতীত তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যকলাপ ঐ পুরুষের বর্ণে সহসা রঞ্জিত হইয়া উঠে না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথেরও ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ঠাকুরের অপূর্ব্ব ত্যাগ এবং মন ও মুখের একান্ত ঐক্যতা দর্শনে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইলেও নরেন্দ্রের হৃদয় তাঁহাকে সহসা জীবনের আদর্শস্থলে বসাইতে সম্মত হয় নাই। সুতরাং বাটীতে ফিরিবার পরে তাঁহার মনে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বভাবের কথা কয়েক দিন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ উদিত হইলেও নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে তাঁহার নিকটে পুনরায় গমনের কথা তিনি দূর ভবিষ্যতের গর্ভে ঠেলিয়া রাখিয়া আপন কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঠাকুরকে অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করাই যে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, ধ্যানাভ্যাস

এবং কলেজে পাঠ ব্যতীত নরেন্দ্র তখন নিত্য সঙ্গীত ও ব্যায়াম চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন—তদুপরি বয়স্যবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণে কলিকাতায় নানাস্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা সমিতিসকল গঠন করিতেছিলেন। সুতরাং সহস্রকর্ম্মে রত নরেন্দ্রনাথের মনে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা কয়েক পক্ষ চাপা পড়িয়া থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও দৈনন্দিন কর্ম্ম তাঁহাকে ঐরূপে ভুলাইয়া রাখিলেও তাঁহার স্মৃতি ও সত্যনিষ্ঠা অবসর পাইলেই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী গমনপূর্ব্বক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। সেজন্যই প্রথম দর্শনের প্রায় মাসাবধিকাল পরে আমরা শ্রীযুত নরেন্দ্রকে একদিবস একাকী পদব্রজে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে গমন করিতে দেখিতে পাইয়া থাকি। উক্ত দিবসের কথা তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আমরা সেই ভাবেই উহা এখানে পাঠককে বলিতেছি—

"দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দূরে তাহা ইতিপূর্ব্বে গাড়ি করিয়া একবারমাত্র যাইয়া বুঝিতে পারি নাই। বরাহনগরে দাশরথি সান্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ি প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকটে পূর্ব্ব হইতে যাতায়াত ছিল। ভাবিয়াছিলাম রাসমণির বাগান তাহাদের বাটীর নিকটেই হইবে। কিন্তু যত যাই পথ যেন আর ফুরাইতে চাহে না! যাহা হউক জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কোনরূপে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম এবং একেবারে ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত ছোট তক্তাপোষখানির উপর একাকী আপন মনে বসিয়া আছেন—নিকটে কেহই নাই। আমাকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই একপ্রান্তে বসাইলেন। বসিবার পরেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম, তিনি যেন কেমন একভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্টস্বরে আপনা আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। দেখিয়া ভাবিলাম, পাগল

বুঝি পূর্ব্বদিনের ন্যায় আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে—ঐরূপ ভাবিতে না ভাবিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণ পদ আমার অঙ্গে রক্ষা করিলেন এবং তাঁহার স্পর্শে আমার অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দেখিলাম গৃহের সমস্ত বস্তু এবং দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্ব্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ ভয় আসিয়া অভিভূত করিল, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে! আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো তুমি আমায় একি কর্‌লে, আমার যে বাপ মা আছেন!' অদ্ভুত পাগল আমার ঐকথা শুনিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তদ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে!' আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ঐরূপে স্পর্শ করিয়া ঐ কথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব্ব ভাবান্তর এককালে অপগত হইল; আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম, এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম!

"বলিতে এত বিলম্ব হইলেও ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল এবং উহার দ্বারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি হইল? দেখিতে দেখিতে উহা এই অদ্ভুত পুরুষের প্রভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া সহসা লয় হইল। পুস্তকে Mesmerism (মোহিনী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চারণ) ও Hypnotism (সম্মোহন বিদ্যা) সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম—ভাবিতে লাগিলাম, উহা কি ঐরূপ কিছু একটা? কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্তে প্রাণ সায় দিল না। কারণ দুর্ব্বল মনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐ সকল অবস্থা আনয়ন করে; কিন্তু আমি ত ঐরূপ নহি, বরং এতকাল পর্য্যন্ত বিশেষ বুদ্ধিমান ও মানসিক-বল-সম্পন্ন বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আসিতেছি।

বিশিষ্ট গুণশালী পুরুষের সঙ্গলাভপূর্ব্বক ইতর সাধারণে যেমন মোহিত এবং তাঁহার হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলি-স্বরূপ হইয়া পড়ে, আমি ত ইঁহাকে দেখিয়া সেইরূপ হই নাই ; বরং প্রথম হইতেই ইঁহাকে অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তবে আমার সহসা ঐরূপ হইবার কারণ কি ? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না ; প্রাণের ভিতর একটা বিষম গোল বাঁধিয়া রহিল। মহাকবির কথা মনে পড়িল—পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, মানব-বুদ্ধি-প্রসূত দর্শনশাস্ত্র যাহাদিগের স্বপ্নেও রহস্যভেদের কল্পনা করিতে পারে না। স্থির করিলাম, উহাও ঐরূপ একটা ; ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, উহার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং দৃঢ় সংকল্প করিলাম, অদ্ভুত পাগল নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া আর যেন কখনও ভবিষ্যতে আমার মনের উপর আধিপত্য লাভপূর্ব্বক ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিতে না পারেন।

"আবার ভাবিতে লাগিলাম, ইচ্ছামাত্রেই এই পুরুষ যদি আমার ন্যায় প্রবল মনের বহুকালের ভাবময় গঠন ঐরূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কাদার তালের মত করিয়া উহাকে আপনভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইঁহাকে পাগলই বা বলি কিরূপে ? কিন্তু প্রথম দর্শনকালে আমাকে একান্তে লইয়া যাইয়া যেরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং যে সকল কথা বলিয়াছিলেন সেই সকলকে ইঁহার পাগলামির খেয়াল ভিন্ন সত্য বলিয়া কিরূপে মনে করিতে পারি ? সুতরাং আপনার পূর্ব্বোক্ত ভাবান্তরের কারণ যেমন খুঁজিয়া পাইলাম না, শিশুর ন্যায় পবিত্র ও সরল এই পুরুষের সম্বন্ধেও কিছু একটা স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্ক সহায়ে প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, অদ্য সেই স্বভাবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ফলে মনে পুনরায় প্রবল সংকল্পের উদয় হইল, যেরূপে পারি এই অদ্ভুত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথা যথাযথ ভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে।

"ঐরূপে নানা চিন্তা ও সংকল্পে সে দিন আমার সময় কাটিতে লাগিল। ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া গেলেন এবং পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় নানাভাবে আমাকে আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইতে ও সকল বিষয়ে বহুকালের পরিচিতের ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয় বা সখাকে বহুকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের যেরূপ হইয়া থাকে, আমার সহিত তিনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। খাওয়াইয়া, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গ পরিহাস করিয়া তাঁহার মন আর আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার ঐরূপ ভালবাসা ও ব্যবহারও আমার স্বল্প চিন্তার কারণ হয় নাই। ক্রমে অপরাহ্ণ অতীতপ্রায় দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটে সেদিনকার মত বিদায় যাচ্ঞা করিলাম। তিনি যেন তাহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া 'আবার শীঘ্র আসিবে, বল' বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধরিয়া বসিলেন। সুতরাং সেদিনও আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল।"

উহার কতদিন পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে ঠাকুরের ভিতরে পূর্ব্বোক্তরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবার পরে তাঁহাকে জানিবার, বুঝিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনার উদয় দেখিয়া মনে হয়, এবার দক্ষিণেশ্বরে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ঐ আগ্রহই তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিল। তবে কলেজের অনুরোধে উহা সপ্তাহকাল বিলম্বে হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কারণ, কোন বিষয় অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি মনে একবার জাগিয়া উঠিলে নরেন্দ্রনাথের আহার বিহার ও বিশ্রামাদির দিকে লক্ষ্য থাকিত না এবং যতক্ষণ না ঐ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন ততক্ষণ তাঁহার প্রাণে শান্তি হইত না। অতএব ঠাকুরকে জানিবার সম্বন্ধে তাঁহার মন যে এখন ঐরূপ হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আবার পাছে তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত

হয় এই আশঙ্কায় শ্রীযুত নরেন্দ্র যে নিজ মনকে বিশেষভাবে দৃঢ় ও সতর্ক করিয়া তৃতীয় দিবসে ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন একথাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঘটনা কিন্তু তথাপি অভাবনীয় হইয়াছিল। ঠাকুরের ও শ্রীযুত নরেন্দ্রের নিকটে তৎসম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই এখন পাঠককে বলিতেছি।

দক্ষিণেশ্বরে সে দিন জনতা ছিল বলিয়া হউক বা অন্য কোন কারণে হউক, ঠাকুর ঐ দিন নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সহিত শ্রীযুত যদুনাথ মল্লিকের পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানে বেড়াইতে যাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যদুনাথের মাতা ও তিনি স্বয়ং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং উদ্যানের অনেক কর্ম্মচারীর প্রতি তাঁহাদিগের আদেশ ছিল যে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর যখনই উদ্যানে বেড়াইতে আসিবেন তখনই গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা ঘর তাঁহার বসিবার নিমিত্ত খুলিয়া দিবে। ঐ দিবসেও ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত উদ্যানে ও গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে ঐ ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র অনতিদূরে বসিয়া ঠাকুরের উক্ত অবস্থা স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঠাকুর পূর্ব্বদিনের ন্যায় সহসা আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। নরেন্দ্র পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিয়াও ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব দিনের মত না হইয়া উহাতে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল! কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহার পুনরায় চৈতন্য হইল তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন!

বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইবার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্রের ভিতরে সেদিন কিরূপ অনুভব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে কোন কথা বলেন নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম বিশেষ রহস্যের কথা বলিয়া তিনি উহা আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু

কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর এক দিবস ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম শ্রীযুত নরেন্দ্রের উহা স্মরণ না থাকিবারই কথা। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

"বাহ্য-সংজ্ঞার লোপ হইলে নরেন্দ্রকে সে দিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কে সে—কোথা হইতে আসিয়াছে—কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে) কতদিন এখানে (পৃথিবীতে) থাকিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম তাহার ঐ কালের উত্তরসকল তাহাই সুপ্রমাণ করিয়াছিল। সে সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে। উহা হইতেই কিন্তু জানিয়াছি, সে (নরেন্দ্র) যে দিন জানিতে পারিবে সে কে, সে দিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ় সংকল্প করিয়া তৎক্ষণাৎ যোগমার্গে শরীর পরিত্যাগ করিবে! নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের ইতিপূর্বে যে সকল দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু তিনি কখন এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। পাঠকের সুবিধার জন্য উহা আমরা এখানেই বলিতেছি। কারণ, ঠাকুরের নিকট ঐ দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"একদিন দেখিতেছি কি ? মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র সূর্য্য তারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘননির্বিচিত্র মূর্ত্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের

রাজ্যকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্ত্তি-বিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্য দেহধারী দেবদেবী সকলে পর্য্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্য-জ্যোতিঘন-তনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব ত দূরের কথা দেবদেবীদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র বিরহিত, সমরস জ্যোতির্ম্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণ পূর্ব্বক নিজ অপূর্ব্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্ব্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেব-শিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল,আমি যাই-তেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে। ঋষি তাহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্ত-রের কথা ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।" *

* ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব্ব সরল ভাষায় উক্ত দর্শনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নরেন্দ্রের মনে দ্বিতীয়বার ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি যে, এককালে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এই দুরতিক্রমনীয় দৈবশক্তির নিকটে তাঁহার মনঃও বুদ্ধির শক্তি কতদূর অকিঞ্চিৎকর! ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার ইতিপূর্ব্বের অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইল। তবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রথম উপস্থিত হইবার দিবসে তিনি তাঁহাকে একান্তে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন সে সকলের অর্থ ও উদ্দেশ্য যে, এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর দৈবশক্তি-সম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ। ইচ্ছামাত্রেই তিনি অপর মানবের মনকে ফিরাইয়া তিনি উচ্চপথে চালিত করিতে পারেন। তবে বোধ হয়, ভগবদিচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ একীভূত হওয়াতেই সকলের সম্বন্ধে তাঁহার মনে ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না। এবং এই অলৌকিক পুরুষের ঐরূপ অযাচিত কৃপালাভ তাঁহার পক্ষে স্বল্প ভাগ্যের কথা নহে।

নরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বোক্ত মীমাংসায় বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ইতিপূর্ব্বের ধারণাও তাঁহাকে উহার অনুসরণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। আপনার ন্যায় দুর্ব্বল স্বল্প শক্তি ও দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকে অধ্যাত্ম জগতের পথপ্রদর্শক গুরুরূপে গ্রহণ করিতে এবং নির্ব্বিচারে তাঁহার সকল কথা গুরুবাক্য বলিয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ইতিপূর্ব্বে তাহার একান্ত আপত্তি ছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ঐ ধারণা সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, একথা

সেই ভাবার যথাযথ প্রয়োগ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় আমরা আপন ভাষায় উহার সারমর্ম্ম সংক্ষেপে এখানে ব্যক্ত করিলাম। দর্শনোক্ত দেবশিশুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অন্য এক সময়ে জানিয়াছিলাম, ঠাকুর স্বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

বলিতে হইবে না। পূর্ব্বোক্ত দুই দিবসের ঘটনার ফলে তাঁহার ঐ ধারণা বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিলেন, বিরল হইলেও সত্য সত্যই এমন মহাপুরুষসকল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করেন যাঁহাদিগের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম ও পবিত্রতা সাধারণ মানবের ক্ষুদ্র মনবুদ্ধিপ্রসূত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া থাকে,—সুতরাং ইঁহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। ফলতঃ ঠাকুরকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও তিনি নির্ব্বিচারে তাঁহার সকল কথা গ্রহণে এখনও সম্মত হয়েন নাই।

ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ এই ধারণা নরেন্দ্রনাথের মনে বাল্যকাল হইতেই প্রবল ছিল। তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেও তন্মধ্যগত দাম্পত্য-জীবন-সংস্কার-সম্বন্ধীয় সভা সমিতিতে যোগদানে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সর্ব্বস্বত্যাগী ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অপূর্ব্বশক্তির পরিচয়লাভে তাঁহাতে উক্ত ত্যাগের ভাব এখন হইতে বিশেষরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটি বিষয় এখন হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এরূপ শক্তিশালী মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া মানবমন অর্দ্ধপরীক্ষা অথবা পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহার সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসে। উহা হইতে আপনাকে বাঁচাইতে হইবে। সেজন্য পূর্ব্বোক্ত দুই দিবসের ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার মনে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইলেও তিনি এখন হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক স্বয়ং অনুভব বা প্রত্যক্ষ না করিয়া তাঁহার অদ্ভুত দর্শন সম্বন্ধীয় কোন কথা কখন গ্রহণ করিবেন না, ইহাতে তাঁহার অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব তত্ত্বসকল গ্রহণ করিতে মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে একদিকে তিনি যেমন যত্নশীল হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ঠাকুরের প্রত্যেক অদ্ভুত দর্শন ও ব্যবহারের কঠোর বিচারে তিনি আপনাকে এখন হইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেই ইহা সহজেই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, প্রথম দিবসের যে সকল কথার জন্য তিনি ঠাকুরকে অৰ্দ্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেই কেবলমাত্র সেই সকল কথার অর্থবোধ হয়। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহার যুক্তিপরায়ণ মন ঐকথা সহসা স্বীকার করে কিরূপে? সুতরাং ঈশ্বর যদি কখন তাঁহাকে ঐসকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য প্রদান করেন তখন উহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি উহাদিগের সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির করিতে অগ্রসর না হইয়া কেমন করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিয়া স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইবেন, এখন হইতে ঠাকুরের নিকট আগমন পূর্ব্বক তদ্বিষয় শিক্ষা ও আলোচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তেজস্বী মন কোনরূপ নূতন তত্ত্ব গ্রহণকালে নিজ পূর্ব্বমতের পরিবর্ত্তন করিতে আপনার ভিতরে একটা প্রবল বাধা অনুভব করিতে থাকে। নরেন্দ্রনাথেরও এখন ঠিক ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে সম্যক গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না এবং আকৃষ্ট অনুভব করিয়াও তাঁহা হইতে দূরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার ঐরূপ চেষ্টার ফলে কতদূর কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

(ক্রমশঃ)

খৃষ্টান নীতি ও শক্তিবাদ।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আদর্শতন্ত্রবাদী গ্রীণ নীতিবাদের যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্যদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান। অন্যান্য দার্শনিকগণ মানবের সদসৎসম্বন্ধে যে স্বাভাবিক ধারণা, তাহা জীববিজ্ঞানের সহজাত-সংস্কাররূপে প্রতিপন্ন

গ্রীণের নীতিবাদ।

করিতে চাহিয়াছেন, গ্রীণ তাহাকে বিবেক বা জীবহৃদয়স্থ ভগবানের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "মানববুদ্ধি প্রকৃতির বৈচিত্র্যের ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কতক রহস্য ভেদ করিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পারে না; ইহার কারণ মানবজ্ঞান অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ মানবজ্ঞানই জগৎরহস্যের অন্তরালে তাহার জ্ঞাতা এবং কারণস্বরূপ যে এক সম্পূর্ণজ্ঞান বিরাজিত, তাহার প্রমাণ দিতেছে। যদি জগতে কোন জ্ঞান আদৌ না থাকিত, তবে তাহার পূর্ণতার কথাও উত্থাপিত হইতে পারিত না। কিন্তু যখন আপেক্ষিক জ্ঞান রহিয়াছে, তখন তাহার সম্পূর্ণতাও যে বিদ্যমান, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।" গ্রীণের মতে জীবমাত্রেই সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের অংশবিশেষ, এজন্য সতে আকর্ষণ, অসতে বিরাগ তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব সেই স্বাভাবিক আত্মবোধ বা বিবেকের দ্বারাই ন্যায় অন্যায় সদসৎ নির্ণয় করিতে পারা যায়।

আদর্শতন্ত্রবাদী যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা হইতে আর একটু অগ্রসর হইলেই প্রাচ্যনীতিবাদের ভিত্তি স্পর্শ করিতে পারা যায়। প্রাচ্যমতে নিজেকে পূর্ণজ্ঞানের অংশ বলিয়া চিন্তা করা—যে চিন্তা অহংজ্ঞানের কারণ, তাহা অসৎ, অর্থাৎ সতের প্রকাশের অন্তরায়স্বরূপ কল্পিত যবনিকা। এই যবনিকাই দুঃখ, অমঙ্গল ও মৃত্যুভীতির কারণস্বরূপ। ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সতে অসতের অধ্যাস, চিৎসমুদ্রে তামসিক জড়তার মোহ, অমরত্বে মৃত্যুভীতি লয় করাই মানবজীবনের সাধনা। প্রাচ্যমতে ইহাই নীতির পথ, অথবা ইহাই উন্নতির পথ। *

প্রাচ্য নীতিবাদের ভিত্তি "অহংবুদ্ধি ত্যাগ"

* অধুনা পাশ্চাত্যে বহুল পরিমাণে প্রাচ্যদর্শনের ভাব প্রচার হইয়াছে। বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট দেশ, কাল, নিমিত্ত যে মায়া, বেদান্তের এই মত আত্মচিন্তা হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নীতিবাদ কতকাংশে বেদান্তেরই প্রতিরূপ। জার্ম্মন দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের বেদান্তের অনুবাদ পাঠ করিবার সুযোগ হইয়াছিল ও তাহার সহিত কাণ্টের দার্শনিক চিন্তার সহায়তা পাইয়া তিনি পাশ্চাত্যে বেদান্তদর্শনের

প্রাচ্যদর্শন সৃষ্টিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা জগৎপ্রবাহ অবিরত আবর্ত্তিত হইতেছে। এই জগৎসৃষ্টির অর্থবোধ মানব-বুদ্ধির অতীত বলিয়া, অজ্ঞেয়বাদ অথবা "ইহা ভগবানের লীলা" ভিন্ন ইহার অপর কোন ব্যাখ্যা হয় না। মানববুদ্ধি সৃষ্টিরহস্যের যদি কিছু অর্থাভাস গ্রহণ করিতে পারে, তবে সে অর্থ—তপস্যা। প্রকাশ যেন আপনার অন্তরায় আপনিই কল্পনা করিয়া, সেই অন্তরায় দূর করিবার সাধনা বা তপস্যারূপ অমৃতের আস্বাদ সাধকরূপে আপনিই গ্রহণ করিতেছেন। প্রাচ্যমতে সে তপস্যার বহিঃপ্রকাশ কর্ম্মযোগ। মানবমন নিয়ত কর্ম্মশীল, কর্ম্ম-লিপ্ততা তাহার স্বভাব। প্রাণী যে প্রাণবিশিষ্ট কর্ম্মচেষ্টাই তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ। তামসিকতা বা অহংপরায়ণতার অর্থ অজ্ঞান বা জড়তা। প্রাণী যখন তামসিকতায় অভিভূত থাকে, তখন প্রাণধর্ম্মহেতু কর্ম্মশীল হইলেও তাহার সকল কর্ম্মচেষ্টাই অহংবুদ্ধির জড়ভাবশতঃ গতিহীন, সুতরাং স্থবিরতারই নামান্তরমাত্র। রাজসিকতার কার্য্যকরিতা। রাজসিক প্রবল কর্ম্মপিপাসা, কর্ম্মসাধনে অবিরাম চেষ্টায়, বার বার পরাজয়ের ক্লেশস্বীকার ও উত্থান-পতনের তরঙ্গাভিঘাতে—আহার, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক চেষ্টা এবং আরাম-বিরাম সুখভোগের ইচ্ছা প্রভৃতি জন্মগত দেহাত্মিকা বুদ্ধিজাত যে সমুদায় প্রবল সংস্কারের বন্ধন স্বাধীন বোধশক্তিকে অহমিকার দাসত্বে বন্দী করিয়া রাখে, ক্রমশঃ কিরূপে [illegible] ধীরে ধীরে ক্ষয়িত, শিথিল ও পরিণামে ছিন্ন করিয়া ব্যক্তিবুদ্ধি হইতে বহুদূরে মুক্তির অসীমতায় লইয়া যায়, কর্ম্মী নিজেই তাহা অনুভব করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক—আত্ম-নিবেদিত-আত্মতৃপ্তি, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মোৎসাহ, সুখদুঃখবোধাতীত চিত্তপ্রসন্নতা; রাজসিক অতৃপ্তি,

ভাব প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই হেতু আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিবাদে প্রাচ্যদর্শনের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জড়বাদ ও ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আনুসঙ্গিকতা হেতু তাহা অনেক স্থলেই পরিস্ফুট না হইয়া ম্লান হইয়াছে।

উদ্দম, আকাঙ্ক্ষা ও নিরন্তর সংগ্রামের দুঃসহ ক্লেশ-স্বীকারের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

জার্ম্মণ দার্শনিক নীট্‌জে বলিয়াছেন, পশু ও অতি মানুষের মধ্যে মানুষ যেন একটী সংযোগ-রজ্জুস্বরূপ। মানবজীবনের মহত্ব ইহাতেই,—ইহা লক্ষ্যে উপনীত হইবার সেতু, লক্ষ্য নহে; ইহা সিদ্ধির উপায়, স্বয়ং সিদ্ধি নহে।

তমঃ ও সত্বের মধ্যে রজঃও সেইরূপ সংযোগ-সেতু। রাজসিক কর্ম্মময় জীবনের মহত্ব ইহাতেই যে, তাহা সুখদুঃখ দ্বন্দ্বাভিঘাত, আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তামসিক জড়তা হইতে সুখদুঃখ বোধাতীত চিত্তপ্রসন্নতায় উপনীত হইবার সেতুস্বরূপ হইয়াছে। তাহা কেবলমাত্র আত্মত্যাগ, আত্মত্যাগের ফল নহে।

জয় ও ত্যাগের একাগ্রতা।

প্রাচ্য নীতিবাদের মতে সদসৎ নির্ণীত হইলে প্রকৃত খৃষ্টাননীতি ও প্রকৃত শক্তিবাদে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। কেননা, বিরাট ক্ষুদ্রতা লয় করিতে, তম হইতে প্রকাশের পথে অগ্রসর হইতে—তুমি ত্যাগ বা জয় যে পথ দিয়াই চল,—শক্তির সাধনায় আমিত্বের প্রসারতার অধিকার বৃদ্ধি করিয়া ক্রমশঃ সর্ব্বগ্রাসী আমিত্বে জগৎ গ্রাস কর, অথবা ত্যাগের সাধনায় ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান মহান্, মহত্তর, মহত্তমে, পরিণামে অনন্তে লয় করিয়া দাও,—যে পথেরই সাধনা কর না কেন, সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে উভয়েরই যে একই ফল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।*

কিন্তু সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠানের ভিত্তি অকপটতায়। কপটতা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম, প্রকৃত শক্তিশালীর কোন ছদ্মাবরণের প্রয়োজন নাই। শক্তিসাধনার ইহাতেই সার্থকতা। প্রাচ্যদর্শন বলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" দুর্ব্বলের পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব। শক্তিশালী বীরই দেহাত্মিকাবুদ্ধিজাত জড়তার শতসংস্কার হেলায় ছিন্ন করিতে পারেন, দুর্ব্বলের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি,

*সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌॥

অর্থাৎ, "আমি ইহা করিতেছি, আমার দ্বারা ইহা হইতেছে, আমাকে ইহার ফলভোগী হইতে হইবে," এইরূপ বোধই সকল দুর্ব্বলতার মূল। যেখানে দুর্ব্বলতা, সেই স্থানেই ইতস্ততঃ ভাব, ফলাফল ও লাভক্ষতির বিচার এবং নানাপ্রকার অনুশোচনা। যেখানে দুর্ব্বলতা, সেখানেই আত্মসমর্থনের জন্য আপনাকেই আপনি বঞ্চনা করিবার জন্য শত শত যুক্তি তর্কের অবতারণা; সকলেরই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনও যখন এইরূপ অহং-বুদ্ধিজাত চিত্তদৌর্ব্বল্যে অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন মানববুদ্ধির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অহমিকার সংস্কার দূর করিতে হইলে কিরূপ শক্তিসাধনার প্রয়োজন, তাহা কতকাংশে অনুমান করিতে পারা যায়।

দুর্ব্বলতার আত্মপ্রবঞ্চনা।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধস্থলে করুণার্দ্রহৃদয় অর্জ্জুনের হস্ত হইতে অস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতেছেন।

এ স্থলে অর্জ্জুন খৃষ্টাননীতির ও শ্রীভগবান শক্তিবাদের পক্ষ লইয়াছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, "আমাকে নিরস্ত্র ও অপ্রতিকার অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যদি যুদ্ধে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে ভাল, তথাপি আমি তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিব না।"

ভগবান্ উত্তরে বলিতেছেন, "খুব ভাল কথা বলিতেছ বটে, কিন্তু তোমার কথায় আর কাজে মিল কোথায়? তুমি যে পণ্ডিতের মত রাজ্যলাভের লোভে স্বজন-হত্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার অকল্যাণ, যুদ্ধের ফলে সামাজিক অকল্যাণ প্রভৃতি নানাদিক দিয়া ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া অকর্ত্তব্যবোধে সংগ্রাম করিতে চাহিতেছ না, কিন্তু কার্য্যে ত তোমাকে পণ্ডিত বোধ হইতেছে না। তুমি 'অস্ত্রধারণ করিব না' বলিতেছ, কিন্তু অস্ত্রধারণে তোমার ক্ষমতা কই? অস্ত্র ত অনুশোচনার মোহে আপনা হইতেই তোমার হস্ত-স্খলিত হইতেছে। তুমি জয়লাভের লোভ ত্যাগ করিয়া আত্মত্যাগ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার দুর্ব্বলতার নিকট আপনিই পরাজিত হইতেছ, তবে ত্যাগ করিবে কিরূপে?" অর্থাৎ তুমি যে পথে চলিতেছ,

সদসৎ বিচারের অধিকার। ইচ্ছা করিলে যদি তদ্বিপরীত পথেও চলিতে পার, কর্ত্তব্যের নামে যেরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছ, ইচ্ছা করিলে যদি তাহার বিপরীতও করিতে পার, যদি তোমার ইচ্ছাশক্তির সেরূপ সামর্থ্য থাকে, তবেই তুমি সদসৎ বিচারের প্রকৃত অধিকারী। অন্যত্র, সদসৎ বিচার, বিচারের নাম দিয়া কেবল দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতার সমর্থন মাত্র।

এই ভাবে দেখিলে বুঝা যায় শক্তিবাদই খৃষ্টাননীতির আশ্রয়-স্বরূপ। যাহা "বজ্রাদপি কঠোর," তাহাই "কুসুম হইতে মৃদু" হইতে পারে। নম্রতা বিজয়ীরই শোভা পায়, ক্রীতদাসের আবার বিনয় কি? যে সক্ষম, ক্ষমা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

শক্তিশতদলে প্রেমের প্রতিষ্ঠা। 'এক গালে চড় মারিলে অপর গাল ফিরাইয়া দিবে' ভগবান্ যীশুখৃষ্ট-প্রচারিত এই প্রেমময় মহান্ উপদেশ-পালনের সৌভাগ্য সেই শক্তিমানের ভাগ্যেই ঘটিতে পারে, যাহার নিজের উভয় গণ্ডদেশেই নিজের অধিকার আছে।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ অনুভূতির দ্বারা বিভাসিত হইয়া যে সকল বাণী প্রচার করেন, সনাতন সত্যের তাহাই বাঙ্ময়ী রূপ। একই সনাতন সত্য যুগপ্রয়োজনে নানাভাবে প্রচারিত হইলেও মূলতঃ

মতবাদে বিরোধের হেতু। একের সহিত অপরের পার্থক্য সম্ভবে না। অহং-আশ্রয়ী মানববুদ্ধি সনাতন সত্যকে ব্যক্তিত্ববোধের বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া স্বীয় সংস্কারানুযায়ী ভাবে গ্রহণ করে, বিরোধের ইহাই একমাত্র হেতু। ভারতবর্ষের এরূপ বিরোধের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু আবার দেখিতে পাই, সেই বিরোধের ভিতরও মূলতঃ ঐক্য সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। যে বৈষ্ণবমত ও শাক্তমতে মতবাদ লইয়া চির-বিরোধ, সেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রই ব্রজকুমারীগণকে কৃষ্ণলাভের জন্য অগ্রে শক্তিরূপা কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করাইয়াছেন। খৃষ্টাননীতির একটী দোষ এই যে, তাহা শক্তিসাধনার আশ্রয়ত্যাগী হইয়া দুর্ব্বলতাবশতঃ প্রায়ই সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। তেজস্বী শক্তিবাদ জয়গৌরবের কামনা জগৎ-সমাজে প্রকাশ করিতে

লজ্জা পায় না, কিন্তু তাহার সেই বাহিরের গৌরবকামনার অন্তরালে আত্মত্যাগই প্রচ্ছন্নভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিনয়ী খৃষ্টান-নীতির নম্রতা অনেক স্থলেই অহংজাত দুর্ব্বলতা আচ্ছাদনের আবরণ মাত্র। যাহার অহংজ্ঞান নাই, তাহার বিনয়ের প্রয়োজনই বা কি? অর্জ্জুনের যুদ্ধসম্বন্ধে সদসৎবিচারের মূলে "আমি অর্জ্জুন", "ইহারা আমার স্বজন"; "আমাকে গুরুশোণিতপাতহেতু পাপভাগী হইতে হইবে", "আমি বুদ্ধিমান্", "আমি কিরূপে অন্যায়াচরণ করিব", প্রভৃতি সকল যুক্তিই ব্যক্তিত্ববোধের দুর্ব্বলতা হইতে জাত। অর্জ্জুন এই যুদ্ধরূপ ব্যাপারটীকে ব্যক্তিত্ববোধের দৃষ্টিতে যেরূপভাবে দেখিয়াছিলেন, শ্রীভগবান্ দেখাইলেন যে, ক্ষাত্রধর্ম্মের দিক হইতে দেখিলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই বোধ হইবে। যাহা ব্যক্তিত্ববোধের দৃষ্টিতে "নিয়ত নরকবাসের" কারণস্বরূপ বোধ হইতেছিল, ক্ষাত্রধর্ম্মের দিক হইতে তাহাই—

> "যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
> সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥"

সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয় বীরের নিকট অনাবৃত স্বর্গদ্বারস্বরূপ আপনা হইতে উপস্থিত ঈদৃশ যুদ্ধ মহান্ কর্ত্তব্যপ্রতিপালনের উপায়-রূপে প্রতিপন্ন হয়।

হিন্দু সাধক যেমন বাক্যমনের অতীত ব্রহ্মের সাধনায় প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, ত্যাগপথের সাধককেও সেইরূপ অহংজ্ঞান লয় করিবার জন্য প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ আর অহংজ্ঞানত্যাগ একই কথা। অহংবুদ্ধি তম, * ব্রহ্ম নিরঞ্জন জ্যোতিঃ, অহং স্বল্পতাবোধহেতু মৃত্যুভীতি, ক্ষতির আশঙ্কা, সুখকল্পনা ও শোক-অনুশোচনার আশ্রয়স্থল, ব্রহ্ম অনন্ত অভয়। অর্জ্জুন ক্ষাত্র-

ত্যাগসাধনায় প্রতীকাশ্রয়।

* যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।

ধর্ম্মের সাধনায় ব্যক্তিত্ববোধ লয় করিবার জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেন। পতিব্রতার পাতিব্রত্যধর্ম্ম অসৎ অহংবুদ্ধি লয়ের প্রতীকস্বরূপ, এইজন্য তিনি সতী। স্বদেশভক্তের জন্মভূমিই ভূমার প্রতীক, কর্ম্মীর কর্ম্মযোগই ভগবৎপ্রতীকস্বরূপ। বিশ্বের ঐক্যতান বাদনে যে পরমমঙ্গলের রাগিণী প্রতিনিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহার সহিত সুর মিলাইবার জন্য যিনি যে যন্ত্রেই সুরসাধনা করুন না কেন, যন্ত্রের আয়তন যেমনই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, অনন্ত ঐক্যতানের সুরের সহিত সুরটী একেবারে মিশিয়া যাওয়া লইয়াই কথা।

অহং বুদ্ধিক্ষয়ে ত্যাগের পরিমাণ।

অতএব অহংবুদ্ধিক্ষয়ের পরিমাণই আত্মত্যাগের পরিমাপক। অনুষ্ঠিত কর্ম্মের লোকদৃষ্টিতে সদোষত্বে ও নির্দ্দোষত্বে, ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্বে কিছুই আসিয়া যায় না। অহংএর বন্ধন যেমন ভাবেরই হউক, লৌহনির্ম্মিত হউক বা স্বর্ণনির্ম্মিত হউক, পাপের ভয় হউক বা পুণ্যের লোভ হউক, উভয়তঃ তাহা বন্ধন ভিন্ন অপর কিছুই নহে।* বৈষ্ণবধর্ম্ম এই জন্য দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ অর্থাৎ লোকপ্রশংসিত পুণ্যফলপ্রদ প্রতিষ্ঠার পথ ত্যাগ করিয়া লোকবিগর্হিত কলঙ্কের পথই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উপাখ্যানে আছে, এক দস্যুর বায়ান্নটী নরহত্যার পাপে যে বংশদণ্ড দ্বারা সে নরহত্যা করিত, তাহা তাহার মুষ্টিতে দৃঢ়বদ্ধভাবে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তখন সে পাপভয়ে ভীত ও

দস্যুর উপাখ্যান।

অনুতপ্ত হইয়া এক সাধুর শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তুমি আর পাপ করিও না। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও। এইরূপ ভাবে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে পাপক্ষয় হইলে দণ্ড আপনা হইতেই তোমার হস্ত হইতে স্খলিত হইবে।' দস্যু সাধুর কথানুসারে বহুদিন নানাতীর্থে

*কিন্তু বন্ধনের যখন অহংএর গুরুত্ব ক্ষয় হইয়া আসে, তখন সে বন্ধন পুষ্পমাল্য বা সূত্রের বন্ধনের ন্যায় অতি সহজেই মোচন করা যায়। ইহা সত্ত্বগুণের বন্ধন।

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল; ক্রমে তাহার নৃশংস কঠোর চিত্ত এত কোমল হইয়া আসিল যে, কাহারও দুঃখ সে সহ্য করিতে পারিত না। নরহত্যা দূরে থাকুক, একটী ক্ষুদ্র কীটও পদদলিত হইলে তাহার প্রাণে ব্যথা লাগিত। কিন্তু তথাপি তাহার মুষ্টি হইতে বংশদণ্ড স্খলিত হইল না। অবশেষে, একদিন পথ চলিতে চলিতে অরণ্যের মধ্যে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া শব্দানুসারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক দুর্ব্বৃত্ত একটী বালিকার উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার পূর্ব্বের তেজস্বী স্বভাব ফিরিয়া আসিল। 'বায়ান্নটী নরহত্যার পাপে যষ্টি মুষ্টিসংলগ্ন, আবার নূতন নরহত্যার পাপ করিলে কিরূপে পাপমুক্ত হইব' এই প্রকার চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য মনে উদয় হইলেও সে আত্মপাপসম্ভাবনার কথা তখনই ভুলিয়া 'যাহা বায়ান্ন তাহা তিপ্পান্ন' বলিয়া মুষ্টিবদ্ধ দণ্ড তুলিয়া যেই অত্যাচারীর মস্তকে সজোরে দণ্ডাঘাত করিল, তখনই দণ্ড হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অন্যায়ের প্রতীকারে "অহং"এর শেষ বন্ধন আত্মমুক্তির বাসনা-মোচনের সঙ্গে তাহার বায়ান্নটী নরহত্যার পাপও মোচন হইয়া গেল।

খৃষ্টান নীতির জীবনব্যাপী ক্রুশবহন।

খৃষ্টাননীতি সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বর্গসুখ, এবং অসতের পক্ষে অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু যে মহাপুরুষ এই নীতির প্রবর্ত্তক, তিনি ক্রুশবহনকেই মানব জীবনের জীবনব্যাপী কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া মানবকে যে মহিমার অধিকারী করিয়াছেন, স্বর্গরাজ্যের তুচ্ছ প্রলোভন কখনই সে মহিমার উপযুক্ত উপসংহার নহে। বস্তুতঃ এই ক্রুশবহন-মহিমার নিকট স্বর্গরাজ্যের সুখময় চিত্রও নিতান্ত মলিন বোধ হয়। খৃষ্টাননীতি পতিতের উদ্ধারে, আর্ত্তের সেবায়, সমাজের কল্যাণ সাধনে ক্রুশবহনের সহিষ্ণুতাই জীবনব্যাপী তপস্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শক্তিবাদও সহিষ্ণুতার মন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু সে তেজোদৃপ্ত সহিষ্ণুতা দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহে না; সে সহিষ্ণুতা লোকসমাজের নিকট, আপনার কাছে, এমন কি,

কর্ম্মফলদাতা ভগবানের নিকটও সহানুভূতিপ্রার্থী নহে। সে সহিষ্ণুতার একমাত্র অর্থ স্বাধীনতা।

নীট্‌জে তাঁহার গ্রন্থে স্বাধীনতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—স্বাধীনতা কাহাকে বলে? ইচ্ছাশক্তিতে আপনার নিকট আপনার দায়িত্ব-প্রতিষ্ঠা। স্রোতোমুখে তৃণপ্রায় না হইয়া ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আপনার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা। ইচ্ছা-শক্তির সাধনায়, দুঃখ, অভাব, এমন কি, জীবনকেও তুচ্ছবোধ। অর্থাৎ যে কষ্টে, দুঃখে, অভাবে বিচলিত হয় না, কঠোর দুর্দ্দশাতেও আত্মহারা হয় না, এমন কি মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিলেও বিভ্রান্ত হয় না, সেই স্বাধীন। যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি উদ্দেশ্যসাধনের পথে আত্ম-ত্যাগের বেদীতে সকলকেই এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও বলিদান করিতে পারে, তাহাই স্বাধীনতা। যে পৌরুষের সংস্কার যুদ্ধে ও জয়গৌরবে বিকশিত হয়, সেই সংস্কার যখন দেহগত অন্য সকল সহজাত সংস্কারের—এমন কি, সুখী হইবার, আনন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছার উপরেও প্রাধান্য লাভ করে, সেই পুরুষকারের সংস্কারই স্বাধীনতার দ্যোতক। স্বাধীন পুরুষ সদাই যোদ্ধা, অহরহঃ যুযুৎসু।

নীট্‌জের স্বাধীনতার সাধনা।

নীট্‌জে যদি দেহাত্মিকা বুদ্ধিজাত দুঃখ, কষ্ট, অভাব বোধ, মৃত্যু-ভীতি ও সুখের বাসনা সকলই ত্যাগ করিতেছেন, তবে অহরহঃ সংগ্রামে যে জয়গৌরব উপার্জ্জন করিতে চাহিতেছেন, সে জয় কিসের জয়, কাহার জয়? সে জয়গৌরব কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার বন্ধন নহে, নীট্‌জের কথায় ইহাই বুঝায়। সে জয় কেবলমাত্র ত্যাগের জয়, সে জয় স্বাধীনতার জয়। *

* জর্ম্মণদর্শনে বেদান্তের আদর্শের প্রভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, নীট্‌জের এই উক্তিতে বেদান্তের সেই আদর্শের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নীট্‌জে সর্ব্বত্র বেদান্তের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, অনেক স্থলেই জড়বাদে তাহা ম্লান হইয়াছে।

প্রাচ্যনীতিবাদ সৃষ্টির আবর্ত্তনে তপস্যার পন্থা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া,
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

যীশুখৃষ্টের যাহা জীবনব্যাপী ক্রুশবহন, নীট্‌জের যাহা মেহাত্মিকা বুদ্ধিজাত সর্ব্বসংস্কারজয়ী সদা যুযুৎসু স্বাধীনতা, প্রাচ্যমতে তাহাই দুঃসাধ্যসাধনে—দুর্ব্বহবহনে, কঠোর কর্ত্তব্যপালনের দুঃখ স্বীকারে আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত মৃত্যুভয়হারী তপস্যার দুর্গম পন্থা।

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"ইহা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ ভগবান্ যদি থাকেন) তবে কিসেই বা যায় আসে? আর ইহা যদি সত্য না হয় (অর্থাৎ ভগবান্ যদি না থাকেন) তবে জীবনেই বা কি যায় আসে?" এই যে "কি যায় আসে" রূপ তাচ্ছল্য, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জীবন-মৃত্যুতে উপেক্ষা, ইহাই ত্যাগ এবং ইহাই জয়। সেই পরদুঃখকাতর করুণার্দ্রহৃদয় জনহিতৈকব্রত লোককল্যাণার্থে সর্ব্বত্যাগী আত্ম-মুক্তির কামনা পর্য্যন্ত ত্যাগী সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ তাঁহার স্বরচিত কবিতায় সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বভাবের একাত্মক ত্যাগ ও জয়রূপ সাধনার যে ছন্দোময় স্বরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই উপসংহারস্বরূপ দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি হইল,—

ভাঙ্গ বীণা, প্রেম সুধাপান মহা আকর্ষণ,
দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজল পান,
প্রাণপণ—যাক কায়া।
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমারে সাজে।
দুঃখভার, এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার—
প্রেতভূমি চিতামাঝে।

পূজা তাঁর, সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়—
তাহা না ডরাক্ তোমা।
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান
নাচুক তাহাতে শ্যামা।
ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্. এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক দিবস এক ক্ষুধিত বৈষ্ণব রামানুজের গৃহে আসিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিলেন। রামানুজের স্ত্রী বলিলেন, গৃহে কিছুই নাই। স্ত্রীর বাক্যে সন্দেহ হওয়াতে রামানুজ তাঁহাকে কোনও কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র পাঠাইয়া স্বয়ং রন্ধনশালাতে গিয়া দেখিলেন, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে। রামানুজ স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া দ্বিতীয়বারের নিমিত্ত তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে রামানুজের পত্নী * তৃতীয়বারের জন্য গুরুতর অপরাধ করেন, এবং এবার রামানুজ এতদূর বিরক্ত হইলেন যে, পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। সামান্য এক পাত্র জল লইয়া মহাপূর্ণের স্ত্রী ও রামানুজের স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয়। মহাপূর্ণ ইহা শুনিয়া নিজের স্ত্রীকে ভৎসনা করেন এবং রামানুজ বাটী ফিরিবার পূর্ব্বেই কাঞ্চী ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে চলিয়া আসেন। রামানুজ বাটী ফিরিয়া সকল ব্যাপার শুনিলেন এবং স্ত্রীকে ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্যজীবন উভয়েরই অন্তরায় জানিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর রামানুজ শ্রীবরদরাজের মন্দিরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্নিহিত একটী মঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

---

* ইহার নাম ছিল তঞ্জমাম্বাড়।

রামানুজের উত্তরোত্তর মহিমা-বিকাশ দেখিয়া যাদবপ্রকাশ মনে মনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন। এই সময়ে যাদবপ্রকাশের মাতা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি রামানুজের মতের অনুবর্ত্তী হইলে আমি সুখী হইব।" যাদবপ্রকাশ মাতার অনুরোধে এবং নিজ হৃদয়েরও প্রবৃত্তি অনুসারে রামানুজের নিকট গিয়া দীক্ষা লইলেন, এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের নির্দেশানুসারে "যতিধর্ম্ম-সমুচ্চয়" নামে সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের সদ্ব্যবহার করিলেন।

রামানুজের সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের বার্ত্তা শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য্যের শিষ্যগণ বিদিত হইলেন এবং রামানুজকে শ্রীরঙ্গমে পাঠাইয়া দিতে বরদরাজের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন। রামানুজের ন্যায় প্রিয় ভক্তকে ছাড়িয়া দিতে বরদরাজের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু শ্রীরঙ্গমের ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে তিনি অবশেষে রাজি হইলেন। রামানুজ শ্রীরঙ্গমে আসিলেন।

কাবেরীর তীরে উপস্থিত হইয়া রামানুজ দ্বীপাস্থিত শ্রীরঙ্গমের মনোমুগ্ধকর শোভা নিরীক্ষণে মুগ্ধ হইলেন, এবং কাবেরীর পবিত্র জলে স্নান করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া নগরের যাবতীয় অধিবাসিবৃন্দ নগর-বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল এবং ধূমধামের সহিত তাঁহাকে নগরের মধ্যে লইয়া গেল। রামানুজ নগরের পবিত্র স্থানসমূহ ভক্তিভরে দর্শন করিলেন। পরে রঙ্গনাথ-স্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ভগবানের ইচ্ছানুসারে তিনি মন্দিরসংক্রান্ত সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে রামানুজের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তাঁহার ভ্রাতা (মাতৃষসার পুত্র) গোবিন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত তিনি তাঁহাদের উভয়ের মাতুল শৈলপূর্ণের নিকট ত্রিপতিতে তাঁহার একজন অনুচরকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, শৈলপূর্ণ কালহস্তীতে গিয়া গোবিন্দকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং গোবিন্দ এক্ষণে ত্রিপতিতে

আসিয়া শৈলপূর্ণের সেবায় নিযুক্ত আছে। এই সংবাদ পাইয়া রামানুজ অত্যন্ত সুখী হইলেন।

গোষ্ঠীপূর্ণ নামে যামুনাচার্য্যের অপর একটী শিষ্যের নিকট রামানুজ জ্ঞানলাভের জন্য গমনাগমন করিতেন। গোষ্ঠীপূর্ণ অতি কঠিন লোক। রামানুজের ন্যায় শিষ্যকেও দীর্ঘকাল পরীক্ষা না করিয়া তিনি তাঁহার বিদ্যা প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে রামানুজের শিক্ষা লাভ করি-বার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যেন এই তথ্য আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করা না হয়। পরদিন তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, রামানুজ স্থানীয় সকল বৈষ্ণবকে সৌম্য নারায়ণের মন্দিরে সমবেত করিয়া তাঁহার গূঢ় বিদ্যা প্রকাশ্যে প্রচার করিয়াছেন। গোষ্ঠীপূর্ণ বিস্মিত হইয়া রামানুজকে বলিলেন, "আমার আজ্ঞালঙ্ঘনের কি ফল হইবে, জান?" রামানুজ বলিলেন, "জানি প্রভু, ফল অনন্ত নরক। কিন্তু যদি এতগুলি বৈষ্ণবকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিজের নরকযন্ত্রণার ভয় রাখি না।" গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট বিদ্যালাভ করিয়া রামানুজ মালাধর ও বররঙ্গনায়ক নামে যামুনাচার্য্যের অপর দুইটী শিষ্যের নিকট বিদ্যালাভ করিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিলেন। কারণ, যামুনাচার্য্য জানিতেন যে, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এমন কেহ একজন নাই, যাঁহাকে সমস্ত বিদ্যা দান করা যাইতে পারে। সেই জন্য তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্যগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে সমগ্র বিদ্যার বিভিন্ন অংশগুলি শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা রামানুজকে এই সকল বিদ্যা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, রামানুজ সমগ্র বিদ্যালাভের অধিকারী। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে রামানুজ "গদ্যত্রয়" এবং "নিত্যগ্রন্থ" নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই সময় কাশীতে যজ্ঞমূর্ত্তি নামে জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের সমস্ত পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত

করিয়াছিলেন। রামানুজের খ্যাতি তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াতে রামানুজকে তর্কে পরাস্ত করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হয়। তদনুসারে তিনি শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইয়া রামানুজকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। আঠার দিন ধরিয়া তর্ক চলিল। ষোলদিন পর্য্যন্ত কোনও পক্ষের জয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। সপ্তদশ দিনের তর্কে রামানুজ সুবিধা করিতে পারিলেন না। রামানুজ দুঃখিত হৃদয়ে এবং যজ্ঞমূর্ত্তি উৎফুল্লহৃদয়ে তর্কস্থল পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রে রামানুজ বরদরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাকালে বরদরাজ স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, "তুমি যে তর্কের উত্তর দিতে পার নাই, তাহার খণ্ডন এইরূপে হইবে।" প্রভাতে রামানুজ উৎফুল্লহৃদয়ে তর্কস্থলে উপস্থিত হইলেন। সে দিন আর তর্ক করিতে হইল না। রামানুজের মুখে অপার্থিব আনন্দের আভাস দেখিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি বুঝিলেন যে, তর্ক করা বৃথা হইবে। তিনি রামানুজের চরণে শরণ লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল দেবরাজমুনি। অনন্তর রামানুজ তীর্থভ্রমণ-মানসে বহির্গত হইলেন।

প্রথমে তিনি কাঞ্চী গমন করিয়া বরদরাজকে দর্শন করিলেন। তথা হইতে ত্রিপতি গমন করিলেন। তথায় শৈলপূর্ণ ও গোবিন্দের সহিত দেখা হইল। ত্রিপতির পর্ব্বত আরোহণ করিয়া বেঙ্কটেশ দর্শন করিলেন। গোবিন্দ এখন একজন প্রকৃত ভক্ত। রামানুজ শৈলপূর্ণের নিকট বিদায় লইবার সময় গোবিন্দকে চাহিয়া লইলেন। শৈলপূর্ণকে ছাড়িয়া যাইতে গোবিন্দের প্রথমে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে রামানুজের সেবা করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। রামানুজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন পথে পবিত্র মন্দিরসকল দর্শন করিয়া আসিলেন।

শ্রীরঙ্গমে আসিয়া গোবিন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল এম্বার। দেবরাজমুনি (যজ্ঞমূর্ত্তি) "জ্ঞানসার" ও "প্রমেয়সার" নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, গুরুর

সেবাই শিষ্যের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। গুরুই তাঁহার নিকট ঈশ্বরের ন্যায়। রামানুজাচার্য্যও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। প্রথমে শ্রীভাষ্য রচনা করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। পরে "বেদান্তসার," "বেদান্তদীপ," "গীতা-ভাষ্য," "বেদার্থসংগ্রহ" এই কয়খানি পুস্তক লিখিলেন।

রামানুজ তাঁহার গুরুদিগকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। মহাপূর্ণের কন্যা শ্বশুরালয়ে কোন দাসী লইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়াছিল। অভিমানিনী কন্যা পিতৃসমীপে তাহার কষ্ট নিবেদন করিল। কিন্তু উদাসী পিতা সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। এই সংবাদ রামানুজের কর্ণগোচর হইল। রামানুজ তাঁহার একজন শিষ্যকে বলিলেন, "তুমি তাহাদের বাড়ীতে গিয়া দাসের ন্যায় কার্য্য কর।" তখন কন্যার শ্বশুর পাপস্পর্শের ভয়ে রামানুজকে অনুনয় করিয়া নিবৃত্ত করিল।

ইহার পর রামানুজ ভারতের সমস্ত পবিত্র স্থান দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত, উত্তর পশ্চিমে কাশ্মীর এবং পূর্ব্বে পুরুষোত্তমতীর্থ পর্য্যন্ত তিনি ভ্রমণ করিলেন। যেখানে ধর্ম্মের অবনতি দেখিলেন, তথায় পবিত্র ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

রামানুজের প্রিয় শিষ্য আড়বানের দুইটী পুত্র হয়; পরাশর ও বেদব্যাস। ইঁহারা উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, প্রভু রঙ্গনাথ পরাশরকে তাঁহার ভিক্ষাপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ষাট বৎসর ধরিয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমে থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পর এক বিপদ ঘটিল। একজন গোঁড়া শৈব চোলরাজ্যের রাজা হইল এবং সে বৈষ্ণবদিগের উপর যার-পর-নাই অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহার আদেশমত সকল পণ্ডিত শৈব মত গ্রহণ করিল। রামানুজকে আনিবার জন্য রাজা লোক পাঠাইল, উদ্দেশ্য—রামানুজকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করান। এই লোকের নিকট

সমস্ত অবগত হইয়া রামানুজের প্রিয় শিষ্য আড়বান রামানুজের বেশ পরিধান করিয়া রাজদূতকে বলিলেন যে, তিনিই রামানুজ। রামানুজকে কিছু না বলিয়া তিনি দূতের সহিত চোলরাজধানী চিদম্বরম্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাপূর্ণও ঐ উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন। পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ে এক সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিছু দূর যাইবার পর রামানুজ সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার বিপদ এই দুই জন নিজেদের উপর গ্রহণ করাতে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা বুঝাইলেন যে, এক্ষণে কিছুদিন শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করা সমীচীন হইবে। তাঁহাদের কথামত তিনি কয়েক জন নিতান্ত অনুগত শিষ্য লইয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। টোণ্ডনুর নামক স্থানের রাজকন্যাকে ভূতে পাইয়াছিল। রামানুজ তাহাকে সুস্থ করিলেন। রাজা জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি এক্ষণে বৈষ্ণব হইলেন। এই ঘটনাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার ১২,০০০ শ্রমণ রামানুজকে তর্কে আহ্বান করিল। রামানুজ এককালে সকলকে পরাস্ত করিলেন। তাহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া রামানুজ যদুগিরিতে একটা বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। তথায় একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হয়। রামানুজ পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন যে, এই বিষ্ণুর উৎসববিগ্রহ দিল্লীর সম্রাটের প্রাসাদে আছে। রামানুজ দিল্লীতে গেলেন। সম্রাট তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিলেন। সম্রাটের কন্যা ঐ বিগ্রহটী লইয়া খেলা করিত। রামানুজ বিগ্রহটী লইয়া আসিলেন। সম্রাটের কন্যা ঐ বিগ্রহটীকে নিজের প্রিয়তমের ন্যায় ভালবাসিত। সে বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া রামানুজের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া পুনরায় বিগ্রহের নিকট উপস্থিত হইল। একদিন সকলে দেখিল যে, সম্রাটকন্যা বিগ্রহের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। রামানুজের আজ্ঞানুসারে সম্রাটকন্যার একটী স্বর্ণমূর্ত্তি বিগ্রহের পদতলে স্থাপিত হইল এবং রামানুজ এই বিগ্রহের সকল প্রকার উৎসবের বন্দোবস্ত করিলেন এবং তথায় মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার বাহান্ন জন শিষ্যকে বাস করিতে বলিলেন। রামানুজ তথা

হইতে পদ্মগিরিতে গিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া লোকদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। রামানুজ তিরুনারায়ণপুরে বার বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।

এদিকে আড়বান ও মহাপূর্ণ চোলরাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। আড়বানের সহিত তর্কে না পারিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আড়বানও নির্ভীকভাবে উত্তর দিতে লাগিলেন। তখন রাজা আজ্ঞা করিলেন, উভয়কে অন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। রাজাদেশ পালিত হইল। বৃদ্ধ মহাপূর্ণ যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া নগরের বাহিরে আসিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আড়বান শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামানুজ এই সংবাদ পাইয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। পরে শুনিতে পাওয়া গেল যে, দুর্ব্বৃত্ত চোলরাজা নিজ কর্ম্মদোষে এক অতি যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সংবাদে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উল্লসিত হইল। রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন।

বহুদিন পরে তাঁহার প্রিয় দেবমন্দির এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান সকল দর্শন করিয়া রামানুজ প্রীত হইলেন। আড়বানকে অন্ধ দেখিয়া তিনি নিরতিশয় আক্ষেপ করিলেন। আড়বান কিন্তু চক্ষু নষ্ট হওয়ায় কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। রামানুজের বিশেষ ইচ্ছা অনুসারে উভয়ে কাঞ্চী গমন করিলেন এবং রামানুজ বরদরাজের নিকট 'আড়বানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসুক'—এই বর চাহিয়া লইলেন।

কিছুদিন পরে আড়বান স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিলেন। রামানুজ এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। স্থির হইল যে, আড়বানের পুত্র পরাশর ভবিষ্যৎ গুরু হইবে। পরাশরের শিক্ষার ভার গোবিন্দের উপর পড়িল।

ইহার পর রামানুজ বুঝিলেন যে. পৃথিবী হইতে তাঁহার যাইবার সময় হইয়াছে। তখন তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে সমবেত করিয়া বলিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহারা যেন বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ না করে। তিনি ৭২টী অমূল্য উপদেশ প্রদান

করিয়াছিলেন, তাহাতে গুরুকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা করা এবং বৈষ্ণবদিগের সেবা করা জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদের জীবন নিয়মিত করিবার জন্য তিনি দশটী আদেশ প্রচার করিলেন। শিষ্যগণ গুরুদেবের সহিত আসন্নবিচ্ছেদে মুহ্যমান হইয়া নিস্তব্ধভাবে তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেছিলেন। কিন্তু গুরুদেব যখন উপসংহার করিবার সময় তাঁহার স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, তখন সমবেত শিষ্যমণ্ডলী সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "গুরুদেব, আপনার অপরাধের কথা বলিবেন না। আপনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী পবিত্র করিয়াছেন। আমরা আপনার অযোগ্য শিষ্য। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভগবানের কৃপায় আমরা আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি।"

ইংরাজি ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে, ১২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের বিখ্যাত প্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য নশ্বর মানবদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উত্তরভারতে ভ্রমণ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালটী আমার স্মৃতিপটে কতকগুলি চিত্রের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। উহারা যেন প্রাচীনকালের প্রতীচ্যদেশীয় বেদিকাপশ্চাদ্বর্ত্তী পর্দ্দার ও ন্যায় ধর্ম্মানুরাগ সরলতারূপ সোনালি জমির উপর অঙ্কিত। আর সকল চিত্রগুলিই একজনের উপস্থিতির দ্বারা মহিমান্বিত, যিনি আমাদের অন্তরঙ্গ ভক্তপরিধির জ্যোতির্ম্ময় মধ্যবিন্দু-

স্বরূপ ছিলেন। আমরা চারিজন পাশ্চাত্য রমণী ছিলাম; তাঁহাদের মধ্যে একজন ম্যাসাচুসেট্‌সের অন্তঃপাতী কেম্ব্রিজনিবাসী মিসেস্ ওলি বুল, এবং অপর একজন কলিকাতার উচ্চপদস্থ এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান রাজ-কর্ম্মচারি-জগতের অন্যতম অঙ্গ। স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্য-গণপরিবৃত হইয়া আমাদেরই পাশাপাশি যাইতেছিলেন। আলমোড়ায় পৌঁছিয়াই তিনি সদলবলে সেভিয়ার-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সে সময়ে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা কিছু দূরে একটী বাঙ্গলায় স্থান গ্রহণ করিলাম। এইরূপে সকলেই অন্তরঙ্গ ছিলাম বলিয়া খুব অবাধে মিলিবার মিশিবার সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু যখন মাসখানেক পরে আমরা আলমোড়া পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলাম, তখন স্বামিজী সঙ্গিগণকে তথায় রাখিয়া মিসেস্ বুলের অতিথিরূপে আমাদের সহিত গমন করিলেন।

মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যান্ত আমরা কি অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়াই না ভ্রমণ করিয়াছি! আর যেমন আমরা একটীর পর একটী করিয়া নূতন নূতন স্থানে আসিতে লাগিলাম, কি অনুরাগ ও উৎসাহের সহিতই না স্বামিজী আমাদিগকে তত্রত্য প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুটীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন! ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত পাশ্চাত্য লোকদের অজ্ঞতা—অবশ্য, যাঁহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কতক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র—এত বেশী যে উহাকে প্রায় নিরেট মূর্খামি বলা চলে! আর আমাদের এ বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রাচীন পাটালীপুত্র বা পাটনা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিতে হইবে। রেলযোগে পূর্ব্বদিক হইতে প্রবেশ করিবার মুখে কাশীর ঘাটগুলির যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। স্বামিজী সাগ্রহে উহার প্রশংসা করিতে ভুলিলেন না। লক্ষ্ণৌয়ে যে সকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগের নাম ও গুণবর্ণনা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। কিন্তু যে সকল মহানগরীর সৌন্দর্য্য সর্ব্ববাদিসম্মত ও যাহারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়াছে, শুধু সেইগুলিকেই যে স্বামিজী আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা নহে। আর্য্যাবর্ত্তের সুবিস্তৃত খেত, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তন্ময়তা যেরূপ প্রগাঢ় হইয়া উঠিত, এমন আর বোধ হয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন, এবং তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া, কিরূপ ভাগে জমি চাষ করা হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতেন অথবা কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করিতেন—তাহার আবার কোন খুঁটিনাটিটী বাদ যাইত না,—যেমন সকালের জলখাবারের জন্য যে রাত্রি হইতে খিচুড়ী উনানে চড়াইয়া রাখা হইত, তাহাও উল্লিখিত হইত। আমাদিগকে এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নপ্রান্তে যে আনন্দরেখা ফুটিয়া উঠিত, অথবা কণ্ঠ যে আবেগভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্বপরিব্রাজকজীবনের স্মৃতিবশতঃ। কারণ, আমি সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, দরিদ্র কৃষকগৃহে যে অতিথিসৎকার লাভ হয়, তাহা ভারতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না। সত্য বটে যে, গৃহস্বামিনী তৃণশয্যা ব্যতীত আর কোন উত্তম শয্যা, এবং মাটীর দেওয়ালবিশিষ্ট একখানি পরচালা ব্যতীত আর উত্তম আশ্রয় অতিথিকে দিতে পারেন না। কিন্তু তিনিই আবার শেষ মুহূর্ত্তে নিজে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে—যখন বাটীর অপর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—একটী দাঁতন ও এক বাটি দুধ চুপে চুপে এমন একস্থানে রাখিয়া যান, যেন অতিথি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া উহা দেখিতে পান এবং পুনরায় অন্যত্র গমন করিবার পূর্ব্বে কিছু জলযোগ করিয়াও যাইতে পারেন।

সময়ে সময়ে এরূপ মনে হইত, যেন স্বদেশের অতীত গৌরব-বোধই স্বামিজীর ষোল আনা মনঃপ্রাণ অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার স্থানমাত্রেরই ঐতিহাসিক মূল্যবোধ অতি অসাধারণরূপে বিকাশ পাইয়াছিল। এই হেতু, যখন আমরা বর্ষার প্রাক্কালে একদিন

অপরাহ্ণে গুমোটের মধ্য দিয়া তরাই অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন যে, এই সেই ভূমি—যথায় ভগবান্ বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত হইয়াছিল। বন্য ময়ূরগণ রাজপুতনা ও তাহার চারণগণের গীত মনে পড়াইয়া দিল—ক্বচিৎ কোথাও একটী হস্তী স্বামিজীর ভারতের প্রাচীনকালের যুদ্ধকাহিনীসকল বলিবার উপলক্ষ্যস্বরূপ হইল—সেই প্রাচীন যুগের ভারত, যাহা যত দিন সে বিদেশীয়দিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই জীবন্ত কামানরূপ সামরিক প্রাকার খাড়া করিতে পারিয়াছিল, ততদিন কখনও পরাজিত হয় নাই।

আমরা বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া যুক্তপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছি. এই অবসরে স্বামিজী আমাদিগকে তৎকালে যে মহানুভব দয়াবান ইংরাজ উহার শাসনকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞজনোচিত কার্য্যপ্রণালীর কথা বলিলেন। তিনি অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিলেন, "অন্য সকল শাসনকর্ত্তা হইতে তাঁহার পার্থক্য এই যে, তিনি বুঝেন যে, প্রাচ্যদেশসমূহে এখনও জনসাধারণের মত তেমন প্রবল হইয়া না উঠায় উহাদের শাসনভার ব্যক্তিবিশেষের উপর থাকা আবশ্যক। সেইজন্য কোন হাঁসপাতাল, বা কলেজ, বা আফিসের লোক জানে না. কোন্ দিন তিনি উহা পরিদর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আর যে অতি গরীব, তাহারও বিশ্বাস যে, যদি সে শুধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাঁহার হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হইবে।" প্রাচ্যদেশসমূহের শাসনব্যাপারে ব্যক্তির প্রভাব খুব বেশী, এই ভাবটী স্বামিজীর কথাবার্ত্তায় প্রায়ই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, বিচারের চক্ষে দেখিতে গেলে সমগ্র দেশশাসনের পক্ষে গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট শাসনপ্রণালী। তাঁহার একটী প্রিয় ধারণা এই ছিল যে, জুলিয়াস সীজার যে স্বয়ং সম্রাটের পদবী আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এই সত্যটী উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই। সম্রাট্ পদবীতে আরূঢ় কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসন হইতে—

যাঁহার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করা যায়, যিনি সর্ব্বদা কৃপাবিতরণে তৎপর, এবং যিনি অন্য সকলের মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী ন্যায়বিধান করিতে সমর্থ, এরূপ লোকের শাসন হইতে, কতকগুলি ক্রমনিবদ্ধ বিভাগের দয়ামায়াহীন শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকদের পক্ষে যে কি কষ্টকর পরিবর্ত্তন, তাহা আমরা তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। কারণ, আমরা তাঁহার মুখ হইতে শুনিতে পাইলাম যে, ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম প্রথম কত সরলচিত্ত লোক যে লণ্ডনে উইণ্ডসর প্রাসাদে ভারতেশ্বরী মহারাণীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সাক্ষাতে সমস্ত নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব ক্ষয় করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের অধিকাংশই এই নিষ্ফল যাত্রার পথিক হইয়া আশাভঙ্গ ও অভাব হেতু নিজ নিজ গ্রাম ও ঘরদ্বার হইতে বহু দূরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে- যাহার পুনঃ সন্দর্শনলাভ তাহাদিগের ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই।

কিন্তু পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা গুরুদেবের স্বদেশ-প্রেমের গভীরতম পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যদি কেহ তাঁহাকে সে সময় দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ধারণা করিয়া বসিতেন যে, স্বামিজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি উহার সহিত আপনাকে এত অভেদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হইত যেন তিনি ঐ দেশের লোকের সহিত বহু প্রেম ও ভক্তিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন; যেন তিনি উহাদের নিকট পাইয়াছেনও অনেক এবং দিয়াছেনও অনেক। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ছিলেন যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতেন যে, তাঁহাতে তাঁহারা গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের—তাঁহাদের প্রথম এবং শেষ গুরুর—অপূর্ব্ব মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সন্দেহপ্রবণ, তাঁহারা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। আর যদি তাঁহারা তাঁহার আশ্রিত ইউরোপীয় শিষ্যগণ সম্বন্ধে—যাহাদিগকে তিনি নিজের করিয়া লইয়াছিলেন—তাঁহার সহিত একমত হইতে

না পারিত, অথবা তাঁহার ন্যায় উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে না পারিত, তাহা হইলে তিনি এই উদ্দামহৃদয় লোকগুলিকে তাঁহাদের মতপরিবর্ত্তন না করা ও অটুট কঠোরতার জন্য যেন আরও অধিক ভালবাসিতেন। তিনি যে পাঞ্জাবী বালিকার চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার 'শিবোঽহং শিবোঽহং' ধ্বনি শুনার কথা বলিতেন—যাহার বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল একটী অস্ফুট আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার আমেরিকাবাসী শিষ্যগণ ইতিপূর্ব্বেই তদ্বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। আবার এ কথাও বলিতে ভুলিলে চলিবে না যে, এই পাঞ্জাব প্রবেশের পরই তিনি (যেমন আর একবার তিনি কাশীতে জীবনের অপরাহ্নসময়ে করিয়াছিলেন) একজন মুসলমান মিঠাইওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে মুসলমানী খাবার কিনিয়া খাইয়াছিলেন।

আমরা কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি আমাদিগকে হিন্দু পরিবারগুলির বিশেষত্বসূচক দ্বারদেশের উপরিভাগে দোদুল্যমান গাঁদাফুলের মালাগুলি দেখাইয়া দিতেন। আবার ভারতবাসিগণ 'সুন্দর' বলিয়া যাহার আদর করেন, গায়ের সেই 'কাঁচা সোনার রঙ্গ' তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেন। ইউরোপীয়দিগের আদর্শস্থল যে ঈষৎ রক্তাভ শ্বেত, তাহা হইতে উহা কত বিভিন্ন! আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া টঙ্গাযোগে যাইবার সময় তিনি অন্য সব ভুলিয়া, যে শিবমাহাত্ম্যবর্ণনে তিনি কদাপি ক্লান্তি বোধ করিতেন না তাহাতেই মগ্ন হইয়া যাইতেন। মহাদেবের লোকসমাগম হইতে অতিদূরে পর্ব্বতশীর্ষে মৌনভাবে অবস্থিতি, তাঁহার মানবের নিকট কেবল নিঃসঙ্গত্ব যাচ্ঞা এবং এক অনন্ত ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকা—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইত।

রাবলপিণ্ডি হইতে আমরা গাড়ী করিয়া মারীতে গমন করিলাম, এবং তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলাম। তৎপরে কতক টঙ্গায়, কতক নৌকায় আমরা কাশ্মীরান্তঃপাতী শ্রীনগরে গমন করিলাম। ইহার পরে আমরা যে কয় মাস ভ্রমণ করিয়াছিলাম, শ্রীনগর আমাদের প্রধান আড্ডা হইয়াছিল।

এই স্থলে আমাদের যাত্রাপথের সৌন্দর্য্য-সমূহের বর্ণনা করিতে গিয়া সহজেই আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়। কারণ আলমোড়ার রাস্তার পার্ব্বত্য অরণ্যানী এবং বিতস্তা গিরিসঙ্কটের গীর্জ্জার আকারে শোভমান পাহাড়গুলি ও শস্যক্ষেত্রবক্ষে লুক্কায়িতপ্রায় গ্রামসমূহ ঐ পথের অন্তর্গত। ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিলে কতকগুলি সুষমাময় দৃশ্যপরম্পরা মানসপটে উদিত হয়। এই সমুদায় চিত্রের মধ্যে কাশ্মীরী কৃষকরমণীগণোচিত রক্ত মুকুট ও শ্বেত অবগুণ্ঠনযুক্তা সেই প্রাচীনার সৌম্যমূর্ত্তি বড়ই প্রীতিপ্রদ। যখন আমরা ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আবাসস্থলের সমীপবর্ত্তী হইলাম, দেখিলাম, তিনি একটী খামারের মধ্যস্থিত এক বিশাল চিনার বৃক্ষতলে পুত্রবধগণ-পরিবৃত হইয়া চরকায় সূতা কাটিতেছেন। স্বামিজীর এই দ্বিতীয় সন্দর্শন। পূর্ব্ববৎসর তিনি তাঁহার নিকট কোন ছোটখাট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে বিদায়গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে 'মা, আপনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী' এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রশ্ন শ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডল গরিমা ও আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; জয়োল্লাসিত উচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধা এই স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী।" স্বামিজী এই গল্পটী সংখ্যাতীতবার আমাদের নিকট বলিয়াছেন।

এস্থলে আমি শ্রীনগরের বহির্দ্দেশে সমুন্নত পশ্চাত্যদেশসুলভ পপ্‌লার গাছগুলি যে বীথি রচনা করিয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিতে পারি। উহা হবিমা (Hobbema) রচিত বিখ্যাত চিত্রখানির অবিকল অনুরূপ। এইখানে আমরা ভারত ও সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর কত কথোপকথনই না শ্রবণ করিয়াছি!

অথবা আমি জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ফসল কাটিয়া ঘরে তুলিবার পর সেই ক্ষেত্রে গ্রামবাসিগণের সময়োচিত আনন্দোৎসবের কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বর্ণনা করিতে পারি। অথবা, আমি ইসলামা-

বাদের উন্নত পপ্‌লার তরুরাজিতলে তাম্রাভ অ্যামারান্থ (amaranth) শস্যের বা সদ্যোজাত হরিদ্বর্ণ ধানগাছগুলির কথা বলিতে পারি। বনফুল-সমূহের মধ্যে উজ্জ্বল নীলবর্ণের একজাতীয় "ফর্‌গেট-মি-নট্‌" গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরের খেতগুলিতে অতি সাধারণ দৃশ্য, কিন্তু শরৎ ও বসন্তকালে খেত ও নদীতট ছোট ছোট বেগুনী আইরিস (iris) ফুলে একেবারে ছাইয়া যায়। উহাদের বর্শার মত সূচাল পাতাগুলির মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে উহাদিগকে ঘাস বলিয়াই ভ্রম হয়। কোন কোন স্থানে রাস্তার পার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড় দৃষ্টি অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ সকল ভূমি মুসলমান-দিগের গোরস্থান। আর ঐগুলি আইরিস কুসুমমণ্ডিত হওয়ায় কি অনন্ত করুণভাবেরই না উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে!

আবার, এখানে সেখানে ঘাস ও আইরিস ফুলগুলির মধ্যে দুই চারিটী করিয়া গ্রন্থিবহুল আপেল বা নাসপাতি বা আলুবোখারার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে রাজ-সরকার হইতে প্রত্যেক গ্রামের প্রজাগণ বিনাব্যয়ে এক একটী ফলের বাগান উপভোগ করিতে পাইত। এই গাছগুলি তাহাদেরই ধ্বংসাবশেষ। একদিন গোধূলি-সময়ে উচ্চ নদীতটে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, একদল মুসলমান রাখাল পাঁচন-হস্তে কতকগুলি দীর্ঘরোম ছাগলকে গ্রামাভিমুখে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। তার পর কতকগুলি আপেল গাছের নিকট পৌঁছিয়া তাহারা একটু থামিল এবং প্রার্থনাকালে ব্যবহৃত গালিচার পরিবর্ত্তে কম্বল বিছাইয়া সেই ঘনায়মান গোধূলি-আলোকে তাহাদের সান্ধ্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। আমার হৃদয় বলিতেছে, এ সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই, বাস্তবিকই অন্ত নাই!

কিন্তু সত্য সত্যই বর্ত্তমান পুস্তকে এই সকল বস্তুর কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বর্ণনীয় বিষয় ভূগোল বা রাজনীতি নহে, এমন কি, কৌতূহলোদ্দীপক লোকসমূহ বা অপরিচিত জাতিসমূহের আচার-ব্যবহারও নহে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি এই পরিবর্ত্তনের যুগের শত বিরোধ ও গণ্ডগোলের মধ্যেও

সেই প্রাচীন যুগের একটী ধর্ম্মজীবনের যে উন্মেষ দেখিতে পাইয়াছিলাম, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। এই মহাপুরুষ আবার সেই সকল বিরোধের বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন বলিয়া সমধিক মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বলিবার খুব ইচ্ছা থাকিলেও আমার অক্ষমতাবশতঃ ঐ বর্ণনা অসংলগ্ন ও অস্পষ্টই থাকিয়া যাইবে। স্বামিজী নিজেই যেমন একবার বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন যেন একটি পুষ্পের মত, একটী মন্দিররূপ উদ্যানে স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করিতেন; সরল অর্দ্ধনগ্ন, আচারনিষ্ঠ, ভারতের প্রাচীন কালের আদর্শস্বরূপ তিনি এমন একটী জগতের মাঝখানে সহসা ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন, যে জগৎ সেই কালের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। আমার গুরুদেবের জীবনের মহত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে খেদেরও বিষয় এই যে, তিনি এই ছাঁচের লোক ছিলেন না। যে অবস্থায় মানুষ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে, সেই সমাধি-অবস্থালব্ধ শাশ্বত প্রজ্ঞালোকে তাহারও চিত্ত উদ্ভাসিত থাকিত বটে, কিন্তু উহা সেই সকল প্রশ্ন ও সমস্যার উপরই নিপতিত হইত যাহা আধুনিক জগতের মনীষী ও কর্ম্মিগণের আলোচনার বিষয়। তাঁহার আশা বিংশ শতাব্দীর মানবগণের আশাকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে বা বর্জ্জন করিতে পারিত, কিন্তু উহার খোঁজখবর না লইয়া থাকিতে পারিত না। সমুদয় জ্ঞানভাণ্ডারকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রথম ফলস্বরূপ, চারিদিক হইতে সমগ্র মানবজাতির দুর্দ্দশা ও তৎপ্রতিকূলে সংগ্রামের যে দৃশ্য প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় লোকের নয়নপথে সহসা পতিত হইয়াছিল, তাহা ইউরোপীয়গণের ন্যায় তাঁহারও চক্ষে পড়িয়াছিল। ইউরোপ এ বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি। গত ষাট বৎসর বা শতাধিক কাল ধরিয়া ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান ও কাব্য হতাশার ক্রন্দনে পূর্ণ। এক দিকে অধিকারপ্রাপ্ত জাতিসমূহের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান তুষ্টি ও ইতরজনোচিত প্রবৃত্তি, অন্য দিকে অধিকার-নিরাকৃত জাতিসমূহের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান বিষাদ ও যন্ত্রণা; আর মানবের উদার প্রকৃতি এ

সকলকে পাপ বলিয়া জানিয়াও শক্তি-অভাবে ইঁহাদের রোধ বা দমনে অসমর্থ—এই দৃশ্যই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের চক্ষে পড়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং মর্ম্মযাতনা ভোগ করিলেও উপায়ান্তর না দেখিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা শুধু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ইহাই বলিতে পারে, "যাহার আছে, তাহাকে আরও দেওয়া হইবে; আর যাহার নাই, তাহার নিকট হইতে তাহার যৎসামান্য সম্বলটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইবে। সাবধান, যে পরাজিত হইবে, তাহারই সর্ব্বনাশ!"

প্রাচ্য জ্ঞানিমণ্ডলীরও কি এই অভিমত? তাহা হইলে মানব-জাতির আর আশা কি? আমি আমার গুরুদেবের জীবনে এই প্রশ্নের একটী উত্তর দেখিতে পাই। আমি তাঁহাকে একাধারে ভারতের ও জগতের অতীতকালের সংখ্যাতীত আচার্য্য ও ঋষিগণের আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ও ধর্ম্মলাভের জন্য সংগ্রামের উত্তরাধিকারি-স্বরূপে এবং এক নূতনবিধ ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রবর্ত্তক ও ঋষিরূপে দেখিতে পাই। কোন একটী সমস্যাকে তিনি মনে মনে কি ভাবে গ্রহণ করিতেন তাহা হইতেই আমি উহার কি সমাধান হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতাম। আর, আমি পূর্ব্ব হইতেই উহার ঠিক বিপরীত মতটীকে দৃঢ়-ভাবে অবলম্বন না করিয়া থাকিলে (এরূপ স্থলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উহা আমাকে দেখাইয়া দিতেন) তাঁহার ঐ সমাধানের ইঙ্গিত আমার প্রভূত উপকারে আসিত। এই ভাবে চিন্তা করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস যে, যে সকল উন্নত ও অসাধারণ চিন্তাপ্রণালী ও জ্ঞানভূমিতে তিনি অবাধে বিচরণ করিতেন, তাহার প্রত্যেকটীর আধুনিক যুগের জন্য কোন না কোন সার্থকতা আছে। আমার বিশ্বাস, অনেক জিনিস যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছে, তাহা অন্য কাহারও জীবনে অনুকূল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবে। আর আমি প্রার্থনা করি, নিজের মনগড়া কোন কিছু না জুড়িয়া দিয়া, বা সত্যের অপলাপ হয় এমন কোন রঙ্গ না লাগাইয়া, আমি যেন সর্ব্বদা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি।

ভাব্‌বার কথা।

বালক একেবারে বৃদ্ধ হইতে পারে না। বৃদ্ধ হইতে হইলে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিতে হইবে। একেবারে সত্ত্বগুণে উপনীত হওয়া যায় না। সত্ত্বগুণ লাভ করিতে হইলে তমকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণ রজতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; তবেই সত্ত্বসন্নিধানে উপনীত হইবার আশা করা যাইতে পারে।

*   .   .   .

সকল রোগের লক্ষণ শরীরে প্রকাশ হইয়া থাকে. সকল হৃদ্‌গত ভাবও কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়া কে কি রকম লোক জানাইয়া দেয়। ভাল মন্দ অবস্থার লক্ষণ লোকের কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। আহার না করিলে শরীর দুর্ব্বল দেখায়, চোখ কোটরগত হয়; জ্বর হইলে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। তেমনই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরীয় কথা, ধ্যানরত ইত্যাদি অবস্থা প্রকাশ পায়। কোন ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে তাহার মধ্যেও ধর্ম্মের ভাব জাগিয়া উঠে। রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে নিয়ত কর্ম্ম করিবার চেষ্টা—তম বৃদ্ধি হইলে আলস্যবৃদ্ধি, মন নিম্নগামী, শরীর কর্ম্মে অক্ষম, কার্য্য স্থিরতাশূন্য প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

*   .   .   .

শুধু আহারের দ্বারা গুণাতীত অবস্থা লাভ হয় না—উচ্চাবস্থা লাভ করিতে হইলে তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ একই কার্য্য বহুদিন করিলে তাহাই মানুষের প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়ায়। সে অবস্থায় মন যে আহার পছন্দ করিবে তাহাতেই প্রকৃত শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে পারিবে।

*   .   .   .

ভারতে নিরামিশভোজীর সংখ্যাই বেশী। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, হয় তাহারা সত্ত্বগুণী, না হয় তমোগুণী। রজোগুণী নিশ্চিতই নহে। সত্ত্ব-প্রধান মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, তমঃপ্রধান মানুষ কর্ম্মে অক্ষম হয়। রজোগুণে

সর্ব্বদা কাজ করায়, সে কাজ খুঁজিয়া বেড়ায় ; সেই প্রকৃত রজোগুণী যে কাজ করিতে ভয় পায় না, কিন্তু কাজই তাহাকে ভয় করিয়া চলে।

* * * *

ভোগী হইয়া ত্যাগের অনুকরণ করিলে কি হইবে ? যাহাকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না, সংসারের চিন্তায় যাহার শরীর ক্ষয় হয় না, ভোগবিমুখ হইয়া যাহার ইন্দ্রিয়গণ সবল ও সুস্থ থাকে, তাহার পক্ষে নিরামিশ ভিক্ষান্ন ও একাহার পর্য্যাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু যাহাকে সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, সংসারের চিন্তায় যাহার শরীর এবং মন সর্ব্বদা অস্থির, তাহার পক্ষে একাহার, নিরামিশ ভোজন পর্য্যাপ্ত হইবে কি ?

* * * *

"বসিয়া বসিয়া খাইলে কুবেরের ভাণ্ডারও শেষ হয়"—ভাণ্ডারে জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং খরচ তদপেক্ষা কম করিতে হইবে। শরীর সম্বন্ধেও সেই কথা ; পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, শরীর ও মন সতেজ রাখিতে হইবে এবং আহারের তুলনায় পরিশ্রমও করিতে হইবে। শরীর যে পরিমাণে ক্ষয় হইবে, আহারের দ্বারা তদতিরিক্ত পূরণ করিতে হইবে।

* * * *

সরল এবং মন মুখ এক না হইলে উন্নতি লাভ অসম্ভব সরল না হইলে অপরের গুণাবলী বা উপদেশ ধারণা হয় না। মন মুখ এক না হইলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার শক্তি জন্মে না। চাল-চলন অনুকরণ করা অতি সহজ বটে, কিন্তু মন অনুকরণ করিতে হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের প্রয়োজন।

* * * *

বিষয়ে যাহার বিরক্তি ঘটিয়াছে ও যে বিষয়ের তৃষ্ণায় উন্মত্ত তাহা-দের উভয়ের কার্য্যাবলী এক হইতে পারে কি ? যোগী ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া যে আহারে শরীর ও মনের প্রসন্নতা রক্ষা করিয়া থাকেন, ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তি যোগীর আহারের অনুকরণ করিলে নিজে অতি দুর্ব্বল

ও চিররুগ্ন হইবেন। তা ছাড়া তাঁহার বংশধরেরাও তদ্রূপ হইবে; অপর দিকে আবার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা শরীর ও মনের প্রসন্নতা লাভ করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তজ্জন্য অবস্থা অনুযায়ী আহার করাই উচিত।

* * *

'আগে মন, পরে আহার'। মন উচ্চ চিন্তায়, সংচিন্তায় বিভোর না থাকিলে আহারের দ্বারায় সংযম লাভ দুরাশা মাত্র। মন সংযত না হইলে ইন্দ্রিয়গণ শান্ত হইতে পারে কি? ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মন; মন গলিলে হস্ত অপরের সেবায় নিয়োজিত হইবে; সেই মন রুষ্ট হইলে সেই হস্তই অপরের পীড়নে নিয়োজিত হইবে।

মদে মত্ততা আনে; মাংস খাইলে শরীর গরম হয়, শাকসবজীতে উদর ভঙ্গ হয়। সকল আহারেরই দোষ গুণ আছে। বিষও বিকারে অমৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যে মদ খাইলে বীরাচারী সাধক ধ্যানে বসিয়া যান—সেই মদ খাইয়া সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। আবার সেই মদ খাইয়া একজন গালাগালি ও দশের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে; কিন্তু মদ ত একই—কেবল মানুষের প্রকৃতি ভেদে ক্রিয়াও বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। সকল আহার সম্বন্ধেই এই কথা। তমোগুণী শাকসবজী খাইলে ঘুমের মাত্রা বাড়িবে, শরীর দুর্ব্বল হইবে মাত্র। কদাচ তাহার সত্ত্বগুণ লাভ হইবে না।

*

জীবন-সংগ্রামে দুইটী পথ বর্ত্তমান। একটী নিবৃত্তি, অপরটী প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি লাভ করিবার জন্য যাহার মন লালায়িত, তাহার পথ প্রবৃত্তির পথ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। নিবৃত্তি আশ্রয় করিয়া কামিনী কাঞ্চনের বাসনা এবং ভোগরত হইয়া একদিনে সমাধি লাভ করিবার বাসনা কিরূপ?—যেমন ঘসিয়া মাজিয়া রূপ ও ধরিয়া বাঁধিয়া প্রীতি উৎপাদন।

শ্রীভাবুক।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

প্লেটো।

(শ্রীকানাইলাল পাল এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জগত্তত্ত্ব আলোচনায় অগ্রসর হইয়া দেখা গিয়াছে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎকে প্লেটো মূল উপাদান-কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর মতে ঐ চারিটী মূল পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট। আকৃতি বলিতে সীমাবদ্ধ দেশ বুঝায়। সুতরাং ঐ পরমাণুগুলির অস্তিত্ব দেশের উপর নির্ভর করায় প্রকারান্তরে "দেশ"কেই উপাদান-কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইল। "দেশ" বলিতে আবার "অভাব" পদার্থকে বুঝায়। ফলে মোট কথা এই দাঁড়াইল—জগত্তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য যেমন একদিকে মূল ভাবপদার্থ (Idea) স্বীকার করা প্রয়োজন, অপরদিকে এই "অভাব" (Non-Being) পদার্থকেও বাদ দেওয়া চলে না। প্লেটো বলেন, ঐ আকৃতিই গুণের কারণ। লঘুত্ব বা গুরুত্ব গুণও আকৃতিভেদেই জন্মায়। তাই পদার্থসকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে। পিথাগুরু সম্প্রদায় "সংখ্যা"কেই জগতের মূল-কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু "সংখ্যা" দ্বারা তাঁহারা পরিমাণগত ভেদকেই বুঝাইয়াছিলেন—গুণগত ভেদের কথা তাঁহারা বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন না। প্লেটো সেই অসম্পূর্ণতা দূরীকরণমানসেই বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিকেও ভিন্ন ভিন্ন গুণের আশ্রয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাক সে কথা, তাঁর মতে সেই পরমাণুগুলির সংমিশ্রণের ফলে এই বহুধা বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

পরমাণু হইতে বিশ্বজগৎ এইরূপে সৃষ্টি হওয়ার কথা প্লেটো উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে পৃথিবী ও সৌর-জগৎ সম্বন্ধে প্লেটো কি বলেন, দেখা যাউক।

পৃথিবী গোলাকার এবং ইহা মেরুদণ্ডের (axis) উপর নিয়ত ঘুরিতেছে। গোল আকৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ; তাই স্রষ্টা জগতের এ প্রকার আকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিশ্বজগতের প্রধান তিনটী স্তর আছে ;—মধ্যে পৃথিবী, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে চন্দ্র সূর্য্য ও আর পাঁচটী গ্রহ বিদ্যমান। পিথাগুরু সম্প্রদায় প্রচার করিয়াছিলেন, বিশ্বজগৎ—চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ আদি তারাচয় সমতানে সমস্বরে বিশ্বের বন্দনাগান করিতেছে। পদার্থবিদ্যার আলোচনায় জানিতে পারা যায়, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বারা একই স্তর উৎপাদন করিতে হইলে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাখিতে হয়। কথাটী আরও একটু সোজা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করি। ভিন্ন ভিন্ন ওজনের কতকগুলি গোলাকে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের সূত্রের দ্বারা ঝুলাইলে তবে তাহাদের গতি ও তানের সমতা সম্ভব। আমাদের মনে হয়, পিথাগুরু সম্প্রদায়ের মতপ্রভাবে প্লেটো চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহাদির ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় স্তরে চন্দ্র, সূর্য্য ও পাঁচটী গ্রহের বহির্দ্দেশে বৃত্তাকারে তারাচয় সুসজ্জিত আছে। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘূর্ণায়মান হইলেও একস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। তারাচয় একদিনে পৃথিবীকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিষুবরেখার উপর দিয়া প্রদক্ষিণ করে। প্লেটো সৌর-অয়ন-মণ্ডলের (Ecliptic) কথাও উল্লেখ করেন এবং মেরুদণ্ড, বিষুবরেখা ও অয়নমণ্ডলের দিক ও দেশের কথঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

তাঁর মতে সৌর-জগতের গতি দ্বারা আমাদের সময়জ্ঞান লাভ হয়। গতির সহিত সময়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান সে কথা অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। সুনিয়মিত গতি হইতেই আমাদের যে সময়ের জ্ঞান জন্মে, সেটী সহজবোধগম্য। মূল সৎ পদার্থ অর্থাৎ ভাব-পদার্থ যে মুহূর্ত্তে সৃষ্টির আরম্ভ করিলেন, তখনই গতি আরম্ভ হইল। সৎ পদার্থ (Being) হইতে পরিবর্ত্তন (Becoming) ব্যাপারের উদয় হওয়ার নামই সৃষ্টি। এই পরিবর্ত্তন-ব্যাপারের মূল কথা গতি ; সুতরাং প্লেটো "অভাব"কে বা সৃষ্টিকে যে অনাদি বলিয়া উল্লেখ

করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আদি ও অন্ত আপেক্ষিক শব্দ ; যেটী কালে উদয় ও বিলয় হয়, তাহারই আদি অন্ত আছে বলা যায় ; যাহা কালের সহিত উদয় হয়, কাল যাহার পূর্ব্বে ছিল না, কালের সহিত যাহার লয় অর্থাৎ যাহার লয় "হইলে কাল বর্ত্তমান থাকিবে না, তাহাকে কালের অধীন," আদ্যন্তবিশিষ্ট বলা শোভা পায় না।

প্লেটো বলেন, তারা আদি গ্রহচয়ের গতি হইতে আমরা সুনিয়মিত কালের পরিচয় প্রাপ্ত হই। যে সময়ে গ্রহাদি তারাচয় ভ্রমণ করিতে করিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, সেই কালকে ১০০০০ বৎসর বলা হয়। যে কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহাদি ভ্রমণ করিতেছে, সে রেখা হইতে কখনও তাহারা বিচ্যুত হয় না। প্রত্যেকেই নিজ দণ্ডের উপর ঘুরিতেছে অথচ সৌরজগৎকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই সকল গ্রহাদি জড় পদার্থ নয় (তাঁহার মতে শুদ্ধ জড় বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে না) এবং সেই সকল গ্রহাদিরও দেহ, আত্মা ও উদ্দেশ্য আছে। শক্তিরূপ কার্য্যই আত্মার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—যাহা জড়, তাহা আবার গতিশীল হইবে কি করিয়া ? এই গতির তারতম্যই আবার আত্মার তারতম্যের পরিচয় প্রদান করে। জ্ঞান-রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না, অজ্ঞানীর কার্য্য সেরূপ হইতে পারে। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহাদির গতির বিষয় আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞানী বলিয়া মনে করা চলে না। মানুষ জ্ঞানের গরিমা করে, কিন্তু তারাচয় তাহাকে শৃঙ্খলতা সাধন বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষাদান করিতে পারে ; তাহাদের তুলনায় মানুষকে অধিক উন্নত বলা যায় না। জেলার বলেন প্রকৃতিকে (nature) দেবতার স্থানে স্থাপিত করিবার প্লেটোর প্রয়াস তাঁহার গ্রীক জাতীয়ত্বের বিশেষ প্রকাশ ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে জগৎসৃষ্টির উপাদান (Elements) সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ক্ষিত্যপ্তেজ-মরুৎ এই পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট। আকৃতি বলিতে সীমাবদ্ধ

দেশ বুঝায়। সুতরাং প্রকারান্তরে দেশকেই উপাদান-কারণ বলিয়া প্লেটো উল্লেখ করিয়াছেন। যাক্ সে কথা ; প্লেটো বলেন, সেই সকল বিভিন্ন আকৃতি হইতে বিভিন্ন গুণের উদয়। প্রত্যেক পরমাণু বিশেষ-রূপ আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় জগতে তাহাদের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সুতরাং কোন পদার্থ গুরু বা কোনটী লঘু হইবে, সেটী কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

প্লেটোর মতে বিশ্বজগৎ মূল সত্তার প্রতিকৃতি মাত্র। মূলে যাহা বর্ত্তমান, প্রতিকৃতিতেও যথাসম্ভব তাহাই বর্ত্তমান। জগতের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মের সুব্যবস্থা, প্লেটোর মতে চেতন শক্তিমান্ পদার্থেরই অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। এই সকল উক্তিতে আনাক্সাগোরাসের (Anaxagoras) মতের সহিত প্লেটোর মতসাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

জড়বাদীরা জগতের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকা স্বীকার করিতেন না। তদ্বিরুদ্ধে আনাক্সাগোরাসই আপত্তি উত্থাপন করিয়া চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব প্রথম ঘোষণা করেন। প্লেটো বুঝিয়াছিলেন, চৈতন্য সত্তা ব্যতিরেকে জগতের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা অসম্ভব ; তাই তিনি আনাক্সাগোরাসের সহিত এ বিষয়ে একমত হন। তিনি ভৌতিক কারণও অস্বীকার করিতেন না ; পরন্তু সকল কারণকে মূলকারণের অন্তর্গত করিতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার মতে সমস্ত কারণই এক মূল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতেছে। পরমাণুবাদিগণ পরমাণুর সাহায্যেই জগদ্ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন ; প্লেটোও পরমাণুর অস্তিত্ব উড়াইয়া দেন না ; তবে প্রভেদ এই যে, যেটীকে পরমাণুবাদিগণ মূলকারণ বলেন, প্লেটোর মতে সেটী মুখ্য কারণ নয়, সেটী গৌণ কারণ মাত্র। দৃষ্টির জন্য তেজঃ স্বীকার করিতে হইবে ; তেজঃ পরমাণু স্বীকার্য্য ; কিন্তু সেটী জাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য ; মূল সত্যলাভ করিতে হইলে এই জাগতিক জ্ঞানের গণ্ডী ছাড়াইতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি দেশ ও অভাব পদার্থকে প্লেটো অভিন্নাত্মক-

রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যে কোন প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ লওয়া যাক না কেন, দেশকে আশ্রয় করিয়া নাই, এমন কোন পদার্থ হইতে পারে না। ফলে ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনিও অবকাশ বা শূন্যের (void) অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। আমাদের মনে হয়, দেশের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের পর অবকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করা অযৌক্তিক হইয়া দাঁড়ায় ; সীমাবদ্ধ দেশই বস্তুরূপে প্রতিভাত হয় ; এই সীমা সংখ্যা-দ্বারা নিরূপিত হয়। সংখ্যার প্রকারভেদে বস্তুর প্রকার-ভেদ সংঘটিত হয়। এই কয়টী কথা স্মরণ রাখিলে অবকাশের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবকাশ বলিতে কি বুঝি—শূন্য। পরমাণু-বাদিগণ অবকাশের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন—কেন? নচেৎ "গতি"র ব্যাখ্যা প্রদান করা অসম্ভব হয়। তাঁহাদের যুক্তি কতকটা এইরূপ—এক বস্তু এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইলে গতি উৎপন্ন হয় ; কিন্তু যে স্থানে যাইবে, সে স্থান যদি শূন্য না হয়, তবে সেই বস্তু সে স্থানে যাইতে পারে না ; সুতরাং অবকাশ না থাকিলে গতি হইতে পারে না। এই ত গেল পরমাণুবাদীদিগের বক্তব্য। প্লেটোর মতে কিন্তু এই অবকাশের অস্তিত্ব অসম্ভব। তাঁহার মত এইরূপঃ—"দেশ" পদার্থ সকল পদার্থের সাধারণ ভূমি। আকৃতির উদয় বা বিলয় সেই দেশ-পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে—এক স্থান হইতে অন্যস্থলে গতি হইলে দেশের বাহিরে ত যাইতে পারে না ; একদিকে সংযোগ হইলে অপর দিকে বিয়োগ সাধিত হয় ; অবকাশ কোথাও নাই।

বেবর সাহেব (Weber) প্রশ্ন করেন, মূল পদার্থ "ভাব" পদার্থই একমাত্র সৎ পদার্থ—আবার অভাব পদার্থের প্রয়োজন কেন? মূল আদর্শ বর্ত্তমান থাকিতে আবার প্রতিকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? মূল পদার্থ আপন সত্তায় পরিপূর্ণ, আবার আপেক্ষিক সত্তাবিশিষ্ট এই পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগৎ কেন? মঙ্গলস্বরূপ বর্ত্তমান, আবার অমঙ্গলের সৃষ্টির প্রয়োজন কেন? এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তিনি বলিতে চান, প্লেটো মূল ভাবপদার্থ ব্যতিরেকে অপর

একটী পদার্থকে (অভাব পদার্থ) জগৎসৃষ্টির দ্বিতীয় মূলকারণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। কথাটী একবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে এই "অভাব" পদার্থ স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ নয় ও উহা ভাব পদার্থের শক্তিবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে অল্প বিস্তর আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে।

ভাব পদার্থই যদি একমাত্র সৎপদার্থ হয়, তবে দ্বিতীয় সৎপদার্থ থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে আপনাকে আপনি বিকাশ করিতে হইলে সেই অপরিচ্ছিন্ন সত্তা কতকগুলি মৌলিক নিয়মানুসারে সে কার্য্য সাধন করে। আধুনিক কালে সেই নিয়মগুলিকে মোট তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়, যথা—দেশ, কাল ও কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ। প্লেটো আধুনিক যুগের দার্শনিক না হইলেও তিনি ঐ তিনটীর উল্লেখ করিয়া যান, সেজন্য দার্শনিক জগৎ চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। অবশ্য, ঐ মূল নিয়মগুলির বিশেষভাবে পরিচয় তাঁহার গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। দার্শনিকপ্রবর কাণ্টই প্রথম সে বিষয়ে বিস্তারিত ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রথম প্রদান করেন।

ইতিপূর্ব্বে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায়, চৈতন্য-ময় সত্তা ব্যতিরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই সসীম, পরিচ্ছিন্ন; তৎসম্বন্ধে জ্ঞানও আপেক্ষিক; অথচ মূলপদার্থ অসীম, অপরিচ্ছিন্ন ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানও পূর্ণ নিরপেক্ষ। এইরূপ হইল কেন? এ প্রশ্ন মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। উদাহরণ-সাহায্যে আমরা এই কথাটী বুঝাইতে চেষ্টা করি। পদার্থবিদ্যার (Physics) আলোচনায় জানা যায়, যেটীকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া আমরা সাধারণতঃ মনে করি, সেটী বাস্তবিক সাতটী বর্ণের মিশ্রণফল। শ্বেতবর্ণকে বিশ্লেষণ করিলে সাতটী বর্ণ পাওয়া যায়। জগতে যদি সাতটী বর্ণ না থাকিয়া শুধু শ্বেতবর্ণ থাকিত, তাহা হইলে আমাদের বর্ণজ্ঞান কি সম্ভব হইত? (আমরা সাতটী বর্ণ বলিলাম, কারণ, ইহারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রধান বর্ণ।) বর্ণজ্ঞানের জন্য যেমন অনেকগুলি বর্ণের প্রয়োজন, তেমনি জগৎজ্ঞানের জন্য এই বহুধা বৈচিত্র্যের আবশ্যক। প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকেও কোন বস্তু-

জ্ঞান লাভ হয় না। দ্বন্দ্বের বিপরীত মিলনেই জগৎ। সুতরাং ভাব ও অভাব পদার্থের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের জন্য কোন শঙ্কা নাই। কারণ—

জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইলে সীমাবদ্ধ করিতে হয়—জগৎ-জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদন্তর্গত বিষয়কে সীমাবদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অভাবপদার্থ যে সেই অসীম মূল সত্তাকে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছে মনে হইবে, সেটী কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পরন্তু ওরূপ না হইলে সৃষ্টিই যে অসম্ভব হইত।

বিশ্বজগতের বিষয় চিন্তা করিলে মোটামুটী তিনটী কথা আমাদের মনে উদয় হয়—এই বিশ্বজগৎ নামরূপময়, ইহা উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে এবং এক চৈতন্যশক্তিবলে ইহা পরিচালিত। মানুষের যেমন দেহ আছে, আত্মা আছে, উদ্দেশ্য আছে, বিশ্বজগৎসম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যায়। অন্য দিক দিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, বিশ্বাত্মা বিশ্বজগতের অর্থাৎ নামরূপের বিকাশের মধ্য দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া প্রকাশ পাইতেছে। মূল পদার্থ বিশ্বাত্মা সম্বন্ধেও যাহা খাটে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণটীর সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে। মনে হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড "সূত্রে মণিগণা ইব" গ্রথিত।

আমরা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাতেই আত্মার বা বিশ্বাত্মার অল্প-বিস্তর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পরন্তু আত্মবাদী মানুষমাত্রেই আত্মা বলিতে নিজ আত্মার বিষয়ই বুঝিবেন, এমন কি, কেহ কেহ এই বিশ্বজগৎকে অনাত্মা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। প্লেটো বলিতেন, বিশ্বজগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করা অযৌক্তিক। যাহা হউক, এই মানবতত্ত্ব আলোচনা এইবার প্রয়োজনীয়। এই স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। কেহ কেহ বলেন, প্লেটো মূল সত্তা, ভাব পদার্থ, বিশ্বাত্মা, আত্মা ইত্যাদি শব্দগুলি স্থলে স্থলে এরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহা হইতে মনে হয়, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিশেষ; কিন্তু আমরা সে মত গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে প্লেটোর

মূল কথায় দোষ থাকিয়া যায়। ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আবার বলি, পাশ্চাত্য দার্শনিকগুরু প্লেটোর দর্শনে স্ববিরোধ দোষ থাকা আমরা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই; যে স্থলে আপাতদৃষ্টিতে সেরূপ মনে হয়, সে স্থলে সে দোষ পরিহার করিয়া তাঁর মতসঙ্কলনে আমরা প্রয়াসী হইয়াছি। মানবতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে বিশ্বাত্মা (World-Soul) সম্বন্ধে আরও কয়েকটী বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয় মনে হয়; সুতরাং সে কার্য্য সমাধা করিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়ের অবতারণা করিব।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

আলমোড়া।

২০শে জুন, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু—

তোমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। —ভায়ার কথাবার্ত্তা তিনি সঠিকে কন না, এজন্য সে সকল শুনিয়া কোনও চিন্তা করিও না। আমি সেরেসুরে গেছি। • •

*   *   *   *

শু—লিখিয়াছে কি Ruddock's Practice of Medicine পাঠ হচ্ছে। ওসব কি nonsense (অসার জিনিস) ক্লাসে পড়ান? এক সেট Physics (পদার্থবিদ্যা) আর Chemistry র (রসায়নের) সাধারণ যন্ত্র ও একটা telescope (দূরবীক্ষণ) ও একটা microscope (অনুবীক্ষণ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শ— বাবু সপ্তাহে একদিন এসে Chemistry practical (ফলিত রসায়ন) এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হ— Physics ইত্যাদির উপর। আর বাঙ্গালাভাষায় যে সকল উত্তম Scientific (বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে তা সব কিনবে ও পাঠ করাবে।

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

মরী।

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে তোমার শরীর তেমন ভাল নয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। Unpopular (লোকে যাকে পছন্দ করে না এমন) লোককে যদি popular (লোকপ্রিয়) করতে পার তবেই বলি বাহাদুর। ওখানে পরে কোনও কার্য্য হইবার আশা নাই। তদপেক্ষা ঢাকা বা অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিলেই ভাল হইত। যাহা হউক নভেম্বরে যে work close (কাজ বন্ধ) হইবে সেই মঙ্গল। শরীর যদি খারাপ বেশী হয় ত চলিয়া আসিবে। Central Provinceএ (মধ্যপ্রদেশে) অনেক field (কার্য্যের ক্ষেত্র ও সুবিধা) আছে এবং famine (দুর্ভিক্ষ) ছাড়াও আমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব কি? যেখানে হউক একটা ভবিষ্যৎ বুঝিয়া বসিতে পারিলেই কাজ হয়। যাহা হউক দুঃখিত হইও না।

যাহা করা যায় তাহার নাশ নাই—কখনও নহে; কে জানে ঐখানেই পরে সোণা ফলিতে পারে।

আমি শীঘ্রই দেশে কার্য্য আরম্ভ করিব। এখন আর পাহাড় বেড়াবার আবশ্যক নাই।

শরীর সাবধানে রাখিবে

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

মরী।

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু—

কাশ্মীর হইতে গত পরশ্ব সন্ধ্যাকালে মরীতে পৌঁছিয়াছি। সকলেই বেশ আনন্দে ছিল।

* * Captain S— বলিতেছেন যে তিনি জায়গার জন্য অধীর

হইয়া পড়িয়াছেন। মসুরীর নিকট বা অন্য কোন central (কেন্দ্র-স্থানীয়) জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়—তাঁর ইচ্ছা। * * ভাব এই যে খুব ঠাণ্ডা স্থানেও কাজ নাই, আবার বড় গরমও না হয়। ডেরাডুন গরমীকালে অসহ্য—শীতকালে বেশ। মসুরী itself (নিজ মসুরী) শীতকালে বোধ হয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে —অর্থাৎ ব্রিটিশ বা গড়ওয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাবেই। অথচ সেই জায়গায় বারমাস জল চাই, নাইবার খাবার জন্য। * * *—বাবুকে আমার আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম দিও। —মহাশয় এতদিন বাদে কোমর বেঁধে লেগেছেন দেখ্‌ছি। তাঁকে আমার বিশেষ প্রণয়ালিঙ্গন দিও। এইবার তিনি চেগেছেন দেখে আমার বুক দশ হাত হয়ে উঠ্‌ল। আমি কালই তাঁকে পত্র লিখ্‌ছি। অলমিতি—ওয়া গুরুকা ফতে—to work! to work! (কাজে লেগে যাও, কাজে লেগে যাও!) ইতি

বিবেকানন্দ।

সমালোচনা।

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের চতুর্দ্দশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সেবাশ্রম হরিদ্বারের ন্যায় ভারতবর্ষের একটী প্রধান তীর্থে জাতিনির্ব্বিশেষে আতুর নারায়ণগণের সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে (১৯১৪) ২১১ জন রোগীকে সেবাশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৪৩ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ১৮ জন চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, ৮ জন মৃত এবং ৬ জন বৎসর-শেষেও চিকিৎসাধীন আছেন। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আশ্রমে চিকিৎ-সিতের সংখ্যা শতকরা ৩৬ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাঁহারা বাহির হইতে আসিয়া ঔষধ লইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ৯৪৪৪, তন্মধ্যে ৬১৬১ জন পুরুষ এবং ১৯২৪ জন স্ত্রীলোক। মোট ৯৬৫৫ জন রোগীর মধ্যে ৮৫২৮ জন হিন্দু, ১০৩৬ জন মুসলমান, ১২ জন খৃষ্টান এবং

অবশিষ্ট অন্যান্যজাতি। হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ৩৭ জন উচ্চ বংশস্থ। ৯২২ জন চামার ও মেথরও আশ্রমে চিকিৎসিত হইয়াছে। বাহিরের রোগীর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কিছু কমিয়াছে। আশ্রমের কার্য্যের পরিসর বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু আয় তদনুরূপ না বাড়ায় অনেক অসুবিধা হইতেছে।

গত বৎসর আশ্রমে নিম্নজাতীয় ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাও সুন্দররূপ চলিতেছে। গত বৎসর ছাত্রের সংখ্যা ৩০ জন ছিল, এ বৎসর ৩৮ জন হইয়াছে। কিন্তু স্থানাভাবে আশ্রমের খোলা বারান্দায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ইহাতে ছাত্রদিগের শীতে এবং বর্ষার সময় বিশেষ কষ্ট হয়। এই বিদ্যালয়ের জন্য কয়েকটী ঘরের অত্যন্ত অভাব। আমরা এই বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

সেবাশ্রম এ বৎসর চাঁদা হিসাবে ৬৮৭/০ এবং এককালীন দান হিসাবে ২৬০৮৶০ পাইয়াছেন। আশ্রমের এ বৎসরের ব্যয়, একটী কলেরা ওয়ার্ড নির্ম্মাণের ব্যয় সমেত, মোট ৫১৭৪/৪ পাই। এই কলেরা ওয়ার্ডটী নির্ম্মিত হওয়ায় গত কুম্ভমেলার সময় সেবাশ্রম অতি সুশৃঙ্খলার সহিত মহামারীপীড়িত নারায়ণগণকে সেবা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তজ্জন্য সেবাশ্রম জনসাধারণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু ইহা ছাড়াও আশ্রমের আরও কয়েকটী প্রধান অভাব আছে। (১) বড় রাস্তার উপর ঔষধ বিতরণের জন্য একটী ডিস্পেন্সারী,—এখন যেটী আছে, সেটী অত্যন্ত ছোট; এই নূতন ঘরটী হইলে পুরাতনটী নৈশ বিদ্যালয়ের কাজে লাগিতে পারে; (২) ১২টী রোগী থাকিতে পারে এইরূপ একটী সাধারণ ওয়ার্ড। এই দুইটীর জন্য ব্যয় আন্দাজ ৮০০০৲ হইবে। (৩) আশ্রমের স্থায়িত্ব কল্পে স্থায়ী তহবিল এবং (৪) আশ্রমের সাধারণ খরচের জন্য তহবিল।

আশ্রমের কার্য্য যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে সাধারণ তহবিলের উপর বিশেষ টান পড়িতেছে। সেবাশ্রম যাহাতে সুচারুরূপে কাজ চালাইতে পারেন তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করিতেছেন। যাঁহারা বিদেশে তীর্থযাত্রা এবং দরিদ্র নারায়ণগণকে রোগ এবং মারীভয় হইতে রক্ষা করা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, আমরা আশা করি তাঁহারা এই সেবাকার্য্যে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। উপরোক্ত যে কোন ফণ্ডে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল, জেলা সাহারাণপুর ; বা উদ্বোধন কার্য্যাধ্যক্ষ, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

আমরা বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অষ্টমবার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত সেবাশ্রমে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্থানীয় এবং আগত সকল নারায়ণগণকে ঔষধাদি দ্বারা সেবা করা হয়। বৃন্দাবন হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া অনেক লোক জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত এখানে অতিবাহিত করিবার জন্য আগমন করেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা তত ভাল না থাকায় শেষে দুর্দ্দশায় পতিত হন। এমন কি অনেকে এইরূপে বিপন্ন ও অসহায় অবস্থায় পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এইরূপ দুঃস্থ ও নিঃস্ব তীর্থবাসিগণকে ঔষধ এবং পথ্যাদি দিয়া সেবা করা এই সেবাশ্রমের একটী প্রধান অঙ্গ। সাধারণতঃ আশ্রম নিম্নলিখিত চারি প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। (১) রোগীদিগকে ঔষধ সাহায্য ; (২) নিঃস্ব, অসহায় রোগিগণকে আশ্রয় ও ঔষধ পথ্যাদি দানে শুশ্রূষা, এবং মৃত্যু হইলে তাহাদের সৎকারের ব্যবস্থা ; (৩) অসমর্থ রোগিগণকে ঔষধ ও পথ্যাদি তাহাদের গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া, (৪) অতি দুঃস্থ পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্য দান।

আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৯১৪ সালে সেবাশ্রমে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭,২৮৯ জন রোগী সাহায্য পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ২৭৫ জন আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছেন, এবং ৩৬,৯৭১ জন আশ্রমে আসিয়া ঔষধ

লইয়া গিয়াছেন ; ইহার মধ্যে ৭,৪৭৭ জন নূতন রোগী এবং বাকি সংখ্যা ইঁহাদেরই পুনরাবৃত্তি। ইহা ছাড়া ৪৬ জন দরিদ্র লোককে, তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া ঔষধাদি লইয়া যাইতে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া সেবা করা হইয়াছে ; এবং অসহায় অবস্থায় পতিত ৪ জন পর্দ্দানশীন মহিলার ব্যয়ভার আশ্রম এক বৎসর যাবৎ বহন করিয়া আসিতেছেন।

একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণীকে অসহায় অবস্থায় লইয়া আসিয়া আশ্রমে রাখা হয়, তিনি তথায় ৫ বৎসর কাল থাকিয়া শেষে ১৯১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ৩৬৮৪৷৵০ আনা ; মোট ব্যয় ২২৫৫৵০ আনা হইয়াছে। আয়ের টাকার মধ্যে এককালীন দান হিসাবে ১৪৭৮৷৶০ আনা ও বাকি চাঁদা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সেবাশ্রম এখন যেখানে অবস্থিত তথায় স্থানের অত্যন্ত অভাব এবং স্থানটী অস্বাস্থ্যকর বলিয়া রোগী রাখিবার অনুপযুক্ত। তজ্জন্য আশ্রমের স্বাস্থ্যকর স্থানে একটী স্থায়ী বাটীর বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এইটী এই আশ্রমের প্রধান অভাব। ইহা ছাড়া আশ্রমের স্থায়িত্বকল্পে এবং সাধারণ খরচের জন্য সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা বিদেশে এবং এইরূপ একটী তীর্থক্ষেত্রে রোগক্লিষ্ট নরনারীর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, আমরা আশা করি তাঁহারা এই আশ্রমকে সাহায্য করিতে কুন্ঠিত হইবেন না। যিনি যেরূপে সাহায্য করিতে চান তাহা, অনারারী সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বংশীবট, বৃন্দাবন, জেলা মথুরা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

সানফ্রান্সিস্‌কো পানামা পাসিফিক্ ইন্টারন্যাশন্যাল প্রদর্শনীতে শিল্প বিজ্ঞানাদি আলোচনার জন্য অনেক সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রাদি আলোচনার সভাও ইহার অন্যতম

ছিল। এই ধর্ম্মসভাতে বিবিধ ধর্ম্মমতের প্রতিনিধিগণ আহূত হন। ২৯ শে, ৩০ শে এবং ৩১ শে জুলাই এই তিন দিন ধরিয়া এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

২৯শে জুলাই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। দ্বিতীয় দিবস ৩০ শে জুলাই হিন্দু ধর্ম্মের দিন বলিয়া স্থির হয়। প্রথমে শ্রীযুত কে, ডি শাস্ত্রী এম্, ডি, মহোদয় বেদনিহিত দর্শনতত্ত্বের আলোচনা করেন। তৎপরে রামকৃষ্ণ মিশনের সানফ্রান্সিস্কোস্থ পাসিফিক বেদান্তপ্রচার কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রকাশানন্দ "হিন্দু ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা" সম্বন্ধে ওজস্বী ভাষায় একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তথাপি তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ প্রশংসাবাদ শ্রবণে সহজেই অনুমিত হইয়াছিল যে বক্তৃতাটী অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মিঃ জে, সি, মিস্রো এম্, এ বলিয়াছেন, ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের পর আর কেহই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম এরূপ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

তৎপরদিবস ৩১ শে জুলাই প্রাচ্যধর্ম্মের দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। সেইদিবস বৌদ্ধ ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম এবং ফিলজফির আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী বেদান্তপ্রচারকল্পে সাপ্তাহিক বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে দুইটী বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। একটীতে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এবং অপরটীতে পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বক্তা ছিলেন। বেদান্তের প্রচারার্থ সোসাইটীর এই উদ্যম সর্ব্বাঙ্গীণ সফলতা লাভ করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

অনেক দিন পরে সোসাইটী পুনরায় যে কার্য্যতৎপরতা প্রকাশ করিতেছেন, আমাদের বিশ্বাস উহা বহু দিন স্থায়ী হইবে।

ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাস তাঁহাদের পিতামহ প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার ও জমীদার স্বর্গীয় রূপলাল দাস মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের গৃহ নির্ম্মাণের ১০০০৲ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষকার্য্য।

বিগত ২১ শে সেপ্টেম্বরের রিপোর্টে শিলচর ও কোটালিপাড়া (ফরিদপুর) ব্যতীত বাকুড়া এবং বালেশ্বরে দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপের কথা জ্ঞাপন করা হইয়াছে; এক্ষণে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে কাছাড় জেলায় লোকের অবস্থা ভাল হওয়ায় আমরা শিলচরের কার্য্য বন্ধ করিয়াছি।

নিম্নে সাপ্তাহিক বিতরণের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে বাঁকুড়ার অবস্থা অতি শোচনীয়। এই জেলার বহুবিস্তৃত অন্নকষ্ট নিবারণকল্পেই আমরা বর্ত্তমানে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। আমাদের সেবকগণ সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে বাঁকুড়ার দুরাবস্থা পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা অনেক অধিক। এত অধিক যে এখানে পরিদর্শন কার্য্যের প্রয়োজন হয় না বলিলেই চলে। নরনারীগণের কঙ্কালসার মূর্ত্তিই তাহাদের দুর্দ্দশার যথেষ্ট পরিচায়ক। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিরূপ গুরুতর ও বহুব্যাপী তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ যিনিই ঐ অঞ্চলে একবার গমন করিবেন, তিনিই পাইবেন। গভর্ণমেণ্ট প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্য যত্ন করিতেছেন বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ অতি প্রবল বলিয়া অপর সম্প্রদায় সমূহেরও কার্য্য করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বাঁকুড়ায় সরকার বাহাদুর আমাদিগের হস্তে ২৭টী ইউনিয়নের ভার দিয়াছেন—সদর থানায় ৪টী, বিষ্ণুপুর থানায় ২টী, ঐ কেন্দ্রেরই এলাকাভুক্ত জয়রামপুর থানায় ৫টী, সোনামুখী থানায় ৩টী, ওন্দা থানায় ৬টী, কনিয়ামারা কেন্দ্রের এলাকাভুক্ত গঙ্গাজলহাটি থানায় ৪টী এবং ইন্দপুর থানায়

বাঁকুড়া।

৩টী। এই ২৭টী ইউনিয়নের আয়তন যে নিতান্ত অল্প নহে—তাহা চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে।

বাঁকুড়ায় সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। যথা—(১) বাঁকুড়া, (২) বিষ্ণুপুর, (৩) কনিয়ামারা, (৪) সোণামুখী, (৫) ওন্দা এবং (৬) ইন্দপুর।

বালেশ্বরে আমাদিগের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। বস্ত ব্যতীত আগড়পাড়ায় আর একটী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

কোটালিপাড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষকে চতুর্থ দফায় ১০০৲ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে। চতুর্থ সপ্তাহের বিতরণান্তে ঐ কেন্দ্র বন্ধ করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব থানার অধিবাসিগণের পুনঃ পুনঃ আবেদনে তথায় আমাদের কার্য্য খোলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তথায় ৩০০৲ প্রেরণ করা হইয়াছে।

(৬ই সেপ্টেম্বর—৪ঠা অক্টোবর)

কাছাড়।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ (মণ, সের)
শিলচর	৭৫	১০৫৪	৫৭/০
ঐ (পরসপ্তাহে)	৬০	৭৩০	৩৯॥২
ঐ	৯৪	৮৮৪	৫৫৸৩
ঐ	৯৫	৮৭৫	৬০/০

ত্রিপুরা।

অষ্টগ্রাম	২১	৫২৯	৩০/০
গোকর্ণ	৫	১১৪	৬।৩
বিটঘর	১৯	৪৯১	২৫॥৮
ঐ পরসপ্তাহে	১৯	৫৪৮	৩৩/০

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ (মণ, সের)
গুনিয়াউক	১৬	২৪৩	১২।৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৯	৬৭৭	৩৮/০
(ঐ পরসপ্তাহে)	২৫	২১৫	২১/০
ফান্দাউক	৫	২৯২	১৬/০
রামরাইল	২২	৩২৯	১৬৷৷৮
সুইলপুর	৫	১৯০	৯৷৷০
নাসিরনগর	১৯	২৫১	১৪/০
সুলতানপুর	২৬	৬১৬	৩১/০
ভোলাকট	১৮	৩০২	১৬/০
কুটী	২৮	৫৪৩	৩৪/৭
(৬ই সেপ্টেম্বর—১৮ই অক্টোবর)			
বাঁকুড়া।			
বাঁকুড়া	১৩১	১০১৫	৮২/০
ঐ (পরসপ্তাহে)	১২১	১৫৩৬	৯৬/০
ঐ	৯৫	১৪৬৭	৬২/০
ঐ	৪৭	৬৮৫	৩৬/০
বিষ্ণুপুর	৩২	৭৬৬	৪৪।০
ঐ (পরসপ্তাহে)	৭৩	৬৮৯	৫৩।০
ঐ	৯৪	৮৯০	৪৭/০
ঐ	৬৪	৯০১	৪৫/২
কনিয়ামারা	২০	৪৪৪	২০/০
ঐ (পরসপ্তাহে)	৩৪	৪৭৮	২৫।৬
ঐ	৪৯	৭১০	৩৫৷৷৯
ওন্দা	২০	৩৭১	২৪/০
ঐ (পরসপ্তাহে)	৫৩	১৪৩৯	৯৭/০
ঐ	৮৫	১৮০৮	১১৩/০

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ (মণ, সের)
সোণামুখী	৫৭	১১৪৩	৭২/০
ঐ (পরসপ্তাহে)	৫৯	১৪০৮	৭৬/০
ঐ	৩৭	১০১৭	৫৮/০
ইন্দপুর	৩২	৪০৩	২৬/০
ঐ (পরসপ্তাহে)	২৬	৩৬৯	২০/০
	বালেশ্বর।		
বস্থ	২১	৩১০	৯।০
ঐ (পরসপ্তাহে)	২৭	২৪৫	১২/৬
ঐ	৩২	৪৭৪	১৩/৩
ঐ	৪৩	৫৩১	১৫।৩
আগড়পাড়া	৬	১৩৪	১০/৬
	ফরিদপুর		
কোটালিপাড়া	—	২০৬	১৭।৯
ঐ (পরসপ্তাহে)	৩২	৩২০	১৬/০
ঐ	২৫	ঐ	ঐ

চাউলের পরিমাণে সাময়িক সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত হইল। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মহকুমায় সাধ্যমত মধ্যবিত্তগণকে অর্থসাহায্য করা হইয়াছে। সকল কেন্দ্র হইতে বস্ত্রও বিতরিত হইয়াছে।

আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমরা বাগবাজার সোস্থাল ইউনিয়নের নিকট হইতে দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ৭৫০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত ইউনিয়ন দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের সাহায্যার্থ থেস্পিয়ান টেম্পলে অভিনয় করিয়া এই টাকা উঠাইয়াছেন। এবং টালা সুবারবন এসোসিয়েশান, লিটারারি বিভাগও এলফ্রেড থিয়েটারে অভিনয় করিয়া ২৫০্ টাকা আমাদের দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

এক্ষণে সমস্তই আমাদের সহৃদয় দেশবাসিগণের দয়ার উপর

নির্ভর করিতেছে। আমরা নিশ্চেষ্টভাবে এই শত শত নরনারীকে দুমুঠা অন্নের অভাবে মরিতে দেখিতে পারি না। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে লোকে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে, ইহা অপেক্ষা খেদের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা কত দিকে কত বাজে খরচ করিয়া থাকি, তাহার কথঞ্চিৎ সঙ্কোচ করিলেই আমরা এই বুভুক্ষু নারায়ণগণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজ্য দানে পরিতৃপ্ত করিতে পারি। বঙ্গের এই শত শত অনশনপীড়িত নরনারীগণের সাহায্যকল্পে আমরা ভিক্ষাপাত্র হস্তে সকল দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইতেছি—আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী যথাশক্তি উহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া এই মহতী সেবাকার্য্যের সহায়ক হইবেন, এবং শ্রীভগবানের অশেষ আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হইবেন।

দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে যিনি যাহা দান করিবেন অর্থ হউক বা বস্ত্র হউক, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।ঃ—

(১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়া; (২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

নিবেদক,—

৩১শে অক্টোবর। সারদানন্দ।

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন।

দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে নিম্নলিখিত এককালীন দানগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি :—

২রা হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

কতিপয় বন্ধু, কাষ্টম হাউস, কলিকাতা ১৭/০
চতুর্থশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, রাজস্কুল, বর্দ্ধমান ২।০
জনৈক ছাত্র, যোগাশ্রম, কাশী ১৲
মাঃ হেড মাষ্টার, ফতেহাবাদ ১২/০
মাঃ শ্রীযুত জে, ভট্টাচার্য্য, কাঁকুড়গাছি ৲
শ্রীযুত এস, এন, সেন, রেঙ্গুন ১৫০৲
বি, আই, এস, এন কোং, ই, এল, বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ, সালকিয়া ১০॥০
ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা ১৩৲
রেলওয়ে ষ্টেশনের কর্ম্মচারিবৃন্দ, পাঁসকুড়া ৫
রেঞ্জ ফরেষ্ট অফিসার, বেলগাঁ ১৲
শ্রীযুত কে, মুখাৰ্জ্জী, নওগাঁ ৩৲
ডাঃ শ্রীযুত জে, এম, নাগ, জব্বলপুর ২৲
শ্রীযুত নীরদচন্দ্র মজুমদার, বর্দ্ধমান ২৲
,, মোহিনীকান্ত গুপ্ত, কলিকাতা ১৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৲
মাঃ প্রিন্সিপাল, উত্তরপাড়া কলেজ ২৮/১০
মেট্রোপলিটান কলেজ মেসের ছাত্রগণ ১০৲
শ্রীযুত বিপিনবিহারী মুখার্জ্জি, কলিকাতা ৫৲
হেড মাষ্টার, পি, জে, কে হাইস্কুল, রামগোপালপুর ১৫৲
রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রঙ্গপুর ১০৲
পাঁসকুড়া রেলওয়ে কর্ম্মচারিবৃন্দ ৫৲
শ্রীযুত কুমুদ বন্ধু দাস, ইনানঘাট ১৲
,, সুরেন্দ্রনাথ রায়, পাবনা ১৲
ইউনিভারসিটী লাইসেন্‌স্‌ড মেস, কলিকাতা ৩৲
মেসী কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ, কলিকাতা ৫৭।৵০
লাইসেন্স ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেসন্ ১৬৲
হুগলি ব্র্যাঞ্চ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ৯৲
হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বজবজ ৭॥০
সেক্রেটারী, বেঙ্গল ক্লাব, মাণ্ডালে ৭॥০
মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ ৭৲
সেক্রেটারী, ছাত্রভাণ্ডার, রায়গঞ্জ ৫৲
শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲
সম্পাদক ভক্তি, ভক্তি অফিস, হাওড়া ৩৲
শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা ২৲
বরিশাল সেবা সমিতি, কলিকাতা ১৫৲
শ্রীযুত ব্রজনাথ দত্ত, কলিকাতা ৫৲
,, শ্যামা চরণ ঘোষ, নারায়ণগঞ্জ ১৲
,, প্রসন্নলাল সাহা, কলিকাতা ১৲
,, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা ২॥০
কৃষ্ণনগরের ছাত্রবৃন্দ, কৃষ্ণনগর ১২।০
মাঃ শ্রীযুত আশুতোষ মিত্র, কলিকাতা ১২৲
পালং হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ, ফরিদপুর ১০৲
কলিজিয়েট স্কুল হোষ্টেলের বোর্ডারগণ ৮।/০
শ্রীযুত জ্ঞানদা গোবিন্দ চৌধুরী, পাবনা ৫৲
মাঃ শ্রীচন্দ্রকুমার মজুমদার, শিলং, ৫
শ্রীযুক্ত জে, এন, বসু, মাণ্ডালে ৫৲
,, এস, কে, মজুমদার, পোর্টব্লেয়ার ২
বীণাপাণি দুর্ভিক্ষভাণ্ডার, মালদহ ৪০৲
বি, এন, রেলের কর্ম্মচারিবৃন্দ, খিদিরপুর ৬।০
ন্যাশানাল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, বরিশাল ৯৲
সিটি কলেজের ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা ৮৲
শ্রীযুত হরিদাস মল্লিক, কলিকাতা ৫৲
মাঃ শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা ৫৲
শ্রীযুত শশীভূষণ সুকুল, মেদিনীপুর ৫৲
,, আর, কে, দাস, জলপাইগুড়ি ১৲

মাঃ শ্রীজানকী প্রসাদ আইচ, আসানসোল ১৬৸৵০
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর ৮৲
„ গণেশ নারায়ণ, বম্বে ৫
„ নকুলচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ।॥০
হাওড়া বার লাইব্রেরী ৫০৲
হুগলি কলেজের ছাত্রবৃন্দ, চুঁচুড়া ২৫॥০
লাভচাঁদ মতিচাঁদ জৈনস্কুলের ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতা ৪॥০
শ্রীযুত হরিদাস দাস, কলিকাতা ১৲
শ্রীমতী কৃপাক্ষী, কলিকাতা ৲
রায় বাহাদুর হরিপ্রসন্ন ঘোষাল, আরা ৬০
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সুর, „ ১৲
„ পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায় „ ১।০
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ „ ১৲
মাঃ শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল, খুচরা আদায় ৮৵০
শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়, ভাটপাড়া ১
ব্রাডলি বার্ট এইচ, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, মেদিনীপুর ৩।০
শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হেড মাষ্টার, ২৪ পরগণা ১৪
„ চারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ৫৲
„ দেবী প্রসাদ শীল „ ৫৲
বি, আই, এস্, এন্, কোং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, সালকিয়া ২॥০
শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী চন্দ্র, বারাকপুর ৫
„ দুর্গানাথ গুপ্ত, কলিকাতা ২৲
„ জগদীশ চন্দ্র সেন, কলিকাতা ১
মাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ি,রঙ্গপুর ২৯৵০
ডাক্তার শ্রীযুক্ত এন, এল, মুখার্জ্জি,গয়া ১৯॥০
চুঁচুড়া ট্রেনিং একাডেমির ছাত্রবৃন্দ ১০৸৵০
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহরায়, নদীয়া ৩০৲
„ সতীশ চন্দ্র সরকার, ঢাকা ১
„ বিক্রম কুমার বসু, কলিকাতা ৫
মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, বৰ্দ্ধমান ৩৲
ছাত্র ভাণ্ডার, করোনেশন স্কুলের সেক্রেটারী, দিনাজপুর ৪।০

মিস্ মিনু দত্ত ও খোকা দত্ত, বসিরহাট ৪৲
শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহরায়, নদীয়া ২
„ জে, এন, নন্দী, জলপাইগুড়ি ২
শ্রীযুত মহানন্দ কবিরাজ, কলিকাতা ৪৲
„ অনন্তজীব প্রধান, বম্বে ৩৸০
„ রাধামোহন সরকার, ফরিদপুর ২৲
„ পূর্ণচন্দ্র বারিক, কলিকাতা ৫০৲
„ মহেন্দ্রনাথ সিংহরায়, নদীয়া ১০৲
„ ললিতমোহন বোস, হার্থুয়া ৮৲
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ত্রিপুরা ২৲
„ রাজনারায়ণ সিং, জলপাইগুড়ি ১৲
অনাথ আশ্রম, বেহালা ৩০৲
শ্রীমতী বামাসুন্দরী দত্ত গুপ্তা, ঢাকা ১৲
শ্রীযুত শান্তবিলাস সিং, সাহাবাদ ২
ষ্টুডেণ্ট ক্লাব, কলিকাতা ৬০৲
কুমার এণ্ড কোং, মানভূম ৫৲
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুখার্জ্জি, সিমলা ১
„ এম, এল, গোস্বামী, গেণ্ডু ১০৲
„ আর, সি হ, ফুলবানী, উড়িষ্যা ৫৲
„ ইন্দুভূষণ গুপ্ত, আউটসাহী ৫৲
„ যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গুয়াতলী যশোহর ২৲
„ এন, কে, দাসগুপ্ত, লোয়ার বর্ম্মা ১৲
শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ গুহ, সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, নারায়ণগঞ্জ ৫০
মাঃ ডাঃ শ্রীযুত মোহিতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাঁতরাগাছি ১৫
হিন্দুমহিলা সমিতি, শিলং ৲
শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, নকাসিপাড়া ১০৲
সেক্রেটারী ছাত্রভাণ্ডার, এইচ, ই, স্কুল, রাইগঞ্জ ৫
মাঃ শ্রীযুত ডি, ঢোল, কলিকাতা ৫৲
শ্রীযুত পঞ্চানন মুখার্জ্জি, সিমলা ৮৫৲
রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, দিনাজপুর ১০৲
শ্রীযুত শুণ্ডারকর মহম্মদ, কুমারগঞ্জ ২৸৵০
„ ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, ঘোড়ামারা ৪।০
„ পি, এস্ বোস্, আদমপুর ১৬

১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই নবেম্বর পর্য্যন্ত

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৫
জনৈক বন্ধু, পুরী ৫
মাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি
ট্রাষ্টি বন্যানিবারণী ভাণ্ডার, খিদিরপুর ১২
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৩॥
শ্রীযুত শরৎকমল ২
মাঃ শ্রীযুক্ত এম, ঘোষ, কণ্ট্রোলার অব ইণ্ডিয়ান ট্রেজারিজ ১০০৵০
শ্রীমতী সুকুমারী দেবী, মুড়াগাছা ১
শ্রীযুত ভগবতী প্রসাদ, নাইনি ২
মাঃ সেক্রেটারী দুর্ভিক্ষ নিবারণী ভাণ্ডার, কলিজীয়ান হোষ্টেল, বহরমপুর ২০
মোহন্ত মহারাজ অব সাউথ সাইড, পুরী ২০
শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ,, ২
,, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ,, ১
,, প্রমথনাথ দে ,, ২
অধ্যক্ষ ভিক্টোরিয়া ক্লাব ,, ১
শ্রীমতী সরোজবাসিনী দাসী, কলিকাতা ২
সদ্যোজাত, লক্ষ্মীনিবাস ,, ১০
লাইটিং বিভাগ, কলিকাতা করপোরেশন ৮০
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৪
শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র দত্ত, মাঃ স্বামী নির্ভয়ানন্দ ২০
সেক্রেটারী বারলাইব্রেরী, আলিপুর ১০৪।০
শ্রীযুত আব্দুর রহমন মল্লিক, কলিকাতা ১
,, নগেন্দ্রনাথ হালদার ,, ১
শিলচর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ৪
মাঃ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, সভাপতি সেবাভাণ্ডার, চট্টগ্রাম ৩০
পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষনিবারণী ভাণ্ডার, কলিকাতা ৫০০
মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ, মাঃ শ্রীযুত কালীপদ মজুমদার ১৫
মাঃ এফ, জে, আলেকজেণ্ডার, আলমোড়া ৫০
মাঃ শ্রীযুত ঠাকুর চরণ মুখোপাধ্যায়, ঢাকা ১০০
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পাল, কলিকাতা ১০
মিত্র ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রবৃন্দ ভবানীপুর ৫৪
জ্ঞানানন্দ, কনখল ১
মাঃ অধ্যক্ষ "হিতবাদী", কলিকাতা ১০০
শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বল্লারতনগঞ্জ ১
,, রামকুমার দত্ত, ধড়ডা ৫
,, গোপালচন্দ্র পাল, কলিকাতা ১০
জনৈক বন্ধু ১০
শ্রীযুক্ত হরিদাস চৌধুরী, বারুইপুর ১৫
,, সত্যেন্দ্রনাথ মুস্তফী ৫
,, ধীরাজকৃষ্ণ বসু, কলিকাতা ২
শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ ,, ১
,, নীহার নলিনী ঘোষ ,, ১
,, সুধাংশু বালা সরকার ,, ১
,, হেমলতা মিত্র ,, ২
কতিপয় ভদ্র মহিলা ,, ৮
শ্রীযুত ক্ষীরোদ নাথ মিত্র ,, ২
রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়, মাখোরটোলা ২০
শ্রীযুত সাতকড়ি ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ৫
,, সি, ভি, পি, সিংহ, বম্বে ২৫
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১০
শ্রীযুত বি, সি, ঘোষ, পাটিগুপে ৬
স্বত্বাধিকারী "হিতবাদী" কলিকাতা ২০০
নবজাত, লক্ষ্মীনিবাস ২৬॥৵১০
রায় বাহাদুর পি, এন, মুখার্জ্জি, দার্জ্জিলিং ২৫
ই, আই, রেলওয়েজ ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, হাওড়া ২৫
সেক্রেটারী, রিপন কলেজের দুর্ভিক্ষভাণ্ডার (২য় দফা) কলিকাতা ৩০
নন্দ চৌধুরী লেনের সভ্যগণ ৬

শ্রীযুত আনন্দেশ্বর চক্রবর্ত্তী, উদিসা ১_
,, নিকুঞ্জবিহারী দাস দালাল, বক্সর ১২৵০
,, লালা বেণীপ্রসাদ এবং জনৈকবন্ধু, দিল্লী ২০_
সাউথ সুবারবন স্কুল, ভবানীপুর ৩৫৷০
ডিষ্ট্রীক্ট বার এসোসিয়েশান, আলিপুর ৫০_
মিসেস্ সি, ই, সেভিয়ার, টনকপুর ৫_
শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু, বাদুড়তলা ১৬৸০
,, মণিলাল মান্না, কলিকাতা ২_
জনৈকবন্ধু, ,, ১_
শ্রীযুত পশুপতি দে, বারাকপুর ১_
জগন্নাথ ঘাট ইটখোলা বারোয়ারী ভাণ্ডার ১০০
শ্রীযুত রুক্মিণীকান্ত পাল, জগন্নাথঘাট কলিকাতা ২
শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় কলিকাতা ১_
,, রাধাশ্যাম সিংহ ,, ১_
,, প্রফুল্লকুমার মিত্র ,, ২
মাঃ ম্যানেজার "বেঙ্গলী" ,, ১৬৫।০
শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, গোপালিয়ার ৫
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১৸০
ঢাকা মেস্, শিলং ২
বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন, মাঃ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ৭৫০
,, প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত, ঢাকা ৩
,, অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুচবিহার ১৩
মাঃ শ্রীযুক্ত এন, এম, বসু, ইউনিয়ান সাউথ জুট মিল ৩
জনৈকবন্ধু, কারসিয়ং ১০

স্থানীয় কেন্দ্রসমূহে সংগৃহীত।

জনৈকবন্ধু, মাঃ শ্রীযুত অশোক ১০_
ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন্, মাঃ জে, এম্, সেন ইন্‌ষ্টিটিউসন, চট্টগ্রাম ৪৪৵০
মাঃ শ্রীযুত বীরেন্দ্র লাল চতুর্ব্বেদী ৭৷০
শ্রীযুত জানকী নাথ মুখার্জ্জি, উত্তরপাড়া ১০_
উকিলগণ, নবিনগর, ৫_
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণমিশন, বরিশাল ১০০_
মাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস, বাঙ্গানগর, ৮৯৸০
,, ,, যতীন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ৫০_
মাদারীপুর, এইচ, ই, স্কুলের, ছাত্রগণ ১১_
মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, কলিকাতা ১৫০
শ্রীযুত হোসেন সাহেব, ,, ৫০
,, সুরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী, মহিশর
মাঃ শ্রীযুত জে, কে মুখার্জ্জি, বম্বে ২_
,, এম, এল, দে, মাণ্ডালে ১০
,, রমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বরিশাল ২৫_
মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ মাঃ শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জ্জি, কলিকাতা ২৮_
মাঃ ,, দেবেন্দ্র দাস চৌধুরী, চট্টগ্রাম ২৭৷৴০
শ্রীযুত বসন্ত কুমার চাটার্জ্জি, কলিকাতা ২০_
জনৈক বন্ধু, শিলচর ১৵০
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১০
মাঃ শ্রীযুত হরকান্ত বসু, চট্টগ্রাম ১৩৷৴০
বালিকা বিদ্যালয়, ,, ১৬
,, ভূপতি চন্দ্র দাস গুপ্ত, কলমা ৪
,, অবিনাশ চন্দ্র সেন, আখাউড়া ১০
বি, এম্, ইন্‌ষ্টিটিউসনের শিক্ষক ও ছাত্রগণ, বরিশাল ১৫
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, চট্টগ্রাম ৮৷০

ভ্রম-সংশোধন—৬৮৯ পৃষ্ঠার "আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ" প্রবন্ধের ৩য় পংক্তিটী ভুল ছাপা হইয়াছে। "বেদিকাপশ্চাদ্বর্ত্তী পর্দ্দার ন্যায় ধর্ম্মানুরাগ ও সরলতা-রূপ সোনালি জমির"—এইরূপ পড়িতে হইবে।
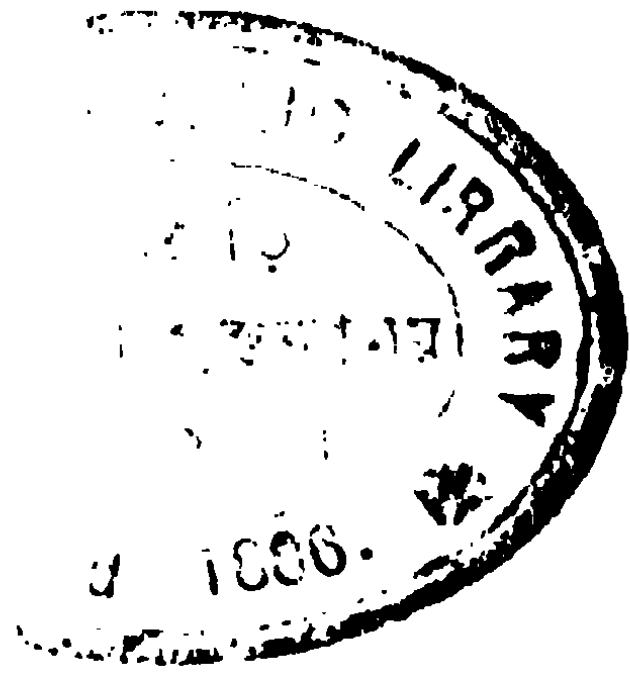
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

নরেন্দ্রনাথ ও ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা।

(স্বামী সারদানন্দ)

আমরা বলিয়াছি, অদ্ভুত পুণ্যসংস্কারসমূহ লইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য অপর সাধারণ হইতে ভিন্নভাবের প্রত্যক্ষসকল তাঁহার জীবনে নানা বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নরেন্দ্র বলিতেন ঃ—"আজীবন, নিদ্রা যাইব বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভ্রূমধ্যভাগে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাইতাম এবং একমনে উহার নানারূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে থাকিতাম। উহা দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া লোকে যে ভাবে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, আমি সেইভাবে শয্যায় শয়ন করিতাম। ঐ অপূর্ব্ব বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া যাইয়া আপাদমস্তক শুভ্র তরল জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত!—ঐরূপ হইবামাত্র চেতনালুপ্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইতাম! আমি জানিতাম, ঐরূপেই সকলে নিদ্রা যায়। বহুকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ ধারণা ছিল। বড় হইয়া যখন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঐ জ্যোতির্বিন্দু প্রথমেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং উহাতেই চিত্ত একাগ্র করিতাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে কয়েকজন বয়স্যের সহিত যখন নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলাম, তখন ধ্যান করিবার কালে কাহার কিরূপ দর্শন ও উপলব্ধি উপস্থিত হইত, পরস্পরে তদ্বিষয়ে

আলোচনা করিতাম। ঐ সময়ে তাহাদিগের কথাতেই বুঝিয়াছিলাম, ঐরূপ জ্যোতিদর্শন তাহাদিগের কখনও হয় নাই এবং তাহাদিগের কেহই আমার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভাবে নিদ্রা যায় না!

"আবার বাল্যকাল হইতে সময়ে সময়ে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থান-বিশেষ দেখিবামাত্র মনে হইত উহাদিগের সহিত আমি বিশেষ পরিচিত, ইতিপূর্ব্বে কোথায় তাহাদিগকে দেখিয়াছি! স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতাম, কিছুতেই মনে আসিত না—কিন্তু কোন মতে ধারণা হইত না যে উহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই! প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ হইত। হয়ত, বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কোন স্থানে নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে একজন একটা কথা বলিল, অমনি সহসা মনে হইল—তাই ত, এই গৃহে এই সকল ব্যক্তির সহিত এই বিষয় লইয়া আলাপ যে ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি এবং তখনও যে এই ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিয়াছিল! কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিতাম না—কোথায়, কবে ইহাদিগের সহিত ইতিপূর্ব্বে এইরূপ আলাপ হইয়াছিল! পুনর্জ্জন্মবাদের বিষয় যখন অবগত হইলাম তখন ভাবিয়াছিলাম তবে বুঝি জন্মান্তরে ঐ সকল দেশ ও পাত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, এবং তাহারই আংশিক স্মৃতি কখন কখন আমার অন্তরে ঐরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। পরে বুঝিয়াছি ঐ বিষয়ের ঐরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। এখন * মনে হয়, ইহজন্মে যে সকল বিষয় ও ব্যক্তির সহিত আমাকে পরিচিত হইতে, হইবে, জন্মিবার পূর্ব্বে সেই সকলকে চিত্রপরম্পরায় আমি কোনরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং উহারই স্মৃতি, জন্মিবার পরে, আমার অন্তরে আজীবন সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে।"

সে যাহা হউক, ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং সমাধিস্থ হইবার

* এই অদ্ভুত প্রত্যক্ষের কথা শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি উহার সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

কথা নানা লোকের * নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কোনরূপ অবস্থান্তর বা অদ্ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইবে একথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াইল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপাদপ্রান্তে আগমন করিয়া উপর্য্যুপরি দুই দিন তাঁহার যেরূপ অলোকিক প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইল তাহার তুলনায় তাঁহার পূর্ব্বপরিদৃষ্ট প্রত্যক্ষসকল নিতান্ত ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার ইয়ত্তা করিতে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি পরাভব স্বীকার করিল। সুতরাং ঠাকুরের বিষয় অনুধাবন করিতে যাইয়া তিনি এখন বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঠাকুরের অচিন্ত্য দৈবীশক্তি-

* আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে শ্রীযুত নরেন্দ্র কলিকাতার জেনেরেল এসেম্‌ব্লিস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ নামক বিদ্যালয় হইতে এফ, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উদারচেতা সুপণ্ডিত হেষ্টী সাহেব তখন উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন, এবং ছাত্রদিগের সহিত সরল সপ্রেম আচরণের জন্য নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সাহিত্যের অধ্যাপক সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় হেষ্টী সাহেব একদিন এফ, এ, ক্লাসের ছাত্রবৃন্দকে সাহিত্য অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি তাহাদিগকে উক্ত অবস্থার কথা যথাবিধি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে একাগ্রতা হইতে উক্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে; ঐপ্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়—একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি—একদিন তাঁহারা উক্ত অবস্থা দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।” ঐরূপে হেষ্টী সাহেবের নিকট হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের কথা প্রথম শ্রবণ করিবার পরে সুরেন্দ্রনাথের আলয়ে তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্ম-সমাজে ইতিপূর্ব্বে গতিবিধি থাকায় তিনি ঠাকুরের কথা ঐস্থানেও শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সহায়েই যে তাঁহার ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবিষয়ে সংশয় করিবার তিনি বিন্দুমাত্র কারণও অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই এবং মনে মনে ঐবিষয়ের যতই আলোচনা করিয়াছিলেন ততই তিনি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহসা যেরূপ অদ্ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শাস্ত্র বলেন. স্বল্পশক্তিসম্পন্ন সামান্য-অধিকারী মানবের জীবনে ঐরূপ প্রত্যক্ষ বহুকালের ত্যাগ ও তপস্যায় বিরল উপস্থিত হয় এবং কোনরূপে একবার উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুর ভিতরে ঈশ্বরপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইয়া সে এককালে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। শ্রীযুত নরেন্দ্র যে ঐরূপ করেন নাই ইহা স্বল্প বিস্ময়ের কথা নহে; এবং উহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কতদূর উচ্চ অধিকারী ছিলেন। অতি উচ্চ আধার ছিলেন বলিয়াই ঐ ঘটনায় তিনি এককালে আত্মহারা হইয়া পড়েন নাই এবং সংযত থাকিয়া ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও আচরণের পরীক্ষা ও কারণনির্ণয়ে আপনাকে বহুকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিভূত না হইলেও এবং এককালে বশ্যতা স্বীকার না করিলেও তিনি এখন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম সাক্ষাতের দিবস হইতে ঠাকুরও অন্যপক্ষে নরেন্দ্রনাথের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। অপরোক্ষবিজ্ঞানসম্পন্ন মহানুভব গুরু সুযোগ্য শিষ্যকে দেখিবামাত্র আপনার সমুদয় জীবনপ্রত্যক্ষ তাহার অন্তরে ঢালিয়া দিবার আকুল আগ্রহে যেন এককালে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে গভীর আগ্রহের পরিমাণ হয় না, সে স্বার্থগন্ধশূন্য অহেতুক অধৈর্য্য পূর্ণসংযত-আত্মারাম গুরুগণের হৃদয়ে কেবলমাত্র দৈবপ্রেরণাতেই উপস্থিত হইয়া থাকে! ঐরূপ প্রেরণাবশেই জগদ্গুরু মহাপুরুষগণ উত্তম

অধিকারী শিষ্যকে দেখিবামাত্র অভয় ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে আরূঢ় করাইয়া তাহাকে আপ্তকাম ও পূর্ণ করিয়া থাকেন। *

নরেন্দ্রনাথ যেদিন দক্ষিণেশ্বরে একাকী আগমন করেন, ঠাকুর যে ঐদিন তাঁহাকে এককালে সমাধিস্থ করিয়া ব্রহ্মপদবীতে আরূঢ় করাইতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। কারণ, উহার দুই তিন বৎসর পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র যখন সম্পূর্ণ-রূপে ঠাকুরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য ঠাকুরের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আমাদিগের সম্মুখে অনেক সময়ে বলিতেন, "কেন? তুই যে তখন বলিয়াছিলি তোর বাপ মা আছে তাদের সেবা করিতে হইবে?" আবার কখন বা বলিতেন, —"দেখ, একজন মরিয়া ভূত হইয়াছিল। অনেককাল একাকী থাকায় সঙ্গীর অভাব অনুভব করিয়া সে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কোন স্থানে মরিয়াছে শুনিলেই সে সেখানে ছুটিয়া যাইত; ভাবিত, এইবার বুঝি তার একজন সঙ্গী জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃত ব্যক্তি গাঙ্গবারি স্পর্শে বা অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া সে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় একাকী কাল যাপন করিত। ঐরূপে সেই ভূতের সঙ্গীর অভাব আর কিছুতেই ঘুচে নাই। আমারও ঠিক ঐরূপ দশা হইয়াছে। তোকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম এইবার বুঝি আমার একটি সঙ্গী জুটিল—কিন্তু তুইও বলিলি, তোর বাপ মা আছে। কাজেই আমার আর সঙ্গী পাওয়া হইল না।" ঐরূপে ঐদিবসের ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অতঃপর নরেন্দ্রনাথের সহিত অনেক সময় রঙ্গ পরিহাস করিতেন।

সে যাহা হউক, সমাধিস্থ হইবার উপক্রমে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইতে দেখিয়া ঠাকুর সে দিন যেরূপে নিরস্ত

* শাস্ত্রে ইহা শাম্ভবী দীক্ষা বলিয়া নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাম্ভবী দীক্ষার বিস্তারিত ববরণের জন্য গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায় পৃঃ, ২০২।২০৩ দেখ।

হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঘটনা ঐরূপ হওয়ায় নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তিনি যাহা দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে ঠাকুরের সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদিগের অনুমান, সে জন্যই তিনি, নরেন্দ্র তৃতীয় দিবস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে শক্তিবলে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নানা রহস্য কথা তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজ প্রত্যক্ষসকলের সহিত উহাদিগের ঐক্য দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুমান সত্য হইলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই দিবসে একই প্রকারের সমাধি-অবস্থা লাভ করেন নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় উক্ত দুই দিবসে তাঁহার দুই বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বোক্তভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুর একভাবে নিশ্চিন্ত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, বলিতে পারা যায় না। কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন, যে সকল গুণ বা শক্তি-প্রকাশের মধ্যে একটির বা দুইটির মাত্র অধিকারী হইয়া মানব সংসারে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ঐরূপ আঠারটি শক্তিপ্রকাশ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, এবং ঈশ্বর, জগৎ ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চরম সত্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র উহাদিগকে সম্যকরূপে আধ্যাত্মিকপথে নিযুক্ত করিতে না পারিলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপ হইলে নরেন্দ্র অন্য সকল নেতাদিগের ন্যায় এক নবীন মত ও দলের সৃষ্টিমাত্র করিয়া জগতেখ্যাতি লাভ করিয়া যাইবে; কিন্তু বর্ত্তমান যুগপ্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য যে উদার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধি ও প্রচার আবশ্যক তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিয়া জগতের যথার্থ কল্যাণসাধন করা তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং নরেন্দ্র যাহাতে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সদৃশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে

সেজন্য এখন হইতে ঠাকুরের প্রাণে অসীম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর সর্ব্বদা বলিতেন,—গেড়ে, ডোবা প্রভৃতি যে সকল জলাধারে স্রোত নাই সেখানেই যেমন দল বা নানারূপ উদ্ভিজ্জ-দামের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে আংশিক সত্যমাত্রকে মানব পূর্ণ সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে সেখানেই দল বা গণ্ডিনিবদ্ধ সম্প্রদায়সকলের উদয় হইয়া থাকে। অসাধারণ মেধা ও মানসিকগুণসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ বিপথে গমন করিয়া পাছে ঐরূপ করিয়া বসেন এই ভয়ে ঠাকুর কতরূপে তাঁহাকে পূর্ণ সত্যের অধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার প্রথম হইতেই ঠাকুর নানাকারণে তাঁহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন এবং যতদিন না তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রের আর পূর্ব্বোক্তভাবে বিপথে গমন করিবার সম্ভাবনা নাই ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত আকর্ষণ তাঁহাতে সহজ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে নাই। ঐ সকল কারণের অনুধাবনে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, উহাদের কতকগুলি নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজ অদ্ভুত দর্শনসমূহ হইতে সম্ভূত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টগুলি পাছে নরেন্দ্র কালধর্ম্মপ্রভাবে দারৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার মহৎ জীবনের চরমলক্ষ্যসাধনে আংশিক-ভাবেও অসমর্থ হন এই ভয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

বহুকালব্যাপী ত্যাগ ও তপস্যার ফলে ক্ষুদ্র 'অহং মম' বুদ্ধি সম্পূর্ণ-রূপে তিরোহিত হওয়ায় জগৎ-কারণের সহিত নিত্য অদ্বৈতভাবে অবস্থিত ঠাকুর, ঈশ্বরের জনকল্যাণ-সাধনরূপ কর্ম্মকে আপনার বলিয়া অনুক্ষণ উপলব্ধি করিতেছিলেন। উহারই প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মগ্লানি-নাশ-রূপ সুমহৎ কার্য্য তাঁহার শরীরমনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া সাধিত হয় ইহাই বিরাটেচ্ছার অভিপ্রেত। আবার, উহারই প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন,

ক্ষুদ্র স্বার্থসুখসাধনের জন্য শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগে পূর্বোক্ত জনকল্যাণ-সাধনরূপ কর্ম্মে তাঁহাকে সহায়তা করিতেই আগমন করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থশূন্য নিত্যমুক্ত নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ হইবে এবং তাঁহার প্রতি তিনি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হইবেন ইহাতে বিচিত্র কি? অতএব আপাত-দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আকর্ষণ দেখিয়া বিস্ময়ের উদয় হইলেও উহা যে স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী তাহা স্বল্পচিন্তার ফলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কতদূর নিকট আত্মীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং কিরূপ তন্ময়ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন তাহার আভাস প্রদান করা একপ্রকার সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়া থাকে। সংসারী মানব যে সকল কারণে অপরকে আপনার জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণ করিয়া থাকে তাহার কিছুমাত্র এখানে বর্ত্তমান ছিল না, কিন্তু নরেন্দ্রের বিরহে এবং মিলনে ঠাকুরের যেরূপ ব্যাকুলতা এবং উল্লাস দর্শন করিয়াছি তাহার বিন্দুমাত্রেরও দর্শন অন্যত্র কোথাও আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বাস্তবিক নিষ্কারণে একজন অপরকে যে এতদূর ভালবাসিতে পারে ইহা আমাদিগের ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান ছিল না। নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, কালে সংসারে এমন দিন আসিবে যখন মানব মানবকে সত্য সত্যই ঐরূপে নিষ্কারণে ভালবাসিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।

ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী প্রেমানন্দ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে সপ্তাহ বা কিঞ্চিদধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে আসিতে না পারায় ঠাকুর তাঁহার জন্য কিরূপ উৎকণ্ঠিতচিত্তে তখন অবস্থান করিতেছিলেন তদ্দর্শনে তিনি মোহিত হইয়া ঐবিষয় আমাদিগের নিকটে অনেকবার কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত হাটখোলার ঘাটে নৌকায় উঠিতে যাইয়া

ঐদিন রামদয়াল বাবুকে তথায় দেখিতে পাইলাম। তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন জানিয়া আমরা একত্রেই এক নৌকায় উঠিলাম এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় রাণী রাসমণির কালীবাটীতে পৌঁছিলাম। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি মন্দিরে ৺জগদম্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে ঐস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া 'এখানটায় সিঁড়ি উঠিতে হইবে—এখানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার ভাববিভোর হইয়া বাহ্যসংজ্ঞা হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এজন্য ঠাকুরকে এখন ঐরূপে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া বুঝিলাম তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তাখানির উপর উপবেশন করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক আমার মুখ ও হস্ত পদাদির লক্ষণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আমার হাতখানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুক্ষণ নিজহস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বেশ'। ঐরূপে কি বুঝিলেন তাহা তিনিই জানেন। উহার পরে রামদয়াল বাবুকে শ্রীযুত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, 'সে অনেকদিন এখানে আসে নাই, তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, একবার আসিতে বলিও।'

"ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্ব্বদিকে উঠানের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য ঘরের ভিতরেই শয্যা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টা কাল অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের ন্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়াল

বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো, ঘুমুলে?' আমরা উভয়ে শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'আজ্ঞে না।' উহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটার যেন গামছা নিংড়াবার মত জোরে মোচড় দিচ্চে; তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো; সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ; তাকে মাঝে মাঝে না দেখ্‌লে থাকতে পারি না।' রামদয়াল বাবু কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে-ছিলেন, সেজন্য ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ঠাকুরের ঐরূপ বালকের ন্যায় আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন এবং রাত্রি পোহাইলেই নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিবেন ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের আর প্রশমন হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও পরক্ষণেই ঐকথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকটে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার কি অদ্ভুত ভালবাসা এবং যাহার জন্য ইনি ঐরূপ করিতেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর! সেই রাত্রি ঐরূপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল। পরে রজনী প্রভাত হইলে মন্দিরে যাইয়া ৺জগদম্বাকে দর্শন করিয়া এবং ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণে-শ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন আসেন নাই বলিয়া ঠাকুর বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বলেন, "সেদিন ঠাকুরের মন যেন নরেন্দ্রময় হইয়া রহিয়াছে, মুখে নরেন্দ্রের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্য কথা নাই! আমাকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্ত্বগুণী ; আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের চারি জনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন ; তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না !"—বলিতে বলিতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য এককালে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রবিরহে মাতা যেরূপ কাতর হন সেইরূপে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুতেই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এবং আমরা তাঁহার এরূপ ব্যবহারে কি ভাবিব মনে করিয়া ঘরের উত্তরদিকের বারাণ্ডায় দ্রুতপদে চলিয়া যাইলেন এবং 'মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাকতে পারি না,' ইত্যাদি রুদ্ধস্বরে বলিতে বলিতে বিষম ক্রন্দন করিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া কাতরকরুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'এত কাঁদ্‌লাম, কিন্তু নরেন্দ্র ত এল না ; তাকে একবার দেখ্‌বার জন্য প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্চে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে ; কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বুঝে না'—এইরূপ বলিতে বলিতে আবার অস্থির হইয়া তিনি গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বুড়ো মিন্‌সে, তার জন্য এইরূপে অস্থির হইচি ও কাঁদ্‌চি দেখে লোকেই বা কি বল্‌বে বল দেখি ? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না ; কিন্তু অপরে দেখে কি ভাব্‌বে বল দেখি ! কিন্তু কিছুতেই সাম্‌লাতে পাচ্চি না !' নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয়ই নরেন্দ্র দেবতুল্য পুরুষ হইবেন, নতুবা তাঁহার প্রতি ঠাকুরের এত টান কেন ? পরে ঠাকুরকে শান্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলাম, 'তাই ত মহাশয় তার ভারি অন্যায়, তাকে না দেখে আপনার এত কষ্ট হয় একথা জেনেও সে আসে না।' এই ঘটনার কিছুকাল পরে অন্য এক দিবসে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের বিরহে ঠাকুরকে যেমন অধীর দেখিয়াছি তাঁহার সহিত মিলনে আবার তাঁহাকে তেমনি উল্লসিত হইতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিথিদিবসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভক্তগণ সেদিন তাঁহাকে নূতন বস্ত্র সচন্দন পুষ্প মাল্যাদি পরাইয়া বেশ সাজাইয়াছিলেন। তাঁহার ঘরের পূর্ব্বে, বাগানের দিকের বারাণ্ডায় কীর্ত্তন হইতেছিল। ঠাকুর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে কখন কিছুক্ষণের জন্য ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন, কখন বা এক একটি মধুর আঁখর দিয়া কীর্ত্তন জমাইয়া দিতেছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্র না আসায় তাঁহার আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল মধ্যে মধ্যে চারিদিকে দেখিতেছিলেন এবং আমাদিগকে বলিতেছিলেন,'তাই ত নরেন্দ্র আসিল না!' বেলা প্রায় দুই প্রহর, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া সভামধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার স্কন্ধে বসিয়া গভীর ভাবাবিষ্ট হইলেন। পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথায় ও তাঁহাকে আহারাদি করাইতেই ব্যাপৃত হইলেন। সে দিন তাঁহার আর কীর্ত্তন শুনা হইল না।

ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র যে দেবদুর্লভ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহাতে অবিচলিত থাকিয়া তিনি যে, যথার্থ সত্যলাভের আশয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সত্যানুরাগ তাঁহার ভিতরে কতদূর প্রবল ছিল। অন্যপক্ষে ঠাকুর যে নরেন্দ্রের ঐরূপভাবে ক্ষুণ্ণ না হইয়া শিষ্যের কল্যাণের নিমিত্ত পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে আধ্যাত্মিক সকল বিষয় উপলব্ধি করাইয়া দিতে পরম আহ্লাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার নিরভিমানিত্ব এবং মহানুভবত্বের কথা অনুধাবন করিয়া বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ঐরূপে নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধের কথা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই একপক্ষে পরীক্ষা করিয়া লইবার এবং অন্যপক্ষে পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল উপলব্ধি করাইয়া দিবার আগ্রহ দেখিয়া

আমরা মুগ্ধ হইব, এবং বুঝিতে পারিব, যথার্থ গুরু উচ্চ অধিকারী ব্যক্তির ভাব রক্ষা করিয়া কিরূপে শিক্ষাদানে অগ্রসর হন ও পরিণামে কিরূপে তাঁহার হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও পূজার স্থল অধিকার করিয়া বসেন।

ইষ্টনিষ্ঠা।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

বেদান্তমতে সবই ব্রহ্ম অর্থাৎ একস্বরূপ হইলেও ব্যবহারিকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, বস্তুতে বস্তুতে,এমন কি, একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় অতিশয় প্রভেদ বর্ত্তমান। এই বহুত্বের ভিতর একত্ব ও একত্বের ভিতর বহুত্বরূপ সনাতন সত্য স্বীকার করিয়াই হিন্দুর এত বিভিন্ন প্রকার সাধন ও উপাসনা প্রণালীর উদ্ভব, এবং বিভিন্নপ্রকার আপাতবিরোধী আচারব্যবহারের জন্ম। এই কারণেই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ সাধারণ স্থূলদর্শীর চক্ষে এত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, হিন্দু বলিতে কি বুঝাইবে, হিন্দু শব্দের সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ কি, ইহার মীমাংসায়ই অনেকে আজকাল হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। এ প্রবন্ধে আমাদের এই ঐক্যসূত্র বুঝাইবার ইচ্ছা নাই, আমরা এখানে কেবল এইটুকুমাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, ইষ্টনিষ্ঠারূপ অপূর্ব্ব মতবাদের দ্বারা হিন্দুসমাজে ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সেই চরমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবার কি সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যিনিই, প্রাচীন মতে চলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেই কুলগুরু বা অন্য কোন গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া একটী দেবতাবিশেষের চিন্তা করিতে হয়। এই দেবতাই সেই ব্যক্তির ইষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই ইষ্ট তোমার

একরূপ হইতে পারে, আমার অন্যরূপ হইতে পারে। পিতার হয়ত এক ইষ্ট, মাতার হয়ত অন্য প্রকার, আবার পুত্রকন্যাগণের ইষ্ট সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ হইতে পারে। এই ইষ্টমন্ত্র আবার একজনের অপরকে বলিতে নাই। এই হইল হিন্দুসমাজে সাধনপ্রণালীর theory। আজকাল কুলগুরুগণ দ্বারা ইহার ভাব কতদূর রক্ষিত হইতেছে, এ প্রসঙ্গে এ বিচার আমি তুলিতেছি না, কিন্তু আমার বক্তব্য এই, এই প্রথার মূলে এমন একটী অমূল্য সত্য নিহিত আছে, যাহার যথাযথ মর্ম্ম বুঝিলে ও যাহার যথার্থ প্রয়োগে আমরা বর্ত্তমানকালে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারি। যদি সমাজে যথার্থ সিদ্ধ আচার্য্যের অভ্যুদয় হয়, তবে তিনি এই প্রণালীর সহায়তা লইয়া লোকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

এক ব্রহ্মলাভ সকলেরই চরম লক্ষ্য—এ কথা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান জীবন আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে বুঝিব, আমরা যেন এক বৃত্তের পরিধিস্থ বিভিন্ন বিন্দু হইতে সেই এক কেন্দ্রে অগ্রসর হইতেছি। কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত অসংখ্য ব্যাসার্দ্ধ আসিয়াছে—জগতের অসংখ্য নরনারী ঐ সকল অগণন ব্যাসার্দ্ধের কোন না কোন বিন্দুতে অবস্থিত, কল্পনা করা যাইতে পারে। সুতরাং কাহারও পথের সঙ্গে কাহারও পথ সম্পূর্ণ মিলিতে পারে না। মেলা অসম্ভব কথা। সুতরাং সকলকে যদি উন্নতির একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট প্রণালী দেখাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহাদিগের সকলকেই জোর করিয়া ঐ প্রণালীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহাতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলারই উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ চেষ্টা হইতেই গোঁড়ামির উৎপত্তি এবং তাহার আনুষঙ্গিক যত আপদ উৎপাতের সৃষ্টি।

কেবল ইষ্টনিষ্ঠার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিলেই এই বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইষ্ট অর্থে যাহা আমার অভীপ্সিত বা পছন্দ। প্রত্যেকেই নিজ পূর্ব্বসংস্কারবশে নিজ বর্ত্তমান কর্ম্মবশে এইরূপ এক একটী অভীপ্সিত পথ সৃজন করিয়া লইয়াছে।

সে যদি সেই চরম লক্ষ্যে যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে তাহারই মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, অপর পথ দিয়া যাইলে চলিবে না। গীতায় এই ইষ্টকেই স্বধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে ঃ—

শ্রেয়ঃস্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ান্ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাতে নানাবিধ বিভিন্নজাতীয় ব্যক্তির সঙ্গফলে প্রত্যেক মানবের সময়ে সময়ে স্বধর্ম্মত্যাগের—ইষ্টত্যাগের একটা চেষ্টা আসিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়ে যদি আমরা একবার দিব্যকর্ণে অন্তরাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করি, তবে শুনিব, তিনি জলদগম্ভীর স্বরে অর্জ্জুনরূপী আমায় বলিতেছেন ঃ—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

তবে উপায়?

উপায় ও সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

একমাত্র উপায় এই ঈশ্বর-শরণাগতি।

সমাজে আমরা পরস্পর কত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, কতপ্রকার শিষ্টাচার করিতেছি, কত ভাবের আদান প্রদান করিতেছি, কিন্তু বোধ হয় সকলেরই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে এমন একটী স্থান আছে, যেখানকার কথা অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুও জানিতে পারে না—মনুষ্যদেহধারীদের মধ্যে যদি সদ্‌গুরু জানেন, আর নিশ্চয় জানেন প্রত্যেকের অন্তর্য্যামী হৃদয়দেবতা। সেই কারণেই সঙ্কীর্ত্তন,ভজন,ধ্যানাদি

কতকটা একত্রে পাঁচজন মিলিয়া সামাজিকভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও আসল ভিতরের সাধন আপনা আপনি নির্জ্জনে ব্যতীত হইতে পারে না। নির্জ্জনে সমাজের কৃত্রিমতা নাই, মুখে একরূপ বাহিরে একরূপ নাই, শুষ্ক ছেঁদো ভাষার আড়ম্বর নাই, আছে প্রাণের গভীর ক্রন্দন, আছে সেই সর্ব্বশক্তিমানের সিংহাসনাভিমুখে হৃদয়ের জাগ্রত প্রার্থনা, আছে তীব্র আত্মানুসন্ধান, আছে সাক্ষাৎকারের—উপলব্ধির আনন্দ।

বাহিরে সাধনপ্রণালী লইয়া, মতামত লইয়া, মানামান লইয়া কত মারামারি কাটাকাটি হয়, কিন্তু যতক্ষণ কথা ততক্ষণই এইরূপ। কথা বন্ধ কর, ইষ্টধ্যানে বস—আর জগতের সঙ্গে তোমার কোন সংস্রব নাই। সেখানে আছ তুমি ও তোমার ইষ্ট। এই ইষ্টের সহায়ে—ইষ্ট প্রণালীর সহায়ে অগ্রসর হইতে থাক—শত শত বাধা আসুক গ্রাহ্য করিও না—দেখিবে ক্রমশঃ এমন এক অবস্থায় পঁহুছিতেছ যেখানে যাইয়া সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে প্রেমে, সহানুভূতিতে মিলিবার সাধারণ ভূমি পাইবে তখন তুমি তোমার নিজ্জনতার গণ্ডী হইতে বাহির হইতে পার, তখন তুমি দৈব বলে বলীয়ান্ হইয়া বজ্রবাণীতে সত্যের ঘোষণা করিতে পার, তখন তুমি সত্যপ্রচার, ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে নামিতে পার—সফল হইবে।

ইষ্ট ও স্বধর্ম্মের আমি যে ব্যাখ্যা দিলাম, তাহাতে বাহিরের ও ভিতরের উভয় প্রকারের কার্য্যই আছে—আর বাহিরের কার্য্য যতক্ষণ, ততক্ষণ সমালোচনার ভয়ও আছে। যাহাকে বাহিরের কর্ম্মে অধিক লিপ্ত থাকিতে হইবে, তাহাকে অবশ্য সকল প্রকার সু বা কু সমালোচনাই বরণ করিয়া লইতে হইবে—তাহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই—অন্ততঃ সমাজ যতদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় কতকটা সুপ্রণালীবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত না হইতেছে। আর যিনি অন্তরে ইষ্টচিন্তা করিবেন, তাঁহাকেও অগাধ অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যসম্পন্ন হইতে হইবে। যতদিন না মুক্ত হইতেছ, ততদিন সমুদ্রের অতলতলে ডুবিয়া থাকিতে হইবে।

সন্ন্যাসী বলিতেছে—সন্ন্যাসধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ—আবার গৃহী তাহার বিপরীত উপদেশ দিতেছে, কেহ বলে পঞ্চ মকারের সহায়ে সাধন করিলে সহজে সিদ্ধি—কেহ বলে শুদ্ধাচারে, কেহ বলে মৎস্য-মাংস বর্জ্জন কর,—কেহ বলে খুব খাও। কেহ বলে জ্ঞানালোচনা কর, বিচার কর;—কেহ বলে ভক্তিতেই মুক্তি, বিশ্বাসেই মুক্তি,—কেহ বলে "সাকার" ভজ, কেহ বলে নিরাকারই সত্য,—কেহ অদ্বৈত-বাদের মহিমা ঘোষণা করিতেছে,—কেহ দ্বৈতবাদের গুণগানে গগন ফাটাইতেছে,—কেহ কৃষ্ণকে ভজিতে বলিতেছে,—কেহ খ্রীষ্টকে ভজাইতে আসিতেছে—কেহ আবার অসাম্প্রদায়িকতার ধুয়া ধরিয়া তাহার ভিতরে সম্প্রদায়ের ভিত্তি গাড়িতেছে। হে ইষ্টনিষ্ঠ সাধক, দেখিয়া শুনিয়া বিচলিত হইও না—ইষ্টনিষ্ঠায় স্থির থাকিয়া দিন কতক চাপিয়া একটা ভাবের বিকাশের চেষ্টা কর—এক দিন দেখিবেই দেখিবে, তোমার ইষ্ট শুধু তোমার হৃদয়ে নহে, তোমার ইষ্ট সর্ব্বত্র। তোমার ইষ্ট কালীঘাটের কালীর মধ্যে, বৃন্দাবনের মদনমোহনের মধ্যে, আবার খ্রীষ্টানের গির্জ্জায় ও মুসলমানদের মসজিদেও বর্ত্তমান। তখন 'যাঁহা যাঁহা আঁখি পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' হইবে। দিন কতক কেবল চারাগাছকে বেড়া দিয়া রাখ, ছাগল গরুতে ছোট অবস্থায় খাইয়া ফেলিয়া মূলে হাবাত না করিয়া ফেলে, একটু বড় হইতে দাও, তখন বেড়া ভাঙ্গিয়া দিতে পার—দিতে পার কেন, আপনিই ভাঙ্গিয়া যাইবে—তখন আর ভেদ থাকিবে না, তখন তুমি অত্যাশ্রমী হইবে—তখন তুমি পরমহংস হইবে, তখন তুমি জ্ঞানী হইবে—তখন তুমি বেদান্তপ্রতিপাদ্য একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্ব সর্ব্বত্র সাক্ষাৎকার করিয়া ধন্য হইবে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জীবের চৈতন্যদাতা।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

কলিকাতা-বাসকালে শুনিয়াছিলাম যে আধ্যাত্মিক জীবন চেষ্টালভ্য একটী নির্দ্দিষ্ট বস্তু, উহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়া লইতে হয়, এবং কতকগুলি সুপরিচিত পন্থা অবলম্বনে লাভ করিতে হয়। হিমালয়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে ইহার মূল দুইটী বস্তুতে নিবদ্ধ— একটী ভগবানের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষামূলক প্রেম এবং অপরটী প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত সেই অনন্ত বস্তুর অন্বেষণ—এরূপ প্রবল উৎকণ্ঠা যে আমি তাহার কোনরূপ বর্ণনা করিবার আশাই করিতে পারি না। ইহাই আমার গুরুদেবের বিশেষত্ব ছিল। অপরে যেখানে উপায়ের আলোচনাতেই ব্যস্ত, তিনি সেখানে রীতিমত আগুন জ্বালিতে জানিতেন। যেখানে অপরে শুধু উপায় নির্দ্দেশ করিত তিনি সেখানে আসল জিনিসটীকেই দেখাইয়া দিতেন।

আমি এস্থলে আমার বক্তব্যটী অতি বিশদভাবে বলিতে চাই। তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অবধি বরাবর আমার কার্য্য ছিল যেন কতকটা অপরের মনের ভাব ধরিতে পারা। আমি শুধু এইটুকু দাবী করিতে পারি যে, গুরুদেবের বিভিন্নমুখী শক্তিপ্রবাহের সহিত আমার এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল যে আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তৎসম্বন্ধে বলিতে পারি। আর যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে, জড় মাত্রেই যেরূপ কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে বদ্ধ, অভিজ্ঞতাও ঠিক সেইরূপ কতকগুলি নিয়মাধীন, সেই হেতু যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া আমার উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল সেগুলিকে আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বামিজী তাঁহার নিজ জীবনের ঘটনা বা অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত চাপা লোক ছিলেন। অবশ্য, জগতের বিভিন্ন স্থানে অনেক লোক তাঁহার নিকট নিজ নিজ দোষসকল উদ্ঘাটিত করিয়াছে, কিন্তু যাহাতে কাহারও আধ্যাত্মিক গুরু না হইতে হয় তজ্জন্য তিনি যত ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিতেন এমন আর কেহ কখনও করিয়াছেন কিনা জানি না। এমন কি, যে প্রশ্নগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ করিয়া নহে, অথচ যাহাতে মনে হইত যে নিজ ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিকে অতিরিক্তমাত্রায় প্রকাশ না করিলে তাহাদের উত্তর দেওয়া চলে না, এমন সব প্রশ্নেও প্রথমটা তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিত,—নিজের অন্তরের কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিব কেন, মনে এইরূপ একটী সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার লণ্ডনের ক্লাসগুলিতে আমি কখনও কখনও দেখিয়াছি যে লোকে কতকগুলি প্রশ্ন তাঁহার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছে—যেমন, সমাধিকালে কিরূপ অনুভূতি হয়, ইত্যাদি। সে সময় উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া বরং যদি কেহ তাঁহার কোন অনাবৃত স্নায়ু অসাবধানতাবশতঃ জোরে চাপিয়া ফেলিত তাহা হইলে উহা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইত।

তিনি নিজেই আমার তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে যাওয়ার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তিনি আমার দ্বারা ভারতে যে কার্য্য করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আমাকে নিজে উপদেশ দিবেন। কিন্তু এই শিক্ষা অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই প্রদত্ত হইত। আমরা সকলে একসঙ্গে বারান্দা বা বাগানে বসিতাম এবং সেই সময়ে স্বামিজী যে কথাবার্ত্তা কহিতেন তাহাই মনোযোগসহকারে শুনিয়া যাইতাম—প্রত্যেকেই যিনি যতটা পারেন উহার ততটুকু গ্রহণ করিতেন এবং পরে ইচ্ছামত তাঁহার আলোচনা করিতেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সারা বৎসরটীর মধ্যে মাত্র একটী দিন তিনি আমাকে অর্দ্ধঘণ্টার জন্য তাঁহার সহিত একাকী

ভ্রমণ করিতে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তৎপরে আমাদের কথাবার্ত্তা —তখন গ্রীষ্মঋতু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং আমিও আমাকে কি করিতে হইবে তাহা একটু একটু বুঝিয়াছি—অনুভূতিমূলক কোন কিছু সম্বন্ধে না হইয়া বরং ভাবী কার্য্যের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্বন্ধেই হইয়াছিল।

কোন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে যে সকল লোক আকৃষ্ট হন তাঁহাদের তাঁহার সহিত কতকগুলি নিগূঢ় ভাবসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সকল প্রণালী অবলম্বনেই যেন তাঁহার চিন্তারাশি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত ও জনসমূহ কর্তৃক পরিগৃহীত হয়। এমন কি, একজন গণিতবেত্তাও তাঁহার সমসাময়িক লোকগণের উপর সেই পরিমাণে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন যে পরিমাণে তাঁহার চিন্তাসমূহ ভাবের (feeling) মধ্য দিয়া প্রচারিত হয়। কিন্তু এই ভাবসম্বন্ধের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই, উহা বিভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কেহ দাসভাবে, কেহ বা ভ্রাতা,সখা বা বন্ধুভাবে,এমন কি, কেহ বা সেই অলৌকিক পুরুষকে প্রাণপ্রিয় সন্তানরূপে দেখিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এই সকল ব্যাপার একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, এবং তথায় লোকে অসঙ্কোচে বুঝে ও মানিয়া লয় যে এই-রূপ কোন একটী ভাবসম্বন্ধ স্থাপন ব্যতীত সাধারণ লোকে কোন বিরাট ধর্ম্মান্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে না। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, ধর্ম্মরাজ্যে ক্রমশঃ আমি তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইলাম, এবং যে সকল ভারতবাসী ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের সহিত গুরু-দেবের জীবদ্দশায় আমার পরিচয় হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই আমাকে ঐ চক্ষেই দেখিতেন।

কিন্তু এই যাত্রার প্রারম্ভে, যখন অন্য নানা বিষয়ের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটীও আমার মোটেই বোধগম্য ছিল না, সেই সময় আমার মন একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, এবং মহা সৌভাগ্যবশতঃই আমি এই সময়ে স্বামী স্বরূপানন্দ নামক তরুণ সন্ন্যাসীকে আমার বাঙ্গালা ভাষা ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নিত্য শিক্ষকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

কারণ আমার বরাবর ধারণা যে, এই ঘটনা হইতেই আমি তাঁহার এবং আমার গুরুদেবের মনের সংযোগপথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, এবং যেমন দর্পণসঙ্কেতে (heliograph) একটী বৃহৎ ও একটী ক্ষুদ্র দর্পণের পরস্পর সঙ্কেত-আদান-প্রদান-মার্গে অবস্থিত হইলে তত্রত্য সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ আমিও এই ঘটনায়, আমরা যে ঘনীভূত ভাব ও চিন্তারাজ্যে বাস করিতাম, তাহাদিগকে কতকটা ধরিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আমি মঠের ঠাকুরঘরে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত হইবার কয়েক দিনের মধ্যেই স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু তিনি অল্প কয়েক সপ্তাহকাল ব্রহ্মচারী থাকিবার পরই স্বামিজীর নিকট গৈরিকবস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসিপদবীতে অরোহণ করেন। ইঁহার মানসিক-বিকাশ-কাহিনী আমার নিকট অত্যন্ত কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হইত। কারণ ইনি বাল্যে বৈষ্ণবমতে লালিত হইয়াছিলেন। এই মতে ঈশ্বরকে দয়াল ও প্রেমময় প্রভু এবং জগৎপাতা বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে অবতার ও জগত্রাতা বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে। ইহা কার্য্যতঃ পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম্মেরই অনুরূপ। ইহার পরেই কিন্তু, সচরাচর যে বিতৃষ্ণা আমাদের সকলকেই জীবনে ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা তাঁহাকেও ভোগ করিতে হইয়াছিল। তরুণ বয়সে, যখন পরোপকার-প্রবৃত্তি হৃদয়ে খুব প্রবল থাকে সেই সময়, তিনি জীবনধারণের অবিচার-দ্যোতক কয়েকটী ঘটনা হইতে এই মর্ম্মভেদী সত্য হৃদয়ঙ্গম করেন যে এ জগতে বলবানেরই জয়, এবং ঈশ্বর পরম দয়াবান্ জগৎপাতা—বাল্যের এই মধুর কল্পনায় তিনি আর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইহাদের মধ্যে একটী গল্প আমার মনে আছে। একদিন রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, এক দরিদ্র রমণী হাঁটু গাড়িয়া অনুচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে একটী একটী করিয়া এক মুঠা চাউল ধুলা হইতে খুঁটিয়া তুলিতেছে। একজন লোক ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া ঐ চাউল দরিদ্রা রমণীর হস্তস্থিত পাত্র হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়। এই

দৃশ্য দেখিয়া স্বামী স্বরূপানন্দ গভীর দুঃখভরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছেন?—এই সব ঘটনাকে কেন তিনি রোধ করিতেছেন না?"

এইরূপ দুই তিনটী ঘটনায় একবৎসর কাল তাঁহাকে সহসা এরূপ অশান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিল যে তিনি জীবনে আর কখনও অটুট স্বাস্থ্য কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। কিন্তু যখন তিনি উহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন তখন তিনি পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন—জীবনের প্রতি একটা অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই এই শান্তির মূল। তিনি এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অর্থাৎ, ভগবান বুদ্ধের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এবং পরে সহস্র সহস্র ভারতীয় ব্রহ্মচারী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তিনিও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এখন হইতে তিনি ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না যে এই সমস্যার চরম সমাধান—ঈশ্বরকে সিংহাসনাধিরূঢ় এবং মানবকে তাঁহার সম্মুখে নতজানু অবস্থায় উপবিষ্টরূপে কল্পনা দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে। বরং তিনি মনের অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতাকেই এবম্বিধ সকল স্বপ্নের—শুধু তাহাই নহে, সুখ, দুঃখ, ন্যায়, অন্যায় প্রভৃতি অপর যে স্বপ্নসমূহ দ্বারা আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ গঠিত, সেগুলিরও মূল কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। মানুষের যতদূর অন্তর্দৃষ্টি ও নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব তাহা লাভ করিয়া সকল দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, এবং হিন্দুরা যাহাকে মুক্তি নামে অভিহিত করেন, সেই চরম একত্ব স্থায়িভাবে সাক্ষাৎকার করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই সময় হইতে সেই পরাবস্থা লাভের জন্য আপনার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করাই যেন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার পিতৃগৃহে বাসের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর যে, তিনি মঠে যে কয় বৎসর যাপন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কঠোরতর সংযমের মধ্যেই কাটিয়াছিল তাহা নানা প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। ইহার অনেক পরে আমি আলমোড়ায় তাঁহার নিকট গীতাপাঠ

কালে, ভগবৎপ্রেমকে দারুণ তৃষ্ণার সহিত কেন তুলনা করা হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

স্বামী স্বরূপানন্দের শিক্ষায় আমি ষোল আনা মন দিয়া ধ্যানের চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। তাঁহার এই সহায়তা না পাইলে আমার জীবনের একটী শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত একেবারে বিফল হইয়া যাইত। গুরুদেবের সহিত আমার এই সময়ের সম্বন্ধ দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘর্ষেই পূর্ণ ছিল বলা যাইতে পারে। এখন আমি দেখিতেছি, শিখিবার জিনিস কত অধিক ছিল কিন্তু শিক্ষার সময় কত অল্প ছিল। শিক্ষার্থীর অহঙ্কারনাশই এ বিষয়ের প্রথম শিক্ষা। কিন্তু এই সময়ে আমার সমস্ত যত্নপোষিত ধারণাগুলির উপর যে নিত্য আক্রমণ ও তিরস্কার বর্ষিত হইতে লাগিল আমি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। দুঃখভোগের অনেক সময় কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি এই সময়ে দেখিলাম যে, অনুকূল ভাবাপন্ন প্রিয় আচার্য্যলাভের স্বপ্ন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থানে এমন এক ব্যক্তির চিত্র মনোমধ্যে উদিত হইতেছে যিনি অন্ততঃ উদাসীন হইবেন, এবং সম্ভবতঃ মনে মনে প্রতিকূল ভাবাপন্ন থাকিবেন। ইহা দেখিয়া আমার যে গুরুতর দুঃখ হইয়াছিল এখন তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

সৌভাগ্যক্রমে আমি সেবা কার্য্যে যোগদান করিব বলিয়া যে কথা দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যাহার করিবার ভাবনা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই। কিন্তু যেমন দিন যাইতে লাগিল আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে বাধ্য হইলাম যে এই সেবাকার্য্যে কোন ব্যক্তিগত মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিবে না। তৎপরে এমন এক সময় আসিল যখন আমাদের দলের জনৈক বর্ষীয়সী রমণী, এরূপ তীব্র যন্ত্রণা-ভোগ সহজেই অসহ্য হইয়া উঠিতে পারে, সম্ভবতঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই, অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বামিজীর নিকট আমার হইয়া কিছু বলিলেন, এবং বিষয়টী যে গুরুতর তাহাও উল্লেখ করিলেন। স্বামিজী নীরবে শুনিলেন এবং চলিয়া গেলেন। কিন্তু সন্ধ্যার

সময় তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাদিগকে বারান্দায় একত্র দেখিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া বালকের ন্যায় সরলভাবে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ। এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। আমি নির্জ্জনবাসের জন্য অরণ্যপ্রদেশে যাইতেছি, আর যখন ফিরিব তখন শান্তি লইয়া ফিরিব।" তৎপরে তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে আমাদের মাথার উপর চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে। অমনি তাঁহার কণ্ঠস্বর এক উচ্চভাবের প্রেরণায় গদগদ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "দেখ, মুসলমানগণ চন্দ্রকলার অতিশয় গৌরব করিয়া থাকেন। এস, আমরাও বালশশীর সহিত নূতন জীবন আরম্ভ করি।" কথাগুলি বলিয়াই তিনি হস্তোত্তলন করিয়া নীরবে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্রোহী শিষ্যাটীকে হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিষ্যা ইত্যবসরে তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছেন। নিশ্চিতই এই মুহূর্ত্তটী মিলনের অপূর্ব্ব মাধুরীতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি এরূপ মুহূর্ত্ত ক্ষত আরোগ্য করিতে পারে, কিন্তু যে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না। আমার এই ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, আমি উহার পরে যাহা ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। বহু বহু পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, এমন দিন আসিবে যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয় "নরেন্দ্র" তাঁহার জন্মগত, স্পর্শমাত্রে জ্ঞানদান-ক্ষমতার বিকাশ করিবে। 'আলমোড়ায় সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। কারণ, একাকী ধ্যান করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, আমি এক অনন্ত মঙ্গল-সমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছি;—এই মঙ্গলময় সত্তা সম্বন্ধে আমি শত অহঙ্কারমূলক বিচার দ্বারাও কখনও জানিতে পারি নাই।' এতদ্ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মের মনোবিজ্ঞান-গ্রন্থসমূহে যে অনুভূতির উল্লেখ আছে, তাহা যে এই জড় ভূমিতেই সহজভাবে নিত্য প্রত্যক্ষ, তাহা আমি জানিতে পারিলাম।

আর আমি এই প্রথমবার বুঝিলাম যে, শ্রেষ্ঠ আচার্য্য যে আমাদিগের মধ্য হইতে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের লোপসাধন করেন, তাহা তৎপরিবর্ত্তে নিরাকারের দর্শনলাভ ঘটিবে বলিয়াই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তত্ত্বালোকের তড়িৎপ্রকাশ।

এই প্রকারের উপলব্ধিসকলের মধ্যে ইহাই আমার একমাত্র উপলব্ধি নহে বটে, কিন্তু শুধু এইটার সম্বন্ধেই বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন ছিল। আর, যে ঘটনাটীর ইহা একটী অংশমাত্র, সেই সমস্ত ঘটনাটীতেই, প্রাচ্যদেশীয় আচার্য্যগণ শিষ্যের কিরূপ ভাবাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন তাহার আভাস পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে শিষ্যকে গুরুর আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। অমি ইহাও শুনিয়াছি যে, কিছু কিছু সেবা করাও একান্ত আবশ্যক। শুনা যায়, এইরূপ হইলে আচার্য্যের চিন্তারাশি বীজস্বরূপ হইয়া শিষ্যের মনে অঙ্কুরিত হয়। বলিতে পারি না। আমার এই প্রকারের সেবা কালে ভদ্রে অতি অল্প ক্ষণের জন্য সূচী বা লেখনী-কার্য্য মাত্রে নিবদ্ধ থাকিত। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "কন্যার কখনও এমনভাবে কাজ করা উচিত নয় যাহাতে লোকে মনে করে যেন তাহার পিতৃগৃহে ভৃত্যের অভাব ছিল।" তথাপি আমার বিশ্বাস—কারণ কয়েকটা স্থলে আমি ইহার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি—প্রীতির সহিত গুরুজনদিগের সেবা দ্বারা তাঁহাদের সহিত আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক আদান প্রদান সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। উহা আমাদিগের জীবনে অপূর্ব্ব ও সুন্দর ফল প্রসব করে।

পাশ্চাত্যে কতক সম্প্রদায়ের লোক ধর্ম্মচক্রের (Church) প্রতি যে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব পোষণ করে, প্রাচ্য শিষ্যকে তাহাই গুরুর প্রতি প্রদর্শন করিতে হয়। শিষ্যের পশ্চাতে, গুরু এবং তাঁহার

সাধনই শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই ঋণ অস্বীকার করাই মহাপাপ—সে পাপের আর মার্জ্জনা নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু, যিনি শিষ্যের স্বাধীনতা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু, শিষ্যের গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি নিজের শক্তির উপরই ধর্ম্মোপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তাহার ধর্ম্মজীবন 'ঘুণ ধরা' কাষ্ঠের ন্যায় অচিরেই নিঃসার হইয়া যায়।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন আমরা এই কালে এমন সঙ্গমধ্যে বাস করিতাম যেখানে নির্জ্জনতাই আত্মোন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তা-প্রণালীর পার্থক্য এই ঘটনা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইউরোপীয়েরা ভাবে যে, মানুষ কুড়ি বৎসর একাকী থাকিলে পাগল না হইয়া যায় না, আর ভারতীয় ধারণা এই যে, মানুষ কুড়ি বৎসর একাকী না থাকিলে তাহাকে প্রকৃতিস্থই বলা যায় না। বৈপরীত্যটী কতকটা অতিরঞ্জিত ভাষায় প্রকাশিত হইলেও মূলতঃ সত্য। হিন্দুমতে শুধু মৌন ও নির্জ্জনবাসের দ্বারাই আমরা আত্মানন্দরস আকণ্ঠ পান করিতে পারি এবং তাহার ফলে যেন ভিতর হইতে নূতন কিছু উদ্গত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধুর অংশ-গুলি মসৃণ করিয়া দেয়। এই হেতু আমরা দেখিতে পাই নির্ব্বাণাবস্থা-প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির মুখমণ্ডল সদাই প্রশান্ত। যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, জগৎ ও জাগতিক সম্বন্ধনিচয় চিন্তাস্রোতকে শিশুর মত বাধা দেয় মাত্র। সকল জিনিসের পশ্চাতেই সেই অনির্ব্বচনীয় পূর্ণতার অনুভব, দৃষ্ট বস্তু যাহার অতি তুচ্ছ ও বিকৃত বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যাঁহারা সকল মানবীয় সম্পর্কের প্রাণস্বরূপ সেই মূলকারণ ব্রহ্মে অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐ সকল ক্ষীণ সম্পর্ক আর প্রলোভিত করিতে পারে না। আর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে প্রেম বা দয়া বা শূরতা এই মূল কারণ নহে,—যদিও এই সকল-গুলিই তথায় পৌঁছিবার মার্গস্বরূপ—কিন্তু শুধু একমেবাদ্বিতীয়ং

বস্তুর সাক্ষাৎকারই এই মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আমার বরাবর ধারণা যে, এই জন্যই হিন্দুমতে নিষ্ঠা, নির্জ্জনবাস ও অহংনাশ মুখ্য গুণ বলিয়া বিবেচিত, আর পাশ্চাত্যে অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল ও প্রভবিষ্ণু (aggressive) গুণগুলিই আদৃত হইয়া থাকে। ভারতীয় মতে, আমরা দেহধারী হইয়াও দেহবুদ্ধি হইতে যতটুক্ ঠিক ঠিক দূরে থাকিতে পারি, ততটুকুই লাভ।

এই সকল চিন্তার প্রভাবে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সেই অপূর্ব্ব গ্রীষ্ম-ঋতুতে আমাদের সকলেরই ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, সাকাররূপধারী মুক্তিদাতৃগণ অপেক্ষা যাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মতত্ত্বে চিরকালের মত লীন হইয়া গিয়াছেন, আর সংসারে ফিরিয়া আসিবেন না, তাঁহারাই শতগুণে শ্রেষ্ঠ। স্বামিজী মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "দেহের কথা চিন্তা করাও পাপ।" অথবা বলিতেন,"শক্তি বা সিদ্ধি লোকসমক্ষে প্রকাশ করা ভাল নয়।" বুদ্ধের দয়ার ভিতরেও ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বর্ত্তমান ছিল! ঈশার পবিত্রতার মধ্যেও শক্তিপ্রদর্শনের ভাব ছিল!

শেষোক্ত চিন্তাটী, অর্থাৎ শক্তিপ্রকাশের নিন্দনীয়তা, ভারতীয় সাধুগণের মধ্যে খুব প্রচলিত বলিয়াই মনে হয়। একবার অদূর-দর্শিতাবশতঃ আমাদের তাঁবুগুলি যাত্রীদের তাঁবুগুলির নিকটেই ফেলা হইয়াছিল। আমাদিগকে উঠাইয়া দিবার জন্য শত শত লোক মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। স্বামিজী তাঁবুগুলিকে যেমন আছে তেমনই রাখিবার জন্য প্রায় জিদ্ করিয়া বসিয়াছিলেন আর কি; এমন সময়ে একজন অদ্ভুত রকমের সাধু নিকটে আসিয়া তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "স্বামিজী আপনার এই শক্তি আছে সত্য, কিন্তু আপনার উহা প্রকাশ করা উচিত নহে।" স্বামিজীও তৎক্ষণাৎ তাঁবুগুলিকে অন্যত্র উঠাইবার আদেশ দিলেন।

অতীন্দ্রিয় সত্যসকল প্রত্যক্ষ করাইতে মৌন ও নির্জ্জনবাসের উপকারিতা বিষয়ে বিচার করিবার আমরা বহু সুযোগ পাইয়া-ছিলাম। কারণ, স্বামিজী বার বার আমাদের মধ্য হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতেন, আবার হঠাৎ ফিরিয়া আসিতেন। সময়ে সময়ে

মনে হইত যেন লোকসঙ্গ তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা। বহুসংখ্যক লোক তাঁর মহতী খ্যাতি শ্রবণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নৌকায় প্রবেশ করিত এবং তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিত। ফলে, তিনি এতটুকু সময়ও একাকী থাকিতে পাইতেন না এবং অস্থির হইয়া উঠিতেন; সময়ে সময়ে মনে হইত তিনি যেন ভস্মানুলিপ্ত পরিব্রাজক বা নিভৃতবাসী মুনির জীবনকে, প্রেমিক যেরূপ তাহার প্রেমাস্পদকে চিন্তা করে, সেইরূপ ভাবে চিন্তা করিতেন। যদি কেহ হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে বলিত, তিনি অদ্য বা কল্য চিরদিনের মত আমাদিগের নিকট বিদায় লইয়া যাইবেন, আর আমরা আজ এই শেষ দিন তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতেছি, তাহা হইলে আমরা এতটুকুও বিস্মিত হইতাম না। তিনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে যে যে বিষয় তাঁহার উপর নির্ভর করিত সেই সকল বিষয়ে আমরাও, যেন ভগবদিচ্ছারূপ সুরতরঙ্গিণীর স্রোতে ভাসমান তৃণস্বরূপ ছিলাম। যে কোন মুহূর্ত্তে এই ইচ্ছা মৌনরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার সংসারে বাস ফুরাইয়া যাইতে পারিত।

এই যে মতলব আঁটিয়া কাজ না করা—ইহা একটী আকস্মিক ব্যাপার নহে। এই সময়ের দুই বৎসর পরে একদিন তিনি একখানি পত্র আনিয়া আমায় দেখিতে দিয়াছিলেন। আমি তাহার উত্তরে কি লিখিতে হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে একটু অযাচিত সাংসারিক উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি এরূপ বিরক্তিভরে আমায় উত্তর দিলেন যে, আমি তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "মতলব! মতলব আঁটা! এইজন্য পাশ্চাত্যবাসী তোমরা কোনকালে একটা ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে পার না। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও করিয়া থাকে ত সে জনকয়েক ক্যাথলিক সাধু—যাঁহারা মতলব আঁটিয়া কাজ করিতে জানিতেন না।' যাহারা মতলব আঁটিয়া কাজ করে তাহাদের দ্বারা কোনকালে ধর্ম্মপ্রচার হয় নাই, হইতে পারে না।"

বাস্তবিকই সেই রমণীয় নৈদাঘ যাত্রাটীতে আমরা সর্ব্বদা ভৃত্যগণের নিকট হইতে এই শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম যে স্বামিজীর নৌকা একঘণ্টা পূর্ব্বে নোঙ্গর তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং সেদিন আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি একদিন কি বহুদিন অনুপস্থিত থাকিবেন তাহার কিছুই স্থিরতা থাকিত না। কিন্তু যখনই তিনি এই সকল নির্জ্জন স্থান হইতে ফিরিতেন, তখনই দেখা যাইত তিনি জ্যোতির্ম্ময় ও শান্তিমণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন, আর গভীর, অতি গভীর জ্ঞানের কথাসকল তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যই, যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান অপরের বিশ্বাসপূত, তাহাদিগকে পরম অর্থবান বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন যে তিনি রোমের "পবিত্র সোপানরাজি" (Scala Santa) * দর্শনে অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিষ্ঠাবান ভক্তগণের মত সকল অনুষ্ঠানগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যোগদান করাই এই সঙ্ঘের আদর্শ। গুরুদেব সম্বন্ধে দেখিয়াছি, তীর্থদর্শনকালে, তাঁহার আশপাশে অতি সাধারণ স্ত্রীলোকেরা যে পায়সভোগ দিতেছেন বা যেরূপে মালাজপ করিতেছেন, তিনিও ঠিক সেইরূপেই করিতেছেন। এই সকল স্থলে তিনি ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ আচারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তিনি স্বীয় মহোচ্চভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সাধারণ লোকদিগের সহিত আপনাকে এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের দুইটী স্থান অতীব পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। একটী ক্ষীরভবানী নামক প্রস্রবণ, যথায় জগন্মাতার পূজা হইয়া থাকে ; অপরটী অমরনাথ নামক একটী পর্ব্বতগুহা, যেখানে তুষারময়

* Scala Santa or Pilate's Staircase—রোমের "ল্যাটারান প্যালেস" নামক প্রাসাদের অন্তর্গত সেণ্ট জনের গীর্জ্জার উত্তরাংশের বিখ্যাত সিঁড়ি। কথিত আছে ইহার আটাশটী মার্ব্বেল পাথরের ধাপ এককালে জেরুজেলেমে খৃষ্টের বিচারক পাইলেটের বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সিঁড়ি দিয়া মধ্যযুগে নির্ম্মিত পোপগণের পূজাগৃহে উঠা যায় এবং লোকে হামাগুড়ি দিয়া এই সিঁড়ি আরোহণ করিবার ব্রতগ্রহণ করিয়া থাকে।

শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই গ্রীষ্মকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তন্মধ্যে কাশ্মীরে উক্ত স্থানদ্বয় দর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা খুব উচ্চ উচ্চ আশা পোষণ করিতাম। আমরা রীতিমত ধ্যান করিতে শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং কোন নির্জ্জনস্থানে কিছুকাল বাস করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম—যথায় আমরা কয়েক ঘণ্টা করিয়া মৌনী থাকিতে এবং নিয়মিত শিক্ষাধীন থাকিয়া ধ্যানের চেষ্টা করিতে পারিব। এইজন্য কয়েকটী তাঁবু আনা হইল এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য অচ্ছাবল নামক একটী স্থানে একটী বনের একপ্রান্তে তাঁবু ফেলিলাম। অমরনাথ যাত্রা আগষ্ট মাসের প্রথমে হইয়াছিল, আর ৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী আমাদিগকে ছাড়িয়া ক্ষীরভবানী দর্শন করিতে গমন করেন। অবশেষে ১২ই অক্টোবর আমরা বারামুল্লায় তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমাদের যাত্রাও পরিসমাপ্ত হইল।

এই সকল মহান্ উপলব্ধি ও সত্য সাক্ষাৎকার ব্যতীত, যে সমুজ্জ্বল জীবনের সংস্পর্শে আমরা বাস করিতাম তাহার কিরণচ্ছটা কিছু-ক্ষণের জন্য প্রায়ই আমাদের উপর আসিয়া পড়িত। একবার তিনি কয়েক দিন অন্যত্র বাসের পর সবে মাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং ভক্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, খাবার প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম ভগবৎপ্রেমরূপ গিরিচূড়ায় যিনি বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট আহারের চিন্তা পর্য্যন্ত কত অসহ্য হইয়া উঠে! আর একদিন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে আমরা কয়েকজন স্ত্রীলোক মিলিয়া স্থিরা মাতার নৌকায় বসিয়া (আমরা সে দিন তাঁহারই অতিথি) আস্তে আস্তে গুল্পগুজব করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তিনি কয়েক মিনিট আমাদের সহিত গল্প করিয়া কাটাইবার জন্য আসিলেন। ইউরোপ-যাত্রার দিন সন্নিকট হইয়া আসিতেছিল। তাহারই প্রসঙ্গ উঠিল। কিন্তু উহা শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। তৎপরে একজন, যাঁহাকে একাকী ভারতবর্ষে থাকিতে হইবে বলিয়া একরূপ স্থির ছিল, তিনি বলিলেন যে

তিনি অপর সকলের অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিবেন। স্বামিজী অদ্ভুত কোমলতার সহিত তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কিন্তু এ কষ্ট এত গুরুতর মনে করিতেছ কেন? হাস্যমুখে তাহাদিগকে বিদায় দাও না কেন? পাশ্চাত্যবাসী তোমরা বড় শীঘ্র মন খারাপ করিয়া বস। তোমরা দুঃখের পূজা কর! তোমাদের সারা দেশে আমি ইহাই দেখিয়াছি। প্রতীচ্যে লোকে পরস্পর কিরূপভাবে মিশে জান?—উহার উপরটা যেন হাস্যমুখরিত, কিন্তু ভিতরে গভীর মর্ম্ম-ব্যথা। উহা শীঘ্রই ক্রন্দনে পরিণত হয়। আমোদ প্রমোদ যাহা কিছু সব উপরে—আসলে উহা গভীর দুঃখভারানুলিপ্ত। কিন্তু এদেশে শুধু বাহিরের দিকটাই দুঃখপূর্ণ ও নিরানন্দময়, কিন্তু ভিতরে নিশ্চিন্তভাব ও উল্লাস।

"তোমরা জান আমাদের মধ্যে একটা মত আছে যাহাতে ঈশ্বর শুধু খেলার জন্য আপনাকে জগৎরূপে বিকাশ করিয়াছেন বলিয়া কল্পনা করা হয়। অবতারাদি শুধু লীলার জন্যই এখানে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। খেলা—সব খেলা। খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন কেন?—শুধু লীলা। জীবন সম্বন্ধেও তাহাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু খেলা করিয়া যাও। বল, এ সব লীলা, লীলা। তুমি কিছু করিতেছ কি?" তার পরই আর একটী কথাও না কহিয়া তিনি উঠিয়া নক্ষত্রা-লোকে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং নিজের নৌকায় চলিয়া গেলেন। আমরাও নদীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরস্পরের নিকট রাত্রির মত বিদায় লইলাম।

নির্জ্জনবাসের সপ্তাহে আমরা একদিন সন্ধ্যার সময় নদীতীরবর্ত্তী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলির নীচে বসিয়াছিলাম, এবং স্বামিজী নেতৃত্ব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তিনি প্রথমেই তদানীন্তন দুইটী প্রসিদ্ধ সমাজের কথা পাড়িলেন। তন্মধ্যে একটী উহার প্রবর্ত্তকের জীবদ্দশাতেই দিন দিন সংখ্যা ও আয়তনে বাড়িয়া উঠিতেছিল, অপরটী ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছিল। শেষে তিনি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, এক জীবনে নেতা গঠিত হয় না। নেতা জন্মায়। কারণ, শৃঙ্খলা

স্থাপন ও আদর্শ নির্ব্বাচনই শক্ত কাজ নহে ; নেতার প্রকৃত লক্ষণ এই যে তিনি অতি বিভিন্নমতাবলম্বী লোকদিগকে সাধারণ সহানুভূতিসূত্রে একতাবদ্ধ করিতে পারেন। আর এটী শুধু স্বভাবদত্ত ক্ষমতা হইতে আপনিই হইয়া যায়, চেষ্টা করিয়া ইহা করা যায় না।”

এইরূপ কথা হইতে হইতে ক্রমশঃ প্লেটোর কথা উঠিল, এবং একজন প্লেটোর Ideas বা ‘ভাববস্তু’ সম্বন্ধীয় মতবাদের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন। স্বামিজী ব্যাখ্যা করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার-মুখে, উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সুতরাং দেখিতেছ, আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি সবই সেই মহা ভাববস্তুসকলের ক্ষীণ বিকাশ মাত্র ; সেই ভাববস্তুগুলিই শুধু সত্য ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন। কোন এক জায়গায় একটা আদর্শ ত্বং-পদার্থ রহিয়াছে, আর এই জগতে তুমি শুধু উহাকেই বিনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছ! চেষ্টা অনেক বিষয়ে আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিতেছে না। তথাপি অগ্রসর হও! কোন না কোন দিন তুমি আদর্শকে ধরিতে সমর্থ হইবে।”

আর একবার জীবনের বন্ধনগুলি ছেদন করা সম্বন্ধে তাঁহার কোন কথার উত্তরে একজন বলিয়াছিল, “হিন্দুগণ এই জীবনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন আমি তাহা অনুভব করিতে পারি না। আমার মনে হয়, আমি নিজের মুক্তি সাধন অপেক্ষা বরং যে সকল মহৎ কার্য্য আমার প্রীতিকর, তাহাতে সহায়তা করিবার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করাই বহুগুণে পছন্দ করি। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ এই তীব্র উত্তর দিলেন, “তাহার কারণ তুমি ক্রমোন্নতির ধারণাটাকে জয় করিতে পার না। কিন্তু কোন বাহ্যবস্তুই ভাল হয় না। তাহারা যেমন আছে তেমনই থাকে। উহাদিগকে ভাল করিতে গিয়া আমরাই ভাল হইয়া যাই।” এই শেষ বাক্যটী আমার নিকট বেদের ন্যায় সারবান বলিয়া মনে হয়। “উহাদিগকে

ভাল করিতে গিয়া আমরাই ভাল হইয়া যাই।" এইরূপ আমার মনে আছে, আমাদের আলমোড়ায় বাসকালে জনৈক প্রৌঢ়-বয়স্ক নিরীহ প্রকৃতির লোক স্বামিজীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে কর্ম্মসম্বন্ধে একটী প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটী এই—যদি কেহ কর্ম্মের ফেরে বলবানকে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে দেখে তবে তাহার কি করা উচিত? স্বামিজী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন, "কেন, বলবানকে উত্তম মধ্যম প্রহার দেওয়া—এর আর কথা কি আছে? এই কর্ম্মের বিষয়ে তুমি তোমার নিজের কর্ত্তব্যটুকু ভুলিতেছ।—অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার অধিকার যে তোমার চিরকালই রহিয়াছে!"

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(জনৈক ভারতীয় বন্ধুকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত। এই বন্ধুটী তাঁহাকে আমেরিকায় সাহায্য করিয়াছিলেন।)

আমেরিকা।

১৮৯৪।

জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়—ইহা কত সত্য! যে গৃহচ্ছাদ তোমায় শীতগ্রীষ্মবর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে তাহার দোষগুণ, উহা যে স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিয়া বিচার করিলে, চলিবে না,—হউক না তাহারা অতি মনোহর কারুকার্য্যময় 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভ। উহার বিচার করিতে হইবে উহার কেন্দ্রস্থানীয় সেই চৈতন্যময় প্রকৃত স্তম্ভের দ্বারা—যাহা গৃহস্থালীর প্রকৃত অবলম্বন,—আমি নারীগণের কথা বলিতেছি। সেই আদর্শের দ্বারা বিচার করিলে, আমেরিকার পারিবারিক জীবন জগতের যে কোন স্থানের পারিবারিক জীবনের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবে না।

আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মত চালচলন নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে এক বৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী নারীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শত জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য মানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই,—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে।
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং—"

"যদি সাগর মস্যাধার, হিমালয় পর্ব্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্র হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন,"—তথাপি এ সকল তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অসমর্থ হইবে।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দ্দকশূন্য, পরিব্রাজক প্রচারকরূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান, এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের নিজেদের যাজককুল এই "বিপজ্জনক বিধর্ম্মীকে" ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা

অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই "অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর (হয়ত বা বিপজ্জনক চরিত্রের)" সঙ্গত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্র রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে দক্ষতরা,—কারণ নির্ম্মল দর্পনেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি,—কত শত জননী দেখিয়াছি যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই,—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা "ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল", আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে; ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপগণ্ডগুলির দ্বারা তৎসম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না; কারণ উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।

একটী আপেলগাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে তুমি কি যে সকল অপক্ক, অপরিণত, কীটদষ্ট ফল মাটীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—যদিও তাহাদের সংখ্যা কখনও কখনও অধিকই হইয়া থাকে—তাহাদের সাহায্য লও? যদি একটীও সুপক্ক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায় তবে সেই একটীর দ্বারাই ঐ আপেল গাছের শক্তি, সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়—যে শত শত ফল অপরিণতই রহিয়া গিয়াছে তাহাদের দ্বারা নহে।

তার পর, আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদারমনের প্রশংসা করি। আমি এদেশে অনেক উদারমনা পুরুষও দেখিয়াছি (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত); তবে একটী প্রভেদ আছে—পুরুষগণের পক্ষে একটী বিপদাশঙ্কা

এই যে তাঁহারা উদারমনা হইতে গিয়া নিজেদের ধর্ম্ম খোয়াইয়া বসিতে পারেন ; কিন্তু নারীগণ যেখানে যাহা কিছু ভাল আছে তাহার প্রতি সহানুভূতিহেতু এই উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের নিজ ধর্ম্ম হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে স্বতঃই অনুভব করেন যে ইহা একটী ইতিবাচক (positive) ব্যাপার, নেতিবাচক (negative) নহে ; যোগের ব্যাপার, বিয়োগের নহে। তাঁহারা প্রতিদিন এই সত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের "হাঁ" এর দিকটীই, ইতিবাচক দিকটীই, সঞ্চিত থাকে এবং প্রকৃতির এই ইতিবাচক বা অস্তিবাচক —এবং এই হেতু চিত্তগঠনকারী,—শক্তিসমূহের একত্রীকরণ দ্বারাই পৃথিবীর নেতি-বাচক বা নাস্তি-বাচক অংশগুলি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিকাগোর সেই বিশ্ব-মহামেলা কি অদ্ভুত ব্যাপার! আর সেই ধর্ম্ম-মহামেলা—যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে লোক আসিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাও কি অদ্ভুত! ডাক্তার ব্যারোজ ও মিষ্টার বনির অনুগ্রহে আমিও আমার ধারণাগুলি সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মিষ্টার বনি কি অদ্ভুত লোক! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তিনি কিরূপ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি যিনি মানসনেত্রে এই বিরাট অনুষ্ঠানটীর কল্পনা করিয়াছিলেন এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতেও প্রভূত সফলতা-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আবার যাজক ছিলেন না ; তিনি নিজে একজন উকীল হইয়াও যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিচালকগণের নেতৃত্বপদে বিরাজ করিয়াছিলেন। তিনি মধুরস্বভাব, বিদ্বান ও সহিষ্ণু ছিলেন,—তাঁহার হৃদয়ের গভীর মর্ম্মস্পর্শী ভাবসমূহ তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে পরিব্যক্ত হইত।

দৈব ও পুরুষকার।

(ব্রহ্মচারী—)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা ও ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে, দৈব ও পুরুষকারের তথ্যনির্ণয় তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। মানুষ যাহাই কেন করুক না, তাহাকে এই দুইটী শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। যখন সে সুস্থ ও সবল থাকে, যখন সুখের ক্রোড়ে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া তাহার অভাব বলিয়া কোন বস্তুর বোধ থাকে না, যখন সে চাহিবামাত্র সকল বস্তুই নিজ করায়ত্ত দেখিতে পায়, তখন সে স্বতঃই পুরুষকারের প্রাধান্য দেখিতে পায় এবং বলিয়া থাকে পুরুষকার দ্বারা সকলই হইতে পারে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মত বদলাইয়া যায়। হয় ত তাহার পুত্রের সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল, শত চেষ্টা, শত অর্থব্যয় সত্ত্বেও সে তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, তখন শোকে, দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া সে দৈব নামক অপর এক শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে থাকে, এবং বলে, "দৈবই বলবান, মানুষ কি করিবে?" এইরূপে আমরা লোকভেদে, এবং কালভেদে একই ব্যক্তিতে, এই দুই শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। এক্ষণে দেখা যাউক উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, উহাদের একটী অপরটীর সহিত একত্র থাকিতে পারে কি না, এবং উহাদের প্রকৃত অর্থ কি।

সাধারণ মানবের নিকট দৈব একটী অনির্দ্দিষ্ট, অজ্ঞাত, প্রবল শক্তি, যাহা তাহার অতি যত্নের সাধগুলি নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়, যাহা তাহার সুকল্পিত মনোরথগুলি কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়, যাহা ভালকিছু প্রায়ই করে না, কিন্তু শত অশুভ সৃজন করিয়া থাকে। দৈব সম্বন্ধে মানবের ধারণা এইরূপই। দৈবের যে একটা ব্যাখ্যা হইতে পারে, উহা যে একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার নয়, উহা যে তাহারই কালান্তরের অর্জ্জিত কর্ম্মফল,

তাহা অতি অল্প লোকেরই মনে উদিত হইয়া থাকে। দৈব বেচারী ভালর বেলায় কেহ নহে, কিন্তু যত দোষ সব উহারই ঘাড়ে চাপান চাই! এই মতে পুরুষকারের জগতে প্রসার অতি অল্প, মানুষ ক্ষুদ্র জীব; দৈবের সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইবার তাহার শক্তি কোথায়? পুরুষকার দৈবেরই কৃপাভিখারী দাস মাত্র।

অন্য পক্ষে আবার পুরুষকারই সর্ব্বস্ব। কর্ম্মী যে, সে পুরুষকার ছাড়া আর কিছু জগতে দেখিতে পায় না। জগৎ ত পুরুষকারেরই লীলা মাত্র। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। এখানে যে খাটে, তাহারই লাভ হয়, উদ্যমশীল পুরুষেরই লক্ষ্মী করতলগত। নিষ্কর্ম্মার, নিরুদ্যমের এখানে স্থান নাই—প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাহাকে কোণঠেসা হইয়া অচিরেই ইহজগৎ হইতে অপসৃত হইতে হইবে। পুরুষকারই এখানে সদর্পে পাদক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে, দৈব তাহার নিকট সতত যোড়-হস্ত। পুরুষকারই সব, দৈবের আবার স্থান কোথায়? দৈব ত দুর্ব্বলের কার্পণ্যজনিত কল্পনা মাত্র। পুরুষকার, পুরুষকার—ইহাই একমাত্র শক্তি। যদি প্রভুত্ব চাও, যদি শক্তি চাও, পুরুষকারের উপাসনা কর, সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

আমরা এই দ্বিবিধ প্রকৃতির লোকই দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি। এখন দেখা যাউক, উভয় শক্তিই এক সময়ে একত্র কার্য্য করিতে পারে কি না? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—না। কারণ, যদি দৈবকে বলবান বলিয়া স্বীকার কর, তবে পুরুষকারের ত অস্তিত্বই থাকে না। আবার যদি পুরুষকারই বলবান বলিয়া মনে কর, তবে দৈব আবার কি? হয় সবই দৈব, নয় সবই পুরুষকার। এ দুইটী শুধু ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত নহে, আলোক অন্ধকারের ন্যায় একেবারে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী। আবার যদি একটী মাত্র মূল বিষয়ের দ্বারা সমুদায় বস্তুর ব্যাখ্যা করা চলে, তবে দুই বা ততোধিক নিয়ম দ্বারা উহাদের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। দর্শনের উদ্দেশ্য ত তাহাই—এমন একটী নিয়ম আবিষ্কার করা যদ্দ্বারা সমস্ত জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং এই হিসাবে দৈব ও পুরুষকার—এইরূপ দুইটী পৃথক শক্তির অস্তিত্ব

স্বীকারের প্রয়োজন কি? একটীই পর্য্যাপ্ত। যুক্তির দিক হইতে দেখিলে এতদুভয়ের একত্র অবস্থান অসম্ভব।

আপাতদৃষ্টিতে এইরূপই মনে হয় বটে। কিন্তু উহাদেরও সামঞ্জস্য করা যায়। এই সমস্যার সমাধান এই যে, দৈব ও পুরুষকারকে যে দুইটী পৃথক শক্তি বলিয়া মনে করিতেছ তাহাই ভ্রম। উহারা একই শক্তির বিভিন্ন অবস্থার নাম। প্রকৃতপক্ষে দৈব কাহাকে বলে? কোথা হইতে উহার উৎপত্তি? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে যাহাকে আমরা 'দৈব' 'দৈব' বলিয়া একটী 'নূতন কিছু' ঠাওরাইতেছিলাম, তাহা ত আমাদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মেরই ফলসমষ্টি। আমি যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে করিয়া আসিয়াছি তাহারই সংহত ফল আমাকে দৈবের আকার ধারণ করিয়া ভয় দেখাইতেছে। দৈব যদি অন্যের উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে বাস্তবিকই উহা এক বিষম বস্তু হইয়া উঠিত। যাহা আমাদের কৃত নহে, তাহার উপর আমাদের জোর চলে না। সে হিসাবে দৈব, বাস্তবিকই অলঙ্ঘ্য হইত। কিন্তু সেরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। অজ্ঞ লোকে ভাবে ভাবুক, বুদ্ধিমান দৈবের স্বরূপ অবগত হইয়া, তাহার বলাবল সম্যক জানিয়া নিশ্চিন্ত হউন। দৈব যখন আমাদেরই পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মফলসমষ্টি তখন উহা হইতে নিষ্কৃতির উপায়ও ত আমাদেরই হাতে। তাহা হইলেই দৈব ও পুরুষকারে বিবাদ রহিল না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যে সম্বন্ধ, দৈবের সহিত পুরুষকারেরও সেই সম্বন্ধ। যাহা এখন বর্ত্তমান তাহাই পরে অতীত হইবে। যাহা এখন পুরুষকার তাহাই পরে দৈব হইয়া দাঁড়াইবে। শুধু কালগত পার্থক্য মাত্র। তবে দৈব এতটা গুরুত্ব পাইয়া বসিল কিরূপে? তাহার উত্তরও সহজ। অতীতই চিরকাল পূজা পাইয়া থাকে, বর্ত্তমান নহে। বেশী মাখামাখি হইতে তাচ্ছিল্য আসিয়া থাকে, একথা সর্ব্বজনবিদিত।

পুরুষকারসহায়ে জগতে যে অসাধ্যসাধন হয়, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ইতিহাস তাহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দিতেছে। পুরুষকারের প্রবল বিকাশে সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূরে পলাইয়া কর্ম্মবীরের পথ উন্মুক্ত

করিয়া দেয়। আমাদের রামায়ণ মহাভারতাদি এরূপ বহু মহাবীরের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালের ইতিহাসে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি এবং আধুনিক কালে এব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতির উচ্চপদ লাভ ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। এরূপ অসাধারণ শক্তিশালী লোক জগতে বিরল সন্দেহ নাই। সুতরাং সাধারণ মানব এবিষয়ে নিজের অক্ষমতা জানাইয়া আপনাকে পুরুষকার বিকাশের অযোগ্য পাত্র মনে করিতে পারে। কিন্তু এরূপ মনে করা অসমীচীন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাধ্যানুসারে কার্য্যের সফলতার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শুধু দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা দুই শ্রেণীর লোকের সাজে। প্রথম—যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, পরমহংসপদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন। তাঁহাদের উপর মায়িক জগতের নিয়মসকল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। দ্বিতীয়—পশুপ্রকৃতি মানব। পশুও কিন্তু একেবারে চেষ্টাবিহীন নহে। যদিও আমরা প্রাণিরাজ্যের কর্ত্তা হইয়া পশুদিগকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনি না, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহারা ততটা হীন নহে। তাহাদের মধ্যেও বুদ্ধিবৃত্তি ও তদনুযায়ী চেষ্টাদির যথেষ্ট বিকাশ আছে। শুধু আমরা গায়ের জোরে উহাকে বুদ্ধিপ্রসূত না বলিয়া সহজাত সংস্কার বা instinct নামে অভিহিত করি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মায়ার বন্ধন অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে কোন মানুষেরই পুরুষকারকে অবহেলা করা উচিত নহে। দৈব ও পুরুষকার অন্ধপঙ্গুন্যায়ের মত। উভয়ের সামঞ্জস্যেই উভয়ের বিকাশ। পঙ্গু চলৎশক্তি-বিরহিত, কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি আছে; অন্ধ দৃষ্টিশক্তিবিহীন, কিন্তু তাহার পা আছে। সুতরাং অন্ধ সুবুদ্ধির মত পঙ্গুকে বহন করিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। এখন অন্ধ যদি বলিয়া বসে, আমি পঙ্গুকে বহন করিব কেন, তাহা হইলে তাহার মর্য্যাদাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার কাণ্ডজ্ঞানের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ পুরুষকারকে ছাড়িয়া শুধু দৈবের উপর নির্ভর করিলে বহুদর্শিতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহাতে এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। হইতে

পারে, বহু জন্ম জন্মান্তরের কার্য্যসমষ্টিস্বরূপ দৈব রেলগাড়ীর বাষ্প-স্থানীয়, কিন্তু চাকারও যে নিতান্ত আবশ্যক একথা ভুলিলে চলিবে কেন ?

দৈব শব্দ কেহ কেহ ঈশ্বরেচ্ছা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই অর্থেও দৈব পুরুষকারের পরিপন্থী নহে। কারণ ইঁহারা স্বীকার করেন ঈশ্বর আমাদিগকে বিদ্যা বুদ্ধি দিয়াছেন, কিন্তু ভুলিয়া যান যে তিনি আমাদিগকে উহার ব্যবহার করিতে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করেন নাই। যাঁহারা বৈধীভক্ত, তাঁহাদের পক্ষে দৈবের দোহাই দিয়া এরূপ ভাবে নিষ্কর্ম্মা হওয়া শোভা পাইতে পারে বটে ; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত কথায় কথায় তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ইষ্টদেবকে সামান্য সামান্য কাজের জন্য কষ্ট দিতে চাহিবেন না। প্রেমিক যে ভগবৎগত-প্রাণ। তাঁহার নিকট ভগবান অতি আদরের বস্তু। প্রেমিক নিজেকে বড় মনে করে এবং পাছে ভগবানের কষ্ট হয় এই ভয়ে সে সদাই বুক পাতিয়া সকল দুঃখ কষ্টকে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। সে দেখে ভগবান যে তাহার অন্তরে বাহিরে রহিয়াছেন। সে উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে ভয় পাইবে কেন ?

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ইহাই শ্রুতিবাক্য। কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই দেহেন্দ্রিয়াদির সমগ্র উদ্যম প্রয়োগ করা উচিত। ঐ শুন তোমাদেরই জন্য প্রাণপাতোদ্যত অক্লিষ্টকর্ম্মা বিবেকানন্দের সাগ্রহ আহ্বান—"জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?" জড়ের ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে জড়ের সত্তা পাইবে, চৈতন্যের ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে চৈতন্যস্বরূপকে লাভ করিবে। জড়বৎ ত রহিয়াছ, আরও জড় হইতে চাহ ? "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

"অয়কেন দরবারে"

(কৈফিয়ৎ)

(শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, এম-এ. বি-এল)

গত আশ্বিন সংখ্যার "উদ্বোধনে" আমার "অয়কেন" প্রবন্ধের কোন কোন মতের সমালোচনা ও প্রতিবাদ লইয়া "অয়কেন দরবারে" এই প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে। জানিতে পারিলাম ইহার লেখক একজন অতি ত্যাগশীল দেশ-হিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তি এবং সম্প্রতি হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী। আমার "অয়কেন" প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে সমস্ত গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার মীমাংসা ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিলেও তাঁহাকে আমি বিশেষরূপে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু এই প্রতিবাদমূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে দু একটি কথা না বলিলে আমি কি বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্তি থাকিয়া যাইতে পারে, আশঙ্কা করি। সন্ন্যাস কি গার্হস্থ্য? মূলতঃ এই প্রশ্নটিই আমার "অয়কেন" প্রবন্ধ প্রসঙ্গে যুগপৎ সন্ন্যাসী ও গৃহীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষা এই প্রশ্নটিকে লইয়াই বিব্রত হইয়াছে, এবং আজিও হইতেছে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের নিকট, এবং সমষ্টিভাবে প্রত্যেক সভ্যতার নিকট, ইহা একটি চিরন্তন প্রশ্ন। এই সমস্যার সম্পূরণ করিতে যাইয়াই, মানুষের জীবন ও সভ্যতার ইতিহাস আমাদের সম্মুখে একটি বিশেষ আকারে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে। (১)

(১) ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের এরূপ ব্যাখ্যা আমরা কোথাও পাই নাই। "গৃহস্থ হইব কি সন্ন্যাসী হইব", এই সমস্যার ভিতর দিয়া প্রত্যেক মানুষের, তথা প্রত্যেক সভ্যতার, ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে, এরূপ উক্তিকে অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। "গৃহস্থ হইব, কি সন্ন্যাসী হইব" ইহা একটা সমস্যা বটে। কাহারও কাহারও জীবনে এ সমস্যা ঘটে; হয়ত শ্রদ্ধেয় লেখকের জীবনেও ঘটিয়াছে। তাই হয়ত লেখকের

গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে, স্বামী বিবেকানন্দের মতেও, রাজা রামমোহন হইতেই বঙ্গদেশে একটি নবযুগের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। এই নবযুগের চালক ও নেতারূপে যাঁহারাই আসিয়া জাতির সম্মুখে দাঁড়াইতেছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে, কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্টভাবে, সন্ন্যাস না গার্হস্থ্য, এই প্রশ্নটিই আসিয়া পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতেছে। সাধারণভাবে মানবআত্মার ইহা এক অতি আদি প্রশ্ন, এবং বিশেষভাবে ভারতীয় সভ্যতার ইহা একটী বিশেষ প্রশ্ন। কাজেই যুগধর্ম্মের আদর্শ বা আভাস-বহনকারী বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন মহাপুরুষই, এই প্রশ্ন এবং তাহার কোন রকম একটা মীমাংসার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু মহাপুরুষেরাও, জানিনা কি অজ্ঞাত বিচিত্র নিয়মের অধীন হইয়া, বিভিন্নযুগে অল্পাধিক বিভিন্ন যুগাদর্শেরই আভাস দিয়া থাকেন। মানবের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। এমন কি, কোন একটি বিশেষ যুগেও সমসাময়িক মহাপুরুষগণের প্রচারিত যুগাদর্শের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আমাদের দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে না। গত এক শতাব্দী কালের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে বিভিন্ন মহাপুরুষেরা যে সমস্ত যুগধর্ম্ম বা যুগাদর্শের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ঐক্য আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যও আছে, এবং বিরুদ্ধ ভাব নাই, এমন কথা বলা যায় না। সম্ভবতঃ, যুগধর্ম্ম বা যুগাদর্শ

জগৎ জুড়িয়া সমস্যাটী "দেদীপ্যমান" হইয়া উঠিয়াছে। তাই হয়ত বড় বড় লোকের মতামতের আলোচনায় লেখক প্রধানতঃ এই সমস্যারই একটা মীমাংসা খুঁজিতেছেন এবং কাহার নিকট কি রকম মীমাংসা পাওয়া যায় দেখিয়া প্রত্যেককে দুইটীর একটী দলে ফেলিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংসারী মানুষ যে অধিকাংশই সংসারের পক্ষপাতী হইবে, ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অধিকাংশই যে "যেনাস্য পিতরো যাতা"-র দলে! লাখ ঘুড়ির দু-একটা সুতো ছেঁড়ে—"হেঁসে দেও মা হাতচাপড়ি।" সংসারাসক্তির শিকড় এত আল্‌গা নয় যে প্রত্যেক মানুষের জীবনে সন্ন্যাস নাছোড়বান্দা হইয়া পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়ায় এবং শেষে উহার মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থকে আরও উচ্চতর আদর্শের দিকে ছুটিয়া যাইতে হয়।—ফুটনোটগুলি সমস্ত আমাদের ইতি। উদ্বোধন সম্পাদক।

এই বস্তুটিও নামরূপের মধ্যদিয়াই ইতিহাসের পথে একটি বিকাশ খুঁজিয়া চলিয়াছে, নামরূপহীন স্বপ্রকাশের মধ্যে নির্গুণ সমাধিতে মগ্ন হইয়া নাই। সম্ভবতঃ, যুগাদর্শের কোন একটা মাত্র বিশেষ দিক কোন মহাপুরুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে; এবং সম্ভবতঃ, সমসাময়িক সকল মহাপুরুষের মধ্যেই আমাদের নবযুগের আদর্শ, নামরূপে বিকশিত, বিচিত্র, ও ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। এক পরম ঐক্যও এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই, বাহিরে নয়, প্রতিভাত হইতেছে,—হওয়া সম্ভব। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগাদর্শপ্রচারক সকল মহারথীর আদর্শই আমাদের ধীরভাবে 'শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন' করিয়া দেখিবার বিষয় মনে করি। (২)

তার পরে, বঙ্গদেশের "বিবেকের বাণী" সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে ধ্বনিত হওয়ার পর, এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব বঙ্গদেশে আসিয়া নিশান পুঁতিবার পর, বাঙ্গালী মহারথীদের দরবারে "অয়কেন", ও "অয়কেন দরবারে" বাঙ্গালী মহারথীদের তুলনায় সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক ত নয়ই, অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমি মনে করি।

(২) এখানে লেখক বলিতে চাহেন যে, একই যুগে যুগাদর্শ প্রচার করিবার জন্য যে সমস্ত মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহাদের মতামতের মধ্যে ঐক্যও আছে, বৈচিত্র্যও আছে; কেন না যুগাদর্শের হয়ত এক একটা বিশেষ দিক এক এক মহাপুরুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে।" অতএব সকল "মহারথীর আদর্শই" আমাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

সর্ব "মহারথীর" আদর্শ যে অবধানযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যুগাদর্শের ধারণা করিতে হইলে যে লেখকের প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ তাহা সকলে স্বীকার করিবেন না। মহাপুরুষেরা কি যুগাদর্শের এক একটী খণ্ডিত অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিতেই আসেন, কাহারও মধ্যে কি যুগাদর্শের অখণ্ডিত মূর্ত্তি প্রকাশ পায় না? তা ছাড়া লেখকের প্রণালী সম্বন্ধে আরও প্রশ্ন উঠিতে পারে। কোন্ মহাপুরুষ যুগাদর্শের কোন্ অঙ্গটী প্রকাশ করিয়াছেন, এ বিচার করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই যুগাদর্শ সম্বন্ধে একটা পাকা ধারণা থাকা চাই। দেশের বর্ত্তমান যুগাদর্শ যে কি, তাহার একটা সিদ্ধান্ত আগে করা চাই। এ গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে কি সকলে একমত?

অতএব এ কয় পংক্তিতে যে একটা দার্শনিক "পাঁয়তারা" রহিয়াছে তাহাতে আসল বিচার কিছুই অগ্রসর হয় নাই! অথচ মিছামিছি "নির্গুণ সমাধির" উল্লেখ করা হইয়াছে!

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য, এই সমস্থার মীমাংসায়, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথকে গার্হস্থ্যের সমর্থনকারী, এবং পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দকে, সন্ন্যাসের পক্ষপাতী বলিয়া আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি। (৩) অবশ্য রামমোহনের ধর্ম্মমত অবিকল রবীন্দ্রনাথের নহে বলিয়া যেমন আমার বিশ্বাস, তেমনি পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলীর গভীর ঐক্যের মধ্যেও, পরস্পরের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যও খুব বেশী অস্পষ্ট নয় বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু সাধারণভাবে শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়াই, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথকে একদিকে,—এবং পরমহংসদেব ও স্বামিজীকে ঠিক সেদিকে নয়, অন্যদিকে, দাঁড় করাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছি। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যগৌরবে সমুন্নতশির মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে, এইরূপ শ্রেণীবিভাগের অপরিহার্য্য ত্রুটি ও অপরাধের হস্ত হইতে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে রক্ষা করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলেই এরূপ ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী।

যাহা হউক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের গার্হস্থ্যসম্বন্ধে মতবাদের সূক্ষ্ম সমালোচনা আমার "অয়কেন" প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। গার্হস্থ্য সম্বন্ধে স্বামিজীর মতের কোন বিস্তৃত আলোচনা আমি ঐ প্রবন্ধে করিবার সুযোগও পাই নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি "স্বামী বিবেকানন্দকে গৃহস্থের বিপক্ষবাদী ও বিরক্তদের সপক্ষবাদী বলিয়া ঘোষণা করায়, 'অয়কেন' ব্যাখ্যাকার, স্বামিজীর প্রকৃত

(৩) এই পক্ষনির্দ্দেশই আসল বিচার্য্য বিষয়। আমরা রাজা রামমোহন রায়ের মতামত আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার ভাব এই ছিল যে, ব্রহ্মবাদ কেবলই যে সন্ন্যাসীর সাধনীয় তাহা নহে, গৃহস্থকেও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী এইরূপ দুইটা পক্ষ দাঁড় করাইয়া তারপর গৃহস্থের পক্ষে রাজা রামমোহন যে রায় দিয়াছেন, এমন কথা ত আমাদের মনে হয় না। গৃহস্থের পক্ষপাতী দল ও সন্ন্যাসীর পক্ষপাতী দল, এই দুই দল খাড়া করিয়া লেখক মহাশয় যে রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে একটা কোনও দলে ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতেছেন, ইহাই আমাদের প্রধান আপত্তিস্থল।

পরিচয় দেন নাই।" কারণ শ্রদ্ধেয় প্রতিবাদকারী বলেন যে, স্বামিজী—

(ক) "ধর্ম্মজীবন লাভের পথ যে কেবল সন্ন্যাস এমন কথা বলেন নাই।"

(খ) "সমস্ত ধর্ম্মপিপাসুকে সন্ন্যাস লইতে আহ্বান করেন নাই।"

(গ) "সন্ন্যাসীর যাহা সাধ্য গৃহস্থেরও তাহা সাধ্য হইতে পারে।"

(ঘ) "সন্ন্যাস কেবল একটা বিশেষ সাধন প্রণালী।"

গার্হস্থ্য সম্বন্ধে এই মত হইতেছে স্বামিজীর প্রকৃত পরিচায়ক। সন্ন্যাসীর গার্হস্থ্য সম্বন্ধে এরূপ উদারতা (৪) এ যুগের পক্ষে খুব সমীচীন বলিয়া মনে করি। এবং গার্হস্থ্য সম্বন্ধে এইরূপ একটা উন্নত রকমের উদারতা যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পোষণ করিতেন তাহা আমারও বিশ্বাস। কেন না সন্ন্যাসী হইলেও, স্বামিজী উনবিংশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী। এবং সেই গার্হস্থ্য ও সমাজ-জীবনের মধ্য হইতে তিনি উত্থিত, যাহার বক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান ভারত, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শতাব্দী কাল ধরিয়া এক প্রবল সংঘর্ষণ চলিয়াছে। তথাপি আমি মনে করি, সমস্ত ধর্ম্মপিপাসু বা দেশবাসীকে সন্ন্যাস লইতে যে স্বামিজী আহ্বান করেন নাই, তাহার কারণ ইহা নয় যে "সন্ন্যাসীর যাহা সাধ্য গৃহস্থেরও তাহা সাধ্য হইতে

(৪) লেখক পক্ষনির্দ্দেশ কল্পনা করিয়া স্বামিজীকে প্রথম হইতেই গৃহস্থের বিপক্ষবাদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাই এখানে গৃহস্থ সম্বন্ধে তাঁহার "উদারতা" দেখিতেছেন। এই জন্য অনুমান হয় যে নিজের জীবনে এক সমস্যায় ঠেকিয়া তাহারই সহায়ে বড় বড় লেখকদের মতামত আলোচনা করায় কাহারও কাহারও সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা হওয়া বাস্তবিকই স্বাভাবিক।

আবার উনবিংশ শতাব্দই সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মনে এই "উদারতাটুকু' ঢুকাইয়া দিয়াছে, নচেৎ অন্য শতাব্দীর সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুদার, সংকীর্ণ-মনা হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ ধারণা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে।

পারে,"—বরং স্বামিজীর মতে তাহার কারণ এই যে সন্ন্যাসীর যাহা সাধ্য, গৃহীর তাহা সাধ্য হইতে পারে না। (৫) গৃহীর 'সাধ্য' অপেক্ষা সন্ন্যাসীর 'সাধ্য' বহুগুণে উচ্চ ও কঠোরসাধনালভ্য। সকলেই কিছু সন্ন্যাসের এই উচ্চ ও কঠোরসাধনালভ্য অধিকার লইয়া জন্মায় নাই। কাজেই সকল ধর্ম্মপিপাসুই সন্ন্যাসের পথে ছুটিবে না, কেননা পারিবে না। কিন্তু গার্হস্থ্য অপেক্ষা সন্ন্যাসের আদর্শ উচ্চ, অধিকার উচ্চ,—মুক্তিও উচ্চ। সন্ন্যাস শুধু আর দশটা সাধন-প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ সাধনপ্রণালী নয়,—আরও দশটা সাধন প্রণালী আছে এবং থাকুক, কিন্তু সন্ন্যাস তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই স্বামিজীর মতে, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব (৬), স্বতঃই সন্ন্যাসের ক্ষুরধার শাণিত দুর্গম পথে ছুটিবেই ছুটিবে। অন্যপক্ষে, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব, এযুগে,

(৫) "সাধ্য" শব্দের দুইটী অর্থ,—একটি "সাধনার বিষয়," অপরটী "ক্ষমতাসাপেক্ষ" "শ্রীহিমারণ্য", প্রথম অর্থে "সাধ্য"শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আর গিরিজাবাবু দ্বিতীয় অর্থে শব্দটী গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, "সন্ন্যাসীর যাহা সাধ্য, গৃহীর তাহা সাধ্য হইতে পারে না।" নচেৎ কে অস্বীকার করিতে পারেন যে সন্ন্যাসী ও গৃহী একই পারমার্থিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন?

সন্ন্যাসীর সাধনপ্রণালী যে শ্রেষ্ঠ সে কথা "শ্রীহিমারণ্য" অস্বীকার করেন নাই। সাধনার এই উচ্চতর বা প্রকৃষ্টতর প্রণালী স্বীকার করিলেই গৃহীকে যে একই লক্ষ্য সাধনার গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল, তাহা নহে। যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ-সন্ন্যাসী ও গৃহীকে একই পরমার্থলক্ষ্যের সাধক বলিতে রাজি আছেন, সেই হেতু তাঁহাকে সন্ন্যাসীরই পক্ষপাতী ও গৃহস্থের অপক্ষপাতী বলা যায় না।

(৬) সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ সাধনপথ হইলেই যে দেশের "শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বই" কেবল ঐ পথে ছুটিবে, এমন অসার যুক্তি স্বামিজী কখনও কেন নাই; লেখক নিজের একটা উক্তি কেন তাঁহার ঘাড়ে চাপাইতেছেন? দেশের "শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব" যেমন অশ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য-সাধন পথে থাকিতে পারে, তেমনি দেশের "শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যত্ব" শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস সাধকপথে থাকিতে পারে। "কর্ম্মযোগের" একটী বক্তৃতায় স্বামিজী নিজে এই প্রশ্ন তুলিয়া ছেন যে সন্ন্যাসী বড় না গৃহী বড়। তারপর নিজেই এই মীমাংসা করিতেছেন যে, (Each is great in his own place)। সন্ন্যাসী যেমন আদর্শের শীর্ষে উঠিতে পারেন, গৃহীও তেমনি পারেন। এই "শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের" সম্ভাবনা গৃহীর সম্মুখে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন বলিয়াই স্বামিজীকে কেবল সন্ন্যাসীর পক্ষপাতী বলা যায় না। তবে যিনিই সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ

সন্ন্যাসের পথে ছুটিবে না, ছুটিলে অন্যায় করিবে,—ইহাই রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মত। ব্রহ্মকে অরণ্যের নির্ব্বাসন হইতে (৭) গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, এযুগে এদেশের পক্ষে রামমোহনের প্রতিভার ইহা একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। কবি রবীন্দ্রনাথ,—মহাকবি, হাঁ নিশ্চয়ই,—গৃহে পরিবারে, সমাজে সংসারে, অসংখ্য বন্ধনের মাঝে ব্রহ্মের যে রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, সেই রসস্বরূপের রস ও আনন্দস্বরূপের আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্যই তাঁহার দেশবাসীকে ও জগৎবাসীকে এ যুগে আহ্বান করিয়াছেন। রামমোহন নিজেকে সগর্ব্বে শঙ্করশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহার ও রবীন্দ্রনাথের মতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে গৃহীই হইতে হইবে, সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না, কাজেই যুগধর্ম্মের আদর্শপ্রচার ব্যাপারে, মহাপুরুষগণের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধভাব আমাদের দৃষ্টিকে ত এড়াইতে পারেই না, বরং সমধিক ব্যগ্র ও উৎসুক করিয়া তুলে।

স্বামিজীর মায়াবাদ ও অয়কেনের স্বভাব ও আত্মার দ্বৈতবাদ ('পাশাপাশি' অবস্থান) এক জিনিষ নহে, সমালোচনায় এইরূপ একটি প্রশ্নও উঠিয়াছে। আমিও তাহা কতকটা বিশ্বাস করি। "অয়কেন স্বভাব ও আত্মার পাশাপাশি সত্তা স্বীকার করিয়াছেন, কেবল স্বভাব নীচে ও আত্মা উপরে।" ইহার অর্থ আমি এইরূপ বুঝিতে চাই যে,—

সাধনপথ বলিয়া স্বীকার করিবেন, তাঁহার কাছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে অশ্রেষ্ঠ মানুষ হইলেও যে জন ঐকান্তিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাঁহার মধ্যে একটা এমন কিছু গৌরব আছে, যাহা কোন সাধারণ সংসারী, শ্রেষ্ঠ মানুষ হইলেও, তাঁহার মধ্যে নাই। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ সাধনপথ অবলম্বন করার গৌরব স্বীকার করিলেও, গৃহীর পক্ষে শ্রেষ্ঠতম সাধনপথে আধ্যাত্মিক উন্নতির গৌরবকে যে অস্বীকার করা হইল, তাহা নহে।

৭। "ব্রহ্মকে অরণ্যের নির্ব্বাসন হইতে গৃহে ফিরানর" বিষয় সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসের "প্রবুদ্ধ ভারতে"র সাময়িক প্রসঙ্গে বিচার করা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধটী লেখক মহাশয় ও "উদ্বোধনের" পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করি।

(ক) অয়কেন আত্মাকে স্বীকার করিতে গিয়া পাশাপাশি স্বভাবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বরং—

(খ) আত্মাকে একটা নির্ব্বাণ বা স্থিরভূমি বলিয়া কল্পনা না করায়, আত্মার মধ্যে একটা গতি বা জীবন স্বীকার করায়, আত্মার ঊৰ্দ্ধ হইতে ঊৰ্দ্ধতর গতি এবং নিম্ন স্বভাবের রাজ্যে পুনরায় পতন আশঙ্কা করায়, অয়কেন আত্মার পাশাপাশি স্বভাবের অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবিরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য।

স্বামিজীর মায়াবাদ ইহা হইতে শুধু 'পৃথক' নয়, উহা এক 'গভীর তত্ত্ব', এমন কথা উঠিয়াছে।

(ক) স্বামিজীর মায়াবাদ, আমি যতদূর বুঝিয়াছি, ঠিক শঙ্করানুবর্ত্তী নয়। মায়ার ব্যাখ্যায় স্বামিজীর মৌলিকত্ব স্পষ্ট বিদ্যমান। স্বামিজী মায়ার ব্যাখ্যায়,—মায়া ভ্রমাত্মক মরীচিকা নয় ("Maya is not an illusion"), মায়া হইতেছে যাহা সংসারে প্রতিদিন ঘটিতেছে,—("Statement of facts") এইরূপ স্পষ্ট স্বীকার-উক্তি দ্বারা, জগন্নাস্তিকতা যাহা শাঙ্কর মায়াবাদে স্বতঃই আসিয়া পড়ে (৮), তাহা একরূপ অস্বীকার করিয়াছেন।

(খ) তাহা সত্ত্বেও, তাঁহার বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, যাহা স্পষ্টই শঙ্করানুবর্ত্তী, তাহাতে জগতের পারমার্থিক কোন সত্তাই থাকে না।

(গ) 'অব্যক্ত', প্রকৃতি ও মানবের ইতিহাসে ক্রমে 'ব্যক্ত' হইয়া বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ করিতেছে,—অভিব্যক্তিবাদের এই মত অস্বীকার করিতে যাইয়াও স্বামিজী আত্মার পাশাপাশি স্বভাবকে স্থান দিতে পারেন নাই; যাহা, পক্ষান্তরে, নামরূপসমন্বিত বিকাশকে স্বীকার করিয়া, অভিব্যক্তিবাদকে স্বীকার করিয়া, অয়কেন দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

---

(৮) ভগবান শঙ্করের মায়াবাদে "জগন্নাস্তিকতা" আসে না, ইহা আর একবার উদ্বোধনে তাঁহারই প্রবন্ধে "ফুটনোটে" গিরিজাবাবুকে আমরা বলিয়াছি। শঙ্করের মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদকে "অসৎখ্যাতিবাদ" বলে না, "সদসৎখ্যাতিবাদ" বলে।

(ঘ) তত্ত্বাঙ্গে স্বভাবকে এইরূপে পারমার্থিক সত্তার দিক হইতে হীনপ্রভ করিতে সক্ষম হইয়াই, সাধনাঙ্গে স্বামিজী স্ত্রীপুরুষের মধুর দাম্পত্য সম্বন্ধকে, গার্হস্থ্যকে, ডিঙ্গাইয়া যাইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু অয়কেন তাহা পারেন নাই। কারণ অয়কেন মায়াবাদী বা শাঙ্করাদ্বৈতবাদী নহেন। তবে স্বভাবকে আত্মার সঙ্গী না বলিয়া (যেমন কেহ কেহ বলিয়াছেন) নিম্নে স্থান দেওয়া এবং ধর্ম্মজীবনে স্বভাবকে অস্বীকার করার একটা অবশ্যম্ভাবিতা ও তীব্র ব্যাকুলতা উপলব্ধি করায়, অয়কেনের মধ্যে স্বভাব ও আত্মার সামঞ্জস্য অপেক্ষা একটা দ্বন্দ্বের আভাসই আমরা পাইয়া থাকি। অয়কেন মনস্তত্ত্বে (psychology) বিশেষ পারদর্শী নহেন বলিয়াই, তাঁহার অনেক সমালোচক এই ত্রুটির উপর কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন।

তার পর ব্রহ্ম নিজের মধ্যে নিজে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার দৃশ্যতঃ এই প্রকাশ বা বিকাশ মায়িক, ভ্রমাত্মক,—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম। "সত্যের এই বিকাশসাপেক্ষ স্বরূপ ভারতীয় সন্ন্যাসশাস্ত্র স্বীকার করেন না।" এমন কথাও প্রসঙ্গতঃ উঠিয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে সন্ন্যাসশাস্ত্র বা সাধনমার্গ এইরূপ বিশেষ একটি দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতির পথে শাস্ত্র, দর্শন, মত ও পথ অনেক দেখা দিয়াছে ও দিতেছে। ঐতিহাসিক ধারার ক্রমোন্নতির পথে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অদ্বিতীয় পন্থা বলিয়া মনে হয় না; বহু সাধনমার্গ ও পথ দৃষ্ট হয়। কাজেই ভারতীয় সন্ন্যাসশাস্ত্র যাহা স্বীকার করেন না, ভারতীয় গার্হস্থ্য শাস্ত্র হয় ত বা তাহা অস্বীকার নাও করিতে পারেন। ভারতবর্ষের একটা দার্শনিক মতকেই (যেমন শাঙ্কর বেদান্ত) একমাত্র মতবাদ বলিয়া জীবনে সাধনা করা চলিলেও 'ভারতের বাণী' বলিয়া বাহিরে ঘোষণা করায় দেশের প্রকৃত পরিচয় ত হয়ই না, (৯) তাহাতে সত্যের সম্যক্ অপলাপ হয়, এমন আশঙ্কাও অমূলক নহে।

(৯) আমাদের দেশের প্রকৃত পরিচয় কি, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু

বুদ্ধ বা স্বামিজী যে গৃহ ত্যাগ করিয়াও গৃহীর প্রভূত উপকার ও কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু গৃহ ত্যাগ না করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ বা রামমোহন যে গৃহীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাও ত অস্বীকার করা যায়না। তবে 'জগৎকে শিক্ষা দিবার শক্তিধারণ' এযুগে কেবল ভারতীয় সন্ন্যাসেই সম্ভব, ভারতীয় গার্হস্থ্যে সম্ভব নয় কেন, তাহা বুঝা ও বুঝান শক্ত। (১০)

বুদ্ধ বা স্বামিজীকে জাতির ইতিহাসের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহাদের প্রচারিত আদর্শের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাইব না। ইতিহাসের ধারায় বিভিন্ন শক্তিসমূহের ঘাত প্রতিঘাত, যাহা কোন যুগবিশেষের উপযোগী আদর্শ বলিয়া প্রচারিত ও প্রকাশিত হয় তাহাই সমস্ত যুগের জন্য একমাত্র সম্ভবপর সত্য আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইলে, ইতিহাসের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী মহাপুরুষদিগকে এযুগে গৃহীর অযথা নিন্দা (১১) ও সন্ন্যাসীর অযথা স্তুতিবাদ হইতে উদ্ধার করা ক্রমশঃই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

দেশের প্রকৃত পরিচয় লইয়া কথা উঠে নাই। কথা উঠিয়াছে যে "ভারতের বাণী" পাশ্চাত্যের চিন্তা ও সাধনার মৌলিক অভাব মোচন করিবে, তাহা লইয়া। ব্রহ্মের বিকাশসাপেক্ষ সত্তাকে পাশ্চাত্যদর্শন নানাভাবে ফলাইয়া তুলিয়াছে। ঠিক সে ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিন্তা ও সাধনার বিশেষ অভাব অনুভূত হয় না। ব্রহ্মের বিকাশনিরপেক্ষ সত্তার কথা ভারতীয় অদ্বৈতবাদ ঘোষণা করিয়াছে। "ভারতের বাণী" এ কথা পাশ্চাত্যে ঘোষণা করিলে পাশ্চাত্যের চিন্তা ও সাধনার প্রত্ত অকৃভাব দূরীভূত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভারতের প্রকৃত পরিচয়ের কথা উঠে নাই। নানা দার্শনিক মতের খিচুড়ীতে যে ভারতের প্রকৃত পরিচয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, বরং অদ্বৈত যে সমস্ত মতের সামঞ্জস্য করিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা।

(১০) "জগৎকে শিক্ষা দিবার শক্তি" যে ভারত এখন ধারণ করে, তাহার কারণ ভারতেতিহাসে খুঁজিতে হইলে, ভারতীয় সন্ন্যাসীর সাধনা ও প্রতিভার কথাই ঐতিহাসিককে বেশী দেখাইতে হইবে, "শ্রীহিমারণ্যের", এইরূপ একটা উক্তিকে লেখক বিকৃত করিয়া বুঝিয়াছেন।

(১১) "গৃহীর অযথা নিন্দা" লেখক কোথায় পাইতেছেন? ইহা সম্পূর্ণ নিজের মনগড়া কথা।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম-এ, বি-এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে—তাহা হইতে জগদ্ব্যাখ্যার মোটামুটী একটা বিবরণ পাওয়া যায়। এই পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগৎ যে মূল সত্তারই বিকাশ প্লেটো এই কথাই ব্যক্ত করিতে চান। এই যে বিশ্বজগৎ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে ইহার স্বরূপ কি, এই চিন্তায় অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে এই বিশ্বজগৎকে জড় বা অচেতন পদার্থ মনে করা যায় না। একেবারে না করিবার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। মানুষ যখন আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়, তখন সে দেহ ও আত্মার পার্থক্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করে। তখন চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করা অযৌক্তিক হইয়া দাঁড়ায়। সে বুঝিতে পারে আত্মার স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ। সুতরাং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বা জ্ঞানলাভ করিতে সেই আত্মার অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন। দেহের সম্বন্ধে আত্মাকে কর্ত্তা বলিলেও চলে। একটী যন্ত্র অপরটী যন্ত্রী এই যে পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগৎ যন্ত্রের ন্যায় সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় চালিত হইয়াছে, ইহা কি তন্মূলে বিশ্বাত্মার অস্তিত্ব সূচনা করে না? মানুষ বলিলে যেমন মানুষ ও আত্মা উভয়ই বুঝায়, বিশ্ব বলিতে তেমনি বিশ্বজগৎ ও বিশ্বাত্মাকে বুঝায়। অবশ্য এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে, মানুষের স্বরূপ আত্মা বা সৎ-চিৎ-আনন্দ, সুতরাং দেহকে বাদ দিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি কিছুই নাই, যদি ব্যবহার না থাকে। যখন স্ব স্বরূপে মানুষ অবস্থিতি করে, তখন দেহবোধের অপেক্ষা না থাকিতে পারে; সে অবস্থায় দর্শনেরও প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম শুভাশুভ বিচারেরও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু

আমরা দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, সুতরাং আমাদের উভয়ই স্বীকার্য্য। বিশ্বজগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিলে দর্শনবিজ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। বিশ্বজগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে, ইহা সদসৎ হইতে পারে, ইহা একেবারে অসৎ নয়—ইহাই প্লেটোর বক্তব্য।

বিশ্বজগৎ বলিতে কি বুঝায় সেটী হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। এক হিসাবে ইহা পরিদৃশ্যমান নানাভেদবৈচিত্র্যপরিপূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল কার্য্য-কারণ-পরম্পরা মাত্র। আবার ইহা এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার পরিচয় দেয়। "পরিবর্ত্তন" ব্যাপার যুগপৎ দুইটী বিভিন্ন ভাবের পরিচয় প্রমাণ করে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা উপলব্ধি না করিলে পরিবর্ত্তন-রহস্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাকেই সৎ আখ্যা দিলে বিশ্বাত্মাই একমাত্র সৎপদার্থ বলিতে হয়। পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যজগৎকে আর তখন সৎ বলা চলে না।

যাহা হউক এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, বিশ্বজগৎ অপেক্ষা বিশ্বাত্মা গরীয়ান। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিচার করিলে এইটুকু বুঝা যায়, একটী অপরটীর প্রকাশ মাত্র। এ বিকাশ কিরূপে হইয়াছে, কেন হইয়াছে, তাহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। ইহা তাঁরই লীলা বা মায়া,—ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? প্লেটো বলেন তিনি মঙ্গলময় (The Absolute Good), তিনি প্রাণময় (Living), সুতরাং বিশ্বজগৎ সেই চেতনার অভিব্যক্তি মাত্র।

ভাবপদার্থই মূল পদার্থ, ভাবপদার্থই একমাত্র সৎপদার্থ, এই সিদ্ধান্ত হইতে কিরূপে "বিশ্বাত্মাকেই" সৎপদার্থরূপে প্লেটো সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা বুঝা খুব কঠিন নয়। কোন কোন দার্শনিক বলেন, ভাবপদার্থ (Idea) ও আত্মাকে (Soul) প্লেটো পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং আত্মাকে ভাবপদার্থের ও পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যজগতের মধ্যবর্ত্তী একটী পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কি বলেন দেখা যাউক।

আমাদের মনে হয় Idea বা ভাবপদার্থকে ব্রহ্ম, World-Soul বা

বিশ্বাত্মাকে ঈশ্বর ও Phenomena বা ঘটনা পরম্পরাকে বাহ্যজগৎ আখ্যা দিলে এবিষয়ের অনেকটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঈশ্বর ও জগৎ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির, বা সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টার কোন অর্থ নাই। পরন্তু ব্রহ্ম সৃষ্টির অতীত। স্রষ্টা ও সৃষ্টি মায়ার অধীন। ব্রহ্ম মায়াতীত। কথাটী পরিষ্কার করিয়া বলা হইল কিনা জানি না। ঈশ্বর স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নন, অথচ তিনি মায়াতীতও নন, সুতরাং তাঁহার যে দুইটী ভাব যুগপৎ প্রকাশ পাইবে সেটী আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের মূলে বিশ্বাত্মা, বিশ্বাত্মার মূলে Idea বা ভাবপদার্থ, ইহাই প্লেটোর বক্তব্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কখনও মূল ভাবপদার্থকে (The Absolute Idea), বা কখনও বিশ্বাত্মাকে(World Soul) সৎ পদার্থ বলায় প্লেটোর মতে কোন বিরোধদোষ ঘটে নাই। কেহ কেহ হয় ত মনে করিবেন আমরা প্লেটোকে একজন বৈদান্তিক করিয়া খাড়া করিতেছি। উত্তরে এইটুকু নিবেদন, প্লেটোর দর্শনের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইলে, তাঁহার দর্শনমধ্যে আপাতপ্রতীয়মান স্ববিরোধদোষ পরিহার করিতে হইলে, অনেক স্থলে তাঁহার মতের সহিত বেদান্ত মতের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তাঁহাকে একজন বৈদান্তিক রূপে প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বিশ্বজগতের মধ্যে মানবই যে শ্রেষ্ঠ জীব, এ কথার প্রতিবাদ করা অতি বড় তার্কিকেরও পক্ষে সুকঠিন। যাহা হউক, প্লেটো কিন্তু মানবকে বিশ্বজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন, এ কথা আমরা মনে করিতে পারি না। ধ্রুব তপস্যার ফলে, ভক্তিবলে, ধ্রুবলোকে বর্ত্তমান। ধ্রুবলোকপ্রাপ্তির জন্য আজও কতশত নরনারী লালায়িত। আধুনিক বিজ্ঞান কিন্তু ধ্রুবলোককে একটী তারকা রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার শুনিতে পাওয়া যায়, মানব সুকৃতিফলে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই সব নক্ষত্ররাজীকে প্লেটো মানব হইতে শ্রেষ্ঠতর পদার্থ মনে করিতেন। যাহা হউক মানবাত্মার আলোচনায় অতঃপর

অগ্রসর হওয়া যাউক। একটী কথা মনে রাখা দরকার—রূপক ভাবে প্লেটো মানবাত্মার সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সেই রূপক হইতেও তাঁহার মতামত অনেকটা বুঝা যায়। পরন্তু কোন্ স্থলে তাঁহার বক্তব্য সম্পূর্ণ রূপক বা কোন্ স্থলে সেটী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত তাহা পৃথক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত কঠিন। আমরা এই বিষয়ে তাঁহার মতামত যতদূর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই অতঃপর লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইব।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, বিশ্বাত্মা হইতে জীবাত্মার মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। প্রভেদ না থাকিবারই কথা, কারণ উভয়ের মূল ভাবপদার্থ। মানবও এই বিশ্বের অন্যতম পদার্থ ('পদার্থ' একটী দার্শনিক পরিভাষা)। বিশ্বে যাহা বর্ত্তমান তাহার প্রত্যেক পদার্থেও তাহাই বর্ত্তমান; বিশ্বের মূলে বিশ্বাত্মা, জীবের মূলে জীবাত্মা।

আত্মার স্বরূপ জ্ঞানময় ও প্রাণময় (Living) এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা সৎ; বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, তিন কালেই ইহা বর্ত্তমান। এই কথার আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক। প্লেটো জন্মান্তরবাদী ছিলেন। তিনি বলিতেন মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পরজন্মে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম্মফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে সে বর্ত্তমান জীবনলাভ করিয়াছে, বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফলে সে পরজন্মে অনুরূপ গতি লাভ করিবে। পক্ষান্তরে আবার তিনি আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিতেন। আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদনে তিনি যে সকল যুক্তি নির্দ্দেশ করেন তাহার পরিচয় অতঃপর দেওয়া গেল।

যাহা জ্ঞাত তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ নিরর্থক, যাহা অজ্ঞাত তাহা জানা যাইতে পারে না—সোফিষ্টগণ এবংবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্লেটো সে আপত্তির গুরুত্ব বেশ ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে সুন্দর মীমাংসা প্রদান করেন। তিনি বলেন জ্ঞানলাভ বলিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান হওয়া বুঝায় না, যাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাহার জ্ঞানলাভ যে অসম্ভব। যাহা জ্ঞাত ছিল তাহা কালে

মানুষ ভুলিয়া যাইতে পারে একথা সকলেই জানেন। যাহা ভুলিয়া যাই তাহা আবার পুনরায় স্মরণ হইতে পারে, এটীও সহজ বোধ্য। জ্ঞানলাভ বলিতে এই স্মরণ (Recollection) বুঝায়। মানব ইহজন্মে অনেক বিষয় ভুলিয়া যায়, আবার তাহা স্মরণ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অনেক জিনিষ যাহা ইহজন্মে ভুলে নাই তাহার স্মরণ হয় কিরূপে? উত্তরে প্লেটো বলেন, সে পূর্ব্বে কোন জন্মে সেটী ভুলিয়া গিয়াছিল, আবার নূতন করিয়া সেই বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করে। অনাদিকাল হইতে এইরূপ জানা ও ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানলাভের অন্য কোন অর্থ নাই। প্লেটো বলেন, এই জ্ঞানলাভ ব্যাপারেই মানবের পূর্ব্বজন্ম সূচিত হয়। তারপর আরও এক কথা। বিশেষ বিশেষ পদার্থই আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়, জাতি কখনও হয় না। অথচ জাতির জ্ঞান কিরূপে উদয় হয়? প্লেটো বলেন, জ্ঞানই মানবের স্বতঃসিদ্ধধর্ম্ম, অজ্ঞান আবরণ মাত্র। জাতিজ্ঞান কেন—মূল ভাবপদার্থের জ্ঞানও তাহার স্বতঃসিদ্ধ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে তিনি বলিতে চান, বিশেষ হইতে জাতি বা "অপর জাতি"হইতে "পর জাতি"তে অধিরোহণ করা মানবের পক্ষে অসম্ভব। তাহার পক্ষে সেই উপায়ে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা ভ্রমমূলক, কারণ বিশেষ বিশেষ পদার্থ হইতে কোন কালে জাতির পরিচয় সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাইতে পারে না। মানুষের জাতিজ্ঞান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই বিশেষ পদার্থে তাহার পরিচয় পাইয়া জাতিজ্ঞানকে স্মরণ (Recollect) করে মাত্র। প্লেটোর মতে জ্ঞানবিকাশ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, বাহ্যপদার্থ হইতে জ্ঞানলাভ হয় না। বাহ্যপদার্থ সময় বিশেষে তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র। তিনি একটী সুন্দর উপমা দ্বারা বুঝাইতে চান গ্লকাস দেবতা (Glaucus-বরুণ দেবতা) আবরণে আবরণে যেরূপ অপরিচিত অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করে, সেইরূপ মানবাত্মাও আবরণ ও বিক্ষেপের ফলে আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যায়। এই আবরণ ও বিক্ষেপ হয় কেন? বৈদান্তিক বলেন—মায়া। প্লেটো বলেন. জীবাত্মা আর সেই

অপরিবর্ত্তনীয় মূল ভাবপদার্থ সর্ব্বতোভাবে এক নয়, সুতরাং তাহার উক্তরূপ পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

জ্ঞানলাভ-ব্যাপারে মানবের পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। প্লেটো কিন্তু এই যুক্তিপ্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, আত্মার স্বরূপ প্রাণময়, সুতরাং তাহার মৃত্যু বা নাশ অসম্ভব। বিশ্বজগৎকে উড়াইয়া দিতে যাওয়া বাতুলের প্রয়াস। কারণ ইহার মূলোচ্ছেদ করা আর আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা একই কথা। পরন্তু এই স্বতঃসিদ্ধতাও অনেকের নিকট অসিদ্ধ। তাঁহাদের সংশয় নিরাকরণার্থ প্লেটো আরও কয়েকটী যুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

এখানে মনে রাখিতে হইবে দেহ বা স্থূল বিকাশ হইতে স্বতন্ত্র আত্মাকেই অবিনাশী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

যাহা জগতের নিয়ামক তাহা কাহারও দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে না, সুতরাং আত্মার কোন নিয়ামক নাই। বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা তাঁহার আবার স্রষ্টা আছে, এ কথা স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়। সৃষ্ট পদার্থের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, নাশও হইতে পারে। যাহার সৃষ্টি নাই তাহার আবার পরিবর্ত্তন বা বিনাশ কোথায়? তার পর, আরও এক কথা। যাহা পরিবর্ত্তন-শীলের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহার পরিবর্ত্তন স্বীকার করা অযৌক্তিক।

মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সৃষ্টি। আমার স্বভাবই নিজ আবরণ উন্মোচন করিয়া আত্মস্বরূপে প্রকাশ হওয়া। প্লেটো বলেন, সেই উন্মোচন-প্রয়াস একজন্মে ব্যর্থ হইতে পারে, সুতরাং পরজন্মের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। সে চেষ্টা বিফল প্রয়াস, একথা মনে করিলেও তাঁহার করুণায় কলঙ্ক পড়ে।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অশোক অনুশাসন—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস, মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্। ৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০, কাপড়ে বাঁধান ২৲।

বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটী প্রধান যুগ ; এই ইতিহাসের জনক মহারাজ প্রিয়দর্শী বা অশোক ; তাঁহার অনুশাসন এই ইতিহাসের শাস্ত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই অধ্যায় লিখিতে গেলে মহারাজ অশোকের অনুশাসনই যে প্রধান এবং প্রথম উপাদান সে কথা নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস একরকম অন্ধকারে নিহিত ছিল ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাধনার ফলে আজ আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। এজন্য ভারতবর্ষ চিরদিন তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিবে। আনন্দের কথা আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে এই চেষ্টা, এই আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে। "অশোক অনুশাসন" সম্পাদন সে চেষ্টার একটী নিদর্শন।

যতদূর দেখা যায় সম্পাদনকার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক অনুশাসনের ঐতিহাসিক বিবরণ বেশ দক্ষতার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকের সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। উহাতে অনুশাসন সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সকল অতি স্পষ্টরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। 'অশোক অনুশাসন" বাঙ্গালা ভাষার একটী বিশেষ সম্পদ ; একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য।

কেদার-বদরী পরিক্রমা—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস মহাশয় তাঁহার কৈদারনাথ ও বদরিকাশ্রম তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে যে বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক তীর্থপর্য্যটনকারী

বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। তিনি হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের সমস্ত প্রধান তীর্থের ও ঐ সমস্ত স্থানের অবস্থার বিষয় তাঁহার প্রণিধানমত বিবৃত করিয়াছেন। সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের ঐ সকল দুর্গম তীর্থযাত্রায় কিরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় ও তাহার নিবারণ জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে সে সমস্তই তিনি তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের অধ্যবসায়ও প্রশংসার্হ। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,২০১. কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,কলিকাতা।

সাধক ও সাধনা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীতুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গরলগাছ হাই স্কুল হইতে প্রকাশিত; মূল্য ।০ আনা, ১১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বালকবালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা দান করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য গ্রন্থমধ্যে কতিপয় মহাপুরুষের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদের জীবনী হইতে যে সকল নীতিশিক্ষা লাভ করা যায়, সেইগুলি গ্রন্থকার নিজে বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে মহাপুরুষগণের পরিবর্ত্তে তিনি নিজেই পুস্তকে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় যদি নীতিগুলি মহাপুরুষদিগেরই মুখ দিয়া বলান হইত, তাহা হইলে ভাল হইত। দুই একটী মহাপুরুষের জীবনীর ইতিহাসেও ভুল আছে।

কার্ত্তিক চরিত—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; ১১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; ৩২নং চড়কতলা ষ্ট্রীট, শান্তিপুর সুতরাগড় হইতে বিনামূল্যে বিতরিত।

ইহাতে শান্তিপুর সুতরাগড় নিবাসী মোদককুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবনী প্রসঙ্গে উক্তগ্রাম ও তত্রত্য মোদক জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে কিছুই বিশেষত্ব দেখিতে পাইলাম না।

ভ্রান্তি-বিজয়—শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

আন্দুল হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ১৲ টাকা; ২৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

"গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গদেশের আদি ব্রাহ্মণ, পরে ইঁহারা যে দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে দ্রাবিড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা সাধারণে না জানিয়া অসার কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে ঈর্ষাবিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদন করিবার জন্য এই 'ভ্রান্তি-বিজয়ের' অবতারণা"।

প্রধানতঃ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থকার নিজ মতের সমর্থনকল্পে বহু যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয়ের সকল তথ্য জানিতে চান তাঁহারা সেগুলি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

সারঙ্গ-রঙ্গদা।—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর কার্য্যালয় হইতে শ্রীরজনীকান্ত বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

ইহা একখানি বহু প্রাচীন পুস্তক। ইহাতে গীতার সারমর্ম্ম বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত হইয়াছে। ৺আনন্দী রাম বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী ইহার রচয়িতা। ১২২৬ সালের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি এই মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য অনুবাদ অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরল। যাঁহারা সংস্কৃত গীতা পড়িতে পারেন না, তাঁহারা যে এই পুস্তক পাঠে গীতার মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ১৬ই মাঘ, ইংরাজি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি, রবিবার, বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মোৎ-

সব হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা উক্ত উৎসবের অঙ্গস্থানীয় হইবে। স্বামিজীর ভক্তবৃন্দের ঐ কার্য্যে যোগদান প্রার্থনীয়।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর বেদান্ত-প্রচার কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে আরও তিনটী বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। প্রথমটীতে পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয়, দ্বিতীয়টীতে পণ্ডিত অক্ষয় কুমার শাস্ত্রী মহাশয়, এবং তৃতীয়টীতে পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় বক্তা ছিলেন।

বক্তৃতাগুলি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সোসাইটী গৃহে, ১।৪ শঙ্কর ঘোষের লেনে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। প্রত্যেকখানির মূল্য এক আনা।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়—

ইহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা এবং সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরী মাতা কর্তৃক ১৩১৮ সালের প্রতিষ্ঠিত। উক্ত বিদ্যালয় এবং আশ্রম এখন ৯৭।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে একটী ভাড়া বাটীতে অবস্থিত। যাহাতে হিন্দুবালিকাগণ সুশিক্ষা লাভ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনে সক্ষম হয় ইহাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। যাহাতে হিন্দু মহিলাগণ আশ্রমে বাস করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন তাহারও বন্দোবস্ত আছে।

বিদ্যালয়টী ৬টী শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং উহাতে সাধারণ ও শিল্প শিক্ষা ব্যতীত নীতিশিক্ষাও প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়টী সম্যক্ রূপে পরিচালনের জন্য একটী কার্য্যকরী সমিতি আছে। এখন ছাত্রী-সংখ্যা ৬৫। বিদ্যালয়ের একটী পুস্তকাগারের অত্যন্ত অভাব। একখানি বড় গাড়ীরও প্রয়োজন; কারণ যে সকল বালিকা দূর হইতে পড়িতে আসিবার ইচ্ছা করে, তাহাদের উক্ত গাড়ীর অভাবে আসা সম্ভবপর হয় না। এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের নিজের একটী বাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন।

আজকাল স্ত্রীশিক্ষার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছেন; আশা করা যায় সাধারণে এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ের অভাবগুলি মোচনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষকার্য্য।

বিগত ২৬ অক্টোবরের রিপোর্টে আমরা বাঁকুড়ার দারুণ অন্নকষ্টের কথা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিয়াছি। পরিতাপের বিষয় এই একমাসে অবস্থার কোনই উন্নতি হয় নাই। নিরন্ন বাঁকুড়াবাসিগণ যে শোচনীয় অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায়ই আছে, এবং লক্ষণ দেখিয়া যতদূর বুঝা যায় তাহারা এখনও কয়েকমাস ধরিয়া এইরূপ অবস্থায়ই থাকিবে। আমরা কয়েক মাস ধরিয়া প্রাণপণে তাহাদিগের দুরবস্থা লাঘবের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। আমাদের এই চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত ১৯শে অক্টোবর হইতে ২৩শে নভেম্বর পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জিজ্ঞাসু পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

চাউলের পরিমাণে সাময়িক সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত হইল। কয়েকখানি বস্ত্রও সকল কেন্দ্র হইতে বিতরিত হইয়াছিল।

বাঁকুড়া।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
বাঁকুড়া	৪৩	৬৬২	৩৩/৪
ঐ (পর সপ্তাহে)	৪৫	৬৪৬	৩৪/০
ঐ	৪০	৬৫৯	৩৩/০
ঐ	৪৬	৬২৯	৩৪/০
ঐ	৪৫	৫৬৫	২৯/০
ওন্দা	৮০	১৩৪৪	৮৪/০

ঐ (পর সপ্তাহে)	৭০	১১৬০	৫৮/০
ঐ	৭২	১২৪০	৬২/০
ঐ	৭২	১১২০	৫৬/০
ঐ	৬২	১০৬০	৫৪/০
কনিয়ামারা,	৫৬	৭৯০	৩৯॥০
ঐ (পর সপ্তাহে)	৬৩	৮৫৬	৪২৩৷
ঐ	৬৮	৮৭৮	৪৫/০
ঐ	৬৮	৮৭৫	৪৫/০
ঐ	৬৩	৫৫৩	২৮/০
ইন্দপুর	৪৭	৬১৭	৩২॥০
ঐ (পর সপ্তাহে)	৭২	৯৯১	৫০৷২
ঐ	৯২	১১৯৮	৬১৷২
ঐ	৯৪	১২৩৫	৬১৸৬
ঐ	৯০	১১৬০	৬০/
সোনামুখী	৪০	১১৯০	৬০/
ঐ (পর সপ্তাহে	৪৭	১০৪৮	৪৬/৪
ঐ	৪৮	৮৬৬	৪৬/০
ঐ	৪৯	৮৪৭	৪৪/০
ঐ	৩০	৪৬০	২৪/০
বিষ্ণুপুর	৪৪	৫৯১	৩০॥৮
ঐ (পর সপ্তাহে)	৩৭	৪৭৮	২৬/*
ঐ	১১০	১৪৮২	৭৬/০
ঐ	১০১	১৪৫৭	৭৩/০
ঐ	১১২	১৪৯৮	৭৬/০

বালেশ্বর।

বস্তু	৪৯	৩২৮	১৭৸৯
আগড়পাড়া	১৮	২২১	১২॥৮
ঐ (পর সপ্তাহে)	৩৯	২৪৬	৯৮৷৯

ময়মনসিংহ।

রাজনগর	৩৫	৪০৮	২০।৬

বালেশ্বরের অবস্থা ভাল হওয়ায় আমাদের সেখানকার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব থানার অধিবাসিগণের পুনঃ পুনঃ আবেদনে তথায় রাজনগরে আমাদের একটী সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সাত হাজারের অধিক লোককে এতদিন ধরিয়া আহার জোগাইতে ব্যয় খুব অধিকই হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অর্থসাহায্যের আবেদনে সহৃদয় জনসাধারণ তেমন কর্ণপাত করেন নাই। এই হেতু বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর হ্রাস করিতে হইয়াছে। উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইলেই আমরা পুনরায় অধিকসংখ্যক গ্রামে সাহায্য দিব। ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ নরনারীগণের কাতর আর্ত্তনাদ যাঁহাদিগের হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করে এমন সকল দয়াবান স্বদেশবাসীর নিকট আমরা এই বুভুক্ষু নরনারীগণের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি আমাদের এই প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না।

যাঁহার যেরূপ সঙ্গতি নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থ বা বস্ত্র পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে:— (১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়া, (২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

ভ্রম সংশোধন:—(১) গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে প্রাপ্তিস্বীকারে, ৭২২ পৃষ্ঠায় বি, আই, এস, এন্ কোং ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ, সালকিয়া, ২॥০ টাকা স্থলে ২০॥০ টাকা হইবে।

(২) ৭২৪ পৃষ্ঠায় স্থানীয় কেন্দ্র সমূহে সংগৃহীত বি, এম, ইনষ্টিটিউসনের শিক্ষক ও ছাত্রগণ, বরিশাল, ১৫৲ টাকা স্থলে ২৫৲ টাকা হইবে।